সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য

গবেষক
শিবু রায়
বামন পাড়া, পশ্চিম খাগড়াবাড়ী রোড
কোচবিহার- ৭৩৬১০১

LIBRARY
N.B.U. DARJEELING

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড:মঞ্জুলা বেরা
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০১২

Th
80·1
[illegible]

271072

07 JUN 2014

প্রাক্‌কথন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০০৩) পর অদ্যাবধি তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বিষয়কগ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। সেই অসম্পূর্ণতাই আমার এইকাজে হাত দেবার চেতনামূল। এ পর্যন্ত তাঁর জীবন ও সম্পূর্ণ সাহিত্য নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। ছাত্রদশার একটি অসম্পূর্ণ ইচ্ছা থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আমার এই গবেষণা। তখন আমি এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ১৯৯৯ সাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা চক্রে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন একটি পাহাড়ী মেয়েকে প্রায় অস্তমিত রবির কিরণের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার আকুল আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। সেদিনের সেই পিঠে বোঝাবাহী অবনত মস্তকে চলমান মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কেউ তার পিঠের বোঝা না নিলে সে মাথা তুলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখবে কীভাবে? কে তার পিঠের বোঝা নেবে? অন্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে নিরন্তর জগৎ ও জীবনের কথা বলেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বোঝা বহনের প্রকৃতি অন্বেষণের উৎস সেটাই।

এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর ড: মঞ্জুলা বেরা। গবেষণা তত্ত্বাবধানের কাজে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, অসম্ভব পরিশ্রমের সামর্থ্য এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের অকৃপণমন অনেক সময়েই আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁর অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহ আমার জীবনের মূল্যবান প্রাপ্তি। তাঁর দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে থাকা রাশ আমাকে অনেক সময় প্রায়চ্যূত অবস্থান থেকে ঠিক পথে চালিত করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বাংলা বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণও অনেক সময় নানা পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র সরবরাহ করেছে কলকাতা দে'জ পাব্লিকেশনের কর্মীবৃন্দ। ওঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময় খোঁজখবর নিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বাঁকুড়া পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়ের সহ: অধ্যাপক ড: নরেন্দ্রনাথ রায় ও আমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন রায়, ওঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে প্রয়োজনীয় বই-পত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন মুখ্যত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, দিনহাটা শহর গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের মাননীয় গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার সমস্ত কাজটি এডিটিং করে সহযোগিতা করেছে কোচবিহার, বামনপাড়া নিবাসী স্নেহের ওঙ্কার পাল (বাবাই)। ওকে আমার আন্তরিক

শুভেচ্ছা। এছাড়াও আমার পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা আমাকে এ কাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আশৈশব শিক্ষাবিষয়ক কাজের প্রেরণা দিয়ে এসেছেন পিতৃদেব স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ রায়ের সহধর্মিনী আমার পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া সরলা রায়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ-প্রণাম।

আগাগোড়া তাগিদ দিয়ে এসেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মহাশয় মৃণাল কান্তি রায় ও শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ী মহাশয়া সুনীতি রায় - তাঁদের প্রণাম জানাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিনী সোমা রায়। কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে পরিবারের সিংহভাগ বোঝা নিজের কাঁধে বহন করেও নির্লিপ্তভাবে দিনের পর দিন সে আমাকে পড়াশুনার পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী আমার কাছ থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ আব্দার পূরণে বঞ্চিত ছিল আমার স্নেহের সাত বছরের কন্যা কৃষ্টি। ওকে আমার আদর জানাই।

ডিসেম্বর - ২০১২

বামন পাড়া, পশ্চিম খাগড়াবাড়ী রোড

কোচবিহার- ৭৩৬১০১

গবেষক

শিবু রায়

সূচীপত্র

* ভূমিকা 1 - 10

* প্রথম অধ্যায় :
  সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ব্যক্তি জীবন 11- 64

* দ্বিতীয় অধ্যায় :
  সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য - বিষয় ও শিল্পরূপ 65- 361

* তৃতীয় অধ্যায় :
  সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্য : বিষয় ও শিল্পরূপ 362- 542

* উপসংহার
  (সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন) 543 - 551

* গ্রন্থতালিকা 552 - 567

ভূমিকা

অ্যারিস্টটল সাহিত্যকে বলেছেন মানুষ ও তার ক্রিয়ার অনুকরণ। সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাযুজ্য থাকে তাঁর সৃষ্টসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনদর্শনের। সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সমাজ প্রেক্ষিতের ওপর সাহিত্যিকের জীবন দর্শনের ভিত গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী সমাজের ভাবজগৎ ও মনোভঙ্গিতে উনিশ শতকে আসে নবজাগরণ। সেকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুক্তি, বিশ্ব চেতনা, মানবতাবাদ, ফরাসি বিপ্লব-প্রভাবিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ও শিল্প ভাবনার বিকাশ ঘটে এদেশে।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিকাল থেকে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে একটি ধর্মীয় ভাবাবেগ সাহিত্যের সিংহ ভাগে বিচরণ করেছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য বলতে মনসা, চণ্ডী, ধর্ম , শিব- পার্বতী ; কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি নানা দেবদেবী মাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যান কাব্যকে বোঝান হত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারাকে দৈবিক মাহাত্ম্য থেকে মুক্তি দিলেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। কালের পরিবর্তনে এল আধুনিক যুগ। কাব্য সাহিত্যে রঙ্গলাল-মাইকেল - হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্রের লেখনীতে বিকশিত হল বাংলা মহাকাব্য–ধারা। ক্রমশঃ বিস্তৃত হল বাংলা গীতিকাব্যের ধারা। বাংলা পাঠককে ভিন্ন সুরে কবিতা শোনালেন বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ-গোবিন্দচন্দ্র ও মবানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমূখ কয়েকজন মহিলা কবি। বাংলা সাহিত্যের ধারাকে বিপুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে মহিমান্বিত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মৌলিক প্রতিভার প্রভাবে উজ্জ্বলজ্যোতিষ্কের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ—করুণানিধান—যতীন্দ্রমোহণ—কুমুদরঞ্জন—কালিদাস—মোহিতলাল— কাজী নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমূখ। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাত আছড়ে পড়েছে। বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পরিবর্তনের প্রেরণা উত্তাল হয়ে ওঠে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের এই পরিবর্তনের পারদ চড়িয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্য। ইংরেজী কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভিক্টোরীয় যুগকে উত্তীর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকালে রবার্ট ব্রিজেসের "The Poems of Gerard Murder Hopkins"(১৯১৮) ইংরেজী কাব্যে বাংলা পাঠকেরা আধুনিক কবিতার নবনির্মিতি দেখতে পেয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের কবিদের প্রভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষয় ও আঙ্গিকে পালা বদল

ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীতে ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স, টি.এস. এলিয়ট, রুপার্ট ব্রুক, টি.ই. হিউম, এজরা পাউন্ড, সাইডফ্রেড, সাসুন, উইলফ্রেড আউয়েন, ডব্লিউ. এইচ অডেন, সেসিল ডে লিউইস, লুইস ম্যাসেইসি, নিকোলাস মূর, জি. এস. ফ্রেজুর প্রমুখ কবি বাংলা কাব্য সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়কালে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে বুদ্ধিজীবী মহলে নতুন জীবনপ্রত্যয় দেখা যায়। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যুক্ত হয় প্রান্তীয় ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন। পাল্টে যেতে থাকে মূল্যবোধ। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশাত্মবোধ ও দারিদ্র কাব্যের অপরিহার্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই সময়কালে বাংলা কাব্য জগতে আলোক সঞ্চার করেন কবি অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘পদাতিক’ কবি বলে খ্যাত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও বিদ্বৎজনের মধ্যে সমাজতন্ত্র ও মার্কসীয় প্রভাব পড়তে থাকে। বঙ্কিম সাহিত্যে এর পরিচয় ও প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি ‘সাম্য’ প্রবন্ধে লিখেছেন— ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগের ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম। (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ ১৪০১, পৃষ্ঠা ৩৩৪)

উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজতন্ত্রে উজ্জীবিত কয়েকজন প্রগতিশীল সচেতন ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রন্থ, সংগঠন ও পত্রিকায় দেশের উৎপীড়িত কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। দীনবন্ধু মিত্র (১৮০০-১৮৭০), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৮৯৮), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৬০- ১৯০১) প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক ও শোষকদের বর্বর অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৪৩), মুজফ্ফর আহমেদ (১৮৮৯-১৯৭৩) প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক

ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগঠকবৃন্দ। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সমাজ সচেতনতা বিশ শতকের কুড়ির দশকে বাংলা সাহিত্যে একটি বড় পালাবদল ঘটিয়ে ছিল। কাজী নজরুলের বিদ্রোহ-বীণা বেজে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য্য চেতনায় আঘাত দিয়ে। এই পালাবদলে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছিল কল্লোল (১৯২৩), কালি-কলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১) ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ লেখকদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তরুণ বাঙালী মানসে দেখা দিল মার্কসীয় শ্রেণীচেতনা, শোষিত-বঞ্চিত-মেহনতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমষ্টির আশাবাদ।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্য একটি বড় বাঁক নিয়েছিল। 'পরিচয়', 'অগ্রণী', 'অরণি', 'ক্রান্তি', 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি প্রগতিশীল সাময়িক পত্র-পত্রিকা ছাড়া গোটা তিরিশের দশক জুড়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল মার্কসীয় বিষয়ে বিভিন্ন বই ও পুস্তিকা। এই দশকে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থী চেতনার বলিষ্ঠতম প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই সময় বাংলা সাহিত্যেও বলিষ্ঠতম প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৩০-৩৩ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে নতুন প্রাণোন্মাদনা জাগালেও গান্ধীজী আন্দোলনের অভিমুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় দেশবাসীর মনে চরম হতাশা দেখা দেয়। তাঁর নেতৃত্বে যুবসম্প্রদায়ের আস্থায় চিড় ধরে। তরুণদের মনে বামপন্থী ভাবধারার বৈপ্লবিক রাজনীতির উদগ্র কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। জমিদার, মহাজন ও পুঁজিপতিদের শোষণ ও বঞ্চনায় বড় বড় কলকারখানার শ্রমিক, গ্রামের ক্ষেত মজুরদের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। শহরের কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ জমিদার-মহাজন-ও বর্বর শাসক শ্রেণীর সুদীর্ঘকালের শোষণ-অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

১৯২৯-৩০ সালে অর্থনৈতিক সংকটে কৃষকদের চড়াহারে খাজনা প্রদান অসহনীয় হয়ে ওঠে। সারা ভারত জুড়ে মুক্তি সংগ্রাম উত্তাল হয়ে ওঠে। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন সমিতি', 'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী দলের মুক্তি সংগ্রামের কার্যকলাপে শাসক দল শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কসীয় ভাবধারা প্রচারক বই-পুস্তক-পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। এতে মার্কসীয় ভাবধারার প্রতি দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, আন্দোলন, সভা-সমিতি ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন-সহ সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

তিরিশের দশকের ভারতের রাজনীতি-প্রেক্ষিত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনার প্রসার ঘটে। বাংলার প্রতিভাবান তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংগঠনের ইস্তাহারে সাহিত্যের নতুন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ক্ষুধা; দারিদ্র্য, সামাজিক পরানুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা প্রভৃতি। সে সময়ে প্রগতি লেখক সংঘের অবস্থান ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে ওঠা। এই সংগঠনের তৎপরতায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৩৬ সালের ২৫ শে জুন গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ'। এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

বাংলার শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বিদ্বৎজন সমাজে ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪২) নাট্য সাহিত্যে এর প্রভাবে গড়ে ওঠে গণনাট্য আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, পঞ্চাশের মন্বন্তর চল্লিশের দশকে শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোজগতে দায়বদ্ধতার চেতনা ও দেশকাল সচেতনতা চরমে পৌঁছে দিয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতি এ সময়ে হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রাম ও মানব মুক্তির অন্যতম বিপ্লবী হাতিয়ার। লেখণীকে হাতিয়ার করে এই দশকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, অসীম রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সরোজ দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, অয়ন মিত্র, দিনেশ দাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে সামজ বাস্তবতা, ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এঁদের রচনায় বাংলা সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতি সচেতন নতুন সাহিত্যাদর্শ গড়ে ওঠে।

এই চেতনার বিকাশে মার্কসীয় ভাবাদর্শ পালন করেছে অগ্রগণ্য ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যের নবোত্তর ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে 'পার্টিজান' মানুষ। তাঁর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁর রাজনীতিসত্তা ও সাহিত্যসত্তা। রাজনীতি তাঁর জীবনবোধের বিশিষ্ট ভঙ্গী। তিনি বলেন — ''পার্টির কর্মসূচী, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি — আমার পাওয়ার উৎস

এসবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, কাজ করা হাতের ছন্দে, বস্তিতে আর কুঁড়ে ঘরে, মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে।'' (তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ জানু: ২০০৫, পৃ:১৮০, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৬) এই রাজনীতির বিভিন্ন উত্থান পতনে বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের পালাবদল ঘটেছে। কর্মজীবনের সঞ্চিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনে তাঁর সাহিত্য জীবন গড়ে ওঠে। রাজনীতির সূত্রে অর্জিত দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য বাস্তবতার ভিত নির্মাণ করে দেয় — এই বিষয়টি তাঁর কাব্য-সাহিত্য বিশ্লষণ ও অন্বেষণ করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

বিষয়বস্তুর নিরিখে তাঁর লেখনী ছিল বিচিত্র পথগামী। কাব্য, ছড়া, উপন্যাস, অনুবাদ, রিপোর্তাজ ও ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শন পাই। রচনার ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীজালে আবদ্ধ ছিলেন না। বরং রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আধার ও বাহন করে সাহিত্যে তার শিল্পরূপ নির্মাণ করেন। রাজনীতি বিষয়ক গল্প-উপন্যাস-কাব্য রচনার ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র। তাঁর সাহিত্য জীবনে পার্টির দ্বিধাবিভক্ত ও নাজিম হিকমত সহ অন্যান্য বিদেশী লেখকদের প্রভাব তাঁর সাহিত্যের পালাবদল ঘটিয়েছে। শুরু থেকে তাঁর 'পদাতিক', 'চিরকূট' ও 'অগ্নিকোণ' কাব্যে শোনা যায় ব্যক্তি মানুষের মুখে ব্যঞ্জিত সমষ্টি মানুষের পদধ্বনি। শোনা যায় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, শোনা যায় মন্বন্তর-লাঞ্ছিত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যয়দৃপ্ত কবিকণ্ঠ। এর পরবর্তী কালের ব্যক্তি জীবনের পট পরিবর্তনে লেখনীতে ঝরে পড়ে মানবিক বিশ্ব রচনার স্বপ্ন প্রত্যয়। অন্তর্লোকে ভাস্বর হয়ে ওঠে সৃজনধর্মী মানবিক চেতনা। অঙ্কিত হয় দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের জলছবি। স্পষ্ট হয়ে ওঠে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক প্রত্যয় ভঙ্গের ট্র্যাজিক বেদনা।

তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা অধিক নয় — পাঁচটি। তাঁর মানসলোকের প্রতিফলন ঘটেছে সে উপন্যাস গুলিতে। উপন্যাসে তাঁর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসা নিজস্ব নিয়মে সমকালীন পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেছিল। ঔপন্যাসিক সুভাষ উপন্যাসে মার্ক্সকে অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমরা দেখব সেটাই যা জীবন থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, যে বক্তব্যে পৌছতে চেয়েছেন এবং জীবনকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। উপন্যাস শিল্পে তাঁর স্বাধীন স্বচ্ছন্দগতি

উপন্যাসগুলির কাঠামো নির্মাণ, চরিত্র সৃজন, ভাষাবয়ন, জীবন ব্যাখ্যা সর্বত্র উপলব্ধি হয়। তিনি যে পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, জীবন থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা এক নৈতিক বোধে বিশিষ্ট।

সাংবাদিকতার সূত্রে ও বাংলার ডাকে তিনি চষে বেড়িয়েছিলেন শহর-নগর-গ্রাম ও বন্ধুর পথ। বাংলার মানুষের সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে লিখেছেন প্রচুর রির্পোটাজ। তার একাধিক অনুবাদ, ছড়া ও অন্যান্য রচনায় শিল্প প্রতিভা, রচনা বৈচিত্র্য ও শিল্প মানসের পরিচয় মেলে। সুভাষের কাছে সাহিত্যের শিল্পগুণ মূল্যবান, কিন্তু তার থেকে বেশী দামী মনে হয়েছিল জীবনের দাবী। তাঁর রচনায় নিছক ভাবলুতা-প্রেম-ভালোবাসাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। গদ্যের ভাষা কোথাও কোথাও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তবে কাব্যের ক্ষেত্রে বাড়তি বাগ্‌বহুলতাকে ঝরিয়ে ফেলে তাকে করতে চেয়েছিলেন মেদহীন ও সুঠাম। বিষয়, আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে তিনি আত্মোপলব্ধি কতটা স্বতন্ত্র্য ও আধুনিক ছিলেন — সেটি আমরা এই অভিসন্দর্ভে অন্বেষণ ও পর্যালোচনা করব।

রাজনীতি স্বাভাবিক নিয়মে যুগ পরিবর্তন, মত পরিবর্তন, ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের নিয়মে বাসি ফুলের মতো মূল্যহীন হয়ে যায়। ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি পাঠককে একাধিক শিবিরে পৃথক করে দেয়। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জীবন প্রত্যয়ে সৃষ্ট রচনা বিরোধী শিবিরের পাঠকের মনে জাগায় দলগত বৈষম্য ও বিরোধী মনোভাব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-উপন্যাস-রির্পোটাজ ও অন্যান্য রচনাগুলির মূল সুর রাজনীতি। তথাপি বিশেষ গুণে তাঁর রচনা পাঠকের হৃদয়ে অসাধারণ নির্বিরোধ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নেয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগুলিতে কালের নিয়মে পালাবদল ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে এসেছে জীবনের নানা দিক। জীবন ও জগৎকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টি। তাঁর প্রথম জীবনে ঘটেছে রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত। রাজনীতি স্বাভাবিক নিয়মে যুগ পরিবর্তন, মত পরিবর্তন, ক্ষমতা পরিবর্তনের ফলে মহাকালের নিয়মে বাসি ফুলের মতো মূল্যহীন হয়ে যায়। তাছাড়া ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি পাঠককে একাধিক শিবিরে বিন্যস্ত করে দেয়। বিরোধী শিবিরের পাঠকের মনে জাগায় দলগত বৈষম্য ও বিরোধী মনোভাব। তাই কবিতা সেই বিরোধী ও নিজের দলের মধ্যে সমান অনুভূতি সঞ্চারিত করতে পারে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই রাজনীতি বিষয় নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করলেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের মূল সুর রাজনীতি। কোন্‌ গুণে তাঁর রাজনীতি নির্ভর কাব্য পাঠকের নির্বিরোধ অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করতে সমর্থ — তা এই পর্বের বক্তব্য।

তাঁর বেশীরভাগ কাব্যেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভঙ্গিতে রাজনীতি এসেছে। এই পর্বে ‘পদাতিক’, ‘চিরকুট’ ও ‘অগ্নিকোণ’ এই তিনটি কাব্যে দেখা যাবে কিভাবে তাঁর কবি-সত্তা রাজনৈতিক সত্তার সঙ্গে শিল্পিতরূপ পেয়েছে। তাঁর হাতে রাজনৈতিক কাব্যধারার সূত্রপাত ও বিকাশের

ইতিবৃত্ত কতটা বাংলা কাব্যধারায় ঐতিহাসিক তা দেখান হবে। তাঁর রাজনৈতিক বলিষ্ঠ আদর্শ বাংলা কাব্যের ধারায় নতুন সুর, ভাষা, আবেগ ও সমাজ সচেতনতা আনতে সমর্থ হয়েছে তা কাব্য তিনটির কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনায় ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক যুগের উত্তরকালে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের পটভূমিতে তা বিচার্য বিষয়।

তাঁর প্রথম কাব্যেই ('পদাতিক') আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কাব্য-জগতে। বাংলা কাব্যের ধারায় নজরুলের ভাববাদী সাম্যবাদের পর এই প্রথম একটি কাব্য, যাতে এই প্রথম একজন বাঙালী কবি রাজনৈতিক দলের মত পুরোপুরি মেনে নিয়ে একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করে কাব্য লিখলেন। এ কাব্যে দেখা গেল কবির বলিষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টি মানুষকে কাব্য শিল্পে উত্তীর্ণ করেছে। এ কাব্যে ব্যক্তির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে সমষ্টি মানুষের সম্মিলিত স্বর। তিল তিল মরণেও উদ্বেল জীবন-প্রীতি, হাতুড়ি ও কাস্তের গান। লাল পতাকা হাতে নতুন আশার উদ্দীপনায় সমষ্টি মানুষের রাজনীতি সচেতনতা নিয়ে এল 'পদাতিক'— তির্যক ব্যঙ্গে, প্রবাদের ব্যবহারে, বাংলা ইডিয়মের প্রয়োগে, গদ্যধর্মী শব্দ ব্যবহারে। সংলাপের হালকাচালে, হসন্তের নতুনত্বে, গতির সুকৌশল প্রয়োগে রাজনৈতিক মতাদর্শ 'পদাতিক'-এ গতি দান করেছে — এই বিষয়টি আমরা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি ।

তাঁর বিশিষ্ট জীবন বোধের পরিচায়ক হল 'চিরকুট' ও 'অগ্নিকোণ'। কবি রাজনীতিতে আপাতমস্তক ডুবে থেকে রচনা করেন 'অগ্নিকোণ'। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে রয়েছে রাজনীতির উগ্রতা। একজন রাজনৈতিক কর্মীর সক্রিয়তা কবিতায় প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাব্যে এসেছে মিছিলের শ্লোগান। মিছিলের মুষ্টিবদ্ধ হাত, মিছিলের পদধ্বনি, বাম-আন্দোলনের চরমপন্থা সদর্থক ও সার্থকভাবে অগ্নিকোণে শিল্পিত হয়ে উঠেছে। দুনিয়া বদলে দেবার প্রত্যয় ধ্বনিত 'চিরকুট' কাব্যে। অসংযত সংযম নিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলের নির্দেশ ও পথ দেখার চেষ্টা রয়েছে এই কাব্যে। 'পদাতিক'-এ শাণিত ধার, তীর্যক ব্যঙ্গ 'চিরকুট'-এ এসে ইতিবাচক সুরে ধ্বনিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্বাস স্থির লক্ষে উপনীত হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম, আত্মোপলব্ধি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ — এই বিষয়টিকেও আমরা তাঁর কাব্য-সাহিত্যে পর্যালোচনা করেছি ।

কাব্যকে হাতিয়ার করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ভীত দৃঢ় করেছিলেন। তিনি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ। এ-বছরই তিনি জুলাই মাসে 'জনযুদ্ধের গান' শীর্ষক একটি গীত সংকলন করেন প্রকাশক হিসেবে। 'চিরকুট' ও অন্যান্য কাব্যের যেসব কবিতায় ফ্যাসিবাদের

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তা এই পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। তাঁর কবিতায় জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চীনের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন। কবিতায় তিনি ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথায় তিনি কাব্যে ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে মন্বন্তর লাঞ্ছিত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চেতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটপূর্ণ দিনে পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার জনজীবনে চরম আঘাত এনেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতা সূত্রে সেই মন্বন্তরের ভয়াবহ ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিনের মন্বন্তর তাঁর কবিতার ভাববস্তু ও প্রকরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। কবি দুর্ভিক্ষের নিছক ছবি অঙ্কন করতে কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতায় অঙ্কিত দুর্ভিক্ষের ছবিতে ফুটে উঠেছিল স্বদেশবাসীর মর্মান্তিক দুরবস্থার প্রতি উদ্বেগ উৎকর্ণ সমবেদনা ও শোষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা এই সংকটের প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তির কামনায় তাঁর কবিতায় দৃঢ় সংকল্প ও আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর পদাতিক, চিরকুট ও অন্যান্য কাব্যের কবিতাগুলিতে কোথায় কোথায় মন্বন্তর-এর প্রতিরোধ, শাসক-শোষকদের অপশাসন থেকে জাতীয় মুক্তি ব্যঞ্জিত হয়েছে তা এই পর্বে অন্বেষণ করা হয়েছে।

কালের গতিতে তাঁর কাব্যে উচ্চকিত কণ্ঠে দৃপ্ত হয়ে ওঠে মানবিক চেতনা। এই পর্বে আলোচনা করা হবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য ধারার এক বিশেষ পালাবদল। 'অগ্নিকোণ-এ পর 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কাব্যমানস নতুন মোড় নিয়েছে। এতে উদ্দীপক হিসেবে প্রতিক্রিয়া করেছে হিকমতের ও মায়াকোভস্কির কবিতা। এই পর্বে তিনি রাজনৈতিক দলমতের কষ্টিপাথরে বিশ্বসংসারকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে নিটোল পরিপূর্ণ মানবতাবাদে আত্মস্থ হয়েছেন। এই পর্বে তিনি মানবতাবিরোধী অশুভ শক্তির পতন এবং ভালবাসা প্রত্যয় পূর্ণ মানবিক বিশ্ব রচনার দৃষ্টিকোণে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। এই পর্বের কাব্যে এসেছে বৈনাশিক স্যাটায়ারের জায়গায় কবির আত্মস্থ ইতিবাচক মানবিকতায়। এই পর্বের কাব্যে এসেছে অভিনব আঙ্গিক, অভিনব চিত্রকল্প এবং বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্য। বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকে রচিত কাব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সাধারণের দৈনন্দিন জীবন। এই পর্বে ধরার চেষ্টা করেছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের ও তাঁর সৃষ্ট কাব্যের এক বিশেষ পালাবদলকে।

এই পর্বে কবি নেমে এসেছেন সাধারণের দৈনন্দিন সংসারে। এই পর্বে কবির হাতে আর্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় গল্পের ভঙ্গিতে তাঁর স্বতন্ত্র নির্মাণ চাতুর্য ও নির্মোহ মননশীলতায় অভিনব

শিল্পিতরূপ পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপূর্ব আঙ্গিকে আটপৌরে মুখের ভাষায় রচিত 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২ খ্রী:) কাব্য গ্রন্থে। এই পর্বেই দেখা যায় কবির ব্যক্তি জীবনের এক ট্র্যাজিক পরিণতি। কারণ কাব্য সৃষ্টি ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের উৎস কমিউনিষ্ট পার্টি এ-সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় (১৯৬৪ খ্রী:) এই ঘটনা কবির মানসলোকে আলোড়ন ফেলেছিল। ফলে এই পর্বে কাল 'মধুমাস' (১৯৬৬ খ্রী:), 'এই ভাই' (১৯৭১ খ্রী:), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২ খ্রী:), 'জল সইতে' (১৯৮১ খ্রী:), 'চইচই-চইচই' (১৯৮৩ খ্রী:), 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫ খ্রী:), 'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯ খ্রী:), 'ধর্মের কল' (১৯৯১ খ্রী:) ইত্যাদি কাব্যে কবির আগের পর্বের প্রত্যয় ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আঙ্গিক, ও ভিন্ন কবিমানসে কাব্যরূপ নির্মিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকে জীবন প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসেবে কাব্যে শিল্পরূপ দান করেছেন। তাঁর কাছে কাব্য-শিল্প দামি কিন্তু, তার থেকে বেশী মূল্যবান মনে হয়েছিল জীবনের দাবি। তাঁর কবিতায় তিনি নিছক ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিতায় বাড়তি বাগ্‌বহুলতাকে ঝরিয়ে ফেলে তাকে করতে চেয়েছিলেন মেদহীন, লঘু, নগ্ন, এবং সুঠাম। যথাসম্ভব যতিচিহ্ন বর্জন করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তির্যক ব্যঙ্গ, প্রবাদ ও ইডিয়মের ব্যবহার। গদ্যধর্মী আটপৌরে মুখের ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ হসন্ত, চরণের শেষে অন্ত্যমিল, অল্পকথায় গল্পের ভঙ্গী ও জীবনমুখী চিত্রকল্প, বিষয়, আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের ধারায় কতটা আধুনিক ছিলেন তা আমাদের বিচার্য বিষয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়াগুলিতে জীবন ও জগতের নানা অভিজ্ঞতা ছবির মতো বিশেষ আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে। তাঁর ছড়াগুলিতে কাব্যের ভিন্ন স্বাদের পরিচয় পাই। চৌষট্টিটি ছড়া নিয়ে তাঁর একটি মাত্র ছড়ার বই 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো' (১৯৮০ খ্রী:) ; ছড়ার ইতিহাসে এটি তাঁর বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী সংযোজন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে পৃথিবীর কী এমন আছে যার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা গড়ে ওঠে নি? ভাত, রুটি, খিচুড়ি, সিঙ্গারা, নিমকি, কচুরি, ছুঁচো, ইঁদুর, ব্যাঙ, মশা, মাছি, ভাম, সবরকমের পাখি, সবরকমের মানুষ, জল, মাটি, শহর, গ্রাম ইত্যাদি তুচ্ছাতিচ্ছ অনেক কিছু একই সুতোয় জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেলতে পেরেছিলেন তিনি। অনেক কিছু অনেক বড় কিছুও তাঁর কাছে অতি সাধারণ হয়ে তাঁর নিজের মতো করে ধরা দিয়েছে। এই ছড়াগুলিতে জগতের খুঁটি-নাটি অনেক কিছু বেছে নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এক একটি জুতসই পংক্তি। ছড়াগুলিতে প্রথম পংক্তির সঙ্গে পরের পংক্তির অর্থের দিক থেকে কোন মিল নেই, কিন্তু আছে চরণান্ত মিলের একই সুরে বেজে ওঠা আর শব্দ সাজানোর বিস্ময়কর দক্ষতার নিদর্শন।

বাংলা অনুবাদ কর্মেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ স্রষ্টা। তাঁকে কাব্য অনুবাদক হিসেবে আমরা পাই ভিন্ন এক কবি হিসেবে। অনুবাদের প্রভাবে যাঁর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি ভিন্ন রঙের ফুল ফুটিয়েছে। প্রধানতঃ নাজিম হিকমত, এছাড়া নিকোলো ভাপৎসারভ, পাবলো নেরুদা, ওলঝাস সুলেমেনভ হাফিজ প্রমুখ লেখকদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলতঃ নাজিম হিকমতের প্রভাবে তাঁর কবিতা হয়েছে অধিকতর জীবনমুখী। জীবনের সবকটি দিকই ফুটে ওঠে এই সময়কার কবিতায়। তাঁর অনুবাদ কাব্যে কতটুকু মূল্যের অনুগত তা যাচাই না করেই বলা যায়, সেগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত কবি প্রেরণা ও প্রতিভার ছাপ আছে। শব্দ চয়ন, ছন্দ বৈচিত্র্য ও প্রবন্ধে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি আছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে,সমাজ-জীবন ও জগৎ থেকে তিনি কী পেয়েছেন, আর জীবন ও জগতকে দেখার ভঙ্গিমাই বা তাঁর কী ছিল — সেটা অন্বেষণ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ ব্যক্তি জীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমকালের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাঙালী-সমাজ জীবনে, বাংলা সাহিত্য জগতে ও বাংলার রাজনীতিতে তিনি যেমন উজ্জ্বল ছিলেন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তাঁকেই কেন্দ্র করে। আমৃত্যু তাঁর জীবন সংগ্রামের সঙ্গী হিসেবেই বিশিষ্ট। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর জীবনের এই বিশিষ্টতা এবং ঘটনাবহুল জীবনবৈচিত্রের প্রকৃতি পর্যালোচনা চেষ্টা করেছি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে শাশ্বত সত্যরূপে নিহিত রয়েছে যুগ্মসম্পর্ক। সাহিত্য অনুধাবনে অবশ্যম্ভাবী সহায়ক হয়ে ওঠে সাহিত্যিকের জীবনযুক্ত সম্ভাব্য বিষয়। কেননা সাহিত্য স্রষ্টার হৃদয়-সমুদ্রের অতলে জীবন ও সৃষ্টি-রহস্য সমস্থিতি রূপে নিমজ্জমান থাকে। স্রষ্টা তাঁর মানবচৈতন্যের বিশেষ বোধজাত অন্তঃপ্রেরণা থেকেই সৃষ্টি করেন সাহিত্য। সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথায় বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ার এ্যান্ড পীস'-এর কথায় লিখেছেন —''Everyman has a two-fold life ; on one side is his personal life which is free in proportion as its interests are abstract , the other is life as an element as one hue in the swarm ; and here a man has no chance of disregarding the laws imposed upon him .'' (সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ১৯৯৩, পৃ: ২১৭, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬)

শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সম্পর্কের কথায় বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — '' যদিও যা আছে ইহলোকে শিল্পের জগতে তা-ই আছে নানা রূপে ছড়িয়ে , তবু এই মস্ত পৃথিবীটা শিল্পকর্ম হলেও সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রের জগতে শিল্পীদের কাছে তা নিতান্তই উপকরণ মাত্র। বস্তুজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা মারফৎ সংগৃহীত এই উপাদান শিল্পী তাঁর মন , মস্তিষ্কও কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা এবং ব্যক্তিত্ত্বের স্পর্শে শিল্পমূর্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলেন।'' (সাহিত্য বিবেক, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ,২০০৬,

পৃ:১০)। লেখক তাঁর লেখার মধ্যে ব্যক্তিমানসের, সমাজ ও বিশ্বমানবের ক্রিয়ার অনুকরণকে প্রতিফলিত করে থাকেন। অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন—''স্পষ্টতই কাব্যের উদ্‌ভবের মূলে আছে দুটি কারণ, আর এই দুটি কারণ-ই মানুষের স্বভাবের মধ্যে নীহিত। শৈশব থেকেই অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক (বৃত্তি)। ......কাজেই অনুকরণ মানুষের স্বভাবগত ; ঠিক সেইরকম স্বভাবগত ছিল সুষমা ও ছন্দের বোধ। এইসব স্বাভাবিক প্রকৃতি ক্রমশই পরিণত হয়েছে এবং নানা পরীক্ষার মধ্যদিয়ে জন্ম নিয়েছে কাব্য।'' (কাব্যতত্ত্ব, অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশির কুমার দাশ, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ: ৫২) ১৯৯৪ কাব্যের ন্যায় সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি যেকোন ক্ষেত্রে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করে থাকেন।

লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছোট গল্পের সম্পর্কের কথায় সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন— ''আর ছোটগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বের-ই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোট গল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তা-ই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বের-ই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।'' (সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ: ১৭৪) লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কের কথায় বিখ্যাত আইরিশ গল্প লেখক Sean O'Faolainতাঁর 'The Short Story' গ্রন্থে লিখেছেন—"In other words the short story is an emphatically personal exposition. What one searehs for and what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subject, is of value to the writer's temperament and to his alone his lounterpart his perfect opportunity to project himself." (সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ১৪০৮, পৃ: ১৭৪)

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য উপলব্ধি ও অনুধাবনে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে ওঠে বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলব্ধ তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বিশিষ্ট দার্শনিক চেতনা। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন—''অথচ যাকে বলা যায় গণ-কবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমান রাখলেও তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে। .... কিন্তু আরেকভাগে তিনি রচনা করেছেন সেইসব কবিতা, যেগুলির বিষয়-বস্তুতে রাজনীতিক চেতনা থাক বা না থাক, কবিতাগুলিতে

পাওয়া যায় কবির সজাগ আত্মবীক্ষণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।'' (বাংলা কবিতার কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ,২০০৮, পৃ: ২২৬-২২৭)। সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন তাঁর সাহিত্যসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এসম্পর্কে তাঁর কবিতার আলোচনায় প্রখ্যাত অধ্যাপিকা ও সাহিত্য সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন —'' সুভাষের বাল্যজীবনে বাংলার গ্রাম ও বাঙালী সংসারের ব্রত-পাঁচালি, বাল্যক্রীড়া, প্রকৃতির শ্যামলতা, রান্না-খাওয়া-অভাব-আতিথেয়তা, প্রবাদ-প্রবচনময় ভাষা, মা-কাকিমা-ভাইবোনের মধুর প্রিয়সঙ্গ ইত্যাদি সম্পদের যে নিবিড় নৈকট্য ছিল .... এই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি হিসেবে প্রথম থেকে নিজের আসনটিকে বিশিষ্ট চিহ্নিত করে নিতে পেরেছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে এসেছিলেন বলে তিনি সাধারণ মানুষের ভাষাটি চমৎকার বুঝেছিলেন প্রথম থেকেই। তাই চল্লিশের দশকের জনমুখী কার্যক্রম যাঁদের রচনার রূপ পেয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ ২০০৫, পৃ: ১৩০-১৩১) লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবন ও জগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যৌথ পরিণামে একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করেনছিলেন সাহিত্য। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল সমকাল, মানুষ, জগৎ ও দেশ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য এই বৃত্তের অর্ন্তভুক্ত —'' সমসময় ও সমকালীন সমাজকে আত্মী-করণ করে দৈনন্দিন জীবনের হলাহল কণ্ঠস্ত করে তিনি নীল-কণ্ঠ। তাঁর কবিতায় সমাজ দেশ কাল চেতনার স্পষ্ট ছবি পাই।'' (একালের কবিতা : প্রকৃতি ও প্রবণতা, অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ড: আদিত্য মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, পৃ: ১৫৩)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গর্ভধারিণী ছিলেন শ্রীমতি যামিনী দেবী। নদীয়া-কৃষ্ণনগরের ভাষার মিষ্টতা তাঁর দখলে ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বাংলা মাঘ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে নদীয়া কৃষ্ণনগরের মামার বাড়িতে। তাঁর জন্ম হয়েছিল দুই কালের সন্ধিক্ষণে, শীতের শেষ ও বসন্তের শুরুতে—

'' আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে,
একেবারে শীতের শেষদিন।
পাতা নেই গাছে।
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
ব'লে ওঠে:
'মনে নেই? কাল মধুমাস!' (কাল মধুমাস /কাল মধুমাস)

তাঁর জন্মের বুধবারের দিনটিকেও কবি ছন্দ ও ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন —''ভুলিনি, কারণ — / মা বলতেন: বুধবারে নখ কাটা আমার বারণ!'' (কাল মধুমাস/কাল মধুমাস) সুভাষ মুখোপাধ্যায় নদীয়ার ভঙ্গকুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের বিষয়টি তিনি তাঁর আত্মজীবনীতেও উল্লেখ করেছেন —''স্থান: কৃষ্ণনগর। মা-র পেট থেকে আমি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছিলাম।'' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী , পৃ: ৮) তাঁর জন্ম রাশি কুম্ভ। সেখানে তিনি তাঁর ভাই-বোনদের সম্পর্কে লিখেছেন —''মা-র ছটি সন্তানের মধ্যে আমরা দু-ভাই আর এক বোনই কপালজোরে টিঁকে গিয়েছিলাম। দিদি ছিলেন সবার বড়।

আমি দু-ভাইয়ের মধ্যে ছোট হলেও মা-র ঠিক কোলের ছেলে নই। কারণ, আমার পরেও আমাদের এক ভাই হয়েছিল।'' (ঐ, পৃ: ১৮)। তাঁর বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন আবগারি বিভাগের প্রসিকিউটর। তাঁর মায়ের গায়ের রঙ কালো ছিল বলে নাম হয়েছিল যামিনী দেবী। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বংশ পরিচয়ের কথায় লিখেছেন —''আমার ঠাকুর্দা কিংবা ঠাকুর্দার বাবা তাঁর মামার বাড়ির সম্পত্তি পেয়ে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামে উঠে আসেন। আমার ঠাকুর্দার মা কিংবা ঠাকুমা ছিলেন খুব জাঁদরেল মহিলা। ওঁদের আমলে আমাদের গ্রামে বিলের পাশে উঁচু ঢিবিতে ছিল সাহেবদের নীলকুঠী । গ্রামের লোকদের ওপর কী একটা অন্যায়-অবিচার করায় আমার ঠাকুর্দার মা বা ঠাকুমা নাকি লম্বা একটা বেত হাতে নিয়ে নীলকুঠির এক সাহেবকে তেড়ে গিয়েছিলেন মারতে।'' (ঐ, পৃ: ২১)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মায়ের বাবাকে ডাকতেন দাদামশায় বলে। তাঁর দাদামশায় ছিলেন কালীমোহন বাড়ুয্যে। মাতৃকুলের সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন —''দাদামশায় ছিলেন বাড়ুয্যে। ডাক্তার। সহকারী সিভিল সার্জেন। যেকালে মুখ্যত সাহেবরাই সিভিল সারজেন হতে পারত, সেকালের পক্ষে বেশ উঁচু পদই বটে।

আমার দিদিমা ছিলেন কুড়িটি সন্তানের গর্ভধারিণী। তারমধ্যে বেঁচে ছিলেন দশজন। পাঁচ মামা আর মাকে নিয়ে পাঁচবোন। . . . . টাকাকড়ি, কাঁঠালপোঁতায় বাগানসুদ্ধ বিরাট বাড়িক — সব রেখে গেলেও, পাকা বুদ্ধির অভাবে সব নয়-ছয় হয়ে অতবড় সংসারটা শেষ পর্যন্ত ভেসে গেল।'' (ঐ, পৃ: ২৩)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গোবিন্দ' নামটি তাঁর ঠাকুর্দার দেওয়া। সেটাকে নিজের মতো করে তিনি ঢোলগোবিন্দ করে নিয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দার একটি ক্যাশ বাক্স ছিল। সেটা ছিল শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গুপ্তধনের মতো একটি কৌতুহলী বস্তু। সেখানে থাকত তাদের বাড়ির সবার কুষ্ঠি।

সেগুলি হলদে কাগজে লাল কালিতে লেখা গোল করে মোড়ানো থাকত। তাঁর জ্যাঠামশাই ছিলেন দীনেশ সেনগুপ্ত। আর তাঁর জেঠিমা তাঁদের মায়ের চেয়ে ছোট ছিলেন বলে তাঁকে তাঁরা কাকিমা বলে ডাকতেন। সেই কাকিমার ভারি সুন্দর ছিল মুখশ্রী ছিল। তাঁর চেহারায় একহারা গড়ন এবং গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা ছিল। তাঁর দেশ ছিল বরিশাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে আমরা আরো দেখি যে, তাঁর এই কাকিমার ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল—মঞ্জু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কাকিমার মৃত্যুর পর থেকে মঞ্জু তাদের সঙ্গেই থাকত। সে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব 'ন্যাওটা' ছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুর্দা ছিলেন ভঙ্গকুলীন। নদীয়ার সীমান্তে যশোরের সুমিদ্রে গ্রামে ছিল তাঁদের আদিবাস। তাঁর ঠাকুর্দা একসময় তাঁর বালবিধবা মায়ের হাতধরে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামের অপুত্রক দিদিমার কাছে ওঠেন।এবং তিনি সেখানকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ফলে তাঁর ঠাকুর্দার সঙ্গে পিতৃকুলের আর কোন সম্বন্ধ থাকেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুর্দার ছিল চার ছেলে চার মেয়ে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বড় পিসিমা, বনগাঁর বাসিন্দা ছিলেন। তারপর তাঁর বাবা। তাঁর মেজোপিসির বিয়ে হয়েছিল আসানসোলে। কলকাতায় প্রসব হবার সময় তিনি উন্মাদ হয়ে যান। শেষে রাঁচির পাগলা গারদেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সেজোপিসির বিয়ে হয়েছিল লোকনাথপুরের কুড়ুলগাছিতে। আর ছোটপিসিমার বিয়ে হয়েছিল দত্তপুকুরের কাছে হৃদয়পুরের গাঙ্গুলী বাড়ীতে। বড় পিসেমশাই ছিলেন পেশায় উকিল। তিন পিসির পর তাঁর তিন কাকার জন্ম হয়। তাঁর বাবার থেকে তাঁর ছোটকাকা বয়সে আঠারো-উনিশ বছরের ছোট। তাঁর বাবা ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে গিরিশ বোসের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবার কথায় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন —" বাড়িতে আমরা বাবাকে যমের মতো ভয় করতাম। বাবার ছিল টানা নাক, মুখ-চোখও ভালো। ঘন কোঁকড়া চুল। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো ফরসা। একটু লালচে। আমার তো ওঠেই না এমন কি আমার দাদা-দিদিরাও কেউ বাবার রঙ পায়নি। আমার মা কালো। আমিও কালো। বাবা আমাকেও ডাকতেন 'কালো' বলে। (ঐ, পৃ: ৫৪)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দাদা ও একমাত্র ভাইপো গান ভালো গাইতে পারতেন।

তাঁর বাবা শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড় ছেলে হিসেবে সংসারের সমস্ত ভার নিজেই সামলে ছিলেন। এ নিয়ে কখনো তাঁকে কোনো আফসোস করতে শোনেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"বাবার সঙ্গে কাকাদের বয়সের বেশ তফাত ছিল। ছোট থেকেই তাদের বড় করার ভার বাবাকে নিতে হয়। পেনশন নেবার পর ঠাকুর্দা তাঁর সংসারটা বাবার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়েছিলেন। এ নিয়ে পিতা-পুত্র দু-তরফেই বোধহয় একটা অস্বস্তির ভাব ছিল। বাবার

মধ্যে একটা গোঁ ছিল, হাজার টানাটানিতেও ঠাকুর্দার টাকা তিনি ছোঁবেন না। আবার মাঝে-মধ্যে ঠাকুর্দা দু-চারটে করে টাকা কাকাদের ধরে দিলে সেটাও বাবার চোখ এড়াত না। বাবা মনে করতেন, ঠাকুর্দা বুঝি এ বিষয়ে বাবার অক্ষমতাটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন।'' (ঐ, পৃ: ৫৭) পরিবারের এই আর্থিক অনটন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সারা জীবনই বহন করে চলতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সংগ্রামের মতো পরিবারের অর্থাভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করাও একটি অন্যতম লড়াই ছিল।

সংসারের নানা অভাবকে উত্তীর্ণ করে সোজা হয়ে চলা এবং জীবনের নানা বোধের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মা-বাবার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। একমাত্র বড় পিসি ছাড়া, বিয়ে হয়ে আসার পর তাঁর মাকেই তাঁর ছোট ছোট কাকা-পিসিদের দেখাশোনা করতে হয়েছিল— ''ঠাকুমা না থাকায় বিয়ের পর থেকেই মা-র ওপর এসে পড়েছিল ছোটদের মানুষ করার ভার। সেজোকাকা ছোটকাকাও মা-রই আওতায় বড় হন।

যৌথ পরিবার থাকা অবস্থায় আমার যে সব খুড়তুতো ভাইবোনেরা জন্মেছিল, তারা সবাই আমার মা-র কোলেই মানুষ হয়।'' (ঐ, পৃ: ১৫৪)। তাঁর মা কেবল পরিবারের লোকদেরই নয়, বিভিন্ন সময় তিনি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সহায় হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন —''মা-র কাছে ছোটলোক বড়লোক নেই। তা ছাড়া গরিব-গুরবোদেরই মা-কে বেশি দরকার। ওদের তো আর ডাক্তার-বদ্যি ডাকার মুরোদ নেই।''(ঐ, পৃ:১৪৮-১৪৯)। তাঁর ঠাকুর্দার মানা উপেক্ষা করেও তাঁর মা অনেক সময় মালোদের প্রসবের সহায়তায় ও নিজের কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তিনি মহামারিতেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শ্বশুরের নিষেধকে উপেক্ষা করেই। কলেরা ও ওলাউঠার মত মহামারিতেও তিনি নির্ভয়ে মানুষের সেবা করেছিলেন—''..........পরের বিপদে মা-র বুক পেতে দেওয়ার ব্যাপারটাতে ঠাকুরদার আপত্তির ভাব বেশ কমে এসেছিল। কিন্তু ওলাউঠা রোগটা অত সহজভাবে তো আর নেওয়া যায় না। ছেলেপুলের বাড়ি। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে?

মা ঠান্ডা মাথায় জানালেন, ময়লাগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। সঙ্গে হাত ধোবার কারবলিক সাবান আছে। বাড়িতে লায়জলের জলে সব ভিজানো হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই। '' (ঐ, পৃ: ১৪৯) তাঁর মা যামিনী দেবী তৎকালীন সময়ে ইংরেজ মেমসাহেবদের স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। পরিবারের অভাবকে সঙ্গী করে যামিনী দেবী লড়াই করে গিয়েছিলেন আজীবন —''একটা ছেঁড়া-ফাটা সংসার সারক্ষণ সেলাই আর রিপু করে টেনেবুনে চালাতে হত। বাবা তো মাসকাবারে

মাইনের টাকাটা মার হাতে ধরিয়ে দিয়েই খালাস। তা দিয়ে তো হরিদাদার দইয়ের ভাঁড় হয় না। ফলে, অভাবের সংসারে অশান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। .... মা-র কাছে শিখেছিলাম, ভাতের সঙ্গে আর কিছুই যদি না জোটে, এক-পলা সর্ষের তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা কিংবা লঙ্কা পোড়া— ব্যস।'' (ঐ, পৃ: ৬২-৬৩) তাঁর মাকে পরিবারের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর তেমন কোন দামি রঙিন শাড়ি পর্যন্ত ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন বাইরে কোথাও গেলে তাঁর একটাই থাকত লালপাড় তাঁতের সাদা শাড়ি। বাহ্যিক সাজপোশাকে নিতান্ত আটপৌরে হওয়াকে সমকালীন সমাজ ও মানুষ সেদিন রেহাই দেয় নি — ''একবার এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে এক অফিসারের বউ মা-র সাদাসিধে সাজসজ্জা দেখে এবং তারপর হাত দুটো ধরে মুখের কাছে এনে নাকি বলেছিলেন, 'এ মা! হাত-দুটোও যে একদম খালি। তোমার স্বামী বুঝি তোমাকে ভালোবাসে না?'

ব্যস, তারপরই বাড়ি ফিরে মা জানিয়ে দিয়েছিলেন এর পর থেকে আর কখনও তিনি কোনো নেমন্তন্ন-বাড়িতে যাবেন না। এরপর বাবাও কখনও মাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো জোরজার করেন নি।'' (ঐ, পৃ: ৬৩) মায়ের প্রভাবে মানুষের সেবা করা, দেশের ও দশের জন্য কাজ করা ও বাইরের জগৎকে ঘুরে দেখার প্রকৃতি তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল — ''মা ঠিকই বলেন। ঘরের বাইরে পা দিলে কত অজানা জিনিস যে জানা হয়ে যায়।'' পদাতিক কবির জীবনে ছিল দুরন্ত চলার গতি। রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রমণকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, সমুদ্র-বন্দর প্রভৃতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ভিত্তিভূমি শিশুকালে মায়ের সেই দার্শনিক বীজমন্ত্র। গদ্যসাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল; সেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃতি তাঁর মা গড়ে না তুললে আমরা হয়তো এই সম্পদ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত থাকতাম।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পমানস নির্মাণের প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর বাবার। তাঁর বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরকারী চাকুরী করতেন। অসম্ভব আর্থিক কষ্টেও তিনি পরিবারের কাউকে অস্বীকার করেন নি। বরং ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সবার জন্য তিনি নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সততা ও মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি নির্মাণে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল তাঁর বাবার। তিনি তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন — ''হাজার চাপাচুপি দিলেও, কোনকিছুতে ঘুষের নামগন্ধ থাকলে ঠিক তিনি ধরে ফেলতে পারতেন। এসব ব্যাপারে বাবার সাংঘাতিক রকমের শুচিবাই বাড়ির আর কেউ খুব একটা পছন্দ করতো না। তারা বলতো আদর করে কিংবা খাতির করে কেউ যদি

LIBRARY NBU. DARJEELING
271072
07 JUN 2014

পুকুরের পাকা রুই, বাগানের ফল তরকারি কিংবা দোকানের দইমিষ্টি পাঠায় — সেটাকেও ঘুষ বলে ধরে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরত পাঠানোর কোনো মানে হয় ?'' (ঐ, পৃ: ৫২)

তবে তাঁর বাবার চেহারায় দৈন্যদশার এতটুকু চিহ্নও থাকত না। স্বভাব-চরিত্রে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার থাকতেন। আবার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিমাণে কম ও নিতান্ত আটপৌরে হলেও তা সবসময় পরিষ্কার রাখতেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাবার কথায় বলেছেন —''বাবার ছিল অদ্ভুত স্বভাব। সবার সব ভার নিজে যেচে ঘাড়ে নিতে বাবার জুড়ি ছিল না।'' (ঐ, পৃ: ১৫৫) তিনি তাঁর বাবাকে দেখে এসেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। সমাজ ও মানুষের সেবা করা তাঁর বাবার একটি মূল্যবান গুণ ছিল। সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করার প্রবণতার ভিত্তিভূমি ছিল তাঁর বাবা। সর্বজনের হাত ধরে মানুষের কাজ করার প্রকৃতি এবং লড়াই করার প্রবণতা জন্মসুত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা ছিলেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ।তিনি তাঁর কথায় লিখেছেন —''বাবার আপত্তিতে আমাদের পরিবারের কেউ উদ্বাস্তু বলে নামও লেখায় নি।''(ঐ,পৃ: ৬০) তাঁর সাহিত্যজীবন ও দার্শনিক চেতনার ভিত্তি নির্মানে তাঁর মা ও বাবার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাঁর রচিত সাহিত্যের নানা স্থানে তাঁর মা ও বাবাকে উপলব্ধি করি। তাঁর বাবার চাকুরী জীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর বাবার বদলির চাকুরী সুত্রে শৈশবে তিনি বিভিন্ন জায়গা তাঁর দেখেছিলেন। জগৎকে ঘুরে ফিরে দেখা এবং তা নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলা ক্রমশ: তাঁর জীবনের একটি প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল। এভাবে ব্যক্তি জীবনের ভ্রমণপিপাসার সঙ্গে সাহিত্যধর্মের সম্পৃক্ততায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সহিত্যের 'পদাতিক'।

কৈশরের অন্যতম সাথী রমাকৃষ্ণ মৈত্র তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে মায়ের অনদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন —''কৃষ্ণনগরের মেয়ে বলেই বোধহয় যামিনীদেবীর নরম স্বরের সুরেলা কথাবার্তার মধ্যে একদিকে যেমন থাকত অসাধারণ মিষ্টি বাঁধুনি, অন্যদিকে পথ-চলতি কথ্য বাকধারার অজস্র প্রয়োগ। ফলে, বঁটিতে বসে আনাজ কুটতে কুটতে বা ভেজা হাত আঁচলে মুছে বাইরের কারো সঙ্গে যখনই যে-কথা বলতেন তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত রুচি ও মাধুর্য ছাড়াও একটা ছন্দোময়তা। মার কাছ থেকে সুভাষ অফুরন্ত এই পথচলতি শব্দভান্ডার এবং তাঁর ব্যবহারে ছিরি-ছাঁদের কলা- কৌশলের প্রাথমিক জ্ঞান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠবে এইসব শব্দের আকস্মিক প্রয়োগ এবং প্রচলিত পাঠ্য ছন্দকে সুবচনী মাত্রাতালে নিয়ে আসায় তা পাঠককে চমকে দিয়ে কাব্য-

উপভোগের পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যায় বলে আমার বিশ্বাস। . . .মা ছিলেন জননী বসুন্ধরার মতো।''(সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৮, দে'জ পারলিশিং , পৃ: ৪১)

চলার পথে, সবার ও সবকিছুর থেকে যতটা সম্ভব রস নিংড়েনিয়ে নিজেকে একটু একটু করে পুষ্টকরে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবন সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেই সঞ্চয়ে পুষ্টি যুগিয়েছিল অনেক খ্যাত-অখ্যাত চরিত্রও। সেই তালিকায় অসামান্য হয়ে ওঠেন একজন রান্নার লোকও — ''আমাদের রান্না করত যে, উড়িষ্যার সেই মোহনের আমি খুব ন্যাওটা ছিলাম। ফাঁক পেলেই আমি ওর কোলে চড়ে বসতাম। যতটা মনে পড়ে, মোহনকে আমি খুব ভালবাসতাম। অবশ্য ওর কোলে ওঠার আরেকটা আকর্ষণ ছিল ওর মুখের পান। তার স্বাদ এখনও যেন আমার মুখে লেগে আছে।''(আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ,১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ: ১৭)

বাল্যকালেই তাঁর জীবনে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের অঙ্কুর হয়েছিল ।সেই সময় থেকেই তিনি জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার আস্বাদ উপলব্ধি করে এসেছিলেন —'' তখনও আমার সাঁতারের জ্ঞান ঘাটের পৈঁঠে ধরে জলে পা ছোড়ার বেশি নয়। টুলো পন্ডিতমশাই এসেই আমাকে ধরলেন। বললেন, তুমি আমার কোমর ধরো, চলো তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

ডাঙা ছেড়ে দূরে যাওয়ায় সে কী রোমাঞ্চ! আজও মনে পড়ে। পুকুরের মাঝবরাবর গিয়েছি। হঠাৎ সেই শয়তান লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ডুবে যাব। প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাঁচতে। একবার যবি পাড়ে উঠতে পারি। দেখে নেব। একবার যদি—

কী করে যে পাড়ে পৌছুলাম! কেউ আমাকে উদ্ধার করতে এগোয় নি। নিজেই নিজেকে বাঁচালাম। কোনো রকমে জল খেতে-খেতে হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ভাসিয়ে। ঘাটে এসে গোড়ায় গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে রাগ পড়তে লাগল। মরা শরীরে জেগে উঠল এক অসম্ভব পুলক। আমি পেড়েছি। মৃত্যুকে পেড়িয়ে আসতে পেড়েছি।''(ঐ, পৃ: ১৪)

লড়াই, সাহস, ভয়, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য গুলির আদিমূল তাঁর শৈশব — ''ছেলেবেলায় চুল কাটতে যাওয়ার সেই ভয়টা আজ এই বুড়ো বয়সেও ভূত হয়ে ঢোলগোবিন্দর ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। নাপিত দেখলে সাধে সে ডরায়?''(ঐ, পৃ: ১৬১) সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় শৈশবের শিক্ষাজীবন থেকেই একাধিক প্রতিষ্ঠিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁদের সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। কৈশোরে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ভারতবিখ্যাত পান্নালাল ঘোষ

মহাশয়কে —"গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কেষ্টঠাকুরের মতো কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। বাঁশির কী মিষ্টি আওয়াজ। হঠাৎ আমার মনে হল যেন ভূত দেখছি। আরে, আমাদের কালোকোলো বক্সিংয়ের টীচার! তিনি কিনা বাঁশি বাজাচ্ছেন! দেখে সেদিন কি যে গর্ব হয়েছিল বলার নয়।

তবে বুক দশ হাত ফুলে গিয়েছিল আরও পরে। যখন জানলাম বোম্বাইয়ের ভারত বিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ হচ্ছেন আমাদেরই ইস্কুলের সেই এককালে তিরিশ টাকা মাইনের বক্সিং টীচার পান্নাবাবু।" (ঐ, পৃ: ১৫) এছাড়া তিনি বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন কবি কালিদাস রায়, কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে। বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, নির্মল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাত ব্যক্তিত্ব।তাঁর জীবনযুদ্ধের নান্দীপাঠ ছেলেবেলাতেই। সেদিনের খেলারছলেই রপ্ত করা যুদ্ধকে তাঁর সৃজনীশক্তি, ব্যক্তিজীবন ও সংগ্রামীমানস নির্মাণের ভিত্তিভূমি হিসেবে আমরা দেখি —" এখনও মনে আছে, বাপরে বাপ! কী যুদ্ধ! বাখারিতে বাখারিতে ঠকাস-ঠক, ঠকাস-ঠক।

লড়তে লড়তে পা ফসকে উঁচু থেকে নিচু পাড়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে আমাকে যা পেটান পিটিয়েছিল বলার নয়। যখন উঠতে যাচ্ছি একজন ধমকে বলল — ওসব চলবে না, তুমি মরে গেছ। আমি মরে গেলাম। কিন্তু জীবনে দুটো বিষয়ে আমার সেদিন শিক্ষা হল।

প্রথমত, আমি মরলেও আমাদের দল কিন্তু জিততে পারে । লড়াই থেমে যাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে যুদ্ধে আমাদের পল্টনেরই জয় হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জীবনে এই প্রথম দস্তুর মতো মালুম হল মার খেলে ভীষণ লাগে।" (ঐ, পৃ: ১২-১৩) ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন উপলব্ধি সঞ্চয় করেছিলেন —" আমি যখন মধ্য কলকাতা ছেড়ে এসে দক্ষিণ কলকাতার সত্যভামা ইস্কুলে সবে ভরতি হয়েছি । টালিগঞ্জ থানার পাশের গলিতে থাকতাম । আমাদের ছেলেবেলার সময়টা বোধহয় বিপ্লবীদের প্রেরণায় শরীর চর্চার দিকে খুব ঝোঁক। নওগাঁয় কালিবাড়িতে শেখানো হত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। আমিও কিছুদিন শিখেছি।" (ঐ, পৃ: ১৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেলেবেলায় যে টুলো পন্ডিতের সান্নিধ্যে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিলেন সেই পন্ডিতও ছিলেন একজন স্বদেশী ও সংগ্রামী মানুষ —"আসছেন না দেখে দিন কয়েক পরে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, শেষ রাত্রে একগাড়ি পুলিশ এসে তাঁকে হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। চালান দিয়েছে

সোজা জেলা সদরে। পন্ডিত সেজে ছিল। আসলে সাংঘাতিক লোক। গা-ঢাকা-দেওয়া স্বদেশি। ঘরে খানাতল্লাস করে একটা পিস্তলও নাকি পাওয়া গেছে।'' (ঐ, পৃ: ১৪)

তিনি আশৈশব পরিবারে দেখেছিলেন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল—''দাদা গান গায়। ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে। মেডেল পায়, প্রাইজ পায়। আমিও পাই গান গেয়ে, আবৃত্তি করে।''(ঐ, পৃ: ৭৭) ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গানের গলা ভালোছিল। খুবই ছোট থেকে তিনি ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। তবে অসুস্থতার কারণে শরীর তাঁর জীবনের লড়াইটাকে আরো কঠিন করে দিয়েছিল —''বছর বারো বয়সে আমি একবার যাই-যাই হয়েছিলাম। টাইফয়েডে। সেই এক ধাক্কায় তিনটে জিনিস আমি হারাই। গানের গলা। চোখের নজর। আর স্মৃতিশক্তি। একটা দাঁত নেই। একটা কান গেছে। সেসব তো অনেক পরে।''(ঐ, পৃ: ৮)

জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি তাঁর রচিত সাহিত্য জগতের এক‌েকটি উপাদান হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাহিত্য সৃজনের ও সংস্কৃতিমনের প্রকৃতি নির্মিত হয়েছিল শৈশবেই। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সততা, সত্যনিষ্ঠা ও মূল্যবোধ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি তাঁর পিতামহের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনেছিলেন। কাকিমার মুখে তিনি শুনেছিলেন কপালকুন্ডলা, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি গ্রন্থ।

তাঁর জীবনে নওগাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। এরপর তিন-চার বছর বয়সে তাঁরা কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের নওগাঁতে চলে গিয়েছিলেন—''নিতান্ত শৈশবকাল টুকু উত্তর কোলকাতায় কাটিয়ে পিতার কর্মস্থল রাজশাহী জেলার নওগাঁতে চলে যান তাঁরা যখন সুভাষের বয়স তিন কি চার বছর। নওগাঁতেই কাটে তাঁর দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত সময়। . . . যদিও খুব প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভূমি ও ভাষা নির্মাণে এই নওগাঁর একটা স্থান আছে।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞা-বিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃ: ১২৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে নওগাঁ ও তার স্বভাব প্রকৃতিতে একাত্ম সম্মেলনীর কথা উল্লেখ করেছেন। ছেলেবেলার নওগাঁর সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধূলা করার সুবাদে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাঁর মনে আশৈশব জায়গা পায়নি। তাঁর বাবা ক্ষিতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। সন্তান সম্পত্তিদের প্রতি তেমন কোন শাসন ছিল না। ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেলেবেলায় নওগায় সর্বস্তরের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন —''মফস্বল শহরে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে সরকারী কোয়ার্টারে বাস করার ফলে

জাতের বালাইটা কখনই আমাদের মনে তেমন চেপে বসতে পারে নি। তা ছাড়া প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোতে আমাদের ছোটদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। ঈদ্ বকরীদ মিলাদশরীফে আমরাও উৎসবে মেতে উঠতাম।'' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ,১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ: ৬৯-৭০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে লীন হয়ে নওগাঁয় বেড়ে উঠেছিলেন। সেখানকার জীবনের গ্রাম্য প্রকৃতি , খোলামাঠ, ধূ-ধূ খেত, গ্রাম্য খেলাধুলার সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল —'' গোরুর গাড়ির ছইতে থেকে-থেকেই মাথা ঠুকে যাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে ঢোলগোবিন্দর মন ভালো নেই। নইলে নলগাড়ির রাস্তা দিয়ে বৈঁচিফল খেতে খেতে দাদার সঙ্গে হেঁটে যেত। বাঁদিকে পড়ত জয়নালের বান। ডানদিকে আদিগন্ত আখক্ষেত। তারপর ঠেলে উঠত রামনগরের রাস্তায় ।'' (ঐ, পৃ: ১৫১) তাঁদের নওগাঁর বাড়ির ইঁদারার পাশে ঝোঁপগুলিতে আকাশের ঝিকমিকে তারার মতো জোনাকি পোকার দল তাঁর উপলব্ধিতে অসাধারণ সৌন্দর্য রূপে ধরা দিয়েছিল। বনজঙ্গল থেকে কাঁচপোকা ধরে নিয়ে এসে সে তাঁর দিদিকে পড়াতো। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নওগাঁর বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে আন্তরিকটানে মেলামেশা করেছিলেন। সেখানকার মাঝি, কামার, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বেড়ে উঠছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ভোর হতে না হতেই মাঝি পাড়ায় ছুটে যেতেন। সেখানে কামারেরা গরম লোহা ধরে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যে স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুড়ি পড়ত; তা তাঁর মানসচৈতন্যকে আলোড়িত করত। ছেলেবেলায় কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতিতে আত্মস্থ হয়ে জগৎকে আপন করে নেবার অভ্যাস আয়ত্ব করেছিলেন —''বাঁ হাতের চেটোয় রাখা ঘুঁটের ছাই বা খড়ির গুঁড়োয়, হাটু-বার-করা লাল টেঁটি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের কাপে চায়ের ধোঁয়ায়, ময়রার দোকানে ফুটন্ত রসে ভাজা জিলিপির গন্ধে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উ: আ: শব্দে, ঢোলগোবিন্দ-র মনে আছে, সেকালে নেবুতলায় ভারি সুন্দর সকাল হত।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত রাস্তায় রোদের খেলা। ঘোড়ার গাড়িগুলো যেত পায়ে-টেপা-ঘন্টায় ঘুঙুরের বোলতুলে। কচিকাঁচা রোদগুলো, ভয় হত, এইবুঝি গাড়ির তলায় পড়ে থেঁতলে যায়! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত যখন দেখতাম ডানপিটে ছেলেদের মতো সেই রোদগুলো টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে গাড়ির চালের ওপর টকাস করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানি বেয়ে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতেগিয়ে টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। অথচ রোদের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগত না।'' (ঐ, পৃ: ৩১)

ব্যক্তিজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিতান্ত ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ মনের অধিকারী ছিলেন। পড়াশুনার প্রাথমিক স্তরে ভালো-মন্দ, ধনী-গরীর উঁচু-নিচু সব শ্রেণীর সাথীদের সঙ্গে তাঁর সমান মেলেমেশা ছিল। সেসময় খেলার সাথীদের সঙ্গে তিনি খেলতে খুবই ভালো বাসতেন। আটবছর বয়সে তাঁকে মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেই দিনগুলিতে বাবার হাতে মাখা দুধভাত তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তিনি তখন খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে 'এবরো - খেবড়ো' রাস্তায় পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতেন। তাঁর মাইনর স্কুলের কথায় তিনি লিখেছেন —''দাদা-দিদির দেখাদেখি সকালে ঢোলগোবিন্দও ওর বই নিয়ে বসে। ..... একটু একটু করে এলেম বাড়ে। ফার্স্ট হয়। জয়দেব সেকেন্ড। কাশীরাম থার্ড। জয়দেব হেঁটে আসত অনেক দূরের এক গ্রাম থেকে। দুপুরে তখন টিফিন খাওয়ার তেমন রেওয়াজ ছিল বলে মনে পড়ে না। ছুটির সময় দেখতাম ওর মুখ শুখিয়ে আমসি হয়ে যেত। ওকে দেখে আমার খুব কষ্ট হোত। জয়দেব ছিল জাতে কামার। কাশীরামের বাবা ছিলেন আমাদের বাসার পেছনের সরকারি বাগানের মালি। ওরা দুজনেই ছিল আমার খুব বন্ধু। আরও একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। গাঁয়ের এক মুসলমান খেতালের ছেলে। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। লাস্ট বেঞ্চিতে বসত। বই কখন ছুঁত বলে মনে হয় না। সবাই ওকে দুর-ছাই করত। আমি মাঝে মাঝে ওর পাশে গিয়ে বসতাম।'' (ঐ, পৃ: ৭৫-৭৬)

আশৈশব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। পারিবারিক পরিবেশের গুণেই সবার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রকৃতি তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল।নওগাঁয় গ্রাম্য পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেশার স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন—''আমাদের পাড়ায় তখন নবাগত অনেকেই। যেমন সান্টারা। মেসবাড়িতে সুশীল গুপ্ত। সুশীলদার বউ বি.এ. পাস। বিয়ের আগে ছিলেন মাস্টারনি। নি:সন্তান বলে বৌদির কাছে আমাদের আদরের শেষ ছিল না। পুকুরের পুবে যে দোতলা কুঠিতে মবিনুদ্দিনসাহেব থাকতেন, সেখানে এসেছেন রঞ্জিত চৌধুরী। ওঁর মেয়ে করুণা তখন এইটুকু। ওর কী একটা বড় অসুখে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন। সেই থেকে ওঁরা হয়ে গেছেন আমাদের আত্মীয়ের মতো।

মফস্বল জীবনে এইরকম হয়। আলাপ থেকে আত্মীয়তা জন্মাতে দেরি হয় না।'' (ঐ পৃ: ১৬৭) সেই সময়ে সুশীল গুপ্তের স্ত্রীকে তিনি বৌদি হিসেবে কাছাকাছি পেয়েছিলেন। তাঁর সেই বৌদি ছিলেন ঢাকার মেয়ে। তিনি ছিলেন 'প্রবাসী'-র অত্যন্ত আগ্রহী পাঠিকা। পরবর্তী কালে তাঁর এই বৌদিই তাঁকে প্রথম লেখালেখির কথা বলেছিলেন। এরকম বহু মানুষের সান্নিধ্যে তাঁর এই নওগাঁতেই

বহু মানুষের মঙ্গলসাধনে কাজ করার ও তাঁদের প্রতিনিধত্বমূলক সাহিত্য রচনার মানস চেতনা নির্মিত হয়েছিল।

নওগাঁ জীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছিলেন কবি সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের বাবা ও তাঁর পরিবারকে —''হুমায়ুন কবিরের বাবা তখন নওগাঁয়। আমার জ্ঞান হওয়ার বয়সটা নওগাঁতেই কেটেছে। যতদুর মনে পড়ে, উনি খুব একটা ভয় পাওয়ার মতো লোক ছিলেন না।'' (ঐ পৃ: ৯) হুমায়ুন কবিরকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দাদা বলে ডাকতেন। ছেলেবেলায় কবি সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে নওগাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন — ''ফুটবলের পোশাক পড়ে একদল ছোকরা ঘাটের পৈঁঠে ছেড়ে হুড়মুড় করে পালাচ্ছে। ঘাটের সিঁড়ির ওপর ছাড়া বেশ খানিকটা ধোঁয়া। পালাবার সেই দঙ্গলে দেখি হুমায়ুনদা। ধোঁয়াটা যে সিগারেটের তা তখনই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু হুমায়ুনদা তখন আর ইস্কুলের ছাত্র নন। ভালো ছাত্র হিসেবে সারা বাংলায় তখন তাঁর নাম। হেডমাস্টার মশাইয়ের ভয়ে তাঁকেও ছুটে পালাতে দেখে আমার সেদিন কী যে মজা লেগেছিল বলার নয় ।'' (ঐ, পৃ: ১১)

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের স্বাভিমানের সংকীর্তনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। এই মুক্তজীবনের মহৎ দার্শনিক চেতণায় সৃষ্ট সাহিত্য পরবর্তীকালে তাঁর সৃজনীধারায় পাই আমরা। কৈশোরের বড় মনের সেই বন্ধুদের স্মৃতিকথায় তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন — ''শাজাহানদা ছিলেন কম-কথার মানুষ। পেছনদিকে একতলায় একপাশে ছিল তাঁর ঘর। জাহাঙ্গীরদা দিতেন ছোটদের পড়বার মতো বাংলা বই। ফিরোজ ছিল আমার ছেলেবেলার হলায়-গলায় বন্ধু।'' (ঐ পৃ:-১০)

আমরা দেখতে পাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের একটি মৌলধর্ম — মানুষের মধ্যে জনজাগরণী সুরের দ্বারা তাঁদের ও দেশের মঙ্গল সাধন করা । নিজেকে দেশ ও মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা এবং সার্বিক অত্যাচার, বঞ্চনা, বৈষম্য ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ছিল তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য। তাঁর জীবনের এই মহৎ আদর্শের ভিত নির্মিত হয়েছিল ছেলেবেলাতেই, খেলার ছলে —''সন্ধে হলেই লণ্ঠন হাতে লোক পাঠিয়ে হুমায়ুন দার মা আমাকে আর দাদাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। আর থাকত ফিরোজ। আমাদের নিয়ে বসত ওঁর গল্পের আসর। ..... অবশ্য আমাদের হিরো বলতে ছিলেন আকবরদা। আকবরদার ছিল দুটো গুণ। ছোটদের খুব কাছে টানতে পারতেন। আস্তে আস্তে তাঁর আওতায় আমাদের বড় একটা দল দাঁড়িয়ে গেল। না ধমকে, দাদাগিরি না ফলিয়ে মিষ্টি কথায় ছোটদের হাতে রাখার অদ্ভুদ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আকবর দা আমদের সেনাপতি। যা বলতেন তাই আমরা শুনতাম। তাঁর অধীনে আমাদের নিয়মানুবর্তিতাটা ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। .... গোড়ায় শুরু হয়

খেলাধুলো দিয়ে। তারপর ড্রিল। এরপর রুটমার্চ। কুচকাওয়াজ। কী নয়। এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের পলটন।'' (ঐ, পৃ: ১১)

ছেলেবেলায় তাঁর মফস্বলের প্রিয় খেলা ছিল ডাংগুলি, গাদি, চু-কিৎকিৎ, মারবেল, লাট্টু আর পলটনের সোলজার সোলজার খেলা। তাঁরা নিজেদেরকে এক একটি সোলজার ভেবে হাতে একটি করে বাখারি অর্থাৎ বাঁশের ফালি দিয়ে ঠকাস-ঠক, ঠকাস-ঠক শব্দে যুদ্ধের খেলা খেলতেন ছেলেবেলায়। এই খেলার ছলে রপ্ত করা যুদ্ধই তাঁর জীবনযুদ্ধের মজবুত হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তী জীবনে। ছেলেবেলা থেকেই ব্যক্তিজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেটাই প্রতক্ষ্য করেছিলেন সেটাকেই গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তার আত্মজীবনীতে ধরা পড়েছে ছেলেবেলায় দেখা হাপুগান —''এই নেবুতলার গলিতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাপু-গান। খালি গাঁ। হাতে একটা চাবুক। দু-কলি গান গাইছে আর তারপরই নিজের কালশিটে-পড়া পিঠে চাবুক মারতে মারতে মুখে আওয়াজ তুলছে : হা-পু ! হা-পু !'' (ঐ, পৃ: ৩৭)

তাঁর মেজকাকা ছিলেন প্রভাষ মুখোপাধ্যায়, যার ডাকনাম ছিল হারু। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। তিনিই বিদ্যলয়ে নাম লেখানোর সময় কিছুটা নিজের নাম এবং কিছুটা স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ বোসের নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নাম লিখিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছেলেবেলায় বন্ধুবৎসলের গুণটিকে অনুকরণ করেছিলেন সেই কাকার স্বভাব প্রকৃতি থেকে —''প্রথম জীবনে জামসেদপুরের টাটা কারখানায় মেজোকাকা পেয়েছিলেন অ্যাপ্রেনটিস হওয়ার, যাকে ইংরেজিতে বলে সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু বাড়ির জন্যে হুতুশে হয়ে সে কাজ তিনি ছেড়ে দেন। ওঁর সে সময়কার সতীর্থরা সবাই পরে টাটার বড় চাকুরে হয়ে গাড়িবাড়ি এবং সেই সঙ্গে প্রচুর টাকা করেছেন। কিন্তু তা নিয়ে পরে মেজোকাকাকে কখনও আক্ষেপ করতে শুনি নি।

নওগাঁয় ফিরে এসে মেজোকাকা তার বদলে দিলেন এক ষ্টেশনারি দোকান। এর পেছনে উৎসাহ যোগান মেজোকাকার আজীবন প্রাণের বন্ধু নারানকাকা। নেবুতলা লেনের কাছেই রমানাথ কবিরাজ লেনে ছিল নারানকাকাদের মস্ত পৈতৃক বাড়ি। ওঁরা ছিলেন সোনার বেনে। এ রকম নি:স্বার্থ বন্ধু-বৎসল মাটির মানুষ জীবনে আমি কম দেখেছি।'' (ঐ, পৃ: ৫৮-৫৯)

তাঁর সেজমাসিমার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ছেলেবেলায় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জমিদারী উঠে গিয়ে তার সেজমাসিমা বিধবা হয়েও ছেলেমেয়েকে নিয়ে অতীব কষ্টে দিনযাপন করেছিলেন। অসম্ভব দু:খ লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁর সেজমাসিমা পদ্য লেখা ছাড়েননি এবং সেগুলির কিছু কিছু 'বিষাণ' পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাদা-দিদিদের গৃহশিক্ষকের কন্যা, তাঁর মরুনীদি ছিল দেখতে ভারী মিষ্টি। তাদের গোটা সংসারটাই তাঁর মরানীদি মাথায় করে রাখতেন। কল থেকে জল টেনে আনা, বাসন ধোওয়া, রান্নাকরা, কাপড়কাঁচা ইত্যাদি সব কিছু। মরুনীদির বিয়ে বলতে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। কেননা তাঁর স্বামী ছিলেন অত্যন্ত খারাপ মানুষ ও নেশাখোর। তাঁর মরানীদিকে বাপের বাড়ি রেখে তিনি পালিয়েছিলেন। সেই ঘটনা উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —"মরুনীদির জন্য আমদের যে কী কষ্ট হত বলার নয়। কেবলি মনে হত ওর অখদ্যে স্বামীটাকে একবার হাতের মধ্যে পেলে হয়।" (ঐ, পৃ: ৭৫)

পড়াশুনা ও সাহিত্যচর্চা ছেলেবেলা থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরিবার থেকে আয়ত্ব করতে শিখেছিলেন। বাংলা সহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেবেলায় অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তার মেজো কাকিমা — যোগমায়াদেবী। তাঁর কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন- —" কাকিমার তখন কী-ই বা বয়স। সম্পর্কে পুত্রবৎ হলেও আমরা কাকিমার কাছে খানিকটা ভাইবোনের মতো ছিলাম। কাকিমার খুব পড়ার শখ ছিল। আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন দেবী চৌধুরানী, কপাল কুন্ডলা।" (ঐ, পৃ: ৭৫) ছেলেবেলায় তিনি শুনেছিলেন ঠাকুর্দার মুখে 'দোঁহাবলী', তাঁর মায়ের কাছে 'গীতা' 'রামায়ণ', 'ভাগবত', নরোত্তম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম' ইত্যাদি মূল্যবানগ্রন্থ। এগুলি তাঁর কচিমনে মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান করেছিল।

শৈশবে তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম, সাহিত্যভাবনা, সামাজিকবোধ ও সংস্কৃতিভাবনার উন্মেষ ঘটানোয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলন — বাল্যবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, তাঁর 'ঘটিকাকা' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক), অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী (স্কটিশচার্চ কলেজ, ইংরেজী বিভাগ), ইতিহাসের ডক্টরেট তাঁর যোগেন কাকাবাবু, রবীন্দ্র সাহিত্যের সুপন্ডিত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর নিখিল কাকাবাবু (অভিনেতা দিলীপ রায়ের পিতা), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, তাঁর গোপালদা (সাহিত্যিক গোপাল হালদার), শম্ভু সিং, পটল মহারাজ অর্থাৎ বাসুদেবানন্দ ('উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক), সুশীল গুপ্ত, রায় সাহেব (নওগার এস. ডি. ও.), তাঁর আলুদা (কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী) প্রমুখ। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পারিবারিক ও হৃদ্যতার সম্পর্ক। এঁদের বৈচিত্র্যেপূণচত্র্যাণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ।

সহিত্যে তাঁর ভাষা প্রয়োগের অসামান্যতার গভীরে নিহিত তাঁর শৈশবে ভাষায় বৈচিত্রময় পরিচয়। তাঁর গর্ভধারিণীর মুখ থেকে তিনি গ্রহন করেছেন নদীয়া কৃষ্ণনগরের সুমিষ্টভাষা। আবার বাবার কর্মসূত্রে নওগাঁয় বসবাসের সময় সেখানকার রাজবংশী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাও তাঁকে ভীষনভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সেই ভাষাকেও সাহিত্যে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন — ''নিন্দালু-রে, রে- নিন্দালু ! এইঠে আইসো । কোঠেকার অ্যালায় বড় নোকের ছোয়া হইসে, বায় রে বায়।'.....'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট, / মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট। / ওই খাটত চড়িয়া যাম বিন্দাবনের হাট। / বিন্দাবনের হাটতে নাউ ফলিসে। / নাউর উপর ঢোঁড়া সাপ ফপ্পেয়া উঠিসে।''(ঐ, পৃ: ১৮৩) এছাড়াও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার ভাষা প্রয়োগ, ভাব ও প্রবাদ ব্যবহারের শিল্পদক্ষতা ও এই নওগাঁ জীবনেই আয়ত্ব করেছিলেন তিনি।

তাঁর স্বভাব প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার আত্মজীবনীতেই রাশিগত বৈশিষ্ট্যের কথায় তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন —'' কুম্ভরাশির জাতক রুচিরোজগার করে নিজের মনের মতো কাজ করে। স্বাধীনতার পোকা মাথায় নড়ার দরুণ সে ফ্রী-লান্স বা ঠিকেয় লেখার কাজ নেয়। অন্যদিকে আদর্শের ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে বলে রাজনীতি, সমাজসেবা, লোকশিক্ষা — এসব দিকেও ঝোঁকে। অনেকে বিজ্ঞান, কারিগরি, ইলেকট্রনিক, ইনজিনিয়ারিং, উদ্ভাবনা — এসব লাইনেও যায়। কুম্ভরাশির জাতকদের সবচেয়ে বড় মুশকিল এই যে, এরা প্রচণ্ড রকমের পরমত-অসহিষ্ণু। এদের একটু সরে বসো বলার জো নেই।'' (ঐ, পৃ:- ৭)

এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত নওগাঁয় শৈশব কাটিয়ে আবার কৈশোরে কলকাতায় আবার ফিরে আসেন সপরিবারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেকালের কলকাতার কথায় তিনি বলেন — ''হোসপাইপে গলা ফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বান ডাকানোর শব্দ; বাঁশের-চোঙ-লাগানো চৌবাচ্চায় কলকণ্ঠে সকালের প্রথম জল আসার আওয়াজ; গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত-পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে-ঝির জোরে জোরে কড়া নাড়া; কলতলার এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসা কাকের গলা-চেরা কা-কা।'' (ঐ, পৃ: ২৯)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ আটবছর নওগাঁয় খোলামেলা ধূ-ধূ মাঠযুক্ত উন্মুক্ত প্রকৃতিতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানকার নগর জীবনের কদর্যতা কৈশোরে তাঁর মানস পটে ছবি নির্মাণ করে দেয় —'' রাস্তার কলে ভিস্তিওয়ালার ভিড়। ড্রেনের জলে গা ধোয় একদল। হেঁইও হো, হেঁইও হো! সুর টেনে টেনে রাস্তার সুরকির ওপর দুরমুশ চালায় কর্পোরেশনের কুলি। ঘামের গন্ধে, বন্‌বন্‌

শব্দে জমজমাট শহর কোলকাতা। চুন-বালি-ইঁটেরও একটা সৌন্দর্য আছে। সন্ধ্যাবেলা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ট্রামের তারে চক্মকির আগুন জ্বলে।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ , প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ: ৪৬)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই বহির্জাগতিক ছবিগুলি তাঁর পরবর্তী সাহিত্য জীবনের অন্তর্দৃষ্টিতে ভাষা, শৈলী, চিত্রকল্প ও শিল্পধর্মের বিভিন্ন উপাদান হয়ে ধরা দিয়েছে। সাহিত্যিকের এই শিল্পধর্মের ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলীর প্রভাব সম্পর্কে স্টিফেন স্পেন্ডার যথার্থই লিখেছেন —''The result of that excessive outwardness of `a spiritually barren external world' is the `excessive inwardness' of poets who prefer losing themselves within themselves to losing themseleves outside themselves in external reality." (The Creative Element, Stephen Spender, Hamish Hamilton, London, 1953, page 21) সুভাষ মুখোপাধ্যায় নওগাঁর সমস্ত পেশার নানা সম্প্রদায়ের নানা অবস্থানের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে খেলাধূলা-নাচগান-যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি নিয়ে একটি মুক্তজীবন কাটিয়েছিলেন দীর্ঘ আটবছর। সেখানেই তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। রাজশাহীর নওগাঁর মাইনর স্কুলে তাঁর শিক্ষার আরম্ভ। শুরু থেকেই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। ক্রমে পড়াশুনায় তাঁর অসম্ভব আগ্রহ বাড়তে থাকে।

সেই সঙ্গে চলতে থাকে লেখালেখি। নওগাঁয় সুশীল গুপ্তের বি.এ. পাশ স্ত্রী শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁকে লেখালেখির হাতেখড়ি দিয়েছিলেন শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় বৌদি। একদিন এক ছুটির সকালে সেই বৌদি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন —''আচ্ছা, আজ তোরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে পদ্য লিখে আনতো।'' সেদিনের সেই নির্দেশই ছিল সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন যাত্রার শুভ সূচনা। সেদিনের কথায় তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন —''শেষ অব্দি বউদির কথা রাখতে পরের পর কয়েকটা লাইন সাজিয়ে তাতে আকাশ বাতাস জল মাটি বৃষ্টি শিশির এই গোছের চক্ষুগোচর মোটা মোটা কথা লিখে দিলাম। কাগজটা উল্টে-পাল্টে বউদি বললেন — এর মধ্যে দেশপ্রেম কোথায় রে? তাছাড়া এ তো পদ্যও হয় নি। '' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ:- ১৭০)

নওগাঁর জীবন কাটিয়ে বাবার হাত ধরে ১৯৩০ সালে এগারো-বারো বছর বয়সে কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে তাঁর নওগাঁ জীবনের ফেলেআসা দিনগুলির জন্য তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে এসে প্রথম দিকে কিছুতেই কলকাতাকে

আপন করে নিতে পারছিলেন না কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতার অক্রুর লেনের এক গলির ভাড়াবাড়িতে সেদিন তাঁদের পরিবার উঠেছিল। সেদিনের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন —''এসে উঠলাম খাস মধ্য কলকাতার এক গলিতে। চারিদেকে গলা-বাড়ানো বাড়ি থাকায় আমাদের বাড়িটাতে রোদ পড়তে পেত না । রোদ-হাওয়া গায়ে ছোঁয়াতে হলে ছোট গলি ছেড়ে বড় গলিতে গিয়ে দাঁড়াতে হোত। যেখানে হাতে মাটি করবার মাটিটুকুও ফেরিওয়ালা ডেকে কিনতে হয় — আমি ভাবতাম, সে শহরে লোকে বাস করে কেন ?

এই ছাত্রজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দী রামদুলাল বসুর বাবার সঙ্গে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন। অগ্নিগর্ভ কলকাতায় বেড়ে উঠেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তাঁকে সেই কিশোর বয়সে প্রচন্ড গতিতে আকর্ষণ করেছিল। প্রত্যক্ষ জীবনে রাজনীতিতে নিজেকে আত্মস্থ করতে থাকেন তিনি। নিজেকে যুক্ত করেন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ।সেকালে যদিও সেভাবে সংগঠিত না হলেও বিছিন্নভাবে ক্রমশ: দানা বেঁধে উঠেছিল কিছু সংগঠন। তৎকালীন সময়ে এগুলির বেশিরভাগই ছিল অসংগঠিত ও উগ্রপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচালনাধীন। কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময় এই রকমই এক ছাত্র সংগঠন - 'বঙ্গীয় প্রদেশিক কিশোর ছাত্রদল'- এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সময় তাঁরা প্রচন্ড আবেগে পাড়ায় পাড়ায় ' বন্দেমাতরম্ ' ধ্বনিতে সামিল হয়ে ওঠেন। ছাত্র জীবনের সেই আন্দোলনের স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন —''বাড়িতে যখন কেউ থাকেনা, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উনুনের আঁচে বেআইনী বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়ীওয়ালা গেছে জেলে আমাদেরই জন্যে, সারা দেশের ভালর জন্যে। আর আমরা ঘরে বসে থাকব ? (আমার বাংলা / সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)

বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাঁর বুঝতে শেখার বয়স ক্রমশ পরিনতির দিকে এগিয়েছিল তাতে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হওয়াই সঙ্গত। এই পর্বে ১৯৩৫ সালে কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যভামা ইনস্টিটিউশন ছেড়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিশনে। এই বিদ্যালয়েই তাঁর ছাত্র জীবনের অন্যতম অধ্যায় সূচিত। এই বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ছাত্র জীবনে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়, 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক মুবলীধর বসু, সাহিত্যিক অতুল চন্দ্র গুপ্ত, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

অঙ্কের শিক্ষক কেশব নাগ, গানে তাঁর নীতীনবাবু, ফনীবাবু, কালো যতীনবাবু প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে। এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের অন্যতম প্রিয় সঙ্গী ছিলেন অমরশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক রমাকৃষ্ণ মৈত্রকে। এই মিত্র ইনষ্টিটিউশনে তাঁর সহপাঠীদের সুমধুর সখ্য তাঁর মধ্যে গঠিত করেছে — প্রেম, প্রীতি, মায়া ও মমতার দুর্ভেদ্য আবরণ। কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে পা রাখার মুহূর্তগুলিকে তিনি সাহিত্যে যুক্ত করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমান্তরাল বাংলাসাহিত্যের মধ্যগগনে অবস্থান করছিলেন — বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন, নজরুল ইস্লাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টা। সেই সময় একটু একটু করে সাহিত্যের ভান্ডার গড়তে প্রয়াসী ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ের মিত্র ইনষ্টিটিউশনে পাঠরত ছাত্রজীবনের সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন — হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রমানাথ রায়, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলোয়ার নির্মল চ্যাটার্জী, পরিমল সেনগুপ্ত, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, জগদীশ বসু, জগৎ দাস, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু সেনগুপ্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিশনে তিনি বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যাগাজিন 'মৈত্রী'- তে নিজের লেখা ছাপিয়ে কবিতায় হাতপাকা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেকালে পনেরো-কুড়ি লাইনের 'কথিকা' নামের আবেগপ্রবণ প্রচলিত পদ্য রচনায় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে থাকেন। মিত্রস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াকালে জমাখাতায় নিজেকে প্রকাশ করতে অসম-উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় 'উদ্বোধন' 'মুখবন্ধ' এবং 'স্মৃতি ও সঞ্চয়' ইত্যাদি কবিতা লিখে একটি কবিতার খাতা পূর্ণ করেছিলেন তিনি। সেই খাতাটির শুরুতেই 'স্মৃতি ও সঞ্চয়' শীর্ষক কবিতায় সেদিন আঠারো বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন — ''জীবন-জাহাজ মোর লবণাম্বু-সাগর সৈকতে / বার বার এসে লাগে। / বণিকের সে নয় বন্দর। মোর পথে / আফিমের বন যত জাগে। / আমার নেইকো কোন বাঁশী, /কোন আলো দীপ্র হয়ে ওঠেনি উদ্ভাসি; / সে তীরেই শুনি গান, /আর পাই আলোর ইঙ্গিত — /এ জাহাজে ভরে নিই নত চোখে সে মহান দান।'' (স্মৃতি ও সঞ্চয় / সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

যৌবনের সাহিত্যচর্চার নিদর্শনের ক্ষেত্রে এই পদ্যটিরও অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে। এই সময় 'বিষাণ' পত্রিকাতেও তার কবিতা ছাপা হয়েছিল। 'বিষাণে' প্রকাশিত সেদিনের তার 'রবিবাবুকে' শীর্ষক কবিতাটি সেদিন তাঁর জাত চিনিয়ে দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছিল। সেসময় তিনি 'কল্লোল', 'কালি ও কলম', 'প্রগতি', 'বিজলী' প্রভৃতি সাহিত্যি পত্রিকায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। মিত্র ইনষ্টিটিউশনের সেদিনের সেই দশম শ্রেণীর ছাত্র কলকাতার ভাবাণীপুর শাঁখারি পাড়া 'কল্যাণ সঙ্ঘ'

নামের গ্রন্থাগারের সাপ্তহিক ছুটির দিনের সাহিত্য-আসরে নিয়মিত একটু একটু করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছি। সেই সাহিত্যআসরে যোগদানকারীদের মধ্যে একটা সাহিত্য-চর্চার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেখানে স্বরচিত গল্প-কবিতা পাঠের পর তার হাড়, মাস ও মজ্জা নিয়ে তুমুল আলোচনা হত। কার রচনা সৃষ্টির কোন আলোকে উশকে দেয় কি না তার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন সহিত্য আসরের অনতি প্রবীন লেখকেরা। সুভাস মুখোপাধ্যায়ের যৌবনে 'কল্যান সঙ্ঘের' সাহিত্য চর্চার স্মৃতিচারণায় তাঁর বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র বলেছেণ —''বলা বাহুল্য, সুভাষের এই কবিতা লেখার বাতিকে আমদের সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক নিষ্ঠা এবং চর্চা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। 'কল্যাণ সঙ্ঘ'-র সাপ্তাহিক আসরটি ক্রমশ জমজমাট হতে শুরু করেছিল। বিশেষ বিশেষ আসরে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, বুদ্ধদেব বসু , নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে আনতাম। ...... সুভাষ আনত ক্রমশ ধারালো হয়ে ওঠা এক-একটা কবিতা। সুকঠিন অনুশীলনের পথে তাঁর কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ভাবমূর্তি বদলাতে লাগল। এই পথে সে তার পূর্বসরীদের প্রভাবও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। শব্দ ধ্বনি ও ছন্দ কুঁদে কুঁদে সে তার নিজস্ব কবিতা -প্রতিমা নির্মাণের কাজে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। 'সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' থেকে 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়'-এ উত্তরণ হয়েছিল।'' (দিগ্বিজয়ী পদাতিক, রমাকৃষ্ণ মৈত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, শঙ্খ ঘোষ, সৌবীন ভট্টাচার্য্য, অমীয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস সম্পাদনা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)

১৯৩৭ সালে ভবানীপুর মিত্র স্কুল থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস ও সংস্কৃতে লেটার নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে সাফল্য হয়েছিলেন। এরপর তিনি আই. এ. পড়তে যান আশুতোষ কলেজে। সেই কলেজে আরো নতুন সহপাঠী হিসেবে পেলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ভবভূতি রায় প্রমুখ ব্যক্তিকে। এইসময় তিনি বাংলা সহিত্যের প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকের রচনা সম্যকদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যেরও ডি.এইচ্. লরেন্স, জেমস্ জয়েস, অ্যাল্ডুস হাকসলি, জর্জ বার্নাড শ' প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সে সময় সাহচর্য ও সংস্পর্শ পেয়েছিলেন।

এই সময়ের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু শয়ীদ আইয়ুব, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্রের স্ত্রী তাঁর শান্তিদি, অমিয় চক্রবর্ত্তী, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশোভন সরকার, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের অনেকের সঙ্গে তাঁর

সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এই সময়। এঁদের অনেকের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে দিয়ে আলাপ চারিতার মধ্যে তাঁর নিজের সৃজনীপ্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে কবি বিষ্ণু দে-র বাড়িতে, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পুরোনো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে, পুরনো হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে, কবি অমীয় চক্রবর্তীর এল্‌গিন রোডের ফ্ল্যাট বাড়িতে এবং যদু বাজারের কাছাকাছি পদ্মপুকুর রোডের একটি কানাগলিতে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাসস্থানে যৌবনের কাল থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত যাতায়াত ও মেলামেশা করে নিজেকে সমৃদ্ধি করে তুলেছিলেন। সেই সময় যৌবনের প্রবল উদ্দীপনা, সাহিত্যসৃজনের প্রদণ্ডক্ষুধার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রাজনৈতিক ঝোঁকও।

আশুতোষ কলেজে ঢোকার সময় থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় যৌবনের প্রচন্ড উদ্দীপনায় মাকর্সবাদী ভাবধারা ও রাজনৈতিক মত ও পথে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশের স্মৃতিকথা ও ঐতিহাস-সত্যের সমর্থনে তাঁর ছত্রজীবনের সহপাঠি রমাকৃষ্ণ মৈত্র লিখেছেন — ‘‘আশুতোষ কলেজে ঢুকে খুব শিগ্‌গিরই আমরা মাকর্সবাদী ভাবধারা ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হই। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তখন বলশেভিক পার্টির প্রভাব বেশি ছিল। সে-সময়কার বিখ্যাত বলশেভিক ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ দুবে প্রায়ই কলেজে এসে তাঁর দলবলের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। সেসব আলোচনা-আসরে ক্রমশ আমাদেরও যাতায়াত শুরু হলো, এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমরা লেবার পার্টির (বলশেভিক পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন) ছাত্রকর্মী হয়ে গেলাম।

বিশ্বনাথ দুবে-র কাছে আমরা মাকর্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিন-এর মূল রচনার (অবশ্যই ইংরেজীতে) পাঠ নিতাম। হাজরা রোডের বাঁশতলার বস্তিতে দুবে-র খুপরিচালওলা ঘরে আমাদের গোপন ক্লাস হতো। দেবীপ্রসাদ, সুভাষ ও আমি এই ক্লাসের নিয়মিত পড়ুয়া ছিলাম। মাকর্সবাদী সাহিত্যের ভারতীয় প্রকাশনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করে বা খিদিরপুর ডকের সাম্যবাদী শ্রমিক বা নেতাদের সাহায্যে দু-চারকপি বই গোপনভাবে সংগ্রহ করা হতো এ ব্যাপারে দেবীপ্রসাদই ছিলেন অগ্রণী। তিনিই নানা সুত্র থেকে গ্রন্থগুলি জোগাড় করে আনতেন। বিশেষভাবে মনে আছে, বিলেতের লরেন্স উইসার্ট-এর প্রকাশিত ‘A Handbook of Marxism’ নামে মোটাসোটা একটি বই। পরে জেনেছিলাম, সমরবাবুই এই বইটি দেবী প্রসাদকে দিয়েছিলেন। এতে মাকর্স-এঙ্গেলস-এর মূল রচনাগুলির প্রায় সবই ছিল। দুবে-র এই স্টাডি ক্লাসেই ‘A Spectre is haunting Europe....’ বিখ্যাত এই লাইনটি দিয়ে শুরু The Communist Menifesto

পড়তে পড়তে আমাদের গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠত।'' (দ্বিগ্বিজয়ী পদাতিক, রমাকৃষ্ণ মৈত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩৭)

মাকর্সীয় চেতনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে এইসময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর যৌবনের প্রচন্ড আবেগে সাম্যবাদী সমাজচেতনা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। এইসময় তাঁর চেতনায় জেগে উঠেছিল খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি অটল ও দৃঢ় দ্বায়বদ্ধ বোধ। তিনি এইসময় কমিউনিষ্ট মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে খিদিরপুর ডকঅঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এইসময় একইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল পড়াশোনা, সাহিত্যচর্চা ও শ্রমিকসংগঠন। বজবজ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতী, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি খেটেখাওয়া সমাজকে জাগিয়ে তোলার ও তাঁদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গেনিয়ে দিনরাত একাকার করেছিলেন এই পর্বে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের শারদীয়া সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর 'চীন : ১৯৩৮' কবিতাটি প্রেরণ করেছিলেন। এই কবিতাটি সেদিন প্রকাশের ছাড়পত্র না পেলেও এরপর সেটি পাঠকরে, কবি অরুণ মিত্র সেদিনের সেই প্রগতিশীল মানসের তরুণকবিকে ও তাঁর নতুনধারার সৃষ্টিপ্রয়াসকে সাড়াদিয়ে তাঁকে চিঠিতে আলাপের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি অরুন মিত্র সেদিনের সেই ঘটনা সর্ম্পকে লিখেছেন —''সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবিতার সূত্রে। সে তখন অতি তরুণ। আনন্দবাজার পত্রিকার কোনো এক বিশেষ সংখ্যার জন্য সে একটা কবিতা পাঠিয়েছিল। যিনি সে-সময়ে রচনা নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁর সেটা পছন্দ হয়নি, ফলে তিনি তা বাতিল করেন। তবে আমাকে দেখতে দেন এবং আমি লেখাটা পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে আসি। সেই প্রথম লেখায় কবির নাম ছিল সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এরপর যে-মুহূর্তে রচনা নির্বাচনের দ্বায়িত্ব আমার ওপর বর্তাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে সুভাষকে ডেকে আনি এবং কবিতা দিতে বলি। তখন সে কবিতা দেয় এবং তা ছাপা হয়। কবিতাটা জাপানি ফ্যাসিস্টদের চীন আক্রমণ সম্বন্ধে :'জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝরি / জ্বলে হ্যাঙ্কাও'। তার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছন্দনিয়ন্ত্রণ এবং শব্দপ্রয়োগের নতুনত্ব, প্রথম থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এই কাব্যগুণের জন্যে এবং জনমুখী দৃষ্টির জন্যে তার কবিখ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।'' (সুভাষ , অরুণ মিত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ১)।

এরও আগে ১৯৩৭ সালে তাঁর 'সকালের প্রার্থনা' এবং 'রোমান্টিক' নামের দুটি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মনোনীত হওয়ায় তাঁর ডাকে সারাদিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখা করেছিলেন। বিখ্যাত কবি ও কবিতা পত্রিকার সম্পাদকের আমন্ত্রন তাঁর কাছে সেদিন অপ্রত্যাশিত চমক বলে মনে হয়েছিল। ''..... কবিতা সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি আমার প্রথম চমক। একটি পোস্ট কার্ডে দুটি কবিতা মনোনীত হওয়ার দু-ছত্র খবরের তলায় একটি রোমহর্ষক নামের স্বাক্ষর — বুদ্ধদেব বসু। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল সুবিধে মতো আমি যেন একদিন যাই।'' (ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, পৃষ্ঠা ৮০) এইসময় তরুণ কবিকে আগ্রহ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর 'মে-দিনের গান' কবিতাটির জন্য যুগান্তর-এর সম্পাদক প্রবোধকুমার সান্যাল (রবিবাসরীয়-এর সম্পাদক) আলাপ করেছিলেন। পূর্ব্বাশা, যুগান্তর, কবিতা, পরিচয় অরনী, অগ্রনী প্রভৃতি পত্রিকা গুলিতে তাঁর কবি প্রতিভা ভাস্বর হয়ে উঠতে থাকে সে সময়।

সে সময় সাহিত্য জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিতে দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গেঁ তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তৈরি হয় রাজনিতীর সঙ্গে। সে দিনের ছাত্র তরুন সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেবার পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩৯ সালে। এই বছরেই তিনি কলকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গেঁ বিখ্যাত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গেঁ তাঁর যোগাযোগ হয়। এই বছরেই তাঁর প্রভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেবার পার্টি ছেড়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনেই গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ দর্শন এবং সাহিত্যজীবনের সুদৃর ভিত্তি। কলেজে ছাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ সালে সর্বক্ষনের পার্টিকর্মী হয়ে ওঠেন। এই বছরেই তিনি বাংলা সাহিত্য জগৎকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে অসামান্য সারা জাগিয়ে পদাতিক গ্রন্থ নিয়ে তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটালেন।

'পদাতিক' গ্রন্থটি কবি বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহে এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বৃত্তির টাকায় 'কবিতা ভবন' থেকে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ টি কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে হাজির হয়েছিলেন। সেদিনের সেই সারাজাগানো কাব্যের কথায় সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার লিখেছেন — '' তিরিশ বছরেরও বেশি আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' যখন প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল তখন সঙ্গত কারণেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সাড়া পড়ার একটা কারণ ছিল ঐতিহাসিক, অন্য কারণ কারু-রীতি গত । এই প্রথম একজন কবি রাজনৈতিক দলের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নিয়ে, সেই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে, দলভুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায়

কবিতা লিখলেন।'' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অরুণা প্রকাশনী , প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১, পৃষ্ঠা ২৪৪) 'পদাতিক'-এ কবির যে জগৎ-বীক্ষা এবং আত্মবীক্ষণ রয়েছে, কবি এই গ্রন্থে যে একটি বিশেষ 'টোন' নিয়ে বাংলা কাব্যের ধারায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে নিহিত তার ব্যক্তিজীবন ও সমকাল — '' তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবী যখন দার্শনিক , নৈতিক এবং অস্তিত্বগত নানা সংকটে মধ্যে দিয়ে চলেছে, যখন বিশ্ব নামক বৃহৎ ব্যাপারটি তাঁর প্রাত্যাহিক প্রত্যক্ষতা নিয়ে এই কোলকাতাতেও হয়ে উঠেছে প্রতিদিন পরিদৃশ্যমান , প্রতিদিন অনুভব গম্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে তাঁর কবিত্বে গড়ে পিটে নিয়েছেন। '' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং , দ্বিতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা- ২২৬)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই 'পদাতিক' কাব্য গ্রন্থে নতুন সমাজ গড়েতোলার উত্তাল আহ্বান ও মানবিকতার প্রতি আত্মনিবেদনে বাংলা পাঠকের হৃদয় রসসিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই অনুভূতির মূলে নিহীত তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার বিপুল সঞ্চয়। তাঁর 'পদাতিক' গ্রন্থ রচনার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র ফেডারেশনের চল্লিশতম বর্ষমূর্তিতে মে মাসে (১৯৭৬) বলেছেন — যখন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়েছিলেন তার কিছু আগেই তাঁর প্রথম কবিতার বই বেড়িয়েছিল। সাহিত্যে কিছুটা খ্যাতি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশন তাঁদের সঙ্গে কখনই একজন খ্যাতনামা লেখক হিসেবে ব্যবহার করেনি। একজন সাধারন ছাত্রকর্মী হিসাবেই দেখত। তাঁদের অফিস ছিল ভবানীদত্ত লেনে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বড়দের টুকি-টাকি ফাইফরমাস পর্যন্ত খাটতেন। এই সবের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী অভিমান কাটাতে পেরেছিলেন। ছোট কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতেন। পোস্টার লেখা, পোস্টার সাঁটা, স্ট্রীট কর্ণার করা , চাঁদা তোলা - এ সবই করতেন। এই সবের মধ্যদিয়েই সাধারন মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন।

১৯৪০ সালে পদাতিক প্রকাশের সমকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়কালে তিনিও অবহিত হয়েছিলেন সে পার্টির সদস্য ও পার্টি কর্মীদের এবং তাদের মতামত। এই সময়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক সুমিত্রা চক্রবর্তী লিখেছেন — '' যে উৎসাহে ও বিশ্বাসে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্খাকে মনের কোণে স্থান না দিয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ও সাম্যবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪১-এর জুন মাসে জার্মানির সোভিয়েট দেশ আক্রমণে তা নতুন করে সংক্ষুব্ধ তরঙ্গাবর্ত সৃষ্টি করল। দ্রুত পরিকল্পিত হল নানাবিধ ফ্যাসিস্টবিরোধী কার্যক্রম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই কর্মস্রোতে।

১৯৪১-এর ১৯ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বাংলার লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনজ্ঞাপক এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ২১ জুলাই টাউন হলে উদযাপিত 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে জনসভায় সামিল ছিলেন তিনি। সেখানেই স্থাপিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশু আচার্য সম্পাদিত ইংরেজী প্রবন্ধ-সংকলন 'দ্য ল্যান্ড অভ্ সোভিয়েটস্' নামের গ্রন্থের শেষে চুয়াত্তর জনের স্বাক্ষর সংবলিত বিবৃতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও স্বাক্ষর পাওয়া যায় । '' (ঐ, ১৩২-১৩৩)

এরপর ১৯৪২ সালে, একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পটভূমি, ভারতের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি সময়। এই বছর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও উদ্যোগে সোমেনচন্দের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও তাঁর স্মৃতিতে 'প্রাচীর' নামে কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তাঁর সঙ্গে আর্থিকসহায়তা করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী এছাড়া মিহির বসু এবং অজয় দাসগুপ্ত। এই বছর ফ্যাসীবাদী হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমন করলে সারা দুনিয়া এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভারতে স্বদেশের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন জোড়দার হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদেস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। এই ১৯৪২ সালেই তিনি সোমেনচন্দের হত্যাকান্ডের পর অন্যতম আহ্বায়ক হিসাবে ২৮ শে মার্চ গড়ে তোলেন 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সংঘের সভাপতি ছিলেন অতুল চন্দ্র গুপ্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সময়কালে রচিত কবিতায় আমরা তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন পুঁজিবাদী, ফ্যাসীবাদী, কালোবাজারী ও ধনতন্ত্রবিরোধী শিল্পীমানসের পরিচয় পাই। এই সময়ে রচিত তাঁর 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' ভারতের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী প্রথম গণসঙ্গীত হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এই বছরই সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতে রচিত কবি বিষ্ণু দে-র কবিতা সংকলন 'বাইশে জুন'। এই বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে তিনি গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন 'একসূত্রে' নামের একটি কবিতা সংকলন। এই সময় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সঙ্গেঁ অবিরাম লিখেছিলেন 'পরিচয়', 'অরণি', 'জনযুদ্ধ', 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি পত্রিকায়।

এরপর ১৯৪৩ সালে তাঁর ব্যক্তি মানসকে বড় রকমের আঘাতে আলোড়িত করেছিল বাংলার তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষের সত্য তাঁর সাহিত্যসত্য হয়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের

হতাশ জীবনে প্রচন্ড আশাবাদিতা জাগানোর জন্য কিশোরকবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কবিতা সংকলনটিতে তিনি কবিতা লিখেছিলেন । এই সময়কালের তাঁর কবিতার শিল্পসার্থকতা কবি বুদ্ধদেব বসুর কথায় আমরা পাই — " নিছক কান দিয়ে শুনলে এ-সব কবিতা ভালো লাগবে ; এদের আগাগোড়াই — এমনকি জাপানি বোমাবর্ষণের বর্ণনাতেও — শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার — এমনকি বেপরোয়া ফুর্তির — সুর ; এ যেন বৃহৎ জনসভায়, বা 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা ব'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি ; যে-ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে , নষ্ট হয়নি তার সুমিতি। . . . সমসাময়িক অনেক কবির কাছেই তিনি পাঠ নিয়েছেন — বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে — কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারো অক্ষরের উপর মকশো-করা নয় ; এত অল্প বয়সে যে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়। " (কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ্ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৮৫)

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের মর্মাহত কবি তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনায় ব্যক্তিক অনুভূতি শিল্পে উন্নীত করেছিলেন। এইসময় পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-এ যোগদান করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-বন্দর-কারখানা-গ্রাম-শহর ঘুরে ঘুরে অসংখ্য রিপোর্টাজধর্মী নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই বছর ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাংলার হয়ে তিনি যোগদান করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত হয়ে পরার ফলে এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. তে দর্শন শাস্ত্রে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারেননি। এভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের গতানুগতিকতা বৃহৎ জীবনের দর্শনে উন্নীত হয়েছিল ।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যজীবনে এই সময় দুর্ভিক্ষ ও স্বদেশ চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে দেখি আমরা। তাঁর 'চিরকুট' ও কিছুকাল পূর্বে রচিত 'পদাতিক' কাব্যের কবিতায় দুর্ভিক্ষ ও দেশপ্রেমের মহৎ জীবনদর্শনের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পদাতিক কাব্যের আর্য এবং চিরকুট কাব্যের 'মুখবন্ধ', 'আহ্বান', 'চিরকুট', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাগত', 'বর্ষশেষ', 'ঘোষণা', 'স্বাক্ষর', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে দুর্ভিক্ষে আহত ও বিক্ষত কবিহৃদয়ের আত্মোপলব্ধিজাত শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাই আমরা। মন্বন্তরের পাশাপাশি স্বদেশচেতনা তাঁর চেতনায় এই সময় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর এই সময়ে রচিত 'চিরকুট' কাব্যের 'স্ফুলিঙ্গ', 'দীক্ষিতের গান', 'জবাব চাই', 'ফের আসবো', 'উনত্রেশ জুলাই', 'ঘোষণা', 'স্বাগত', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে

দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলবন্ধন থেকে মুক্ত করার দৃঢ়, সংকল্পবদ্ধ, উচ্চকিত ও আশাবাদী কবিকণ্ঠ পাই আমরা।

পৃথিবীর আসন্ন মহাবিশ্বযুদ্ধের মহাসংকটে দাঁড়িয়ে , ফ্যাসীবাদীদের আগ্রাসীনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং স্বদেশকে শাসনকারী বিদেশিরাজের টুঁটি চেপে ধরার শিল্পিত প্রয়াস 'কেন লিখি?' ১৯৪৪ সালে হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগনের জবানীতে রচিত নিবন্ধ সংকলণের সম্পাদনা করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এতে ৮০জন সাহিত্য অনুরাগীর সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রে নিহিত সমকালের সমাজ প্রেক্ষিত 'কেন লিখি?' সংকলণের মুখবন্ধে সমকালের ব্যক্তিমানস ও সাহিত্য রচনার দার্শনিক চেতনা আমরা পাই। সেখানে হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যৌথভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বীকৃতি জানান যে সাহিত্যিকের শিল্প-নির্মাণের তাগিদ আসে সমাজ থেকে। এবং এই শিল্পের রূপ যেমন সামাজিক পরিবেশের ছাঁচে ফুটে ওঠে তেমনি এই দুই যুগে যুগে সমধর্মে পরিবর্তন হয় । এই নিবন্ধে তাঁর সমকালের সাহিত্যধর্ম, রাজনীতির আদর্শ ও সমাজভাবনার নিদর্শন পাই আমরা — " আজকের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিকেরা তাঁদের সামাজিক পরিবেশ সমন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়তো নন কিন্তু এই পরিবেশ তাঁদের সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত করছে অনিবার্য শক্তিতে। এই শক্তি যাতে প্রগতির শক্তি হয়, যাতে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রশস্ততর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে এই শক্তি সাহায্য করে, তার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার দায়িত্ব সাহিত্যিককেও নিতে হবে, সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে একযোগে, মজুর, চাষি, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক সকলের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত হয়ে।

এর উত্তরে হয়তো অনেক সাহিত্যিকই বলবেন আমরা তো এই ভাবে যুক্ত আছি। গরিবের দু:খে আমরা কাঁদি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করি, সুবিধা পেলেই প্রচার কবি যে আমাদের আদর্শ স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংঘ থেকে আমরা এই জবাব নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনব কিন্তু তবু বলব, আমরা শুধু এতে সন্তুষ্ট নই। আজ পৃথিবীর ইতিহাসে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা অভাবিতপূর্ব। তাই এর প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হতে হলে মামুলি আদর্শের ছাঁচ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে আমাদের সমগ্র চিন্তাকে চালাতে হবে। পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থার বদলে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবার উপক্রম হয়েছে তাঁর চাবিকাঠি তাদের হাতে যারা নিজেদের শারীরিক শ্রম একদিন নিয়োজিত করেছে শুধু পরের দাসত্বে। আজ পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম এদেরই মুক্তি সংগ্রাম। যারা এদের শত্রু তারা আমাদের সকলের শত্রু তাদের বিনাশের জন্যে স্বদেশে ও বিদেশে আমাদের সকলকে এক হতে হবে।" ('কেন লিখি ?' সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম মিত্র ও ঘোষ

সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা 'মুখবন্ধ' অংশ) এই সময়ের কবি হিসেবে তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছিল সমকালের সমাজপ্রেক্ষিত। সে প্রসঙ্গে ড: জয়গোপাল মন্ডল লিখেছেন —'' পরিবর্তিত সময়ের ছবি কবি সুভাষের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। একদিকে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, অন্যদিকে শোষিতদের হুঙ্কার। কবি শোষিতদের পক্ষে। একই সঙ্গে বেজে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ফলে সামগ্রিকভাবে সুন্দর পৃথিবী আবার ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি। এই সময়ের ভারতবর্ষ উঠে এল কবি সুভাষের কবিতায়।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘর ও বাহির, ড: জয়গোপাল মন্ডল, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১১২)।

এরপর দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের সময়ে বাংলা ও ভারতে তখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি।১৯৪৬ সালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে কাজে যোগদান করেছিলেন। এই সময়ের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিরোধ, আন্দোলন ও মুক্তিকামী মানস তাঁর কাব্যে শিল্পরূপ পেয়েছিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ১৯৪৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী ও ১৭ই জানু: অমলেন্দু সেনগুপ্তের কথায় মাহবুবুল লিখেছেন —''১৯৪৬ সালের শুরু থেকেই বাংলায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিক্ষোভের জোয়ার জেগেছিল। তার সঙ্গে এক স্রোতে মিলেছিল শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। সে সময়ে শ্রমিক আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল শিল্পাঞ্চল থেকে শিল্পাঞ্চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছয় বছরের জমে থাকা বিক্ষোভ যেন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ফেটে পড়তে থাকে। শ্রমিক বিক্ষোভ বানচাল করতে ব্রিটিশরাজ বেছে নেয় দমননীতির পথ। গোয়ালিয়রের বিড়লা মিলে এবং কলকাতার ব্রেথওয়েট কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-জনতার ওপর চলে অবিশ্রান্ত গুলি। এর প্রতিবাদে খিদিরপুরে ধর্মঘটে সামিল হয় হাজার হাজার শ্রমিক।'' (তিনজন আধুনিক কবি — মাহবুবুল হক, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কল — ৬, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২১৪)

তাঁর ব্যক্তিমানসে বাংলার বিক্ষোভ ও ঔপনিবেশিক শক্তি প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'চিরকুট'কাব্যের 'দীক্ষিতের গান', 'জবাব চাই', 'ফের আসবো', 'উনত্রিশ জুলাই', 'ঘোষণা' প্রভৃতি কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। সমকালের জাতীয় মানস ও ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছিল — ''রক্তের ধার রক্তে শুধব/ কসম ভাই!/ ব্রেথওয়েটের , গোয়ালিয়রের/ জবাব চাই।/ লাখো লাখো হাত এক হলে বলো/ পরোয়া কাকে?/ আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে/ লাল ঝান্ডাকে?'' (জবাব চাই / চিরকুট)

এরপরের বছর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে এল বহু প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ — ভারতের স্বাধীনতা লাভ। এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ চরম রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেসের ব্যবসায়ী ধনীক ও পুঁজিবাদী তোষণনীতির সঙ্গে কমিউনিস্টের ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত গতিপ্রকৃতি। সেই বিষয়টি বিদগ্ধ সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর কথায় উঠে এসেছে—'' স্বাধীন দেশের ব্যবসায়ী-তোষক স্বরাষ্ট্র নীতিরও তাঁরা তখন সর্বৈব বিরোধী। দেশের রিক্ত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে তাঁরা ছিলেন অটল। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি যথারীতি তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ধর্মঘট, মিছিল—কোনোটাই বন্ধ হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝেই দেখা দিচ্ছিল এখানে ওখানে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার সমর্থক, আর জাতীয় সরকারের চেষ্টা ছিল সেই আন্দোলনগুলির দমন। এই ভাবে কিছুকাল চলবার পরই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল ১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ। (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃ: ১৪১) কমিউনিস্ট পার্টির অসংখ্য কর্মী-সমর্থককে সেকালের কংগ্রেস সরকার কারারুদ্ধ করে রাখে। পার্টিকর্মী, বিভিন্ন গণসংগঠন ও পত্র-পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সেকালে অনেকেই আত্মগোপন করে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেকালে বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস। আবার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সাধারণ মানুষ, ভিন্ন মতাদর্শের পার্টিকর্মী, বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 'অগ্নিকোণ' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় যুক্ত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবন অভিজ্ঞতায় লব্ধ সমাজসত্য, সমাজ মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতি তাঁর চিরকুট ও অগ্নিকোণ কাব্যের কবিতায় বিষয় করে তুলেছিলেন।

এই পর্বে কেবল কাব্য কবিতাই নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর আগে 'জনযুদ্ধ' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে গদ্যরচনায় সমাজ সত্যের ছবি নিয়ে গদ্যশিল্পে ক্রমশ: পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে 'গণনাট্য সংঘ'-এ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাট্যসাহিত্যেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁর লেখনীতে। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুলাই তিনি 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম গদ্যরচনা — ''জাপানকে রোখা চাই। চীন ভারত ভাই-ভাই।'' এই পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই বাংলার মানুষকে জ্ঞাত করেছিলেন —''বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন'' শীর্ষক গদ্য রচনায়। এর পরের বছর 'জনযুদ্ধে' লিখেছিলেন তাঁর গদ্যরচনা—''বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া,

জমি ও জাত ব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নিঃস্ব।'' (১৯৪৪ সালের ১৪ই জুন) এই পত্রিকায় এই বছরের ৮ই নভেম্বর তিনি প্রকাশ করেছিলেন —''বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা'' এবং ''কলের কলকাতা'' শীর্ষক গদ্য রচনা। এই গদ্যরচনাগুলির শীর্ষনামেই আমরা তাঁর গদ্যরচনার উদ্দেশ্যমুলকতা উপলব্ধি করতে পারি। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন —''আমি বলেছিলাম কাগজ কীভাবে আমাকে গ্রামশহরের সাধারণ মানুষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে শুধু যে নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম তাই নয় — বাংলা ভাষার প্রাণপুরুষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম।

পার্টির কাগজে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে। সবচেয়ে বড় সুবিধে, সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে বাইরের মানুষ বলে মনে হয় না। তারাও বিশ্বাস করে নিজেদের মনের কথা খুলে বলে।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৫৪৪) সংবাদ পত্রে কাজ করার সুবাদে তিনি অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। আবার কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাংলার মানুষের বন্যা-খরা-মহামারি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন —''সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায়।

যেতে হবে আরও মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে হানার মুখে। মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক। তিনগুণ চারগুণ ভাড়া। পকেটে আমাদের যা রেস্ত—তাতে শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না।''(দীপঙ্করের দেশে, আমার বাংলা, ঈগল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ২৩) আবার তিনি লিখেছেন —''..........পুরু চার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা—ঙো' গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫)

চল্লিশের দশক ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই সময়ের বাংলার সমাজ ও ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অভিঘাত প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মন ক্রমশঃ ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে যায়। তাঁর সাহিত্য জীবনের বিষয়-ভাব-প্রকৃতি-প্রত্যয়-চিত্রকল্প-ভঙ্গিমা ও মানবিকচেতনা জীবনদর্শনের সামগ্রিক ইমেজ নির্মানে উন্নীত হতে থাকে সেই সময়। সেই সময় রচিত হয়েছিল তাঁর 'চিরকুট' কাব্যের কবিতাগুলি।

দ্বিতীয়বার কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হবার সময়ই ১৯৪৮ সালে তাঁর 'অগ্নিকোণ' কাব্যটি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ২০ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আগে রচিত হয়েও প্রকাশের সময় হিসেবে তাঁর তৃতীয় কাব্য 'চিরকুট' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬ থেকে। ১৯৪৮-সালের মার্চ মাসে ভারতের কংগ্রেস সরকার পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে,সেই পার্টির নেতাদের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জেলে বন্দী হয়েছিলেন। সেই বছরের জুন মাসেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আবার এই বছরেরই নভেম্বর মাসে আবার তাঁকে বিনা-বিচারের বন্দী হিসেবে দমদম জেলে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

জেলে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে অনেকবার আমরা দেখতে পাই। জেল -জীবন, অনশন, অবরোধ, আইনঅমান্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, রিপোর্টাজ ও কাব্য-কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যকে পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয় করে তুলেছিলেন তিনি। অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে তিনি জেলের ভেতরে ও বাইরে পেয়েছিলেন। ফলে, ভেতরের ও বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে এবং তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯৪৪সালের ৮ই নভেম্বর জনযুদ্ধ পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন —''আবার দ্বিতীয় দফায় আলীপুর, দমদমের জেলে অনশন শুরু হয়েছে। আটাশটি দিন, আটাশটি রাত্রি উপবাসে। ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর মহাদেব দেশাই এসেছিলেন গান্ধিজীর দূত হিসাবে।...বাংলা কংগ্রেস তার প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষ বোস, শরৎ বোস, মুজফ্ফর আহ্মদ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে বন্দীদের কাছে পাঠিয়েছে। ২৮ দিনের সুদীর্ঘ উপবাসেও স্বাধীনতার বীর সৈনিকদের শিরদাঁড়া একটু বেঁকেনি। চোখে তাঁদের শাণিত সংকল্প।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৪ দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৬২৪)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দমদম জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের সাড়া জাগানো অনশন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এরপর তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ভুটানের বক্সা জেলে। সেই জেলের সঙ্গী হিসেবে তিনি অনেক গুনীজনের সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আব্দুর রেজ্জাক খান,'অগ্নিদিনের কথা'র সতীশ পাকড়াশী, উর্দুকবি পারভেজ শহীদী, সমর গুপ্ত, চারু মজুমদার, গিরিজা মুখার্জী, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জেলে বন্দী ছিলেন। জেলের ভেতরের একটা আলদা জগৎ তাঁর অনুভুতিতে ধরা দিয়েছে —''জেলখানা একটা আলাদা জগৎ। চোর-ডাকাত-খুনী-গাঁটকাটা—এই নিয়ে উচুঁ-পাঁচিল-তোলা এখানকার জীবন। আলো-হাওয়ার সঙ্গে আড়ি। আজব এখানকার ভাষা — না বাংলা, না-হিন্দী। তেমনি ছিরি এখানকার জীবনের।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫)

তিনি জেলে থাকাকালীন প্রত্যক্ষ করেছিলেন কয়েদী দুরস্ত করার হাজার ব্যবস্থা — ডিগ্রিবন্ধ, মার্কাকাটা, কম্বল ধোলাই, মাড়ভাত ইত্যাদি। সেখানকার ছোট্ট ছোট্ট নির্জন কুঠুরিকে বলে ডিগ্রি, বছরে তিনমাস সাজা মাপকরার নিয়ম সেখানে আছে-তাকে বলে মার্কা, সেখানে জেল কর্তাদের মন যোগাতে না পারলে হয় মার্কাকাটা, সেখানে কম্বল দিয়ে কয়েদীর সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে লাঠি পেটা করার —প্রচলনকে বলা হয় কম্বল ধোলাই। জেলখানার ভেতরের জীবনকে তাঁর মনে হয়েছিল 'মধ্যযুগের একটা প্রকাণ্ড কারখানা।' জেলের ভেতরে কয়েদীদের হাড়ি-মেথরের কাজ থেকে দাড়িচাল্লি, ধোবিচাল্লি, ঘানিঘর, মিস্ত্রিঘর, ছাপাখানা, তরকারি বাগান ইত্যাদি প্রকারের সব কাজই করতে হতো। তিনি জেলখানার ভেতরেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রেনীবৈষম্যহীন এক জীবন — ''এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদী আছে। ....ছোটলোক নয় এরা। ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। পেটেও টান পড়েনি কোনদিন। এমন নরম মন যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায়। তাই হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও, শত সহস্র ছাঁ-পোষা সংসারকে পথের ফকির করে দিয়েও জেলে গিয়ে তারা সুখে আছে। কেননা তাদের বড় ঘর, বনেদি বংশ —তারা সুয়োরানীর ছেলে। আর যারা পেটের জ্বালায় পথ চলতি লোকের পকেট মেরেছে কিংবা জমি হরিয়ে পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে লাঠালাঠি করেছে তাদের জন্যে অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা। কেননা তারা গরিব, সাধারণ মানুষ—।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬)

তাঁর জেলজীবনে বক্সা জেলকে মনে হয়েছিল 'হিটলার-জার্মেনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'। তাই তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, 'জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড় দিক অদেখা থেকে যায়।' জেলে তিনি বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। টানা দুবছর জেলে থেকে তিনি ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৯৫০ সাল থেকেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাৎক্ষনিকের বন্ধন কাটিয়ে যুগ-সংকট ও শিল্প-সৃষ্টির পরস্পর-সাপেক্ষতা স্বীকৃতি পেতে থাকে। এ সম্পর্কে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন ''মোটের উপর এই হল ১৯৫০ পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-লেখার ইতিহাস এবং সাম্যবাদী দল ও মতের সঙ্গে তাঁর সংলগ্নতা। এরপর থেকেই কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ধারায় লক্ষণীয় বাঁক-বদল ঘটেছে। তারও মূলে আছে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পরিস্থিতি এবং সমগ্র দেশের আবহাওয়া।

এতকাল পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে সোভিয়েট রাশিয়াই ছিল সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লব ও রাষ্ট্রের আদর্শ। ১৯৪৮ সাল থেকে চীনের সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবের সাফল্যও তাঁদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। রুশপন্থী ও চীনপন্থী দুটি মতবাদ ও গোষ্ঠী এই সময় থেকেই জন্ম নিতে থাকে।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৪৩) সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্যবাদী গোষ্ঠীর স্বীকৃত মূলনীতি থেকে আলাদা হতে থাকেন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধী প্রধান, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বসু, রাম বসু প্রমুখ।

এরপর জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে অসম্ভব আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন বাবা চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। এরমধ্যে তাঁর মা যামিনী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর দাদা টাইফয়েডে অকালে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পারিবারিক একটা বিপর্যয়ের বেসামাল অবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেসময় বুক ওয়ার্লড প্রকাশনার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন মাত্র পঁচাত্তুর টাকা মাইনেতে। অল্পকালের মধ্যে তিনি সেই প্রকাশনার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

এই বছরেই ১৭ই আগস্ট গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ের স্মৃতিকথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেশ পত্রিকার 'চিঠির দর্পণে' বিভাগে লিখেছিলেন —''বিয়ে বলতে কোন অনুষ্ঠান নয়, রেজিষ্ট্রি। তখন সবে একটা নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'বুক ওয়ার্লড'-এ এডিটর হিসাবে হাফ চাকরী পেয়েছি। ৭৫ টাকা মাইনে। ধুতির ওপর বন্ধু রমাকৃষ্ণর কাছ থেকে ধার করা একটা ডোরাকাটা সার্ট চড়িয়ে বিকেলে ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গিয়েছিলাম রেজিষ্ট্রি আপিসে। সে রাত্রে বাড়ি ফিরিনি । ইউরোপ থেকে গীতা সদ্য দেশে ফিরে চৌরঙ্গীটেরাসে কুড়ি টাকায় চারতলায় একটা সিঁড়ির ঘর ভাড়া নিয়েছিল।'' (দেশ, ১৬ই আগস্ট ১৯৮৬, চিঠির দর্পণে, পৃষ্ঠা ১৫-১৬) ।

এতটাই আর্থিক কষ্টে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিয়ে করেছিলেন যে, বিয়েতে বসার পোশাকটুকু নিজে কিনে নেবার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রের কাছ থেকে ডোরাকাটা একটা শার্ট, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জলচুড়ি পাড়ের একটা ধুতি এবং কবি অরুণ মিত্রের কাছ থেকে বিয়ের পাঞ্জাবী ধার করে বিয়েতে বসেছিলেন তিনি — ''হাসতে হাসতে সেদিন সুভাষ নিমন্ত্রণ করে গেল। যাবার সময় বলল, বিয়ে করবার পাঞ্জাবী নেই। সারাদিন শার্ট পরে থাকে, কোনওদিন পাঞ্জাবী পরেই নি। কেনার মতো আর্থিক পরিস্থিতিও নেই। কারণ রোজগার বলতে কিছু ছিল না। পার্টির হোলটাইমার। সেই আমলে হোলটাইমার হিসেবে অতি সামান্য কিছু পয়সা পেতো তাতেই সংসার

পাতছে। সেই অবস্থায় আমারই একটা লম্বা পাঞ্জাবী দেওয়া হলো। তাই পরে সুভাষ বিয়ে করতে গেল। রেজিস্ট্রি বিয়ে। আমরা গেলাম। যতদূর মনে পড়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ এসেছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্ভবত।'' (কবি অরুণ মিত্র, পত্রপুট, ৩৩ সংখ্যা ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৬)

দারিদ্রকে সহজভাবে গ্রহণ করে জীবনযুদ্ধে জীবনের ইপ্সিত লক্ষে পৌছানোর উদার মন ছিল তাঁর। দারিদ্র কোনদিন তাঁর জীবনের চেমান গতিকে স্তিমিত করতে পারেনি। বরং সেই লড়াইয়ের ভেতর থেকে উত্থিত হয়েছিল তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ছাপ' কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব কবির ব্যক্তি জীবনের বিশিষ্ট পর্যায়ের স্মৃতির বাহক হিসেবে। কবির জীবনের এই ইতিহাস ধরা পড়েছে কবির আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথায়। কবি লিখেছেন — ''জেল থেকে বেরিয়ে সবে দুপুরে আধবেলার একটা নড়বড়ে চাকরি জুটিয়েছি। এক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে। বিকেলে বিয়ে। দুপুরে আপিস। রেজিস্ট্রি বিয়ে। তার আবার পাঁজি দেখাদেখি কী? না দেখার ফল হল এই যে, বিয়ের রাত পোহাতে না পোহাতেই চাকরিটা নট হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা যাক্ বিয়েটা তো বেঁচে গেছে। আমি যে বিয়ের জন্য বন্ধু রমাকৃষ্ণর কাছ থেকে ডোরাকাটা একটা শার্ট আর দেবীপ্রসাদের কাছ থেকে জলচুড়ি পাড়ের ধুতি ধার করে পরেছিলাম, তার কারণ বিয়েতে আমার মাথার ওপর এমন কেউ ছিল না যে আমাকে বলতে পারে —'বাবা একটা পাঞ্জাবি যোগাড় করতে পারো কি?'.. . . . .যাই হোক, ভালোয় ভালোয় সইসাবুদগুলোও হয়ে গেল। বন্ধুরা কেউ ফুল এনেছিল, কেউ মিষ্টি এনেছিল। দল বেঁধে কমলালয়ে গিয়ে চা খাওয়ার পর হৈ হৈ করে ঘরে ফেরা। ঘর বলতে চিলেকোঠা। চারতলায় একটা চিঁড়ে চ্যাপ্টা পায়রার খোপ। পেছনে এক চিলতে চাঁদ সোহাগী ছাদ। তার এককোণে লোহার বীমে চড়ানো জলের ট্যাঙ্কি। সেদিন রাত্রে ঐ ছাদে বসেই গীতার বোন আবু দরাজ গলায় গেয়েছিল: 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোহারে .....।'...সে রাত্তিরটা স্মরণীয় হয়ে আছে একটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ছোট্ট জুনকে চৌকি। দু'জনের পাশ ফেরারও জায়গা নেই। শুয়ে পড়েই যেভাবে ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম, তাতে পাশ ফেরার বিশেষ দরকারও হয়নি। মাঝরাতে সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ। ঘুমের মধ্যে ছ্যাঁত্ করে উঠল। পুলিশ! তার মানে আবার ধরে নিয়ে যাবে। কান খাড়া করে আছি। তেতলায় একটু থেমে এবার চারতলায় উঠছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। আত্মসমর্পণ ছাড়া কীই বা করার আছে? উঠে দরজা খুললাম। টেলিগ্রাম। সে কি? পুলিশ নয়? চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘোচাতে একটু সময় লাগল। বার্লিন থেকে গীতাকে বিয়ের অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা 'মারি ক্লোদ'। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।'' (সুভাষ

মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২ পৃষ্ঠা ২৭)

বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করা ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে অনাড়ম্বর বিয়ে এবং সংসার জীবনে পদার্পণের ছবি ও স্মৃতি 'ছাপ' কবিতার বিষয়। কবি লেখেন —

''কেউ দেয়নি কো উলু
কেউ বাজায়নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছু ডাক।
পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলেনি হার ;
মাটিতে রঙিন আশা
পেতেছিল সংসার ।'' (ছাপ / যত দূরেই যাই)

বিয়ের আনন্দের সঙ্গে পুলিশী নির্যাতনের আশঙ্কা তার বুকে ঢেউ তুলেছিল। সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার বেদনাতুর জলছবি কবিতার ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। কবি লিখেছেন — ''হঠাৎ যে কোথা থেকে / ছুটে এসেছিল ঝড় ; / ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে / দুলে উঠেছিল ঘর। / জীবনের হ্রদে স্মৃতি / চোখ বুজে দিল ঝাঁপ; / ভিজিয়ে সে-জলছবি / তুলে নিল এই ছাপ।''

মানব সভ্যতার অন্ধকারে ডুব দিয়ে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন একটু একটু করে কিভাবে মানুষ আলো থেকে অন্ধকার জগতে ডুবে যায়। কিভাবে মানুষ 'ঘাড় হেঁট করে' ''সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভালো মন্দ ইত্যাকার নানান বিষয়ে / ভাবনায় নিগুঢ় হয়ে '' ক্রমশ নিজেকে নরকে নিমজ্জিত করে, সেই উপলব্ধি তাঁর শিল্পিত রূপে ফুটে উঠেছে।

১৯৫১ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'আমার বাংলা'। এই বছরেই তাঁর সঙ্গে কবি নাজিম হিকমতের কবিতার পরিচয় হয় — ''এভাবে '৫১ সালে পৌঁছে 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব এল আমার উপর। টাকার টানাটানি চলেছে। এমন সময় একদিন ডেভিড কোহেন নামে একজন ইহুদি, তিনি পার্টি মেম্বার ছিলেন, তাঁদের একটা কাগজ ছিল, সেখানে কেউ আমেরিকা থেকে ইংরাজি অনুবাদে সাইক্লোস্টাইল করা নাজিম হিকমতের কবিতা পাঠিয়েছিল। 'পরিচয়ে'র জন্য সেটা আমাকে পাঠানো হয়। আমি ফরাসিতে অনুবাদ করা একটা কপিও পেলাম। এই দুটো মিলিয়ে হিকমত

অনুবাদ করলাম। আমার ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে নাজিম হিকমত বড় রকমের ঘটনা এটা সন্দেহ নেই।'' (অদ্রীশ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি, ঐ, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)

১৯৫২ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক গিয়েছিলেন বজবজ। সেখানে তিনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন —''দেশের লোক চুলোয় যাক, বজবজের লোকেরাই বা তাদের কাছ থেকে কী পেয়েছে? পেয়েছে শুধু ধোঁয়াধুলো আর রোগব্যাধি। ইস্কুল না, কলেজ না, ক্লাব না, হাসপাতাল না। কিছু আত্মসুখী বড়লোক আর কিছু দালাল। নতুন কোনো শিল্প না, গবেষণাগার না, কারিগরি বিদ্যালয় না।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৪৬৯)

এই শ্রমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির যোগ অসামান্য — ''শ্রমিকদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এখানেই সুভাষের বাস্তব ও গভীর পরিচয় ঘটে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর নন্দন-চিন্তার ক্ষেত্রেও আমুল পালাবদল সূচিত করে। শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের প্রতি আনুগত্য ও বিপ্লবী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে যেমন শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি রচনা করেছে তাঁর এই পর্বের কবিতার মৌল ভিত্তি।'' (তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য ; মাহবুবুল হক, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ পৃষ্ঠা ১৭৫)

১৯৫২ সালের বজবজের শ্রমিক সংগঠনের কথায় তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''সত্যিই তো, দেশ জানি না, মানুষ চিনি না—কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি কথা! তাই একদিন, ১৯৫২সালের এক ভোরবেলায় শ্বশুরমশাইয়ের চোখের জলের মধ্যে দিয়ে, 'ফিরে চল মাটির টানে' বলে একটা ধড়্ধড়ে ট্রাকে কিছু নড়বড়ে তক্তোপোষটোস নিয়ে যখন উঠলাম গিয়ে বজবজের ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের এঁদো পুকুরের ধারে এক মুসলমানের কুঁড়ে বাড়িতে,............'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ৭৯) ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের সেই শ্রমিক জীবন তাঁদের বিস্মিত করে তুলেছিল সেদিন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন —''চটকলের মেয়েদের মধ্যে বহু হিন্দু মেয়ের কাছাকাছি এসে অবাক হয়েছিলেন তাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেখে। বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, গৃহছাড়া আইবুড়ো মেয়ে, ধর্ষিতা—সব চটকলে, নামমাত্র মজুরিতে বেঁচে আছে। কিন্তু নানা রঙ আছে তাদের মনে। একবার অরুণা আসফ আলি আসবেন সুভাষ-ময়দানে। সে কী উত্তেজনা! ছোটো ছোটো মিছিল, বড়ো বড়ো ফেস্টুন হাতে মেয়েরা সময়ের আগে চলে গেছে সভায়।'' (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ৮০)

ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রমের কুঁড়ে গরে সেদিন তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সেই সময় সস্ত্রীক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বেড়েছিল সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ ' নাজিম হিকমতের কবিতা ' এবং শিশুকিশোরদের গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস'।

বজবজের শ্রমিক সমাজে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমৃত্যু ভালোবেসে গিয়েছিল সেই শ্রমজীবী মানুষগুলি — ''সুভাষদা এবার যখন পি. জি. হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি, সেই সময়ে বজবজের কয়েকজন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের লোকেরা পি. জি. হাসপাতালে এসেছিলেন সুভাষদাকে দেখতে। এদের মধ্যে বাবর আলি, সোলেমান, আহম্মদের সন্তান সন্ততিও ছিল।'' (দিলীপ চক্রবর্তী, সপ্তাহ পত্রিকা, ৮ই আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০)

বজবজে সংগঠনের কাজে থাকলেও পার্টির কাজ থেকে কোনোরূপ ভাতা নেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শত অভাবের মধ্যে মাত্র কুড়ি টাকায় একটি মাটির দেয়ালের ঘরে ভাড়ায় থেকে তিনি পরিচয়-এর সম্পাদনা, সংগঠনের কাজ ও লেখার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। লেখায় সমান্য রোজগারে দিনাতিপাত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রমিক ও মজুরদের মধ্যে নিমগ্ন থেকে রচনা করেছিলেন 'ভূতের বেগার' গ্রন্থটি। কার্ল মার্ক্সের 'ওয়েজ লেবার এণ্ড ক্যাপিটাল' অবলম্বনে অর্থনীতি বিষয়ক 'ভুতের বেগার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৩ সালে তাঁর অনূদিত গদ্য গ্রন্থ 'কত ক্ষুধা' ভবানী ভট্টাচার্যের So many Hungers অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষুধা ও দারিদ্র তাঁর পথ চলাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। এরপর ধারাবাহিক লিখে তিনি ১৯৫৪ সালের জুন মাসে 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'অক্ষরে অক্ষরে' শিশু-কিশোরদের গদ্য গ্রন্থটি। তিনি ১৯৫৪ সালেই পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই বছরই তিনি বজবজের চটকল থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পিতা হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বড় মেয়ে 'পুপে' ঘর আলো করে এসেছিলো। সেই সময় সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যের পরিধি গভীরতা ও বিস্তৃতি পেয়েছিল। সেই সময়ের স্মৃতিকথায় তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''আমি পেটের দায়ে চাকরির সন্ধানে প্রশান্তকুমার মহলানবীশের দ্বারস্থ হলাম। রোজ সকাল-বিকেল বরাহনগর যাওয়া আর সাদার্ন অ্যাভেনিউতে সন্ধ্যেবেলা ন'নম্বর বাস থেকে নামা। তার মধ্যে অবশ্য

'সন্দেশ' আপিসে হানা দেওয়া, নাটকের রিহার্সাল, মেয়ে পুপেকে নিয়ে আদিখ্যেতা—আপিসের কাগজে 'ববির বন্ধু' লেখা, সবই চলছে।

'সন্দেশ'আপিস তখন ধর্মতলায় রমরম করে চলছে। সত্যজিৎ আর সুভাষের হাসি হাসি মুখে ডাঁই ডাঁই লেখা ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারটা তখন নব্য আর নামকরা লেখকদের মধ্যে 'অমায়িক-ইয়ে' নাম কিনেছে।'' (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ৮২) এবছরই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর 'কথার কথা', 'জগদীশচন্দ্র বসু', ছোটদের জন্য সঙ্কলিত তাঁর 'পাতাবাহার' ইত্যাদি গ্রন্থ।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিল্পীসত্তা থেকে তিনি লিখেছিলেন 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থটি। এই সময়কালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও কর্মজীবনে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে পরিচয়। এই ঘটনাগুলি তাঁর জীবন ও সাহিত্যে বড় বাঁক নিয়েছিল। তিনি একেবারে নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে সঞ্চয় করেছিলেন ভাষা ও শিল্পের নির্মাণ দক্ষতা। তাঁর সাহিত্যের গড়ন ক্রমশ: পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি কবিতায় নিয়ে আসেন আটপৌরে ভাষা এবং প্রকাশ আঙ্গিকে আনেন কথন ভঙ্গিমা। কবিতায় আগাগোড়া যুক্ত হয়েছিল দৃঢ় প্রত্যয় ও পৃথিবীকে নিজের মত করে বদলানোর স্বপ্ন। এই সময় তাঁর সাহিত্যে আসে মহৎ মানবিক আবেদন। এই সময়ের 'ফুল ফুটুক' কাব্য সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন —''গোঁড়া রাজনীতিতে বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এলো তখন ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পুরাণ-পাখির মতো জন্মালো মানবতাবাদে গভীর প্রত্যয়। 'ফুল ফুটুক' কবিতাপর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের ইতিহাসে মানবতাবাদের উজ্জীবনের কাব্য।'' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪০৬ পৃষ্ঠা ২৫৫) এই সময়ের কাব্য প্রত্যয় ও বিষয় সম্পর্কে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ড: আদিত্য মুখোপাধ্যায় আলোকপাত করেছেন —''নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাপোষা জীবন, লড়াকু সৈনিক, দলিত মানুষ, কেরাণী, মিছিলের মানুষ, সালেমনের মা, কারখানার শ্রমিক, নি:স্ব চাষীদের নি:স্ব রিক্ত বিবর্ণ জীবনযাপণ তাঁর কবিতায়, দরদী ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজচেতনার কেন্দ্রে রয়েছে সাম্যবাদ — এবং তার নিউক্লিয়াসটি হল মানব তন্ময়তা। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর দেশপ্রেমে মানবপ্রেমে অনুপম সংমিশ্রণ।''(একালের কবিতা: প্রকৃতি ও প্রবণতা, পান্ডুলিপি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯ পৃষ্ঠা ১৫৪) এই কাব্য প্রকাশের বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছোটোদের জন্য রচিত 'দেশ-বিদেশের রূপকথা' এবং 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' গ্রন্থটি। এরপরের বছর ১৯৫৮

সালে তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত ‘অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলন’-এ ভারতের লেখকদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে।

উনিশশ ষাটের দশকের প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছল প্রচন্ড অর্ন্তদ্বন্দ্ব, পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং শ্রমিক-কৃষক গণ আন্দোলনের প্রচন্ড শিথিলতা। এই বিপর্যয়ের সময়েও ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের প্রত্যয় ও সাম্যবাদে অটল ছিলেন। ১৯৬০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৮১টি পার্টির বিশ্বসম্মেলনে শান্তি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ভারতেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব’ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতের তৎকালীন সি.পি.আই পার্টি এই নীতি সমর্থন করেছিল। বামপন্থী দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতেই থেকে যান। এই রাজনৈতিক কোন্দল, দ্বিধা, সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনেএর সংকীর্ন বৃত্তের বাইরে এসে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন-প্রত্যয় নির্মাণ করেছিলেন। নবজীবন বোধে তিনি রাজনৈতিক সংকটের উর্দ্ধে আত্মস্থ হয়েছিলেন মানবিক চেতনায়। তিনি সমাজের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে জনচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে সৃষ্টির ও শান্তির এক নির্মল জগৎ গড়ার অঙ্গীকারে দৃঢ়পিনদ্ধ থেকেছিলেন। এই মানস চেতনার প্রতিফলন দেখি আমরা তাঁর ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থটিতে। এই কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে তিনি ‘সহিত্য একাদেমী পুরস্কার’-এ সম্মানিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন — ‘রুশ গল্প সঞ্চয়ন’(১৯৬৩), ‘ব্যাঘ্রকেতন’ (১৯৬০) এবং ‘দিন আসবে’ (১৯৬১—বুলগেরিয়ান কবি নিকোলো ভাপৎসায়ঙের কবিতার অনুবাদ)। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় পার্টির ভাঙন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মোচড় দিয়ে আঘাত করেছিল। এর প্রভাবে তাঁর ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থে কবি মানসে আমরা দেখি বিপন্ন সময়ের বেদনাবিধুরতা ও বিষন্নতা। কবি এই সময় হৃদয়ের সেই ক্ষত ঢাকতে আশ্রয় নিয়েছিলেন চল্লিশের দশকের সংগ্রমমুখর আন্দোলনের নস্টালজিক স্মৃতিরোমন্থনে। কবি মহাকালের গতিতে উত্থিত সেই ট্র্যাজিক পরিণতির অবসানে এক স্বপ্নময় জীবনের আশা হৃদয়ে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সৃজনীসত্তায় কালের সংকট থেকে উত্তরণের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল প্রকৃতি ও জীবন। এবং যুদ্ধের ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ থেকে শান্তি প্রস্তাব হবে বলে গভীর প্রত্যয় রেখেছিলেন মনে। তাঁর হৃদয়ে সেই সময় যদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেম কাব্যশিল্পে রসোত্তীর্ন হয়ে উঠেছিল।

এই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৬'র বাংলার খাদ্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর খাদ্যসংকট বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব তখন সংকটের সম্মুখীন। সারা বাংলা তখন ধর্মঘট, বিক্ষোভ, অবস্থান, গ্রেফতার ও গুলিবারুদে উত্তপ্ত ১৯৬৬ সালের ১০ই মার্চ বামফ্রন্ট সারাবাংলা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সেই সময়ের কথায় জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন —''ছেষট্টির ফেব্রুয়ারীতে বসিরহাটে প্রথম ঘটে মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। পুলিশের গুলিতে মারা যায় কিশোর ছাত্র তেঁতুলিয়ার নুরুল ইসলাম। সে বিস্ফোরণের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিমবাংলায়। মূলত চাল ও কেরোসিনের অনটন ও চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে বহুদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণা আছড়ে পড়ে কংগ্রেস সরকারের ওপর ।'' (দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০০)

সাহিত্য জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন পরস্পর সমান্তরাল অন্বিষ্ট থেকে তৎকালীন সময় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন হলেও কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাজ্যপাল ধরমবীরা যক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিল। যুক্তফ্রন্ট বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল সেই সময়। তৎকালীন কমিউনিস্ট সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত সভা, মিছিল, বক্তৃতা ও আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিল। এবশ১৯৬৭ সালে আইন অমান্য করে তিনি আবার কারাবরণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি তেরোদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। সেই সময় রাস্তকেই জীবনের একমাত্র পথ করে নিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্যে তিনি সমষ্টি মানুষের মঙ্গল কামনা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে থাকেন। রাজনৈতিক গণআন্দোলনে সেই সময় কারাবরণ করে তিনি একই সেলে, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী প্রকাশ দেওরাই, প্রবীণ গান্ধীবাদী অরুণ ঘোষ, কমিউনিস্ট নেতা এ. এম. ও. গণি, সি. পি. আই. এম নেতা সুধীর ভান্ডারী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শৈলেন দে, আজকের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তির সঙ্গে ছিলেন। তৎকালীন প্রশাসন অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে অসম্ভব দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে অরিন্দম সেন তাঁর 'নকশাল দমন অভিযান: ঐতিহাসিক রাজনৈতিন পরিপ্রেক্ষিত' (চেতনা পত্রিকা, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১ম বর্ষ) নিবন্ধে 'শ্যাওলা: অবসান পর্বের বিষাদ' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন —'' শাসক শ্রেণী দুটো জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। প্রথমত: তারা আর পুরোনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। ফলে আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিনিদি কংগ্রেস পার্টির মধ্যেও ঘনিয়ে আসছে ভাঙন (যা আনুষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে ৬৯ সালে)। উপরন্তু স্বাধীনতা এনে দিয়েছি — একথা বলে জনগণকে আর ভোলানো

যাচ্ছে না। .... মিশ্র অর্থনীতি নামক সোনার পাথর বাটি কোন প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি। .... দ্বিতীয়ত: তারা লক্ষ্য করেছিল যে সাধারণ মানুষ আর পুরনো ভাবে মরে বেঁচে থাকতে রাজী নন, তারা বরং মানুষের মত বাঁচার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন। ৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট সরকার গঠন, ৫৯ সালে কলকাতায় কৃষকদের মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ৮০ জনকে হত্যা — প্রভৃতি ঘটনায় সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে গণআন্দোলনের ঝড় ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছিল। ৬০ সালে স্বত:স্ফুর্ত ভারত বনধ, ৬১ সালে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বোম্বাই বন্ধ ও 'দমদম দাওয়াই' পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এবং কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন — এ সবের মধ্যে জনগণের সংগ্রামী সংকল্প ও আত্মত্যাগের মানসিকতা বারবার ফুটে উঠেছিল। এবং পরে ৬৬ সালে আছড়ে পড়ল খাদ্য আন্দোলনের ঢেউ। ভারত-পাক যুদ্ধের পর তখন কেরোসিন তেলেরও অভাব — তেলের লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন তরুণ ছাত্র বসিরহাটের নুরুল ইসলাম। কৃষ্ণনগরে মিছিলে শহীদ হলেন আনন্দ হাইত। এরই ঠিক এক বছরের মাথায় ঘটে গেল নক্সাল বাড়ি। ষাট দশকের গরম হাওয়া ৬৭র গ্রীষ্মে কালবৈশখীর বজ্র বিঘোষে পরিণত হল। .... আন্দোলনের ধারাবাহিক যোগসূত্রটা ধরতে শাসক শ্রেণী ভুল করেননি। দ্বিগুণ আতঙ্কিত হয়ে দমন নামল .... চেষ্টা করল বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। কিন্তু পারল না। কারণ নক্সালবাড়ীর শিকড় শুধু ষাট দশকেই নয় আরো গভীরে প্রোথিত হল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতে ছড়ানো ছিল। (উপন্যাসের ঘরবাড়ি-জহর সেন মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬)। নক্সাল আন্দোলন সেকালের বাঙালী মানসে প্রবল নাড়া দিয়েছিল —"............... সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের এই রাজনীতি কার্যত এতবিৎকালের লালিত সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার চিন্তাচর্চার মূল ধরে নাড়া দিল।" (নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য; প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ভূমিকা অংশ,পৃষ্ঠা ১)

ভারতের রাজনৈতিক আবহ তখন উতপ্ত। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ কবি-মনকে চঞ্চল করে তোলে। ১৯৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি কবি সুভাষের রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ওপর আঘাত নিয়ে আসে। কবির মত ও বিশ্বাস চিড়ে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভারতের অভ্যন্তরে মাওবাদী জীবনদর্শন ভারতের বুকে বারুদ নিয়ে প্রচন্ড গতিতে জনসাধারণের ওপর থাবা বসায়। এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক নীতির পরিবর্তন ঘটে। পার্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে রণদিভে নীতি। পার্টিতে নীতি ও পদ্ধতি বদলাতে থাকে ঘন ঘন। ভারতীয় রাজনীতিতে

নেতা বি. টি. রণদিভে, চারুমজুমদার, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমূখ নেতৃত্বের গ্রহণীয় মাওবাদ বিকশিত হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক আবহে দেখা দেয় অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ, কুৎসা, সন্ত্রাস ও সংকীর্ণ বিভেদ নীতি।

এই দশকেই নকশাল বাড়ি আন্দোলনের হিংস্র কার্যকলাপে কবিআত্মা বিচলিত হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কবির সৃষ্টিশীল মনকে আঘাত করে। ১৯৬৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে অগণতান্ত্রিক ভাবে ভেঙে দেওয়া, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অন্তর্বর্তী কালীন জরুরী অবস্থা, ১৯৭৭ সালে ভারতে অকংগ্রেসী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর আবির্ভাব প্রভৃতি ঘটনায় এই সময়কালে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও সংগ্রামী হয়ে ওঠেন। সন্ত্রাস, হিংসা, বিরোধ, ভাঙন, শত্রুতার প্রতিরোধ করার জন্য কবি উদ্দীপ্ত চেতনায় লেখেন — 'সাহস থাকে / দরজা ঠেলে ঢোকো / সর্বনাশ, রোখো! / কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে / বিশাল থাবায় বাগিয়ে বাঘনখ / . . . . হিংস্র নরখাদক / এই বুঝি দেয় লাফ / ও কিছু নয় / ভেতরে এসো, পাপোশে মোছো ভয় / গা ডুবিয়ে ফুলদানিতে / দেখ, তোমাকে ডাক দিচ্ছে / হাত ছানিতে / রক্তবরণ শঙ্কাহরণ গোলাপ।'' (শের জঙ্গ-এর ডেরায় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

মানুষের সামনে উপস্থিত সমূহ সর্বনাশ। 'হিংস্র নরখাদক' সন্ত্রাশ ও বিভেদের জিগির তুলে মানুষকে বিপন্ন করতে চাইছে। এই সর্বনাশকে প্রতিরোধ করার জন্যে কবি সুভাষ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন আলোচ্য কবিতায়। মানুষ চাইছে সংগ্রামী আত্মাকে — যে সংগ্রামে সে জয় করে নিতে পারে লক্ষ হৃদয়, যেখানে একটি মাত্র সাহসী পদক্ষেপে ফুল ফোটানো সৌরভ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই কবি সেই নরখাদকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যদিকে বিপন্ন মানবাত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্য আহ্বান করেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের একটি মাত্র পদক্ষেপ লক্ষ জনের সমষ্টি মানুষের উপকার উপহার রূপে সফল হতে পারে। শান্তির পক্ষে চলাই হল সেই সব নরখাদকের প্রতিরোধের উপায়। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে মানুষ উৎকর্ষ আনয়নের প্রচেষ্টায় অংশ নিলে হিংস্র ও সন্ত্রাসবাদী মানুষের পরাজয় নিশ্চিত হবে। কেননা, কবি বহুরূপে সর্বসাধারণের অভিমুখ নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেদিন। এজন্য তিনি লেখেন ''জীবনে বনে রণে রমণে লড়াই বহুরূপী।'' লড়াই করার সাহস আর শান্তির চেতনায় মানুষ জয় করে নিয়েছে কারাগার, ভয় ও যাবতীয় অত্যাচারকে।

এই সময়কালে কবি বাইরের জগৎ থেকে একা হয়ে পড়েন। অন্তরে সম্মিলিত সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী ছিলেন। এ রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। কিন্তু শাসক দলের কাছে তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। একেবারেই ব্যক্তি স্বার্থহীন জনদরদী এই কবি ও কর্মীর প্রত্যাশা সরকারের কাছে হতাশার রূপ নিয়েছিল সেদিন। সেজন্য তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তিনি সি. পি. আই. এম. পার্টির সদস্য পদ আর নবীকরণ করান নি। উপরন্তু কংগ্রেসের কয়েকটি জনসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদী মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই থেকে তিনি সি.পি.আই.এম. পার্টির কাছে অচ্ছুৎ হয়ে যান। সেই সময়ে পার্টির নেতৃত্বের কাছে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় — কবি সুভাষ কি সেই সময়ে কংগ্রেসের সদস্যপদ নিয়েছিলেন। এখন যদিও পার্টি বদল জনমানসে একটি স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় বামফ্রন্ট নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে নি। রাজনৈতিক বিষয়টি এড়িয়ে কবির সৃজনী কথা ও জনকল্যাণমুখী কর্মপ্রয়াস লক্ষ্য করলে জীবনদর্শনে অবিচল বলে আমাদের মেনে নিতেই হয়।

কবির ব্যক্তি জীবনে পার্টির নেতৃত্ব ও সরকারের কর্মসংস্কৃতির অভাব এক বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেই সময়ে। 'জল সইতে' (১৯৮১) কাব্যের কবিতাগুলিতে কবির ব্যক্তি মানসের ছাপ রয়েছে। গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আশাহত কবিমন রচনা করেন আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলি। এই সময়পর্বে কবি সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে জনকল্যাণকে ইপ্সিত বিষয় বলে মনে করেছিলেন। তিনি অদ্রিস বিশ্বাসকে এক সাক্ষাৎকারে স্বয়ং বলেছিলেন — ''আমি যে মঞ্চ পেয়েছি সে মঞ্চেই গিয়েছি, কংগ্রেস বলে নয়। এখন তো আর আমি কোনো মঞ্চ তৈরী করতে পারি না। কাজেই তৈরী মঞ্চতেই আমাকে যেতে হয়। শুধু কংগ্রেস নয়, আরো মঞ্চে আমি গেছি। আর আমি কংগ্রেসকে আচ্ছুৎ বলে মনে করি না। এক সময় মনে করতাম, এখন করি না। আমাদের পার্টিতে তার জন্য আমাকে নানা সময়ে জবাবদিহি করতে হয়েছে। এই যে সংকীর্ণতা বিভিন্ন দলে, তা শুধু কমিউনিস্ট পার্টির নয়, তা কংগ্রেসের মধ্যেও আছে, সেই সংকীর্ণতায় আমি বিশ্বাস করি না।''

সমকালের দেশ-সমাজ ও জনজীবনের গভীর সংকটের গভীরের তল স্পর্শ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেকালের তরুণ যুবশক্তির প্রতি একদিকে তাঁর শিল্পী সত্তায় গভীর সহনুভূতিশীলতা অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম নিয়েছিল। প্রশাসন ও পুলিশের প্রতি তাঁর শিলপীসত্তায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যে। তৎকালীন জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় সংকট ও জনজীবনের প্রতি চেতনাসম্পন্ন তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত

কাব্য 'এই ভাই ' (১৯৭১) ও 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২)। এই সত্তুরের দশকে অভিজ্ঞ স্রষ্টার লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছিল 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯) কাব্যগ্রন্থ, 'নাজিম হিকমতের আরো কবিতা' (১৯৭৯) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ' (১৯৭৩) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, 'রোগা ঈগল' (১৯৭৪) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , হাংরাস (১৯৭৩) উপন্যাস , 'কে কোথায় যায়' (১৯৭৬) উপন্যাস , 'ক্ষমা নেই' (১৯৭১) গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' (১৯৭৪) গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'চে গেভারার ডায়েরী (১৯৭৭) অনুবাদ গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'ইয়াসিনের কলকাতা' (১৯৭৮) ছোরদের জন্য গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি। এই সময়ই প্রকাশিত হয়েছিল 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ড (১৯৭২), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৪), 'পদাতিক' প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ (১৯৭৪) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসঙ্কলন(১৯৭৫) বাংলাদেশ সংস্করণ।

সত্তুর দশকে সৃষ্ট সাহিত্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনঅভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কেননা ''শিল্পী এক প্রবল তাড়নায় নিজের চৈতন্য দিয়ে জানা বোধকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হন। .... সাহিত্যে বিষয় নির্মাণে, তার রূপসৃষ্টিতে শিল্পীর স্বভাব যেমন সংযুক্ত হয়, তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাতিরেকে ভাষাও নির্মিত হয় না,তাকেও গড়ে তুলতে হয়। তাই একদিকে বিষয় অনুযায়ী ভাষা নির্মিত হয়, অন্যদিকে শিল্পীর নিজস্বতাও সেই ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আবার শিল্পীর অভিজ্ঞতাও ভুঁইফোর কোন কিছু নয়, তাও নির্দিষ্ট কালখণ্ড ও বিশেষ পরিসর থেকেই গড়ে ওঠে।'' (উপন্যাসের নানা স্তর - প্রসুন ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, কেবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা ১১) এই দশকে সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ আবদানের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৭ সালে 'আন্তর্জাতিক লোটাস পুরস্কার'-এ সম্মনিত হয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবন অভিজ্ঞতায় ক্রমশ: সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্য সম্ভার। ক্রমশ তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে সত্তুর দশকে যেসব শিল্প নির্মাণ করেছিলেন তাতে তাঁর জীবনপ্রত্যয়, স্বপ্নময় নতুন জগৎ, বলিষ্ঠ চেতনা কালের ধ্বংসস্তুপের ওপর অবিচল থাকার সাধনা — ''সত্তর দশক ছিল একটা ভয়ার্ত কঙ্কাল সময়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংশয় সব নিয়ে শুরু থেকে কবিদের হাঁটতে হয়েছে ভয়ংকর এক আগুনের মধ্যে দিয়ে। নকশাল আন্দোলনের সর্বগ্রাসী সংক্রামকে সকলেই যে কবিতার উপাদান হিসেবে ছেঁকে নিয়েছিলেন তাঁদের উচ্চারণে তা হয়তো নয়, কিন্তু সময়ের একটা উত্তাল অভিমত টের পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের অনেকের মধ্যেই, অল্পবিস্তর। স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল

মূল্যবোধ, ভেঙে পড়ছিল বানিয়ে তোলা মিথের যাবতীয় নির্মাণ সুষমা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল আত্মসন্দেহ, অনিশ্চিত, সত্যভঙ্গ আর বিশ্বাসঘতকতা।'' (৭০ থেকে ৯০ -এর কবিতার বাঁকবদল ও তার উপাদান - সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়; বিশ শতকের কবিতা ভাবনা —সম্পাদনা কমল মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১৭২)

কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যাক্তিজীবনে ক্রমশ: সৃষ্টির জগতে একটু একটু করে লীন হতে থাকেন। পার্টির নেতৃত্বের বিরোধ বিভেদ, সংকীর্ণতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকে আরো অধিক মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ করে তুলেছিলন। এর মধ্যে তিনি জাতীয় জীবনের গন্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বৃহৎ জগতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৬০ এর দশকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর কাজে। ট্রেড ইউনিয়নের স্থানান্তরে ব্যাক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময় থেকে অ্যাফ্রো-এশিয়ান শিল্পী সংঘের কাজে অধিক মননিবেশ করেছিলেন। এই সময় থেকে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এবং জগতের বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিকের কাছাকাছি এসেছিলেন। ফলে তার জগৎ ক্রমশ সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে। তিনি সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬২ সালে যান কায়রো, ১৯৬৭ সালে বেইরুট, ১৯৭৩ সালে আলমাআতা, ১৯৭৮ সালে লয়ান্দা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি দিললীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এবং এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনী সংস্থার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্বভার সামলেছিলেন এই সূত্রে তিনি বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে তৎকালীন লেখক তুরস্কের নাজিম হিকমত, রাশিয়ার রসুল গামজাতভ, মির্জা ইব্রাহিম, ইয়েভতুশেঙ্কো, নিকোলাই প্রমুখ, জাপানী সাহিত্যিক হোতা আকাচি, ভিয়েতনামের কবি সাহিত্যিক তেহান, পাকিস্তানের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সত্তুরের দশকে ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এই বছরের ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু মজিবর রহমানের হত্যাকান্ড, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় নজরুল ইসলামের ইহলোক ত্যাগ, ১৯৭৭ সালে ভারতের জরুরী অবস্থা তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। এই সময় তিনি দিল্লী সাহিত্য একাডেমীর কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে কার্যভার বহন করছিলেন।

ক্রমশ: বিভিন্ন ঘটনায় ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছিলেন। এবং ১৯৮১ সালের থেকে তিনি পর্টির সদস্যপদ আর নবীকরণ করেননি। এরপর

থেকে তিনি রাজনৈতিক সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে দলমত নির্বিশেষে ডান-বাম বিভেদের বাইরে রাজনীতিকে দেখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে কমিউনিস্ট দলের ভেতরে গুঞ্জন ও সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এমনও নয় যে তিনি সেসময় বা তারও পরে ভিন্ন কোন দল কিংবা ভিন্ন কোন মতের বশবর্তী হয়েছিলেন। তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করার এক সময়ের অন্ধ অনুসরণ ও আবেগ অবশ্য সরে এসেছিলেন। পর্টির সংকীর্ণ গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সেসময় যে মঞ্চই পেয়েছিলেন তাকে অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি।তখন রাজনীতির অর্থ তাঁর কাছে সমাজ ও মানুষের মঙ্গল করাকে বুঝেছিলেন। তাঁর কথায় '' সমাজটা এমন হবে যাতে মানুষের ভাল হয়। কিন্তু, এটাও খুব রিলেটিভ। যে শ্রমিক কিছু কাজ না করে মজুরী নিচ্ছে, বোনাস পাচ্ছে, নানা রকমের সুবিধা পাচ্ছে — আমি তাকে সমর্থন করি না। কেননা, শুধু তার ভাল হওয়াটাই সব নয়। তাতে সমাজের ভাল হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এতে সমাজ আরো তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, মানুষের ভাল হওয়াটা পরিষ্কার করে দেখা দরকার ।''(অদ্রীশ বিশ্বাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন ; দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২ পৃষ্ঠা ৪৮)

গ্রামবাংলা-মাঠ-ঘাট-নগর-প্রান্তর-কল-কারখানা-নদী-বন্দর জীবনের সুখ-দু:খের সঙ্গে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যাক্তিজীবনে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এই সময়ের সাহিত্যে সেগুলি চিত্রকল্পরূপে শিল্পরূপ পেয়েছিল। কাব্য-কবিতার ছন্দ প্রয়োগ — ভাষা নির্মাণ ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় পালাবদল ঘটেছিল এই সময়ের সাহিত্যে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় লোকায়ত জীবন, প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ ও কাব্য সাহিত্যের গল্প-কাহিনীধর্মী কবিতা রচিত হয়েছিল এই সময়। রাজনীতিবোধে হতাশ সাহিত্যিকের শিল্পমানস সাহিত্যের গতিপথে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের জলছাপ নিয়ে এই সময়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল। কাব্য-উপন্যাস-গদ্যনিবন্ধ-অনুবাদ-ছড়া শিল্পে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চিত্রকরের মতো জীবনের ছবি আঁকছিলেন এই পর্বে। সত্য প্রতিষ্ঠা ও জনজীবনের মঙ্গলের জন্য তাঁর জীবন প্রত্যয় অটুট সেকালেও। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী লিখেছেন —''ব্যাক্তি সুভাষও একান্ত দলের ছিলেন না কখনো। ছিলেন মানব সাম্যের জীবন সত্যের তুঙ্গাচলে নিবদ্ধ-দৃষ্টি। দল ওঠে -পড়ে, ভাঙ্গে-গড়ে, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যয়ের দায়বদ্ধতা অবিচল। সেই সামর্থ্যেই তিনি কবি; তারই টানে সর্বশেষে অমন নিরেট যূথ-চ্যুত।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-শ্রীভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায় - দ্বিতীয় পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন জীবনপ্রত্যয়, জীবনসাম্য, জীবনসম্পৃক্ত, জীবনমুক্তি ও জীবনপ্রসঙ্গের শিল্পী। জীবনের শেষ পর্বের সাহিত্যে তাঁর জীবনচেতনা ও অটুট প্রত্যয় অধিক পরিণত ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে রচিত তাঁর অন্যতম সাহিত্য হল —'জল সইতে' (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থ , 'চইচই চইচই' (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থ , 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থ , 'যারে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থ ,'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা'(১৯৮০), অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'হাফিজের কবিতা' (১৯৮৪) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'চর্যাপদ' (১৯৮৬) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'আমরু শতক' (১৯৮৮) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'গাথা সপ্তসতী' (১৯৮৯) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' (১৯৮৩) উপন্যাস, 'কাঁচা-পাকা' (১৯৮৯) উপন্যাস, 'তমস' (১৯৮৮) অনুবাদ উপন্যাস, 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' (১৯৮৪) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'এখন এখানে' (১৯৮৬) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'খোলা হাতে খোলা মনে' (১৯৮৭) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' (১৯৮৭)জীবনস্মৃতি গ্রন্থ , 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী' (অনুবাদ গদ্যগ্রন্থ - ১৯৮২) , 'ভারত স্বাধীন হল' (১৯৮৯) অনুবাদ গদ্যগ্রন্থ , 'মিউ এর জন্য ছড়ানো ছিটানো' (১৯৮০) ছড়ার গ্রন্থ , 'টো টো কোম্পানী' (১৯৮৪) গদ্যগ্রন্থ , 'রূপকথার ঝুড়ি' (১৯৮৮) শিশু কিশোরদের জন্য গদ্যগ্রন্থ , এবং নির্বাচিত গদ্য-পদ্যের বাংলাদেশ সংস্করণ 'বাংলা আমার বাংলাদেশ' (১৯৮৮)।

১৯৮০ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ধারায় একজন স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যিকের সামর্থ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সুভাষ মুখোপাদ্যায় একটি স্বতন্ত্র স্টিল হয়ে দাঁড়ায় । এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সাহিত্য সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি —" ....তা একাধারে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত, লেখক-ব্যক্তিত্বের শিল্পসম্মত প্রকাশ। যেকোনো গদ্য রচনা বা কবিতায় লেখক ব্যক্তিত্বের এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না, অথচ অনিভব করা যায়, তাকে এককথায় বলা যায় —স্টাইল ।" (বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯) তাঁর সাহিত্য বিভিন্ন সময় পুরষ্কারে স্বীকৃতি লাভ করেছিল — কুঁয়ারন আসান পুরষ্কার (১৯৮০), মির্জা তুরসুন জাত পুরষ্কার (১৯৮১), আনন্দ পুরষ্কার (১৯৮৩), সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরষ্কার (১৯৮৪), মধ্যপ্রদেশ সরকারের কবীর পুরষ্কার (১৯৮৭), মোহিতলাল স্মৃতি পুরষ্কার (১৯৮৭), সুকান্ত স্মৃতি পুরষ্কার (১৯৮৭), উল্টোরথ পুরষ্কার (১৯৮৭), জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার (১৯৯২),

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশীকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেছিল ১৯৯৩ সালে। তাঁর সাহিত্য সর্বমত, সর্বদল ও সর্বশ্রেনীর মানুষের হৃদয়ে কালজয়ী আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছে।

কাব্য-উপন্যাস-গদ্যনিবন্ধ-রিপোর্টাজ ও ভ্রমণকাহিনীধর্মী রচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালীনতার উত্তাপ প্রকটিত করেছিলেন। মানুষ ও রাজনৈতিক দল তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেননি অনেক সময়। কিন্তু মানুষের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস ও প্রত্যয় ছিল দৃঢ়। এলদিকে সাহিত্যজীবন ও রাজনীতি অন্যদিকে জগৎ ও জীবনের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জাতীয় জীবনের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন কর্মবীর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে মানুষের হৃদয়ের আমৃতের সন্ধান । বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তের কথায় — ''একটা দেশের জাতির বাস্তব জীবন এবং ঐতিহাসিক পরিবাশের মধ্যদিয়ে তার সাহিত্য বিশিষ্ট জাতীয় চরিত্র পায় । বিশেষ করে তার সাহিত্য যদি তার প্রাণের অংশ হয়ে উঠতে পারে।'' (বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ক্ষেত্রগুপ্ত , প্রথম প্রকাশ , গ্রন্থনিলয় , পৃষ্ঠা ১৭) ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজীবন প্রতিকূলতা, বন্ধর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের প্রতি আশাবাদকে প্রজ্জ্বলিত করেই হেঁটে চলেছিলেন। কায়েমীস্বার্থ, সুবিধাভোগী, স্বার্থান্বেষী শাসক শ্রেনীর প্রতি তাঁর সাহিত্য সর্বদা প্রতিবাদী ও উচ্চকিত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ হয়ে কথা বলেছে। ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা, সমালোচনাকে পাথেয় করে তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় সাবলীলভাবে সৃষ্টির প্রতিমা নির্মাণ করে চলেছিলেন। ক্রমশ: মানুষের জয়গান করতে করতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী পদাতি। তিনি বাংলা সাহিত্যের ধারায় কালের গন্ডীকে অতিক্রম করে বিশিষ্ট জীবনবোধ ও প্রত্যয়ী চেতনায় আজো আমাদের হৃদয়ে পদধ্বনি তুলে চলেছেন নি:শব্দে, নীরবে।

তিনি দেশপ্রেম ও স্বপ্নকল্পে মানবতার উত্থানের আদর্শে তন্নিষ্ঠ থেকেছিলেন। মানুষের বেদনা, আর্তের কান্না, নিপীড়িতের বেদনা ও নারীর অবমাননায় প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ যথার্থই লিখেছেন —''রসে বশে 'অজাতশত্রু বোবা' হয়েও থাকতে চাননি তিনি, দরকার মতো তাঁকে করতেই হয়েছে সমালোচনা, তুলতেই হয়েছে রাজনীতির কথা, বলতেই হয়েছে ক্ষমতার বিরুদ্ধে, গদি আর গদিয়ানদের বিরুদ্ধে, আর সেই জন্যে শুনতে হয়েছে অবিরাম: 'ভেবেছে কী! এসব কী লিখছে সুভাষ মুখুজ্যে!'' (দিবারাত্রির কাব্য, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৩)। তাঁর জীবনবোধ, ব্যক্তিজীবন, আদর্শবোধ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। এ সম্পর্কে সাহিত্যিক গোপাল হালদার আলোকপাত করেছিলেন —''জীবনযাত্রার গোড়ার কথা আগে জানতে হয়, তবেই বোঝা সম্ভব সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতটা পড়েছে প্রত্যক্ষ, কতটা পরোক্ষ; —

কতটা পড়েছে সৃষ্টির মৌলিক নিয়মে অনুরঞ্জিত, কতটা পড়েছে ব্যক্তি-মানসের মধ্যদিয়ে কুব্জ হয়ে বা ন্যুব্জ হয়ে।'' (বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ আরুণা সংস্করণ , পৃষ্ঠা - চ)

সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন জীবনের অন্তিম পর্বে। এই রচিত সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল —'ধর্মের কল' (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থ , 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫) কাব্যগ্রন্থ , 'কমরেড কথা কও' (১৯৯০) উপন্যাস, 'সাতসকালের ছড়া' (২০০০) ছড়ার গ্রন্থ , 'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০০) কাব্যগ্রন্থ , 'বক্‌বকম্‌' (২০০১) ছড়ার গ্রন্থ , 'হরেকরকমবা' (২০০৩) ছড়ার গ্রন্থ , 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' (১৯৯০) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'কবিতার বোঝাপড়া' (১৯৯৩) গদ্যগ্রন্থ , 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' (১৯৯৪) গদ্যগ্রন্থ , 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' (১৯৯৪) জীবনী গ্রন্থ , 'জানো আর দ্যাখো জানোয়ার' (১৯৯১) গদ্যগ্রন্থ , 'এলাম আমি কোথা থেকে' (১৯৯১) গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি। এই নব্বই এর দশকে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা সংগ্রহের পাঁচটি খণ্ড কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালজয়ী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় একজন স্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ণে সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন — ''রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার জগতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক বলিষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্ব। অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিখা তাঁর কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের বৃত্ত থেকে অন্য এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বোধগত আন্তরিকতা ও প্রকাশগত প্রগতিশীলতার দিকে বাংলা কবিতার যাত্রা পথ সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ কবিব্যক্তিত।''(কবি এবং কবিতার বিষয় -আশয়, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫১)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে নিরন্তর স্বপ্নের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিক সমস্যা ও সামাজিক চলমান সমস্যাগুলিকে শিল্পের সমস্যার সঙ্গে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য সাধনা সময়ের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর সময়চেতনা ও সাহিত্য সাধনার সঙ্গে বিদগ্ধ সমলোচক সরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য —''পৃথিবীজোড়া একোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করার কারণ আমরাই। আবার দূষিত পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধতার সাধনাও তো আমাদেরই। .... এখানে প্রত্যেক লেখকই যেন সময়ের হাতে লাঞ্ছিত অস্তিত্বের বেদনায় অস্তির। সময় তো অস্থির হবেই। যে-কোনো ইতিহাস জিজ্ঞাসুই জানেন প্রতিটি কালখণ্ড কালান্তরের আবেগে স্পন্দমান। কিন্তু আজকের সচেতন মানুষের অস্থিরতার অর্থটা আরো

একটু গভীর। আমাদের লেখকরা একবিংশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বোধহয় অনুভব করছেন ব্যক্তিক নিরুপায়ত্ব, গত্যন্তরহীনতা। সুনীল যাকে বলেছেন 'ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা' আর সমরেশ যাকে বলেছেন আত্মানুসন্ধানের 'নৈতিক ও মানসিক আর্তি' এ দুইয়েরই মূলে আছে বাইরের দিক থেকে প্রযুক্তিপারঙ্গম অথচ অন্তরের দিকে নিষ্প্রদীপ ব্যক্তির নিজেকে খুঁজে ফেরা। এই অভিজ্ঞান সন্ধানের যন্ত্রণা নানা লেখকের কাছে নানা মাত্রায় মূর্তি ধরেছে।'' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিচ ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪০) সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুব-জনচিত্তের হতাশা, অনন্বয়, অনিকেত অসহায়তা, নিস্ফলত্ব,বিষাদগ্রস্ত ও ভঙ্গুর মনকে স্বপ্নময় জগৎ নির্মাণে উৎসাহিত করে, সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে, আলোর দিশা দিয়ে তাদের হৃদয়ের কাছের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন।

মানুষের কান্না, অধ:পতন, মানবতার লঞ্ছনা, বঞ্চনা, শোষণ, পীড়ন ও বেদনার ভেতর দিয়ে শান্তি, সাম্য ও জাগরনী সুরের ছন্দে ও বলিষ্ঠ জীবনবোধে মানুসের প্রত্যয় ও স্বপ্নময় জগতের ঠিকানা দিয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মানবচেতনা, সমাজসচেতনতা ও দায়বদ্ধ শিল্পীসত্ত্বার জন্য তিনি কালজয়ী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে প্রতিষটিত তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বার দৃঢ় প্রত্যয়, গভীর জীবনসক্তি, তীক্ষ্ম বাস্তব সচেতনতা, আদর্শিক জীবনবোধ, অর্থনৈতিক চেতনা, আপাত সাফল্যকে অগ্রাহ্য করে নতুন পথে হাটবার দু:সাহসিকতা, সমালোচনার মুকুটের কণ্টকাকীর্ণতাকে বহন করে সত্যনিষ্ঠায় আপনসীমাকে উত্তীর্ণ হবার আন্তরিকতা বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এই কর্মযোগীর সৃষ্টিকর্ম জনজাগরণের ও জনপ্রিয়তার অন্ত:মূলে পদচারণায় সফল।

বার্ধক্যে কবিকে পীড়া দেয় একাকীত্ব। স্বাভাবিক সময় হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক। কবির এই কঠিন সময় হয়ে ওঠে রাক্ষুসী। কবি 'চইচই-চইচই' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'অন্ধকারে' শীর্ষক কবিতায় তাঁর এই বিচ্ছিন্ন একাকী জীবনকে তুলে ধরেছেন। সেকালে মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতিহীন এক বিচ্ছিন্ন জীবনের অভিমুখ লক্ষ্য করেন কবি সুভাষ। তাঁর এই উপলব্ধি এবং সামাজিক মানুষের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় কবি দুঃখিত। কবি সঙ্ঘবদ্ধ ও শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। অথচ একজন থেকে অন্যজন বিচ্ছিন্ন এমন এক অন্ধকার পথে চলমান মানুষকে প্রত্যক্ষ করছেন কবি। এই উপলব্ধি থেকে কবি লেখেন —

''যার যার নির্জন কুঠুরিতে
তখন সবাই আমরা বন্দী,

সমস্ত সুন্দর মুখ তখন
কালো বোরখায়,
ঢাকা প'ড়ে যায়।
সমস্ত অক্ষর আড়াল ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকে —
মুন্ড গ্রীবাহীন এক নির্বোধ কবন্ধ,
উদরে যার মুখ,
আর সেই মুখমন্ডলে বসানো
অগ্নিবর্ষী একটিমাত্র চোখ।''(অন্ধকারে /চইচই - চইচই)

মানুষের মৃত্যুর পর জীবনের নানা ছবি নানা ভাষায় কথা বলে। আবার কোনো কোনো চরিত্রের মৃত্যুতে মুখরোচক খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। 'চইচই -চইচই' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'মুখরোচক' শীর্ষক কবিতাটিতে পাপ-পুণ্য নয়, একটা মানুষের মৃত্যুর পরের সত্য ছবি আঁকার প্রয়াস লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে এখানে। একজনের কাছে গৃহকর্ম সর্বক্ষণ নিপুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। এজন্য কবি বলেন — ''ফুলঝাড় তার হাতের থাবায়/ বগলদাবায় পাশে'' সর্বদাই দেখা যায় প্রায়। এতটুকু ধুলোময়লা তাকে ছুঁতে পারে না। তার ধারণা ঘরকন্নায় তার মতো ঝানু আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই। যেন মানুষ যত পাপ করুক না কেন সে যেন একাই সব সাফ করে দিতে পারে। তারপর একদিন সহসা সে এই জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। এই অসাধারণ জীবন চরিত্রের নানা কথা, মুখরোচক খবর হয়ে ভাসতে থাকলো এক মুখ থেকে অন্য মুখে। তখন খবরটাই থাকল। সেটাই সত্য হয়ে থাকল। এই সত্য বাস্তবতার আনন্দ-বিষাদপূর্ণ কবিতা 'মুখরোচক'-এ শিল্পিত মাধুর্যে নির্মাণ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি পথ চলেন আর ''মশালের মুখে/ কথা-দিয়ে-কথা -জোড়া টগবগে লাল ঘোড়া।'' ছুটিয়ে চলেন। নিজের ঘরে বসে দুটো কথা বলার ফুরসৎ যেন তাঁর নেই। স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে আলাপ ও সঙ্গ সুখ যেন তাঁর জন্য ছিল না। এটা কখনো কখনো তাঁর নিজের কাছেই বর্বর বলে মনে হয়েছিল। নিষ্ঠুর ও অমানবিক এই আচরণে তাঁর স্ত্রী কন্যা কত যেন কষ্ট পেয়েছিলেন। ঘর থেকে তাঁকে যেন তাঁর স্ত্রী বলেন — ''শোনো কথা, বর্বর ! / কবর তো নয়, / তোমারই জন্যে / আমি কথা দিয়ে / বানিয়েছি এই ঘর।'' এই উপলব্ধি কবির নিতান্ত নিজের একার। কখনো কখনো আত্মোপলব্ধি থেকে মনে হয়েছিল — সংসার, স্ত্রী, কন্যার প্রতি সে অমানবিক বর্বর আচরণ করেছেন। কেননা সহায়-সম্বলহীন

হয়েও সে কেবল পথকেই একমাত্র সঙ্গী করে নিয়েছিল। এজন্য আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গৃহস্থ হও' শিরোনামের কবিতায় কবি লেখেন —''চালচুলোহীন, ওরে ও হা-ঘরে / বর্বর!/ কেন তুমি সম্বৎসর / শুধু ঘুরে ঘুরে / ক্ষয় কর ছয় ঋতু?''। কবি আত্ম বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে আলোচ্য কবিতাটি লিখেছেন । এই কবিতায় তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদের ত্যাগকে স্বীকার করেছেন কবি। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি অর্থ সংগ্রহের প্রতি যত্নবান না হয়ে সারা জীবন প্রায় পথিক হয়েই চলেছিলেন। আত্মকথনের ভঙ্গীতে কবির অন্য কাছের মানুষের ভাবনার প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যৌবন অনেকদিন আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে কবির শরীর থেকে। বার্দ্ধক্যে পৌছে কবি তাঁর প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বলেন যৌবন থেকে সরে এসে ''এখন অনেক দূর থেকে, /একা /মনে মনে বলছি আমি / ভালোবাসি।'' জীবনের অনেকটা সময় বিবাহিতা স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বঞ্চনার মালা পরিয়ে বার্ধক্যে কবি অনুশোচনার গ্লানিতে ভুগেছিলেন। বৃদ্ধ কবি রোমান্টিক কল্পনায় প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন — ''আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই /কলকল্লোলিত সে আবেগে। /তোমাকে জে কথা আমি বলতে গিয়ে /হার মেনে /ফিরে ফিরে আসি : /কানে কানে গুনগুন ক'রে বলা যেত /যদি আমি /হতাম ভ্রমর।'' (যা চাই / এই ভাই) কবি তাঁর প্রিয়তমাকে এ সংসারের সব কিছু অন্তরিকতার দৃষ্টিতে যাচাই করার আহ্বান করেছেন। তাঁর ভাষায় — ''এ সংসারে

দিনে রাত্রে
দেহ বলো, মন বলো
যখন যা চাই —
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা,
করো সব কিছুর যাচাই।।'' (যা চাই / এই ভাই)

চলার পথে আঘাত স্বাভাবিক। সেই আঘাত ও ঝঞ্ঝাকে মেনে নেবার মতো সহনশীলতা তাঁর মধ্যে ছিল। কোনো বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায় একা বাঁচার মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি পড়শি, পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের হয়ে, মানুষের কথা বলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কথায় কবি-সহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য স্মর্তব্য — ''পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে; ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা; আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-

চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা . . . . . . কিন্তু প্রেরণা যেখানে সত্য, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকার ক'রে খুশি হই।'' (কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৮)

জগৎ, জীবন, মানবিকচেতনা ও ভালোবাসায় তাঁর শিল্পীসত্তা অমর। কৃষক, শ্রমিক, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, মজুর প্রভৃতি মানুষকে ভালোবেসে, দেশমাতার সেবায়, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহার ক্লিষ্ট আর্তের বেদনায় ব্যথিত স্রষ্টা অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও পীড়নহীন জগত নির্মাণের স্বপ্নে ও আশাবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০০৩ সালের ৮ই জুলাই মঙ্গলবার সকালবেলা কলকাতা বেলভিউ নার্সিংহোমে আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যা রেখে গিয়েছেন তা আমাদের জীবন -দেশ-সমাজ-সাহিত্য ও নতুন জগৎ গঠনের উদ্দীপনার আশ্রয়স্থল রূপে মহাকালের গতিতে শাশ্বতরূপ পদচারণা করে। তাঁর বিশিষ্ট জীবন বাংলা জীবনীসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অনন্য সম্পদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলার সাহিত্য জগৎকে অভিনব পথের সন্ধান দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে কবিরূপে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আর্বিভাব। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ষোল--১) পদাতিক (১৯৪০), ২) অগ্নিকোণ (১৯৪৮), ৩) 'চিরকুট' (১৯৫০), ৪) 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), ৫) 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), ৬) 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), ৭)'এ ই ভাই' (১৯৭১), ৮) 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), ৯) 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), ১০) 'জল সইতে' (১৯৮১), ১১)' চই-চই চই-চই' (১৯৮৩), ১৩) 'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯), ১৪) 'ধর্মের কল' (১৯৯১), ১৫)'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫), ১৬)'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০১)। ছ'টি দশক জুড়ে রচিত কাব্যগুলিতে আমরা এই অধ্যায়ে কবির বিশেষ কবিমানস, শিল্পীসত্ত্বা, অভিনব শিল্প-আঙ্গিক ও কালপ্রবাহে তাঁর কাব্যপ্রবাহের পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি ছ। সেই সঙ্গে এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছি তাঁর একাধিক অনুবাদ কাব্য ও বিভিন্ন ছড়া গ্রন্থের ছড়া। তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হল ১) নাজিম হিকমতের কবিতা (১৯৫২), ২) দিন আসবে (১৯৬২), ৩) পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ (১৯৭৩), ৪) রোগা ঈগল (১৯৭৪), ৫) পাবলো নেরুদার আরো কবিতা (১৯৮০), ৬) নাজিম হিকমতের আরো কবিতা (১৯৮৬), ৭) হাফিজের কবিতা (১৯৮৪), ৮) অমরু শতক (১৯৮৮), ৯) গাথা সপ্তসতী (১৯৮৯)। এবং তাঁর ছড়াগ্রন্থ গুলি হল -- ১) মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো (১৯৮০), ২) সাতসকালের ছড়া (২০০০), ৩) বকবকম (২০০১), ৪) হরেকরকমবা (২০০৩)। আলোচ্য কবিতা, ছড়া ও অনুবাদ গ্রন্থে কবির শিল্প প্রকৃতি এবং শিল্পমানস বাংলা কাব্য সহিত্যের ধারায় যে অভিনবত্ব দান করেছে আমরা তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তাঁর প্রথম কাব্য 'পদাতিক' - এর রচনাকাল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ । ১৯৪০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রচিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা ২৯ টি । তাঁর কাব্য রচনার সূত্রপাত ২০ শতকের ৩০ এর দশকে । তাঁর প্রথম কাব্য রচিত ১৯৩৮-৪০ সালে। এর পর আরও এক দশক ধরে রচিত কাব্যে তিনি রাজনৈতিক কবিতা লেখেন। এই পর্বের কবিতায় দেখা যায় ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সমষ্টি মানুষের সম্মিলিত সুর।

দেখা যায় তিল তিল মরণেও উদ্বেল জীবনপ্রীতি, হাতুড়ি ও কাস্তের গান। লাল পতাকা হাতে নতুন আশার উদ্দীপনায় সমষ্টি মানুষের সচেতন প্রয়াস। এই পর্বে কবি আপাদমস্তক রাজনীতিতে ডুবে ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক কর্মীর সক্রিয়তা। এই পর্বের কাব্যে শোনা যায় মিছিলে সমবেত সমষ্টি মানুষের শ্লোগান ও মুষ্টিবদ্ধ উদ্ধত হাত। এই পর্বের কাব্যে কবি সুভাষের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছে দুনিয়া বদলে দেবার দৃঢ় প্রত্যয়। এই পর্বের কাব্যে শোনা যায় ফ্যাসীবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মরণজয়ী আহ্বান। এই পর্বে সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার বলিষ্ঠ প্রত্যয় তাঁর কাব্যে দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার জনজীবনে চরম আঘাত হেনেছিল এই মন্বন্তর লাঞ্ছিত স্বদেশের ভয়াবহ দুর্দিনে কবির উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, সমবেদনা ও বিষন্নতা তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে। মন্বন্তরের প্রতিরোধ, শাসক ও শোষকের অপশাসনের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কবির বলিষ্ঠ চেতণা এই পর্বে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

প্রথম কাব্য 'পদাতিকেই' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোড়ণ ফেলেছিলেন। বাংলা কাব্যের ধারায় একটি বিস্ময়কর সৃষ্টির অভিনব শৈল্পিক নিদর্শন নিয়ে পদাতিকের আবির্ভাব। এই কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোলকাতা 'কবিতা ভবন', ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সালে কবির মাও বাবাকে উৎসর্গ করে। এই কাব্যে কবিতার সংখ্যা ২৩ টি— 'সকলের গান', 'মে- দিনের কবিতা', 'কানামাছির গান', ' রোমান্টিক', 'প্রস্তাব ঃ১৯৪০', 'বিরোধ', 'বধূ', 'আদর্শ', 'পলাতক', 'নারদের ডায়রি', 'দলভুক্ত', 'পদাতিক', ' শ্রেষ্ঠী বিলাপ', 'অন্তঃপর', 'চীন ঃ ১৯৩৮', 'এখানে', 'আলাপ', 'ধাঁধা', 'বানপ্রস্থ', 'ঘরে বাইরে', 'আর্ষ' এবং 'কিংবদন্তী'। এই কাব্যের রাজনৈতিক চেতনাকে আশ্রয় করেছিল কবির মহৎ জীবনবোধ। তাঁর সেই জীবনবোধ সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন — " ইতিহাসের বড় মোড়ে দাঁড়িয়ে যে–কোনো সৎ–সাহিত্যিকই সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করবেন। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবী যখন দার্শনিক, নৈতিক এবং অস্তিত্বগত নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, যখন বিশ্ব নামক বৃহৎ ব্যাপারটি তার প্রাত্যহিক নিয়ে এই কলকাতাতেও হয়ে উঠেছে প্রতিদিন পরিদৃশ্যমান, প্রতিদিন অনুভবগম্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে তাঁর কবিত্বকে গড়ে পিটে নিয়েছেন। তাঁর বহু আবৃত্ত পুনঃ পুনঃ শ্রুত পঙক্তিগুলি যখন এক কন্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে ভেসে যাচ্ছিল, তখন তঁরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচেষ্ট থেকেছেন তাঁর নিজের গলার আওয়াজটিকে ধরার জন্য। সে স্বর পরিশীলিত এবং অনুচ্চ, ধ্বনিময় অথচ অনুগ্র। বরঞ্চ আমি সোজা কথাতেই বলে ফেলি , — এই

কবিকে আমার সব চেয়ে ভাষণ মুক্ত বলে মনে হয়েছে যখন তিনি উচ্চগ্রামে তঁ ার রাজনৈতিক প্রতৱগুলি উচ্চরণ করেছেন।" (বাংলা কবিতার কালান্তব, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৬) সমকালের বাংলা কাব্য প্রবাহের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও দার্শনিক চেতনায় শিল্পমানস সেকালের একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী যথর্থই মন্তব্য করেছেন — " সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে অবশ্য আধুনিক কাব্যের লক্ষণগুলি অধিক দেখা যায় । কালের দিক থেকে এঁরা পরবর্তী পর্যায়ের কবিতা । আধুনিক বাংলা কবিতায় অনেকগুলি লক্ষণ দানা বেঁধে যাবার পর যদিও এঁদের আবির্ভাব হয়েছে, তবুও এঁদের বৈশিষ্ট নতুন - নতুন দিক্‌দর্শনে। যেমন সমর সেন প্রধানত নাগরিক কবি, শহুর কলকাতার কবি— নিছক গদ্যছন্দ রচনা, যাতে কোনো দোলা পর্যন্ত নেই, তিনিই শুরু করেন । বর্তমান যুগের অসুস্থ আবহাওয়াকে তিনি রূপ দিয়েছেন । বামপন্থী আন্দোলনের প্রচারকে কি ক'রে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' তারই উদাহরণ।" আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ পাবলিশিং ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫) । এই কাব্যের কবিতাগুলি হল- 'সকলে গান', ' মে-দিনের কবিতা', কানা মাছি্র গান', রোমান্টিক', 'প্রস্তাব ঃ ১৯৪০ ' , 'বিরোধ', 'বধূ', ' আদর্শ', 'পলাতক', 'নির্বাচনিক', 'নারদের ডায়রি', 'দলভূক্ত' , 'পদাতিক', 'শ্রেষ্ঠীবিলাপ', 'অতঃপর', 'চীন ঃ ১৯৩৮' , 'এখানে', 'আলাপ', 'ধাঁধা', 'বানপ্রস্থ', 'ঘরে বাইরে ', 'আর্য এবং কিংবদন্তী। এই কাব্যের প্রথম কবিতা ' সকলের গান'- এর প্রথম পঙক্তিতেই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাব্য রচনার মূলে অবস্থান করছে মার্কসীয় চেতনা । তিনি তাঁর সাথীদের 'কম্‌রেড' সম্বোধন করে নতুন যুগের চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কবিতায় তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা শিল্পী সত্ত্বার সঙ্গে লীন হয়েছে। প্রগতিবাদী চেতনায় সেই দলের সাথীদের আহ্বান করেছেন পার্টি নির্দেশিত বিশিষ্ট পথে চলার জন্য। ব্যক্তি মানুষের চেতনা এখানে সমষ্টি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সমাজের প্রতি কবির উন্নাসিকতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। দেশের চরম সংকট কালে যারা সৌন্দর্য চেতনায় মগ্ন, যারা ভোগ বিলাসে মত্ত তাদের বিরুদ্ধে কবি এখানে উচ্চকিত প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। ' আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী।' এবং ' আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি' পঙক্তি দুটিতে 'আমরা' এবং 'আমাদের' সর্বনাশ দ্বারা তিনি রাজনৈতিক দলের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছেন এখানে। তাঁর হাতে রাজনৈতিক কাব্য রচনার অভিপ্রায় এখানে স্পষ্ট। তাঁর প্রগতিবাদী চেতনার সঙ্গে আহ্বান শোনা যাচ্ছে — অন্তঃমূলেবাসী সাধারণের কাছে পৌঁছে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পথ নির্দেশ— " আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি/একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে;/আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর

প্রতি।" তাঁর শিল্পবোধ এখানে ব্যক্তি মানুষকে অতিক্রম করে সমষ্টি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। সেই সমষ্টির লক্ষ্য হবে— বেশীরভাগ সাধারণের জন্য সাধারণকে নিয়ে জোটবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলা। ব্যক্তির ভোগ, বিলাস ও সুখ চিন্তা কবি এখানে পরিত্যাগ করেছেন।

"মে - দিনের " কবিতায় কবি সুভাষ আটপৌরে মুখের ভাষার সঙ্গে তৎসম শব্দের সুষম প্রয়োগে ও চরণান্তিক মিলে অসাধারণ শিল্পবোধের নিদর্শন রেখেছেন। শ্রেণী সংগ্রামের বার্তা কবি এখানে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। কেননা, পৃথিবীর বুর্জোয়া সমাজ শতাব্দী ধরে আর্তের লাঞ্ছনা দিয়ে চলেছে। এই আঘাত কবির অন্তরাত্মাকে পীড়িত করে। এই পৃথিবীর অসংখ্য মেহনতী মানুষ যারা চিমনির মুখে সাইরেন বাজলে কাস্তে, হাতুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, শাবল ইত্যাদি নিয়ে কাঠ ফাটা রোদ ও ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করেও তিল তিল মরণে জীবনকে ভালোবেসে কাজ করে চলেছে, তাদের ওপর শতাব্দী ধরে চলেছে অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। বিংশ শতকের মানুষ হিসাবে কবি তাই লজ্জি ত। এখানে কবি বার্তা বয়ে এনেছেন যে আমরা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। এই সময় রোমান্টিকতায় ভুলে সৌন্দর্য চেতনায় মগ্ন হওয়া কবির কাছে কাম্য নয়। তিনি মনে করেন এই সময় লৌকিক প্রনয় চেতনার কোন স্থান নেই। মৃত্যুর ভয়ে ভীরুর মতো ঘরে বসে থাকা নয়। দেশের যুবশক্তিকে এগিয়ে সংগ্রামের পথে নামতে হবে। " দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য / চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।।" সেই যুবশক্তিকে আন্তরিকার সঙ্গে আহ্বান করেছেন তিনি— " প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য" " পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা। " সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে সমাজের যুবশক্তিকে কবি দিগ্ দিগন্তে জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন।

"কানামাছির গান" কবিতায় কৃষক মজুর ইত্যাদি মেহনতি মানুষের প্রতি কবির অন্তরাত্মা পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছে। কবির জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ, অর্থনৈতিক চেতনা ও ইতিহাস বোধ এখানে সচেতনার সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যের ইতিহাসে কবি এখানে গর্বিত— " একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে" কিন্তু আজ তা ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা " ধুলিস্যাৎ বটে"। ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতি ও গৌরবময় ইতিহাস পুনরুদ্ধারে কবি এখানে বিপ্লবী হতে চেয়েছেন। আবার ব্রিটিশের রক্ত চক্ষুতে এক শ্রেণীর ভারতীয় যে ভীত সন্ত্রস্ত সে কথাও তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে— " হায়, ইতিহাস অর্থনীতির হাতে বাঁধা/ভুলি বিপ্লব ক্রুদ্ধ প্রভুর রাঙা চোখে"; স্বদেশ চেতনা তাঁর কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে ভালোবাসার নামান্তর। তাদের সঙ্গে নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে আহ্বান তিনি করেছিলেন— " কৃষক, মজুর! আজকে

তোমার পাশাপাশি / অভিন্ন দল আমার। বন্ধু, আগে চলো— / সবাই আমরা নিজ বাস ভূমে পরবাসী;"। তাই কবি সর্বস্তরের সাধারণের সংগ্রামে সামিল হতে চেয়েছেন— " কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ— /জানি, আজ নেই অন্যগতি; / যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ/ সেই পথে নাও আমাকে টেনে!"। কবিহৃদয় এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাশী যে একদিন জাতীয় ঐক্যের মহাসংগ্রামে দেশ স্বাধীন হয়ে উঠবে—"কালবৈশাখী নামবে যে কবে / আমাদের হাত — মিলানো গানে।" । ব্রিটিশের অপশাসনের বিরুদ্ধে কবি শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের তাগিদ এখানে উপলব্ধি করেছেন। সেই শ্রমিক আন্দোলনে সর্ব সাধারণের সঙ্গে নিজেকে সামিল করার তাগিদ তিনি এখানে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এক-একজন কবি এক - একটি আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাদের লেখনীতে জ্বালামুখ দিয়ে উত্তপ্ত লাভা ঝরাতে পারে। বাইরে না এলে সেই গলিত লাভা যেমন আগ্নেয়গিরিতে জমাট বাঁধতে পারে না তেমনি তিনি কবিকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করেন— " আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে রাত্রি, /গলিত ধাতুরা জমাট কখন বাঁধবে ? " রোমান্টিক) । রোমান্টিক কবি মনকে তিনি বিদেশী শাসকদের হাতে তাদের ব্যক্তিসত্ত্বাকে বন্ধকী বলে মনে করেন। কবি সমাজ সচেতন বিমুখ, আয়েসী, ভাববিলাসী কবিদের তীক্ষ্ম কটাক্ষ করেছেন— " এখানে বন্দী আনা- তিনেকের বাল্‌বে। / ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণ - বিলাসী ভাবনা/ আরাম - চেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা/ নিজেরি একদা কল্পিত সব স্বপ্ন/ সেলাইয়ের প্রতি সুতোয় লুকোয় লজ্জ ।" যে বাল্‌ব জ্বলল না তার সার্থকতা কোথায় ? কল্পনা বিলাসী ও ভাববিলাসী সেই সব রোমান্টিক কবিকে একবার আগ্নেগিরীর মতো জ্বলে উঠার কথা যিনি বলেন— " শুনবে সে কথা হাজার জনকে বলতে।" সমস্ত দুরভিসন্ধি উর্ত্তীণ হয়ে কবিদের তিনি " সব- হারাদের বস্তি "তে হৃদয় - জোয়ার আনার আহ্বান করেছেন । এখানে লেখনীকে তিনি মানবতাবাদ ও গণমুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝলসে ওঠার আহ্বান করেছেন।

" প্রস্তাব ঃ ১৯৪০" শীর্ষক কবিতায় সমকালীন ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় জনমানস সার্বিকভাবে সে সময় মৃত্যুভয় জয় করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির নেতা মহাত্মাজীর ওপর আস্থা রেখে সমগ্র জাতি সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— " প্রভু , যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই / কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর ধনুক।/ এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই; / দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।" কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন সমগ্র দেশবাসীকে হতাশ করেছিল। তাঁদের আপোস নীতি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তুলেছিল। ব্রিটিশের সঙ্গে এই আপোসনীতি ও দুর্বল

মনোভাব সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় " তরী হতে তীর" মনীষা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা; এবং তিনজন আধুনিক কবি — মাহবুবুল হক, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কোল-৬, প্রথম প্রকাশ, প্রথম অধ্যায় গ্রন্থে লিখেছেন — " ১৯৪০ সালে দেশ যখন সংগ্রামের জন্যে উদ্‌গ্রীব, তখন তাই নিজের চিন্তার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে গান্ধি বললেন যে তিনি জানেন দেশের মেজাজ কিন্তু জেনেশুনে ' লাল সর্বনাশ ' (red ruin) টেনে আনতে দেবেন না!" এই সিদ্ধান্তকে কবি তীব্র বিদ্রূপ ও শাণিত ব্যঙ্গে ব্যঞ্জিত করেছেন—" হা- ঘরে আমরা ; মুক্ত আকাশ এর, বাহির।/ হে প্রভু , তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল— / তাইতো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর; / ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুলি ফসল। / হে সওদাগর , — সেপাই , সান্ত্রি সব তোমার।/ দয়া করে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও— তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার; / জনগণ মতে বিধিনিষেধের বেড়ী পরাও। " ' প্রভু ' ' হে সওদাগর ' সম্বোধনে প্রত্যক্ষ সংলাপ ধর্মী সংলাপে কবি সহজ ভাষায় ইংরেজ শাসক ও মহাত্মাগান্ধীকে একাকার করে দেখেছেন। ' দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক। ' ' তোমার গোলায় তুলি ফসল।' ' সেপাই সান্ত্রি সব তোমার।' ' তাইতো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসী;' পঙক্তিতে কবি ব্রিটিশ শাসক ও শোষণের কঙ্কালসার স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন তীর্যক ব্যঙ্গ ও উপহাসধর্মী শাণিত বিদ্রুপের দ্বারা। উত্তাল মুক্তি আন্দোলন মুখী ' জনগনমতে বিধিনিষেধের বেড়ি' পরানোই এবং সংগ্রাম বিমুখ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নরম নীতিকে কবি তীক্ষ্ন ও শাণিত বাক্যে ব্যঙ্গ ও ধিক্কার জানিয়েছেন— ' অস্ত্র মেলেনি এতদিন; তাই তেজেছি তান ।/ অভ্যাস ছিল তীর -ধনুকের ছেলেবেলায়।/ শত্রু পক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—/ বলব , বৎস ! সভ্যতা যেন থাকে বজায়! চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান।।" হা-ঘরে ভারতীয়দের মহামানবের বুলি আওড়ানো, তাদের ওপর আপোসের বিধিনিষেধ এবং সহসা বুকে কামানের বুলেটের মাঝে ' সভ্যতা ' শব্দটিকে কবি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এখানে ব্যাঞ্জিত করে তুলেছেন। দেশমাতা ও জাতীর সার্বিক সংকটে কোন সচেতন , প্রগতিশীল ও সংবেদনশীল মানুষের চোখ বুঁজে কোকিলের দিকে কান ফেরাতে বলাকে কবি ভয়ঙ্কর ভাবে উপহাস ও ধিক্কার জ্ঞাপন করেছেন।

'বিরোধ' কবিতায় কবি উত্তম পুরুষে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। কবি জীর্ণঘরে জীবনযুদ্ধে রত থেকেও দৃষ্টি রেখেছেন অসীমরে দিকে— " নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে / জানলায় নীল আকাশ দিলাম টাঙিয়ে, / মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে/ চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।" (বিরোধ/পদাতিক) এখানে অসীমের

অন্বেষণে কবি কল্পনা বিলাসী ও রোমান্টিক ভাবের পন্থাকে পরিহার করেন স্পষ্ট রূপে। তিনি স্থবির ভাববিলাসী কবিদের বিদ্রুপ- বানে নিক্ষেপ করে বলেন —

" সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে,
শুক্‌নো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।" (বিরোধ/পদাতিক)

এখানে পদাতিক কবির পা দুটি গোপনে ' নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ । ' প্রগতিশীল ও সাঙ্গ ভাবনার কবিমন সমাজতন্ত্রের দুঃসাহসিক স্বপ্ন নিয়ে দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলায় বিশ্বাসী——

" কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে;
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি ? " (বিরোধ/পদাতিক)

এখানে জাতীয় সংকটের কালে সমাজ বাস্তবতার দিক থেকে নীরব থেকে কল্পনা ভাববিলাসী কাব্যস্রষ্টা রূপ ঈশ্বরকে কবি তাই নিষ্ঠুর বলেছেন। রোমান্টিক ভাবনায় যে স্রষ্টা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে , তাদের সঙ্গে কবি সুভাষের সমাজকে দেখার, জগৎকে দেখার ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিরিশের নাস্তিক্যবোধের জাড্য থেকে তাঁর মানব প্রত্যয় রূপ ঈশ্বর রীতিমতো স্বতন্ত্র। আধুনিক কবিদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ের যে সংকট তা এখানে স্পষ্ট। 'ঈশ্বর' সম্বোধনে কবি যেন এগনোষ্টিক। সর্বোপরি ঈশ্বর সম্পর্কে কবির ধারণা মানবীক জীবন প্রত্যয়—" উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে নাকি/ আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে ? " (পদাতিক/ পদাতিক)

কবির ' বিরোধ' কবিতার সম্পর্কে সমালোচক ও গবেষকদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। ডঃ মাহবুবা সিদ্দিকীর ' আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা' গ্রন্থে কবিতাটিকে গণ্য করেছেন ' শখের সাম্যবাদী'দের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ হিসাবে। আবার 'আমার কালের কয়েকজন কবি ' গ্রন্থে জগদীঐ ভট্টাচার্যের মতে বিরোধ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে 'বয়ঃসন্ধি – লগ্নের প্রেয় আর শ্রেয়বোধের দ্বন্দ্ব'। আবার ডাঃ মাহবুবুল হক 'তিনজন আধুনিক কবি' , (নয়া উদ্যোগ , ২০৬ বিধান সরণী, কোলকাতা - ৬, প্রথম

প্রকাশ) গ্রন্থে লেখেন — ‘ অভিধা ও ব্যঞ্জনার ধরা — অধরা ভাষায় এই কবিতায় কবি বাস্তব অস্তিত্ব ও কল্পসৃজনের মধ্যেকার বিরোধকেই মূর্ত করেছেন।’

‘পদাতিক’ কাব্যে ‘বধূ’ শীর্ষক কবিতাটিতে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে চিত্রকল্প। এখানে কবি লিখেছেন——

“ সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া।
ছিপে সে- ছায়া মাথায় কর যদি
পেতেও পার কাতলা মাছ, প্রিয়।” (বধূ’ / পদাতিক)

এখানে সারা দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ, ব্রিটিশ শাসকের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও জীবনের দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে সাময়িক প্রশান্তি পেতে শৈশবের ঘনছায়া ঘেরা গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“ কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে.
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা।” (বধূ’ / পদাতিক)

এখানে সেই সুন্দর জীবনে পরাধীন দেশের যন্ত্রণা কবির হৃদয়ে সচেতন ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপরোক্ত পঙক্তি কটিতে ‘হানা’ শব্দটির প্রয়োগ ইঙ্গিতবহ ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে মানব জীবনের বৈচিত্র্য তাঁর স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে পড়েছে জটাজুটধারী গেরুয়াবসন পরিহিত মানব জীবনের কথা, কখনো ছাদের কিনারা থেকে চাঁদের সৌন্দর্য, সেখানেও ধ্বনিত হয় পাষাণ হৃদয়ে সুদখোরদের পদচারণা। কোথাও ফেরিওয়ালার আহ্বান, আবার কোথাও বিকেলের পড়ন্ত বেলায় জলের কলে সখার উদ্দেশ্যে কলসি কাঁখে মৃদু চালে চলার ছবি এখানে এঁকেছেন তিনি। সবার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কলঙ্কিনী প্রণয়িনীর অসাধারণ প্রেমাকাঙ্খায় একলা চলার মরণজয়ী প্রেম ভাবনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বধূ’ কবিতার শিরোনামে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন । এই কবিতাটিতে তাঁর অতীত গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে শহুরেজীবনের পার্থক্যের উপলব্ধি পাই আমরা । সেই জীবনের প্রসঙ্গে এতে উঠে এসেছে পুঁজিবাদীদের শোষণ ও বিনিয়োগের কথা । আর এখানেই তাঁর স্বকীয়তা । ক্রমশ: রাজনৈতিকজীবন থেকে মোড় নিয়ে ভেতরের শিল্পীসত্ত্বাকে জাগিয়ে

তোলার নিরন্তর প্রয়াস তাঁর সাহিত্যজীবনের আদিপর্বেই দেখা যায় । এই তাগিদের একটি নিদর্শন তাঁর ‘বধূ’ কবিতাটি । সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিকজীবন থেকে দূরে এসে কবি নির্ভেজাল প্রশান্তি ও অনাবিল আনন্দে ডুব দিয়েছেন এই কবিতায় ।

সমকালের জাতীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের ইঙ্গিতবহ কবিতা ‘আদর্শ’। পদাতিক কাব্যের এই কবিতাটির শিরোনামে তাঁর বিশিষ্ট চেতণার সাক্ষাৎ পাই আমরা । জাতির বিপর্যয়ের দিনেও নাগরিকের আদর্শবোধ ও জেগে ওঠার উদ্দীপনাকে তিনি এই কবিতাটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন— ক) ‘ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে ।’ (আদর্শ /পদাতিক) খ) ‘মনান্তরের ঘটনা নেহাৎ ঘরোয়া ।’ (আদর্শ /পদাতিক) গ) ‘রুপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রুপকে ।’ (আদর্শ /পদাতিক) ঘ) ‘মাথা ঘামাবো না চেক-চীনা সংকটেও......... ।’ (আদর্শ /পদাতিক) ঙ) ‘নির্বাণ-লোভে মঠ তো সঠিক সময়ে ।’(আদর্শ /পদাতিক)

এরকম এই কবিতার বিভিন্ন পংক্তিতে কবির বিশিষ্ট জীবনচেতণার পরিচয় পাই আমরা । মূলত: মন্বন্তরপীড়িত ভুখা সমাজের প্রতি দেশবাসীর ঔদাসীন্য কবির মনে গভীর ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল । সেই তাড়নার শিল্পরূপ এই কবিতাটি । মজুর, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষকে যেকোন যুগেই লড়াই করে বাঁচতে হয় । তাঁদের সংগ্রাম ও তাঁদের অধিকার রক্ষার ধর্মঘটে সামিল হওয়া সভ্য নাগরিকের কর্তব্য । এই নৈতিক বোধকে যারা অন্য মানুষের কাছে ভাড়া দেন, তাদের কবি শাণিত বিদ্রুপে শোধণ করতে লিখেছেন —“ সম্মতি নেই মজুর ধর্মঘটেও ভাংচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে;” (আদর্শ / পদাতিক) আলস্য ও নির্বোধ জীবনযাপন জাতির সংকটে অত্যন্ত অশোভন। এই আদর্শচ্যুত জীবনাচরণকে সরস কৌতুকে ও শাণিত ব্যঙ্গে কবি লিখেছেন—

“শুনি বটে, পাঠা যোগ্য প্রেমের প্রসাদী —
চালাও, শ্রীমতি, বৈজয়ন্তী অবাধে ;
স্বেচ্ছায় পাবে যুবক সলিল সমাধি,
দীর্ঘ আড্ডা জমবে জনপ্রবাদে।” (আদর্শ /পদাতিক)

জাতীয় মুক্তি আন্দোলের অস্থিরতার কালেও যারা ধর্মীয় অসার জীবনে নির্বিকার ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে কবি লিখেছেন — “সংশোধনের পথ বাৎলেছি শুঁড়িকে; / নাস্তিক নই, — নিষ্ঠা সটান ত্রিশূলে। /মার্জনা সব, ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে—/নি:সন্দেহে স্বর্গে, শরীর মিশুলে। ” (আদর্শ/পদাতিক)

সৌন্দর্যপ্রেম, দায়বদ্ধহীন সাহিত্যচর্চা ও কংগ্রেস নেতৃত্বের নরমপন্থী মানসিকতা সম্পর্কে কবি বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন — ‘‘মানি অহিংসা , মেনেছি অসহযোগিতা;

নায়ক অধুনা কংগ্রেসী মনোনয়নে—

সাহিত্যে সখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা;

শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে।’(আদর্শ / পদাতিক)

অলসভাবে ,গল্পগুজবে , দিবানিদ্রায় , নিছক ধর্মীয় ভাড়ামিতে উদাসভাবে যারা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছিলেন , তাদের জীবনের প্রতি কবি গভীর অনুশোচনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতাটিতে । এখানে ‘হরিণা’ ও ‘শুঁড়ি’ শব্দ দুটি প্রয়োগ করে কবি হাজার বছর পুরণো গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ এবং সেই যুগের এক শ্রেণী সচেতন শিল্পীকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সমকালের প্রেক্ষাপটে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ।

‘পলাতক’ কবিতায় কবি সুভাষের বিশিষ্ট শিল্পীমানস একটি কবিতার ফ্রেমে ধরা পড়েছে। যাঁরা সাহিত্যের জন্য বুঁদ হয়ে বাক্য সৃষ্টি করেন তাঁদের প্রতি কবির আঘাত ‘পলাতক’ আখ্যায় সম্বর্ধিত করা। কবি বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত যথার্থ — ‘‘.................তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালী কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্য জীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না, কোনো অস্পষ্ট মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই,.................’’। এই জগৎ সংসারে ‘পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে’ তা দেখেও যখন কবিরা ‘মেঘেদের হাত ধরে’ ‘উধাও-যাত্রা গ্রহ হতে গ্রহে’— সেই সব কল্পনাবিলাসী সমাজের দায়বদ্ধতাহীন বুদ্ধিজীবিদের কবি ‘পলাতক’ মনে করেন। বিশিষ্ট জীবন প্রত্যয়ে কবি সুভাষ কখনো ব্যর্থ প্রেমিক ও চন্দ্রাহত যুবকের ট্রামের চাকার নিচে আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে প্রেম — বিষয়ক শোকগাথা লেখেন নি। যাঁদের লেখনী ‘‘প্রণয়ের কাহিনীকে প্রবৃত্তির হাতে বেঁধে মুহূর্তের জ্বরে মহৎ প্রচ্ছদ দেওয়া ; তারপর পিঠ রেখে সম্মুখ জীবনে বিশ্বস্ত হৃদয় খোঁজা, সকল শূন্যতা যাতে প্রেম ঝরে;’’ যাঁদের জীবন প্রত্যয়ে— ‘‘মর্ত্যের আকাঙ্ক্ষাদল ছিঁড়ে দিয়ে পরীদের পাখার পিছনে,

অদৃষ্টের অন্ধ খাদে জীবনকে এসে অবসাদভরে

বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতা কন্যারে ধার দিই জনে জনে;’’ (পলাতক / পদাতিক)

তাদের ‘পদাতিক কবি’ ‘পলাতক’ বলে মনে করেন। কখনো ব্যক্তিগত প্রেম ও বিষাদের গভীরতায় অন্তলীন, কখনো প্রজাপতি হয় হয়তো মধুসন্ধানে মগ্ন এবং তার কানে বাতাস তো দূরের কথা এরোপ্লেনের শব্দও উপলব্ধ হয় না — সেই সব উদাস ও ভাববিলাসী কবিকে ‘পদাতিক কবি’ তীব্র ও

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে আঘাত করেছেন এই কবিতায়। কবি মনে করতেন — সাহিত্য সৃজন ও শিল্পের তাগিদ সেই মেঘলোক থেকে আসেনা। তাই জগৎ সংগ্রামের জ্বলন্ত রণক্ষেত্রে পদাতিক সেনার রণধ্বনি তাঁর কবিতার গভীরে প্রতিধ্বনি তোলে। এই কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস নয়, বরং বিশ্ব মানবের মুক্তির লক্ষ্যে সমষ্টির চেতনার উৎসবে। এই বিশিষ্ট জীবন প্রত্যয় এই কবিতার ভাববস্তু, পদ বিন্যাস, প্রকরণ ও ছন্দ ভাবনা এক ধরনের অভিনব সংযোজন।

'পদাতিক' কাব্যের অন্যতম কবিতা নির্বাচনিক। এই কবিতার মধ্যে কবির গভীর প্রত্যয় নিমজ্জিত। কবিতাটির শীর্ষনামে 'নির্বাচন' শব্দটির সঙ্গে 'ষ্ণিক' প্রত্যয় যুক্ত। অর্থাৎ ঠিক বিষয় নির্বাচন করার সমর্থন আছে যার। সমকালীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আভাস এ কবিতায় আছে। কবির গভীর প্রত্যয় — একদিন সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করবে জগতের পুঁজিবাদ ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। জীবনের অধিকার অর্জনের যে লড়াইয়ের পথ, সেটিকে সাধারণ মানুষ ঠিক বেছে নেবে। সমাজতন্ত্রের ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় যে মার্কসীয় নীতি তাকে মানুষ একদিন গ্রহণ করবে। কবির বিশ্বাস একদিন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত মোড় নেবে। প্রকৃতি যেখানে নিয়ম মেনে ''ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক বদলাবে'', সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর স্থান হবে 'মরাকাটা ঘর' — তখন সমাজতন্ত্রের কাছে নিজের দম্ভ ও অহংকার ত্যাগ করে পুঁজিবাদী শক্তি বাধ্য হয়েই 'কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,'-তে। কেননা মেহনতি শ্রেণীর মানুষ নিজেদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে নেমেছেন। আর তাই সেই সব সংগ্রামী মানুষের 'নখাগ্রে নক্ষত্র পল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।'' তামাম দুনিয়াকে তাঁরা জানাতে চান যে — 'সাম্য অতি খাসা চিজ!' বিদ্রোহ — কিন্তু শাসক ও পুঁজিবাদের ভাষায় এই বিদ্রোহ 'রাজবিদ্রোহ!' আর বিদ্রোহী করে তুলেছেন যারা — তাদের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন ও যন্ত্রণায় অধীর হয়েই সাধারণেরা সাথী বিপ্লবীদের আহ্বান জানাচ্ছেন। কেননা কালের নিয়মে যে 'ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা'। সময় এসেছে সেই সব সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের জীবনের পথটাকে মোড় ফিরিয়ে দলে ফেরানোর। সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করার।

জগৎ জুড়ে সাম্যবাদী জয়গানে সবাই যেখানে লাল পতাকাকে সেলাম করছে, সেখানে কি পুঁজিবাদে ও সাম্রাজ্যবাদে অত্যাচারীরা পদত্যাগ পত্র পাঠাবে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর ঔদ্ধত্য ও ভণ্ডামী ধ্বংস করার দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান করেছেন কবি এই কবিতায়। কবির কণ্ঠে উচ্চকিত প্রত্যয়-সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তীর্যক ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষে কবি পুঁজিপতিদের আঘাত করেছেন এই কবিতায়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে 'পদাতিক কবি'র 'নারদের ডায়েরি' কবিতাটি। এই কবিতায় পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবর্ষি নারদের নাম গ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নারদ যে কোন বিষয়ে ঝামেলা সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। এই চরিত্রের নাম দ্বারা কবিতার বিষয় অসামান্য শৈল্পিক চেতনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই কবিতায় সমকালের সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন্দল শিল্পরূপ পেয়েছে। ১৯৩৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্র বসুর এই উত্থান সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তারই পরিণামে তিক্ততার জেরে সুভাষচন্দ্র বসু এই পদ থেকে ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করেন। এই কোন্দল সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন — ''সুভাষ বাবুকে নিয়ে কংগ্রেসের ঝগড়া অবশ্য ক্রমশ তুঙ্গে উঠেছিল, তাই স্বয়ং গান্ধী মহারাজ সভাপতি পদের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের পট্টভি সীতারামাইয়াকে খাড়া করলেন ; অহিংস 'চ্যালেঞ্জ'-এর জবাবে সুভাষচন্দ্র দেশ জুড়ে নিজের বক্তব্য প্রচার করে অভূতপূর্ব সমর্থনও পেলেন। কম্যুনিস্ট, সোশালিষ্ট প্রভৃতি বামপন্থীরা তখন তাঁর সাথী ;''। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সারা দেশ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। এ বিষয়ে ডঃ মাহবুবুল হক লেখেন —''ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়ায় দেশ যখন উত্তাল, বঞ্চিত জনগণের সামনে যখন সমাজ জীবনের পালাবদলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লাভ করেছে ক্রমপরিব্যাপ্তি, সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনগণের সামনে নিয়ে এসেছিল সংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা। ১৯৪০-এর গোঁড়াতেই কমিউনিস্ট ও অন্য বামপন্থীরা বুর্জোয়া সংস্কারবাদের প্রভাবের বাইরে মেহনতি জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধর্মঘট ও আন্দোলনের পরিকল্পনা নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি তখন মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যাওয়ায় ব্রিটিশ শক্তি ছিল দুর্বলতর অবস্থানে। এই সময় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।'' জওহরলাল নেহেরু মনে করেছিলেন ব্রিটিশ যখন বিপাকে পড়ে জীবন মরণের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সেদেশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম লড়াইয়ের যৌক্তিকতা নেই। অন্যদিকে দেশ জুড়ে কম্যুউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হয়ে যখন কৃষক-শ্রমিক-তাঁতি-কামার-কুমোর-নাপিত-ধোপা ইত্যাদি খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে; তখন গান্ধীজি দেশে লাল সর্বনাশ (Red ruin) না আনতে দেওয়ার কথাই ঘোষণা করেন। দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিঘাত আছড়ে পড়ার প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস ও সংগ্রাম

বিমুখ অবস্থান নেন। এই অবস্থানের জন্য পদাতিক কবি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজির প্রতি তীব্র শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন —

"বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই ;
সাঙ্গ, প্রভু, সত্যাগ্রহ ?
একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা ?
শেষে কি নৈমিষারণ্যে পাবে আত্মগোপনেরঠাঁই?" (নারদের ডায়েরি /পদাতিক)

কমিউনিস্ট আন্দোলন সে সময় নিষিদ্ধ। আন্দোলনের ঢেউ, বিক্ষোভের তেজ, সংগ্রামের বীর্যতেজ অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছিল গোপন অন্ধকারে, কোথাও বা আন্ডার গ্রাউন্ডে। সেই গোপন ডেরাতেই বিলি করা হতো নিষিদ্ধ ইস্তাহার, নিষিদ্ধ প্রতিবেদন। মাটির নীচে থেকে ভারতের মাটি কাঁপিয়ে ব্রিটিশের রাজসিংহাসন টলিয়ে দেবার ডাক দেন কবি। তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চিকত হয়ে ওঠে গোপন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত — "অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে
ডাক দিই" (মিছিলের মুখ / অগ্নিকোণ)!

গভীর প্রত্যয় আর ইতিবাচক আশাবাদ ধ্বনিত তাঁর কণ্ঠে। কবি অন্তরিন্দ্রিয়ে শুনতে পাচ্ছেন শুভ দিনের স্বাধীন প্রভাতে সূর্যোদয়ের বার্তা — "নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা।;"। কবির সংগ্রাম-মুখর শিল্পী-মানসে গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন 'অহিংস সত্যাগ্রহ' অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক হয়ে উঠেছিল। এই কবিতার শীর্ষনাম 'নারদের ডায়েরি'তে এবং কবিতার বিষয়ে কংগ্রেসের কোন্দল ও আপসনীতি কবির লেখনীতে তীর্যক ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের ঢঙে প্রকাশ পেয়েছে।

'পদাতিক' কাব্যের 'দলভুক্ত' শীর্ষক কবিতাটিতে সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক সমাজ পরিবর্তনের আভাস নির্দেশিত হয়েছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, হাজরা পার্কে পার্টির সভায় পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। তার ফলশ্রুতিতে 'ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়ারি;' কেননা, তার এখন 'আতঙ্কিত অন্তরাত্মা।' কবির স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় যে, শোষক শ্রেণী প্রজাসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার তুলে দিতে বাধ্য। তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন — "ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস ; পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে ;" সাধারণ মানুষ সহজ বুদ্ধিতে উদ্দীপিত হয়ে স্বপ্ন দেখছেন স্বর্গসুধা পানের ; স্বপ্ন দেখছেন সমাজে সাধারণতন্ত্র কায়েমের ; খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ

সংগ্রামী হয়ে উঠেছেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছেন সাধারণের হাতুড়ি, শাবল, কাস্তে ও গাইতি। কবির ভাষায় —''হাতুড়ি বিদ্যুৎগতি। বিস্ফোরক স্ফুলিঙ্গের গম্বুজে লাগুক,

ধ্রুব লক্ষ্যে হামাগুড়ি কতকাল ?'' (দলভুক্ত / পদাতিক)

এখানে কবি মনে করেন এবার আর হামাগুড়ি নয়, সময় এসেছে প্রতিরোধ করার এবং অন্যায়ের সামনে রুখে দাঁড়াবার।

'পদাতিক' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পদাতিক' সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে উৎসর্গ করে রচিত। এই কবিতাটি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। কবিতাটির পর্ব পাঁচটিতে পাই, পদাতিকের কাব্যজীবনের বিশেষ ধর্ম। প্রথম পর্বে কবির উচ্চকিত ঘোষণা— ''হা! হতোস্মি--সড়কে বেঁধেছি ডেরা।'' সেই পথবাসী ও পথচারীর ''আকাশ চিকন শাখায় চেরা ;'' পথের কবি পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেন — ''চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি।'' সময় থেমে থাকে না। কোনো উত্তর থাকে না যখন 'পদাতিক' জিজ্ঞাসা করেন — 'হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পারো ?' মহাকালের ধর্ম তার নিজের নিয়মে চলে। প্রকৃতির ধর্ম মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে নাড়া দেওয়া। তাই মরীচিকা থাকলে বালুচরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয় হবে। লালমেঘ আর গুহার অস্তিত্ব নিখিলেই থাকবে। মাঠের শিশির ঝরে পড়বে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। তাই আজ যারা বিশ শতকেও আমাদের ক্রীতদাস করে রেখেছে তারা কোনো কালেই পাত্তাড়ি গোটাবে না — এ সম্ভব? পদাতিক কবির সচেতন শিল্পীমনে গভীর প্রত্যয়—দেশমাতার দুঃখ মোচন হবে। বলিষ্ঠ আশাবাদে কবি তাই বলেন— ''রামধনু-রং দেশেও জমাবো পাড়ি।''

'পদাতিক' কবিতার দ্বিতীয় পর্বে মানব সভ্যতার কঠিন বাস্তব সত্য উপলব্ধিতে মগ্ন থেকেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভাবাবেগপূর্ণ স্বপ্ন-কল্পনাময়তা নরনারীর প্রেম-ভালোবাসায় আত্মস্থ হয়ে থাকার দিন আজ নেই। কেননা — ''ফাঁকা ভাঁড়ারের ওস্তাদ সংসারী -

আর কত দিন ঢাকবে ধোঁকার টাটি ?'' (পদাতিক ২/পদাতিক)

কবির বার্তা তাই প্রেম আপাতত পিরামিডে কফিন-ঢাকা হয়েই থাকুক। তাই কবির পরামর্শ — প্রগল্ভ যুঁই মেলুক বন্ধ্যা শাখা, /চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি।'' (পদাতিক২/ পদাতিক) মানুষ এখন প্রত্যহ বিনিদ্র রাতে উপবাসী। সেই উপবাসী হৃদয়ে— 'হাঙর-যক্ষ্মাই ঠোকরাবে'। তাৎক্ষণিক ভাবে কবির মনে হয়— 'ব্যর্থ পৃথিবীর পার বোনা ;' কেননা ''তার জীবনের স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো। আশাবাদিতা জানিয়ে দেয় ফসলের দিন সামনে। তাকে কোনভাবেই আটকানো সম্ভব নয়। জীবন সংগ্রামের কঠিন ও বন্ধুর পথ নির্দেশ করে কবি বলেছেন— ''কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো।''

সময়ের ধর্মে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কঙ্কালসার হয়েও অসম্ভব প্রাণশক্তি নিয়ে পুনরায় উদ্ধার করবে সমাজের চলমান ধারা। সামনেই সফলতা আসবে। মানুষ আবার সময়ের রূপান্তরে সভ্যতাকে ধরে থাকবে।

'পদাতিক' কবিতার তৃতীয় স্তবকের স্বল্প পরিসরে কাম-প্রেম-বৈরাগ্য ও সংগ্রামের চেতনা প্রকাশ করেন কবি। মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি ও যৌন তাড়না দ্বারা অনেক সময় পীড়িত হয়। সেই কাম-ভাবনায় শ্রীমতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ উক্তিতে কবি বর্ণনাধর্মী ঢঙে প্রকাশ করে বলেন —

''শ্রীমতি, আমার অরণ্য-স্বাদ
মেটে এখানেই।
লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে............।'' (পদাতিক৩/পদাতিক)

প্রেম-কাম-স্বপ্ন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া। জৈবিক তাড়নায় ব্যর্থ প্রেমিক অনেক সময় নানা ঘাত-প্রতিঘাত-ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়। তখন সংসার ও জগৎ সম্পর্কে তার বিরাগ আসে। কবির কাছে এই বৈরাগ্য কাম্য নয়। তাও 'ওঁ তৎ সৎ' ইত্যাদি প্রলাপ বলে মনে হয়। এই কারণে সংসার ত্যাগ অর্থহীন মনে হয়। বরং কবি গভীর প্রত্যয় ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে ঘোষণা করেন —
''লাল ত্রাসে কাঁপে/গ্লেসিয়ার দিন। পেশোয়ারিদের /করকমলেই ভবলীলা শেষ।''(পদাতিক৩/ পদাতিক)

'পদাতিক' কবিতার চতুর্থ স্তবকের শুরুতে ডাস্টবিন শব্দের অনুবর্তী 'নির্জন' রাত্রের পূর্বে 'আগ্নেয়' শব্দ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখানে 'আমরা' বহুত্ববোধক পুরুষের পূর্বে 'নিষিদ্ধ' শব্দটিও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ভোগবাদী বণিক সমাজ, পুঁজিবাদী শোষক ও শাসক শ্রেণী নারীকে করে তুলেছে পণ্য। কবির সচেতন শিল্পীমনে ও দৃষ্টিতে এ বিষয়টি এড়িয়ে যায় নি —

''দেখেছি বৈষ্ণব বেনে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে,
অবশ্য নেপথ্যে চলে নিরামিষ নাচ আর গান।'' (পদাতিক ৪ / পদাতিক)

অবক্ষয়-ভোগ-লালসা-যৌনতা সারা বিশ্বের যুব শক্তিকে দুর্বল করে তোলে। সেই আশঙ্কায় মানব-মানবীর স্বপ্ন-বিলাস, কল্পনাময় রোমান্টিক চেতনা কবির অভীষ্ট ছিল না। ভোগবাদী, পুঁজিবাদী শক্তি আমাদের শ্রমের ফসল ভোগ করে ফুলে ফেঁপে নিজেদের আয়তন বাড়ায়। তারা যেন আজ 'সুপুষ্ট ঈশ্বর' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যুব শক্তিকে ফুর্তির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে দেখে কবির মনে বিস্ময় জাগে। কবি সেই যুব-শক্তির অপচয় সম্পর্কে বলেন —

''মৌমাছির মতো বসে কতিপয় নক্ষত্র নাগর

নিশাচর ফুর্তির চূড়ায়।.........................

তবুও আড্ডায় চলে মন-দেয়া-নেয়ার হেঁয়ালি।

প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবল-ডেকারে

(চাক্ষুস আমার দেখা) ফাল্গুনী কবিরা

অর্ধেক চাঁদের মতো কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।'' (পদাতিক৪/পদাতিক)

শিল্পী মানসের জীবন-প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই পংক্তি ক'টিতে। কবির প্রত্যয়-বর্তমানের শিশু সমস্ত বঞ্চনা, শোষণ ও পীড়নের অবসান ঘটানোর বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাই কবি বলেন — ''নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর।''

সমগ্র বিশ্বেই মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ঘটেছে। তাই সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। চীনা সৈনিক লড়াই করছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামকে কবি শাণিত বিদ্রূপ ও তির্যক পরিহাসের দ্বারা শিল্পিত রূপ দান করেছেন এখানে। কবি লিখেছেন —

''চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এখন

নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট ?

বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে —

মরণ রে, তুঁ হু মম শ্যাম সমান।'' (পদাতিক৪/পদাতিক)

আগ্রাসী ফ্যাসীবাদী শক্তি ও সাম্রাজ্যলোভী পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়ার মজদুর এক হবার চেষ্টা করছে। মিছিলে মিশে বিপ্লব ঘোষণা করছে। তাই কবি লিখেছেন—''উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন / ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে / বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে।'' (পদাতিক৪/ পদাতিক) সে সময় জাপান চীনকে আক্রমণ করে চলেছিল। সেই পটভূমিতে সমকালীন জাপানি কবি ইয়োনেজিরো নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) প্রচারিত মানবতার বাণী ও দার্শনিক চেতনা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুরধার তীর্যক উপহাস ও শ্লেষের ব্যঙ্গে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের 'অহিংস পরমো ধর্ম'— বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র — জাপানী কবি নোগুচি ও জাপানের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ কবির ভাষায় বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে — ''অহিংসা পরমো ধর্ম নীলবর্ণ শৃগালের দলে।

টাকার টঙ্কারে শুনি ঃ মায়া এ পৃথিবী।

জীবের সুলভ মুক্তি একমাত্র স্বস্তিকার নীচে।

সংগ্রাম নিশ্চিত, তবু মাসতুতো ভাইয়েরা

বিষম সন্ধিতে আজ কি চক্রান্ত চৌদিকে ফেঁদেছে !

আজকে এপ্রিল মাস, — (চৈত্র না ফাল্গুন?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভণে।'' (পদাতিক৪ /পদাতিক)

এখানে নোগুচিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠির উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯৩৭ সালের জাপানের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ একটি খোলা চিঠি লেখেন। কিন্তু জাপানি কবি নোগুচি-এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিশ্বমানবতাবাদী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোগুচির সেই পত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে লেখেন — ''আমি আপনার দেশের মানুষকে ভালবাসি, তাদের জয় কামনা করব না, আশা করব, অনুশোচনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ঘটবে।'' জাপানী আগ্রাসী নীতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় 'পদাতিক কবি'ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ উপহাসে আঘাত করে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

'পদাতিক' কবিতার পঞ্চম অনুচ্ছেদে কবির প্রত্যয়দৃপ্ত আশাবাদিতা ও দায়বদ্ধ কবিকণ্ঠ শোনা যায়। বলিষ্ঠ মানসে এখানে কবির ঘোষণা — ''গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাব / সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।'' (পদাতিক৫ / পদাতিক) কবি ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেদিন লেখনীকে হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন। তাই কবি লিখেছিলেন—''ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক''। কবি সাধারণের জীবনে আহ্বান করেছেন 'ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ'। কবি সংগ্রামী জীবন চেতনায় আনতে চান 'রৌদ্রের দিন।' কবি বিশেষ রাজনৈতিক চেতনায় উচ্চকিত কণ্ঠে এখানে ঘোষণা করেন —

''অরণ্যকে ছেঁটে দেবার দিন এসেছে আজ।
তবে, যুদ্ধ আজ।
রাজন্যের অনুকম্পা নেই,
প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন-ভঙ্গ।
বণিক প্রভু চোখ রাঙায়
কারখানায় বন্ধ কাজ।'' (পদাতিক ৫ / পদাতিক)

আর্থসামাজিক এই পটভূমিতে সংগ্রামী মানুষের আত্মশক্তির কাছে কবির জিজ্ঞাসা —

''উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে না কি
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে,'' (পদাতিক ৫ / পদাতিক)

এই বিশেষ বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় ও রাজনৈতিক জীবন-দর্শন থেকে বাংলা কবিতা পেল তীর্যক ভঙ্গি, অভিনব ভাব-ভাষা-সুর-লয় ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিমা। 'পদাতিক' হয়ে ওঠে একটি অভিনব ধারার সৃষ্টি।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে গভীরভাবে পরিচয় ছিল কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, কুমোর, মেহনতি মানুষের সঙ্গে। বিপ্লবী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দার্শনিক চেতনা প্রসুতে দায়বদ্ধতা থেকে কবি শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শহর, বন্দর ও গ্রামে শ্রমিক ঐক্য বাড়ানোর কর্মে সক্রিয় অংশ নেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কবি দেশ-বিদেশের ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান —

''ইতিহাস দেশ-বিদেশে ক্ষিপ্র কৃপাণ ;
বন্দরে দল গড়েছে শ্রমিক, গ্রামে কৃষাণ।'' (শ্রেষ্ঠীবিলাপ ৫ / পদাতিক)

এই শ্রমিক ঐক্য ভারতের ডান-পন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণী, বণিক শ্রেণী ও শাসক শ্রেণী ইংরেজকে তীক্ষ্ণব্যঙ্গ ও তির্যক পরিহাসে তৎকালীন বাম ও শ্রমিক আন্দোলন কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর লেখনীতে —''রোখো বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার কারা নিপাত ;
হে দীনবন্ধু, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত।'' (শ্রেষ্ঠীবিলাপ৫ /পদাতিক)

কবি অনায়াসে নির্দ্বিধায় ও বলিষ্ঠতায় লিখতে পারেন —

''কোটালের করকমলে সপেঁছি ধর্মঘট
উদ্ধত বুট ভাগ্যে জোটায় শুধু হোঁচট।'' (শ্রেষ্ঠীবিলাপ ৫ / পদাতিক)

কবির বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সংগ্রামী শিল্পীসত্তায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্টতা লাভ করেন। এই সংগ্রামী সাম্যবাদী রচনার ধারায় বিশিষ্ট কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র । কিন্তু এঁদের সঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকতায় পার্থক্য অনেক। তাঁদের সাম্যবাদী চেতনার ভিত্তি ছিল মানবিক সহানুভূতি। রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তাঁদের রচনার উৎস ছিল না। কিন্তু কবি সাম্যবাদের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণে বাস্তব অবিজ্ঞতা থেকে পেয়েছেন দ্বিধাহীন রাজনৈতিক জীবনদর্শন, কলানৈপুণ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐকান্তিক প্রয়াস ও বলিষ্ঠ

অঙ্গীকারকে সৃজনী কর্মে প্রতিফলনের দায়বদ্ধতা। এই চেতনায় কবি শ্রেণী সংগ্রাম ঘোষণা করে লেখেন— ''হে প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্ব করো গ্রহণ

তীক্ষ্ণ সঙিনে আজ ঘনিষ্ঠ অভিবাদন।।'' (শ্রেষ্ঠী বিলাপ / পদাতিক)

ব্রিটিশ শাসন, জমিদারী ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষ সংগ্রামী আওয়াজ তোলে। ফলে —

''এ-দুর্দৈবে জমিদারি রক্ষা দায়..............................।
ঈশ্বর চালান, চলি।''
যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকিতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা।...................
ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল....................................
ধনীদের তো পোয়াবারো।'' (অতঃপর/ পদাতিক)

কবি দূরদৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন ভারতের স্বাধীনতা। সেই প্রত্যয়ে তিনি লেখেন পালাবদলের ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও যে ধনিক শ্রেণী, পুঁজিবাদ, বণিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হবেন সাধারণ মেহনতি মানুষ, অসহায়ভাবে জীবন ধারণ করবেন সেই বিষয়টি শাণিত ব্যঙ্গে ও তীর্যক উপহাসে শিল্পিত রূপ দান করেন কবি সুভাষ —

''বিশেষত, - ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী, গৌরীসেন -ঢাকা।
ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়,................জমিদারি যায় যাক।
বণিকের মৌলিক প্রতিভা
দেশি শিল্পে মুক্তি পাবে।'' (অতঃপর / পদাতিক)

পুঁজিবাদ, ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যলোভীদের বিরুদ্ধে কবি সুভাষ জাতীয় গন্ডী উত্তীর্ণ করে আন্তর্জাতিক স্তরে বিপ্লবের ঢেউ তোলার প্রত্যয় অন্তরের গভীরে নিহিত রেখেছিলেন। ১৯৩৮ সালের বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে উজ্জ্বল ঘটনা জাপানের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসী নীতির শিকার চীন। চীনকে গ্রাস করার জন্য জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি গ্রহণ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স পড়ছিলেন। জাপানের এই ফ্যাসীবাদী আগ্রাসী নীতি তাঁর মনে গভীর তোলপাড় সৃষ্টি করে। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ পেল তাঁর ''চীন ঃ ১৯৩৮'' শীর্ষক কবিতা। এই কবিতায় তিনি সমকালের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমানসের আবেগকে ছন্দবাজ করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানের ফ্যাসিস্ট বাহিনী চীনের ওপর আক্রমণ চালায়। তারপর ২১ সেপ্টেম্বর চীনের ক্যান্টেন ও জানকিং শহরে বোমাবর্ষণ করা হয়। এই আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে ও চীনের

মুক্তি আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করে সারা ভারতবর্ষে সংগঠিত হয় গণবিক্ষোভ ও গণ আন্দোলন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের এই আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করে সমালোচনা করেন। জাপানের আক্রমণের বিধ্বংসীরূপ কবির ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে — ''জাপ পুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও'' অথবা ''জাপ পুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই।'' ইতিহাসের এই কলঙ্কিত ঘটনাকে বিষয় করে কবি সুভাষ বিপ্লবের পরিধি বিস্তৃত করলেন।

কবি সংশয়হীন প্রত্যয়দীপ্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন — ''কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুত্ব চাও লাল নিশানের নীচে উল্লাসী মুক্তির ডাক রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক। চীনের বিপ্লবী জনতার উদ্দেশ্যে কবির প্রতিরোধী আহ্বান —

'' জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও...

''মেরুদন্ডের কাছে ইপ্সিত খাড়া ইস্পাত
বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত'' (চীন ঃ ১৯৩৮/ পদাতিক)

চীনের উপদ্রুত জনতাকে উদ্দীপ্ত করতে কবি লিখলেন চীনে বিজয়ের পথ খোলা। সেখানে দিকে দিকে শ্যেণদৃষ্টি, পরজীবীদের নিষ্ঠুর লোলুপ চোখ চীনের দিকে। সেখানে উপদ্রুত জনতাকে তীব্র লড়াই ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কবির আহ্বান — ''প্রাক্‌পুরাণিক গুহাকে ডাকল ক্ষুরধার নখ, /কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন''(চীনঃ১৯৩৮/পদাতিক) বুকে সাহস সঞ্চার করার লক্ষ্যে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে কবির জিজ্ঞাসা—

''দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা বন্যার ঢেউ ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই।''(চীনঃ১৯৩৮/পদাতিক)

এই কবিতাটি কবির কাব্য-জীবনের বিশিষ্ট রচনা। এই কবিতা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর কথা — ''কোনো কোনো সমালোচক মনে করেছেন বোমা বর্ষণের এই আবহ রচনায় 'পুষ্পক' বা 'ফুলঝুরি' জাতীয় শব্দ বেমানান হয়েছে। কিন্তু প্রথমত, বোমাবর্ষণ আক্রমণকারী আর আক্রান্ত জনপদের কাছে একই আবহন্তরে বিবেচিত হয় না। দ্বিতীয়ত, পুষ্পকও তো দেবতাদের সেই বিমান যা বহু যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ফুলঝুরিও আসলে ফুল বর্ষণ করে না, বর্ষণ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বস্তুত, কবির কুড়ি বছর বয়সের কথা স্মরণ রাখলে বলতে হবে বাংলা কবিতায় এক সমর সেন ছাড়া এত অল্প বয়সে খুব বেশি বাঙালি কবি রাখতে পারেন নি।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়)

এই পর্বে চেতনালোকে রাজনৈতিক জীবনাদর্শের ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সৃষ্টি। এই রাজনৈতিক চেতনার মাঝে উঁকি দিয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতির হাতছানি কবিকে পথে চলার মন্ত্র দেয়। কবি ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন আসানসোলে পিসেমশায়ের বাড়িতে। সেইখানে লেখেন — ''সব থেকে দ্রুত ট্রেনে করে আজ

এখানে আসা।

— আসানসোলে।'' (এখানে / পদাতিক)

আসানসোলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন —'' পড়েছে ভেঙে, / পাহাড়ের পায় সারি সারি সব/ চিমনি চুড়ো।/এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়/ ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে/দিগ্বিদিকে —'' (এখানে / পদাতিক)

আসানসোলের এই পাহাড়-প্রকৃতি জড়িত শৈশবের স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন — ''উত্তেজনায় যা হয়। খুব ভোরে উঠে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে, হ্যাঁ পাহাড়ই তো। ছবিতে কত দেখেছি। কিন্তু চাক্ষুস এই প্রথম। বাড়িতে একটা সাইকেল ছিল। কেউ উঠে পড়বার আগেই পাহাড়টা চট করে দেখে চলে আসব। এই মনস্থ করে সাইকেলটা নিয়ে পাহাড় বরাবর রওনা হয়ে গেলাম। পথ সংক্ষেপ করার জন্য কখনও মাঠ ভেঙে, কখনও পায়ে চলা রাস্তায়। সাইকেল যত ছোটে পাহাড়টাও যেন পাল্লা দিয়ে পিছনে সরে সরে যায়। কলকাতার পাড়া গাঁয়ে এক পাহাড় এভাবে যে বোকা বানিয়ে দেবে, ভাবতেই পারিনি।

আমারও তখন রোখ চেপে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দামোদর পথ আটকে না দাঁড়ালে সেদিন যে আমার কী হাল হতো, বলা যায় না। পাহাড়ের নাগাল না পেয়ে খুব মন খারাপ করে বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। নতুন লোক। অচেনা জায়গা। কোনো বিপদের মুখে পড়িনি তো! ....সেদিনের সেই ভ্রমণ আমার মনে কিরকম দাগ রেখে গিয়েছিলো পরে ফিরে সে লেখা 'এখানে' কবিতায় তা ধরা আছে।'' (টানা পোড়েনের মাঝখানে, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯০)।

এখানকার উর্মিলা ভুঁই, বনহীন তেপান্তর, দুই দিকে দূর বালুদের দেশ, মধ্যে নদী পাড়ে পায়ে পায়ে চলার চিকন রেখা। এখানে নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও তারের বেড়া ; দূরে শিশু গাছ, ধানক্ষেত তার কিনার ঘেঁষে। এখানকার মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে আকাশ চুম্বী উঁচু উঁচু মিলের ধোঁয়া। এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে কবির অন্তরের যোগ। কবি খিদিরপুর ডক অঞ্চলের সাধারণের জীবনে আনতে চান বসন্তের ছোঁয়া। ডক অঞ্চলে জীবনদর্শন, চীনের বিপ্লব ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কবির ভাষায় — ''লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স নখাগ্রে আমার

উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যতম নেতা।
লক্ষ্য বড়ো ; ধরি তাই মহাত্মার ধামা ;
আনন্দ-ভুবনে খুঁজি মুক্তির উপায়।
প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠান্ডা ক'রে দিয়েছি কেমন ?
এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না ;
— ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর।'' (আলাপ / পদাতিক)

যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে নেতা, অথচ মার্কসীয় জীবন চেতনায় সচেতন নয়, কিন্তু নিজেকে বিজ্ঞ বলে ভাবেন, যাঁরা মহাত্মাকে না বুঝে অন্ধ অনুসরণ করেন, তাঁদের কথাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ও তীর্যক উপহাসে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি এখানে।

কবির সংগ্রাম মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। যাঁরা পুঁজিবাদ, জমিদার ও শাসক শ্রেণীর দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত তাঁদের চেতনায় ও রক্তে প্রতিরোধের আগুন জ্বালাবার লক্ষ্যে কলমকে হাতিয়ার করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কৃষকের শোষণের জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন 'ধাঁধাঁ' কবিতায় — ''মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে / সুখে ধরি গান ছেলে বুড়োতে। / একদা কাস্তে নিই সকলে।/ লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে / তারপর পালে আসে পেয়াদা। / খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধাঁ।।'' (ধাঁধাঁ / পদাতিক)

নিরন্ন, ছন্নছাড়া, হাড় হা-ভাতে মানুষ গুলোর বুকে সেদিন আশার সঞ্চার করেছিলেন কবি। তাঁর কবিতায় কেবল হতাশ ও করুণ অবস্থার কথা ধ্বনিত হয়নি, সেই দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায়ও তিনি দেখিয়েছিলেন— ''মন বিষন্ন; শরীর টলছে উপবাসে
নিরস্ত্র হাত, অসহায় মুঠি তুলি ক্ষোভে —
নিরুপায়ে চাই আকাশে, দেহে নেই আশা।
সহসা মাভৈ শোনাগেল চড়া সাইরেনে
স্বদেশে দিয়েছে চম্পট ভীরু বর্গীরা।
পান্থ প্রদীপ জ্বলে ওঠে যেই রাজপথে,
মোড়ে মোড়ে লাল ফতোয়ায় দেখি নব আশা!'' (ঘরে বাইরে/পদাতিক)

বাংলার বুকে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। বাজারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটজনিত খাদ্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন যুদ্ধে যে জয়ী হতেই হবে। সেই মহাযুদ্ধে কবি সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার শরিক হতে চেয়েছেন — ''ভীড়গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত

আমি / সংসার সমুদ্রে হালে পাই নাকো পানি। / তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই, / আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই।।''   (আর্য / পদাতিক)

এতকাল ভারতে চলেছিল ব্রিটিশের বাণিজ্য ও শাসন নীতি। সেই ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবসান ঘটিয়েছেন কবি তাঁর কবিতায়। কবি তাঁদের শাসন ও শোষণ শক্তির মৃত্যু ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায় — ''চলছিল এতকাল বেসাতি

নিরাপদে বেশ এ দাস দেশে

আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে

যমদূত দেয় ডুব সাঁতারে।''   (কিংবদন্তী / পদাতিক)

'পদাতিক' কাব্য বিশিষ্ট রচনা কবির জীবনে ও সেকালের বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায়। বাংলা কাব্যজগতে 'পদাতিক' ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-কৌতুকে-ছন্দচাতুর্যে এক আশ্চর্য ও অভিনব পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। ফলে বাংলা কবিতায় 'পদাতিক' নিয়ে আসে নতুন সুর, বিশিষ্ট ভাষা, স্বতন্ত্র ভঙ্গিমা, বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও প্রচন্ড আবেগ। ব্যক্তি মানুষের জায়গায় আসে সমষ্টি মানুষের চেতনার উদ্দীপনা। 'পদাতিক' বাংলা কাব্যজগতে নিয়ে আসে নতুন ধারার ও নব জীবনের এক অভিনব শিল্পরূপ। 'পদাতিক'-এর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শাণিত ব্যঙ্গোক্তি, প্রতিরোধ গড়ে তোলার মরণজয়ী প্রত্যয়, প্রতিবাদের বলিষ্ঠ, উচ্চকিত ও সহজ ভাষা। এই কাব্যের পঙক্তিতে পঙক্তিতে ধরা পড়েছে আন্দোলনের রক্তিম আহ্বান ও সংগ্রামের দৃঢ় মনোবল। কবিতাগুলিতে সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল স্বদেশ প্রীতি, আর্ত ও পীড়িতের হাহাকার। বঞ্চনা-নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তির আশাবাদিতা এই কাব্যের কবিতাগুলিতে শোনা যায়। শোষণহীন মেহনতি মানুষের নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন রয়েছে এই কাব্যের কবিতাগুলিতে। শ্রেণী-বৈষম্য মোচন করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয় এই কাব্যের কবিতাগুলিতে ঝংকৃত হয়েছে। জনসংলগ্নতা ও জনসংযোগের মধ্য দিয়ে কবির জীবন অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে গণমুক্তির রাজনৈতিক চেতনা।

রাজনৈতিক প্রত্যয় তাঁর 'পদাতিক' কাব্যের ভিত্তি ভূমি ও মৌল প্রেরণা। 'পদাতিক'-এর কবিতাগুলি কবির হাতে একদিকে যেমন বীণা হয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছে ; তেমনই অস্ত্র হয়েও জনসাধারণের চেতনলোকে আলোড়ন তুলে শোষণ-বঞ্চনা ও নীপড়নের বিরুদ্ধে খড়গ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কাব্যের শিল্প নৈপুণ্য বাংলা কাব্যজগতকে বিস্মিত করে তুলেছিল। কবি অরুণ মিত্র সে সম্পর্কে বলেন — ''তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য ছন্দ নিয়ন্ত্রণ এবং শব্দ প্রয়োগের নতুনত্ব প্রথম থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। (কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং)।এই কাব্যটিতে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে

রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে 'পদাতিক' সেনার রণধ্বনি। এই কাব্যের ভাববস্তু, মনোভঙ্গী ও শিল্পপ্রকরণের দিক থেকে সেকালে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় 'পদাতিক বিস্ময়কর ও অভিনব সৃষ্টি।

এই ধারায় তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য 'চিরকুট' (১৯৪১ — ১৯৪৬) এবং 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) 'চিরকুট' কাব্যে পঁচিশটি এবং 'অগ্নিকোণ' কাব্যে পাঁচটি কবিতা অন্তর্ভূক্ত। এই কাব্যগুলির মূল সুর 'পদাতিক' কাব্যের মতো রাজনীতি। পদাটিক কাব্যের কবি থেকে চিরকুট ও অগ্নিকোণ অনেক বেশী পরিণত। আলোচ্য চিরকুট কাব্যে ও অগ্নিকোণ কাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সমকালীন কয়েকটি রাজনীতি , জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। ব্যক্তি জীবনে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার ফ্যাসীবাদী বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তিরিশের দশকে বাংলা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। এই আন্দোলনোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুধী প্রেমচন্দ্ (১৮৮১—১৯৩৬), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১—১৯৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৮–১৯৪১), নন্দলাল বসু (১৮৮২—১৯৬৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী। ফ্যাসীবাদী অন্দোলনে এঁদের সঙ্গে সক্রীয় ভাবে যুক্ত ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ সাল থেকে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলার শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহল ১৯৪২ সালে ২৮ শে মার্চ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' গঠন করে। এই সঙ্গে সভাপতি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে। এর দু-এক বছর আগে থেকেই বিশ্বের রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সভা-সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৯ সালে ২১ শে জুলাই কোলকাতা টাউন হলে ফ্যাসীবাদের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেদিনের সেই সভায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদী আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে প্রগতিশীল সোভিয়েত সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। ফ্যাসিবাদী নাৎসী জার্মানী ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষ এই অন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ তীব্রতর করে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল জনযুদ্ধ, অরনি প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন ছাড়াও এই কাজের কবিতাগুলিতে কবি অন্তর্দৃষ্টিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে মন্বন্তর পীড়িত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কট ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে একটি বড় ধরণের ঝাঁকুনি দিয়েছিল সেদিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্টুপ এর ২৩ তম বর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় অনুরাধা রায় "পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেন —— শিল্পী সাহিত্যিকদের সেই ত্রান কার্যের সুর বাঁধতে আহ্বান করে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন এঁদের অনেককেই বাঁচিয়ে দিয়েছিল। অন্যথ্যায় হয়তো এঁদের অনেকেরই মানসিক মৃত্যু হত প্রচন্ড স্নায়বিক চাপে সৃষ্টি ধর্মিতার বিনাশ হত। কমিউনিস্টদের দায়বদ্ধতায় আদর্শ অনেক শিল্পী সাহিত্যিকের মধ্যেই একটা দায়িত্ববোধ জাগিয়েছিল। তারা বুঝিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের তান্ডব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুযায়ী মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া কমিউনিস্টদের নিরলস প্রয়াস যাঁরা চোখের সামনে দেখলেন, তাঁরা জানলেন, হালকা হয়েছে।

এ কাব্যের 'কাব্য জিজ্ঞাসা' কবিতার কবি মানসে কবি হৃদয়ের তৃপ্তি, সহজে উপলব্ধ হয়। জীবনের " মধু সমাপ্তির ক্ষীণ আশা নিয়ে পদাতিক কবি " নিরুদ্দেশে আকাশ বৃথা খুঁজি বাসা" এই জগতের সবই অনিত্য। কবি ও বিশ্বাস করেন সবই মায়া। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মায়ায় মানুষের শরীর ও মন বাঁধা। জগৎ ও জীবনের অর্থ কী , জীবনের কাঙ্খিত আশা কী — এ সবের জিজ্ঞাসা এই কবিতার কবিকে ভাবিয়েছে। অলীক ও অনিত্য এই গ্রহলোক কবির কাছে। কেননা তাঁর ইন্দ্রিয় গুলির ধাঁধাঁ নিয়েই নিজের অস্তিত্ব। চাই তাঁর নিজের অস্তিত্ব আপেক্ষিক। মায়ার জগতের খেলাঘর ভেঙ্গে গেলে ও সূর্য ডুবে গেলে দুই পারের সেতুর কোন অর্থ থাকে না। তার পরেও আবার আমি হীন। জগতের " পান্থ নীড় " মুখরিত হয়ে উঠবে। নিজেই নিজেকে চেনার চেষ্টা করেন তিনি। এজন্য পদাতিকের ছুটে চলার অবিরাম তীব্র গতিতে লাগাম টেনে ধরেছেন এই কবিতায়—" নিজেই নিজের ছায়ার পাশে

চমকালে মিছে, নিজেকে চিনে

নামাও বল্গা পিপাসু ঘাসে

রুক্ষ মাটিতে, মেঘলা দিনে।" (জিজ্ঞাসা২ / চিরকুট)

নিজেকে এতকাল ভাসিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কতকালই বা ভেসে বেড়ানো সম্ভব। কবিরও জিজ্ঞাসা—"শুধুই ধুম্র ইচ্ছাধীনে / কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে" (জিজ্ঞাসা২ / চিরকুট) তীব্র চলার গতি, বিপ্লবের আমরণ দৃঢ়তা উচ্চকিত কবি কন্ঠে এসেছে বিষণ্ণ সুর। জগৎ ও জীবনকে ভালোবাসার আহ্বান সহসা তার অন্তরাত্মা থেকে শুনতে পেয়েছেন—"তাই বিষন্ন তোমাকে দেখে / হঠাৎ পেলাম ইশারা কোনো / হালকা-স্বভাব হৃদয় থেকে—/ হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আজকে শোনো / তোমকে

সঁপেছি শরীর, মনও / সেদিন চোখের মুকুরে রেখে। / ... ... যদি কিছুকাল যুগলে কাটে / ঘরমুখো মন হবেই তবে। (জিজ্ঞাসা২ / চিরকুট) কবি নিজেকে সপে দিয়েছেন ভালোবাসার জন্য জগৎকে জীবনকে ও মানুষকে, ভালোবাসার আহ্বান জানিয়েছেন—" আমার মতে,

এসো আজ এই জটিল পথে

ঠিকানা বদলে প্রণয় খুঁজি।" (জিজ্ঞাসা২ / চিরকুট)

কবি 'হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে' নিয়ে জগৎ ও জীবনকে পরিমাপ করতে চান। জীবনে আপাদ মস্তক রাজনীতিতে ডুবে থেকে কবি রচনা করতে চেয়েছে কাব্যের জগৎ। কিন্তু রাজনীতি তাকে সেই লক্ষ্য থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে। কবি বলেন—"ছড়ানো দৃশ্যের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ /রচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে, ভেঙেছি শপথ— /বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী, /মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি, /কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে, /পুরন অভ্যাসবশে চিরুনির পণ্ডশ্রম টাকে । (জিজ্ঞাসা৩ / চিরকুট) রাজনৈতিক জীবন দৃষ্টি সর্বদা এক পাক্ষিক হয়। সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তি অন্য ধর্মের রাজনীতি থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখে। কবি তার রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি চারণে বলেন—

"একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়-হরিণী,
তোমার উষ্ণতা দিল বাষ্পময় আমাকে শরীর
উচ্ছল পর্বতগাত্রে, ধর্ম তাই উদ্দাম নদীর;
তবুও তুষারচক্রে পিঠে একি জরাগ্রস্ত কুঁজ—" (জিজ্ঞাসা৩ / চিরকুট)

একদিকে জীবনের প্রবাহমানতা অন্য দিকে পিঠের কুঁজের মতো জরতা জীবনকে কন্টাকিত করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অপশাসনের অবসান ঘটানোর আভাস দিয়েছেন কবি। তাই তিনি লেখেন 'পাঠালো নিষ্ঠুর সূর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়ানা/ আমাদের মোমের টুপিতে।" কবি ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং তাঁর জীবনের রাজনৈতিক মত্ততার স্থানে কাব্য সত্য রচনার ডাক অন্তর্মন থেকে শুনতে পান কবি। তাই তিনি লেখেন—"দূরে দেখ হাতছানি সংঘবদ্ধ মাঠের সবুজ, / ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে / উদ্যত সঙিন দিকে দিকে।" (জিজ্ঞাসা ৩ / চিরকুট)

সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার আহ্বান করেছেন তিনি। কেননা সচেতন সন্তানদের বুকে পরাধীন দেশ মাতার গ্লানিতে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে দেশবাসীকে একবার পাড়ায় পাড়ায় জ্বলে ওঠার আহ্বান করেন কবি —

"জাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হু হু

মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো

আহা উহু।" (জিজ্ঞাসা ৪ / চিরকুট)

দেশে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি কলাবিদ্‌দের অলিক স্বপ্নে রোমান্টিকতায় বিভোর হয়ে চাঁদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে থাকা এক প্রকারের পলায়নতা। কাপুরুষতার ভীতি এখন আর শোভা পায় না। সচেতন শিল্পীকে আজ দুর্দিন সময়ে সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। তাই কবির কণ্ঠে উচ্চকিত সুর— "ভাঙল চিবুক - ঠেকানো হাতের নিদ্রা/বাগানে শুক্‌নো কঙ্কালসার বৃক্ষ / খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা ? / গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।/ .... কাপুরুষ ভয় আনব না মোটে গ্রাহ্যে। / বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে — / প্রাণ বাঁচানোর নেই কো সহজ পন্থা;" (কাব্যজিজ্ঞাসা ৫ /চিরকুট)

কবি আকাশে বাতাসে গ্রাম-গ্রামাঞ্চল ,শহর, বন্দরে , চেতন মনে উপলব্ধি করেন আসন্ন লড়াইয়ের পদধ্বনি। কবি শুনতে পান প্রকৃতির পদধ্বনি। কবি অন্তর্মন দিয়ে দেখতে পান প্রকৃতির রুদ্র রূপ। তাঁর ভাষায় — " বাতাস পিঠে চাবুক হানে / আকাশ আনে বজ্র / শান্তি কবে ফুঁকেছে শিঙে"। (কাব্যজিজ্ঞাসা ৬ /চিরকুট) সাধারণের মিলিত শক্তিকে কবি আহ্বান করেন। সেই মহাশক্তিতে পা মেলাবে 'মজুর-চাষা' ও অন্যান্য 'মুক্তিদাতা' মানুষ। তাঁদো সম্মিলিত শক্তি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কালোবাজারী পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানার ঘোষণা করেন কবি—

"একলা নই, মিলিত হাত

আজ আঘাত হানবে।

মুক্তিদাতা মজুর চাষা—

নতুন আশা সামনে।

চলোনা কবি মিছিলে মিশি—" (কাব্যজিজ্ঞাসা ৬ /চিরকুট)

কবির দৃঢ় অঙ্গিকার লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ এবার বিদ্রোহের রূপে জ্বলে উঠবে। কবির শিল্পী স্বত্তায় সমাজ - দায়বদ্ধতা স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত হয়ে ওঠে— " আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি, / খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ / লক্ষ বুকে রয়েছে খনি, / কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ। / আমরা নই প্রলয় - ঝড়ে অন্ধ।।" (কাব্যজিজ্ঞাসা ৬ /চিরকুট)

কবি সমাজ বদলের জীবনদর্শনে লেকনিকে হাতিয়ার করেছেন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত গ্রামীন জীবনের নিদারুণ অসহায়তা রোমন্থন কবিতায় তুলে ধরেছেন। চরম আর্থিক অনটনে "গৃহে

গঞ্জনা"। পরিবারের " অন্দরে দাবদাহের ছাই" । দ্ররিদ্র ও অসহায় কৃ ষক - শ্রমিক- খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে এক হয়ে কবি সুভাষ বলে, " কাজ মেলেনি কো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,"। বেকার কিষাণেরা 'সকাল সন্ধ্যে গড়াগড়ি' দেয় 'গাছতলাতে'। তারপর এক সময় প্রকৃতির তান্ডব চলে আসে বাংলায়। আসে প্রাবন। চরম দূর্দশা নেমে আসে বাংলার ঘরে ঘরে। গৃহস্থ্ বাস্তুহারা হয়। ঘরে ঘটি বাটি, থালা বন্ধক দিয়ে পেটে এক মুঠো ভাত দেয় । একে একে গ্রামের মানুষ স্বজন হারা হয় —

" জমিজমা গেছে ; শেষে বন্ধক থালাবাসন;
যমের দুয়োরে একে একে যায় আপনজন ।
বাল্যবন্ধু ছিল যারা, গেছে নিরুদ্দেশে—
অখ্যাত ফুলে রাস্তা ঢেকেছে কাঁটার বন"। (রোমন্থন / চিরকুট)

এই কবিতায় চিত্রকল্পময়তায় আমরা দেখি গ্রাম শূন্য— চলাচলের পথ আগাছা ও জঙ্গলে পূর্ণ— সামান্ন একমুঠো ভাত বা একটুখানি ফ্যানের জন্য গ্রামের মানুষ শহরে ভিড় করে। শহরে গিয়ে ওরা সারাদিন হন্যে হয়ে ঘোরে কাজের সন্ধানে। দূর্যোগে বিদ্ধস্থ্ বাংলার গ্রামীন আর্থ- সামাজিক ছবি অঙ্কনে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ও সচেতন শিল্পীমানসের পরিচয় দেন — "গলির গোলক - ধাঁধায় যেখানে ঘোরে জনতা, / কর্মখালির আশা বুকে নিয়ে বিষণ্ণতা / সারাদিন শুধু সিঁড়ি ভাঙে , চাঁদে হাত বাড়ায় / —কে মনে রেখেছে , গরিব গ্রাম্যজনের কথা!" (রোমন্থন / চিরকুট) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদার মহাজন, সুদখোর, প্রভৃতি শোষক, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মানুষ গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করেছে— " গ্রামে তো রয়েছি, কই কোথাও

জীবনের নেই নামনিশানা
উপবাসী চাষা, ধান উধাও
মহাজনদের পন্থা জানা।" (গ্রাম্য / চিরকুট)

কবির দৃঢ় মনোবল বাংলা এই সংকট কাটিয়ে উঠবে। নতুন করে সোনালী দিনের প্রত্যাশা ও আহ্বান করেছেন তিনি। কবির অর্ন্তজগৎ স্বপ্ন দেখে নতুন দিনের। তাঁর কথায় — " শুনেছি, সূর্য মাঠের কোণে / আকাশে সোনালি স্বপ্ন বোনে, / চাঁদ দেখে মুখ দিঘির কাঁচে , / হৃদয় হালকা হাওয়ায় নাচে।" (গ্রাম্য / চিরকুট) সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদী পুঁজিবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে কবি হাতিয়ার উচিয়ে

রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির গভীর আত্ম বিশ্বাস একবার সামগ্রিকতার লড়াই সংঘটিত হবে। কবির বলিষ্ঠ আহ্বান — " তারচেয়ে এসো ধরি কুঠার

শত্রু পরখ করুক ধার।" (গ্রাম্য / চিরকুট)

এই চরম সঙ্কটে কবি সুভাষ মুখোপাধায় সেকালের সাহিত্য সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজ মানসিকতার সামাজিক ছবি 'চিরকুট' কাব্যের 'ভুতপূর্ব' শীর্ষক কবিতায় এঁকেছেন। যাঁরা কেবল নিজের সৃষ্টিকে সত্য বলে জানে, অথচ সামাজিক প্রেক্ষিকে বা সমাজের দায়বদ্ধতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেখতে নারাজ, তাঁদের ভিত্তিহীন দূর্বলচিন্তনকে শিল্পরূপে তুলে ধরেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় । যাঁরা বলেন "কল্পনা আমার প্রজা; মগজের আমি জমিদার, / সেখানে বিশেষ কোন ঘটনার মানি না প্রভাব । (ভূতপূর্ব / চিরকুট) তাঁরা সমকালের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। ঘটনার প্রভাব ও জাগতিক ধর্ম তাঁদের সৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলে। তাই তিনি লিখেছেন— " যুদ্ধ এলো, অগ্নিমূল্য, একি দেখি স্বপ্নের অভাব।" (ভূতপূর্ব / চিরকুট) মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে পীড়িত, বিশ্বযুদ্ধ যখন বাজার করাল গ্রাস করেছে সে সময় স্রষ্টা কাল্পনিক ও রোমান্টিক ভাববিলাসিতায় স্বপ্ন দেখতে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। মানুষ কঠিন বাস্তবকে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নেয়। ব্যক্তি জীবনকে বাঁচাবার ও সামগ্রিক জাতির মুক্তি সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনের এক বিশেষ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেই সত্যতায় মানুষ বলে ওঠে " এ জগতে ভাই কার কে ? ' (ভূতপূর্ব / চিরকুট) সেই সব পীড়িতকে সংগ্রাম; প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সামিল করার আহ্বান জানান কবি।

তিনি 'মুখবন্ধ' শীর্ষক কবিতায় সেই বিশেষ প্রত্যয়, সমাজ বাস্তবতা, দায়বদ্ধ ও সামগ্রিক কালকে ধরেছেন কবি। সেই লক্ষ্যে বিশেষ তাৎপর্যবাহী রচনা হয়ে উঠে 'মুখবন্ধ'। 'মুখবন্ধ' -এ দেখা যায় "লড়াই চলছে দেশে"। তার পরিণাম ও প্রতিধ্বনি কবি শুনতে পান 'ভিক্ষা কাণ্ডে'। কবি প্রত্যক্ষ করেন— সাধারণত গৃহস্থ 'জীবনে দিচ্ছে হানা/ উপবাসী অপমৃত্যু।" — প্রকৃতির নিষ্ঠুর অভিঘাতে একদল সুযোগ সন্ধানী স্বার্থান্বেষী অর্থ পিশাচ নির্লজ্জ ভাবে নির্বিকার থাকে। তারা কৃত্রিম অভাব তৈরী করে। মানবতার চুড়ান্ত সংকটেও যে তারা স্বার্থে অন্ধ হয়ে ভোগলিপ্সায় লিপ্ত থাকে । তাদের উদ্দেশ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন — "স্বরাজে সেলামী মিলবে; প্রভুরা পেটায় ঢাক। / অধুনা সরস ঘুষ জিভে, অহো ! বন্ধ বাক্ ।।" (মুখবন্ধ/চিরকুট)

মানবিকতার অপমানে বসে থাকা অন্যায় এবং কবি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ । তিনি একজন দায়িত্বশীল রাজকর্মী ও সংগঠক । অন্যায় , শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য কবির

"তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে যাওয়া আসা।" কবির গভীর বুকে ও চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস। কেননা গ্রামে জাগছে চাষা । মিছিল , সভা সমিতি ও দলের সাংগঠনিক কাজে কবির বুকে গভীর আত্মবিশ্বাশ জন্ম নেয় । সব শ্রেণীর মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে । কবি প্রত্যক্ষ করছেন সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছেনা । কবি যেন অন্তমনে দেখতে পাচ্ছে আগামী দিনের শুভদিন আসছে । সেই অবস্থায় যেন প্রত্যক্ষ করছেন 'অনাগত কোন দিনের দুপাশে মেলেছে ডানা ' সংগ্রামী সহজ মানুষ আর "বীর বসে তাই কাঁপে ব্যরাক , প্রেট পল্টন , জালিমানওয়ালাবাগ প্রয়োগ আজ , গভীর প্রত্যয় ও উচ্চআশাবাদিতা ইতিবাচক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন কবি ।

' চিরকুট ' কাব্যের চলচিত্র কবিতাটিতে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গ ও বিশ্বের আন্তরজাতিক প্রেক্ষিত ছবির মত আমাদের মানসপটে প্রতীয়মান হয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধবিমানের সাহায্যে বোমাবর্ষনের ছবি তুলে ধরেছেন তিনি —

"হাওয়াই রথ হঠাৎ দিল হানা
অগ্নিবাণ ছড়ান চার পাশে।" (চলচ্চিত্র / চিরকুট)

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিনতি হানাহানি ও লুটপাত কবির সচেতন কবি হৃদয়কে আঘাত করেছিল। আন্তর্জাতিক পটভূমির সঙ্গে এই কবিতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে পরাধীন ভারতের স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ, গান্ধীজির নেতৃত্বে অসিংহ আন্দোলন ও দেশভক্তির প্রকৃতি। এই কয়েকটি পংক্তিতে কবি স্বদেশ প্রেমের অন্তসার শূন্যতা তীর্যক শ্লেষের ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ ক) " নাম রটে গেছে নিধিরাম সর্দার / বাজার চলতি দেশ সেবার এ হাল" (চলচ্চিত্র / চিরকুট) খ) "যখন পরাস্ত গান্ধী, আসন্ন স্বরাজ। / সব্যসাচী আমি, বিনা অস্ত্রে বাজি মাৎ— / ভেদাভেদ নামেমাত্র ডাইনে আর বাঁয়।" (চলচ্চিত্র / চিরকুট) গ) "অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার /দেশ ভক্তি আমাদের সওদাগরি চাল।(চলচ্চিত্র / চিরকুট) ঘ) " কেবল অভাগা আমরা; লড়াই পালিয়ে / দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।" (চলচ্চিত্র / চিরকুট) এখানে কবি কপট দেশভক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। কবি যেন শুনতে পাচ্ছেন সামনা - সামনি সংগ্রামের পদধ্বনি। কবির ঘোষণা — "অই! যুদ্ধের আওয়াজ ত্রিবর্ণ নিশানা গেল কেল্লায় এবার"; এবার কবি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাই কবির দৃঢ় অঙ্গীকার " যা হবে হবার, এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার।"

ইংরেজ কেবল ভারত নয় , পৃথিবীর অনেক দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল না । সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা তাদের জাতীয় ধর্ম। তারা বিশের বিভিন্ন দেশে আগ্রাসী থাবা বসিয়ে ছিল। কিন্তু আজ সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত্ নড়বড়ে হয়ে গেছে। কবি 'শত্রু' শীর্ষক একটি কবিতায় লিখেছেন —

" সূর্য অস্ত যায় না এমন রাজ্যে—

সম্প্রতি বুঝি টলায়মান সে - ভিত্তি !)" (শত্রু / চিরকুট)

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ভারতের যথার্থই শত্রু। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তোষামোদ করে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশের সংগ্রামী ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ইংরেজকে মন্ত্রণা দেয় সেইসব ভারতীয়দের কবি জাতীর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায় —

" চিনেছি শত্রু, রয়েছি প্রভুর পক্ষে

নতুবা শাসন চলতো ভগ্ন স্বাস্থ্যে)"। (শত্রু / চিরকুট)

কিন্তু অন্যায় আঁতাতের বিরুদ্ধে মানুষ সরব হয়েছেন। সর্বস্তরের সাধারণের মিলিত কাস্তে হাতুরির শক্তিতে সাধারণ বেঁচে থাকার বদলে কবি বিশ্বাস করেন। সাধারণের বেঁচে থাকার অধিকার তারা লড়াই করে টিকিয়ে রাখবেন। তাই কবি লিখেছেন —

"গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্তে

বাঁচবেই গণতন্ত্র এই যা রক্ষে—

যুদ্ধের ধার শুদবে হাতুড়ি কাস্তে।" (মুখবন্ধ / চিরকুট)

লড়াইয়ে সামিল হবার জন্য সাদারণ কাস্তে ও শান দেয়। তাঁরা হাতুরি উঁচিয়ে হুঙ্কার তুলুক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাবধান করতে চান। তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার —

" ঐক্যবদ্ধ জনতার হুংকৃত জোয়ারে

চোখের পলকে ভেসে যাবে

অহংকৃত মুখের চুরুট।" (আহ্বান /চিরকুট)

কবি পরাধীন দেশবাসীকে আহ্বান করেন। পরাধীনতার গ্লানি , কালোবাজারী, পুঁজিপতি ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল আহ্বান করেন কবি। 'আহ্বান' শীর্ষক কবিতায় তিনি

লেখেন — " নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগন; / শৃঙ্খলিত সেনাপতি; / তাই ব'লে আমাদের শূন্য নয় তৃণ।।" (আহ্বান /চিরকুট)

কোটিজনের হাহাকার নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ, দুর্ভিক্ষে পিড়িত খেটে খাওয়া সাধারণের মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান করেছেন কবি সুভাষ। আহ্বান শীর্ষক কবিতায় তিনি তাই লেখেন— "ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ যোগালো / বিষম বিক্ষোভ , তাই / লাঙ্গলে কাটে না মাটি, দুর্বল দুহাতে শ্লথ মুঠি / বস্তির গলিত প্রান্তে ওঠে হাই— / অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি। / কোটিকণ্ঠে গান স্তব্ধ; নিরুদ্যম নিস্তেজ ধমনি।" (আহ্বান /চিরকুট) কবির সচেতন দৃষ্টি ও তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিতআন্তরিকতা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় মানুষের প্রতি শিল্পীত আঙ্গিকে রূপায়ণের উৎকৃষ্ট প্রয়াস এখানে লক্ষণীয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঔপনিবেশিক করা ও পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনে কবি সুভাষের শিল্পী মানস ছিল আপোসহীন। তিনি ছিলেন সংগ্রামী শিল্পী। সমাজতন্ত্র কায়েম করা ছিল এত পর্বে তার শিল্পী মানসের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। সে কাজে তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছিল ধারালো অস্ত্র। এই পর্বে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমাজবাদী শিল্পী। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক অশ্রু কুমার সিক্‌দার যথার্থ লিখেছেন — " আসলে চল্লিশের বেশী ভাগ কবির মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিবিবেকের যে সামাজিক বিবেক প্রখর। সেখানেই তাঁর শক্তির উৎস — .... জীবনের অন্তিম জয় সম্বন্ধে তার আশার শেষ নেই।" আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় — অশ্রু কুমার শিক্‌দার, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭০)। সে সমাজের পরিধী বহুদুর বিস্তৃত। সে সমাজ তাঁর নিজের দেশ ও দেশের বারি‌ে গোটা পৃথিবী জুড়ে সর্বশ্রেণী মানুষের সমাজ। এই দৃষ্টান্ত তাঁর " চীনঃ ১৯৪১ " শীর্ষক কবিতাটি। 'চিরকুট' কাব্যের এই কবিতাটিতে তিনি আন্তর্জাতিক ও জাগতিক সকল পীড়িত বঞ্চিত সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

এই কবিতাটি জাপানের ফ্যাসীবাদী ও আগ্রাসী মনোভাবের প্রতিবাদে রচিতা। এতে চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন গণবাহিনীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও একাগ্রতা তাঁর উচ্চ ও উদার হৃদয়ের শিল্পী সত্ত্বার নিদর্শন। ১৯৩৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনকে পদানত করে। বিস্তৃত চীন দখল করে ফ্যাসীবাদী জাপান । এই ঘটনার প্রতিরোধ করার প্রবল ইচ্ছা ও মনোবল ছিল না সেদিনের চিয়াং কাই শেক (১৮৮৬ - ১৯৭৫) কুয়োমিনো তামাং সরকারের। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট গণবাহিনীর লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক ১৯৪০ সালের মধ্যে ফ্যাসিস্ট জাপানের হাত থেকে চীনের অনেক অঞ্চল দখল করে নেয়। এবং ১৯৪১ সালের শুরুতে আগ্রাসী জাপানও প্রতি আক্রমণ চালায় গণ বাহিনীর উপর।

এমতবস্থায় কমিউনিস্ট গণ বাহিনী ও চীনের বিখ্যাত গোরিলা বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিরোধ বিপ্লব সংগঠিত করে। এই ঐতিহাসিক সত্যের পটভূমিতে রচিত চীন ঃ ১৯৪১"। চীনের বিপ্লবী গণ বাহিনীর বিজয় উল্লসিত কবি - হৃদয়ের প্রকাশ কবিতাটির শুরুতেই—

" শত্রুপক্ষ হার মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃত চিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দূরন্ত প্রতাপ—
বিভক্ত প্রবাহ মেলে;
ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ ।" (চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট)

আগ্রাসী জাাপান ভয়ে সন্ত্রস্ত। কেননা চীনের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, বন্দরে - বন্দরে, মাঠে - ঘাটে, খেতে - খামারে, হাট- বাজারে অরণ্য - পর্বতে গন বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হয় তারা। গড়ে "— ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর। বিপ্লবী চীন যেনা ' বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ—'। কবি প্রত্যক্ষ করেন যে বিপ্লবীদের— " শরীরে সঙিন ফোটে, / রক্তের ফোয়ারা ছোটে, / আকাশের নীচে ওঠে প্রতিধ্বনিঃ / এ দেশ আমার।" (চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট)

শয়তানের দম্ভ ভাঙ্গে; দিকে দিকে শাসানো তর্জনী দুর্জয় প্রকারের।" এই বিপ্লবে সম্মিলিত সাধারণের সর্বশক্তি জোট বদ্ধ হয়েছে। কবির জিজ্ঞাসা এই শক্তির দুহাতে শিকল পরানোর সাহস ও সামর্থ হবে কী জাপানের ? চীনের গণ শক্তি আজ জাগ্রত। কবির ভাষায়— "এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ; / কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাটের সবুজ। / অতর্কিত গোরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে / শত্রুর হৃৎকম্প জাগে;" (চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট)

জাপানের এশিয়ার বুকে দাপিয়ে বেড়ানোর লুব্ধ দুরাশা ভেঙে যায়। চিনের দিকে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। দিকে দিকে চীনের সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়। জাপানের আগ্রাসী শক্তিকে করবে পুঁতে দেবার শপথ নেয় সমগ্র চীন। রক্তাক্ত আন্দোলনে ও বিপ্লবীদের ভীষণ পদক্ষেপে মুখরিত হয়ে উঠে চীন। "চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর। সমগ্র চিনে গড়ে উঠেছে প্ররোধ আন্দোলন। কবি সুভাষ লেখেন— " প্রতিরোধ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন; /হাত তোলে বজ্রমুঠি, / বুকে খনিগর্ভের আগুন। / ইতিহাস প্রতিশ্রুত; কাঁধে কাধঁ মিলিত জীবনে , / ক্রান্তি দিন গোনে।" (চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট)

কবি উল্লসিত হৃদয়ে বিপ্লবী চীনের প্রতি একাত্মতা উপলব্ধি করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন— ' হে চীন! তোমার পাশে আমি। / শত্রুপক্ষ হার মানে / বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।" (চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট) বিপ্লবের মধ্যদিয়ে চীন হয়ে উঠল ভৌগোলিক সীমারেখার গন্ডি উত্তীর্ণ করে বিপ্লবের দিক প্রদর্শক। কবির ভাষায়— " সিঙ্গাপুর, রেঙ্গনের পথে পথে রক্ত দেয় চীন—

ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির;"(চীনঃ ১৯৪১ / চিরকুট)

কাল্পনিক, রোমান্টিক ও প্রেমভাবনাহীন ঐতিহাসিক সত্য নির্ভর সমাজ সচেতন শিল্পীর হাতে চীন ঃ ১৯৪১ কবিতাটি অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঘটনাশ্রয়ী ইতিহাস কালের গতিতে পুরানো হয়ে যায়। কিন্তু এ কিবিতাটি শিল্পীর উচ্চ শিল্প দক্ষতার গুনে কালজয়ী হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে ঐতিহাসিক ঘটনা লেখকের বিশিষ্ট জীর্ন দর্শনে বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। কবির বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশেষ সময়ের বিশেষ কোন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা কবিতার বিষয় করে তাৎপর্যবাহী কবরে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন কবি। আগ্রাসী ফ্যাসীবাদী শক্তি জাপান চীনের পর এশিয়ার অন্যান্য দেশে আগ্রাসী থাবা বসানোর চেষ্টা করে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ জাপানের হাতে রেঙ্গুনের পতন হয়, পরের মাসে ৬ই এপ্রিল জাপান ভারত ভূখন্ডে বোমা বর্ষন করে। এই সময়কালে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করে ভারতের কমিউনিস্ট ছিল। তারা মনে করেন যে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে একসঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু সে সময় অনেক ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্রব ভালো মনে মনে নেন নি। যে ইংরেজ ভারতকে পরাধীন করে রেখেছে সেই বিদেশী শক্তিকে তখন সাহায্য করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি ইংরেজকে দেশের শত্রু বলে বিবেচনা করতেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের মানুষ। এই শত্রুর বিরুদ্ধে কবি আওয়াজ তোলেন " জনযুদ্ধের গান" শীর্ষক কবিতায়। কবি উচ্চকণ্ঠে দস্যুদলকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন—

"বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ। (জনযুদ্ধের গান / চিরকুট)

জাপানকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। এই জাপান এখন ভারতসহ সমগ্র এশিয়ায় আগ্রাসী নীতি নিয়েছে। চীনের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে জাপানকে প্রতিহত করার জন্য। চীনের গোরিলা শক্তির কাছে জাপান পরাজিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনা কবির ভাষায়— " একলা তবু তো পাঁচ বছর /

চীনের গেরিলা লড়ছে জোর, / তাইতো শহরে গ্রামে কবর / পাচ্ছে জাপ বহ্র।" (জনযুদ্ধের গান / চিরকুট) কবি চীনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের জনশক্তিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। জাপান, ইংরেজ যে কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে। কবি মৃত্যু পণ লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির মতে আগামী দিনের নাগরিকের দিক নির্দেশের জন্য কবি আহ্বান করেন। কবি লেখেন—

" আমরা নইতো ভিরুর জাত
দেবো নাকো হতে দেশ বেহাত,
আজকে না যদি হানি আঘাত
দুষবে ভাবী সমাজ।" (জনযুদ্ধের গান / চিরকুট)

' দেশ বেহাত ' না হতে কবি জন জাগরণের তাগিদ উপলব্ধি করেছেন। আগ্রাসী দেহ আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি রয়েছে এখানে। কবি লিখেছেন —

" এদেশ কাড়তে যেই আসুক,
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক,
তৈরি এখানে কড়া চাবুক,
চলছে কুচকায়াওয়াজ।" (জনযুদ্ধের গান / চিরকুট)

এই কবিতায় গভীর দেহাত্মবোধ, সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবির আবেগ ভঅযার সঙ্গে চড়া সুরে বেজে উঠেছে। এই কবিতাটি অন্য একটি গুরুত্ব হল সেকালে ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকদের মুখে মুখে গীত হতো। এটি উৎকৃষ্ট গণসঙ্গীত হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবিতাটি প্রথমে প্রাচীর তীর্ষক কবিতা সংকলন ও 'জনযুদ্ধের গান' শীর্ষক গীতি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেকালের সমাজ প্রেক্ষিতে 'জন যুদ্ধের গান' কবিতা জনজাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল।

ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন ঔপনিবেশিকতা ঔ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রসূত কবি সুভাষের চিরকুট কাব্যের একটি অন্যতম্ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।" সাপ্তাহিক অরনি প্রত্রিকায় ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে সোভিয়েত সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় । কবিতাটির প্রথম অনুচ্ছেদেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাস দিয়েছেন কবি। শুরুতেই লিখেছেন—

"নিষ্ঠুর কালের মুঠি—

ভেঙেছে ঘটনাচক্রে ছত্রপতি মন্ত্রীর ফিকির,
একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভিছে দেউটি,
ব্যর্থ সব দুধ কলা, কালসর্প হয়েছে করাল,
অবশেষে রাজ্য বানচাল।" (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

ন্যাৎসী হিটলারের আগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইউরোপে জার্মাণীর দৌরাত্ম প্রতিহত করার জন্য রাশিয়ার কমিউনিজম ভীতিও আশঙ্কার জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হিটলারের সঙ্গে মিউনিক চুক্তি করে ১৯৩৮ সালে ২৯ শে সেপ্টেম্বর। এই চুক্তির ফলে চেকোস্লাভিয়ার সুদেতেন ল্যান্ড জার্মাণীর হাতে চলে যায়।

ইউরোপে এই ভূখন্ডই হিটলারের শেষ দাবি হিসেবে মেনে নেয়। হিটলার অঙ্গীকার করেন যে, এর পর আর আগ্রাসী নীতি মেনে নেবেন না। অথব ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ জার্মানী চোকোস্লাভিয়া দখল করে নেয়। ফলে মিউনিক চুক্তি ভেঙ্গে যায়। এজন্য কবি বলেছেন হিটলারের একে একে কুচক্র দেখা দেয়। ইউনিকের চুক্তির সম্ভবনা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধে কারণ হিসেবে কবি চিহ্নিত করেছেন সেই সব মানুষের উন্মত্ত হিংসা যারা পুরাণের শকুনির মতো। এদের পাশবিক নৃশংসতা ও মানবতাহীন স্বার্থপরতার কারণে বিশ্বের মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের ফলে " তরে থরে শোভা যাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুর"। এই ভয়াবহতা কবির শিল্পী মানসে দৈত্যের সঙ্গে পুরাণ প্রসিদ্ধরণচন্ডীর মহাসংগ্রামের ছবি ভেসে উঠেছে, তিনি লিখেছেন— "শকুনির নখরে নখরে / উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে। /ক্রমে তার আত্মঘাতী লোভ। /বিপ্লবের রক্তিম ভূগোলে / বিস্ফোরক রূপসজ্জা খোলে। / আকাশে , সমুদ্রে, স্থলপথে / থরে থরে শোভা যাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুর, / অরণ্য পর্বত কোণে রণচন্ডীর গাজোয়ার নহবতে আজ / আদিম গুহার সুর। / সারি সারি ট্যাঙ্ক আর চাকারক্রেঙ্কার,..." (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

কবি দ্বিতীয় বিহ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এখানে তুলে ধরেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্ভিক্ষের করাল প্রকোপ। বিশ্বপ্রেক্ষিত ও জাতির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেন কবি সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদলের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

"কর্কশ হ্রেষায় ওঠে একদিকে হিংস্র গর্জন—

অপহ্নরণের পেশা নির্বোধ দস্যুর নেশা..."

(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

কবি বিশ্বের লুণ্ঠনকারী ঘৃণ্য দস্যুদলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান — " আরেক দিগন্তে জ্বলে ঘৃণায় শাণিত প্রতিরোধ / পদতলে স্থলিত শৃঙ্খল, / ঘরে ঘরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল— / সংঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্রখচিত সমারোহ / মুক্তির প্রহরী আজ।" (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

কবি অন্তর্মনে মুক্তির ডাক শুনতে পাচ্ছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল আলগা হয়ে গেছে। জনসাধারণ মুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য গন সাধারণ সংঘবদ্ধ জনতার ক্ষিপ্র জাগরণ। পরাধীন ভারতীয় চীনের গোরিলা মুক্তিতে উদ্বুদ্দু হয়ে উঠেছিল। ভারতের মাঠে -ঘাটে হাঁটে, বাজারে মুক্তির ডাক প্রতিধ্বনি তোলে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ইত্যাদি সকল স্তরের মানুষ "দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গীকার বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত' করতে থাকে। কবির দৃঢ় প্রত্যয় বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চকিত হয়ে তাঁর লেখনিতে ঝরেছে। কবি লিখেছেন— " এখানেও তাই আজ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার; / সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন / মুক্তির পদাঙ্ক রাখে। / আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র আগুন / আমাদের রক্তে এসে লাগে।" (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

কবি আজ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে দুর্জয় প্রাকার গড়ে তোলার জন্য। কবি আত্মোৎসর্গ করে দেশমাতার প্রতি নিজেকে নিবেদন করার পবিত্র কর্মে উৎসর্গ করতে চান কবি। কবির রক্তে মুক্তির ঢেউ লেগেছে। বিশ্বাসঘাতক প্রভুকে এশিয়া থেকে বিদায় জানায় মানুষ। অগণিত প্রজা সাধারণ দোর্দন্ড প্রতাপে আর্তনাদ করে ওঠে মাঞ্চু রিয়া, কোরিয়া, মালয় ও বর্মা। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষ জাগ্রত আজ। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস—" গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত গণতন্ত্রে কবর। " পুরাণের দধিচীর প্রসঙ্গ এখানে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন কবি। কবি লিখেছেন —

"দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচীর হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।।" (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার / চিরকুট)

দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে অনুকম্পাহীন ব্যক্ত করেছেন কবি সুভাষ সীমান্তের চিঠি শীর্ষক কবিতাটিতে। কবি সংগ্রামের জন্য দেহমাতার প্রত্যেক সন্তানকে

আন্তরিকতায় গহ্ণ করেছেন। তিনি দেশমাতার সঙ্গে গণসাধারণকে অভিন্ন করে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন —

" তোমর সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।
পর্বত দাঁড়ায় পাশে
অগ্নি বর্ণ বনের সবুজ;
—এখানে প্রস্তুত আমি,
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ।" (সীমান্তের চিঠি / চিরকুট)

কবি সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শত্রু শিবিরে আঘাত হানার কথা বলেছেন। কেননা কৃষক, শ্রমিক, কামার, তাঁতি ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর মানুষ একাত্ম হয়ে প্রতিরোধ শক্ত করার কথা বলেছেন কবি। তাঁর ভাষায়— "তোমরা অক্লান্ত কর্মী মাঠে মাঠে, / তোমাদের হাতের ফসল / ক্ষুধিত মজ্জা য় মিশে / আমাদের বাড়ায় কদম। / শত্রুর শিবিরে হানি / তোমার হাতের বজ্র।" (সীমান্তের চিঠি / চিরকুট) কবি দিগ-বিদিক দেখছেন জনগাগরণ। উপলব্ধি করেছেন সাধারণ দেশবাসীর হৃদকম্প। হৃদয়ে জ্বলছে শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন। এবং তিনি অর্ন্তদৃষ্টিতে দেখছেন, যেন শত্রু নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। কবি লিখেছেন — "শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে— / এখানে আমার মনে / জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা। / শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি / জীবনদক্ষিণা।" (সীমান্তের চিঠি / চিরকুট)

এই কবিতায় ফ্যাসিবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশ্বযুদ্ধের সংকটে, মুনাফাবাজ, পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার মন্ত্র শোনাতে চেয়েছেন কবি। সেই সঙ্গে শ্রেণী বৈষম্য ঘুচিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় এই কবিতায় শুনিয়েছেন কবি।

'চিরকুট' কাব্যের অন্তর্গত 'চিরকুট' শীর্ষক কবিতাটি কৃষক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট, বস্ত্র সংকট বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত। জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব সত্যকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কবিতাটি রচিত। কবিতাটির গঠণ ভঙ্গি অভিনব। জমিদারকে সতর্ক করে নিত্যান্ত অভাবগ্রস্ত প্রজা নিজের বাঁচার তাগিদে চূড়ান্ত পত্র লিখছে। কবিতাটির প্রথম অনুচ্ছেদে জমিদার বাবুকে খাজনা মানের আবেদন সিদ্ধান্তের ঢঙে প্রকাশ — "শতকোটি প্রণামান্তে

হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ সন

ছিটেফোঁটাও ধান নেই।" (চিরকুট / চিরকুট)

এসব খাজনা মাপ করবার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে এই কবিতায়। মাঠ-ঘাট, খাল-বিল; ফুটি ফাটা ও শুকনো। মানু' বুনোশাক পাতা খেয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করে চলেছে। এমত অবস্থায় বিনয়ের সঙ্গে প্রজা সাদারণের সিদ্ধান্ত এবছর খাজনা মুকুব করে দিতে হবে। কবির ভাষায় — "মাঠে ঘাটে কপাল ফাটে / দৃষ্টি চলে যতদূর / খাল শুক্নো, বিল শুক্নো /চোখের কোলে সমুদ্দুর। /হাত পাতবো কার কাছে কে /গাঁয়ে সবার দশা এক / তিন সন্ধ্যে উপোষ দিলাম /আজ খাচ্ছি বুনো শাক। " (চিরকুট / চিরকুট) বাংলার দুর্ভিক্ষের করুণ ও হৃদয় বিদারক চিত্র কবি সুভাষ সহজভাবে ও আটপৌঢ়ে ভাষায় তুলে ধরেছেন। এখানেবাংলার ও দেশের খাদ্য সংকট প্রাধান্য পেয়েছে। এই কবিতার পরের অনুচ্ছেদে। কবি লিখেছেন — "পরনে যা আছে তাতে / ঢাকা যায়না লজ্জা / ঘটি বাটি বেঁচেছি সব /আছে বলতে ছিলো যা।" (চিরকুট /চিরকুট)

খাদ্য সংকট পীড়িত ও বস্ত্র সংকটে দুর্গত সাধারণ মানুষ মহারাজকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে যে তাঁর পাইক বরকন্দাজ যে দুর্দিনে পাওনা আদায় করতে আসে না। পরিস্থিতি কারণসহ উল্লেখ করে হাজার হাজার প্রজা জানিয়ে দিয়েছে যে, কেমন করে বাঁচা যায় সেই দুর্দিনে তার উপায় খুজছে তারা। বাঁচার জনয লড়াই করছে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় তাদের উপর জুলুম করলে তারা এইবার আগুন হয়ে জ্বলে উঠবেন। এখানে আগুন শব্দের মধ্যে তাৎপর্য নিহিত করেছেন কবি। তাঁর ভাষায় — " পেট জ্বলছে, খেত জ্বলছে / হুজুর, জেনে রাখুন / খাজনা এবার মাপ না হলে / জ্বলে উঠবে আগুন ।।" (চিরকুট /চিরকুট)

সেই দুর্দিনের ছবি কবি সুভাষ জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন 'এই আশ্বিনে' নামক কবিতায়—

"পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
উঠোনের এককোণে
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা ।" (এই আশ্বিনে / চিরকুট)

দুর্ভিক্ষের ফলে হাট-বাজার, শহর-বন্দরে মৃত্যু জালে বন্দী মানুষ। নিষ্ফলা অন্ধকারে মানুষ। অবক্ষয় হয়েছে মানুষের মানবিক ও সহানুভূতি জীবনাদর্শ। কঙ্কাল সার হার বেরুনো মানুষ শহর

-বন্দরে জঞ্জাল স্তুপের ন্যায় ভীড় করে। উপবাস কক্ষ হাড় নিয়ে দুর্গতি মানুষ মৃত্যু সাথে লড়াই করে করে ধুঁকছে। ছেলে তার মাকে হারাচ্ছে, মা তার সন্তানকে; স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়ে হাহাকার করছে। তাই কবি বলেন— "শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা/ ত্রয়োতির আরাধ্য সিঁদুর। দুর্গত এই ছবি আঁকার মধ্যে কবি সুভাষের স্বদেশ প্রীতি ও দায়বদ্ধ সমাজ চেতণা ফুটে উঠেছে। এই সংকট ও গভীর অন্ধকারের ভেতর থেকেই মানুষ মানুষ তার বাঁচার উপায় নেবে বলে কবি মনে করেন। কবির ভাষায় —

"অনুর্বর অন্ধকারে ঢাকা,
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।" (এই আশ্বিনে / চিরকুট)

জীবন যুদ্ধের সংগ্রামে মানুষ জয়ী হবে। চরম আর্থিক সংকট থেকে, খাদ্যের সংকট থেকে, দূর্ভিক্ষের বয়াবহতা থেকেই মানুষ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। কবি "এই সংকট পীড়িত মানুষের দুরন্ত মনের ইচ্ছা /আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে।" কবি ভারতবাসীর জীবনে আবার প্রাণশক্তির জয়। কবি প্রচন্ড আশাবাদিতার সঙ্গে লেখেন — "মরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে / নেমে আসে অস্থির জোয়ার; / করাঘাতে খুলে যায় / জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।" (এই আশ্বিনে / চিরকুট)

কবির মনে দৃঢ় প্রত্যয় যে, সংকট পীড়িত মানুষ জীবন যুদ্ধে জয়ী হবেই। আবার তারা জয়ের মুকুট মাথায় পরবে — "উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ ফাঁপে, / রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে / যেনো কোনো কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুত! / দিকে দিকে ছুটে যায় দূত / জয়ের পতাকা হাতে, / মাটি পাতে সবুজ আসন, / দুহাতে পরায় সূর্য / জীবনের মাথায় মুকুট।" (এই আশ্বিনে / চিরকুট)

নিজেকে জয়ী প্রমান করার জন্য কবি সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান করেন। প্রচন্ড প্রত্যাঘাতে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেন তিনি — " কাঁধে কাঁধে সান্নিধ্যে দাঁড়াও / হাতে হাতে বজ্র হানো / ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও— / শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন।" (এই আশ্বিনে / চিরকুট)

এখানে , 'শৃঙ্খল' এবং 'কলঙ্ক মোচন' শব্দ দুটির মধ্যে ভারতে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি চেতণা ব্যাঞ্জিত হয়ে উঠেছে । মুক্তির জন্য ক্ষমাহীন বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়ার আহ্বান জানান কবি। সোভিয়েত দেশে লাল ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে উজ্জীবিত কবি মন 'এই আশ্বিনে' কবিতায় উপবাস ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন।

দূর্ভিক্ষ পীড়িত স্বদেশ এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কবির অবস্থান, কবির রাজনৈতিক চেতণা প্রসূত কবিতা 'স্বাক্ষর'। এই কবিতায় সমকালীণ ভারতীয়ের মুক্তি চেতণা এবং ঐক্যবদ্ধ

মানুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই কবিতার বিষয়বস্তু। এখানে কবির শিল্পী মানুসে জাতীয়তাবেরধের উচ্চকিত জীবন প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। পুঁজি পতি, মজুতদারে কালোবাজারী স্বার্থান্বেষী মানুষকে কবি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাদের চিনিয়ে দিতে কবি লিখেছেন —

"দরদীর ছদ্মবেশ ধ'রে
শহর বন্দরে গন্ডগ্রামে গঞ্জে ঘোরে
শত্রুর দালাল,
এক হাতে বন্ধ রাখে অন্ধকার ঘরে
লক্ষ মণ চাল;"   (স্বাক্ষর / চিরকুট)

কবি বলেছেন যে এই সংকটের মধ্যে মানবতার চূড়ান্ত অবক্ষয় দেখা দেয়। মানুষ "ধুঁকে ধুঁকে মরে।" অভিশপ্ত সংকটে পড়ে মানুষের মর্মান্তিক দুর্দশায়ভোগে। ব্যক্তি জীবনে কবি বাংলার এই হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জীবনের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন — " সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে / জীবনস্পন্দনশূন্য নিশ্চল শরীর।/ চোখে তীব্র অভিযোগ, / ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির; / ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার / কঠিন দস্তুর অভিশাপ। .... ছিন্নভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার; / মর্মন্তুদ এ দগ্ধ মেদিনী।" (স্বাক্ষর / চিরকুট) ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কবির মরণজয়ী সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা মনে ছিল। তিনি জাতির শৃঙ্খল মুক্তির প্রবল বিশ্বাস মনে রাখতেন। শত অভাব আর লড়াইয়ের মাঝে মানুষ জয়ী হবে। মানুষ লড়াই করে তার বিধির লেখনকে জয় করে নেবে। মানুষ সমস্ত সংকট পরাধীনতা থেকে মুক্তির পরিখা নির্মান করে। অভাব ও অত্যাচারের প্রতিরোধ গড়ে তোলে —" দেশ তবু ম'রেও মরে না; / দশ হাতে ছোড়া তাঁর মৃত্যু বাণে / নিয়তি নিহত।/ হাতে হাত বেঁধে তুলে আনে / মুক্ত আঙিনায় বন্ধ ঘরের ফসল। / পথে নিরন্নের ত্রাণে সেবাব্রত, / প্রতিরোধ পরিখা প্রাকারে।" (স্বাক্ষর/চিরকুট) অর্ন্তদৃষ্টিতে কবি অনুভব করেন "আগুন্তুক দিনের" ফসলের "পদধ্বনি"। কবির "বুকজোড়া বিপুল বিস্বাস"— খেটে খাওয়া মানুষের হাতের মুঠোর আবার আসবে ঐশ্বর্য্যের খনি। কবি ইতিবাচক দৃষ্টিতে জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তি যেন প্রতযক্ষ করেন। শৈল্পিক চেতণায় এক রঙিন স্বপ্ন কৃষকের নবান্ন উৎসব দেখার। তাঁর প্রতিজ্ঞা সেই স্বপ্নকে সত্য করে তোলার। কবি লেখেন —

"জীবন ছড়ায় মাঠে বীজমন্ত্র,
অসংখ্য লাঙল

নবান্নকে ডাকে।

যদিও সম্মুখে ঝড়,

ভয়ে কন্টকিত বিপর্যয়,

তবু জানি আমাদের জয়,

অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি দশ হাতের স্বাক্ষর"। (স্বাক্ষর/চিরকুট)

'পদাতিক কবি' ফ্যাসীবাদ, পুঁজিবাদ মজুতদার , কালোবাজারী, সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে শিল্প প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন 'স্বাক্ষর' শীর্ষক কবিতায়। কবির বিশ্বাস সম্মিলিত গণসাধারণের শক্তিকে রোধ করার শক্তি আজ আর কারো নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রান্তীয় শ্রেণীর মানুষকে ভিটে মাটি শূন্য করেছে। আবাদের ফসল কেড়ে নিয়েছে। তাই কৃষকের নিত্য উপোস। কোন কৃষক আজ আর একা নয়। তারা আজ মিছিলে সামিল। 'স্ফুলিঙ্গ' শীর্ষক কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —— " একা নই, আছে সঙ্গে পাথুরে পেশি হাজার—/হাতে হাত বাঁধা, চড়া গলা, পায়ে জোড় কদম,/দুচোখে সূর্য ক্রমেই প্রখর; ভেঙেছে ভ্রম—— /শত্রুর টুঁটি ছিঁড়বে এবার নখের ধার।" (স্ফুলিঙ্গ / চিরকুট) গ্রাম - শহর - বন্দর আজ মুমূর্ষ। বর্গীর ভয়কে তাই আজ এসেছে। ওদের "পুঞ্জিত ক্রোধে রক্তে হিংস্র জ্বলে অনল।" তারা আজ কাউকে পরোয়া করে না। এমন কি দৈবকেও নয়। কবির চেতণায় ছিল গভীর জাতীয়তাবোধ তিনি শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবাইকে একবার একসঙ্গে জ্বলে ওঠার আহ্বান করেন। তিনি লেখেন ——

"রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার ;

ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়

হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার ?

ওঠে আগুনের হল্‌কা ক্ষিপ্র ছুটে চলায়।।" (স্ফুলিঙ্গ / চিরকুট)

ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং চীন, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে 'স্ত্যালিনগ্রাড' শীর্ষক কবিতাটি তাঁর অভিনব সৃষ্টি প্রতিভার নিদর্শন। কবিতাটি নান্দনিকতায় ও নির্মান কৌশলে তাঁর উচ্চ শিল্প প্রতিভার নিদর্শন? এই কবিতার শীর্ষনামে লিখিত আছে একটি মরণজয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। সেদিক থেকে এই ধরণের কবিতা সৃষ্টি মূলে কবি মানসে একটি উদ্দেশ্য মূলকতা ক্রিয়াশীল ছিল। কেবল সেই কারণে এই কবিতাগুলিকে দূর্বল বলা অযৌক্তিক। এই সম্পর্কে সমালোচকসুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন। " রচনা শৈলীর দিক

থেকে অতৃপ্তি পাঠকের মনে কখনো কখনো থেকে গেলেও কবিতাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু প্রায় সর্বত্রই সাধিত হয়েছে। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত কবিতাগুলিকে দূর্বল বলতে পারিনি আমরা।" (আধুনিক বাংলা কবিতায় দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী , দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ , পৃষ্ঠা ১৩৪ - ১৩৫)

এই কবিতাটিকেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দূর্বল সৃষ্টি নয়। এই কবিতার ইতিহাস জার্মানীর ফ্যাসীবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য রাশিয়ার স্তালিন গ্রাডের জনসাধারণের বীরত্বের ইতিহাস। ১৯৪২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হিটলারের ফ্যাসীবাদী সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী স্তালিন গ্রাডের নগরীকে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে।নাৎসি সেনাবাহিনী এক মাস ধরে অনবরত আক্রমণ চালিয়ে যায় স্তালিন গাডের ওপর। কিন্তু সাম্রাজ্য বিজয়ী জার্মাণ বাহিনী অনবরত সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালিয়েও স্তালিনগ্রাড দখল করতে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা দখলকারী নাৎসি বাহিনী স্তালিন গাডের লাল বাহিনী আমরণ লড়াই করে স্তালিন গাডের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লাল ফৌজ সেদিনের স্তালিন গাড নগরীকে বাস্তবে একটি প্রতিরোধী দূর্গের রূপ দিয়েছিল। কাঁটা তার, মাইন, ট্যাঙ্ক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেদিনের স্তালিন গ্রাড একটি অপরাজেয় শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হয়েছিল। আর সেই নগরীর আপামর জন সাধারণ নারীপুরুষ ভেদাভেদ হীন শ্রেণী বৈষম্যহীন এক একটি দক্ষ সৈন্যের ভূমিকা নিয়ে লড়াই করেছিল। ফলে শক্তিশালী জার্মান বাহিনীর বিজয় রথ স্ত্যালিনগ্রাডের পদপ্রান্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ইউরোপের যনযুদ্ধের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মর্যাদা পায় স্ত্যালিনগ্রাড। শুরুহয় একটি নতুন অধ্যায়। এরপর ১৯শে নভেম্বর ১৯৪২ সালে রুশবাহিনী পাল্টা আঘাত হানে ফ্যাসিবাদী নাৎসি বাহিনীর ওপর। শেষে ১৯৪৩ সালেব. ৩১শে জানুয়ারী জার্মান জেনারেল কন পাউলুস (১৮৯০— ১৯৫৭) রুশ বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পন করতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত কবি সুভাষের 'স্ত্যালিন গ্রাড।" স্তালিন গ্রাডের লাল ফৌজের মরণজয়ী সংগ্রামে উচ্ছ্বসিত কবি লেখেন—"এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো" স্ত্যালিনগ্রাডের যুদ্ধকে পুরাণের কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছেন কবি। কবি রাজ্যলোলুপ ন্যাৎসি বাহিনীর আক্রমনকে নির্দেশ করতে লেখেন —

" বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকাব বিদ্যুৎখচিত;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।

ছুটে আসে পঙ্গপাল শত্রুর জোয়ার—
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুঝলকিত কামান, সওয়ার।
লুব্ধ চোখে ঝলসায় আগুন;" (স্ত্যালিনগ্রাড/চিরকুট)

কিন্তু সেই পাশবিক আক্রমণকে প্রতিরোধ করে দেশপ্রেমের পয়া ইতিহাস রচনা করে স্তালিন গ্রাড নগরীর জনতা। কবির ভাষায় —"প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী /দাঁড়ায় নগরদুর্গে। /দেশপ্রেম ধমনিতে, বিশ্বাবোধ ধ্যানে; / ক্ষিপ্র গতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু।" (স্ত্যালিনগ্রাড/চিরকুট)

স্ত্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ সেদিন বিশ্ববাসীকে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের পথ নির্দেশ করা যায়। নগরীর লক্ষ লক্ষ জনতা প্রাণ তুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় নগরীকে একটি অপরাজেয় শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করে। ফলে প্রতিহত হয় সাম্রাজ্যলোলুপ ফ্যাসীবাদী নাৎসি বাহিনী । তারা লজ্জায় মুখ ঢেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কবি লিখেছেন—" ফেরে লুব্ধ পশু / মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা;/ প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যুআতঙ্কিত, /স্তালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর; / তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে / মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষরা।।" (স্ত্যালিনগ্রাড/চিরকুট) এখানে"মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষর।" পঙক্তির মধ্যে কবি স্ত্যালিনগ্রাড বাহিনীর জীবনপণ সংগ্রামকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ।

প্রাণতুচ্ছ প্রতিরোধ পরিখা–প্রাকার নির্মাণ করে চলেন পদাতিক কবি ভেতরে–বাইরে। বিশ্ব পটভূমিতে কবি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে চীন, রাশিয়া প্রভৃতি নানা জায়গার বিপ্লবীদের শরিক হয়ে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে স্বদেশের মুক্তি চেতণা, মন্বন্ত লাঞ্ছিত স্বদেশের মর্মান্তিক ছবি কবিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। 'চিরকুট' কাব্যের 'স্বাগত' কবিতাটিতে তাঁর স্বদেশ প্রীতি ও মন্বন্তর - লাঞ্ছিত স্বদেশে বিপর্যয় প্রতিরোধ করার গভীর প্রত্যয় বাঞ্ছিত হয়েছে। ইতিবাচক জীবন চেতণা নিয়ে সঙ্কট উত্তীর্ণ করার স্বপ্ন দেখান। তিনি এরজন্য কৃষক ইত্যাদি মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার কথা বলেন। বর্তমানে গ্রাম প্রাণ শক্তি হারিয়েছে। কিন্তু এক সময়ের গ্রামীন সুখী জীবনের স্মৃতি তাঁকে বেদনাতুর করে তোলে। গৃহস্থ সুখ ও শান্তিতে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের উজ্জ্বল ছবি তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, তাঁর মনে হয় গৃহস্থ বাড়ির তুলসী মঞ্চে প্রদীপের আলো। মনে পড়ে ধান ক্ষেতের পাশ ধরে রাখালের গরু ধুলো উড়িয়ে চলার ছবি। মনে পড়ে গৃহস্থ বাড়ি গৃহবধূ ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার ছবি। মনে পড়ে সন্ধ্যেবেলায় শুভ শঙ্খ ধ্বনি। তিনি স্মৃতি চারণ করেন তাঁতির তাঁত চালানো, কলুর ঘানি ঘোরানো, কুমোড় পাড়ার হাঁড়ি, কলসী তৈরী করা, কামারের হাতুরী পেটানো, হাপর চালানো, শীতের আমেজ নিতে চন্ডী মন্ডপের কোলে আগুন তাপানো পরিবেশে–মাঠের সোনালী ধান

গুচ্ছগুচ্ছ করে বেড়েওঠা। কিন্তু গভীর দীর্ঘশ্বাস কবির কাছে এগুলি এখন অতীতছবি মাত্র। সহসা এক কঠিন বিপর্যয় সাধারণের জীবনে নেমে এসেছে। গ্রামের মানুষ অস্থি সজ্জা শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে একটু ফ্যানের জন্য শহরে গিয়ে ডাস্ট বিনের এঁটোকাটা ঘেটে প্রাণের জন্য সংগ্রাম করছে। কবির ভাষায় ——

" গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—

শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,

ধান - বোনা জমি আছে পড়ে।

শুকানো তুলসীর মঞ্চে

নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,

আগাছায় ভরেছে উঠোন

....

ঝাঁপ বন্ধ নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানি,

হাতুরি বিকিয়ে হাটে

ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।

যে পথে কামার গেছে

কে জানে সে পথের খবর ?" (স্বাগত / চিরকুট)

যে কারণে আজ গ্রাম শূন্য, গ্রামীন জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন, সে খবর ক'জন রাখছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবিকতা তলানি ঠেকে গিয়েছে। তাই কবির জিজ্ঞাসা যে পথে চললে সাধারণ কৃষক, কামার, কুমোর-তাঁতি ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষ পূনর্বার তাদের স্বাভাবিক জীবন পেতে পারে সেই পথের দিশা কে দিতে পারে। কে তাদের জন্য লড়াই করবে। কবি সর্বসাধারণের কার্তুণ ছবি সাহিত্যে তুলে ধরে মানুষের বিবেক জাগ্রত করতে চান। তিনি ইতিবাচক স্বপ্ন দেখেন , পূর্বে প্রাণবন্ত গ্রাম্য জীবন শহরে বিপন্ন মানুষকে আবার গ্রাম আসার আহ্বান জানাচ্ছে। কবি স্বচ্ছল গ্রাম্য জীবনকে 'স্বাগত' জানান এই কবিতায়। আবার কৃষক - শ্রমিক কামার, কুমোর- তাঁতি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার ধন সম্পদ স্বাগত জানান। তিনি অর্ন্তদৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করছে গ্রাম আবার কঙ্কাল সার, অস্থিচর্ম সার মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান করছে ——"দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে, /মাঠের সোনালী ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে। / দুচোখ প্রতীক্ষা তার / স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে। / ডাক ওঠে শহরে শহরে। / রাস্তার

শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে; / মাঠের ফসল দিন গোনে। / নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান— / মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে /ধান আর ধান।।" (স্বাগত / চিরকুট)

এখানে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট জীবনবোধ সহজে অনুমেয়। তিনি শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি কৃষককে এবং নিরন্ন দুর্ভিক্ষ প্রীড়িত মানুষকে তার শৈল্পিক নৈপুন্যে উৎসব মুখর, সুখ-ঐশ্বর্য্য ও আনন্দপূর্ণ এক জীবনে উন্নীত করেন। আজ তাদের নেত্র তাই মুগ্ধ। এই শ্রমজীবী মানুষকে 'মাঠের সম্রাট' আখ্যা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে । কবির এই জীবন প্রত্যয় ও মানবিক চেতনা সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ আঘাতে , দুর্ভিক্ষের কালো শকুনির ছায়ায় অরুন্তুদ মানুষগুলির মাঝখানে তাঁর কবিতা খুঁজে পেল নিজের অধিষ্ঠান ভূমি। তিনি এবং আমরা সেই সময়েই বুঝলাম উজ্জ্বল চক্চকে পঙ্‌ক্তি নয়, চতুর নাগরিক বিন্যাস নয়, যে-অর্থ, যে meaning তাঁর কবিতা সঞ্চারিত করতে চাইছে তা হল প্রত্যক্ষ 'মানুষ'।" (বাংলা কবিতার কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ,২০০৮, পৃষ্ঠা ২৩০)

দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন মানুযের কষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভীষণ পীড়িত করতো। নিরন্ন দেশবাসীর প্রতি কবির গভীর একাত্মতার প্রকাশ পাওয়া যায়। বাংলার ১৩৫০ - এর দুর্ভিক্ষে গ্রাম -বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। চিরকুট কাব্যের বর্ষশেষ কবিতায় তাই কবির জিজ্ঞাসা — কোন ভবিষ্যতের দিকে মানুষ? তার জিজ্ঞাসা মানুষ যে গভীর অন্ধকারের মধ্যে কাঁটার মধ্যে দাঁড়িয়েছে এ কোন প্রতিশ্রুতির পরিণাম? কবি বলেন— প্রেম আজ ভুলেছে শপথ।" শপথ অটুট রাখতে না পারার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ লক্ষ্য কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। ভারত মাতার " ভাগ্য আজ হয়েছে বধির।" কবির অটল বিশ্বাস নিজের ভাগ্য জয় করার শপথ ভুলে বসে আছে। তাই তাঁর " ভাগ্য লক্ষ্মীও বধির।" কবি গ্রাম বাংলার দুর্দশাগ্রস্থ করুণ ছবি আঁকতে লিখেছেন —

" চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা জমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে,
রক্তলোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে।
দিশাহীন জীবনের গোলকধাঁধায়,
দুমুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে।

ভিটা শূন্য প'ড়ে,

আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধূলি।

ক্রূর অট্টহাসি খেলে

সওদাগরি ডিঙায় ডিঙায়।" (বর্ষশেষ / চিরকুট)

কিন্তু দুষ্টের দমন অবশ্যম্ভাবী। কবি দেখেছেন "ওঠে সূর্য দেশে দেশে/ রক্তপদ চিহ্ন তার/ দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়।" কবির দৃঢ় বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদী , পুঁজিবাদী শক্তি ও কালো বাজারী শক্তির দেয়ালে দেয়ালে টলিয়ে দেবার শক্ত ঢেউ এসে লাগবে। চীনের মুক্তি যোদ্ধা ও সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট সেনারা ফ্যাসীবাদ ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 'রক্ত পদ চিহ্ন' রেখেছে। সেখানে মুষ্টিবদ্ধ হাতের শক্তি জয়ী হয়েছে। কবির আত্ম প্রত্যয় দেশমাতার সন্তান একবার জেগে উঠলে, সেখানে— "তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ / বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ / অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টিঝড়ে— /কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ, / আগে চলো, আগে! / অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে। / পর্বতের চোখে জাগে সাড়া—/ আকণ্ঠ ধূমায় বহ্নি /টেলে ওঠে অনর্গল লাভা। /বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—/ আকাশে আকাশে ফোটে অরক্তিম আভা। / লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে / অন্ধকার যবনিকা দুহাতে সবায়।" (বর্ষশেষ / চিরকুট)

কবির বিশ্বাস সম্মিলিত মানুষ একবার জেগে উঠে রুখে দাঁড়াবে। এই শুভক্ষণে অন্ধকার পর্ব দূর হবে। এই গভীর জীবন প্রত্যয় কবি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানসচক্ষে যেন আরও মধুর ও শিল্পীত মাধুর্যপূর্ন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি—প্রেম ও দেশাত্মবোধ একযোগে অন্যায়—অত্যাচারী, ফ্যাসীবাদী মানুষের বিরুদ্ধে রুখেদাঁড়াচ্ছে। এতে কবির জীবন দর্শন বিশিষ্ট বোধে আমাদের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সার্বিক বঞ্চ নার প্রতিবাদ করে কবি সর্বশ্রেণীর মানুষ কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষা নেবার চেষ্টা ছিল। কবি আবেগপ্রবণ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি আর্ত মানুষকে ঝান্ডা উড়িয়ে লড়াইয়ে সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছেন—

" পালাবার পথে ধূলো- ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই

আমিও ছিলাম একজন, আজ প্রাণপণে তাই

ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝান্ডা ওঠাই।" (দীক্ষিতের গান / চিরকুট)

কবি জনচেতণা ও উদ্দীপনা সৃস্টি করতে চেয়েছিলেন। অনমনীয় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে জীবনের ফুল ফোটাতে প্রত্যয়ী কবিকণ্ঠ উচ্চকিত ছিল। তিনি লেখেন ——"স্বপ্নজড়িত জীবনের দ্বিধা চাবুকে

ছোটাও/ হাঁটু ছিড়ে যাক, দুপায়ে রক্তকদম ফোটাও! / বিপদ তাড়ানো আওয়াজে আজকে হাঁকো হৈ হৈ /ফাঁসিতে দিয়েছি জীবন, মরতে পিছপাও নই / গৃহকলহকে দূরে ঠেলে এসো একজোট হই। (দীক্ষিতের গান / চিরকুট)

দেশাত্ম বোধের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে ক্ষুদিরাম ও অন্যান্য শহীদেরা হাসি মুখে ফাঁসিতে জীবন দিয়েছেন। তাঁদের সেই আত্মবলিদানের দায়বদ্ধতা স্মরণ করিয়ে ডান - বাম বিভেদ ঘুঁচিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান কবি। তিনি লেখেন ––

" হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার

শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—

আত্মদানের ;স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার।" (দীক্ষিতের গান / চিরকুট)

নতুন পৃথিবীর গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কবি জন গাগরণে প্রয়াসী হন। সাধারণের চেতণস্তরে আঘাত করে কবি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন ভীরুতার মুখে লাঠি মেরে প্রাণপণে লাল ঝাণ্ডা ওঠানোর কথা। তিনি মানুষকে সমস্ত শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নীপিড়ন ও সংকট থেকে মুক্তির জন্য মরণজয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কবি তাই লেখেন ––

" প্রতিরোধ চাই! অগ্নিফলকে কাটে কুজ্মটি

মুক্তিনিশান হাতে নিয়ে ওঠে চল্লিশ কোটি

বীরবিক্রমে দ্বার আগলাবে লক্ষ করোটি!" (দীক্ষিতের গান / চিরকুট)

জনজীবনকে 'কুজ্মটি' থেকে বাঁচিয়ে 'মুক্তি নিশান' ওড়াবার জন্য বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান করেন কবি। তিনি শিল্পীচেতণাকে দক্ষ সৈনিকের রূপ দিয়েছেন। দেশবাসীকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করার আত্মপ্রত্যয় রেখেছিলেন। একারণে সর্বত্র জাগরণের দীক্ষা সঙ্গীত শোনাতে চেয়েছিলেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রত্যয় ছিল যে সংগ্রামী মানুষ ব্যর্থ হবে না । যেমনভাবে ব্যর্থ হয়নি ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লব, ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ১৫ ই আগস্ট। এই বিপ্লব সাক্ষ্য দেয় যে বন্দী শালায় আবদ্ধ করে, মানুষের ওপর অত্যাচার করে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোন শাসক কোন কালে শেষ কথা বলে না। ১৯২৬ সালে ১৫ই আগস্ট ভূমিষ্ঠ হয়ে কবি সুকান্ত জাগরণী সুর ধরেছিলেন। কবির বিশ্বাস মানুষের মুক্তির জন্য বার বার সেই মানবতার আবির্ভাব ঘটবে। সাম্রাজ্যবাদের অবসান নিশ্চিন্ত। মানুষের মুক্তিকে আটকানো কারো সাধ্য নেই। কবির জিজ্ঞাসা তাই " রোখে পনেরই আগস্ট সাধ্য কার'? লাল অক্ষরে রক্ত লেখায় কবি মানুষের মুক্তির জয়

ঘোষণা করেছিলেন । যখন সর্বস্তরের মানুষ জেগে উঠবে যখন তার দাবীকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবেনা। তাই কবি লেখেন —— "পথে পথে বান ডেকেছে যখন

ছাত্র - যুবক-চাষী- মজুরের

গলায় গর্জে উঠল

বজ্রের সেই আওয়াজ।

যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে—

আমরা শান্তি মানব না।

মিছিলে সভায় অশান্ত হাতে ওড়াবে নিশান

দুর্দমনীয় দাবী।" (ফের আসব / চিরকুট)

কবি ফ্যাসীবাদী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে জ্বলে উঠার আহ্বান করেন। তিনি আবেগ ও ঘৃণার সঙ্গে ভাষায় আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি লেখেন—"ঘা দিয়ে শিকল ভাঙব, / বন্ধ তালার চাবি কার হাতে, / কার ঘারে ক'টা মাথা আছে খুঁজে দেখব !" (ফের আসব / চিরকুট)

এই উক্তির মধ্য দিয়ে কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কবির 'ঊনত্রিশে জুলাই' শীর্ষক কবিতাটিতে। এই কবিতার প্রেক্ষিতে ২৯ শে জুলাই ১৯৪৬ সালে কলকাতা মহানগরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই দিনটিতে কলকাতার সর্বস্তরের মানুষ ব্রিটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হয়। কৃষক- শ্রমিক- ছাত্রযুব ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়। ভারতে 'ক্রান্তি' অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে দোকানপাট, ট্রাম-বাস, ডাক, তার, টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে ভারতীয় জাতি পশুরাজ ব্রিটিশ শাসক শক্তিকে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়। কবি নিজে অন্তমনে আলোড়িত হয়ে শ্লোগান ধর্মী উক্তিতে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এখানে কবিতার মধ্যে অপারাজেয় দেহাত্মবোধ ও ঔপনিবেশিকতা— বিরোধী বিদ্রোহ উদ্দেশ্যমূলকত ছন্দবদ্ধ করেছেন কবি। কবিতার ঢঙ শ্লোগানধর্মী ও বিদ্রোহাত্মক। তিনি তীব্র ঘৃণায় অসহিষ্ণু হয়ে লেখেন— "স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

দুঃশাষনের পাঁজর খসাবো, গা থেকে খুলব চামড়া।

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

আর সব ডাক বন্ধ, একটি ডাক শুধু চালু থাকবে

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

আগুনের মুখে একটি জবাব সকলে তৈরী রাখব

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

এক পাও পিছু হটব না কেউ, করুক রক্তারক্তি।

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

পথে পথে আজ হোক মোকাবিলা, দেখি কার কত হক্তি

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক !

সাদাকে করবো কালাপানি পার, তবে যুদ্ধের শান্তি।" (ঊনত্রিশে জুলাই/চিরকুট)

কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে এক পাও পিছু হঠবেন না। যদি এতে রক্তারক্তি হয় তবে হোক। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজকে বোর তাড়াবেন। সশস্ত্র লড়াইয়ের মুখোমুখি হবার কথা বলেছেন কবি। সবার মুখে একটাই ডাক থাকবে এক সঙ্গে চলা এবং সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করা; সর্বোপরি দেশমাতাকে স্বাধীন করা। প্রয়োজনে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির গা থেকে চামড়া খুলে নেবেন। সকল ভারতীয়ের সম্মিলিতি শক্তির ওপর কবি সুভাষের বিশ্বাস আছে। ইংরেজদের সাথে লড়াইয়ে ভারত কিছুতেই পরাজিত হবে না। লক্ষ লক্ষ হাত আজ মুষ্টি বদ্ধ। তাই দেশের মানুষ হিংস্র ইংরেজ শক্তির ভিত টলিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞ নিয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে কবি দেখেন — দিকে দিকে আজ দুঃশাষনের–সড়িয়ে দেবার আহ্বান। কবি সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে শপথ নিয়েছেন আততায়ীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার। তিনি লেখেন —

"সুকান্ত , তোমার সেই আততায়ীকে

পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে

তোমাকে বাঁচাব। (উজ্জীবন / চিরকুট)

দুর্ভিক্ষ' হাজার হাজার নর-নারীর প্রাণ কেড়ে নেয়। নিরুত্তাপ ব্রিটিশ সরকার। ঔপনিবেশিক সেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ও মন্বন্তরের প্রতিরোধের জন্য কবির হৃদয় উদ্বিগ্ন —

"দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ,

রক্তচক্ষু রাজার শাসন—

শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু ,

মুঠোয় শিথিল সিংহাসন;

সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু

শবের গলিত গন্ধ ছোটে ।" (ঘোষণা / চিরকুট)

কবি প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রাম, শহর , বন্দর, নগর, হাট, বাজারে মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। কবি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রজাপুঞ্জের জেগে ওঠা। দেখেছেন পায়ে পায়ে বিদ্যুৎ গতির ছন্দ। কবির গভীর দেশাত্মবোধ ঘোষণা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি লিখেছেন — "দেশ প্রেম বল্গা ধরে। /পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল। / গ্রামে গঞ্জে শহরে বাজারে/ দুর্জয় সংকল্প নেয় হাজারে হাজারে। / মৃত্যুকীর্ণ পথে হই জড়ো; নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে, /বেদনার পৃথ্বী থরো থরো। /এ দেশ আমার গর্ব /এ মাটি আমার চোখে সোনা।" (ঘোষণা / চিরকুট) কবির সোনালী স্বপ্ন বাস্তব রূপ পাবার অপেক্ষায়। কবি হৃদয়ের ছোঁয়ায় সমস্ত অভাব ও মন্বন্তর থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। তাঁর দৃঢ় সংকল্প হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অলঙ্ঘ্য পরিখা- প্রাচীর নির্মান করা।এই সংকল্পকে কবিতায় শিল্প রূপ দিয়েছেন কবি —

" আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।

এখানে আমার পাশে

হিমাচল,

কন্যাকুমারীকা।

অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য

প্রতিজ্ঞা পরিখা।" (ঘোষণা / চিরকুট)

মানবিক চেতনা কবিকে এই পর্যায়ে আলোড়িত করে। দেশাত্মবোধ মন্বন্তরের সঙ্গে এই পর্বে কবির বিশ্ব চেতনা ও মানবিক চেতনা অভিন্নসূত্রে ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছে। এখানে উদ্দেশ্যমূলকতা ও শিল্পাচাতুর্য একটি অভিন্ন শিল্পরূপ পেয়েছে যা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অভিনব ও বিশ্ময়কর।

এই ধারার তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য 'অগ্নিকোণ '। কাব্যটির প্রকাশ ১৯৪৮ সালে। সিঙ্গাপুরের যে তিনজন শহীদ বৃটিশের ফাঁসি কাঠে আন্তর্জাতিক গান গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি সুভাষ " অগ্নিকোণ " কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটির প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাস, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস কল - ২০ থেকে । প্রকাশ কালে এই কাব্যের কবিতা সংখ্যা ছিল পাঁচটি। ' অগ্নিকোণ', 'ঝড় আসছে', 'একটি কবিতার জন্যে', 'মিছিলের মুখ' ও 'রাম রাম' । অগ্নিকোণ আক্ষরিক ও অভিধাগত অর্থ দক্ষিণ– পূর্ব দিক। কিন্তু এই নামের মধ্যে কবি এমন এক

পরিবেশের সৃষ্টি করেন যা আগুনের আভায় এক আকাশকে নির্দেশ করে। যার মধ্যে নিহিত সমকালের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। সেই সময় সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের থাবা বসেছিল। ব্রিটিশ, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদ লাল ফৌজের আঘাত- প্রত্যাঘাতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। মালয়েশিয়া, বার্মা, ফিলিপিন্সের গোরিলা সেনারা একটার পর একটা আঘাত হানে সাম্রাজ্যবাদী সেনার ওপর। চীনের মুক্তি ফৌজ ১৯৪৮ সালে গোটা উত্তর পূর্ব চীন ফ্যাসীবাদের হাত থেকে চীনকে মুক্ত করে। ভারতেও ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে উগ্রবাম নীতিতে ডাক দেয়া হয় সশস্ত্র গণ- অভ্যুত্থানের। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় পশ্চিমবাংলায়। বহু কমিউনিষ্ট নেতাকে সেই সময় গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও। অনেক বাম নেতা তখন দিন কাটিয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে আত্মগোপন করে। সেই পরিমণ্ডলে কবি লেখেন 'অগ্নিকোণ'।

এই কাব্যে রাজনীতিতে ডুব দিয়ে কাব্য সৃষ্টির জন্য এর মধ্যে রানীতির উগ্র ঝাঁঝ উপলব্ধি হয়। এই কাব্যের কবিতা পাঁচটিতে কবির দুনিয়া বদলানোর জীবন প্রত্যয় লক্ষণীয় বিষয়। কবিতা হয়ে উঠে সমাজ বদলের ও রাষ্ট্র দখলের হাতিয়ার। কবির কণ্ঠে স্বাভাবিক ভাবে শিল্পের আদলে উচ্চকিত শ্লোগানধর্মী বক্তব্য শোনা যায়। সমসাময়িক রাজনৈতিক সাড়া জাগানো ঘটনা কবিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি শিল্পের ফ্রেমে বেঁধে নিয়েছিলেন বিশেষ এক সময়কে। সেই সময় তাঁর সমকালের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বিদ্ধস্ত সময়। এভাবে 'অগ্নিকোণ' কাব্যে তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শ সহজ সরল ভাষায় কাব্যরূপ দান করেন । একালে তাঁর ব্যক্তিমানস ও শিল্পমানসের পরিচয় অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা পাই — "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজ চেততার কেন্দ্রে রয়েছে সাম্যবাদ- — এবং তার নিউক্লিয়াসটি হল মানব তন্ময়তা। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর দেশপ্রেমে মানবপ্রেমে অনুপম সংমিশ্রণ।.... যাঁরা মনে করেন কবিতা শুধু পাঠককে আনন্দ দেবে—সেই কলাকৈবল্যবাদীদের পক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নন—তিনি বিশ্বাস করেন সমাজ দেশের জন্য কবিদেরও অনেক দায়বদ্ধতা।" (এ কালের কবিতা ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা , পাণ্ডুলিপি, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০৯, পৃষ্ঠা ১৫৪) 'অগ্নিকোণ' কাব্যের নাম কবিতায় কবি দেশে- বিদেশে শহর- গ্রাম, হাট- বাজার পাহড়াড় জঙ্গলের উৎপীড়িত মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। কবি স্বপ্ন দেখেন পরিবর্তিত নব জীবনের সোনালী দিনের জন্য। তিন লেখেন —

"লক্ষ লক্ষ হাতে

অন্ধকারকে দু টুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।
কোটি কন্ঠের হুঙ্কারে লাগে
বজ্রের কানে তালা।
পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে।" (অগ্নিকোণ / অগ্নিকোণ)

কবির অর্ন্তমনে অগ্নিকোণের মানুষ অন্ধকারকে দু-টুকরো করবার এবং সূর্যকে ছিঁড়ে আনার অসম্ভব শক্তি রাখে। তাদের কোটি কন্ঠের ঐক্যবদ্ধ সুর যে কোন জয়গান অনায়াসে গাইতে পারে। তাদের মিলিত প্রতিরোধে মাঠের সবুজ সোনা বসন্ত নিয়ে হাজির হয় । সেই কোটিজনকে সচেতন করার জন্য তাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য জাগরণী মন্ত্র গেয়েছেন কবি। সে জাগরণের প্রত্যক্ষ পরিণাম সিপাহী বিদ্রোহ। কবি কল্পনায় ব্যারাকে ব্যারাকে সৈনিকেরা সাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কবি লিখেছেন ——" ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহী সেনা জাগে

অস্ত্রাগারের দ্বার খুলে তারা
জনতার পাশে দাঁড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ের আওয়াজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে মাটি ।" (অগ্নিকোণ / অগ্নিকোণ)

সেনা ও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ পা মিলিয়ে অপ্রতিরোধ্য শক্তি গড়ে তোলে। তারা মৃত্যুকে ভৃত্য করে অন্ধকারের গলা টিপে ধরে আলোর দুনিয়া আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সমস্ত বঞ্চিত মানুষ অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক তোলে। কবি আত্মবিশ্বাস রাখে সমস্ত মানুষ জলে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে দিগন্ত জোড়া মিছিলে সামিল হয়। অভূতপূর্ব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবি দেখেন "দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায় / সুলতান, রাজারাজরা, উজির শিখন্ডীদের মাথা।" কবি কল্পনায় দেখেন যুগ যুগ ধরে লুন্ঠনকারী ও সাম্রাজ্যবাদী "কুঠিয়াল এক সাহেবের লাশে/ শকুনিকে খায় ছিঁড়ে।"

কবি নিজের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের অবসান ঘটিয়েছেন। লুন্ঠনকারী, অত্যাচারী ও ধষণকারী ইংরেজের জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষের দেশকে ভালোবেসে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন। মা-বোনেরা দাদের পাশবিক ও মানবিক অত্যাচারে অকালে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন। কবির কথায় "সাদা ছেলে পেটে ধরে / যার কচি মেয়ে দিয়েছে গলায় দড়ি।" এজন্য সাধারণ

মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে — /বনেজঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা। / কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে / ধনুকের মতো বাঁকা পিঠগুলো / টান ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়- — / ঘুম - ভেঙ্গে - ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ। / রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে / অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাতে উপ্‌রে আনে / দুঃশাসনের ভিৎ।" (অগ্নিকোণ / অগ্নিকোণ)

পৌরাণিক দুঃশাসনের সঙ্গে তুলনা করে ব্রিটিশ শক্তির পতনকে অনিবার্য করে তুলেছেন কবি। কবি ডাক দিয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রাম করে দেশমাতাকে মুক্ত করতে হবে। এরজন্য তিনি গেয়েছেন যে,"দিন এসে গেছে, ভাই রে — / রক্তের দামে রক্তের ধার / শুধবার। / দিন এসে গেছে ভাই রে— / বিদেশীরাজের প্রাণ-ভোমরাকে / নখে নখে টিপে মারবার।" (অগ্নিকোণ / অগ্নিকোণ)

অসহিষ্ণু কবি মন রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ মাতাকে স্বাধীন করার আহ্বান করেন। কবির আত্মপ্রত্যয় চিন ও অন্যান্য দেশের মুক্তি ফৌজ সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ফ্যাসীবাদীর মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। ক্ষুরধার তলোয়ার' শব্দের দ্বারা কবি সশস্ত্র বিপ্লবে দুরন্ত ঝড় তোলাকে আভাসিত করে গেছেন কবি। 'অগ্নিকোণ' কবিতার শুরুতে কালাপানি তোলপাড় অর্থে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন কবি —

"অগ্নিকোণের তল্লাট জুহে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি।
খুন হয়ে যায় সাদা সাদা ফেনা
ঘুমভাঙ্গা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ারে।" (অগ্নিকোণ / অগ্নিকোণ)

এই কবিতার দ্বারা একবার আগুন হয়ে আগুনের তাপে নিজের তাপকে উদ্দীপিত করে জ্বলে ওঠার আহ্বান করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই ভাবনা তাঁর এই কাব্যের 'একটি কবিতার জন্যে' কবিতায় আমরা পাই। এই কবিতাটির দুটি পরিচ্ছদে কবি দুটি বিষয়কে শিল্পরূপ দিয়েছেন। একটি কবিতা যে জন্য লিখতে চেয়েছেন তার প্রথম অংশে আছে কবি মানসের ধ্বংসের চিন্তন, শোষক, শাষক, অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদীর কৃতকার্যের ধ্বংস চেয়েছেন কবি। এই ধ্বংসাত্বক প্রতযয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির ইতিবাচক শিল্প মানস। শোষক অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদের পতনে সূচিত হবে সৃষ্টির নতুন অধ্যায়।

মানুষ মুক্তি পাবে বঞ্চ না, অত্যাচার, নিপীড়ণ ও পরাধীনতার গ্লানি থেকে। এই লক্ষ্যে কবি পৌরাণিক ভস্মলোচন চরিত্রটি প্রতীক ধর্মী করেছেন। এটি চরিত্রটি পুরাণে রাক্ষস রাজ রাবন রাম চন্দ্রকে তনধন করার জন্য এক সময় পাঠিয়েছিলেন। তার অসম শক্তি ছিল কাউকে দৃষ্টি দ্বারা ভূস্মীভূত করার।

রামচন্দ্র ভস্মলোচনকে প্রতিহত করার জন্য দর্পন বাণ নিক্ষেপ করেন। ভস্মলোচন সেই দর্পন বাণে তার নিজের প্রতিবিম্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্রই নিজেই পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়। এই ভস্মলোচনের প্রতীকে কবি ঔপনিবেশিক শক্তিধর ব্রিটিশ রাজের পতনকে ব্যঞ্জিত করেছেন। ভস্মলোচনের পতনের মধ্যদিয়ে কবি সাম্রাজ্যবাদের পতনকে নিখুঁত শিল্প চাতুর্যে ইঙ্গিতধর্মী করে তুলেছেন। কবি অসাধারন চিত্রকল্পের দ্বারা ভস্মলোচনের ভস্মীভূত হবার ছবি তুলে ধরেছেন। ভস্মলোচনের ভস্মীভূত হবার চিত্রকল্পের মধ্যে কবি সাম্রাজ্যবাদী রাজ শক্তির ধ্বংসকে উপভোগ্য করে তুলেছেন কবি। তাঁর ভাষায়—

“ আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী - রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দূরন্ত ঝড় , মেঘের ধুম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।” (একটি কবিতার জন্যে / অগ্নিকোণ)

ভস্মলোচনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কবি মানবতাবাদী অশুভ শক্তির ধ্বংসচিত্র শিল্পরূপ দান করেছেন। কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে কবি এমন কিছু সৃস্টি করতে চান যার মধ্যে অসীম ভালোবাসা পূর্ণ নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন শিল্পরূপ পাবে। যেখানে সৃষ্টিশীল কবি মানস এক মানবতাবাদী জীবন দর্শন শিল্পরূপ পাবে। সৃস্টি হবে মানবিক বিশ্ব। মানবিক বিশ্ব চেতণার দৃষ্টি কোণ থেকে এই কবিতায় অনাগত এক নতুন দিনের আগমন ঘটবে। যেখানে মানুষের শুভ চেতণার উন্মেষ ঘটবে। সেই পৃথিবীর - —— “ আকাশ বাতাস মুখরিত গানে / গর্জনে তার / নখদর্পণে আঁকা / নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।” (একটি কবিতার জন্যে / অগ্নিকোণ) একটি কবিতা দ্বারা কবি মানবিক বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে কবির মুক্তি চেতণা ও জনচেতণায় গাঢ় আশাবাদ সৃজন করা। কবির মহত ও দার্শণিক চেতণায় কবিতা লেখার উদ্দেশ্য শিল্পরস সৃষ্টির উর্দ্ধে আরও একটি কাজ করে।

এই কাব্যের 'ঝড় আসছে' শীর্ষক কবিতাটিতে সংগ্রামী মানুষের সংঘবদ্ধ লক্ষ্য পায়ের সঙ্গে এক জনের অগ্নিকোণে দুহাতে মশাল তুলে ধরা যথার্থ ইঙ্গিতবহ। চলার পথে লোকে লোকারণ্য, নদীতে, বনে, মাটিতে চিড়, বজ্রের ফিস্‌ফাস চিত্রকল্পের মধ্যে কবি ঝড় আসার সঙ্গে বিদেশীরাজের টুটি টিপে ধরে মারাকে অতুলনীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত বাস্তবের মাটিতে অসাধারণ সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতি নেয়। সেই অবস্থায় "দেশে দেশে বেইমানদের/বুক দুর দুর করে " অনায়াসে বলা যায়। সেই অনুকূল পরিবেশে তিনি লিখেছেন—

" রাস্তা লোকে লোকারণ্য
পরোয়া আজ কাকে
যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে বরমাল্য তাকে।
ঝড় আসছে, উঠে দাঁড়ায়
যে যেখানে আছে।
ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর
যে মারে, সেই বাঁচে।" (ঝড় আসছে / অগ্নিকোণ)

প্রচলিত একটি প্রবচনকে কবি শিল্পদক্ষতার দ্বারা জনজাগরণের ও এগিয়ে আসার; সর্বোপরি প্রতিবাদী হয়ে বাঁচার শিল্পিত পরিপূরক করে তুলেছেন। এই দক্ষতার গুনে কবিতাটির উদ্দেশ্য মূলকতাসক ছাপিয়ে শিল্পরস উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাতিত হয়।

'অগ্নিকোণ' কাব্যের অসাধারণ শিল্প প্রতিমা 'মিছিলের সেই মুখ'। এই কবিতায় কবি মিছিল শব্দটিকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এই শব্দটির অভিধানগত অর্থ ছাপিয়ে এর মধ্যে সজীব সত্ত্বা আরোপ করেছেন। কবির ব্যক্তি জীবনে পার্টি ছিল অনেকখানি। পার্টির সভা - সমিতি; মিছিল - শ্লোগান ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত। সেই সময় তাঁর জীবনের সঙ্গে মিছিলের একটি নিবিড় প্রেম ছিল। সেই সম্পর্কের নিরিখে এই কবিতায় 'মিছিলকে' মানবিক সত্ত্বায় উন্নীত স্বাভাবিক। কবি স্মৃতি চারণার মধ্যে সেদিনের প্রতিবাদ মুখর মিছিলকে মনে করেন । সেই মিছিলের মুখ কবি হৃদয়ে জ্বলজ্বল্ করে উঠেছে—

"মিছিলে দেখছিলাম একটি মুখ,
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;

বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র

আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।

ময়দানে মিশে গেলেও

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়

ফস্‌ফরাসের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকল

মিছিলের সেই মুখ।" (মিছিলের মুখ/ অগ্নিকোণ)

সেই মিছিলের মুখ কবিকে বারংবার আকর্ষণ করে। কবিকে সেই মিছিল উজ্জীবিত করে, স্বপ্ন দেখায় কবিকে নিষ্কাষিত তরবারির মতো জাগায় । তাই আজোও কবি মিছিলের সেই মুখ অন্বেষণ করেন। একটি ভিড় দেখলেই সেদিনের সেই মিছিলকে তার মধ্যে খুঁজে পেতে চান। কবিকে হতাশ করে হারিয়ে গেছে সেই মিছিল ——"পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল / মিছিলের সেই মুখ ।/ আজও দুবেলা পথে ঘুরি / ভিড় দেখলে দাঁড়াই / যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ / ... ... কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে, / ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ/ ফস্‌ফরাসের মতো।"(মিছিলের মুখ/ অগ্নিকোণ)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যেন প্রতিবাদ ঝড় ফিকে হয়ে যায়। প্রতিবাদী মানুষ মিছিল শ্লোগান থেকে সরে আসার ফল হল — তারা ভোগবাদ ও ধনতন্ত্রের পূজারী হয়ে ওঠে। তারা কুৎসিৎ ও বিকৃত রুচিতে নেমে আসে। যাদের তিনি মিছিলে পা মেলাতে বলেছিলেন আজ তাদের " কারো বাঁশীর মতো নাম ভালো লাগে/ কারো হরিণের মতো চাহনি নেশা ধরায়"। স্বাভাবিক ভাবে তারা আজ আত্মকেন্দ্রিক ও নিম্নগতি সম্পন্ন মানুষ। সেই মানুষগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাদের আজ কবি যেন দেখেন ভিন্ন রূপে। মিছিলের মুখ থেকে অনেকেরই আজ প্রতিবাদের ভাষা শোনা যায়। কিন্তু কবির দুঃখ হয় একটি বিশেষ অংশের মানুষের জন্য। কবি যখন দেখেন ——

" অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়

কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,

পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে

গায়ে সুগন্ধি ঢালে,"। (মিছিলের মুখ/ অগ্নিকোণ)

মানুষের এই সামাজিক অচল অবস্থার অবসান করাই কবির ইপ্সিত লক্ষ্য। কবির ব্যক্তি জীবনের রাজনৈতিক সংকটের কালকে কবিতার শিল্পরূপ দিয়েছেন। স্বাধীন প্রপ্তির (১৯৪৭) সময় থেকেই

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৈরীতা। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেস সরকারের ধনী ও পুঁজিপতিদের তোষণ - শোষণ নীতিকে সমালোচনা করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করলে কংগ্রেস সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সরকার ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪৮ সালের ২৭শে মার্চ নিষিদ্ধকরেদেয়। কমিউনিস্ট নেতা- কর্মী- কমরেডদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেয় পুলিশ। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে তারা পুলিশের সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পেতে আন্ডার গ্রাউন্ডে আশ্রয় নেন পার্টি কর্মীরা।

পার্টি নিষিদ্ধ হলেও কমিউনিস্ট পার্টির কার্যসংগ্রাম বন্ধ ছিলনা সেদিন। গোপনে সেদিন চলছিল পার্টির কর্মতৎপরতা। বামপন্থী রাজনৈতিক সমাজ মানসিকতা এই কবিতার পরিষ্কার অভিব্যক্তি। কবি সমকালের রাজনৈতির বৈশিষ্ট্য এই কবিতায় শিল্পিত রূপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে যুক্ত হয়েছে কবির মানবিক বিশ্ব রচনার উদার প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস। কবি রচনা করতে চান এমন এক নতুন পৃথিবী যেখানে সম্পুর্ণ মুক্ত, স্বার্থগন্ধশূন্য ও ভালোবাসার ভিতের ওপর সম্পর্ক নির্মিত হবে। কবি লিখেছেন —— “ অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি

নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে
ডাক দিই—
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা ’’। (মিছিলের মুখ/ অগ্নিকোণ)

এই কবিতায় একটি মিছিল ক্রমশ একটি অবয়ব পায়। মিছিলে মিলিত মানুষ সমস্ত শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নতুন এক পৃথিবী রচনা করবে যার মধ্যে শোষণ , বঞ্চনা , নিপীড়ন মুক্ত এক প্রজাতন্ত্র তৈরী করবে। সমাজতন্ত্রের জীবন দর্শন কবির “মিছিলের মুখ” কবিতাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

‘অগ্নিকোণ’ কাব্যের একটি অন্যতম কবিতা ‘রাম রাম’। কবিতাটির রচনাভঙ্গি তীর্যক শ্লেষাত্মক ও শৈলীতে পাই ব্যাঙ্গের কষাঘাত। এই কবিতায় শাষক-বিরোধী সন্ত্রাস-বিরোধী কবিমানস সহজ উপলব্ধ। এতে প্রজানিপীড়ন , যুদ্ধবাজ জল্লাদ, বজ্জাত - বন্দুক সরকারকে তীক্ষ্ণ শ্লেষের কষাঘাত করেছেন কবি। তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন কবিকে উজ্জীবিত করে। ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানার

প্রজাপীড়ন ও সম্রাট নিজামের ইতিহাস চেতনা কবিকে আলোড়িত করে। কবি কবিতার শুরুতেই অত্যাচারী সম্রাট ও নিপীড়নকারী সরকারকে ব্যঙ্গ করে লেখেন — "কুকুরের মাংস কুকুরে খায়না।" অথচ সম্রাট ও শাষকদের অত্যাচারের শিকার হন নিরীহ সাধারণেরা। কবিতাটির শেষ অংশে তেলেঙ্গানার কৃষকদের জমির সঙ্গে আত্মিক নিবিড় সম্পর্ক কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। কবি লিখেছেন——

"এখন বজ্জাত গুলোকে টিট করা দরকার
চাই খুব জবরদস্ত এক
বন্দুক সরকার,
মন্ত্রী হোন জল্লাদ—
তারপর দেখা যাক জমির আস্বাদ আমার
ভোলে কি ভোলে না
অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।।" (রাম রাম / অগ্নিকোণ)

'পদাতিক- চিরকুট - অগ্নিকোণ' কাব্য তিনটির কবিতা গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পচেতনা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

কালের নিরিখে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ "ফুল ফুটুক" (১৯৫১-১৯৫৭) এই কাব্যের রচনাকাল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ সাল । ১৯৫৭ সালে গ্রন্থকারে দে'জ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় । এই কাব্যে কবি নতুন করে ভিন্ন স্বাদে পাঠক ও সমালোচকদের কবিতা উপহার দিয়েছেন। প্রকাশকালে এই কাব্যের অর্ন্তভুক্ত কবিতা ছিল ৩৬টি । 'ফুল ফুটুক' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হল- 'আমি আসছি', 'সালেমনের মা', 'লাল টুকটুকে দিন', 'সুন্দর', 'পারাপার', 'পুপে', 'আমরা যাব', 'ড্যাং ড্যাং করে', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'আরো একটা দিন', 'সহজিয়া', 'এখন ভাবনা', 'শুধু ভাঙ্গা নয়', 'আগুনের ফুল ', 'জয়মণি স্থির হও', 'অগ্নিগর্ভ', 'একটি লড়াকু সংসার', 'বাসি মুখে', 'এক অসহ্য রাত্রি', 'পারুল বোন', 'দিয়েন বিয়েন ফু'ইত্যাদি ।

এই কাব্য সৃষ্টিকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি মানস সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিক্‌দার লিখেছেন — " চিরজীবিত নবজাতক মৃত্যু পরম্পরাকে অতিক্রম করে জন্মপরম্পরায় বার বার দেখা দেয় । কাব্যে, শিল্পে, মীথে এই নবজন্মের প্রতীক শিশু, উর্বরা ধরিত্রী বা জননী । গোঁড়া রাজনীতিতে বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এল তখন ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে পুরাণ - পাখির মতো জন্মালো মানবতাবাদে গভীর প্রত্যয় । 'ফুল ফুটুক' কবিতা পর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

কবিজীবনের ইতিহাসে মানবতাবাদের উজ্জীবনের কাব্য।" (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অশ্রুকুমার সিক্‌দার, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২৫৫)

এই কাব্যে কবি মানুষের জীবনে দুঃখ, অভাব, অসাম্য ও সামাজিক অসুখ সারিয়ে এক উজ্জ্বল সমাজ জীবনের ফুল ফোটাতে দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ । ফলে তিনি আত্মস্থ হয়েছিলেন মানবতাবাদে । তাঁর এই পর্বের কবিতায় আমরা পাই প্রচন্ড ইতিবাচক কবি মানস প্রকাশের বিশিষ্ট ইমেজ । এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। এই কালের মধ্যে কবির জীবনদর্শনে পালাবদল ঘটেছে। যুগান্তকারী এই পালাবদলের পথ পেরিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পৌঁছে গেছেন 'ফুল ফুটুক' এর নতুন দেশে। এই পথ তাঁর জীবন ও কাব্যের পূর্ণতার পথ। তাই এই কাব্যখানি তার কাব্য সাধনার যাত্রাপথে বিশিষ্ট মাইল স্টোন।

এই কাব্য বিশ্লেষণে সন্ধান মেলে তাঁর কাব্য সাধনার বিশিষ্ট স্বরূপ। এই সময় কবি খুঁজে চলেছেন তাঁর অন্বিষ্ট। তাই এই কালে রচিত কবিতার ভাষা সংগ্রামী সাধারণের বুকের ভাষা, স্বপ্নের সিঁড়ির ছবি আঁকার নতুন রূপকথা। এই সময় তাঁর কাব্য সাধনা পৌঁছে যায় নতুন পৃথিবীতে, সেখানে দেখা দেয় অজস্র মুখ নতুন পৃথিবী আর তার সীমাহীন ভালোবাসা। পদাতিকের বিস্ময়কারী নতুন আঙ্গিকের কবিকে খুঁজলে হয়তো হতাশ হতে হয়। কিন্তু নিখুঁত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে তিনি এই সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি বা গোত্র ত্যাগীয় হন নি। এই সময় বিস্তৃত কবি হৃদয় দাঁড়িয়েছে সংগ্রামী মানুষের আরো কাছে ও সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের আঙিনায়। এই পর্বে কবির মননে আত্মনিবেশ ঘটেছে। বিস্তৃত হল তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য। সেখানে তাকালেন প্রকৃতির দিকে, অন্তরের প্রেম ভাবনার দিকে। এই মোড় ফেরার কাজে কয়েকটি ঘটনা স্মরণীয়। এগুলি তাঁর ব্যক্তি জীবনকে আলোড়িত করে। এই সময়কালে দীর্ঘ কারাবাসে থেকে মুক্তি পান ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে। এর পর ১৯৫১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। একই বছরে শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এর পরের বছর ১৯৫২ সালে সস্ত্রীক বজবজ চটকলে যান মজুর সংগঠনের কাজে। এর মধ্যে ১৯৫০ সালের মধ্যেই তুরস্কের মার্ক্সবাদী কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বিদেশী এই কবি কারাবাসে বন্দী অবস্থায় কাব্য সাধনা করেন। আলোচ্য ঘটনাগুলি কবি হৃদয়ের বিস্তৃত উদ্যানে বৈচিত্রময় ফুলের সৌরভ নিয়ে আসে। কবির হৃদয়ে জীবনমুখী ও সৃজনধর্মী মানবিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

এই সময়ের কবির স্বরূপ সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক বিজয় সিংহ লেখেন " রাজনীতির কেতাবী তত্ত্ব এখন মূর্ত্তি রূপ নিয়ে এসেছে সত্তার কাছে। আজ আর পার্টিজান রাজনীতির সঙ্গে গলা

মিলিয়ে শুধু চিৎকৃত শ্লোগান নয়, রাজনীতি এসে মিশেছে শুদ্ধ মানবিকতায়।.......... এখন আরতাই তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ঘটনাকে নয়, পার্টি - রণনীতিকে নয়— গোটা জীবনকে, উতলে ওঠা ভালোবাসায় , কবিতায় নিয়ে আসার আকুলতা ৷ ” নাজিম হিক্‌মতের কথায়, যার “ মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয় ও পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে জীবনের সবকটি দিক।” (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য - সম্পা ঃ সন্দীপ দত্ত , র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৮২)

‘ পদাতিক’ এর পর্বে কবিমানসে ফুল ছিল বুর্জোয়া ভাববিলাসীর প্রতীক। সেখানে ফুলকে তিনি বিলাসিতার জন্য তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কষাঘাত করে শিল্পরূপ দান করেছিলেন। কবি সেখানে লেখেন “কুঁজো হয়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে/ পৌঁছায় নাকি হাতুড়ি তাদের পিঠে।” (সকলের গান / পদাতিক)
অথবা “ প্রিয়, ফুল, খেলবার দিন নয় অদ্য ” (সেদিনের গান / পদাতিক) ফুল এই পর্যায়ে হয়ে উঠেছে ইতিবাচক জীবন সুষমার প্রতীক। ফুল হয়ে ওঠে অন্ধকার মোচন ও নবজীবনের প্রতীক। এই মানসে কবি লিখেছেন —

“আমিই বা বসে থাকি কেন ?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময়।” (সন্ধ্যামণি / ফুল ফুটুক)

কবি মানসের এই পালাবদলে ফুল হয়ে উঠলজীবনানুভূতির ইতিবাচক প্রতীক। ফুল হয়ে উঠল কৃষাণ ও ক্ষেত মজুরদের বিপ্লবী চেতনা ও সংঘবদ্ধ অগ্রগামী জীবনের প্রতীক। তাই এই কাব্যের ‘আগুনের ফুল’ কবিতায় তিনি লিখেছেন —

“ মাঠের কাদা-লাগা ফাটা পায়ে
শানবাঁধানো পাথরে
আগুনের ফুল তুলে
আমরা আসছি।” (আগুনের ফুল / ফুল ফুটুক)

‘ফুল ফুটুক’ কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ শীর্ষক কবিতাটি। এই কবিতায় অসামান্য ইতিবাচক জীবনাদর্শ কাব্যসাধনার উৎকর্ষ পরিণাম। জীবনকে ভালোবেসে এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে মৃত্যুকে জয় করে নেয়। জীবনে প্রাচুর্য শান্তি, ভালোবাসাপূর্ণ মানবিক চেতনার দৃঢ়

ভিতের উপর নির্মিত এই কবি মানস। অসাধ্য সাধন করে বিপ্লব আনার জীবন প্রত্যয়ে তাঁর ক্ষেত্রেই বলা মানানসই— " ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত।" অতীতের রক্তাক্ত দিন, অন্ধকারের মরণজয়ী সংগ্রামের দিন যেন আর কারো জীবনে না আসে। আলোর জীবন আর জীবনের আশাবাদ নিয়ে সাধারণের জীবনে একটাই শুভচেতনা আসুক। চোখ মেলে সাধারণেরা বলুক " ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত।" শুক্নো প্রায় রুগনো— কাঠ খোট্টা গাছেও আসুক প্রাণ খোলা হাসি। সেই আশাবাদী চিত্রকল্পে কবি লিখেছেন —" শান - বাঁধানো ফুটপাথে

পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।" (ফুল ফুটুক না ফুটুক / ফুল ফুটুক)

জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে দীর্ঘ সংগ্রামের দিন অতিবাহিত হয়েছে কবির জীবনে। অনেক মৃত্যু দিয়ে মানুষ মুক্ত হয়েছে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে। চীন , রাশিয়া ইত্যাদি দেশের লক্ষ লক্ষ মুক্তি ফৌজ নাৎসী বাহিনী, ফ্যাসীবাদী শক্তি ও পুঁজিবাদী মানুষের সোনালী দিনগুলোকে রক্তাক্ত করে তোলে। মৃত্যুর কালো দিন ঘনিয়ে আসে। তবেই হয় নব জীবনের সূর্যোদয়। সেই দিনগুলি যেন না ফেরে। কবির অন্তর্মনে ইতিবাচক ও মানবতাবাদী দর্শনের গভীরতম তল থেকে প্রত্যাশা, সংগ্রাম, রক্তঝরা, মৃত্যু নিয়ে চলার পথে যেন হাঁটতে না হয় অনবরত। তাই কবি লিখেছেন —"আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে / তারপর খুলে—/ মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে / তার পর তুলে —/ যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে / যেন না ফেরে।" (ফুল ফুটুক না ফুটুক / ফুল ফুটুক)

জীবনকে ভালোবেসে, ভালোবাসার মন নিয়ে লেখেন কবি। হরবোলা ছেলেটাকে ভালোবেসে কালো কুৎসিত আইবুড়ো মেয়েটা আর মরতে পারে না। আজকের দিনটাতে যে তাদের গায়ে হলুদ। লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির কথা জেনে গেছে সারা আকাশ।

" ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !" (ফুল ফুটুক না ফুটুক / ফুল ফুটুক)

অর্থাৎ নিশ্চিত তাদের বিয়ে। তারপর নব-দম্পতির বাসরসজ্জার দরজা বন্ধ, আর অন্ধকারে তাঁদের বাঁক্‌রোধ। এসব দেখে ফাঁসিতে ঝুলবার জন্য দড়িটা আর যে গাছটিতে দড়িটা বাঁধা হয়েছিল সেই গাছটা "তখনও হাসছে।।" এই পর্বে এসে মোচড় দিয়ে ঘুরেছে কবির জীবনদৃষ্টি; স্বাভাবিক ভাবে

মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, দাম্পত্য নিয়ে সুখী জীবন এসেছে কবির লেখনীতে। কবি সুভাষ হয়ে ওঠেন আশাবাদের রূপকার। মানবতাবাদ ও গ্রামীণ লোকায়ত জীবনকে গ্রহণ করে রচিত তাঁর "ফুল ফুটুক না ফুটুক"। এই কবিতায় সর্বস্তরের মানুষের প্রাণে ফুল ফোঁটাতে চেয়েছেন কবি। তিনি ফুল ফুটিয়ে সবার জীবনে বসন্ত ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন।

'ফুল ফুটুক ' কাব্যের একটি অসামান্য কবিতা 'সালেমনের মা।' এই কবিতাটির উৎস ও প্রেরণা সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক ও কবি বিজয় সিংহ লেখেন — "১৯৫১ তে একটানা দীর্ঘ দু'বছরের কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে, তার পরের বছরেই কবি সস্ত্রীক চটকল মজুর সংগঠণের কাজে চলে যান বজবজ। ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের মজুর বস্তিতে মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া নেন একটি মাটির ঘর। সুভাষ ও গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়— দু'জনেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। মজুর বস্তিতে থাকার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই জন্মনেয় 'সালেমনের মা' ।" (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য , সম্পাদনা সন্দীপ দত্ত , দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন পৃষ্ঠা - ১৭)

ব্যঞ্জনহেড়িয়া কবির সেই ভাড়া বাড়ির প্রতিবেশী ছিলেন বাবর আলি। ১৩৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে আজকাল পত্রিকায় সেই বাবর আলি সম্পর্কে লেখা হয়— "জোলাদের জামাই। পঞ্চাশের আকালে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মেয়ে সালেমন তখন কোলে। পাগলস্বামীকে নিয়ে অবলা স্ত্রী কী ঘর করবে? ফলে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসে। দু'জনকে খেতে দেবার মু:রাদ তাদেরও ছিল না। বোনে তো গামছা। তার ওপর সুতো তো সব চোরাবাজারে। ফলে, বাড়ির জোয়ান মদ্দ ছেলেটা বাধ্য হয়ে বেশ্যাবাড়িতে তাড়ি যোগায়। সালেমনের মাকেও একদিন চলে যেতে হয় কলকাতায়। কেউ বলে সে নিকে করেছে , কেউ অন্য কিছু বলে। সালেমন জানে তার মা আছে কলকাতায়। কোথায় যে তা সে কেন, কেউই জানে না।(এক হাতুড়ের জবান বন্দীঃ ' সালেমনের মা', আজকাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য , সম্পাদনা সন্দীপ দত্ত , দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃষ্ঠা ১৭)

মা-হারা সালেমন খুঁজছে তার মাকে। একটা মন্বন্তরে তার মাকে হারিয়ে সেই সন্তান ভবিষ্যতের মন্বন্তরেও মাকে খোঁজে। মন্বন্তর দেশের সন্তানদের পরিজন হারানোর বেদনা দেয়। 'আকাল' সালেমনের মতো শত সহস্র সন্তানকে অনাথ করে। সালেমনের মধ্য দিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মন্বন্তরের ভয়াবহ ও শোকাবহ পরিণামের শিল্পরূপ দিয়েছেন। শিশুটি বজবজের শ্রমিকদের একটি মিছিলে মিশে গিয়েছে

সেই মিছিলের সঙ্গে কোলকাতায় পৌঁছে মাকে খুঁজবে। সে শুনেছে সেখানে তার মা আছে। সেই মাকে খোঁজার জন্য সে

" মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে

পিচুটি - পড়া চোখের দু- কোণ জলে ভিজিয়ে

তোমাকে ডাকছে শোনো,

সালেমনের মা—" (সালেমনের মা/ ফুল ফুটুক)

গ্রামের একটি মিছিলের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে সালেমন। এই গলা মেলানোর মধ্যে কবির রাজনৈতিক সদর্থক দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে। কোলকাতা শহরের অলি গলি গোলক ধাঁধায় মেয়েটি হন্যে হয়ে ঘোরে। কবির ভাষায়——" এ কলকাতা শহরে

অলিগলির গোলকধাঁধায়

কোথায় লুকিয়ে তুমি ,

সালেমনের মা ?" (সালেমনের মা/ ফুল ফুটুক)

সালেমনের চরিত্র মুনাফাবাজ, দাঙ্গাবাজ, কালোবাজারী শক্তির বিরুদ্ধে মানবিকতা জাগরণের সফল প্রয়াস। এই চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে লেখকের জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি শিল্পিতরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"ফুল ফুটুক" কাব্যের অনন্য সাধারণ সহানুভূতি সঞ্চারী কবিতা "একটি লড়াকু সংসার"। কবিতাটির শীর্ষনামে সেই সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায়। এই কবিতাটির উৎসমূলে রয়েছে কবির জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি ও সমালোচক ডঃ বিজয় সিংহ লিখেছেন, " কবিতার লড়াকু সংসার আসলে বজবজের সে সময়ের একজন লড়াকু কমরেডের সংসারের গল্প। নেতৃত্বস্থানীয় সেই পার্টি কমরেডের নাম শ্রীরামাচরণ সাইনী। তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী তখন, কাজ করেন চটকল মজুরদের মধ্যে। অত্যন্ত অভাবের সংসার ছিল তাঁর। পার্টিরও তখন চরম দুরবস্থা। সামান্য মাসোহারাটুকুও তখন দিতে পারছে না তার সর্বক্ষণের কর্মীদের। এই চরম অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কমরেড সাইনির বাড়ির ভেতরে লড়াই ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে।" (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য' , সম্পাদনা সন্দীপ দত্ত , দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃষ্ঠা ১৯)

কবিতাটিতে কমরেড সাইনির পরিবারে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম ও আগামী শিশুর মধ্যে তার ব্যাপ্তি বিস্তৃত রূপে শিল্পরূপ পেয়েছে এই কবিতায়। এই কবিতার শুরুতে নিরন্ন মানুষের কথা পাই। এখানে ফাঁকা হাঁড়ির সঙ্গে ফাঁসি শব্দটি তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন–

" নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়
যেন
ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে
কাল বিকেলে মজা ভাতের হাঁড়ি। (একটি লড়াকু সংসাব/ ফুল ফুটুক)

অভাবের সঙ্গে কবির শব্দ প্রায়োগ ও চিত্রকল্প অসাধারণ শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্পন্ন এবং সচেতন শিল্পী মানসে নির্মিত। কবি লেখেন ——

" কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে .
দাওয়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
রেশনের ভাঁজ - করা থলি । (একটি লড়াকু সংসাব/ ফুল ফুটুক)

কবিতায় এই অভাবের মধ্যে রয়েছে কবির ব্যক্তি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কবির বজবজের ভাড়াটে বাড়ির প্রতিবেশী কমরেড সাইনীর মা এই কবিতার 'বুড়ি' কবিতার 'মেজো নাত্নী' মূলতঃ কমরেড সাইনীর মেয়ে। কবি লিখেছেন——

" মেজো নাত্নিকে সঙ্গে নিয়ে
সারাদিন লাইনে কয়লা কুড়িয়ে
একটু পরেই বুড়ি ফিরবে।
আজকের নতুন ফোসকাগুলো
আজকে সারা টা রাত
তাদের হাতে জ্বলবে।" (একটি লড়াকু সংসাব/ ফুল ফুটুক)

সারাদিন 'লাইনে' কয়লা কুড়িয়ে জ্বলন্ত স্তুপ থেকে মেজো নাতনী আর সেই বুড়ি কয়লা সংগ্রহ করে। প্রতিদিন গাদা গাদা কয়লা সংগ্রহের সময় জ্বলন্ত কয়লার তাপে তাদের হাতে ফোসকা পড়ে। রাত্রে সেই ফোস্কাগুলো জ্বলতে থাকে। তাই ফোস্কাগুলোর ওপর প্রতিদিন নতুন করে আবার ফোস্কা হয়।

বৈচিত্রের এই বাস্তব রূপ চিত্র রূপতায় ফুটিয়ে তোলেন কবি সুভাষ। সেই সঙ্গে এই সংসারের রোজগারে মানুষটা শ্রমিক আন্দোলনের মিছিলে পা মিলিয়েছে। লেখক লিখেছেন ——

" ছেঁড়া কামিজ মাথায় গলিয়ে

মানুষটা এইমাত্র গেছে

ছ-নম্বর গেটে ।

হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল —শান্তির।" (একটি লড়াকু সংসাব/ ফুল ফুটুক)

কবিতাটির শেষ স্তবকে লেখক সংগ্রামকে আগামী প্রজন্মে সম্ভাবিত করেন। তিনি মানব প্রজন্মের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কিন্তু কবি শত অভাবের মধ্যে মানবিকতাকে উজ্জ্বল করে ধরেছেন। উপোসী এবাড়ীর আসন্ন সন্তানসম্ভবা বউ কোন রকমে কোমর বেঁকিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের প্রাণীর প্রতি কর্তব্য করে শারিরীক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও। এখানে কবি সমস্ত প্রতিবন্ধকতাতে উত্তীর্ণ করে মানবিকতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাকে জয়ী করে তুলেছেন। এই অংশে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ জীবন-দর্শন সাহিত্যে বিশিষ্ট করে তুলেছেন।

'ফুল ফুটুক' কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত কবিতা হল 'পারুল বোন'। এই কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত রয়েছে একটি ইতিহাসগত ঘটনা। কবিতার উৎস সম্পর্কে ডঃ বিজয় সিংহ লেখেন— "সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে - ৫০ এর বিখ্যাত ভাষা- আন্দোলনের পরে পরেই ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় যান কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ পশ্চিমবাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা। সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান উত্তেজনার ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে। ভাষা আন্দোলন তখন সফল। আওয়ামী লিগের পরিচালনাধীন ফ্রন্ট বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে নির্বাচনে, অথচ তাকে ক্ষমতায় বসতে না দেওয়ার জন্য চলছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র । এরই সঙ্গে সেখানে ঘটেগেছে আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন শ্রীমতি ইলা মিত্র। পাক স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে চরম নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে সেসময় তিনি ঢাকার সরকারী জেলে অন্তরীণ। এই দুটি ঘটনাই আবেগমথিত হয়ে 'পারুল বোন' এ ধরা পড়েছে। রূপকথা থেকে উঠে আসা এ কবিতায় 'পারুল বোন' - এ মিশে আছেন একাধারে 'স্তালিন - নন্দিনী', ইলা মিত্র এবং জাগ্রত বাংলাদেশ।" (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য', সম্পা ঃ সন্দীপ দত্ত , দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন পৃষ্ঠা - ২৩) পারুল বোন কমিউনিস্ট কর্মী ও বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতীক। লোককথা ও রূপকথার সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের

ভাইয়ের সঙ্গে একাত্ম কবি স্বয়ং। কবির হৃদয়ের সহানুভূতি ও আন্তরিক - সহমর্মিতা পারুল বোনের সঙ্গে নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। সাত ভাই পাহারা দেয় তাদের বোনকে । বোনের প্রতি দরদ কবিতার বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। সংগ্রামী ও সচেতন শিল্পী তাই লেখেন ——

" অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার ? " (পারুল বোন/ ফুল ফুটুক)

সংগ্রামী নেত্রীর সঙ্গে এই কবিতার সৃষ্টির রহস্য উন্মেচিত হয়েছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি কথায়। 'পরিচয়' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় সংখ্যায় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে তিনি লেখেন — " আমি আর সুভাষদা একঘরে শুই। সেই রাতে ঘুমোবার আগে দেখলাম সুভাষদা বসে বসে কী লিখছেন।......... পাতা উল্টে দেখলাম নতুন কবিতা। মনে হল আনন্দে চিৎকার করে উঠি। ইলা মিত্রকে দেখার তাঁকে নিয়ে আমার অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। পড়েছিলাম গোলাম কুদ্দুসের কবিতা— স্তালিন নন্দিনী, বোন ইলা মিত্রের সেই আশ্চর্য বন্দনা। কিন্তু রোগ শয্যায় ইলা মিত্রকে মনে হয়েছে, তিনি যেন আরো কিছু অন্য কিছু। অনেক ভেবেও সেই বিশেষ কথাটি কিছুতেই ধরে ... আনতে পারিনি। আজ সুভাষদার কবিতায় নিজেরই প্রাণের প্রতিচ্ছবি দেখলাম।" (পরিচয় , জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় , ১৩৮৮) পারুল বোন জেলের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পাবার দিন বেশী নাই। তার মুক্তির সঙ্গে তুলনা করে বাংলাদেশের সুখের দিন আসন্ন। মুক্ত ও স্বাধীন দেশের মাঠ-ঘাট সোনার ফসল তুলে নেবে। নিত্যদিন রাখাল ছেলে নিশ্চিত মনে মাঠে গরু চড়াবে। স্বাধীন বাংলা দেশের মুক্ত ও উদার ডাকে বাংলায় সচখের বাণ আসবে এবং সমস্ত প্রতিবন্ধকতারগন্ডী উত্তীর্ন করে মানুষ আসন্ন মুক্ত সকালের বাংলাদেশ। কবি লিখেছেন——

" শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার।

সোনার ধানের সিংহাসনে
কবে বসবে রাখাল

কবে সুখের বান ডাকবে

কবে হবে সকাল। ” (পারুলবোন/ফুল ফুটুক)

এই কবিতার গভীরে নিহিত বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং সংগ্রামী নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শিল্পিত রূপে সংগ্রাম ও শ্রদ্ধার মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। এই কবিতার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইলা মিত্রের রাজনৈতিক সংগ্রামের অভীষ্ট লক্ষ্য ও জীবন প্রত্যয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উপলব্ধির নিদর্শন রেখেছেন। সাতভাই চম্পার রূপকথার মতো কবি নিজেকে একজন সদাজাগ্রত পাহারাদার ভাই হিসেবে সদা আত্মতৃপ্তি শিল্পিতরূপে মিটিয়ে নিয়েছেন। এখানে একজন সংগ্রামী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উৎকৃষ্ট শিল্পিত প্রয়াস। যার মধ্যে কবির রাজনৈতিক চেতনা, ইতিহাসবোধ ও মানবিক চেতনা নিহিত রয়েছে।

লেখকের সমকালের বাস্তব ঘটনার প্রতিক্রিয়াজাত কবিতা এই কাব্যের 'সহজিয়া'। এই কবিতাটির নেপথ্যে রয়েছে তাঁর ভিন্ন একটি লেখা নিজের পার্টির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে কবির মনে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তা হল এই কবিতাটির উৎসস্থল। কালমার্ক্স -এর মার্ক্সবাদের মূল বক্তব্য অপেক্ষাকৃত কম লেখাপড়া জানা মজুর ও সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন কবি সুভাষ বুখোপাধ্যায় বজবজে মজদুর সংগঠনে থাকা কালে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কালমার্ক্স - এর 'ওয়িজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল " এর মূল অর্থনৈতিক ভাষ্য , মজুরি ও পুঁজি সম্পর্কে সহজবোধ্য ভাব ও ভাষায় লেখেন 'ভুতের বেগার'।

এই বইটি সেকালে তাঁর পার্টির ভেতর ও বাইরে সমালোচনার বন্যা বইয়ে দেয়। এই সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে কবির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি ধরা পড়েছে 'সহজিয়া' কবিতায়। এ সম্পর্কে ডঃ বিজয়সিংহ লিখেছেন— "বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটিকে ঘিরে পার্টির মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এক পক্ষ যেমন আদা জল খেয়ে এর খুঁত ধরতে শুরু করেন, দলেরই অন্যরা তেমনি পাল্টা বিতর্ক এনে প্রমাণ করেন, বইটিতে তত্ত্বগত কোন ভুল নেই। বইটি ত্রুটিপূর্ণ এবং অতি সহজ সরল— এই অভিযোগের সপক্ষে ছিলেন মূলত পার্টির বিশিষ্ট নেতারা, অন্য দিকে ত্রুটিহীন ও জরুরী — এই বক্তব্যের সপক্ষে ছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো পার্টির অর্থনীতির পণ্ডিতেরা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'সহজিয়া' কবিতার রচনা। যে বিশিষ্ট পার্টি নেতা মুখ্যত বইটির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, গোটা কবিতাটিতে উত্তমপুরুষে তাকেই দাঁড় করানো হয়েছে। তাঁর ভাষ্যেই কবিতাটি গঠিত। কবিতার সেই ভাষ্যের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি, অবশ্যই 'ভূতের বেগার' — এর রচয়িতা।........ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।" (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ জীবন ও সাহিত্য' সম্পা ঃ সন্দীপ দত্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন পৃষ্ঠা - ২১)

কবিতাটির প্রথম অংশে কবি তাঁর নিজের ও সামাজিক অবস্থান শিল্পিত রূপ দান করেছেন। সেখানে তিনি লেখেন নিজের স্বভাব ধর্ম ও তার বিতর্কিত রচনা 'ভূতের বেগার'— এর সমকালীন বাস্তব অবস্থা। তিনি লেখেন—"ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, নিতান্ত ছাঁ-পোষা বংশ,

নেই কানাকড়িরও মুরোদ;
গাড়ি নেই সে আবার কথা বলে।
জানে না অধিক হাটলে পায়ে হয় গোদ ?
আগে তো নেহাৎ ছিল গোবেচারা;
যাই বলা হ'ত শুনত; কিন্তু সে অধুনা
যা হয়েছে কহতব্য নয়—
তর্ক করে পায়ে পা বাধিয়ে।
পেয়েছি নমুনা ——" (সহজিয়া / ফুল ফুটুক)

এই কবিতার 'ভাড়াটে বাড়ি' টি ইঙ্গিত করেছে কবি সস্ত্রীক বজবজের চটকলে ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের মজুর বস্তিতে মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় থাকা বাড়িটিকে। সেখানকার জীবন অভিজ্ঞতা কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। এখানে ' নেই কানাকড়ি ও মুরোদ;' এই বাক্যাংশটি দ্বারা কবি তাঁর চরম আর্থিক দুরবস্থা ও পারিবারিক সংকটকে শিল্পে উন্নীত করেছেন। একটি ব্যক্তিগত গাড়ি না থাকলে উঁচু দরের ও জাতের মানুষের সঙ্গে কথা বলার যেন কোন অধিকার ছিল না সেকালে। সেকালের উচ্চবিত্ত মানুষ ও তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা তাঁকে দেখতেন এবং মনে মনে বলতেন ' গাড়ি নেই সে আবার কথা বলেন।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নেহাতই ' গোবেচারা বৈশিষ্টের একজন স্বল্পভাষী স্বভাবের মানুষ।' পায়ে অধিক হাঁটা শব্দগুলির মধ্যে তঁর প্রথম কাব্য ' পদাতিক' পাঠকের স্মৃতিতে করাঘাত করে। এবং 'তর্ক করে পায়ে পা বাঁধিয়ে' উদ্ধৃতাংশের মধ্যে কবি তাঁর বিতর্কিত রচনা 'ভূতের বেগার' বইটি থেকে উদ্ধৃত সমালোচনার ঝড়কে কবিতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় করে তুলেছেন। এই কবিতায় বিতর্কের মূলে যিনি সমস্ত কলকাঠি নাড়িয়েছেন সেই ব্যক্তিটিকে উল্লেখ করেছেন কবি— " আমার বিশ্বাসের মূলে আছে কেউ, / সেই ব'সে কলকাঠি নাড়ায়।" ডঃ বিজয় সিংহ ' কবিতার নেপথ্যে' প্রবন্ধে কলকাঠি নাড়ানোর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে সেকালে পার্টির অর্থনীতির পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবির

ব্যক্তি জীবনের ছোট ছোট ঘটনাকে সহজ গদ্যের ঢঙে কবিতার রূপনির্মাণ করেছেন। বর্ননাধর্মী প্রকাশ ভঙ্গিমায় কবি লিখেছেন—" যার সঙ্গে ঘোরে ফেরে, শুনতে পাই / সে- লোকটার একেবারে চরিত্র খারাপ; / তদুপরি মদ খায়। / এ যা বলে তার পিঠে ওর বুড়ো আঙুলের ছাপ। /যেটুকু বিশ্বস্তসূত্রে জানাগেছে,আড়ালে তা বলা চলে;/বাইরে বলার / অনেক বিপদ; ......" (সহজিয়া / ফুল ফুটুক)

ফুল ফুটুক কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কবিতার নাম 'আমি আসছি'। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে পরাধীনতার কলঙ্কিত শৃঙ্খল। পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিক কায়েমি স্বার্থে মানুষকে নিরন্ন রেখেছে এক শ্রেণীর মানুষ। রাজনৈতিক মুক্তিকামী চেতনা কবিকে সর্বদা বিপ্লবে আহ্বান করে কবি লিখেছেন ——

" আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধির করে তুআমায় ডাকছ।" (আমি আসছি / ফুল ফুটুক)

বিপ্লবী কবি আত্মা দিনরাত্রি অতি পীড়িতের কান্না শুনতে পায়। সচেতন কবিমন তাই বলে ওঠে——" কটি কটি কণ্ঠে দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো ক'রে /কারা কাঁদছে /মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনকে জড়িয়ে ধরে /কারা কাঁদছে /তাই/ বজ্রকে বধির ক'রে তুমি আমায় ডাকছ।" (আমি আসছি / ফুল ফুটুক)

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সমাজের নিচুঁ তলার মানষ, খেটে খাওয়া মানুষ , বঞ্চিত, পিড়ীত মানুষের মুক্তি কামনায় কবি দুহাতে প্রাণপণে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে চলেছেন। সমাজের সমস্ত বাঁধা দূর করে কবি সমস্ত পৃথিবীতে দুরন্ত দুর্নিবার শান্তিপূর্ণ এক মানবিক জগৎ সৃজনের ইপ্সিত লক্ষ্য কবি আত্মায়। তাই কবি বলেছেন——" আমি আসছি—

দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙিন উদ্যত করেছো কে ? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছো কে ? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।।" (আমি আসছি / ফুল ফুটুক)

রাজনৈতিক চেতনা, মানবিকতা, সহমর্মিতা ও শান্তিকামনা এই কবিতার ছন্দোবদ্ধ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ' লাল টুকটুকে দিন'। রাজনৈতিক চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, প্রেম চেতনা, সমাজ ভাবনা এই কবিতার মৌল প্রেরণা। 'পদাতিক', 'চিরকুট' ও 'অগ্নিকোণ' কাব্যের কবি খুঁজে বেড়িয়েছেন মিছিলের একটি কাঙ্খিত মুখ। লাল টুকটুকে সেই মিছিলের মুখ আজ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই মুখ আজ ঘর আলো করে আছে। কবি লিখেছেন —

" তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ।
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো ক' রে ব'সে আছে পিলসুজে।" (লালটুকটুকে দিন / ফুল ফুটুক)

রাজনৈতিক প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠ কবির সমস্ত হৃদয়জুড়ে ছিল। তিনি সাধারণ মাটির মানুষের বুকে জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দিয়ে ধনুকে ছিলা টেনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি চেতনা ও প্রেম চেতনা একাত্ম হয়ে তাঁর মনবীণায় বেজে উঠেছিল। তিনি এই দুই চেতনায় লিখেছেন—"ঠা-ঠাঁ রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া,/ নীল সমুদ্র পুরে গেছে সেই আঁচে/ চোখ মুছি—/ তুমি স্বপ্ন ?/ না তুমি মায়া?/ আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি—/ গলুক / বুকের/ অশ্রুজমাট শিলা।" (লালটুকটুকে দিন / ফুল ফুটুক)

কবির গভীর অভীপ্সা যে, দিক্ দিগন্তে অন্ধকারে হেঁটে জনজাগরণ ঘটানো। তিনি চাইছিলেন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে। মানুষের সাড়া কবিকে আশাবাদী করে তুলেছে। তাই কবির প্রতিশ্রুতি তিনি লাল টুকটুকে দিন আনতে চলেছেন। কবি পৃথিবীর মানুষের জীবনের অন্ধকার, ঝড়ঝঞ্ঝা, মাথার ওপরের বজ্র দূর করার দায়বদ্ধ শিল্পবোধের দৃষ্টান্ত রেখেছেন কবি। প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে কবি মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন লাল টুকটুকে দিন। তিনি তাই লিখেছেন —

" দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে

আনতে চলেছি

লাল টুকটুকে দিন।।" (লালটুকটুকে দিন / ফুল ফুটুক)

এই কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সুন্দর' শীর্ষক কবিতা। কবিতাটির মধ্যে শিল্পসৌন্দর্য ও শিল্পীর জীবনবোধ চিত্ররূপময়তায় ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিছক নর-নারীর প্রেম, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যবোধ তাঁর কাছে মূল্যহীন। তিনি একটি নারীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নরূপে তার সাজ-সজ্জা, হাসিতে কোন সৌন্দর্য দেখতে পান না কবি। তিনি সেই নারীর সৌন্দর্য দেখতে পান প্রতিবাদে, বিদ্রোহে ও জন সমুদ্রে কর্মের প্রবাহে। নারীর সৌন্দর্য কবি দেখতে পান মাথায় চটের ফেসো জড়ানো এক সমুদ্র মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের কর্মপ্রবাহে। নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি অসাধারণ রোমান্টিক কল্পনাময়তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন——" যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল / তখনও নয় / বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম /তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল / তখনও নয় / কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে / তুমি যখন হাসলে / তখনও নয় ... .../ আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।।" (সুন্দর / ফুল ফুটুক)

এই কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রোমান্টিক কল্পনাময়তার সঙ্গে তাঁর শৈল্পিক দর্শন অতীব সহজ ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লৌকিক মানবিক সৌন্দর্য সহসা তাঁর জীবনের একটি দর্শনের প্রকাশক হয়ে ওঠে। তখন সেই লৌকিক সাধারণ নারীকে দেখা যায় না; প্রতিভাত হয় কবির শৈল্পিক দর্শন। কবি লেখেন—— "যখন ভোঁ বাজতেই

মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—

তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।।" (সুন্দর / ফুল ফুটুক)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাব বৈশিষ্ট্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ছিল না। বৃহৎ হৃদয় দৃষ্টিতে তিনি তাঁর দুটি নয়নমণি বা তারা দুটির সমান প্রিয়। এ দু'টির মতো তিনি বাংলাদেশের সীমান্তের

এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার কোনটাকেই বেশী ভালোবাসতে চান না। সীমান্তের এপার- ওপারকে এক্ করে নিজের দুটি চোখের মণির সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। তিনি লিখেছেন——

"আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
... ...
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।।" (পারাপার/ফুলফুটুক)

এইকাব্যের 'পারাপার' শীর্ষক কবিতাটিতেকবি দুটি জায়গাকে এককরে নিতে বলেছেন। এই কবিতায় তাঁর বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত সহজেই মেলে। এই কাব্যে তাঁর ' পুপে' শীর্ষক কবিতাটি রোমান্টিক কল্পনাময়তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ছোট্ট মেয়ে সন্তান পুপে কবিতাটির কেন্দ্র বিন্দু। কবি বলেন তাঁর মেয়ে পুপে গুটি গুটি পায়ে ছাদে গিয়ে প্রকাণ্ড নীল আকাশটাকে লুফে নিতে চায়। কবি ভাবেন এই ছোট্ট মেয়েও তাঁকে একদিন ছেড়ে অন্যকে আপন করে চলে যাবে। অনেক বড় হয়ে তাঁর মেয়ে পুপে স্বামীর বাড়িতে সিঁদুর পরতে গিয়ে তাঁকে মনে করবে। সন্তানের প্রতি অকুন্ঠ স্নেহ ভালবাসার কবিতা 'পুপে'।

এই কাব্যের অন্যতম কবিতা 'আমরা যাব'। প্রতিনিধিত্বমূলক দায়বদ্ধতা থেকে 'আমরা' শব্দটি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন কবি। শহরে জলের কলের টিপ্ টিপ্ টিপ্ জলপরাকে প্রতীকময়তায় শিল্পরূপ দান করেন কবি। টিপ্ টিপ্ করে জল পরা নয় ঘাত-প্রতিঘাত করে বৃহৎ সমাজের সমগ্র মানুষের মঙ্গল সাধনা তাঁদের লক্ষ্য। তাই তিনি লেখেন—

" ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক
আর আমরা জলের কলে শুনি—
চোখ বড়ো-বড়ো করা আকাশের নীচে
পাথরের নুড়িতে নুড়িতে লাফিয়ে - পড়া
এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামাল নদীর

কলতান।"　　　　　(আমরা যাব / ফুল ফুটুক)

ব্রিটিশের দয়া দাক্ষিণ্য নয়, অসংখ্য মানুষ, "যেখানে বন্দেমাতরম্ বলে মানুষ জীবন দিয়েছিল" সেখানে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সীমাহীন স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। সংগ্রাম করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দলগতভাবে চীন রাশিয়া ইত্যাদি লাল ফৌজের ন্যায় মুক্তি আন্দোলনে জয়ী হয়ে শহীদের ইতিহাসে অমরত্বের সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে— এই প্রত্যয় তাঁর মনে ছিল। জগতের শহীদদের পুত্রের সমুদ্রে বিলীন হবার প্রত্যায় তাঁর ছিল। "জলের কলে টিপ্ টিপ্ টিপ্" নয়, তার অটল সিদ্ধান্ত—"আমরা বলেছিলাম যাবো / সমুদ্রে। /নদী বলেছি যাবে / সমুদ্রে। /আমরা বলেছিলাম যাবো / সমুদ্রে। / আমরা যাবো।।" (আমরা যাব / ফুল ফুটুক)

ফুল ফুটুক কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ড্যাং ড্যাং ক'রে'। এই কবিতায় অসাধারণ চিত্ররূপময়তায় একটি বিড়ম্বিত জীবনের চলমানতাকে ছবির মতো তুলে ধরেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পুরুষশাসিত অসহায় নারী জীবনের ওপর অমানবিক আচরণের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করেছেন তিনি এই কবিতায়। যে জীবনে অনেক সংগ্রাম সে জীবনও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অপমান, অবজ্ঞা, লজ্জার জীবনও মাথা উঁচু করে ড্যাং ড্যাং করে সমাজের বুকে হেঁটে চলে কবির লেখনীতে। সেখানে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জটাধারী একটি গাছ। পুরুষ শাসিত সমাজে এক শ্রেণীর নর খাদকের ভোগের শকার হয় এক স্বামীপরিত্যক্তা রমন। তার উপর এই অমানবিক আচরণকে ধিক্কার জানিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ি তনি অসাধারণ জীবনচিত্ররূপ অঙ্কনে সমাজ ও জীবনের সব কটি দিক তুলে ধরেছেন। সমাজের একটি ছবি আঁকতে তিনি লিখেছেন —'ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে

এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাসন মাজে
রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয়
যে মেয়েকে স্বামী নেয় না
যমেরও অরুচি—

ছি ছি!
আবার তার ছেলে হবে!"　　　　(ড্যাং ড্যাং ক'রে / ফুল ফুটুক)

মানুষের এই ঘৃণ্য পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষী বহন করে চলে জটাধারী একটি গাছ— " এক পায়ে / আজীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা / জটাধারী গাছটা / ঝুঁকে প'ড়ে / যত দেখে, তত অবাক হয়।।" (ড্যাং ড্যাং ক'রে / ফুল ফুটুক)

মানবিকতার এই অবমাননা, মূল্যবোধের এই অবক্ষয় এবং অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার দেখে অবাক হয় বৃক্ষ। সমস্ত লজ্জা ও গ্লানি থেকে মুক্ত করে সচেতন শিল্পীমন অসহায় জীবনকে জয়ী করে তথাকথিত সেই অবৈধ জীবনকে জয়ী করেন কবি। তিনি লেখেন —"লজ্জাকে মাথার মণি করা ছোট্ট একটি জীবন—/ ক'দিন আগেও / শানের ওপর যে হামা দিত! / তার মানে— /তাহলে / পৃথিবীতে/ আরো দুটো চোখ / আরো একটা মাথা উঁচু করে / দু পাশে পাখির ডানার মত দুটো হাত / দোলাতে দোলাতে/ মাটিতে ড্যাং ড্যাং করে হেঁটে যাবে।" (ড্যাং ড্যাং ক'রে / ফুল ফুটুক)

কবি দার্শনিক চেতনায় বলেন পৃথিবীতে সে সর্বদা মাথা উঁচু করে বুক চিতিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে সমাজের বুকে হাঁটবে। বিন্দুমাত্র লজ্জার কারণ তাঁর নেই । যার পাশবিক ভোগের ও কামনার শিকার স্বামী খেদানো সেই মেয়ে যাবতীয় পাপ তারই! তাই বয়সের ভারে ঝুঁকে সব প্রত্যক্ষ করে অবাক হয় জটাধারী সেই গাছটি। মানব সভ্যতায় মানুষ কত ঘণ্যকাজও করতে পারে তার জবাবে কবি আলোচ্য কবিতাটি সৃষ্টি করেছেন ।

এই কাব্যের একটি অন্যতম কবিতা "আরও একটা দিন "। বাংলাব গ্রাম - শহব, মাঠ-ঘাট , হাট - বাজারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। এই কবিতায় সেই অভিজ্ঞতার জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। কবি গ্রামের মাটির পথে দু'পায়ে কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে চলা, নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো ধরে ধরে পাব হওয়াব বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কবিতায় ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। রোমান্টিক - চিত্ররূপ অঙ্কন করে কবি এই কবিতায় লেখেন—

" সজনে গাছে ডাল ধ'রে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা।" (আরও একটা দিন / ফুল ফুটুক)

কবিতার শেষ স্তবকে কবি আলো ছড়ার ছবি এঁকেছেন। অভাব মোচনের লক্ষ্যে কৃষকে জলা জমিতে ভালো ধান ফলনের বার্তা শুনিয়েছেন। কবি সামাজিক জাগরণ ও চেতনার আলো ছড়ানোর প্রত্যয় কাব্যের চিত্ররূপ ও কল্পনা প্রধান , সহজ আবেগ প্রধান ও রসপূর্ণ শব্দের যোজনায় তুলে ধরেছেন। তাই কবি লিখেছেন —

"জলায় এবার ভালো ধান হবে—
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে

সারাটা উঠোন জুড়ে

অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।।" (আরও একটা দিন / ফুল ফুটুক)

জীবনের বিভিন্ন সময়ের ভাবনা নিয়ে লিখেছেন একাব্যের ' এখন ভাবনা' কবিতাটি । এখন কবি যৌবনের ভারি দামালো দিনগুলোকে নিয়ে আশঙ্কা করেন যে, সেই দামাল দিনগুলো কালের গতিতে প্রয়োজনে অন্য সময়ে আবার জ্বলে উঠবে। মুক্তি কামনায় যৌবনের দিনগুলোর সংগ্রামী দিনগুলোর ভাবনায় কবি লেখেন— " পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই— / সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে / গর্জমান সমুদ্র / দেওয়ালে গুলির দাগ , / ভাঙা শ্লেট, ছেঁড়া জুতোয় / ছত্রাকার রাস্তা , / পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত । / মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নীচে / যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন ।" (এখন ভাবনা /ফুল ফুটুক)

কবির ভাবনায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচুর্যের দেবী এসে দেখা দেন । ভালোবাসাপূর্ণ জীবন এ জগতের মানুষের জীবনের শান্তি, প্রাচুর্য ও সহযোগিতায় পূর্ণ হয়ে ওঠার ইপ্সিত লক্ষ্য ছিল কবি সুভাষের। কবির প্রত্যাশা তাঁর এই ভালবাসায় গড়া স্বতন্ত্র জগৎ মহাকাল উত্তরসূরীর হাতে পৌছে দেবে। এই ভাবনায় তিনি লেখেন — " হিরণ্য গর্ভ দিন

হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে ।

গান গেয়ে

আমাকে বলছে দাঁড়াতে ।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি —

মাটিতে পড়ে যাবার আগে

আমার ভালোবাসাগুলোকে

নিরাপদে

তার হাতে

পৌছে দিতে চাই ।।" (এখন ভাবনা / ফুল ফুটুক)

'ফুলফুটুক' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'শুধু ভাঙা নয়'। কবিতাটির শীর্ষনামের মধ্যে কবির ইতিবাচক ও গঠনমুখী সৃজন মানসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার লেখেন — "রাজনৈতিক দলমতের কষ্টি পাথরে বিশ্ব সংকটকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে তিনি নিটোল পরিপূর্ণ মানবতাবাদে আত্মস্থ হয়েছেন ।" (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়

, অশ্রুকুমার সিকদার , প্রথম সংস্করণ , অরুণা প্রকাশনী , পৃষ্ঠা ২৫৭) । এখানেআশাবাদ ও মানবতাবাদ সৃজনের ভিত্তি স্থাপনের 'জমি' সন্ধান করেছেন কবি। তিনি এ উদ্দেশ্যে লেখেন—

"ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়
চাষের জন্য যে জমিটা পেলে ভালো হয়।
সে তো ঠিক
বালি-চিক-চিক
ডাঙা নয় ।" (শুধু ভাঙা নয় / ফুল ফুটুক)

জগতে থাবা তুলে আছে ধ্বংসাত্মক শক্তি। আছে নরখাদকের দল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তি, অত্যাচারী মানুষ। কিন্তু সেই চোখ রাঙানিয়া মদমত্ত হাতির মতো আসুরিক শক্তি জীবনী শক্তির কাছে অন্ধ হয়ে গেছে । তাদের জীবনী শক্তি , মানবতাবাদী সঙ্গীত ও নির্মাণের সঙ্গীত শোনানোর আহ্বান জানান কবি তিনি লিখেছেন —"শিখরে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে / গলিত নখ এ রাত্রি। / তবু যদি দুটি একটি করেও পাপড়ি / খুলে যায়, / কাছে থেকো — /পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে / সেটুকুও হয় থেঁতো । / ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে / যারা হয়ে গেছে অন্ধ তাদের নাকের কাছে ধরে দিও / ফুলের একটু গন্ধ ।" (শুধু ভাঙা নয় / ফুল ফুটুক)

'পদাতিক' থেকে 'অগ্নিকোণ' পর্যন্ত ফুল ছিল কবির কাছে ভোগবাদী, রোমান্টিক, বুর্জোয়া ও বিলাসিতার প্রতীক। 'ফুল ফুটুক' পর্বে এসে সেই ফুল হয়ে উঠেছে মানবতা, জীবনীশক্তি, সৃজনীশক্তি ও সহযোগি ভালোবাসার প্রতীক । পার্টিজান কবি দলীয় গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠে মানবতাবাদী বৃহত্তর জগতে আত্মস্থ হয়েছেন। এই পর্বে তাঁর ঘোষণা — "ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।/ মন দাও আজ/ এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে / দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি/ টাঙানোয় ।/ আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক /— একটুও যার ভাঙা নয়।" (শুধু ভাঙা নয় / ফুল ফুটুক)

দেশ জুড়ে মানুষের মনে যে ছবি এঁকে দেবার চিত্রকল্প এই কবিতায় অঙ্কন করেছেন কবি, তার রঙে শুধু বৈচিত্র্য নয়, সেই রঙে বিচিত্র জীবনকে দেখা যাবে। আঘাত আছে লড়াই আছে, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সেই জীবন আহ্বান করেছেন সাধারণের প্রতিটি ঘরে ঘরে যা পূর্ণাঙ্গ এবং যার একটুও ভাঙা নয়। কবি দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তাক্ত দিন অতিক্রম করে সৃজনের সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন।

'ফুলফুটুক' কাব্যের আর একটি কবিতা 'জয়মণি , স্থির হও'। এই নামকরণে আছে লোকজীবনের স্বরূপ। প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঘুর্ণিবায়ু, ভুমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে ভীত সন্ত্রস্ত মা কুঁড়ে ঘরে সন্তানকে বুকে আগলে নিয়ে বলে "জয়মণি , স্থির হও ! জয়মণি ,

স্থির হও !''এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবির জীবনাদর্শ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে একাকার হয়েছে এখানে। কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি লেখেন— ''আমি তারস্বরে চেঁচিয়ে বললাম :

জয়মণি, স্থির হও!
হে কালবৈশাখী, শান্ত হও!
এই পৃথিবীতে ভয় দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা !'' (জয়মণি, স্থির হও / ফুল ফুটুক)

এখানে 'জটা' ও 'আকাশগঙ্গা' শব্দে পৌরাণিক অনুসঙ্গ প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন কবি ।

ইতিহাস চেতনা কবিকে এই কবিতা রচনাকালে আলোড়িত করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাস থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, মহাপ্রলয়, ধ্বংস, সংগ্রাম ও জীবনের প্রতিঘাত শেষে একটি মহৎ জীবনের সৃষ্টি হয়। কবি দেখিয়েছেন যে, চিতার আগুন নিভে গেলে এক নীরব শান্তির আবহ সৃষ্টি হয়। সেখানে অবস্থান করে ভূতেশ্বর। তাই কবি লেখেন — ''কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্য —

নিভন্ত আগুনের চিতায়
জন্ম নেয়
মহিমান্বিত জীবন ।'' (জয়মণি ,স্থির হও / ফুল ফুটুক)

এই পর্বে সংগ্রাম শেষের মহৎ জীবন কবির লক্ষ্য। অন্তর্মনে কবি সংকীর্ণ রাজনৈতিক গন্ডী থেকে মুক্ত হয়ে অসীম আকাশ ছুঁয়েছেন। কবি লেখেন — '' কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ শিখরে উঠে / আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম / আকাশ''। (জয়মণি ,স্থির হও / ফুল ফুটুক)

কবি মহৎ জীবনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ শিখরে ওঠার প্রত্যয় ও লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। এখানে দ্বিখন্ডিত হয়েছে কবিমন। সংঘাত থেকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম। রাজনৈতিক প্রত্যয়দীপ্ত জীবনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের সংযোগ থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা —''কে যেন ডেকেছে আমায় । কে ? /— মিছিলের সেই মুখ;/দিগন্তথেকে দিগন্তজুড়ে ....বাড়িয়ে দিয়েছিহাত। / সে কি স্বপ্ন ? / সে কি মায়া ? /সে কি মতিভ্রম ?'' (জয়মণি, স্থির হও/ ফুল ফুটুক)

এই পর্বে রাজনৈতিক জীবন প্রবাহে কবি সুভাষের মোড় ফেরার পর্ব। কবির অটল বিশ্বাস, মৃত্যুপণ সংগ্রাম ও রাজনৈতিক মোহে সহসা পতন ঘটে। এই সময় থেকে মিছিলের সেই মুখটাকে কবির মনে হয়েছে ছলনাময়ী। কবিকে যেন বিদ্রূপ করে। কবি এগিয়ে চলেছেন নিজেকে সহস্র খন্ডে

ভেঙে ভেঙে। অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে তাঁর জীবন প্রত্যয় ও আদর্শের গতি পরিবর্তন ঘটে। তাঁর সত্ত্বার এই বিশেষ অবস্থা কবি অসাধারণ চিত্রকল্পে ব্যঞ্জিত করেছেন। তাঁর ভাষায় —

''তারপরেই
বিদ্যুতের চকিত কশাঘাতে
দুর্নিবার
বেগান্ধ পতন
সামনে ফেনিল তরঙ্গের গায়ে
নিজেকে সহস্র খণ্ডে ভেঙে
আমাকে বিদ্রূপ করে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ।'' (জয়মণি ,স্থির হও / ফুল ফুটুক)

এই পর্বে তাঁর কবিতা বিষয় ও আঙ্গিকে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। কবি রাজনৈতিক চেতনাকে, মিছিলের সংঘবদ্ধ মুষ্টিবদ্ধ হাতকে, রক্তাক্ত দিনকে নামিয়ে এনেছেন লোকজীবনের অঙ্গনে লোকজীবনের মোহিনী মঞ্চে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য আটপৌরে মুখের ভাষা তাঁর নিজস্ব বয়ন। বিন্যাস বজায় রেখে লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে এই পর্বে কবি সুভাষের লেখনীতে তা কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে। অনশন, শ্লোগান, ধর্মঘট কিংবা অবরোধ নয়; এই পর্বে কবি মানবতন্ত্রে মননশীল হয়ে ওঠেন। কবিতার ভাষা ও ভঙ্গিমা নিজস্ব রীতি মেনে এ-পর্বে কবিতা হয়ে ওঠে। কবি লেখেন — '' পুব দখিনে / আগুন-বোনা / সাত সাগরের ঝি! / আকাশ কেন নীল বর্ণ ? / সাপে কাটল কি ? / সাপে কাটুক, খোপে কাটুক / আছে আমার / মন্ত্র পড়া ফুঁ - / যারে / সাপের বিষ / দিয়েন বিয়েন / ফুঃ।'' (দিয়েন বিয়েন ফুঃ / ফুল ফুটুক)

কবি রাজনৈতিক আদর্শের দৃঢ় প্রত্যয়, বলিষ্ঠ কণ্ঠ এই পর্বে এসে অনেক মোলায়েম ও মাধুর্যে ভিন্ন সৌন্দর্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে। কবি হয়ে ওঠে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের যথার্থ শিল্পী। কবির এই মোড় ফেরার প্রেক্ষিত নির্মিত বজবজের চটকলে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ওতোপ্রোত ঘনিষ্ঠতার সময়। শ্রমিক জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে কবির 'বাসি মুখে' শীর্ষক কবিতায়। 'ফুল ফুটুক' কাব্যের এই কবিতাটির শুরুতে পরিস্ফুট হয়েছে বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের শ্রমিক জীবনের অস্বস্তিকর উপলব্ধির চিত্ররূপ — ''অসহ্য গরমে /একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে / ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের ঘুটঘুটি রাত্তির।'' (বাসি মুখে / ফুল ফুটুক)

এই অসহায় বস্তিবাসীদের ইউনিয়ন, আন্দোলন ও সংগঠনের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী শাসক ও শোষকদল ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। শ্রমিক ও সাধারণ কর্মী জীবনকে ভালোবেসে কবি 'জোনাকির সঙ্গে উপমিত করে শব্দ প্রয়োগের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায় —

''বালব-চুরি-করা রাস্তায়
জোনাকিদের চোখে
চমকে চমকে ওঠে কী এক ষড়যন্ত্র ।'' (বাসি মুখে / ফুল ফুটুক)

শ্রমিক বস্তির মানুষ ষড়যন্ত্রীদের সম্পর্কে সচেতন। তাদের সংগ্রাম শাসক, শোষক ও মালিকদের বিরূদ্ধে। কবি বস্তির শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন কাহিনীমূলক চিত্ররূপময়তায়। সেই বস্তি জীবনের জোলা পরিবারের ছোট্ট বউটা ঘুমানোর সময় পায়না। জীবন সংগ্রামে গভীর রাতেও তাকে কায়িক শ্রম করতে হয়। তাকে কাচতে হয় সুতোর একগাদা বান্ডিল। আবার যুবকটিকে অভাবের তাড়নায় তার পৈতৃক পেশা ছেড়ে বেছে নিতে হয় মদ চোলাই এর কাজ। সেই ছোট বউটা একটা দিনের ঠিক পরের দিনটা খেতে পাবে কিনা সেই দুশ্চিন্তার অন্ধকারের কোনো কিনারা খুঁজে পায়না। কবির ভাষায় —''অন্ধকারকে আছড়াতে আছড়াতে /ছোট্ট বউটা ভাবে - / তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না ?'' (বাসি মুখে / ফুল ফুটুক)

নিশ্চিত উপবাসী জীবনের চিত্রকল্প এঁকে কবি পৌঁছে যান শ্রমিক ও সাধারণ জীবনের নির্মাণ ঘরে। বস্তিজীবনে বসবাসের অভিজ্ঞতার পরিণামে কবির অনুভব ও সত্ত্বায় নির্মিত হয়ে যায় মানবিক গুণান্বিত সাধারণ জীবনের রূপ। কবির মনে যে বস্তি জীবনের হাজার বছরের সর্ববিধ অন্ধকার গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, মানব জীবনের অন্ধকার জীবনের চিত্ররূপ অঙ্কন করে কবি সুভাষ আলোর দিশা দিতে চেয়েছিলেন। এই দিক থেকে এই পর্বে কবির শিল্পীমানসে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অটুট ছিল। এই চেতনায় তিনি সৃষ্টি করেন 'এক অসহ্য রাত্রি' শীর্ষক কবিতাটি। 'ফুল ফুটুক' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটিতে সাধারণ শ্রমিক জীবনের অসহণীয় দুরবস্থাকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণে গ্রহণ করে কবি সুভাষ বিশেষ চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। তিনি লেখেন —

'' কী এক গভীর চিন্তায়
কপাল কুঁচকে আছে
চড়িয়ালের রাস্তা ।
একবার এ-আলোর নিচে একবার ও-আলোর নিচে
গাছের পাতায়

বারবার নড়ে চড়ে বসছে

ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার।'' ('এক অসহ্য রাত্রি'/ 'ফুল ফুটুক')

বস্তিবাসীদের জীবনের স্বাভাবিকতা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানে কবির নজরে পড়ে না দাওয়ায় বসে ধূমপানরত শ্রমিকের বিড়ির আগুন। এমন কি ঘরের এককোণে অষ্টপ্রহর হরিনাম করা পাখির খাঁচাটাও শূন্য হয়ে আছে। জীবনের স্পন্দন অন্ধকারে ধুঁকছে সেখানে। কেবল রাস্তার কুকুর ও পাহারাদার পুলিশের অস্তিত্ব তাঁর নজরে আসে। বস্তি জীবনের অসহনীয় ছবি কবির লেখনীতে চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে সেখানে — '' কশাইখানার বন্ধ ঝাঁপ পাহারা দিচ্ছে / চর্বিতে ফেটে পড়া / একাল ঘেঁড়ে হিংসুটে কুকুর। / . . . . . সাঁকোটার কাছেই / কালরাত্রে যেখানে একটা লোক খুন হয়ে গেলে / যেখানে দিনকে-রাত-করতে-পারা এক / উর্দি পরা পুলিশ / প্রাণপণে লাঠিতে মুখ গুঁজে বৃথাই চাইছে / রাতটাকে দিন করতে।'' (এক অসহ্য রাত্রি / ফুলফুটুক)

যেখানে প্রাণের স্বাভাবিক চলমানতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত মেলামেশা নেই, সেই বস্তি জীবনে রাতটাই সর্বদা বিরাজ করে। যেখানে জীবনের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে আছে সেখানে আলোর অস্তিত্ব নিষ্প্রভ। সেখানে লড়াই চলছে বাঁচার জন্য। এই হৃদয়হীন ছবি এঁকে কবি মানুষ মারার কশাইদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর হৃদয়ে সেই সাধারণের স্বাভাবিক জীবনের ছবি ছিল ইপ্সিত বিষয়। এখানে শ্রমিক বস্তির প্রতি কবির হৃদয়ের সহানুভূতি ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি এই কবিতায় চটকলের শ্রমিকদের হৃদয় বিদারক চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। তাঁর ভাষায় —

''রাস্তার দুপাশাড়ি বস্তি থেকে
মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দম-ফাটা আওয়াজ—
চটের অদৃশ্য ফেঁসোগুলো
বুকের গহ্বরে দড়ি পাকিয়ে
বুঝি হৃদপিন্ডগুলোকে বিষম জোরে টানছে।''(এক অসহ্য রাত্রি/ফুল ফুটুক)

দুর্বিষহ অবস্থায় বস্তিজীবন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। 'ফুল ফুটুক' কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবিতা 'অগ্নিগর্ভ।' বস্তির শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ও রাষ্ট্রের নির্মম শোষণ এবং অত্যাচারে রুখে দাঁড়ায়। অগ্নিগর্ভ মানুষ একবার ক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। শত অভাবের মধ্যেও তারা জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চায়। এই নির্মম ছবিকে কাহিনীধর্মী ও বর্ণনাত্মক রূপচিত্রে শিল্পরূপ দান করেন কবি সুভাষ। তিনি উল্লেখ করেন — '' যে লোকটা একটু আগে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল/ এতক্ষণে সে বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়েছে। /

উঠোন এখন খালি ; / পাড়ার লোক যে যার ঘরে গিয়ে /চোখের পাতার ছিটে বেড়ায় / চনচনে ক্ষিধের দুরন্ত রাত্রিকে রুখছে ।'' (অগ্নিগর্ভ / ফুল ফুটুক)

এই কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ শ্রমিকদের জীবনের বাস্তবতা নির্ণয় করেছেন। পেটের অসহণীয় ক্ষুধা নিয়ে যারা কোনরকমে জীবন টিকিয়ে রেখেছে তাদের মুখগুলো দেখা কবির মর্মান্তিক উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে — ''গোটা দিন নয়,

দিনের আধখানা এখানে জীবন।

সন্ধ্যে হলে অন্ধকারে মোড়া অন্তহীন পাথারে

ডুব দাও

চোখ বন্ধ করো, বন্ধ করো -

পেটের আগুনে মুখ দেখোনা রাত্রির।'' (অগ্নিগর্ভ/ফুল ফুটুক)

বজবজে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে অসহায় ও মর্মান্তিক দৈন্যে পীড়িত শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের জন্য, তাদের আরো প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হবার তাগিদ উপলব্ধি করেছেন কবি। কোনোভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকলেই চলবে না। আবার মাথা উঁচু করে নিজের পায়ে শিরদাঁড়া খাঁড়া করে দাঁড়াবার আহ্বান করেছেন কবি। তাঁর ভাষায় — ''অনেক রাত্রে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে কারা ফেরে। /— না ,এই অন্ধকার থাকার নয়, / পায়ের শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা চমকে চমকে ওঠে। / — না, এই মাথা নীচু করে মরা নয়।'' (অগ্নিগর্ভ / ফুল ফুটুক)

নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেডরা গোপনে ইস্তাহার বিলি করেছিল। সেই প্রেক্ষিতে এই কবিতার 'অগ্নিগর্ভ' নামকরণের স্বতন্ত্র একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে। এই কবিতার শেষে গভীর অন্ধকার পথে এক হয়ে চলার মন্ত্র দিয়েছেন কবি। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতি একটাই, সেটা হল তারা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ। এই এক মন্ত্রে দীক্ষিত করে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য দৃঢ় করতে চেয়েছেন কবি —

'' এত রাত্রে কে যায় ?

— ভাইরে, আমি রাম ; আমি রহিম।'' (অগ্নিগর্ভ / ফুল ফুটুক)

এই কাব্য থেকে কবি সুভাষের কাব্যে নানা রঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মানবতাবাদী চেতনা রয়েছে কাব্যটির নামকরণেও। কবি ফুলকে প্রতীক দ্যোতনায় শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছেন। 'ফুল ফুটুক' কাব্যটি কবি সুভাষের কাব্যের ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এখানে ফুল ফোটার মতো তাঁর অনুভূতি

ও উপলব্ধিগুলি বিকশিত হয়েছে। সেদিক থেকে 'ফুল ফুটুক' কাব্যের নামকরণেও তাৎপর্যবাহী সার্থকতা রয়েছে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যত দূরেই যাই' কাব্য গ্রন্থের (১৯৬২) কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৭ -১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ। কবিবন্ধু অশোক ঘোষ মহাশয়কে উৎসর্গ করেছিলেন এই কাব্যটি। আটাশটি কবিতা সমন্বিত এই কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাস পত্রিকায় ১৯৬৫ সালে ২০ সংখ্যা বিংশ সংকলনে লেখা হয় - "এ বৎসর আকাদেমি পুরস্কার বাংলায় দেওয়া হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। আমরা এজন্য অতীব খুশি হয়েছি। কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, বাংলা কবিতায় তাঁর আগমন অবধারিতের মতো................।"

এই কাব্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য প্রবাহের যেন পালাবদলের মাইলস্টোন । এই কাব্যে কবির জীবনদর্শন ব্যাপ্ত হয়ে সর্বমুখী হয়েছে। এ কাব্যের পর্বে কবি নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘরোয়া সংসারে। ফলে এই পর্বে তাঁর কবিতাগুলিতে বিষয় বৈচিত্র এসেছে। নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় সাদামাটা বাংলার প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক ঘরোয়া গল্প ভাষার অত্যাশ্চর্য সংহৃত রূপে ও শাণিত বাক্ ভঙ্গিমা কবিতার শরীরে অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে। এ বৎসর আকাদেমি পুরস্কার বাংলায় দেওয়া হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। আমরা এজন্য অতীব খুশি হয়েছি। কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, বাংলা কবিতায় তাঁর আগমন অবধারিতের মতো ।এই কাব্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য প্রবাহের যেন পালাবদলের মাইলস্টোন ।

এ কাব্যের পর্বে কবি নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘরোয়া সংসারে। ফলে এই পর্বে তাঁর কবিতাগুলিতে বিষয় বৈচিত্র এসেছে । নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় সাদামাটা বাংলার প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক ঘরোয়া গল্প ভাষার অত্যাশ্চর্য সংহৃত রূপে ও শাণিত বাক্ ভঙ্গিমা কবিতার শরীরে অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে ।

এই পর্বে বিষয়ের অভিনবত্বে, স্বতন্ত্র চিত্ররূপ নির্মাণে, কাব্যিক শৈলী ও নির্মোহ মননশীলতায় তিনি অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনেছিলেন। এই কাব্য বৈশিষ্ট্য সমালোচক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এর একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয় — "............কাব্যগ্রন্থটির সবকটি উজ্জ্বলতম দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রথম প্রয়োজন। এই কাব্যের আরেকটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা তার চিত্রকল্প বা Image রচনায় । কবির সৌন্দর্য্য দৃষ্টি এবং জীবন দৃষ্টির যুগ্ম প্রকাশেই Image গুলির অসাধারণত্ব । নিতান্ত জড়বস্তু কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কবি ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক

তির্যকতা আরোপ করে যে শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তার তুলনা প্রাক্ মহাযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধোত্তর কোন কালের বাংলা কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না । বইটিতে একাধিক এমন কবিতা আছে যাকে বলা যায় এইরকম চিত্রকল্পের মালা ।'' (মহেঞ্জদারো , দ্বিতীয় বর্ষ , প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা , বৈশাখ-আশ্বিন , ১৩৭০ , সম্পা: সমীর রায়) ।

সাহিত্য সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য 'যত দূরে যাই' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখেন — ''যত দূরে যাই' -- গ্রন্থে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় জন্ম । শিল্পী হিসাবে এটি তাঁর নবতর অভ্যুদয় — দিগন্তের ইশারা বহন করে এনেছে । সুভাষের কবিভাষায় গদ্য যে কখন বিশুদ্ধ পদ্যের প্রাণধর্ম লাভ করে তা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না । ধ্বনিকারদের ভাষায় তাঁর গদ্যে পদ্যধর্মের এই অভিব্যঞ্জনা অসং লক্ষ্যক্রম মিতভাষণ সুভাষের স্বভাবধর্ম । 'যত দূরে যাই' গ্রন্থে তাঁর পরিশীলিত কলাকৃতি যেন চারুশীলনের উচ্চশিখরে আরোহন করেছে । এই গ্রন্থে কবিভাবনা গল্পরূপের রূপক ও রূপকথার মিশ্রশিল্প দিয়ে গড়া । তাতে ব্যক্তি চৈতন্যের সাধারণীকৃতি সহজতর হয়েছে ।''(সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতাসংগ্রহ -২,প্রথম প্রকাশ , দে'জ পাবলিশিং , সম্পা: সুবীর রায়চৌধুরী) ।

এই কাব্যটির স্বতন্ত্র ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সাহিত্য সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর 'আমার কালের কয়েকজন কবি' গ্রন্থে । সেখানে তিনি লিখেছেন — ''সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংকলন । ঘিরে থাকা প্রকৃতি ও পরিবেশকে দেখার চোখের অভিনবত্ব , অ-সাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রতিভায়, উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থেই অসম্ভব সার্থকতা দেখিয়েছিলেন। এবং এরপর থেকে শেষ পর্যন্তও তাঁর কবিতায় দেখা যায় এই ক্ষমতার নিরবচ্ছিন্ন সফলতা ।''

এই পর্বের কবিতাগুলির যে বিশেষত্ব তাঁর কাব্যপ্রবাহের ধারায় যে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিল তা সাহিত্য সমালোচক হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় উল্লেখ করেছেন । এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''লৌকিক শব্দ ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত এইসব উপাদানে তাঁর কবিতা অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গম্য ও মূর্ত হয়ে উঠেছে বলেই আমাদের উপর তার আঘাত হয় প্রবলতর। ....প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতি যে অসীম মমতা থেকে তাঁর কবিতা উৎসারিত, তাই তাঁর কবিতাকে মহার্ঘ উপচারে পরিণত করেছে। সাধারণত অভিজ্ঞতা বলতে আমরা নিত্য নৈমিত্তিকের বাইরে একটা কিছু বুঝি, কিন্তু সাধারণ বাঁচাই যে একটা মস্ত ও অফুরন্ত অভিজ্ঞতা সেটা এ ধরনের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, সেখানে এমনকি নেহাৎ বর্ণনাও অনুপুঙ্খের বিশেষীকরণে ও উপমার ''অন্তরঙ্গ চমৎকারিত্বে'' সমৃদ্ধ। (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় ।)

'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থে কবির কাব্যমানসের স্বরূপ, সৃজনশীল ধারায় স্বাতন্ত্র, এবং কাব্যটির মধ্যে অভিনব দিকগুলি সহজেই পাঠকের নজরে আসে। এই কাব্যের রচনাকাল ব্যাপী যে ঘটনাগুলি কবির সৃজনশীল মানসিকতার ওপর গভীর রেখা আঁক কেটেছিল তা 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়'-এর কাব্য সংগ্রহ দ্বিতীয় খন্ডের 'ভূমিকা' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানে লেখা হয়েছে -'যত দূরেই যাই' (১৯৬২খ্রি:) থেকে 'ছেলে গেছে বনে'(১৯৭২খ্রী:) পর্যন্ত এক দশকের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে প্রকাশিত হলো ''সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ'র দ্বিতীয় খন্ড।

দীর্ঘ বিরতির পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিরূপে প্রত্যাবর্তনে আধুনিক কবিতার পাঠককুল খুশি হয়েছিলেন। নানা কারণে এই দশকটি কবির জীবনেরতো বটেই, জাতীয় জীবনেও খুব গুরুত্বপূর্ণ । চীন-ভারত সীমানা লড়াই, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভাগ হওয়া, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরো নানা ঘটনায় কবির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি বিভিন্ন কবিতায়। কবিতা লেখার ধরনও বদলে যাচ্ছে - শ্লোগান ধর্মিতা ছেড়ে কবি বেছে নিচ্ছেন গল্প বলা বা কথোপকথনের রীতি।''

এই কাব্যের আটাশটি কবিতাই উৎকৃষ্ট। সেগুলির মধ্যে লেখকের মূল সুরবাহী প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাগুলি হল — 'কেন এল না', 'লোকটা জানলই না', 'যত দূরেই যাই', 'এখন যাব না', 'মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ', 'আরও গভীরে', 'ঘোড়ার চাল', 'রঙ রুট', 'গণনা', 'যেতে যেতে', 'পায়ে পায়ে', 'ফিরে ফিরে', 'আলো থেকে অন্ধ', 'ছাপছেই' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ এক পালাবদল। তাঁর জীবনানুরাগ এখানে প্রকট হয়ে ওঠে সর্বব্যাপী। এই পর্বে নেমে আসে সাধারণ জীবনের নিতান্ত ঘরোয়া সংসারের সমতল ভূমিতে। ফলে নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় ও অ-রোম্যান্টিক সাদামাটা প্রকৃতি তাঁর সৃজনী শক্তির আকস্মিক অভিনবত্বে, স্বতন্ত্র শিল্পনির্মাণে এবং মননশীল শিল্পী সত্ত্বায় স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করে। এই সময়ে তাঁর কবিতার আটপৌরে মুখের ভাষা শৈল্পিক প্রয়োগের চমৎকারিত্ব আমাদের মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। রূপকথার পর্বের কবিতায় অসাধারণ ও আকর্ষণীয় গল্পের স্বাদ মেটায়।

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'যেতে যেতে'। এই কবিতার শীর্ষনামের সঙ্গে-কবির কাব্য প্রবাহের পথ পরিক্রমা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কবির আত্মপ্রত্যয় নদীর স্রোত এবং মহাকালের প্রবাহে কবির রচনা কালজয়ী হয়ে উঠেছে —''আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল / সময় । / তারপর কানের কাছে/ফিসফিস করে বলল / দেখলে। / কাণ্ডটা দেখলে! /আমি কিন্তু কক্ষনো / তোমাকে ছেড়ে থাকি না ।'' (যেতে যেতে / যত দূরেই যাই) এই পর্বে মানবিক চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, সাধারণ

জনজীবনের চেতনার কাছে তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা প্রসূত কাব্যগুলি বাসি ফুলের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। তাঁর ভাষায় — "তার কথা শুনে

হাতের মুঠোটা খুললাম ।

কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো

সত্যি শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ।" (যেতে যেতে/যত দূরেই যাই) এই পর্বে এসে কবি যেন স্বর্গে উঠে যাবার সিঁড়ির সন্ধান পেয়েছেন। তিনি যেন তাঁর মানস প্রতিমার দেখা পেয়েছেন। তাঁর ভাষায় — "আলো-জ্বালা প্রকান্ড এক শহর। / সেখানে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি , / আর সিঁড়িগুলো সব /যেন স্বর্গে উঠে গেছে। / তারই একটাতে /দেখি চুল এলো করে বসে আছে /এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।" (যেতে যেতে / যত দূরেই যাই)

কিন্তু কবি তাঁর কাব্য জীবনের এই রূপান্তর বিষয়ে অন্তর্মনে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না। তাঁর শিল্প চেতনায় দ্বন্দ্ব থেকে সেই মানস সুন্দরীকে তাঁর জীবনের আশা বলে মনে হয়েছে একবার। কিন্তু সেই সুন্দরীকেই কখনো রাক্ষুসি বলে মনে হয়েছে। তাঁর ভাষায় — "তার পর সেই রাজকন্যা / আমার আঙুলে আঙুলে জড়ালো। / আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম ; / তুমি আশা। / তুমি আমার জীবন।................ / সেই রাক্ষুসিই আমাকে খেলো ।" (যেতে যেতে / যত দূরেই যাই)

এই কবিতায় চিত্ররূপময়তা অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আটপৌরে মুখের ভাষা এই কবিতায় তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্যের নিদর্শণ বহন করে। কবিতার আঙ্গিকে এসেছে গল্প বলার ইমেজ । কবির সমাজ সত্ত্বার দিকে যেন তাকিয়ে থাকে সৃষ্টির দেবী, তাকিয়ে থাকে চুলসাদা আহম্মদের মা, ধানখেত, খেতের আগাছা আর অপূর্ণ বাসনা। 'পায়ে পায়ে' শীর্ষক কবিতাটি সার্বিক দুঃখ ও বিষাদ থেকে জন্ম। সেই অনিবার্য দুঃখ ও বিষাদকে কবি এড়িয়ে চলতে পারেন না। সেই অসহায় বিষাদকে হৃদয়ে জায়গা দিয়ে তাকে দুরন্ত শিশুর মতো কোলে তুলে নেন ।

কবি ক্রমে হয়ে ওঠেন সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের রূপকার। আলোচ্য কাব্যের 'দিনান্তে' কবিতাটিতে রূপচিত্র হিসেবে এসেছে সন্ত্রাসবাদী মুক্তি সংগ্রামের দুর্ধর্ষ ডাকাত, পুলিশের কালো গাড়ি, সরজমিন তদন্ত, জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়া ও ভয়চকিত হরিণী ।এই রূপচিত্রগুলিতে কবির ব্যক্তি জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও পুলিশী অত্যাচার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় সূর্যের আলো, সন্ধ্যার অন্ধকার এবং হাওয়ার সঙ্গে কবির একাত্মতা উপলব্ধি করা যায়। এই কবিতায় কবির প্রকৃতি চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ কাব্যের 'পোড়া শহরে' শীর্ষক কবিতায় গ্রামীণ প্রকৃতিকে নাগরিক জীবনে অন্বেষণ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নাগরিক জীবনের রুক্ষতা কবিকে গ্রাস করে নেয়। তাঁর উপলব্ধিতে ''ইঁট কাঠের প্রকান্ড একটা রাক্ষুসে হাঁ মুখ/ আমাকে ঢেকে নিল''।। এই কবিতার চিত্রকল্পে নাগরিক জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক চলমানতা ছবির মতো এঁকেছেন কবি— ''দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা করে / তুলে নিয়ে / বেলা দশটার ট্রাম / ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল। /কালো কালো মাথাগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে / যেন আত্মসমর্পণের এক ভঙ্গিতে /হাত উঁচু করে আছে ।'' (পোড়া শহরে / যত দূরেই যাই)

এই কাব্যের 'পাথরে ফুল' কবিতাটি কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬) উপলক্ষে রচিত। বিলাসবহুল আভিজাত্য ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক হিসেবে ফুলকে এখানে প্রত্যাখ্যান করেছেন কবি। নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে ব্যবহৃত ফুলকে অস্বীকার করেন তিনি এই কবিতায়। শব দেহের ওপর ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ কবির কাছে শ্রদ্ধার ভন্ডামি বলে মনে হয়েছে। শববাহী ''গাড়ি এখন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে/ মোড়ে/ ধুপ, সেই ধূনো, সেই মালা, সেই মিছিল -/ রাত পোহালে/ সভা-টভাও হবে।''কবির মনে হয়েছে সব মানুষের —

''মনগুলো এখন নরম —
এবং এই হচ্ছে সময় ।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচাটা উঠে আসবে ।'' (পাথরের ফুল / যত দূরেই যাই)

ফুলের জমায়েতকে কবির কাছে অসহ্য মনে হয়। তাই সাহিত্যিকের সঙ্গে একাত্ম কবিআত্মা বলে ওঠে — ''ফুলগুলো সরিয়ে নাও, /মালা /জমে জমে পাহাড় হয় / ফুল / জমতে জমতে পাথর। / পাথরটা সরিয়ে নাও, / আমার লাগছে ।'' (পাথরের ফুল / যত দূরেই যাই) ফুলকে সহ্য না করার অন্য একটি কারণও নির্দেশ করেছেন কবি —

''ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই,
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই ।'' (পাথরের ফুল/যত দূরেই যাই)

কবির ব্যক্তি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক সংগ্রাম । সাধারণের জীবনের সামগ্রিক অন্ধকার মোচন ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস। সংগ্রাম। বিপ্লব আন্দোলন, মিছিল ছিল জীবনের অঙ্গ । কেননা-নিজেই বলেছেন ''তার চেয়ে আমার পছন্দ/ আগুনের ফুল্‌কি/— যা দিয়ে কোনোদিন

কারো মুখোশ হয় না।'' এবং ''রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি/কতক্ষণে কিভাবে সকাল হয়। / আমার দিনমান গেছে / অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে। / আমি একদিন ; এক মুহূর্তের জন্যেও / থামিনি। / জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে/বুকের ঘটে এঁটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম / আজ তা উথলে উঠল।'' তিনি যাবতীয় ভালোবাসাকে নিজের করে নিয়েছেন। মানুষকে ভালোবেসে তাই এবার কবি ভালবাসার কবিতা লিখতে এবার কবি ভালোবাসার কবিতা লিখতে বসেছেন। তাই শুধু কথার কথা নয় — ''আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই ;

যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
যেখানে যায় —
কথার সেই উৎসে
নামের সেই পরিণামে
জল-মাটি-হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।'' (পাথরের ফুল/যত দূরেই যাই)

এই কাব্যের 'যেন না দেখি' শীর্ষক কবিতায় কবি এই পৃথিবীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন ''হে পৃথিবী, আমি যেন সেই / দিনের মুখ / না দেখি।'' যেদিন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে ''............ছানি পড়া চোখের নীচে। তিন মাথা এক করে আছে /লাঠি হাতে .....'' ''কেবল স্মৃতি / শুধু রসি ফেলে ফেলে / জীবনের জল মাপে — সেই অসহায় পরিণতি কবির কাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি তার আগে পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা জানানা— ''তার আগে / তুমি আমার দুটো চোখ / দুটো পায়ে / ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও।।''

এই কাব্যের অনন্যসাধারণ শিল্পিত প্রয়াস 'লোকটা জানলই না' শীর্ষক কবিতা। এই কবিতার সেই লোকটি ভোগবাদী, সম্পদলোভী, চূড়ান্ত বৈষয়িক, আত্মকেন্দ্রিক, অন্তঃসারশূন্য, মর্মান্তিক ট্রাজিক জীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। এই অসহায় মানুষের প্রতি লেখকের আফশোসের উদ্রেক হয়। কবিতার শীর্ষনামের মধ্যে কবির হৃদয়ের কারুণ্য সিঞ্চিত রয়েছে। কবিতার শুরুতে তিনি লেখেন —

''বাঁদিকের বুক —
পকেটটা সমলাতে সামলাতে
হায় হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।
অথচ

আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়।''   (লোকটা জানলই না / যত দূরেই যাই)

সেই হৃদয়, ভালবাসা, মানবিকতা, সহানুভূতির জাগরণী সুর ধরেছিলেন কবি। যে মানুষ কেবল অর্থ এবং অর্থ সঞ্চয়ের বুক পকেটের সমাদর জানে, কিন্তু বুক পকেটের সামান্য নীচে যে হৃদয়ের অবস্থান তার মর্যাদা সে দিতে জানে না তার প্রতি লেখকের করুণা হয় । কেননা, এ জগতের 'আশ্চর্য-প্রদীপ' রূপক ভালোবাসা থেকে সে বঞ্চিত হয় ।

সে নিতান্ত একাকী। একাকী অসহায় জীবনে নিজের অর্থ, ভোগ, বাসনা, লালসাময় জগতকে সে জানে, ভালোবাসাময় জগতের সন্ধান সে কোনোদিন পায় না ; সাধারণের জগতে মিলেমিশে ভালবাসার স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয় । সারাটা জীবন তার কড়ি গুণতে গুণতে অপচয় হয়। ভোগলিপ্সা, অর্থলিপ্সা, ধনসম্পদের লিপ্সা, আত্মকেন্দ্রিকতার মোহে অন্ধ মানুষের জীবন কোন্ সময় খসে পড়ে সে বুঝতেই পারে না । সেই লোকের প্রতি লেখক ব্যর্থ মানবিকতার অবমাননা ও অপচয়ে সহানুভূতি উপলব্ধি করেন। তাঁর ভাষায় — ''তারপর

একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন
লোকটা জানলই না ।''   (লোকটা জানলই না /যত দূরেই যাই)

এই কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'যত দুরেই যাই'। এই কবিতায় ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে কবির উপলব্ধির শিল্প প্রয়াস আছে। এখানে কবিতার শীর্ষ নামের মধ্যে ও ঢেউয়ের মালা-গাঁথা এক নদীর উপমায় জীবনের গতিময়তাকে কবি নির্দেশ করেছেন ; সেইসঙ্গে জগৎ ও জীবনকে দেখার মধ্যে কবির সমস্ত শুভ চেতনা-শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি-উৎকর্ষ-প্রগতিশীল চেতনাকে সারি সারি লক্ষ্মীর পা-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন । কবির ভাষায় —

''আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা

এক নদীর নাম —

আমি যত দূরেই যাই ।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে

নিকোনো উঠোনে

সারি সারি

লক্ষ্মীর পা

আমি যত দূরেই যাই ।।" (যত দূরেই যাই / যত দূরেই যাই)

এই কাব্যের 'ফিরে ফিরে' শীর্ষক কবিতাটি কবি সুভাষের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফসল। চরম অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কবি একদা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ফেরেন । অনেকের কাছে মিথ্যা আশায় কেবলই হতাশ হতে হয় কবিকে। সন্তানের সামান্য একটি বায়নাও সে সময় মেটাতে পারেননি কবি। সেই সময়কার বিশেষ উপলব্ধি 'ফিরে ফিরে' শীর্ষক কবিতায় নিহিত রয়েছে।

সমালোচক বিজয় সিংহের ভাষায় "১৯৫৩ সালে জেল থেকে বেরোনোর পর থেকেই দীর্ঘকাল টানা আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় কবিকে । বিয়ে করেন। ক্রমে জীবন বৃত্তে এসে দাঁড়ায় মেয়ে পুপে । অভাব অনটনের সংসারে খুব দরকারী হয়ে পড়ে একটা চাকরী। বহু জায়গায় যোগাযোগ করেন। বহু পরিচিত জন তাঁকে নানা আশার কথা শোনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুকনো স্তোকবাক্য ছাড়া কিছুই জোটে না কপালে। 'ফিরে ফিরে' কবিতা সেই অসময় থেকে উঠে আসা কবিতা । 'সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে/ নামছি/ নামছি' — নানা অফিসে দিনের পর দিন ধর্ণা দেওয়া আর আশাহত হয়ে ফিরে আসার ছবিটি মুদ্রিত এই সব পংক্তিতে। 'বলেছিল —আসবেন/ দেখব, আসবেন'—ইত্যাদি পংক্তিতে সেই সব ব্যর্থ স্তোকবাক্যের ছবি। 'বলেছিলাম — মা আমার/ খেলনা আনব'—এই মা আসলে কবির মেয়ে, যার সামান্য বায়না তখন মেটানো যায়নি ।" ('সুভাষ মুখোপাধ্যায়': 'জীবন ও সাহিত্য' সম্পা : সন্দীপ দত্ত।)

পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য কবির চেষ্টা এবং তা অনেকের মিথ্যে আশায় ব্যর্থ এই কবিতার বিষয়। এই সাধারণ বিষয় কি সহজ ভাষায় ও ভাবে কবিতায় ছবি এঁকেছেন কবি। এতে লেখকের চিত্র রূপময়তার নিপুণ শিল্প প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায় — " বলেছিল — আসবেন / দেখব, আসবেন। / আচ্ছা, আসবেন দেখব। / বলেছিল। / সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে

আমি নামছি / নামছি / বলেছিলাম — মা আমার / খেলনা আনব — / মা আমার, /আজ ঠিক আনব। / বলেছিলাম।''   (ফিরে ফিরে / যত দূরেই যাই)।

ছোট্ট সন্তান পুপে-কে কথা দিয়েছেন তিনি খেলনা কিনে আনবেন। কবিকে কেউ কাজের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ কথা রাখেন নি । তাই কবি বলেন বার বার ''সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি / নামছি / নামছি' ; কিন্তু একের পর এক অফিসের সিঁড়ি ভেঙে হতাশ হতে হয় তাঁকে। কবির জীবনের আর্থিক অনটনের বাস্তব ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই কবিতায় ।

এই কাব্যের 'কে জাগে' শীর্ষক কবিতাটিতে সমস্ত কর্মজীবী মানুষের কোন্ সকালে জেগে ওঠার ছবি এঁকেছেন কবি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে চলে সাধারণ কর্মজীবী মানুষ। লেখার উৎকর্ষ শিল্প প্রতিভার গুণে 'এই শহরটা' হয়ে উঠেছে একটি জীবন্ত সত্ত্বা। কবি কর্মজীবী মানুষের ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবেসে মানুষের কাজকে খাদহীন রূপে মহাকাল গ্রহণ করেন। মহাকালের আহ্বানে কবি নিঃস্বার্থ ও নিখাদ ভালোবাসার দ্বারা সকলকে কালোত্তীর্ণ করে তোলার প্রত্যাশা করেন। তাঁর ভাষায় —

''রক্তে রক্তে শোনা যাবে
জলদগম্ভীর মহাকালের হাঁক
'কে জাগে ?'
ভালোবাসার গা থেকে
ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে
তারস্বরে সগর্বে বলে উঠব —
আমরা। ''   (কে জাগে / যত দূরেই যাই)

এই কাব্যের 'আরও গভীরে' শীর্ষক কবিতাটিতে কবির সংগ্রামে জয়ী হবার দৃঢ় প্রত্যয় ও বীজমন্ত্র শোনা যায়। আসন্ন ঝড়ের প্রাক্ মুহূর্তে বিশেষ পরিবেশ ঘনীভূত হওয়ার চিত্ররূপে তুলে ধরেছেন লেখক এবং সেই ঝড়কে গোল কালো একটা পাথরের নখে শান দেবার উপমায় সামাজিক বিপদকে নির্দেশ করেন কবি— ''পিঁপড়ে গুলো ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে
ছুটে পালাচ্ছে গর্তে ।
ঝড় এখুনি উঠবে ।
মাঠ জুড়ে থমথম করছে ভয়
ঘাসের ডগা গুলো কাঁপছে
আর কোথায় যেন ঝটপট

ঝটপট করছে

দিগ্‌ভ্রান্ত পাখিদের ডানা ।'' (আরও গভীরে / যত দূরেই যাই)।

সামাজিক যে কোনো আঘাতে নিজেদের হিম্মত বজায় রাখার বজ্রসম মনোভাব ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সদর্থক জীবন প্রত্যয় তুলে ধরেছেন কবি। জীবনে অভাব, আঘাত, ঝড়, বিপদ ঘনীভূত হবে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জয়গান শুনিয়েছেন কবি। তাঁর ভাষায় — '' ঝড় যদি আসে আসুক / চলে যেতে কতক্ষণ? / আমরা যেখানে আছি / আকাশে মাথা তুলে / সেখানেই থাকব / মাটির / আরও গভীরে /শিকড় গুলো চালিয়ে দিয়ে ।।'' (আরও গভীরে / যত দূরেই যাই) কবির গভীর বিশ্বাস মাটির কাছাকাছি যারা থাকেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঐক্যবদ্ধ জোটের দৃঢ়তা মজবুত হয়ে সমাজের যে কোনো বিপদকে জয় করে আপন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো অসম্ভব।

এই কাব্যের 'ঘোড়ার চাল' শীর্ষক কবিতাটিতে দাবা খেলার ঘোড়ার চালকে তাৎপর্যময় একটি তত্ত্বের উপর শিল্পরূপ দান করেছেন । এখানে ভোগবাদী পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের বিপদ ও সর্বনাশকে নিশ্চিত করে তুলেছে। তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করেও প্রতিরোধের বাঁধ নির্মাণ করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায় । কবির ভাষায় অত্যাচার-শোষণ ও বঞ্চনার দ্বারা শাসক ও শোষক শ্রেণী ক্রমশ তাদের বিপদ বাড়িয়ে চলেছে। কবি বলেন — '' লোভের কাঁটা-মারা জুতোগুলো

পায়ে পায়ে বেঁধে

ছিঁড়ছে ।'' (ঘোড়ার চাল / যত দূরেই যাই)

এই দুনিয়ার সমস্ত মেহনতি মানুষের প্রতিরোধ তাদের প্রতিহত করার দৃঢ় বিশ্বাস কবির চেতনলোকে রয়েছে। তাই তিনি বলেন — ''চাল ফেরত নেই,

সারা পৃথিবীটাকে বাজি রেখে

আমাদের খেলা।

ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক

আমরা আড়াই-ঘরের পাল্লায়

ওদের পাব।

ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে।'' (ঘোড়ার চাল / যত দূরেই যাই)

আলোচ্য কাব্যের রাজনৈতিক চেতনা প্রসূত কবিতা 'গণনা' - এই কবিতায় কবি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত রাজনৈতিক অত্যাচারকে শিল্পরূপ দান করেছেন। সমকালীন কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর কংগ্রেসী অত্যাচারকে কবি কবিতার শিল্পরূপে তুলে ধরেছেন। কবি বর্ণনাত্মক ঢঙে বলেছেন — "আমি দেখতে পাচ্ছি — / রাস্তায় সারিবদ্ধ লাঠির শরশয্যা, / দু-নলের অনলে দুমদাম/ মুখাগ্নি ; / তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মতো / ধোঁয়ার কালো গাড়ি /আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। /আমি দেখতে পাচ্ছি — / হাতে হাতে ফিরছে একটা ফর্দ — / নিহতের / আহতের / নিখোঁজের।" (গণনা / যত দূরেই যাই)

কংগ্রেসি অত্যাচারের এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য শপথ নেন অত্যাচারিত সাধারণ পার্টিকর্মী । অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক, হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান কবি। তাঁর ভাষায় - অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠার আহ্বান শোনা যায় — "রক্তের মতো লাল

আগুনের মতো উদ্‌গ্রীব

নিশানের মতো অশান্ত

মুষ্টিবদ্ধ

যার পাঁপড়িতে ঢাকা

এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ।" (গণনা / যত দূরেই যাই)

হিংস্রতা, আক্রমণ ও আঘাতের পরিণাম কবি গণনায় নিশ্চিত করে তুলেছেন এই কবিতায়। সেই অত্যাচারিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"আমি বলে দেব /ওদের কপালে কী লেখা আছে।" (গণনা / যত দূরেই যাই)

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'রাস্তার লোক' । রাস্তায় একটা চলন্ত লোকের বিশেষ উপলব্ধিতে লেখকের বিশেষ প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। রাস্তায় যে লোকটি হেঁটে যাচ্ছিল সেই রাস্তা মসৃণ ছিল না। এই পথ চলার মধুরস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনের বিভিন্ন বেদনা ভরা স্মৃতি। পথ চলতে গিয়ে সে প্রত্যক্ষ করে মানবতার আগামী দিনের ভবিষ্যৎকে এক শ্রেণীর দজ্জাল মানুষ মায়ের কোল শূন্য করে রাস্তায় ফেলে রেখেছে। এভাবে মানবিকতার অবমাননা কবির দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেই রাস্তার লোকের কথায় কবি বলেন —

"সামনে পা ফেলতে গিয়ে

লোকটা হঠাৎ

শিউরে পিছিয়ে এল।

ইস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল

মায়ের কোল-ছেঁড়া

একটা দুধের বাচ্চাকে।''   (রাস্তার লোক / যত দূরেই যাই)

কবি সমাজের শাসক, শোষক ও অত্যাচারী মানুষের পতনকে পৌরাণিক রাবণের চিতা জ্বালোনোর মধ্যে দিয়ে আভাসিত করেছেন। কবির সচেতন ও সভ্য মনকে সেই ভয়ঙ্কর দিনের নৃশংস স্মৃতি ভীষণ আঘাত করেছিল । সেই ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ায় কবি লেখেন —''পেছন থেকে /একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি / তার নাম ধ'রে / চিৎকার ক'রে ডাকছে।/ হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ ক'রে / লোকটা তাড়াতাড়ি / পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। / তারপর যেতে যেতে / বন্ধ দু-কানে সে শুনতে পেল / রাবণের চিতা / দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।''   (রাস্তার লোক/যত দূরেই যাই)

'যতদূরেই যাই' কাব্যের অনন্য সাধারণ একটি কবিতা 'কেন এল না' । সমকালের সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, খুন, জখম, বোমাবাজি ও অস্থির সামাজিক পটভুমীতে কবিতাটি রচিত। অসাধারণ মননশীলতা ও শিল্পচাতুর্যে রচিত কাহিনী মূলক কবিতা। মানবিক চেতনা জাগরণের ও করুণ পরিণতি মূলক এই কবিতাটি। একটি ছেলে সারাটা দিন নেচে নেচে বেড়িয়েছে, আজকে তার বাবা পূজোর জামা কিনে আনবে বলে। অফিসে যাবার সময় ওর বাবা বলে গেছে পূজোর কেনাকাটা করবে বলে আজ মাইনে নিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে। 'জানলার দিকে মুখ ক'রে / ছেলেটা বই নিয়ে বসল মাদুরে / সামনে ইতিহাসের পাতা খোলা।'' কিন্তু ''বাপের আদরে-মাথা-খাওয়া ছেলের মতো / হিজিবিজি অক্ষর গুলো একগুঁয়ে / অবাধ্য — / যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে / নড়বে না ।'' ক্রমশ সময় কেটে যায় কিন্তু বাবা ফিরে আসে না। 'ঘড়িতে টিকটিক শব্দ।/ কলে জল পড়ছে। / ও-বাড়ির পাঁচিলটা থেকে লাফিয়ে নামল / একটা গোঁফয়ালা বেড়াল।'' এদিকে ''রাস্তায় আলো জ্বলেছে অনেকক্ষণ / এখনও / বাবা কেন এল না, মা? ওর মা ভাবেন — ''বলে গেল / সেই মানুষ এখনও এল না। / কড়ার গায়ে খুন্তিটা / আজ একটু বেশি রকম নড়ছে। / ফ্যান গালতে গিয়ে / পা-টা পুড়ে গেল। ছেলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে 'এখনও / বাবা কেন এল না মা ?/ রান্না কোন্‌কালে শে / গা-ধোয়াও সারা / মা এখন বুনতে ব'সে / কেবলি ঘর ভুল করছে/ খুট করে একটা শব্দ- / ছিটকিনি খোলার / কে ? / মা, আমি খোকা। / গলির দরজায় ছেলেটা দাড়িয়ে। / এখন রেডিওয় খবর বলছে। / মানুষটা এখনও কেন এল না ?'' এর পরের ঘটনা লেখকের কথায় বর্ণিত হয়েছে । কবি সুভাষ লিখেছেন— ''একটু এগিয়ে দেখবে ব'লে

ছেলেটা রাস্তায় পা দিল। /
মোড়ে ভিড় ;
একটা কালো গাড়ি ;
আর খুব বাজি ফুটছে ।
কিসের পুজো আজ ?
ছেলেটা দেখে আসতে গেল।
তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলি গলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল ।
ছেলে এল না ।''   (কেন এল না /যত দূরেই যাই)

এই ছেলে কেন এল না ? এর দায় কার উপর বর্তাবে কবি তা নির্দেশ করেছেন। এর জন্য তিনি সামাজিক সভ্য মানুষের চেতন লোকে আঘাত করতে চেয়েছেন। অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সেই ছোট্ট ছেলেটি। পুজোতে তাঁর বাবার আনা নতুন জামা সে পরবে। এভাবে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ায় কবিমন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এই কাহিনীমূলক কবিতাটির দ্বারা হিংসা, বিবাদ, ভুলে মানবতাবাদের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন কবি।

আলোচ্য কাব্যের 'বারুদের মতো' শীর্ষক কবিতায় প্রকৃতি চেতনা কবিকে আলোড়িত করেছিল । চিত্ররূপময়তা এই কবিতার-লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কবি লেখেন — '' এক টুকরো রোদ / মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে / হাঁটু মুড়ে / যেন মগরেবের-নমাজ পড়ছে''। (বারুদের মতো / যত দূরেই যাই) এছাড়া ''তারপর বেড়ার-গায়ে / জোনাকিরা দল পাকিয়ে / উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মতো /সারা রাত / জ্বলবে আর নিভ্‌বে''। (বারুদের মতো / যত দূরেই যাই)এই কবিতায় সমকালের পুলিশী অত্যাচারকে পদ্যবন্ধে বেঁধেছেন কবি। তিনি লিখেছেন —

''তারপর শেষ রাত্রে
রাস্তায় ভারী বুটের শব্দ
খয়েরি টুপি পরে
উঠোনে পা নামাবে ষড়যন্ত্র'' (বারুদের মতো / যত দূরেই যাই)

কবি সুভাষ রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন পার্টিজান মানুষ। স্বাভাবিকভাবে বামপন্থী মানুষের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল অধিক। কালক্রমে এই জীবনদর্শন তাঁর কাছে একদা বোকামির নামান্তর বলে মনে হয়। আলোচ্য কাব্যের 'বোকা' শীর্ষক কবিতার বুড়ো খোকাকেও বোকা বলে মনে হয়েছে। তাঁর ভাষায় — ''ওহে খোকা। ব'সে পড়ো ব'সে — / এদিকে তো পেকে গেল দাড়ি / কেন আর করো এ বয়সে / এর-ওর তার সঙ্গে আড়ি? / তার চেয়ে দেখ ডাইনে বাঁয়ে / পথে এসো। বদলিয়ে স্বভাব / চোখ বুজে হাত রেখে পায়ে / জোরসে বলো; ভাব ভাব ভাব। /.......... ঘাড়টা নুইয়ে হও কুঁজো — / কথাই রয়েছে : যাকে রাখো / সেই রাখে। ভালো ক'রে বুঝো।'' (বোকা / যত দূরেই যাই)

সবাইকে মেনে নিয়ে স্বভাবের এই পালা বদল ব্যক্তি জীবন ও কাব্যে একই সঙ্গে ঘটেছে কবি সুভাষের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক চেতনার কবিতা 'রংরুট'। 'রংরুট' কবিতায় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির পরাজয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে পার্টির একাংশ। তাদের উজ্জীবিত করার জন্যে রচিত 'রংরুট'। তবে 'পদাতিক,' 'চিরকুট,' কিংবা 'অগ্নিকোণ' কাব্যের রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত কবিতার ঝাঁঝ এতে নেই। শান্ত ভাবের এই কবিতায় নৈরাশ্যবোধ প্রতিরোধের জন্য সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। কবিতার ভাব ও গঠনশৈলীতে সংগ্রামী উদ্দীপনার চেয়ে সান্ত্বনা প্রাধান্য পেয়েছে এই কবিতায় —

''হেরেছি ? তাতে কি ?
কখনও যায় না শীত
এক মাঘে।
আছে
লড়াইতে হার জিত।'' (রঙরুট / যত দূরেই যাই)

পরাজিত পার্টিকর্মীদের মনে আশার সঞ্চার করার প্রয়াস এই কবিতার লক্ষণীয় বিষয়। এখানেও মিছিলের আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু তাতে বাড়তি কোন উদ্দীপনা শোনা যায় না। শোনা যায় না কবির চড়া সুরের গলা। সেখানে তিনি লেখেন — ''এসো নিচু হয়ে ভরি / শুকনো বারুদ / আশার নতুন খোলে। / বীরের হৃদয় / যেন লক্ষ্য না ভোলে / অন্ধকারের পর্দা থাকুক / টানা। / সবুজ পাতায় ঢেকে দাও / আস্তানা। / .... / বাইরে / কিসের আওয়াজ ? / মিছিলে কারা ? / বাজাতে বাজাতে চলেছে / কাড়া-নাকাড়া। / চোখে চোখে চায় / যারা ছিল দলছুট। / নাম লেখো। ময়দানে যাবে রংরুট। '' (রঙরুট / যত দূরেই যাই)

আলোচ্য কাব্যের 'এখন যাব না' শীর্ষক কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের উপলব্ধির অসাধারণ শৈল্পিক ব্যবহার। চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়। কবির বিরুদ্ধে ওঠা নানা সমালোচনাকে সদর্থক দৃষ্টিকোণে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন —

"বাতাসের কান আছে দেখছি —
হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,
না, আমি গেলাম না নয়
আমাকে নিল না ।
. . . .
সব বেড়ালের ভাগ্যেই
শিকে ছেঁড়ে না ।" (এখন যাব না / যত দূরেই যাই)

স্বপ্ন ও প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাঁর এই কবিতায় —" আপনাকে এই বলে দিচ্ছি, দেখে নেবেন — / কারো বাপের সাধ্যি নেই / লাথি মেরে / আমাকে এই পৃথিবী থেকে হটায় /আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম। / যতক্ষণ বরাবরের মতো / মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার / একটা ভালো ব্যবস্থা না হচ্ছে / ততক্ষণ / মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচব। / তারপর জীবন যখন খুব করে সাধবে / তখন ভেবে দেখব / যাব কি যাব না।" (এখন যাব না /যত দূরেই যাই)

মানব সভ্যতার অন্ধকারে ডুব দিয়ে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন একটু একটু করে কিভাবে মানুষ আলো থেকে অন্ধকার জগতে ডুবে যায়। কিভাবে মানুষ 'ঘাড় হেঁট করে' "সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভালো মন্দ ইত্যাকার নানান বিষয়ে / ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে " ক্রমশ নিজেকে নরকে নিমজ্জিত করে। আলোচ্য কাব্যের 'আলো থেকে অন্ধকারে' শীর্ষক কবিতায় কবি দেখিয়েছেন সমাজের সাধারণ মানুষ সমস্ত অভাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এক সময় - "ভয় ভালোবাসা লজ্জা/সমস্ত ঘুচিয়ে " অন্ধকারে ডুবে যায়। এই অন্ধকার একসময় বিস্তৃত হয়েও হিংস্র হয়ে সভ্যতাকে নরকের দ্বারে উপনীত করে। কবির ভাষায় — "যেখানে সভ্যতা ভুলে / খালি পেটে / নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধার / দুপাশে দাঁড়িয়ে উঠে / হিংস্র অন্ধকার / টান মেরে খুলে দেবে নরকের দ্বার।' (আলো থেকে অন্ধকারে / যত দূরেই যাই) এই কবিতায় কবি সুভাষ দেখিয়েছেন সভ্যতার আলো থেকে মানুষের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার শিল্পিত চেতনা। দেখিয়েছেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার তথ্য সূত্র। সমকালের জগৎ ও জীবন।

আলোচ্য কাব্যের 'পা রাখার জায়গা'- শীর্ষক কবিতায় অসাধারণ চিত্ররূপ ব্যবহারের নিপুণ দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কবিতার প্রথম অংশেই জগৎ ও জীবনের অসাধারণ শিল্পিত রূপ রয়েছে। তিনি লিখেছেন — "পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকি-কুকুরের মতো

পোকার জ্বালায়

নিজের ল্যাজ কামড়ে ধ'রে

কেবলি পাক খাচ্ছে ;

আর একটা প্রকান্ড ফাঁকা পোড়ো বাড়িতে

তার বিকট আর্তনাদই হল

জীবন ।" (পা রাখার জায়গা/যত দূরেই যাই) জীবনের সার্থকরূপ এই কবিতায় বৈচিত্র্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। কবি লেখেন —"একজন /একটা চাবির গোছা / দু-হাতে ঢালা-উপুড় করতে করতে / হেঁটে / রাস্তা পার হচ্ছিল।"(পা রাখার জায়গা/যত দূরেই যাই) কবির এই বক্তব্যকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বৈষয়িক, এবং ঘর সংসারের তাল সামলাতে সামলাতে তার জীবন অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। কিন্তু একসময় যখন সে পিছন ফিরে তাকায় তখন তার জীবনের একঘেয়ে ছাপ সমাজে সনাক্ত হয়ে গেছে। তখন সে খুব দ্রুত সমাজ বৈচিত্র্যে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে। কবির ভাষায় —

"বিরক্ত হয়ে চাবির গোছাটা পকেটে রাখতে গিয়ে

নজরে পড়ল

গোটা রাস্তা তার দিকে ফিরে

তাকে আঙুল দিয়ে সনাক্ত করছে।

নিজেকে একটু একা পাবার জন্যে

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।" (পা রাখার জায়গা /যত দূরেই যাই)

বৈষয়িক ও ভোগবাদী সর্বস্ব জীবনের ছবি এঁকে কবি তার অন্তঃসারশূন্যতাকে দেখিয়েছেন। যেখানে মানুষের ব্যবহার ও অসাবধান ভোগবাদ ও যৌনতা তাকে একটা বিশ্রী ব্যাপারে মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। সেখানে নবীন ও প্রবীণের পরিবর্তিত সমাজ কবির কাছে ছবির মতো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন — "ছোকরার আক্কেল দেখে এক বুড়ো / ছানি কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায় / দূরবীনের মতো করে ধরে , / ডান হাতের লাঠিটা মাটি ছেড়ে ঈষৎ তুলে, / আর হাতের লাঠিটা

দিয়ে খুব জোরে / 'হুঁঃ' আর 'ঠকাস' / এই দুটো শব্দ বের ক'রে / যেদিক দিয়ে উজিয়ে এসেছিল সেই দিকেই ফের / চলে গেল ।" (পা রাখার জায়গা / যত দূরেই যাই)

সাধারণের খুব কাছাকাছি, মাটি ঘেঁষা জীবনের সঙ্গে কবিমন এই পর্বে একাত্ম হয়ে আসে চায়ের দোকানে গরম কাপের ছ্যাঁকা, ফুটপাতে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে উবু হয়ে বসে কাঠকয়লার আগুনে মুখে ফুঁ দিয়ে লোহার কড়াইয়ে ভুট্টা পোড়ানোর ছবি। কবি দেখেন সেই সব মানুষকে যাদের লক্ষহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে পা ধরে যায়। দেখেন ভিন্ন ধরনের জীবনের ছবিও। যে জীবনের অঙ্গ — "শো-কেস ।/ ভেতরে খুব বাহারে সব জিনিস / আহ্ হা ! রেফ্রিজারেটার! বেশ রেডিওটা! ওহো," (পা রাখার জায়গা / যত দূরেই যাই)

কবি সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখছেন মানুষ অর্থ কামাবার জন্য ছুটে চলেছে। এজন্য কেউ কেউ ইলেকট্রিক ক্ষুরের দাম জানতে চাইছে। কিন্তু সেই ভোগবাদী, অর্থলিপ্সু, বৈষয়িক মানব একসময় নিজের জীবনের পিছনের দিকে তাকিয়ে জীবনের শূনতা দেখে হতাশ হয়ে ওঠে। তখন সে জগতে নিজেকে একাকিত্বের পৃথিবী আবিষ্কার করে। সামাজিক মানুষের জীবনের এই বিশেষ উপলব্ধি কবির লেখায় ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি লেখেন — " জামা নয়, শাড়ি নয়, রেডিও নয়, ঘড়ি নয় -/ কী আশ্চর্য / কাঁচের গায়ে অবিকল সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে ; / তার সামনে আস্ত একটা মানুষ / বুক টান করে দাঁড়িয়ে।/ দেখে সে যেন এই প্রথম আষ্কিার করল / পৃথিবীর / জীবনের / সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে / যে দুটো হাত / কী আশ্চর্য, সে হাত দুটো / সমস্তক্ষণ তো তার পাশাপাশিই ছিল।' (পা রাখার জায়গা / যত দূরেই যাই)

যে মানুষ কেবল আত্মপরায়ণ ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে দেখে এলো সারা জীবন, সম্পূর্ণ জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে যে মানুষ হতাশ, তার মুক্তির পথের সন্ধানও দিয়েছেন কবি। অনায়াসে সে মানুষের বিস্তৃত হৃদয়ে সবার মাঝে নিজের একটু পা রাখার জায়গা পায়। কবির ভাষায় যাত্রী বোঝাই বাসে সে মানুষ বলে — "হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই! / ও দাদা, একটু এগিয়ে যান — / দয়া ক'রে, / স্যার, একটু পা রাখার জায়গা।" (পা রাখার জায়গা / যত দূরেই যাই)

আলোচ্য কাব্যে অসাধারণ কাহিনীধর্মী ও নিগূঢ় তাৎপর্যবাহী কবিতা - 'মেজাজ'। মধ্যবিত্তের সাধারণ ঘরে এক কালো অলুক্ষুণে / পায়ে খুরওয়ালা ধিঙ্গি 'গৃহবঁধূ' আনা হয়েছে এক শাশুড়ির কাছে। এজন্য সেই গৃহবঁধূর বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল -"। মেয়ের গায়ের রঙ কালো বলে তার বাপের 'গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল।' এই গৃহবধূ যে তার শ্বশুর বাড়িতে কি পরিমাণে মর্যাদা ও অধিকার পাবে তা আন্দাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই পরিবারে শাশুড়ি থলির ভেতর হাত

ঢেকে বিড়বিড় ক'রে জপেন। সেই পরিবারে শাশুড়ি- বৌ-এর নিত্য ঝগড়াকে অসাধারণ চিত্ররূপে তুলে ধরেছেন কবি সুভাষ। তাঁর ভাষায় —

"মালাটা থেমে গেল ; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেই দিকে ঢলে পড়ল ।
নীচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।
বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পর মুহুর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
কলকাতায়
ঝমর ঝম্ খনর খন্ ক্যাঁচ ঘ্যাষঘিষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল ।...
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয় -
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।" (মেজাজ / যত দূরেই যাই)

এরপর স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ির মালার থলেতে উঠে আসে বউমাকে মারবার বিষ। সব প্রতিকূলতাকে উত্তীর্ণ করে কবি সেই কালো গায়ের রঙের গৃহবধূকে বাঁচার সন্ধান ও অমৃতে স্থান দেন। শাশুড়ির নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বউ রুখে দাঁড়ায়। কবির ভাষায় — "বউ যেন মা-কালীর মতো রণ-রঙ্গিণী বেশে / কোমরে আঁচল জড়িয়ে /চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।" (মেজাজ / যত দূরেই যাই)

অত্যাচারের সামনে রুখে দাঁড়ানো বাঙালী তথাকথিত শাশুড়ির কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। শাশুড়ি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে যান। তার মতে 'বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল/ তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।/" তারপর দরজা দেবার পর রাত্রে বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে শাশুড়ি যা শুনতে পায় তা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে অসাধারণ তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত করেছেন কবি। ছেলে এবং বউমার একান্তে আলাপ শোনার জন্য আড়ি পাতার প্রবণতাকে শিল্পিত ও শ্লেষ ভঙ্গিতে কবি

শাশুড়িকে লজ্জা দিয়েছেন। শাশুড়িকে লজ্জা দিয়ে দাম্পত্য জীবনের গোপন মেলামেশা ও গোপন কথায় আড়ি পাতা সামাজিক বর্বরতাকে পরিহার করতে বলেছেন কবি।

তিনি লিখেছেন — '' মোটা চশ্মায় কাঁথা সেলাই করতে করতে / শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন /বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল / তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার। /তারপর দরজা দেবার পর /রাত্রে /বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে /এই এই কথা কানে এল — / বউ বলছে —'একটা সুখবর আছে।' / পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না / খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ, / মা হয়ে আর দাড়াতে লজ্জা করছিল। / কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার— / বউয়ের গলা, মা কান খাড়া করলেন। / বলছে — দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।' /এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত । / ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে / কী নাম দেবো জানো ? / আফ্রিকা । / কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'' (মেজাজ /যত দূরেই যাই)

'আফ্রিকা' শব্দটির ব্যবহার এবং 'কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই জা করছে সেখানে।।'' এই উক্তির ব্যঞ্জনা ছোটগল্পের কাহিনী শেষে মোচড় দেবার ন্যায় শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এখানে গল্প বলার রীতিতে আটপৌরে মুখের ভাষার ব্যবহার এবং 'গ্রাম্য অমার্জিত লোকায়ত স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আফ্রিকার নিগ্রোদের মুক্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গ একটি ধিঙ্গি কালো নিপীড়িত গৃহবধুর সাদামাটা কাহিনীতে শৈল্পিক চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

এই কাব্যের সামাজিক চেতনাপ্রসূত দায়বদ্ধ শিল্পচেতনা ও বন্যপ্রাণী প্রেমের কবিতা 'ফলশ্রুতি' । এই কবিতায় শহুরে নাগরিক ও কৃত্রিম পরিবেশের ভোগবাদী জীবনের এক করুণ পরিণতি এই কবিতা। মানুষ শহুরে জীবনে কৃত্রিম জঙ্গল, চিড়িয়াখানা, পার্ক, তৈরী করে বন্যপ্রাণী হরিণ, বাঘের বাচ্চা ইত্যাদি প্রাণীকে খাঁচা বন্দী করে শেকল পরিয়ে রাখে। এতে প্রকৃতির যে শৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটে তার ভয়ঙ্কর পরিণতি মানব সভ্যতার বুকে চূড়ান্ত ফলশ্রুতি ক্রমশ: অনিবার্য হয়ে ওঠে। শহুরে বন্দী এক হরিণের উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি লেখেন—

'' ফলের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে যেতে
লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ত -
বা:, কী সুন্দর ।

....

শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।'' (ফলশ্রুতি / যত দূরেই যাই)

পশুকে নিজের ইচ্ছেয় মানুষ কৃত্রিম পরিবেশে রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। কবি ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর পরিণতি ও বিপর্যয়ের আভাস দিয়ে বলেছেন — ''মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে, / কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না। / 'বা: কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।'' (ফলশ্রুতি / যত দূরেই যাই)

এই কবিতায় কবি সুভাষ হরিণের উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপলব্ধিতে বাধা হরিণের মনে হল এর চেয়ে ঢের ভাল - 'যদি তার প্রাণে হাতে করা সৌন্দর্য / মানুষ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে একাগ্র লক্ষ্যে ধনুকে টঙ্কার তুলে দেখত'। কবি মানুষের এই হিংস্র ও নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ। মানুষের এই সাহচর্যের চেয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করে সেই হরিণ। হরিণের এই অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তির উপলব্ধি কবির লেখায় প্রকাশ পেয়েছে - ''ঠ্যাং আকাশে আর চোখ কপালে তুলে/ মহানন্দে এই শহরের বাইরে চলে যেতে দেখা গেল।''/ 'সেই হরিণকে' মানুষের সর্বনাশ মানুষ সৃষ্টি করছে। এর ফলশ্রুতি এবং মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছেন কবি।

আলোচ্য কাব্যের 'ছেই' কবিতাটিতে এক ব্যর্থ পাত্রের বিয়ের স্বপ্নকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে দীর্ঘ লয়ে দীর্ঘ পংক্তিতে রমণীয় করে তুলেছেন । এই কবিতায় আজকাল বুড়োদের পার্কে যাওয়ার রীতিকে তুলে ধরেছেন। ক্ষুধামন্দা ঘোঁচাতে তাদের পার্কে যেতে হয়। নইলে ইলিশের ভাজা তাদের আর খাওয়া হয়ে উঠবে না, সেই ইলিশ হয়তো বেড়ালের পেটেই যাবে। ইলিশের আয়োজন, কেন না, সেই মেয়েটির আজ পাকা দেখা। তাই তার হতাশ প্রার্থী বোকা হাবার মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। সেই মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য 'পাত্র কিনল মেড-ইন-লন্ডন। হাতে আরশি, গোঁফ ছেঁটে বাবু দেন আপনাকে আপনি বাহবা। রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক- আধ ডজন ব্যর্থ প্রেম নিয়ে রোয়াকে আড্ডা বসে পুরোদমে। চা আছে টা নেই। কিন্তু আড্ডার সেই ব্যর্থ প্রেমই মুখরোচক হয়ে উঠেছে। তারপর হয়তো কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা । তারই কারণে দমকলের ঘন্টাধ্বনি এবং সেই ব্যর্থ প্রেমিকের আর সংসার করা হয়ে ওঠে না। যার জন্য সেই পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে থাকার ছবি এঁকেছেন কবি।

তাঁর ভাষায় — ''এখনও পোকায় খায়নি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।/ঠিকে ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই, / চোখের জলের মতো।'' নিছকই ব্যর্থ প্রেমের ছবি এঁকে এক পুরুষ বা মহিলার ব্যর্থ প্রেমকে হতাশায় ঠেলে দেননি কবি। আবার তাই ''..............আজ পাকা-দেখা। অমনি পাকা গিন্নি পৃথিবীট ।/ শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল-ছেই-ছেই-ছেই।'' প্রেম-প্রেমের ব্যর্থতা-বিয়ে-মৃত্যু-হতাশা আবার সেই প্রেমিকাই পুরোনো প্রার্থীর

বাড়িতে পাকা গিন্নি হয়ে এলে পাকা দেখায় পৃথিবীটা তারই শাড়ির আঁচলে হাওয়া দেয় - এই সব রূপচিত্র নির্মাণ চাতুর্যে কবিতাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য কাব্যের একটি অনণ্যসাধারণ কবিতা 'দূর থেকে দেখা'। সময় যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে মানুষের ভিড়ে মিশে থাকা মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা এবং মানুষকে নিয়ে পথ চলা তখন শুধুই স্মৃতি হয়ে থাকবে। কবি তখন তার ভাবনাগুলোকে চামচে করে নাড়তে নাড়তে ভিন্ন এক জগতে চলে যাবে। সে জগৎ প্রকৃতির জগৎ। কবি লিখেছেন —

''পেছনে একবারও না তাকিয়ে
আমি চলে যাব
যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলো চলে মাঠ ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া।
যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি। (দূর থেকে দেখো / যত দূরেই যাই)

'যত দূরেই যাই' কাব্যের 'এই পথ' শীর্ষক কবিতাটিতে কয়েক পর্বে জীবনের টুকরো টুকরো কয়েকটি ছবির চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন কবি। কবি জীবনে পুরনো বন্ধুত্বের মধুর স্মৃতিতে একদা ডানাভাঙা পাখির মতো উড়তে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাবধানী মন চারদিকের গাড়ি ঘোড়া দেখে সেই সব ভাললাগাকে জুতোর তলায় চেপে পথ চলেছিলেন। কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে সহজ আটপৌরে ভাষায় নিতান্ত সাধারণ ছবি। সেখানে তিনি লেখেন —

''ভাড়া জংধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল ।
একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ।' (এই পথ / যত দূরেই যাই)

এই কবিতায় কবি তাঁর রাজনীতিক জীবনের বিশেষ স্মৃতি তুলে ধরেছেন। তাঁর বন্দী জীবনের ছবি অদৃশ্য ঝর্ণার জলের মতো তাঁর মনে প্রবাহিত হয়। তিনি লেখেন —"আমি আজও ভুলিনি / সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা / আকাশ পত্রজালে ঢাকা / আমরা বন্দীর দল / পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি । / .... একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই / রাস্তায় খুব হল্লা হল । / পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে / কে একজন পেছন থেকে বলল - / মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে।" (এই পথ / যত দূরেই যাই)

'যত দূরেই যাই' কাব্যের সর্বশেষ কবিতা হল 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ'। বিষয়ের নিরিখে, কবিতাটি আত্মজৈবনিক ; রাজনৈতিক কর্মী ও মতাদর্শে দীক্ষিত কবির আত্মবিশ্লেষণ এই কবিতার অঙ্গ। এতে সমকালের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের শিল্পিতরূপ। সেদিক থেকে কবিতাটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে । এখানে প্রথম অংশে কবির শিল্প সত্ত্বা ও ব্যক্তি সত্ত্বার বিরোধ রমণীয় হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি লিখেছেন -

"আরে! মুখুজ্যে মশাই যে ! নমস্কার, কী খবর ?
আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়ে ব্যস্ত
তা বেশ । কিন্তু দেখো মুখুজ্যে,
আমার এই ডানদিকটাকে বাদিক
আর বাদিকটাকে ডানদিক করে
আয়নায় এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া -
আমি ঠিক পছন্দ করি না।" (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই)

এখানে তাঁর বামমতবাদের সঙ্গে মতপার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই দোলাচলেও কবির আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ছিল। কবির দৃঢ় বিশ্বাস একদিন "আমাদের মুঠোয় আকাশ,/চাঁদ হাতে এসে যাবে।" কবির নানা টানা- পোড়েনেও সময়ের অভিমুখ দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি দেখতে পান প্রগতি আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা জয় করেই। এভাবে কবি অবিচল আত্মপ্রত্যয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় — "ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির , / অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই / পাল্লা ভারী হচ্ছে। / ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা / পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে - / দেখো, আফ্রিকার কোলে / সাত রাজার ধন এক মানিক /স্বাধীনতা।" (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই)

কবির দৃঢ় বিশ্বাস এতকাল যারা কুচক্রে মানুষের ধ্বংসের লীলাসঙ্গী ছিল আজ তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। সমকালের জনসাধারণের অভিমুখকে শিল্পরূপ দিয়েছেন কবি। তিনি লিখেছেন —

''পাজির পা-ঝাড়াদের আগে যারা কুর্ণিশ করতে
এখন তারা পিস্তল ভরছে ।

....

পুরনো মানচিত্রে আর চলবে না হে,
ভূগোল নতুন করে শিখতে হবে।
আর চেয়ে দেখো,
এক অমোঘ নিয়মের লাগাম -পরা
ঘটনার গতি. . . . . . ''। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই)

কবি সমকালের গতিকে উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন। বিশ্বের বুকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পতন হবে এবং সমাজতন্ত্র কায়েম হবার আদর্শায়িত প্রত্যয় তাঁর ছিল। এই বিশ্বাসে তিনি লিখেছেন— ''ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ / আত্মহত্যা । /এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়। / পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে /ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো, /ক্রুশ্চভের গলায়। / নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে / এ মাটিতে / সমাজতন্ত্র দখল নেবে।'' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই)

নিজের ও সমাজের ভেতর ও বাইরে আত্মপর্যালোচনা ও বিশ্লেষণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কবি যা দেখতে পেয়েছিলেন তাতে অনেক সময় সুখ ও দুঃখ উভয় উপলব্ধি অনুভব করেছিলেন। কবি দেখেছেন পাঞ্চেতের সাঁওতাল কুলি, ওস্তাদ ঝালাই মিস্ত্রীর লাঙল ঠেলা, বড় বড় রেলের ইঞ্জিন তৈরী এবং ইস্পাতের শহর। এই পরিবর্তনে কবির অন্তর্মন খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল মন আবার কাতর হয়ে ওঠে যখন দেখেন 'রুগী ডাক্তার অভাবে মরছে,' দেখেন ''যার হাত আছে তার কাজ নেই / যার কাজ আছে তার ভাত নেই।'' সেই সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। এর জন্য হয়তো লড়াই অবশ্যম্ভাবী । তাই তিনি লেখেন—

'' গদিতে ওঠ বস করাচ্ছে
টাকার থলি।
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে. . .
হাতে হাতে ঝনঝন ক'রে ফিরুক ।'' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই)

কবির ইপ্সিত লক্ষ্য ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে সেখানে সমাজতন্ত্র কার্যকরী হবে, এবং সাধারণ নাগরিকের হাতে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে অর্থ ঝনঝন করে ফিরে আসবে। কিন্তু কবি, প্রত্যক্ষ করেন যে, যারা তাঁদের হাতে ধনতন্ত্র তুলে দেবে তারা সম্পূর্ণ ভাবে তৈরী হয় নি। কেবল তাত্ত্বিক নিয়ম যথা- বামপন্থী, ডানপন্থী ইত্যাদি পদ্ধতিগত যান্ত্রিক কেতাবী নিয়ম সেখানে বইয়ের পোকার মতো কিলবিল করছে। কিন্তু তাকে "চোখ খুলে তাকাবার / মন খুলে বলবার / হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখাবার যোগ্য নেতৃত্বের যথার্থই

অভাব। কমিউনিষ্ট পার্টির ভেতরের কোন্দলি, নেতৃত্বের ঈর্ষা, ইগোর লড়াই সমাপ্ত করে সেখানে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ বিস্তৃত করার পরামর্শ দেন কবি। সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটালে তা নেতৃত্বকে কুরেকুরে খাবে। তাই কবি সেই চক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে সহযোদ্ধাদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর পরামর্শ দেন। তিনি সর্বসাধারণের মাটিতে নেমে আসার পরামর্শ দান করেন, এবং সবাইকে সংগ্রামী করে তোলার আহ্বান জানান — "উঁচু থেকে যদি না হয় /নীচে থেকে কর । /সহ যোদ্ধার প্রতি যে ভালবাসা একদিন ছিল /আবার তাকে ফিরিয়ে আনো, /যে চক্রান্ত /ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে / তাকে নখের ডগায় রেখে / পট্ ক'রে একটা শব্দ তোলা ।। / দরজা খুলে দাও, / লোকে ভেতরে আসুক ।" (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ / যত দূরেই যাই) সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে চলুক কবির অবিরত সৃষ্টির ধারা।

কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কাল মধুমাস' ১৯৬৬ সালে প্রকাশ পায়। আকৈশোর তাঁর কবিতার অক্লান্ত পাঠক ও বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয়কে উৎসর্গ করে কাব্যটি রচনা করেন কবি। এই কাব্যটিতে ৩৮টি কবিতা সংকলিত। যৌবনের শুরু থেকে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিল কবির জীবনে। এই পার্টির ভেতরের কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই ভাঙনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যয় ভঙ্গের ট্র্যাজিক ছাপ পড়ে 'কাল মধু মাস' কাব্যে। বিভেদ জনিত মনোকষ্টের থেকে এই কাব্যে এসেছে বিষাদ। এই কাব্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছে উপমা ও চিত্ররূপময়তায় শৈশবের স্মৃতি। এ কাব্যে এসেছে পুরাণের প্রসঙ্গ, সংগ্রামমুখর রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনগুলির নস্টালজিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা ও সৃষ্টির প্রতি কবির নির্মোহ জীবন দৃষ্টি।

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'তোমাকে বলিনি'। কবির ভেতরে আছে একটি গোপন বেদনাজনিত উদ্বিগ্নতা। কবি রাতে ঘুমোতে পারেন না। তাঁর লেখার কাগজটা নিয়ে 'শয়তান বেড়ালটা

/কাল সারা রাত খেলেছে।' সময় এবং সময়ের ধর্ম তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তাই কবি প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে শান্তির খোঁজ করছিলেন —

''ঘরে বৃষ্টির ছাঁট এলেও
জানালা গুলি বন্ধ করিনি -
আলো-নেভানো অন্ধকারে
থেকে থেকে ঝিলিক-দেওয়া বিদ্যুতে
আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মুখ।'' (তোমাকে বলিনি / কাল মধুমাস)

জগৎ ও জীবনের সমস্ত জটিলতা থেকে দূরে সরে গিয়ে কবি একেবারে সাধারণ ও সহজ জীবনের সৃষ্টির উপাদানকে গ্রহণ করেছিলেন । পঞ্চশোর্ধ কবি তাই বলেন—

''এবার রথের মেলায় / কি কি কিনব — / মেয়েব জন্য তালপাতার ভেঁপু / তোমার জন্য ফলফুলের চারা /আর বাড়ির জন্যে / সুন্দর পেতলের খাঁচায় / দুটো বদরিকা পাখি।' (তোমাকে বলিনি / কাল মধুমাস)

এই কবিতায় প্রিয়জনকে বলার ভঙ্গিতে কবিসত্ত্বার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। কবির হৃদয়ে 'সময়' ভীষণ পীড়া দেয়। কবি পিছনে ফিরে দেখেন ঐক্যের ভাঙন। জলছবির মতো তাঁর হৃদয়ে রক্তিম দিনগুলির স্মৃতির প্রতি আকৃতি প্রকাশ পায়। অন্ধকার পথে কবি যেন হাতড়ে হাতড়ে না থেমে চলেছেন পথ। তাঁর ভাষায় —''আলো নেভানো। চোখ বন্ধ । / দেখতে পাচ্ছি সবই। / কাঠের বাক্সে পোকায় কাটছে / পুরনো গ্রুপ ছবি। /একটিবার দৌড়ে এসো /ও নদী, ও স্মৃতি - /ঘরের এই দেয়াল ধরে /দাড়াও না, লক্ষ্মীটি । / দরজায় কে পর্দা ঠেলছে ? /বাইরে যাই। ফিরে / পায়ের শব্দে নেমে যাচ্ছে / অন্ধকার সিঁড়ি ।।'' (জলছবি / কাল মধুমাস)

কবি বাইরে বহু থেকে অন্তরে একা। তাঁর এই একাকিত্বের মধ্যে তিনি খুঁজে পান দলগত সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা। কবি পঞ্চাশোর্ধ বয়সে এসেও যেন সেই রাজনৈতিক দিনগুলি একই বৃত্তে ঘুরে ফিরে আসছে। কবি এই কাব্যের 'দ্বৈপায়ন' শীর্ষক কবিতাটিতে লিখেছেন— ''একাকিত্বের সমাহার? নাকি —

সমাহৃত একাকিত্ব ?
একে একে দুই, অথবা একের
মধ্যেই আছে দ্বিত্ব ?
বন না বৃক্ষ? ঘুরে ফিরে শেষে
আজও সেই একই বৃত্ত।।'' (জলছবি / কাল মধুমাস)

আজও কবির স্মৃতিতে বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে লাল পতাকা উড়িয়ে সংগ্রামী ও উচ্ছ্বসিত মুষ্টিবদ্ধ হাত। কবির ভাষায় — ''আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে

দুলে দুলে

সারাক্ষণ

দুলে দুলে

নিশান

দুলে দুলে

সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে

নাচছে।।'' (নিশান / কাল মধুমাস)

কবি এই পর্বে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখতে চাইছেন। একটি বুড়ো শালিখের দৃষ্টিতে কবি দেখছেন— ''আলসেয় ব'সে / মুখে কুটো নিয়ে একটা বুড়ো শালিখ /ঘাড়ের রোঁয়া বার ক'রে / চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। / গদিতে বহাল তবিয়তে ব'সে / পাগড়ি বাঁধা একটা লোক /গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেল / রাস্তায় টহলদার / একঠো বঢ়িয়া মাল।'' (খোলা দরজার ফ্রেমে / কাল মধুমাস)

কবি আলস্যের দিনগুলিতে দেখতে পাচ্ছেন - একটা ল্যাম্পপোষ্টে ঝোলানো পুরোনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই, ''মাথার ওপর লম্বা একটা লাঠি উঁচিয়ে / কোলে-পো কাঁখে-পো হয়ে / একটা ট্রাম''তেড়ে যাচ্ছে, ''একটা দোতলা বাস / একটু দাঁড়িয়ে / জানলায় একটা মিষ্টি মুখ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল'' ইত্যাদি ছবিগুলি। এই কবিতায় চিত্ররূপ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখেছেন কবি।

কবি জীবনের শূন্যতা, একাকীত্বের রিক্ততা ঐকান্তিক ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভরিয়ে তোলার দৃঢ় সৃষ্টিমানসে মননশীল হয়েছিলেন। জীবনের সদর্থক দৃষ্টিতে লিখেছেন এই কাব্যের কবিতা শূণ্য নয়। অন্ধকার দিককে মনের রোমান্টিকতায় মানস প্রতিমাকে আলোর দিশা দিতে চেয়েছেন। তিনি শূন্য নয় কবিতায় লিখেছেন - ''আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে, দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে, সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে।/জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয় পদে পদে ভুল ভ্রান্তি,/ অথচ জীবন তার চেয়ে বড়, ঢের ঢের বড়ো ; শিশিরবিন্দুর শান্তি/ ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে/ হাত নেড়ে বলে; বাঁধো, নীড় বাঁধো, লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে।।'' কবি জীবনের শূন্যতায় মর্ত্য প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম

হয়ে জীবনের সমস্ত ভুল, বিচ্ছেদ ও হতাশাকে আলোয় ভরিয়ে তুলেছেন। কবি জীবনের ইতিবাচক দৃষ্টিতে শূন্যতাকে ভরিয়ে পুলক জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন ।

কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙনে ডানপন্থী কংগ্রেস শাসকদল ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিকভাবে ধরে নেন যে ভারতে কমিউনিষ্ট বলতে আর কিছু থাকল না। পার্টির এই দুর্দিনেও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির সমাজতন্ত্রের পথে চলার আহ্বানই জানান। তিনি নিশ্চিত প্রত্যয় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন — ‘‘ভাঙাকে জোড়া দেওয়া এই সুদূরপ্রসারী মিছিলে। / ওরা ভেবেছিল আর আমাদের কিছুই থাকল না। / মুঠো করতেই / খালি হাতগুলো আমাদের ভ'রে গেল । / ওরা ভেবেছিল দিনকে রাত করতে পারবে । / আমাদের লাল নিশান / রাতকে দিন করার শপথে গর্জে উঠল । / ডেকে ডেকে আমরা বললাম , / ভুল রাস্তায় এখনও যারা ঘুরছ / যারা এখনও ভুল বুঝছ / ভাই বন্ধুরা আমাদের — / এসো। / দেখ, এই মিছিল / এই রাস্তা।।’’ (এই মিছিল এই রাস্তা / কাল মধুমাস)

মিছিলে পা মিলিয়ে, পার্টি অফিস ঝাট দিয়ে, সর্বক্ষণ পার্টির হয়ে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কাজ করেছিলেন সে ব্যক্তির কাছে পার্টির ভাঙন মর্মান্তিক ও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তাই কবি ডান-বাম ও রাজনৈতিক সঙ্গীদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ মিছিলে পা মেলানোর আবেদন জানান ‘এই মিছিল এই রাস্তা’ শীর্ষক কবিতায়। সেদিক থেকে এই কবিতাটির একটি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিহিত রয়েছে।

‘কাল মধুমাস’ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা ‘ভুবনভাঙার বাউল এক’। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ভুবনভাঙার বাউলের গান জননী জন্মভূমিকে একতারা হাতে ঘুঙুর-পায়ে নাচতে নাচতে আশ্রয় নেয় কবি মন - ‘‘উলানোভার মরাল নৃত্যের ভঙ্গীতে / শিয়রে / শুভ্র ফুল - /............ভুলোনা, মনে রেখো........... / দাসভিদানিয়া! / ....তার হাতের উষ্ণতা / এখনও সেই বিদায়-নেওয়া বন্ধুদের হাতে-/ ক্রেমলিনের লাল তারার চোখে চোখ রাখা / শার্সিগুলোর গায়ে / তার গেয়ে আসা গান এখনও গমগম করছে’’। ‘ভুবন ভাঙার বাউল’ আন্তর্জাতিক পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন কবি। সেই বাউলের গান ও নৃত্য আজ জননী জন্মভূমির স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও সখ্যতা প্রার্থনা করে গাইছেন বাউল ।

এই বাউলের ছবি এঁকেছেন কবি অপূর্ব চিত্ররূপময়তায় — ‘‘লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে / হাতে একতারা নিয়ে / ঘুঙুর - পায়ে বাউল হাওয়া / আনন্দে নাচতে নাচতে / চলে গেল......................... /

যেদিকে খোয়াই / যেদিকে শালবন / যেখানে জননী / যেখানে জন্মভূমি ।।'' (ভুবন ডাঙার বাউল এক / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের 'লাল গোলাপের জন্যে' কবিতায় কবির রক্তিম সংগ্রামী জীবন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কবি এদেশের আ-সমুদ্র হিমাচল উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে সংগ্রামী কর্মীদের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের লড়াইয়ের ক্ষত আজও শুকোয় নি। কবি মনে করেন দেশবাসীর সবাইকে এক সুরে বাঁধতে পারেনি বলেই মানুষ সর্বনাশ থেকে বরাবরের মতো আজও সরে আসে নি। কবি পার্টির কোন্দল, ভাঙন, ছন্নছাড়া পরিস্থিতিতেও আশাবাদী। তাই কবি লেখেন —

''চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময়,
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।'' (লাল গোলাপের জন্যে / কাল মধুমাস)

লাল সংগ্রামকে বুকের রক্ত দিয়েও অক্ষুন্ন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন কবি। পার্টির প্রতি কবির দায়বদ্ধতা ও পছন্দ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। এই কবিতার শেষে তিনি লিখেছেন — ''আমার প্রিয় রং লাল, / আমার প্রিয় ফুল / গোলাপ। / লাল গোলাপের জন্যে /সাহসে বুক বেঁধে / এখন আমাদের লড়াই ।।'' (লাল গোলাপের জন্যে/কাল মধুমাস)

এই কাব্যের 'ছি-মন্তর' একটি ছড়া। এই ছড়ায় চাল-চিনি-মাছ-চোর-পুলিশকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন । এই ছড়ায় তিনি তুলে ধরেছেন উপহাসের ঢঙে সমাজের ছবি ----

''লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি
চাল-চিনি-মাছ-তেল-ঘি ।।
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি খিড়কির দোরে ।
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধ'রে।
ওঁ হ্রিং স্বাহা ওয়াগন ফট্‌ ।।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট্‌।'' (ছি-মন্তর / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যে কবির হৃদয়ে শূন্যতা, দ্বিধা এবং তা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ' শীর্ষক কবিতায় কারো চেনে-বাঁধা কুকুরের ঘেউ ঘেউ, মশারির দড়িতে মাছি, সার বন্দি টবে ফুলের গাছ, খটখটে রাস্তায় গাড়ির চাকার ভিজে দাগ, আলমারির আড়ালে অদৃশ্য ইঁদুরের অস্তিত্ব ইত্যাদি কবি অনুভব করেন। তার মাঝে কবি নিজেকে কোথাও খুঁজে পান না। তাঁর কথায় ''সমস্ত ভার হারিয়ে ফেলে আমি যেন ভাসছি'' মহাশূন্যে। হতাশ কবিমন প্রকৃতির বুকে আত্মস্থ হয়ে দ্বিধা, ভাঙন ও হতাশার কারণ অন্বেষণ করেন — '' ঠিক কত দূরে / আশ্বিনের কানা মেঘ / এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোথাও / যাবে কি যাবে না এই দ্বিধায় / রোদ আর বৃষ্টি দিয়ে / নিজেকে দু-ভাগ করছে।'' (কুকুর ইঁদুর মাছ ফুলের-গাছ / কাল মধুমাস)

কবি সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার ট্র্যাজিক বেদনা উপলব্ধি করছেন। নিজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসে নিজেকে জড়িয়ে অন্বেষণী দৃষ্টিতে দ্বিধাবিভক্তির ঐক্য খুঁজে পান না। একেকটি সকালে সেই দিনের অন্বেষণ করেন কোন এক আগন্তুকের প্রত্যাশিত আগমন। কিন্তু একটা অনিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা যেন সৃজনশীল হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। কবির এই দোলাচল হৃদয় ধরা পড়েছে আলোচ্য কাব্যের 'সকালের ভাবনা' কবিতায়। সেখানে তিনি বলেছেন — ''রাত্রে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ভেবেছি / মাঠে ধান দাঁড়িয়ে; / এখন বৃষ্টি হওয়াটা ভয়ের । / কাল দিনটা কেমন গেছে / ছাপার হরফে / একটু বাদেই জানতে পারব । / আজকের দিনটা মনে কি আছে / . . . . যে দিনটাকে আমি চাই, / কিছুতেই মিলছে না ।।'' (সকালের ভাবনা / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের 'পার ঘাটের ছবি' কবিতার পার ঘাটের ফেরি ও ফেরিঘাটের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ছবি এঁকেছেন কবি সুভাষ। সাধারণের নিত্যজীবনে ফেরি ঘাটের বাজারে পাওয়া যায় চা, পান, বিড়ি, সবেদা, কলা, কাঁঠাল, আম, মুরগী, মাছ ইত্যাদি। ফেরিঘাটের লঞ্চে নিত্য নাচতে নাচতে চলে

''ঝোলানো ব্যাগ/ পোটলা-পুটলি/টিনের সুটকেসে
পড়ার বই,
সিঁদুর কৌটো,
মেলায় তোলা ফটো,
গলার কণ্ঠী, পুরোনো তাস,
কাঁথা এবং আদালতের নথি।'' (পার ঘাটের ছবি / কাল মধুমাস)

এই জীবনকে পারাপারের লঞ্চের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন। যার মধ্যে একটা পুরো ছবি এপারে গিলে ওপারে ওগরায়। ডান-বাম দুদিকের বিশেষ পার্থক্য আজ তিনি দেখতে পান না। পারাপার করে

মানুষ কেবল জীবনের একই ছবি দু দিকের দুটি ঘাট পারে। জীবনের এক বিশেষ দর্শন কবি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। একটি সাধারণ ছবির মধ্যে অ-সাধারণ সৃজনশীল নৈপুণ্যে জীবনের বিশেষ দর্শনকে নিহিত করেছেন কবি আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তুতে।

আলোচ্য কাব্যের 'মসিয়ার পর' কবিতায় কবি হতাশা, শোক ও অন্ধকারের ভাঙন থেকে মুক্তির পথ যেন খুঁজে পেয়েছেন। 'রাস্তায় লাইনবন্দী শোকমিছিল / যেন ফুরোতে চায় না'/ কবি ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছেন 'হায়-হাসান হায়-হাসান' বলে বুক বাজাতে বাজাতে চলেছে শোক মিছিল —

''মাটির ফুটো সরা থেকে
ফোঁটা ফোঁটা
জলে
নিষ্পত্র মরা ডালে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে —
নতুন জীবনের
বীজমন্ত্র।'' (মাসিয়ার পর / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের 'কাছের লোক' শীর্ষক কবিতা অন্য বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। 'যত দূরেই যাই' কাব্য গ্রন্থের কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পান একাডেমি পুরস্কার। ১৯৬৪ সালে এই পুরস্কার বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি
প্রদান করেছে এবং তা কবির গ্রহণ করা না করা নিয়ে বির্তকের ঝড় ওঠে। পার্টির একাংশ এ নিয়ে বিতর্ক তোলে, এবং এই পুরস্কার গ্রহণ করার কারণে কবি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের কাছে অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াজাত কবিতা 'কাছের লোক'। কবির কাছের মানুষজন তাঁর প্রতি আনুগত্যের ও বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলেন। কবি পার্টির কাছে স্বচ্ছতা দেখান যে তিনি তাদেরই কাছের মানুষ। পুরস্কার গ্রহণ করে কবি তাই পার্টিকে উদ্দেশ্য করে বলেন - ''তোমাদের কাছ থেকে আমি দূরে গিয়েছি, কিন্তু তোমাদের প্রাণের দরজা খুলে দেখ আমি কাছেই আছি এবং কাছে থাকবও।'' তাই তিনি এই কবিতায় লেখেন —

'' দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি —
দরোজা খোলো
ফিরে এসেছি

দরজা খুলে ডাকো।'   (কাছের লোক / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের 'জননী জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতায় কবির গভীর দেশাত্মবোধ এবং দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। কবির জননী এবং দেশমাতা ক্রমশ একাকার হয়েছে এই কবিতায়। প্রকাশহীন, নীরব অথচ সক্রিয় ভালবাসার বাল্য স্মৃতি সহজ ভাষায় এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে — "টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে / কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু / শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভরে উঠত / আমার ভালোবাসার কথা / মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।" (জননী জন্মভূমি / কাল মধুমাস)

শৈশবে যে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তিনি হাঁটতে শিখেছেন সেখানে আছে তাঁর দেশজননীর স্মৃতি। সেই হাতে যা স্পর্শ করেন সেখানেই দেশমাতার অস্তিত্ব অন্তরে উপলব্ধি করেন কবি। তাঁর ভাষায় — "আমি যা কিছু স্পর্শ করি / সেখানেই, / হে জননী , / তুমি। / আমার হৃদয়বীণা / তোমারই হাতে বাজে । / . . . . . মুখ বন্ধ ক'রে /অক্লান্ত হাতে — হে জননী , / আমরা ভালোবাসার কথা ব'লে যাব।"   (জননী জন্মভূমি / কাল মধুমাস)

সেই দেশমাতার ওপর যারা আঘাত হেনেছে তাদের প্রতি আপোসহীন সংগ্রামে আজ দেশ স্বাধীন। সেই দেশমাতার প্রতি আজও এমনকি ভবিষ্যতেও যারা আঘাত নিয়ে আসবে তাদের প্রতি কবির বিদ্রোহ বজায় থাকবে। তিনি এই কবিতায় লিখেছেন — "হে জননী, / আমরা ভয় পাই নি। / তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে / আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে /সীমান্ত পার ক'রে দেব। /আমরা জীবনকে নিজের মতো ক'রে /সাজাচ্ছিলাম / — আমরা সাজাতে থাকব।" (জননী জন্মভূমি / কাল মধুমাস)

কবির রাজনৈতিক জীবন নিয়ে ওঠা বিতর্ক ও সমালোচনা বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর আলোচ্য কাব্যের 'এ দিকে' কবিতাটি ; সেই সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে সমালোচনা এই কবিতার বিষয়। উপমা, চিত্রকল্পে কবি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনার শিল্পরূপ এঁকেছেন এই কবিতায়। তিনি লিখেছেন — " কিছু তালেবর লোক তাল বুঝে কত্তালে শ্রীখোলে

'লেগে-যা', 'লেগে-যা', বোলে রব তুলছে : নারদ ! নারদ !
এদিকে রাস্তার জল ভাসতে ভাসতে রসাতলে নামে।
চলে যাই টলতে টলতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় ঝাঁঝরিতে
কাগজের নৌকাগুলো । হা হতোস্মি ! দক্ষিণে ও বামে ।

ছিঁড়ে খাচ্ছে শুঁড়ি ছুঁড়ি গনৎকার পুরুৎ পাদরিতে।'' (এ দিকে / কাল মধুমাস) এই সমালোচনাকে কবি কুমোরটুলির প্রতিমা বিসর্জনের মতো অগ্রাহ্য করেছেন। কবির বিরুদ্ধে কুৎসা ও তাঁকে ভুল বুঝে নিচু করে দেখানোর প্রয়াস, তার সৃষ্টিকে হেঁয় করার জন্য কখনো কখনো ভেতর থেকে ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠত। কিন্তু কবি নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, ''আদতে দোষটা হল গিয়ে চোখের ঠুলির'' — । তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে যারা যেভাবে নেয় ও যে দৃষ্টিতে দেখে সমস্যা সেখানে। সমস্যা তাঁর সৃষ্টির নয়। কেননা সেইসব নিন্দুক ও সমালোচক পৃথিবীকে নিজের মতো করে ঢেলে সাজাতে চান।

এ কাব্যের 'ফোঁটা' কবিতায় ভাই ফোঁটার ছবি এঁকেছেন কবি। সেই ভাইকে কবি তরোয়ালের খাপ হাতে বেঁধে রণে পাঠিয়েছেন। সেই ভাই শিকল বেঁধে বিজয় পতাকা উড়িয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির ডালা খুলে এনেছে। তারই জন্য কবি মালা গেঁথে রেখেছেন । সেই ভাই-এর সঙ্গী ও সহকর্মীরা তার প্রতি বিরূপ আচরণ করলেও কবি সহনশীল হয়ে তাকে গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছেন। তাই ভাইকে বিস্তৃত অর্থে লিখেছেন — '' ভাই আমাকে বকুক ঝকুক / দিগ গে যতই খোঁটা— / . . . . . ভাই আমাকে নাই বা দেখুক, /মারুক লাথি ঝাঁটা — / ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা , / যমের দুয়োরে পড়ল কাঁটা।।'' (ফোঁটা / কাল মধুমাস)

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন, বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রচিত আলোচ্য কাব্যের 'ভুলে যাব না' কবিতাটি। অতীত জীবনে চায়ের দোকানে একসঙ্গে চা খেতে খেতে টেবিল চাপড়িয়ে তর্ক করার স্মৃতি রোমন্থনে কবি। তাঁর মনে পড়ে এক সঙ্গে হাতে হাত বেঁধে অঙ্গীকার করার স্মৃতি। এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে ''মা আমার বন্দিনী'' গান গাওয়ার মধুর স্মৃতি আজও বহন করে চলেছেন তিনি। আজ একটি কঠিন দেওয়াল উঠেছে কু-চক্রী ও কৌশলীদের কারসাজীতে। সেই কথা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে এই কবিতায়—

''এ পারে ঘর ।
ওপারে ঘর ।
মধ্যে কঠিন দেয়াল।
ভোজের পাত
পেতে রেখেছে
ধুরন্ধর শেয়াল।'' (ভুলে যাব না / কাল মধুমাস)

সমস্ত অভিসন্ধির উর্ধ্বে কবি মাতৃভূমির জন্য, মায়ের প্রতি দায়বদ্ধতার সচেতন অঙ্গীকারে কবি লেখেন —

" শুকনো মুখে
বলেন মা, 'কী
পেলাম বল্ দিনি ?'.
ভুলে যাই নি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই।" (ভুলে যাব না / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের 'কালো বেড়াল' শিরোনামের কবিতায় যৌবন থেকে পরিণত ও পারিবারিক জীবনে ক্রমাবনতি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আত্মজীবনীমূলক উপলব্ধি ছন্দোবদ্ধ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আজকাল ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে নিজেকে সাবধানে সামলে নিতে হয়। শো-কেসের জানলায় নিজের ছবি দেখে যে উপলব্ধি তা কবির ভাষায় -তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে —

"শো-কেসের জানলায় নিজের ছায়াটাকে লট্‌কে / একটু নেড়ে-চেড়ে / দেখে নিলাম - / এককালে যা শোভা পেত / এখন আর তা শোভা পায় না। /পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকল — আমি নই । /আজ কেউ তরুণ গলায় /আমার নাম ধ'রে ডাকবে না।" (কালো বেড়াল / কাল মধুমাস)

যৌবনের সভা-সমিতি-মিছিলের জায়গা স্বাভাবিক নিয়মে বেদখল হয়ে যায়। মনুমেন্টের নীচে তাই যেখানে সভা করতেন তাঁরা সেখানে আজ দেখেন এক হেকিম মেজিক দেখিয়ে দাঁত তোলার বক্তৃতা দিচ্ছে। আজ তাই মিছিল নয় — "পাকানো মুঠোগুলো খুলে
লাইন বেঁধে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে
রেশনের থলি।" (কালো বেড়াল / কাল মধুমাস)

অথচ আজও কবি হৃদয়ে পার্টি, সভা মিছিলের জন্য আর্তনাদ করেন, যেমন করে একটি কালো বেড়াল মাসভর একাদশী পড়ার রাগে সে মাসের ক্যালেন্ডারের পাতাটি কেবল নখ দিয়ে আঁচড়ায়।

এ কাব্যের 'আমার ছায়াটা' শিরোনামের কবিতায় আত্মবিশ্লেষণজনিত উপলব্ধির শিল্পরূপ পাওয়া যায়। এই কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের স্বভাব সহজ ভাষায় শিল্পরূপ পায় — "সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে / দেয়ালের গায়ে / চোখ পড়ল / ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে / আমাকে অবিকল নকল

করছে / আমার ছায়া / মাথায় আমারই মতো পাখির বাসা /চোখে চশমা / ঠোঁটে সিগারেট ধরা।'' (আমার ছায়া / কাল মধুমাস)

কবির ছিল মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখে চশমা, এবং তিনি স্বভাবে ধূমপান করতেন সিগারেট। তিনি নিজেকে বারবার শাসন করেও ব্যর্থ হন স্বভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। তাই তার উপলব্ধি হয় তার এই আচরণ একদিন শেষ হবে কেবল আগুনে পুড়েই। প্রকৃতির বুকে বারবার আত্মস্থ হয়েও কবি বারংবার ঘুরে ফিরে সমাজ বদলের পদধ্বনিই হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। তাঁর এই প্রকৃতি একমাত্র আগুনে পুড়েই যবনিকা নিয়ে আসবে।

রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনে এসেছে জটিলতা। 'হাত বাড়ালে' কবিতায় কবি তাই বলেন —''চারিদিক ছিন্ন ভিন্ন / সভার বিরুদ্ধে সভা ব'সে গেছে, / সমিতির বিরুদ্ধে সমিতি । / পিছনে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই - / এখনও বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে আছে / প্রিয়তম স্মৃতি;/ এখনও এখনও মধুরতম গান বাজে / সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে ।'' কিন্তু নিষ্ঠুর সময় আজ তাকে রক্তাক্ত করে হৃদয়ে। কবির তাই বন্ধুত্বের প্রতি হাত বাড়ানোর পরামর্শ কেননা ''থুথু দিয়ে জোড়া যায় না, বিচ্ছিন্ন দুটি হৃদয়। বিচ্ছেদের হৃদয় জুড়তে হয় ভগ্নমনোরথ -/ এ আগুনে,/ এই রাংঝালে।''

বিজ্ঞাপনের ঢঙে কবি এ কাব্যের 'আশ্চর্য কলম' শিরোনামের কবিতাটি লেখেন। যে কলম দিয়ে লেখক ও সাহিত্যিক লেখেন তার নাম তিনি দিয়েছেন 'খাই-খাই'। লেখকদের জাতেও তিনি উপলব্ধি করেন তিক্ত অভিজ্ঞতা । সমাজের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নেই এমন ব্যক্তি রাতারাতি ঝোপ বুঝে কোপ দিয়েছেন। কবির ভাষায় —''এই যে দাদা, এত দিনে বেরিয়েছে - /নতুন ফরমুলায় তৈরী / খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম ; 'খাই - খাই'। / চোর, জোচ্চর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা, / পন্ডিত, মুর্খ যে কেউ চোখ বুজে /রাতারাতি লেখক হতে পারে। / . . . . দিনকে রাত, সোজাকে কাত, / হতাশকে হাত করতে / এ কলমের জুড়ি নেই।'' (আশ্চর্য কলম / কাল মধুমাস)

যারা কেবল নিজের স্বার্থ-নাম-যশ-অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে লেখক হয়েছেন বা হতে চান তাদের ব্যঙ্গ করে হাস্যরসের এই কবিতা সৃষ্টি করেছেন কবি। এই কবিতার গভীরে নিহিত রয়েছে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধ, সমাজ সচেতন, সৃজনশীল কবি মানস।

এই কাব্যের 'বন্ধু' শীর্ষক কবিতায় মহাকালের নিয়মে এক সময়ের পরিচিত মুখ, পরিচিত আলো, আজ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। কবি সেই আত্মপরিচয়ের অন্ধকারকেই যেন বন্ধু করে নিয়েছেন। তার পাশাপাশি পরিচিত সংগ্রামী মুখগুলো যেন আজ হারিয়ে গেছে। তাই কবির ঘোষণা যন্ত্র

সভ্যতায় তাঁর মনও যেন যান্ত্রিক হয়ে গেছে। স্বাভাবিক বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে এলেও যেন তিনি ভয়ে চমকে ওঠেন। তাই কবি 'বন্ধু' কবিতায় লেখেন — ''পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে

ছায়ার মত মানুষ ;
চেনা মুখগুলোও
এই অন্ধকারে আমি চিনতে পারছি না ।
আমার কাঁধে
এখন কেউ এসে যদি হাত রাখে
আমি চমকে উঠব।''(বন্ধু / কাল মধুমাস)

চরম আর্থিক অনটন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বন্ধুত্বের অবনতি, বিতর্ক, সমালোচনায় কখনো কখনো তাঁর মনে আসে দুর্বলতা। সেই দুর্বলতা থেকে মানুষ দ্বারস্থ হয় জ্যোতিষীদের কাছে। সেই চূড়ান্ত অন্ধকার জীবনে চলতে চলতে কবি একবার তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকা ছানিপড়া চোখে চশমা আঁটা বুড়ো গণৎকারের কথা ভাবেন। সেই মুহূর্তে কবি উপলব্ধি করেন ওপরওয়ালা এবং ভাগ্যচক্র জ্যোতিষীর হাতে নেই। শিঙে ফুঁকে সেই গণৎকার যা কিছু পুরোনো নতুনের মতো করে খড়ির দাগ কেটে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিচ্ছে। কবির ভাষায় - '' ফুটপাতে খড়ির দাগ দেখাচ্ছে অদ্ভুত

জন্ম মৃত্যু প্রেম জরা যৌবন শৈশব
ভূত ভবিষ্যৎ সব।'' (খড়ির দাগ / কাল মধুমাস)

মনের দুর্বলতাকে উত্তীর্ণ করে কবি যুক্তিনিষ্ঠ মন দিয়ে নিজের অভাব ও সংকট সহ্য করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় —''কষ্ট কিছু হচ্ছে বটে জুতোর পেরেক

দেখে শুনে পা রেখে পা রেখে
এই আর একটু পথ যেতে পারলে ব্যস্
সমস্ত অভ্যাস।'' (খড়ির দাগ / কাল মধুমাস)

নানা অভাব, সঙ্কট ও কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কবির ইতিমধ্যে কেটে গেছে পঞ্চাশটি বছর। এর, মাঝে তাঁর নজরে পড়েছে কত পরিবর্তন। কবি লিখেছেন — ''শেষ লড়াইয়ের গড় খাইগুলো / বড় বড় বাড়ির গাঁথনিতে /এখন অদৃশ্য । /নাকে দড়ি বেঁধে /আগে যেখানে ভালুক নাচ হত - /সেখানে এখন ভুঁড়ি নাচিয়ে / লিফ্‌টে উঠছে নামছে / কালোকে সাদা করার হাত-সাফাই।'' (সাফাই / কাল মধুমাস)

দারিদ্র্য সীমার নীচের মানুষ যেখানে বস্তি জীবন কাটাতো সেখানে দখল করে নিয়েছে আজ ঝা-চক্চক্ বহুতল অট্টালিকা। পুঁজিপতিরা সেখানে কালো টাকাকে সাদা করার হাত-সাফাই করতে নিলামে ডাক দিচ্ছে। যেখানে আজ কলকারখানার জীবন গভীর রাত পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বোঝাতে থাকে । কবি অন্য একটি কবিতায় লেখেন —'' একটু আগে অবিরাম কাশতে কাশতে

বজবজের তেল, বাটার জুতো
ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গেছে
মাঝরাতের মালগাড়ি।''   (হালুম / কাল মধুমাস)

এই কবিতায় হঠাৎ চিড়িয়াখানার বাঘগুলো 'গাঁক গাঁক' করে ডাক দেওয়ার মধ্যে কবির প্রতিবাদী মন তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত সমাজে স্থবির ও তথাকথিত পুঁজিবাদী সমাজের বন্দী জীবনে আলো ফোটাতে চেয়েছিলেন কবি 'আমার কাজ' শিরোনামের কবিতায়। কবির জীবনদর্শন ও কাব্যভাবনা সহজ ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবাহী হয়ে উঠেছে । তিনি লিখেছেন —

'' আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে ।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার ।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে ।''   (আমার কাজ / কাল মধুমাস)

সামাজিক আলোড়ন, মানসিক সচেতনতা, ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাঁর উক্তিটিতে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর আন্তরিক লক্ষ্য। সমাজের প্রান্তীয় মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পথ চলা তাঁর জীবনের কাম্য ছিল। তাই কবি বলেছেন — ''কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে / জীবনের শেষদিন পর্যন্ত / যেন আমি হেঁটে যাই। / আমি যেন আমার কলমটা / ট্র্যাক্টরের পাশে /নামিয়ে রেখে বলতে পারি — /এই আমার ছুটি— / ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।'' (আমার কাজ / কাল মধুমাস)

ট্র্যাক্টরের পাশে তাঁর কলম নামানোর মধ্যে এবং একটু আগুন চাওয়ার মধ্যে গভীর আন্তরিক জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। মানুষের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস অবিচল। কিন্তু প্রতারণা, শোষণ, বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কিংবা বিশ্বাসঘাতক দেশবাসীর প্রতিও তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। 'এই জমি' কবিতায় তাঁর দৃঢ় ও সচেতন দেশাত্মবোধ গভীর

প্রত্যয়ের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কবি সেখানে বলেন —" জিঘাংসার যে নামই তারা দিক, /যুদ্ধকে যে পোশাকই তারা পরাক, / মৃত্যুর কোনো রমণীয় নামে / আর আমি ভুলছি না । /আ-সমুদ্র হিমাচল /আমার বিশ্বাসের জমি। /আমাকে কথায় ভুলিয়ে / সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ।" (এই জমি / কাল মধুমাস)

কবির এই বিশেষ জীবনদর্শন, কবিতার উদ্দেশ্যমূলকতা, রাজনৈতিক জীবন নিয়ে এক শ্রেণীর সমালোচক বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন সেদিন। তাদের উদ্দেশ্যে দাবা খেলার উপমায় কবি বলেছেন —

" হে ভদ্র মহোদয়গণ,
হয় চুপচাপ ব'সে থেকে দেখুন
নয় যে যার জায়গায় ফিরে যান

আমার খেলাটা, দোহাই
এখন থেকে আমাকেই খেলতে দিন।" (ফড়েদের প্রতি / কাল মধুমাস)

তাদের বিতর্ক কবির সরল হৃদয়ে কঠিন প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে। তবে কখনো কখনো বিব্রত কবিমন সেই ঝড়ের ভেতর ইতিবাচক জীবন দৃষ্টিতে সুফলের ইঙ্গিত দেখতে পান। তাঁর এই দোলাচল চিত্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে একটি কবিতায় —

"ঝঞ্ঝা কি শুধু টানবেই রসাতলে ?
শুধুই ভস্ম ! শুধু নিরাকার ধ্বনি !
নাকি দিন গোনে মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল—
ভস্মের নীচে সেই তো বজ্রমণি।" (একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশ / কাল মধুমাস)

নানা ঝঞ্ঝার মধ্যে কালবাহিত কবি জীবন সায়াহ্নে এসে এক একবার জীবনের পিছন দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। কখনো কখনো তাঁর মনে পড়েছিল সাঁকোর ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁকড়া ধরার স্মৃতি, বজবজের ডকে শ্রমিকদের জীবনের নানা টুকরো ছবি, ইত্যাদি নানা ঘটনার স্মৃতি বহন করে চলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় — "জীবনটাকে চিনেবাদামের খোলায় / ছাড়াতে ছাড়াতে /যখন প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি — / পেছনে পায়ের শব্দে / তাকালাম।" (সান্ধ্য / কাল মধুমাস)

পেছন ফিরে তিনি তাকিয়ে দেখেন ছেলে মেয়েদের প্রেম ভালোবাসা । কিন্তু ততক্ষণে পথচলার আলোগুলো অন্ধকারের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে নিজের বুকে

রঙের আভা জড়িয়ে কবি পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করেন, এবং তিনি এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সবাইকে আহ্বানও জানান —

"মাথার ওপর
খাটানো নীল
বিনি পয়সার তাঁবু।

নীচে সবুজ
গাল্‌চে পাতা
খেলা দেখে যান, বাবু !

ঢোলক বাজে
ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌
ভর সন্ধে বেলা।
হাজার ঢেউয়ের
হাততালিতে
জ'মে উঠছে খেলা।" (খেলা দেখে যান / কাল মধুমাস)

কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানে সামন্ততান্ত্রিক জীবন আজও রয়েছে। সে জীবনে আছে নায়েব, গোমস্তা, বাঈজী, মাহুত, সহিস, তোশাখানা, ও মাতাল। সেখানে একধরনের গণতন্ত্র। কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন — "ভোট যুদ্ধং দেহি ব'লে আঁটেন মাল কোঁচা / যাকেই তাকিয়ে মনে হয় খাঁদা বোঁচা / তাকেই আটকান জেলে। কারণ, সে গররাজি / মন্ত্র পড়তে গণতন্ত্রে ওঁ স্বাহা ফট্‌ - / পাঁচসালা উৎরে দেবে সত্যি কি ভোজবাজি? / কালের সেপাই ব'সে খেলা দেখে। /এবার বড়ের চালে কিস্তি পড়বে? /নাকি হরে মন্ত্রীর পালট্‌ ?"(যা হট্‌ / কাল মধুমাস)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'হেঁ-হেঁ আলির ছড়া' শিরোনামের ছড়াটি মূলতঃ তিনটি ছড়ার সংকলন; যথা 'কান্ড', 'বাঘে' এবং 'তিন্তিড়ি'। 'কান্ড' শিরোনামে এক শ্রেণীর মানুষকে উপমা দিয়েছেন কবি। তারা কেবল গাছের পাতা, কান্ড, ফুল-ফল, না দেখে গাছে উঠে শিখর অন্বেষণ করে, এবং তাদের শিখর দেখার প্রয়াস কবির ভাষায় —

" এ কয় ওরে, শিখরে
পৌছাতে হয় কী ক'রে
সোজা সটান শিকড়ে -

ব'লে যেই না হাত ছেড়ে দেয়
চিৎ করে দেয় ব্রহ্মাণ্ড।" (হেঁ-হেঁ আলির ছড়া / কাল মধুমাস)

এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'কাছে দূরে' শিরোনামের কবিতায় মর্ত্যমানবী ও দূরের প্রকৃতি একাকার করে সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন কবি। রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনায় প্রকৃতি ও মানব চেতনায় এই কবিতা সৃষ্টি হয়। কবি চিত্ররূপময়তায় ছবি এঁকেছেন এই কবিতায়। তাঁর ভাষায় — " হাওয়া বারে বারে আঁচল সরায় / হাত বারে বারে ঢাকে /হাত খালি হলে আঙুল জড়ায় /সময়কে পাকে পাকে / . . . . . . থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে /তার সে মুখচ্ছবি /দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে / ছাপা সে মুখচ্ছবি / নেমে গেল এক্ষুনি / ট্রেন খালি ক'রে ভোরের শেজালি ।।" (কাছে দূরে / কাল মধুমাস)।

এই কাব্যের 'রোদে দেব' শীর্ষক কবিতার বিষয় কৃষক পরিবারের ভেজা কাঠে ফুঁ দিয়ে দিয়ে বর্ষার ক'মাস রান্নার জন্য চোখে রাঁধুনির জল আসার বিষয় এবং এই বিষয় সহজ মনে শিশুর মনে কান্নার কারণ বুঝতে না পারার বিষয়। কিন্তু বর্ষা গেলে কৃষক কেবল কাঠকুটো ভিজে গেলে রোদে দেবে না, তবে হৃদয়ের রোদ দেবে। বর্ষা-রোদে প্রকৃতির সঙ্গে চিত্রকল্পে কৃষক হৃদয়ের কথায় একাত্মতা উপলব্ধি করেন পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কাল মধুমাস কাব্যের নাম কবিতা একাব্যের শেষতম কবিতা। এই কবিতা মূলত সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত মোট ছয়টি কবিতার সংকলন। এই সংকলনের প্রথম কবিতা 'কাল মধুমাস' শিরোনামে প্রথম কবিতা। এই কবিতায় কখন কিভাবে সময় কাটবে তা কবির উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে না। সুখ অথবা দুঃখ যেভাবেই দিন অতিবাহিত হয় হোক, সবই তাঁর আনন্দময় ও সুখের দিন। এই ভাবনার কথা কবি বলেন — "কথাটা, কী ভাবে /যাবে — /ক্ষণে ক্ষণে /মরতে মরতে ? /নাকি বেঁচে /নেচে নেচে / ঢেউয়ের মাথায় ?" (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস)

'কাল মধুমাস' শিরোনামে কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতার প্রথম অংশে কবি পৌরাণিক প্রসঙ্গে মুনি দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণা প্রসঙ্গে বুড়ো-আঙুল চাওয়ার বিষয় উত্থাপন করেছেন। ক্রমশঃ কবির প্রৌঢ়ত্বে পৌছানোর বিষয় কবিতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সেই পর্যন্ত তাঁর সময় অতিক্রান্ত

হয়েছে বিভিন্ন রূপে 'ছোট, বড়, গোল, চৌকো নানান মাপের।' কবির সময় ও জীবন দৃষ্টির নিরিখে তাঁর কাব্য বিশ্লেষণ আবশ্যক। নইলে সেই প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি নিজেই বলেছেন - ''তোমার সময় দিয়ে তাই / বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।'' কবি কখনো অন্বিষ্ট হয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে, কখনো মাঠের কৃষকের সঙ্গে, কখনো বা কারখানা শ্রমিক জীবনের সঙ্গে। কখনো নিজে অন্বিষ্ট হয়েছেন নিজের অন্তর্মনের আকাশকুসুম কল্পনার সঙ্গে। আবার মিশে গেছেন মিছিলে অথবা সভার ভিড়ে। তবে কোথাও তাঁর মাথা বাঁচিয়ে চলার অভ্যাস ছিল না কখনো । নানা বিঘ্নের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি নিরন্তর লিখে গেছেন।

এই সংকলনের তৃতীয় সংখ্যক কবিতায় গতিময়তা রয়েছে। একটি চলমান ট্রেনে একটি শিশুর কল্পনার জগৎকে রূপায়িত করেছেন কবি। ট্রেনটি চলেছে রাত্রির নিকষ অন্ধকারে। ট্রেনে ''দাদা দিদি কাকা বাবা সব পিপু ফিশু নিস্তব্ধ নিঝুম কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছে।'' ''জেগে একা বসে আছে শিশু - নেই ঘুম।'' সেই শিশু একসময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখল তার মা ট্রাঙ্কটা খুলে সেখান থেকে বের করল — ''দুটো তুবড়ি আর দুটো লাল-নীল দেশলাই /তখন অনেক রাত, /পাড়াসুদ্ধু বাড়ি সুদ্ধু ঘুমুচ্ছে সবাই /তারপর কী যে মজা হল।'' (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস) এখানে উৎসব মুখর শিশু মনকে চিত্ররূপময়তায় তুলে ধরেছেন কবি।

এই কাব্যের 'কাল মধুমাস' কবিতা সংকলনের চতুর্থ সংখ্যক কবিতাটি কবির শৈশবের সঙ্গে নওগাঁ শহরের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ও তারফলে লেখকের সে সময়ের উপলব্ধি জড়ানো আত্মজৈবনিক বিষয়। এই কবিতায় কবি লিখেছেন নওগাঁ 'অজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর।' নদী বেষ্টিত শহর; বৃষ্টিপাত সেখানে একটু বেশি এবং সেখানে শীতেরও বহর বেশি। সে শহরের চারপাশ বনাঞ্চল বেষ্টিত। সেখানকার কবির স্মরণীয় জায়গা দুবলহাটি, দিঘাপতিয়াই ইত্যাদি। নওগাঁর কথায় কবির স্মৃতিতে আসে রেনট্রি গাছের ছায়া, বোতাম ফুল, বেল, জুঁই, তুলসী মঞ্চ, কাঠগোলাপ, হাসুহানা, দোপাটি, টগর, করবী, মোরগঝুঁটিফুলের সম্ভার। এই কবিতায় কবি শৈশবের স্মৃতি কথায় লেখেন — ''শীতকালে সার্কাস আসত ; / ইস্কুলের মাঠে পড়ত তাঁবু।'' /আবার ''চড়কের আগে আসত সং — / কাছের গ্রামের এক বহুরূপী ; বছরে একবার । / মেসবাড়িতে তাবু চেয়েও আসত লোক হরেক রকম। /এক আসত শীল্ডে খেলতে নানা জায়গার /নামী নামী অনেক প্লেয়ার।'' /এবং ''খেতালচাষীরা আসত পাট্টা নিতে; / তখন সামনের মাঠে পা ফেলা যেত না।'' (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস)

সে জায়গার অনেক চরিত্র কবির বাল্য স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কবি লিখেছেন — " কী মুশকিলে পড়তেন যে হারাধন বাবু — / কাছে হবে মনে ক'রে /ছোট্ট তিন ফুট উঁচু টিবিটায় উঠে তিনি রোজ / আকাশের তারা দেখে দেখে / খাতা ভ'রে কী সব টুকতেন।" (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস) এছাড়া কবির স্মৃতিতে আসে শিল্প প্রদর্শনীর সরকারীলোক, জমিদার, গিন্নি মা, ও অন্যান্য চরিত্র। এই কবিতায় কবি সুভাষ তাঁর শৈশবের নওগাঁয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই জায়গার স্বদেশী আন্দোলন এবং উন্মাদনা সম্পর্কে কবি বলেছেন —

"সমস্ত শহর ক্ষুব্ধ ; ফেটে পড়ছে রাগে
আমরা সবাই।
মাঝে মাঝে হাঁক উঠছে ; জোরসে বলো , ভাই —
বন্দে মাতরম্।।
সারাটা শহর করছে থমথম।
গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে, দধীচি।" (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস)

শৈশবের মাতৃস্নেহের স্মৃতি নিয়ে কবি লিখেছেন এই কাব্য সংকলনের পাঁচ সংখ্যক কবিতা। ছেলেবেলা থেকে তাঁর মা তাঁকে লেখায় উৎসাহ দিতেন। সেই প্রেরণা কবির হৃদয়ে জেগে আছে আজো। মা তাঁকে 'বাঁদর' বলে আদর করে ডাকত কখনো কখনো। কবিকে শৈশবে মা আশ্বস্ত করতেন। কবি লিখেছেন— "কিন্তু তবু যখনই বৃষ্টিতে ঝড়ে / চমকাত বিদ্যুৎ /পাশে এসে মা বলতেন হেঁকে / জয়মণি ! স্থির হও । / যে-মন্ত্রে ঘেঁষে না কাছে ভূত / সে-মন্ত্র তো মার কাছেই শেখা। (কাল মধুমাস / কাল মধুমাস)

এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবি হৃদয়ের মানবিক আবেদনে মুখর হয়ে উঠেছেন। কবিমন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে ঘরের কোণে ঠাঁই না করে শৈশবের জীবন যাত্রায় অবিচল। নানা বেদনা, হতাশা ও ভাঙনের সিঁড়ি বেয়ে তিনি লাল গোলাপের প্রতি হৃদয়ের টান উপলব্ধি করেছেন। জীবনের সংঘাত, রাজনৈতিক সংঘাত, পার্টির ভাঙন, বিতর্ক ও সমালোচনার বাধা উত্তীর্ণ হয়ে কবি মধুমাসের রঙিন আভায় রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে । তাঁর কাব্য প্রবাহে 'কাল মধুমাস' বিশিষ্টতায় মাইল ফলক হয়ে উঠেছে।

কবিবন্ধু কালিসাধন দাশগুপ্তকে উৎসর্গিত 'এই ভাই' কাব্যের অন্যতম কবিতাগুলি হল — 'পূর্বপক্ষ', 'উত্তরপক্ষ,' 'বাঘবন্দী', 'ছুটির গান', 'কে যায়', 'এই ভাই', 'এক অস্থির চিত্ত',

‘তাঁর ইচ্ছেয়’, ‘একাকার’, ‘জেলখানার গল্প’, ‘সুখে থাকো’, ‘নজরুল তোমাকে’, ‘তানসেনগুলি’ ইত্যাদি।

‘এই ভাই’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘পূর্বপক্ষ’। এই কবিতায় একদিকে তারুণ্যের ও যৌবনের প্রতি কবিহৃদয়ের সহানুভূতি, অন্যদিকে অস্থির-উন্মত্ত-চাঞ্চল্যকর ও হিংসাত্মক আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কবি বিরক্ত ও বিব্রত। নকশাল আন্দোলনকারীদের অতি বামপন্থী উগ্র সন্ত্রাসে কবিহৃদয় ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। তাদের প্রতি কবির গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনের পরামর্শ এই কবিতায় শৈল্পিক ঢঙে ফুটে উঠেছে — “....................পাথরে সেই পুরনো মূর্তিটা ? / ইস্ , ভেঙে ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না। /এখনকার যে কি হাওয়া ! / . . . . . . কানে তালা ধরে গেল ওদের চিৎকারে। /বাবাজীবনেরা, ঘরে শান্ত হয়ে ব’সো /সাপ আছে, শাঁকচুন্নি আছে /অন্ধকারে যেতে নেই। /চোখের পাতা দুটো বন্ধ ক’রে /ভালো করে দেখতে হবে / হা-ঘরে হা-ভাতেদের জন্য কি করা যায়।” (পূর্বপক্ষ / এই ভাই)

রাজনৈতিক জীবনে কবি সংগ্রাম করেছেন দীর্ঘদিন। সেকালে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তাঁদের সামনে ছিল এক বড় আদর্শ, উচ্চ জীবনবোধ ও মূল্যবোধ। কিন্তু বর্তমান সমাজে কবি মূল্যবোধের অবক্ষয়, সন্ত্রাস, হিংসা, লোভ ও ভোগবাদী জীবনের সামাজিক হাওয়া দেখে কবি বিব্রত। সমাজের, নিয়ম ও আদর্শের ভাঙনে কবি হতাশ হয়েই বলেন — ‘ইস্, ভেঙে ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না।’ অপরিণত অনভিজ্ঞ ও অসহিষ্ণু ‘বাবা জীবনদের’ শান্ত হয়ে নিজেদের ঘরে ফেরার পরামর্শ দেন কবি। কবি তাদের নিজেদের মননের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে ‘হা-ঘরে’ ও ‘হা-ভাতেদের’ জন্য হিতকর কিছু করার আহ্বান জানিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

‘এই ভাই’ কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘উত্তরপক্ষ’। এই কবিতাটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত দু’টি কবিতার সংকলন। প্রথম সংখ্যক কবিতা অংশে প্রাচীনপন্থী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারা সেকালের প্রগতিশীল যুবশক্তির দ্বারা ধিক্কৃত হয়েছে। প্রাচীন পন্থীরা সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরে গা বাঁচিয়ে মড়া টপ্‌কে টপ্‌কে চলার পরামর্শ দেন। তারা সামাজিক দায়িত্বহীন, অসংবেদনশীল হয়ে অসহায়, মৃতপ্রায় অথবা মৃতদের এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। এঁদের ধিক্কার জানিয়েছেন কবি। কবি তাঁর নিজস্ব ঢঙে বলেছেন —

“বাবা বলেন, এমনি ক’রে
সারা রাস্তা ধৈর্য্য ধ’রে
মড়া টপ্‌কে

মড়া টপ্‌কে

মড়া টপ্‌কে হাঁটা ।

. . . . . .

বাবাদের ধিক্‌

বাবাদের ধিক্‌ ।।''   (উত্তর পক্ষ / এই ভাই)।

কবির কথন ভঙ্গীর নিপুণতায় 'মড়া টপ্‌কে হাঁটা' / এবং 'গা বাঁচাবার নাম' বাক্যাংশের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় দুই কালের দুই ছবিকে প্রতিকায়িত করেছেন কবি সুভাষ। আন্দলনে উন্মুখ ও যোবন শক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর প্রাণগুলোকে অসাধারণ চিত্রকল্পে কবি তুলে ধরেছেন কবিতার ভাষায় — ''আমাদের প্রাণ ভোমরাগুলো বড় বড় খোলের মধ্যে / ভ'রে / সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ; / ওপর বহ্নিমান হয়ে আকাশ কখন ভেঙে পড়বে''।। (উত্তর পক্ষ / এই ভাই)।

এই ছবির মধ্য দিয়ে কবির শৈশবের যুবশক্তির লক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছেন কবি সুভাষ। আবার বার্ধক্যে এসে যুবশক্তির মূল্যবোধের অভাব, সামাজিকতাবোধের অভাব লক্ষ্য করে কবি মর্মাহত। কবির ভাষায় — 'বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম, গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না; / এমন কাউকে আমরা দেখছি না / যার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারি ।'' এবং ''যাতে সারা দুনিয়াকে আমরা ভালো করে পা দেখাতে পারি।'' এই অবক্ষয়, অন্ধকারময় বিবেক বর্জিত সমাজে কবি মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কবি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী ধ্বনিতে মানুষের চেতনলোকে আঘাত করতে লিখেছেন —''শব্দ আমাদের ব্রহ্ম । / বাঁধা রাস্তায় পেটোর পর পেটো চমকাতে চমকাতে / আমরা হাঁক দিই।/ আমাদের আওয়াজে বাসুকি নড়ে উঠুক।''(উত্তর পক্ষ / এই ভাই)।

এই কাব্যের 'পাখির চোখ' শিরোনামের কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ । এই কবিতায় মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের গাণ্ডীবের প্রসঙ্গ উত্থাপনের দ্বারা কবির পৌরাণিক অনুষঙ্গের প্রতি দুর্বলতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাই, বন্ধু ও অন্যান্য পরিজনের মৃত্যু এবং ভ্রাতৃ হত্যার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রসঙ্গ কবির সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবির ভাষায় —

''আমি টান টান করে বাঁধছি

গান্ডীবের ছিলা।
সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাই বন্ধুদের
পেছনে আততায়ী আমার ভাই।
হে সারথি,
রথ এইখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।'' (পাখির চোখ / এই ভাই)।।

আলোচ্য কাব্যের অর্ন্তভুক্ত 'গাও হো' কবিতাটি কবির প্রিয় কমরেড ও মুক্তিযুদ্ধের নেতা হো-চি-মিন কে নিয়ে লেখা। এই কবিতার উৎস মূলে ছিল কবির রাজনৈতিক চেতনা। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে হো-চি-মিন-এর দক্ষতা ও নৈপুণ্য বিশ্ববাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কবির মনে হো-চি-মিন এর দেশাত্মবোধ প্রেরণা দান করে। কবি তার প্রিয় নেতার স্মরণে বীরত্ব ও সাহসিকতায় উৎসাহিত হয়ে লেখেন — শত্রুর টুঁটি ছেঁড়ে কোটি কোটি / তোমারই জাগানো সিংহ। /হো-চি-মিন ! হো-চি-মিন, হো। /মুক্তিযুদ্ধে দেখালে ভিয়েতনামের বিশ্বরূপ। /হাতে হাতে দিলে তুলে /বুকের রক্তে ভেজানো রঙের তুরুপ। /সারা দেশ জাগে / আজ অতন্দ্র পাহারায় — /ভালোবাসা কাছে টানে মৃত্যুকে সোহাগে /জীবনকে আজ কে হারায় ? /ঘৃণার বজ্রে দেখ শত্রুর শিবির ছিন্ন ভিন্ন /হো-চি-মিন ! হো-চি-মিন, হো ! (গাও হো / এই ভাই)।

এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা 'ভাবতে পারছি না' শিরোনামাঙ্কিত কবিতা। এই কবিতায় কবির সৃজনশীল হৃদয়ের ইপ্সিত ছবি ধরা পড়েছে। নিঃস্বার্থ, কৌশলহীন ও নির্মল জীবন কাঙ্ক্ষিত ছিল কবির হৃদয়ে। কবি লিখেছেন—

নদীর ধারে ঠান্ডা হাওয়া ;
আর পেছন থেকে দৌড়ে এসে কে ছোট্ট ছোট্ট নরম হাতে
আমার চোখ টিপে জানতে চাইবে ;
বলো তো কে ? (ভাবতে পারছি না / এই ভাই)

কিন্তু সমকালের সন্ত্রাসী তৎপরতা, পুলিশি দমননীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, খাদ্যে সংকট, পুঁজিপতিদের শোষণ, বঞ্চনা, ইত্যাদি কবিহৃদয়কে রক্তাক্ত করে তোলে। এই মর্মজ্বালা ফুটে উঠেছে কবির ভাষায় —

''আমি ভাবতে পারছি না
কেন না চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ,
আমার সারা গায়ে
এখন দংশনের জ্বালা।।''   (ভাবতে পারছি না / এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক চেতনা প্রসূত কবিতা 'ল্যাং' । এই কবিতার নামকরণে কবি লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন ব্যঞ্জনাধর্মী শ্রেণীকরণের দিক থেকে । ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এ যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সময়-পর্বে কবির নজরে এসেছিল — অনেকে ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য এই শিল্পী সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন । কেউ কেউ বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী হয়েও কায়েমী ক্ষুদ্র স্বার্থে কংগ্রেসী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বাম দলের সঙ্গ ত্যাগ করে ডানপন্থী দলের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন অনেকে। বিষয়টি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন —''ডান কানটা বিগড়ে গেলেও /বাঁ কানটা আছে /তাইতে ধরছি কে এবং কী / ছাড়ছে ধারে-কাছে- / 'আপনি, মশাই , গেছেন বদ্‌লে /বদলে গেছেন, ছি ছি ! / আগে গলায় বাজ ডাকাতেন / এখন করেন চিঁ চিঁ । / ইনাম পেয়ে জাহান্নামে / গেছেন, বলব কী আর —/ প্রগতির লোক ছিলেন আগে / এখন প্রতিক্রিয়ার ।   (ল্যাং / এই ভাই)।

এই উদ্ধৃতির মধ্যে 'ফুলকি' 'মেলা' ইত্যাদি শব্দগুলি অ-সাধারণ তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে কবির রচনার অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের দ্বারা । কবির এই পালা বদল কেবল কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। এই রূপান্তর দেখা দিয়েছিল তাঁর ব্যক্তি জীবনেও। কবি পার্টির দ্বিধা বিভক্তিতে যেমন মর্মান্তিক ব্যথা উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি কবি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ব্যক্তি জীবনে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। এতে অন্তর্মনে কবি মাঝে মাঝে পার্টির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন ও কষ্ট পেতেন। তাঁর এই গোপন কথা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসেছে 'দূরত্বে' কবিতায়। এই দিক থেকে কবিতাটির নামকরণেও কবির সেই বিশেষ কবি মানস সক্রিয় ছিল। কবিতার আঙ্গিকে কবির ব্যক্তি জীবনের গোপন মনের কথা এই কবিতায় ধরা পড়েছে। কবি লিখেছেন — ''মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পেতে চাই / চিঠি লেখার দুরত্বে ; /যেখানে / আমার কথাগুলো আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে / তোমার কাছে যাবে । /আর /আমি তাদের ফেরবার অপেক্ষায় /কেবলি ঘর-বার করব /কেবলি ঘর-বার করব।'' /   (দুরত্বে / এই ভাই)।

"এই ভাই" কাব্যে 'এ ও তা' শিরোনামের কবিতাটিতে কবি সুভাষ নিজের প্রতিকৃতিকে নাড়া চাড়া করে তাকে আত্মবিশ্লষণের ছকে দেখতে চান। এজন্য তিনি শিশুদের মতো হাত-আয়নার বায়না ধরে আছেন। কবির বিরুদ্ধে ওঠা পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের সূত্রে কবির মনের গোপনকথা কবিতার আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন এই কবিতায়। কবির দৃঢ় মনোবল যে, তাকে সব কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিলেও নিজের রাজত্বে নিজেই সেরা রাজা হয়ে থাকবেনই । সেখানে মনের সুতো আলগা করে কবি আকাশে উড়তে থাকবেন ঘুড়ির মতো। এই
তাঁর চলমান গতিময়তার নিরবধি ও নিরন্তর চলা অত্যন্ত সাধারণ ও আটপৌরে ভাষায় ও অতলভাব প্রকাশের ঢঙে স্পষ্ট হয়েছে।

আলোচ্য কাব্যের 'বলিহারি' কবিতাটি কথোপকথনের আঙ্গিকে কবির সাহিত্যিক জীবনের লেখা ও না লেখার ফিরিস্তি দিয়েছেন। অত্যন্ত সাধারণ ভাব, ভাষায় ও অন্ত্যমিল পংক্তিতে এই কবিতাটি লেখেন কবি। কবি লেখেন — "লিখি নি যে, কারণটা তার / নয় কো দুবোধ্য / জানলে লেখা যায় না কি আর / রোজ দু-চারটে পদ্য / সাধ ক'রে না-লেখার দলে / হতে চাইনি একক / কলম ঠেলি খেলার ছলে / আমি নই ঠিক লেখক।" (বলিহারি / এই ভাই)।

খেলার ছলে কলম ঠেলার বিশেষ তাৎপর্য নিহিত কবির সাহিত্যিক জীবনে। রাজনীতির উর্দ্ধে এক অনাবিল হৃদয়ের সাহিত্য-স্রষ্টা সমাজের সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই প্রকৃতি ও তার সমাজের মানুষকে নিয়ে লিখতে চান কবিতা । সেখানে উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষ ভালো-মন্দের তুলনায় জিততে চাননি কবি। কবি নিজের মতো করে লেখার জগৎটাকে বদলিয়ে জগৎটাকেও বদলিয়ে নিয়েছেন। প্রথাগত ও তথাকথিত জীবন ও জগৎকে বদলানোর প্রত্যয় তাঁর মনে জাগরুক ছিল। এই সামাজিক স্থবিরতা 'দুয়ো' কবিতার রূপচিত্রময়তায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি সুভাষ। তাঁর ভাষায় — "আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই /যে, /সারাক্ষণ হাসতেই থাকব ! /আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই /যে, /সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব ! /আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয় নি / যে, /সারাক্ষণ হাত মুঠো ক'রে রাখব।" (দুয়ো / এই ভাই)।

জীবনকে ও জগৎকে বদলানোর প্রত্যাশা কবির মনের গভীরে নিহিত। আলোচ্য কাব্যের 'বাঘবন্দী' শিরোনামের কবিতায় নিহিত সব কিছুকে বদলানোর দৃঢ় প্রত্যয়। সেখানে কবি লেখেন —

রাস্তায় কিছু একটা হলেই
আমি বাইরে আসি;
আমার মন বলে, এই বার

হ্যাঁ ,

ঠিক এইবার সবকিছু বদলাবে।''   (বাঘবন্দী / এই ভাই)।

খাঁচায় বন্দী বাঘ খাঁচাটার বাইরে নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে সর্বদা গর্জন করে থাকে। কবি ভেতরে একটা সাধারণ প্রেরণা ও তাগিদ সর্বদা উপলব্ধি করেন। তিনি রাজনৈতিক মিছিলের আওয়াজ শোনার জন্য কান পাতেন। কিন্তু তাঁর কানে মিছিলের শব্দের পর ধ্বনিত হয় ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ, হাওয়া লেগে শালপাতার ছটফটানি, সিনেমা ভাঙার পর রাত্রের শেষ ট্রামের যাত্রীদের কলরব ইত্যাদি। দৈনন্দিন সাধারণের জীবন স্পন্দন তোলে এই সময়কালের কবি হৃদয়ে। তাঁর এই জীবনের সাধারণ লক্ষণ-তাঁর কাব্য প্রবাহের বিশিষ্ট মাইলফলক ।

কবি নিজের অন্দরে ডুব দিয়ে লক্ষ্য করেন—এই জগতের সবই পরিবর্তিত হচ্ছে। কেউ-ই নিজের জায়গায় স্থির নয়। স্থবির নয় কোনো কিছুই । সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে এই জড় জগৎ ও চলমান মানুষের জগৎ। তাই 'বাইরে থেকে ভেতর ' শিরোনামের কবিতায় কবি সুভাষ বলেন — ''ভেতর থেকে যখনই আমি বাইরে তাকাই /দেখি /সমস্তই নড়ে নড়ে যাচ্ছে /নিজের জায়গায় কেউই স্থির নয় / আমি এবার বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে / বাইরে থেকে / ভেতরটাকে দেখতে চাই।'' (বাইরে থেকে ভেতর / এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশিষ্ট কবিতা 'ছুটির গান'। গানের তাল, লয় ও আঙ্গিকে রচিত আলোচ্য কবিতাটি । এই কবিতার মধ্যে কবি সাইরেন বাজলে হাত ধুয়ে শ্রমিকের নিত্য দিনের ছুটিকে কবিতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় করে তুলেছেন। সাহিত্যিকের রাজনৈতিক কর্মীর ও পৃথিবীর সমস্ত স্বপ্ন সেখানে নীড় বাঁধার ভিড় কমে; সেই স্বপ্নের জন্য ছুটির গান গেয়েছেন কবি। কবি জীবনের যাবতীয় তৃষ্ণা থেকে বার্ধক্যে এসে ছুটি নিতে চাইছেন। কেননা, যে কোনো তৃষ্ণার পরিণতি হিংসা। তাই কবি লেখেন —

''ছুটি আমার ছুটি ।
ফিরে যা তৃষ্ণা
যা, পিছু নিস না
ফিরে যা রে হিংসুটি।''   (ছুটির গান / এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ছাই' শীর্ষক কবিতাটিতে বার্ধক্যেও কবির বলিষ্ঠ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তুলনায় সমকালের 'সাজোয়ান' ছোকরাদের একগুঁয়ে, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা তাঁকে বিরক্ত করে তোলে । কবির উদার ও স্বাভাবিক বলিষ্ঠতার কারণ নির্দেশিত হয়েছে —''রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে

ভিজে এই এত বড়টা হয়েছি। /এখন আর আমার / কিছুতেই কিছু হয় না /বলিহারি আক্কেল /আজ কালকার সাজোয়ান ছোকরাদের।'' (ছাই / এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের আর একটি বিশিষ্ট কবিতা 'কে যায়'। এই কবিতাটি মূলতঃ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত পাঁচটি কবিতার সমষ্টি। কবিতা পাঁচটির প্রথম কবিতায় জীবনের পরিবর্তিত ছবিগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। অনেকটা জন্মান্তরবাদের মতো। মানুষের জীবনের কোনো ছবিই সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় নি। জীবন ক্রমশঃ জগতের নিয়মে পরিবর্তিত হয়। কবি বার্ধক্যে এসে যখন শৈশবের মুখ গুলোর ছবি মেলাতে চান তখন সেগুলো আর আগের অবস্থায় আগের রূপে দেখতে পান না — ''কেউ যায় না / শুধু জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে / সব কিছুই /জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে / সকলেই /থাকে ।'' (কে যায় (১) / এই ভাই)।

কবি মনে করেন এক খাঁচার নীল একটা পাখি উড়ে গেলে খাঁচাটা শূন্য হয়ে অভিমান করে কিন্তু শূন্যতা আরার সেই পাখিতেই ভরে। প্রাণবায়ু এক খাঁচা থেকে অন্য খাঁচাকে আলোকিত করে মাত্র । এই জীবনের বিশিষ্ট দর্শনের চেতনা ফুটে উঠেছে 'কে যায়' শিরোনামের দ্বিতীয় সংখ্যার কবিতায়। সেখানে দেখা যায় — ''পাখি উড়ে গেছে । /উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা । /তাই মুখ কালো ক'রে /অভিমানে / দেওয়ালে ঠিকরে আছে /মরচে ধরা লতাপাতায় /লোহার বাসরে /শূন্য খাঁচা ।।'' (কে যায় (২) / এই ভাই)।

কবি বার্ধক্যে এসে পুরনো দিনের সঙ্গীদের অনেককেই ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন অনেকের নামও । তাই একদিন কোনো এক সঙ্গীর অট্টালিকার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গিয়ে কিছুতেই তাঁর নাম স্মরণ করতে পারছিলেন না —

''ডাকতে গিয়ে
দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল
পুরোনো দিনের সঙ্গীদের নাম
এখন আর
কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না ।।'' (কে যায় (৩) / এই ভাই)।

আবার অনেক স্মৃতি কবির মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। সেই স্মৃতিগুলো আজ কেবলই গল্প আর ছবি হয়ে আছে। সেদিনের সব কিছুই বদলে গেছে । দৃষ্টান্ত দিয়ে 'কে যায়' কবিতা সংকলনের চতুর্থ সংখ্যক কবিতায় লেখেন — ''একদিন যেখানে ঘেরাটোপে / কলেজের বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি থেকে

নামত জজ সাহেবের নাতনি।'' এই সময় যেখানে ছিল তাঁদের কবরেজ মশাইয়ের বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো; সেখানে ''তাঁর নাতিরা খুলেছে / ঠিকেদারের কেতাদুরস্ত আপিস'' আর চুলছাঁটার সেলুন।

তাই কবি বলেছেন — '' ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাচ্ছে হে দুনিয়া।'' এই বদ্‌লানোর ছবি দেখা যায় এই কাব্য সংকলনের পঞ্চম সংখ্যক কবিতাটি। আলোচ্য কবিতায় কবি পরিবর্তিত যন্ত্র সভ্যতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমাজ প্রেক্ষিতের ছবি তুলে ধরেছেন । একটু আগে এলে যেখানে নিস্প্রদীপ নৈঃশব্দ্যে পরিবেশ দেখতে পেতেন কবি সেখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন — '' ছাপাখানার চাপযন্ত্রে /গম ভাঙার কলে / চারিদিকে আবার সব / গম গম করছে ।'' (কে যায় (৫) / এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের 'জল আসুক' কবিতাটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতাটিতে নিজের মনকে আকাশের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন কবি। আকাশের মুখের ভাব বদলে যায়। কেন না সকাল থেকে গুম হয়ে থাকার পর এই প্রথম গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শূন্যে ভর দিয়ে নামছে । এই বৃষ্টি নামার সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন একটি সভায় বেআইনি দলের অতর্কিতে রাজনৈতিক ইস্তাহার ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে — ''এবার / যেন একটা কঠিন সংকল্পে —/ মন বেঁধে নিয়েছে / সভায় কোনো বেআইনি দলের / অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া / উত্তেজক ইস্তাহারের / শূন্যে /ভর দিয়ে দিয়ে / নামছে /গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ।'' (জল আসুক / এই ভাই)।

আলোচ্য কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটিতে কবি জলের দেবতাকে গ্রামের মোড়লদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন। কবির ভাষায় সেই অভিযোগ ও প্রতিবাদ হল — ''লোকে অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে নদী — / আমাদের পুকুর গুলোতে পাঁক ; /কুয়োর এই ঘোলা জল , / হে দেবতা, /আর যে আমরা মুখে দিতে পারছি না ।/তোমার পায়ে পড়ি এই মোড়লগুলোকে নাও/একে ওরা মুড়িয়ে খাচ্ছে ,/তার ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাদের রাখছে ।''(জল আসুক/এই ভাই)

এই কবিতায় পুঁজিবাদী ও জমিদার প্রথার বিরুদ্ধে কবি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই জমিদাররা প্রকৃতির দেওয়া নদী-পুকুর-কুঁয়োর জল জনসাধারণকে ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করছে। তাই কবি এই জমিদার গুলোর পরিবর্তে চাইছেন 'বেবুন' । মানুষের সমাজে সেই সব অত্যাচারী জমিদারের পরিবর্তে বেবুনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কবি —''বরং পাঠিয়ে দাও কিছু বেবুন / আমরা ওদের নুন জল খাইয়ে তৃষ্ণার্ত করলে /ওরা ঠিক জল বার করবে।/ মাটি থেকে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে।/হে জলের দেবতা, / তুমি কোথায় ?'' (জল আসুক / এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের নাম 'এই ভাই' — এই কাব্যের একটি অসাধারণ কবিতা। এই কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য সমাজের তুলনা করেছেন কবি। সমাজের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, মানুষকে

আঘাত, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক ভাঙন ইত্যাদি প্রলয় সেই সময়কালীন সমাজকে রক্তাক্ত করে তোলে। কবির ভাষায় সেই পরিবেশে বিশেষ আবেদন — ‘‘দম বন্ধ হয়ে আসছে । / এই ভাই। / আমাকে একটু পাশ দিন। / বেরিয়ে যাই ।’’ কবি মানুষকে আহ্বান করেছেন এই নাম-কবিতার শিরোনামের মধ্যে । কবির মনে হয়েছে — চারদিকে একটা দম বন্ধ অবস্থা। কবির মতে কোথাও যেন একটু খোলা হাওয়া নেই । বনে বনে দাবানল, মাথার ওপর যেন খাঁড়া ঝোলানো আছে। রাত দিন মাথার ওপর যেন পাক দিচ্ছে প্রলয়। তাই কবি সেই রক্তাক্ত দিনের ছবি আঁকেন কবিতার ভাষায় — ‘‘ আর পাথরের দেয়ালে /পিঠ /ক্ষতবিক্ষত ক’রে /আমরা এ ওকে / সে তাকে /নখ দিয়ে খুঁড়ছি /দিন রাত খুঁড়ছি ।’’ (এই ভাই / এই ভাই)

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে ক্ষতবিক্ষত কবি উপলব্ধি করেন সময়ের সংকট মুহূর্তকে । সেই সংকটপূর্ণ সময়ে মানুষ সহানুভূতি ভুলে মূল্যবোধ হারিয়ে পরস্পরের ধ্বংসের মুখোমুখিতে মত্ত হয়েছে। সেখানে মানুষ এ ওকে , সে তাকে নখ দিয়ে কেবল খুঁড়ছে। তাই কবি ‘এই ভাই’! — ডাক দিয়ে মানবিক হবার চেতনা জাগাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

এই কাব্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘এক অস্থায়ী চিত্র’ শিরোনামের কবিতা। এই কবিতায় দেখা একটি ট্রেন যাত্রার চিত্রকল্প। সেই চিত্রকল্পে এসে পড়েছে স্বাভাবিক গতিতে সমকালের জীবনের কদাকার ছবি। কেননা, সেসময়ের পর্বে ‘‘সেখানে যার থাকার কথা / নিজের নিজের জায়গায় / নেই।’’ জীবন যেন কবির দৃষ্টিতে একটা সময় সহসা থেমে গিয়েছে। সেই স্থবির জীবন হারিয়ে ফেলেছে তার প্রকৃত সৌন্দর্য। কবি এই কবিতায় তাই লিখেছেন —‘‘থেমে যাওয়ার এ-বিকৃতি / ধুলোয় ফেলে দিয়েছে স্মৃতি / খুঁজছে সবাই / পরস্পরকে ফেলে পালানোর জো। /তবেই দেখুন , / সময়মতো যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য ।।’’ (এক অস্থায়ী চিত্র / এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতা ‘এই ও’ শিরোনামে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সমষ্টি। কবিতা দুটির প্রথমটিতে কবি আশৈশব মনের দর্পনে দেখে নিয়ে নিজেজে নিজের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলেন এক সময়। তাঁর ভাষায় —

‘‘ আমি তখন ঘাড় হেঁট করে
কুয়োর স্থির জলে
নিপুন হয়ে দেখছিলাম
নিজেকে ।
ছায়া থেকে স্মৃতি

আমার চোখ. . . . . ''　　(এই ও /এই ভাই)

কবি নিজের আশৈশব জীবনের সব কিছু আত্মবিশ্লষণ করে এখন কবি নিজেকে বিস্তৃত করে সারা পৃথিবীতে নজরবন্দী করে নিয়েছেন। কবির ভাষায় — ''আমার গোচরে /এখন /সমস্ত চরাচর ; /সারা পৃথিবী / এখন আমার নজরবন্দী ।।''　　(এই ও/এই ভাই)

কবি রাজনীতির গণ্ডী উত্তীর্ন করে, সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের ছায়াটাকে পৃথিবীর গায় ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছেন। কবি রাজনীতির সংকীর্নতাকে এই সময় বর্জন করেছেন ।তাঁর ভাষায় —

''আমি সব দেখতে পাচ্ছি।
দলের ভেতর দল পাকিয়ে
গদি দখলের গুজগুজ ফুসফুস —
এই ও !
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।''　　(এই ও/এই ভাই)

কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর সে সময় যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পার্টির ভেতর কেবল গদি আকড়ে বসে থাকার জন্য গোষ্ঠী কোন্দলে মত্ত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস সরকারের অধীন যারা কেবল নিজের গদি আঁকড়ে থাকার জন্য গোষ্ঠীকোন্দল দলের অন্দর মহলে পাকিয়ে তুলেছিলেন তাদের সংকীর্ণ রাজনীতিকে এবং আদর্শচ্যুত রাজনৈতিক সত্তাকে কবিতায় ধিক্কার জানিয়েছেন কবি সুভাষ। তাঁর এই বিশেষ রাজনৈতিক সচেতন সত্তা কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে ।

আলোচ্য কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা 'তাঁর ইচ্ছেয়' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটি। এই কবিতার বিষয় ও শিরোনামে শরণ করেছেন কবি একজন কেউকেটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর। পার্টি সর্বস্ব মানুষ পার্টির প্রতি এতটাই অনুগত থাকে যে পার্টি কারো ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললে সেই কর্মী বিনা বিচারে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে।

এমনই এক ব্যক্তি পার্টির কথায় বিনা যুক্তিতে যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিয়ে আসে এমন কি নেতৃত্বের নির্দেশে সে নিজের গলা এগিয়ে দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না। এসব কিছু ওপর ওয়ালার ওপর তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে বলে সাধারণ কর্মী ও নাগরিক বিনা বিচারে বিনা যুক্তিতে নিজের গলাটাও এগিয়ে দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক হিংসা, ঈর্ষা থেকে এক সময় ব্যক্তির হৃদয়ে আসে অনুশোচনা। সেই অনুশোচনাও এসেছিল কবির মনেও। কিন্তু তার পরেও রাজনৈতিক সংঘাত শেষে কর্মী যে কথাটা মনে করে সংঘাত, লড়াই, ঈর্ষা ও অপকর্মের সব দায়ভার এড়িয়ে যায়; সেটি হল 'সব তাঁরই ইচ্ছেয়।'

কবি হিংসা, ঈর্ষা, ও সংঘাতের দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পেরিয়ে এসেছেন। এখন তার মনে সহনশীলতা, মানবিক চেতনা ও অনাবিল আনন্দের আকর। তাই কবি 'খেলা' শীর্ষক কবিতায় লেখেন — " যদি হারি /আমি তাঁবু পোড়াতে ছুটব না -/ খেলার আনন্দে / দেব /সশব্দে হাততালি ।।" (খেলা/এই ভাই)

এই পর্বে এসে কবি উপলব্ধি করেন যে - নদীর প্রবাহমানতাকে যেমন বাঁধা দিয়ে রোধ করা যায় না, মানুষের জীবনের গতিকে এবং সাহিত্যের প্রহাহমানতার গতিও রোধ হবার নয়।তাই এমনি ক'রে শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটিতে কবি সুভাষ লেখেন — " ডাইনে-বাঁয়ে বাঁধ দিয়ে / নদী /রাখতে পারো নাকো ঢেউ /একটিও বজায় । /এমনি ক'রে দিন যায় /এমনি ক'রে দিন।" (এমনি ক'রে/ এই ভাই) আলোচ্য কাব্যের 'একাকার' শীর্ষক কবিতাটি সমাজতন্ত্রের মহান নেতা কমরেড লেনিনের স্মরণে রচিত। খুব অল্প বয়স থেকে কবি লেনিনের আদর্শে মুগ্ধ হন। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবার বন্ধুর নিকট শোনেন, যে — " দেশশুদ্ধ লোক যতদিন

খেতে পায়নি

কমলালেবু -

খাননি লেনিন। " (একাকার/এই ভাই)

পরে ক্রমশঃ বড় হয়ে কবি জীবনের সঙ্গে একই সঙ্গে লেনিন পৃথিবী ও কমলালেবুর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাই কবি লেখেন — " পরে যখন বড় হলাম /পৃথিবী আর কমলালেবুর /এক আকারে / জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম . ... লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষত্ব ।"(একাকার/এই ভাই)

পারিবারিক সূত্রে খুব অল্প বয়স থেকে কবি সমাজতন্ত্রের ওপর বামপন্থী মতাদর্শের ওপর মুগ্ধ হয়ে যান। আত্মজীবনীমূলক এই কবিতায় লেনিনের প্রতি তাঁর আকর্ষন শিশুকাল থেকেই। সেই বীর নেতাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে। পরে জগৎ -জীবন- মনুষ্যত্ব বোধের সঙ্গে লেনিন একাকার হয়ে ওঠে। জীবনের এই সত্য অবলম্বনে তিনি 'একাকার' কবিতাটি লেখেন।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'জেলখানার গল্প'। জেলে বন্দী জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে সুভাষ ১৯৪৮ সালের মার্চে বিনা বিচারের বন্দী হিসেবে বহু কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দমদম জেলে কমিউনিষ্ট বন্দীদের হাঙ্গার স্ট্রাইকে তিনি সামিল হয়েছিলেন।

কবি এই কাব্যের রচনাকাল পর্বে এই জগতের 'গাছ পাখি মাঠ ঘাট হাট' ও মানবিক জগতে আত্মস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতি তো পেছনে ডাকবেই। এরকমের একজন হঠাৎ একদিন পেছন থেকে

''কমোর-ড'' ''কমোরে -ড'' বলে ডাকছিলেন। এই ব্যক্তি সম্পর্কে কবি লেখেন — ''ফিরে দেখি চেনা মুখ / দেখে থাকব হয়তো কোন মিছিলে -মিটিং-এ /ভাঙা গাল, একেবারে রোগা টিঙটিঙে /খাটো ধুতি, মার্কামারা খাঁকির হাফশার্ট । /কাছে যেতে মনে পড়ে গেল অকস্মাৎ /এক সময় আমরা সব /একই জেলে একসঙ্গে ছিলাম''। (জেলখানার গল্প/এই ভাই)

এই রাজনৈতিক বন্দী সঙ্গীর সঙ্গে তাঁদের সেই অনশন ধর্মঘটের দিনগুলির ছবি মনে পড়ে। কবি সেই বন্ধুকে বলেন — '' দাঁতে দাঁত দিয়ে সব ব'সে থাকা

কিছুতে না খাওয়া,

সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা

টিয়ার গ্যাসের জন্যে , সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি -

তবু কী আনন্দে, ভাব,

কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।''(জেলখানার গল্প/এই ভাই) অতীত জীবনে সংগ্রাম মুখর সেই দিনগুলির স্মৃতিতে কবি আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। তারপরেও কবি আপাতদৃষ্টিতে কারাগারে বন্দী নন। তথাপি যেন আমরা সবাই 'নিজেদের জালে বন্দী ; নিজেদেরই তৈরী - করা জেলে'।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ভালো লাগছে না'। এই কবিতার শেষ চরণে কবির মানসিকতার পরিচয় মেলে। সেখানে কবি লেখেন — ''আমার ভালো লাগছে না / ভালো লাগছে না- /যখন দেখছি / আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে /ভিয়েতনামকে ভাই বলছি ।।'' (ভালো লাগছে না/এই ভাই)

দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরও আমরা উন্নয়নশীল দেশ আজো আমেরিকার হাত থেকে মুক্ত নই। আজো মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে মাছির মতো মরছে। সভ্যতার মুখোশ পড়ে অনেক উন্নত দেশ তাদের স্বার্থের জন্য শয়তানী মুখোশ খুলে হিংস্রতায় বর্বর জানোয়ারদেরও হার মানাচ্ছে । কবি রামায়ণে পুরাণ প্রসঙ্গ অত্যন্ত শিল্প কুশলের সঙ্গে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। এখানে রামলক্ষ্মনের চুলোচুলির মধ্যে উন্নত ও সভ্য দেশগুলির অন্তর্কলহকে ব্যঞ্জিত করেছেন কবি সুভাষ।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'সুখে থাকো' শিরোনামের কবিতাটি। এই কবিতাটিতে এক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফেরার ছবি বিভিন্ন পেশার মানুষের। এই যাত্রায় দেখা মেলে কমলালেবু, ঠান্ডা জল, চুল বাঁধার ফিতে, খনার বচন, ছুঁচ, সেফটিপিন, গোপাল ভাঁড়, খেলনার পিস্তল নিয়ে হকার, কাঁখে -পো , কোলে -পো, অস্থিসার মা ঠাকুরণ, ম্লেচ্ছ, পুরুতমশাই, ছাত্র, করানী ও অন্যান্য পেশার

মানুষ। অসাধারণ চিত্রকল্পে কবি এই বাস যাত্রীদের জীবন্ত করে তুলেছেন । সেই বাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে ফিরছেন এক বি. ডি. ও. । তার বর্ণনায় কবি লেখেন — '' পা তুলে একলষেঁড়ে, ধুতি তুলে হাঁটুর ওপর / পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আঙটি , কোলে ট্রানজিস্টর রেডিও, / হাতে ছোট সাইজের টোপর ; /জানা গেল, ষষ্ঠ ছেলেটির ভাত এবং তৎসহ /ল্যাঙড়া আম বড় ভালবাসেন বি-ডি-ও।'' (সুখে থাকো/এই ভাই)।

এই পর্বে কবি মানুষের মধ্যে একটাই মুখ দেখতে চান যার মধ্যে কেবল সুখের আনন্দ। কবি লিখেছেন — সেই বাসে ''উঠে এল বীরদর্পে /অপরূপ /অনবদ্য /টিনের সুটকেস নেড়ে 'সুখে থাকো' লেখাটুকু /দোলাতে দোলাতে।।'' (সুখে থাকো/এই ভাই)।

এই পর্বে কবির চেতনালোকে আসে দৈনন্দিন সাধারণের জীবনের ছিন্ন ভিন্ন ছবি। সে ছবি একেবারে মাটির কাছাকাছি ও বাস্তবের ভিতে নির্মিত। একাধিক যাত্রা পথের ছবি । জীবন যাত্রার বৈচিত্রপূর্ণ জীবন যে জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু ও কবির দৃষ্টিতে আসে। অন্নপ্রাশনের টোপর কোলে বিডিও সাহেব গ্রীষ্মের ছুটিতে যাত্রা করছেন। আবার আলোচ্য কাব্যের 'ছিন্নভিন্ন ছায়া' শিরোনামের কবিতায় রেলের লাইনে কাঠের স্লিপারে দুপুরের রোদে শুকোয় মানুষের গেঞ্জি গামছা, জাঙিয়া, মোরজাই। কবি দেখেন মানুষের কাঁধে বলহরি হরিবোল ধ্বনিতে খাটিয়ায় শবদেহ। কবির লেখনীতে মানদিক চেতনায় এই প্রকৃতির বৈচিত্র্য পূর্ণ জীবন্ত ছবি ঝরে পরে এই পর্বে। কবির বর্ণনায় — ''ডোমের মেয়েরা বাছে পা ছড়িয়ে ব'সে /এ ওর উকুন । /মাঝিরা ঘুর ঘুর করছে , /জলে ধুচ্ছে ইলিশের জাল। /. . . . . আঁটি বাঁধা ভিজে খড় /ডাঙার রেলিঙে /সার বেঁধে বসে খাচ্ছে হাওয়া — /পর্বতপ্রমাণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে /অদূরে খড়ের নৌকো।'' (ছিন্নভিন্ন ছায়া/এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা 'আমাদের হাতে''। এই কবিতায় উপনিবেশিক পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী দেশাত্মবোধের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে তাঁর শিল্পী চেতনা। কবির চেতনায় বিশিষ্ট দেশাত্ম বোধের জাতীয় চেতনা ইতিবাচক দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে। পুঁজিবাদী মার্কিনী গমের আগম, 'ওদের কালো চশমা', 'ওদের বাঁধানো দাঁত এখন আমাদের দেশীয় বাজারে দেখা যায়। আমাদের বাজারে ওদের পুন্য কেনা বেচা হয় অথচ আমদের স্বাধীনতা আমাদের মুঠোয় রেখেছি আমরা। কবির লেখনীর যাদুতে দেশাত্মবোধ আমাদের চেতনলোকে জাগরিত হয়েছে এই কবিতার মধ্যে। তিনি লিখেছেন —'' বিলক্ষণ পরিস্কার — দুর্গাপরে ফিন্‌কি -/ দেওয়া রক্তের ধারায় /ঠিক /জলের মতন সহজ । /আমাদের চোখ যত খোলে /মুঠো তত শক্ত হয় । /ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে , /আমরা

বুকের রক্ত দিয়ে /কিনে নিয়েছি। /ওরা ফেলে দিয়েছিল , /আমরা তুলে নিয়েছি /স্বাধীনতার পতাকা, দেখ —/ এখন / আমাদের হাতে।।'' (আমাদের হাতে/ এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'হতেই হবে'। কবি জীবনের সংকট-ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার অটল ও দৃঢ় জীবন প্রত্যয়ের ছবি এঁকেছেন এই কবিতায়। কবির দৃষ্টিতে জীবনের যাত্রায় ও প্রবহমান যুদ্ধে থামলে চলবেনা। যুদ্ধ করেই জীবনের রোদ্দুরকে হাসাতে হবে। যাত্রাপথে পাড়ি হতেই হবে। এইভাবেই জয়ী হতে হয় যে কোন সংগ্রামে। আমরাও জয়ী হয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। নৌকা যাত্রার চিত্রকল্পে কবি আকাশের মুখে রোদের হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন একসময়। এইরকম চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানসিক জোর, প্রাণপণের শৌর্য রাখতেই হয়। তাই কবি বলেন— এরকম হতেই হয়।

নইলে কিসের জীবন

আর মানুষই বা কেন ?'' (হতেই হবে/ এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা ''নজরুল তোমাকে'' । এই কবিতায় একদিকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার প্রেরণা অন্যদিকে বিদ্রোহী কবির প্রতি দেশের শাসক দলের রঞ্চনার প্রতিবাদ করেছেন কবি সুভাষ। কবি বাস্তবযুক্তি নিষ্ঠার মাধ্যমে কবিতায় দেখিয়েছন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের ঋতু বদল, ফুলের সৌরভ, মৌমাছির গুনগুন সমস্তই সাময়িক। কিন্তু জীবনের লড়াই চিরন্তন এই লড়াইয়ে এবং আমাদের নিত্য দুঃখজয়ের সংগ্রামে চিরন্তন আসন নিয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি সুভাষ নজুরুল ইসলামের স্মৃতিতে এই কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতায়, লেখেন —'' যখন বাতাসে ঘূর্ণি /শিকড়ে শিকড়ে । /তখন তোমাকে মনে পড়ে । / খুঁজি না রাস্তার নামে, /জানি নেই মর্মর মূর্তিতে - /তুমি থাকবে, তুমি আছ, /আমাদের নিত্য দুঃখজয়ের সংগ্রামে ।।'' (নজরুল তোমাকে/এই ভাই)।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'পটল ডাঙার পাঁচালী যাঁর'। এই কবিতায় কবি সুভাষ তাঁর সমকালের বাংলা জগতের কোনো কোনো সাহিত্যিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । উচ্চবিত্ত সেইসব লেখককে কবি এখানে নির্দেশ করেছেন যারা ''ছদ্মনামে ছাড়িয়ে যান/মান্ধাতারও আমল' অথচ পুলিশ প্রশাসন 'একালেও দেয় পাহারা যাঁর / নীলকমল লালকমল।' সেই সব প্রকৃতি সম্পর্কে হাস্যরসমিশ্রিত কিঞ্চিত তীর্যক ব্যঙ্গ ও চিত্ররূপ ময়তায় তাদের প্রতি লেখক সহজ ভাষায় লেখেন— '' এমন মানুষ পাওয়া শক্ত /লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে /এ নিজের এবং কলম /এই ফেলছেন ছুঁড়ে / মাথায়

আকাশ-ছোঁয়ার যদিও / মাটিতে পা রাখেন /জমি জরিপ করেন আগে,/পরে নকশা আঁকেন ।'' (পটল ডাঙার পাচাঁলী/এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'যা চাই।' এই কবিতাটিতে কবির প্রকৃতি চেতনা, সৌন্দর্য চেতনা ও মর্ত্য প্রীতি এবং আত্মোপলব্ধি জাত বিশেষ বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে। কবিতাটির প্রথম চরণ গুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে কবির একাত্মতা অসাধারণ চিত্ররূপময়তায় ছবি হয়ে উঠেছে। কবি প্রকৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন বসন্তের গলায় মালা পরিয়ে দিতে প্রতীক্ষায় দিন গুনছে অজ্ঞাতবাসের ফাল্গুন। কবি এই আকাশের প্রতি মুখ চুলে চেয়ে দেখেন ঋতুচক্রে বসন্ত আসার এখন অনেক দেরি। এই মর্ত্যপ্রকৃতিকে ভালোবেসে ও প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে কবি লেখেন -''আকাশ দুহাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ,

চোখে বিদ্যুতের জ্বালা,
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকির শরীরে আগুন।

....

কাল নিরবধি।
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের,
পায়ের পাতায় লেগে লেগে

মাটি ভাঙে;
কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায়
নদী।'' (যা চাই / এই ভাই)

আলোচ্য কাব্যের 'নাটক' কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ ও নিপুণ শিল্প দক্ষতায় অত্যন্ত সহজ ভাষায় রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি তাত্ত্বিক বিষয়কে কবিতায় শিল্পরূপ দান করেছেন। একটি পারিপার্শ্বিক পরিজনদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগের ঘটনার প্রেক্ষিতে অসাধারণ বিষয়কে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি সুভাষ। কবিতাটির শুরুতে বলেছেন —

'সুযোগ এবং সুবিধায়
সমানে সমান হোক দশ ভাই
কেন পাবে কেউ খুব বেশি,

খুব কম?''   (নাটক / এই ভাই)

সমাজতান্ত্রিক ও সাম্য ভাবনার প্রেরণা থেকে কবি উক্ত বক্তব্যটি প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে কবির সমাজ সচেতন শিল্পী মানস। এই ভাবনা কবি মনে তৈরী হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনের ঢেউ থেকে। রাজনৈতিক সংগ্রামে, সমাজ ভাবনায় ও সাহিত্য সম্ভারে সেই সাম্য ভাবনা সারা দুনিয়াকে ঢেলে সাজাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কবি এই ভাবনায় লিখেছেন — ''যেই তারা সারা পৃথিবীটাকেই /ঢেলে সাজবার পক্ষে / হাতে কলমেও হাজির করল প্রমাণ / অমনি তাদের / থাকল না আর রক্ষে।''   (নোটিশ / এই ভাই)

এই সমাজ বদলের প্রেক্ষিতে সেসময় রাজতন্ত্র ও জমিদার তন্ত্রকে মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় জানিয়েছে। এই বিষয়টি কবি কাহিনীধর্মী করে ঘটনার বিবৃতিমূলক ঢঙে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় —

''রাজার বাড়িতে রব উঠে গেল সাজ সাজ
ছোটে চৌদিকে লাঠিয়াল বরকন্দাজ।
হাতে নিয়ে পরোয়ানা
কড়া নাড়তেই
দরজায় যায় দেখা —
এসে দাঁড়িয়েছে ভাই-দাদা-বাবা-কাকা
কার হাতে হাতকড়া লাগাবে সে
কাকে সে করবে আটক
তখন সে এক নাটক।''   (নাটক / এই ভাই)

''এই ভাই'' কাব্যের 'সর্ষে' কবিতায় এক ধুরন্ধর চোট্টা ব্যক্তির কৌশল কবি আটপৌঢ়ে মুখের ভাষায় নিখুঁত অন্ত্যমিল যুক্ত ধ্বনিতে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। কৌশল দ্বারা সাধারণ মানুষের চোখে সর্ষে ফুল ধরে বেহুঁশ করে। সেই চোট্টা একদিন কবিকে ডাক দিয়ে বলে —''আরে রামো রামো /বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন মিছে ঘামো — / তার চেয়ে এসো / নিয়ে যাও এই নোটটা। /তারপর কিবা ধুমধড়াক্কা /চারমন তেল পুড়ল পাক্কা, /লারে লাপ্পায় কানে ভোঁ লাগিয়ে /জোরসে /চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলল সর্ষে /হুশ হতে দেখি ধুরন্ধর সে চোট্টা /মেরে নিয়ে গেছে / আগামীবারের ভোটটা।।''   (সর্ষে / এই ভাই)
কৌশল করে মানুষের মনে ধুমধড়াক্কা চমক দিয়ে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে সেই চোট্টা। কবিকে আড়াল করে সেই চোট্টা ব্যক্তি আগামী দিনের নাগরিক ভোট মেরে নিয়ে যায়। কবিকে সে মিথ্যা

প্রতিশ্রুতি দিয়ে কবির পথচলাকে থামিয়ে দিতে চায়। কবি বাস্তবদৃষ্টি ও নির্মোহ মন নিয়ে সমাজের একেবারে নিম্ন শ্রেণির এক চোট্টা ব্যক্তির পেশাগত ভাঁড়ামিতে এই কবিতার মূল বর্ণিতব্য বিষয় করে তুলেছিলেন।

আলোচ্য কাব্যের পরবর্তী কবিতা 'ছত্রী'। এই 'ছত্রী' শিরোনামের কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ একটি সাপের স্বভাব ধর্ম। কবি লক্ষ্য করেছেন সেই সমকালের সমাজে ছিল বাইরের একটি আবরণের ভেতরে মানুষের প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রবৃত্তির ছোবল। মুক্তিকামী লাল ফৌজ ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষ নকশাল আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে। তারা সারাদিন কুচকাওয়াজ চালিয়ে যায়, কিন্তু মানুষের প্রতিরোধ, মানুষের সম্মিলিত প্রস্তুতি সন্ত্রাসবাদী শক্তি ও রাজনৈতিক কায়েমী শক্তির কাছে অসহায় ব্যাঙের মতো ভক্ষিত হয়। কবি তুলনামূলক সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে সাধারণ অসহায় নাগরিকের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের ওপর আক্রমণ চমৎকার তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

আলোচ্য কাব্যের পরবর্তী কবিতা 'পুপের ন্যায়', 'সিনে মামা' ও 'পুপের মা-র গল্প' শিরোনামে ছড়ার আঙ্গিকে রচিত। প্রথম কবিতাটিতে তাঁর কন্যা পুপে মামার বাড়ি গেছে। সেখানে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তার মামি পায়েস রান্না করে। কবি নিজে শ্বশুর বাড়ির রান্না ঘরের এদিক ওদিক অনেক কিছু শুঁকছে এবং থাবা বাড়িয়ে চলছে কিন্তু পুপের মা গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে ধুঁকছে। এর পরের 'সিনেমামা' কবিতাটিতে পুপের মামার বাড়ির স্মৃতি। সেখানে ঝুপ ঝুপ করে একডুব, তিন ডুব চলছে পুপের মা তাদের একসময় কুমির ধরার গল্প আঁটে। পুপে লাফালাফি করে। ওর মা রান্নাঘরে কড়াইয়ে রান্না করে ইত্যাদি নানা টুকরো ছবি ছড়ার ঢঙে ও সহজ ভাষায় 'সিনেমামা' কবিতাটিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'পুপের মা-র গল্প' শিরোনামের কবিতাটির বিষয় পুপের মামা-বাড়ির নানা স্মৃতি। অন্য সব শিশুর মতো পুপে শৈশবে গল্প শুনতে ভালোবাসত। তাই কবি লিখেছেন — ''সন্ধ্যেটা তার ভরতেই হয় / গল্পেতে / পুপে কিছুতেই খুশি নয় /অল্পেতে। / পুপের মা কী করে — / কলকেতা শহরে ! /উঠে ভোরে / গল্প ধরে / কল পেতে। /গল্প গুলো জ্যান্ত / পুপে সেটা জানত।'' (পুপের মা-র গল্প / এই ভাই) কবির কন্যাশিশু শৈশবে একসময় কঠিন পীড়ায় পড়ে। সেই ছবিও এই কবিতায় স্মৃতি রোমন্থনের বিষয় হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কবিতা তিনটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের স্মৃতিরোমন্থন থেকে জন্ম নেয়। কবির পারিবারিক জীবন অন্বেষণের ক্ষেত্রে কবিতা তিনটির গুরুত্ব অনন্যসাধারণ।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'তানসেন গুলি' নামাঙ্কিত কবিতাটি। এই কবিতাটির সৃষ্টিমূলে বিশিষ্ট সমকালীন বাস্তব ঘটনা। এ সম্পর্কে কবি জীবনীকার বিশিষ্ট অধ্যাপক বিজয় সিংহ লিখেছেন — "১৯৬৬ সাল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন তখন মুখ্যমন্ত্রী। এক অভূতপূর্ব খাদ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। খোলাবাজারে চাল নেই, কেরোসিন নেই। কালোবাজারীদের দাপটে সাধারণ মানুষের পিঠ পড়েছে দেওয়ালে। শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ, গুলি, গ্রেফতার, পাল্টা বিক্ষোভে গোটা রাজ্য উত্তাল।

এই পরিস্থিতিতে ১০ই মার্চ ১৯৬৬-তে বামপন্থী দলগুলি সারা বাংলা ধর্মঘটের ডাক দেয়। বলা বাহুল্য সে ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক। অথচ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এই ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনাটিকে সামনে রেখে 'তানসেন গুলি'র রচনা। তীব্র শ্লেষে এ কবিতায় প্রফুল্ল সেন রূপান্তরিত হয়েছেন 'তানসেন'-এ। 'গুলি'র মধ্যে যেমন ধর্মঘটীদের প্রতিহত করার শাসক -অস্ত্রের ছবি আছে, তেমনি আছে গালগপ্পের ব্যর্থক ও তির্যক অভিব্যক্তি।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সম্পা: সন্দীপ দত্ত।) কবিতাটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে তানসেনের আড়ালে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উক্তিগুলি উদ্ধৃত। তাঁফর কথায় — "হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয় / এই এমনি করে —"। তিনি বলেন 'বুড়ো হাড়ে এখনও ভেলকি খেলে মশাই — / দেখলেন তো / কব্জির জোর।" ('তানসেন'/ 'এই ভাই')

রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন এই কবিতায় মাছের রূপকে অঙ্কিত। সাধারণ মানুষের ন্যায় কবিতায় মাছ বড়শির টোপ কে সত্য খাদ্য ভেবেই বিশ্বাস করে। মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা মানুষ মাছের মতোই বোকা। তিনি এই কবিতায় অতীব কৌশলে হরতাল-ধর্মঘট ভেঙে দেবার বাহাদুরি দেখান। কিন্তু কবি সুভাষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিথ্যাচারিতার প্রতিবাদ জানিয়েছেন আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক উপায়ে দলে অনেক সময়ই নেতা নির্বাচিত হয় না। এভাবে যোগ্যতার মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই পার্টিতে বজায় থাকে না। অবাঞ্ছিত, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিত্বের অনিয়মকে অনেক ক্ষেত্রে পার্টি প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এই বিষয়টির আলোচ্য কাব্যের 'রোমাঞ্চ সিরিজ' শিরোনামাঙ্কিত কবিতায় শিল্পিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবি লিখেছেন —

"আদরে মাথায় চড়ে গিয়েছে রামখোকা
এখন নামাতে গিয়ে মাথাটাই কাটা
যায়, দাদা! সময়ে বাছো নি কেন পোকা?" (রোমাঞ্চ-সিরিজ /এই ভাই)

ব্যক্তিত্বহীন এইসব কর্মীকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন পার্টি নেতৃত্ব। ঢাকের বাঁয়ার মতো তাদের সর্বদা কাজে ব্যবহার করেন তারা। এভাবে পার্টির ভিতরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেন তাঁরা। এবং পার্টির ভিতরে পয়দা হয় বাদশা আর বেগম সাহেব। এর পরই এই উত্তরণ অসহনীয় হয়ে ওঠে পার্টি নেতৃত্বের কাছে, আবার প্রশাসনের কাছেও। এরপর প্রশাসন তাদের পা-চাটা ও কাজ ফুরানো পাজী বলে 'গাছে তুলে মই' কেড়ে নেয়। এমন কি নেতৃত্ব তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এভাবে দলের 'রোমাঞ্চর-সিরিজ' কালক্রমে দলে ঘটতেই থাকে। রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাজাত, কবি জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণীয় হয়ে ওঠে এই কবিতাটিতে।

আলোচ্য কাব্যের পরবর্তী কবিতার শিরোনাম 'বাড়িয়ে বাড়িয়ে'। কবি এই কবিতায় যোগাযোগের রাস্তা ঘাটের এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পিচ-ঢালা রাস্তার খোয়া ওঠা বেহাল দশা তুলে ধরেছেন। ভাঙা খোয়া ওঠা জীর্ণ পিচের রাস্তা ক্রমশ কবির শিল্প দক্ষতার গুণে জীবন্ত মানুষের সত্তায় প্রাণ পেয়ে পথ রুখে দাঁড়ায়। তাদের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও অবহেলা সম্পর্কে কবি অভিযোগ করে — ''হাত বাড়ালেই / প্রাণঢালা ভালবাসা / আমরা চেয়ে চেয়ে / চেয়ে চেয়ে / ফুরিয়ে ফেলেছি / চাপা-পড়া কথাগুলো / উঠে উঠে / এখন পলে পলে / আমাদের বিঁধছে। / একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য / মনে মনে / তাকে সাহস দিচ্ছি।'' (বাড়িয়ে বাড়িয়ে / এই ভাই) এই কবিতায় মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের বঞ্চনা, অবহেলার তীব্র প্রতিবাদ রমনীয় ও উচ্চ আদর্শের নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

'এই ভাই' কাব্যের 'দেখ মাস্টের' শিরোনামের কবিতায় আপাত অর্থে দাবা খেলার হারজিতের প্রেক্ষিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কবিতার বাহ্যিক কাহিনির খোলসের ভিতরে নিহিত লেখকের পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্রের প্রতি তীব্র বিরোধ । তিনি যেন খেলার মাধ্যমে রাজাকে কেল্লায় বন্দী করবার ও মন্ত্রীকে কার্যত অকেজো করার অপূরণীয় স্বাদ উপলব্ধি করতে পারছেন এবং খেলার ওস্তাদকে হারিয়ে দিয়ে কিস্তি মাত করার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁর ভাষায় —

''দেখ মাস্টের,
গা-ঢাকা দেওয়া উঠকিস্তিতে
এই বার
শেষ চালে তোমাকে কেমন মাত করি।'' (দেখ মাস্টের / এই ভাই).

শেষ বয়সে কবি মাত করার স্বপ্নও মানসিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন 'দেখ মাস্টের' কবিতাটিতে।

আলোচ্য কাব্যের অনন্যসাধারণ কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায় 'শুধু আজ বলে নয়' শিরোনামের কবিতাটিতে। এই কবিতায় কবির জীবন প্রত্যয় শুধু আজ বা অন্য কোন একদিন নয়, কবি বলেন — ''রোজ / আমি তো হাসতেই চাই / আমারই গরজ। / ফুল কিনতে / পায়ে হেঁটে যে পয়সা বাঁচাই / রেখে আসতে হয় /পথ জুড়ে হাঘরে হাভাতে /অস্থি সার হাতে।'' (শুধু আজ বলে নয় /এই ভাই) বুভুক্ষু, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, আর্থিক সংকটে পীড়িত কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষকে জীবনের জয়গান শোনাতে চান কবি। এই প্রত্যাশায় নিহিত কবির গভীর দেশাত্মবোধ। তাই এই কবিতায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে কবি বলেছেন — অনন্তকাল ধরে পথ চলতে চান। তিনি পথ চালাতেও চান জলদি জলদি। জগদ্দল পাথরের পাহাড় মাথায় নিয়েও কবি চলার কথা বলেন। কবি মেহনতি ও কর্মজীবনের সব শ্রেণির কর্মীকে চলার আহ্বান করেন। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করেন —

''ও ভাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কে
হাপরের ওঠাপড়ায়
ফোঁস ফোঁস করছে আগুন
ও ভাই, দাঁড়িয়ে কেন
নেহাইতে রক্তের মতন লাল
গনগনে লোহা
আমি সাঁড়াশি নিয়ে বাগিয়ে ধরি
আর তুমি বিশ্বাসের তালে তালে
ঘা দাও. . . . . . .।'' (জলদি জলদি / এই ভাই)

কবি খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের পথ চলার প্রতি আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। তিনি ''জলদি জলদি'' কবিতায় সেই সব সাধারণের জীবনে উৎসবে মুখরিত হবার প্রত্যাশা দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্বনিত করেন। তিনি লেখেন — ''ডানায় ভর দিয়ে / আমার ক্ষিদেয় ভোঁচকানি লাগা / শব্দগুলো / গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসুক একবার / মাঠের নবান্নে. . .'' (জলদি জলদি / এই ভাই)

''এই ভাই'' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ভালোবাসার মুখ' কবিতাটিতে কবির সংশয়িত মনের দোলাচল, যাওয়া না-যাওয়া, মানা না মানার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। পিছন ফিরে কবি তাকিয়ে দেখেন যাদের সঙ্গে এক সময় মিছিলে পথ হেঁটেছিলেন তাদের অনেকেই ''যে যার জায়গায়। স্থির হয়ে আছে।'' কিন্তু সে সিদ্ধান্তে কবির মনের টানাপোড়েন ছিল; সেই একই অবস্থানের মনের মানুষ

জনদের মধ্যে কবির ভালোবাসার মুখগুলিকে বাতিল করা হয়েছে। এই একটি উত্তাল পরিস্থিতিতে কবি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর অন্তর্মনের মতো বাইরের পরিস্থিতিও উল্টোপাল্টা হাওয়ায় তছনছ হচ্ছে। কবি এমন পরিস্থিতিতে ডানপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শেও মিশেছিলেন। এই অস্থির সময়ের জীবন্ত ছবি ধরা পড়েছে তাঁর 'তোমাকে দরকার' শিরোণামের কবিতাটিতে।

''এই ভাই'' কাব্যের 'তোমাকে দরকার' কবিতাটিতে কবি রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে কখনো কখনো নির্ভর করেছেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায়ের উপরে, একথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্ত্রী ক্রমশঃ হয়ে ওঠে তাঁর কাব্য প্রেরণার মানস প্রতিমা। যাঁকে তিনি খুঁজছেন। কবিতার প্রথম চরণগুলিতে তাঁর গৃহবধু সামনে দাঁড়িয়ে টেবিলে এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে যাওয়া এলোমেলো সব কিছু গুছিয়ে দেয়। তাঁর জরুরি কাগজগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে সাজিয়ে রাখে; এক রঙিন সুতোয় ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে ফুলতোলা কাঁথা বানিয়ে দেয়। তাঁর গৃহবধূ ক্রমে উন্নীত হয় মানস প্রতিমায়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি লেখেন —

''তুমি আমার এই ছেঁড়া খোঁড়া
নিরুদ্দিষ্ট বল্গাহীন কথাগুলোর ড্যানা ধ'রে ধ'রে
যেখানে যার থাকার
সেখানে তাকে বসিয়ে দাও
বাইরেটা তছনছ হচ্ছে উল্টোপাল্টা হাওয়া
তুমি এখন কোথায় !'' (তোমাকে দরকার / এই ভাই)

বাহ্যিক জাতীয় অস্থির পরিস্থিতি ও কবির অন্তরের এলোমেলো টানাপোড়েনের রাজনৈতিক দোলাচল আলোচ্য কবিতায় শিল্পিত প্রয়াস পেয়েছে। 'এই ভাই' কাব্যের সর্বশেষ দুটি অনুবাদ কবিতা 'চীরবাসে বীর' এবং 'পাহাড়ে গা তোলে গোলাপ' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতা দুটিতে কবির শব্দ প্রয়োগের দক্ষতা এবং স্বকীয়তার নিদর্শন সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য ''ছেলে গেছে বনে'' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্যা চল্লিশটি। কবি এই কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন ''বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বাংলাভাষী ও ভারতের বহুভাষী বীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে''। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির সৃষ্টির মূলে নিহিত কবির রাজনৈতিক জীবন প্রত্যয়। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনৈতিক ভাঙন, বিভেদ, হানাহানি এবং প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী শক্তির কৌশলে সৃষ্ট সংকট। প্রগতিশীল আন্দোলন ও সাম্যবাদী চেতনায় ছিল কবির বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রত্যয়ে কবি মুক্তি যুদ্ধের ও ভাষা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এই কাব্য উৎসর্গ করেছেন। এই কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হল — 'সামনেওয়ালা ভাগো', 'অদ্ভুত সময়', 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি', 'ছেলে গেছে বনে', 'গাঁয়ে ফিরে', 'নিশির ডাক', 'নাটকের গান', 'দেওয়ালে লেখবার জন্য', 'সময়ের জালে', 'একুশে ফেব্রুয়ারী', 'আজকের গান', 'পুব হাওয়ার গান' ইত্যাদি।

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের প্রথম কবিতা 'সামনেওয়ালা ভাগো' । এই কবিতায় মানবতাবাদী, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের গ্রাম-প্রকৃতির সার্থক রূপকার হিসেবে এই কবিতায় কবি সুভাষকে পাওয়া যায়। কবি সাধারণের খাঁচা ছাড়া ভয়, ইষ্টনাম জপ করে বুকে বল আনার চেষ্টা ও ঘন্টা বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে গাড়ি চালানোর ছবি এঁকেছেন । সাধারণ দৈনন্দিনের ছবি আঁকতে কবি লিখেছেন —

''বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ি
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ফাঁড়ি
ইষ্টনাম জপতে জপতে
হাতে ধরল খিল
হাতের ঠোঙা হাতেই রইল
মিঠাই নিল চিল।'' (সামনেওয়ালা ভাগো / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'অদ্ভুত সময়' শিরোনামের কবিতাটিতে কবি সুভাষ বিশেষ কালের সম্পূর্ণ সময়ধর্মকে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। এই সময়টিকে কবি 'এক ভারী অদ্ভুত সময়' বলেছেন। কেননা, সে সময়ে যেসব কারণে সমগ্র সময়টা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল সেগুলি কবির ভাষায় ধ্বনি মাধুর্য লাভ করেছে। সেগুলি সম্পর্কে কবি লিখেছেন —১) ''পুরোনো ভিতগুলো যখন বালির মতো ভাঙছে / আমরা ভাই বন্ধুরা / ঠিক তখনই / ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।'' (অদ্ভুত সময়/ছেলে গেছে বনে) ২)''অন্ধকারে চেরা জিভগুলো যখন হিস হিস শব্দ করে / তখন মনে হয় / অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব মিহি করে কাটছে।'' (অদ্ভুত সময় / ছেলে গেছে বনে) ৩) ''বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে / চোরের দল / আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।।'' (অদ্ভুত সময় / ছেলে গেছে বনে) ৪) ''কোন্ হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে / আমরা জানি না। / কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।'' (অদ্ভুত সময় / ছেলে গেছে বনে) এই বৈশিষ্ট্যগুলিতে বাংলার অন্তঃসারশূন্য এক ভয়াবহ অবস্থার ছবি এখানে আমরা পাই। বামপন্থী দলে অন্তর্কলহ ও

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙন, এই সময় মানুষকে ভালোবেসে কাছে গেলে একটা নিরাপত্তাহীনতার ভয় আতঙ্কিত করে তোলে। মানুষ যেন সেই সময় অতিবড় হিংস্রপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মানসিকতার ও মূল্যবোধের ধারণাগুলি ক্রমশঃ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির আত্মকেন্দ্রিক ও কায়েমী স্বার্থের মানুষ বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে এক মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষকে পৃথক করে একাকী করে তুলছে। এই সংকট কবির শিল্পীসত্তাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল সেই সময়। কালের বিশেষ সংকট কবির সৃষ্টিশীল সচেতন মনকে তাড়িত করেছিল।

কবির শিল্পীসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার পরিচয় এই কবিতায় মেলে। সংকটপূর্ণ বিশেষ সামাজিক অবস্থায় দায়বদ্ধ চেতনা থেকে কবি আলোচ্য কাব্যের অন্তর্গত ''হাত বাড়িয়ে রেখেছি'' শিরোনামের কবিতাটি লেখেন। এই কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধ নীতিগত আদর্শে কবি বিপন্ন মুখগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কবি জীবনের বিশেষ গতিতে যেন এগোতে পারছিলেন না। একটি সংকটপূর্ণ বৃত্তের মধ্যেই যেন তিনি ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। নিজেকে ক্রমশঃ ভেঙে ভেঙে সকলের কাছে পৌঁছে যেতে চান কবি। বিপন্ন মানুষের প্রতি কবির উদার হৃদয়ের আহ্বান উপলব্ধি করা যায় এই কবিতায় —

''তুমি সেই অন্ধগলিতে দাঁড়িয়ে
বিপন্ন চোখের আগুনে চাইছ
. . . .
আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
খোলা রাস্তার কোন মুখে
আমি তোমারই জন্য দাঁড়িয়ে
হাত বাড়িয়ে রেখেছি —
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও
তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো।।'' (হাত বাড়িয়ে রেখেছি/ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের নাম কবিতা 'ছেলে গেছে বনে' মাননীয় সুগত মৈত্রকে স্মরণ করে রচিত। এই কবিতার অন্তর্ভুক্ত আরও একটি কবিতা রয়েছে সেটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত ও শিরোনামহীন। এই কবিতায় পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র, বাল্মীকি, অন্ধমুনি ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রসঙ্গ সহ উত্থাপিত করেছেন কবি। বাল্মীকি মুনির রামায়ণের রামচন্দ্রের বিশাল কাহিনি থেকে তিনি রামের বনবাসে যাওয়া এই কবিতায় অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কবি উক্ত ১ম সংখ্যক কবিতার শুরুতে বলেছেন — ''রাম তো গেলেন বনে /দশরথ বাপ /দুঃখ যা পেলেন মনে /ছ রাত্রেই সাফ /

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে / কী ক'রে গেলেন তার কঠিন এ সংসারে বাল্মীকি। (ছেলে গেছে বনে / ছেলে গেছে বনে) এখানে কবি অন্ধমুনির পুত্রের জল ভরবার শব্দে বাণ ছুঁড়ে ভুল ক্রমে খুন করাতে চাননি। এভাবে কবি নিয়তিকে আজ্ঞাবহ করতে চাননি। বৃদ্ধ বয়সে যখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় কবির, তখন তাঁর ছেলে তাঁকে সংসারের মায়ার বন্ধনে বেঁধে সে বনে চলে গেছে। কবি সবকিছু ভেঙে তিনি পথ চলতে চান। তাই কবিতাটির শেষে বাল্মীকি ঋষিকে হটিয়ে সেখানে রত্নাকরকে আহ্বান করেছেন কবি। এখানে ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করার প্রয়াস লক্ষণীয় জীবন দর্শন হয়ে ওঠে।

'ছেলে গেছে বনে' শীর্ষক কবিতার দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় কবির সমকালের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, বাস্তব ঘটনার আঘাতে আলোড়িত তাঁর অতীত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এই কবিতায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কবি আলোকপাত করেছেন জাগতিক ও সাংসারিক মায়ার বন্ধনকে । যেখানে আবদ্ধ করে তাঁর ছেলে নিবার্সিত আজ, সেই উত্তরসুরীর হাতেই কবি মুক্তির উপায় যেন দেখতে পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে এই কবিতায় অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে কবির সচেতন শিল্পীসত্তা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা স্মৃতি। এই কবিতায় কবি সুভাষের বার্ধক্যের মুক্তি কামনার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। এই কবিতাটির শুরুতে দেখা যায় নিত্যযাত্রীর ট্রাম যাত্রা থেকে, পথে আটকে পড়ার বিরক্তি জনক অভিজ্ঞতা। কবি লিখেছেন —

''কপালে মিন মিন করছে ঘাম।
সময় দাঁড়িয়ে আছে,
মাথার ওপর তার ছিঁড়ে
যেন বন্ধ ট্রাম।'' (ছেলে গেছে বনে (২) / ছেলে গেছে বনে)

এই কবিতায় ছবির মতো চিত্রকল্প এক এবং অভিন্ন হয়ে উঠেছে কবির পথ চলা ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবার জীবন প্রত্যয়। কবি লিখেছেন —''নাও যদি মেলে গাড়ি — /কাগজের নৌকো ঠেলে / জুতো হাতে হেঁটে যাব বাড়ি। / ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রাস্তা মাঠের শিশির।'' (ছেলে গেছে বনে (২) / ছেলে গেছে বনে) কবি সমকালের পুলিশী হেনস্থায় বিব্রত। তিনি অনর্থক পুলিশী তল্লাসীতে বিদ্রোহী মনে পুনরায় উত্তেজিত বোধ করেন। এই মেজাজকে নির্দেশ করে তিনি লেখেন —

''পাবে না জেনেও কাল রাত-দুপুরে বন্দুক উঁচিয়ে
দু'গাড়ি পুলিশ
সারা বাড়ি খুঁজে গেল তন্ন তন্ন ক'রে

পেরিয়ে চল্লিশ

যে আগুন প্রায় নিবন্ত,

ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে'' (ছেলে গেছে বনে (২)/ ছেলে গেছে বনে)

এই কবিতায় কবি তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতিচারণায় রাজনৈতিক আলোড়নকে আর একবার ফিরে পেয়েছেন। বাল্যের সেই বিস্ময় জড়ানো অনুভূতি ভেতরে সিঞ্চিত করে অকুতোভয় হয়ে ওঠেন। এই ভাবনায় তিনি লেখেন — ''বড়ো বড়ো ঢেউ তুলে যতই দেখাক ভয় / পাড়-ভাঙা নদী / ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়, / যে-রোমাঞ্চ অন্ধকারে যেতে হাতে-ঝোলানো লণ্ঠনে।'' (ছেলে গেছে বনে (২)/ছেলে গেছে বনে') এই প্রসঙ্গে কবির মনে পড়ে রাজনৈতিক জীবনের নানা কথা। সেই অতীত রাজনীতির অভ্যাসবশতঃ কবি আজও মিছিলে গেলে রাস্তায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান, সভার ধ্বনি কানে এলে এখনো সভার বক্তব্যগুলি একমনে শোনেন —

''এখনো মিছিল গেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই রাস্তায়

যে কোনো সভায় গিয়ে শুনি

কে কী বলে।

কেউ কিছু ভালো করলে দিই তাতে সায়।

সংসারে ডুবেছি, তাই জ্বালাই না ধুনি।'' (ছেলে গেছে বনে (২)/ছেলে গেছে বনে)

কবি এই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বাইরের রাজনীতিকে ভেতরে স্থান দিতে থাকেন ; নিজের বিশ্বাসের জায়গাকে বিস্তৃত করে তিনি সর্বদলের মিছিল দেখেন, সর্বদলের সভার বক্তৃতা শোনেন। একটা দলীয় বৃত্তের বাইরে এসে যে কোনো রাজনৈতিক দল ভালো কিছু করলে নির্দ্বিধায় তার তারিফ করেন। যে কোনো দলের ভালো কাজে সায় দিতে থাকেন। নিজেকে একদিকে বিস্তৃত করতে করতে কবি নিজের দলের কাছে ক্রমশঃ ছোট হয়ে যেতে থাকেন। এরপর আর রাজনীতির সংকীর্ণ গন্ডী তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে না। এভাবে পার্টির কাছে কবি হয়ে ওঠেন বিপক্ষ শিবিরের মানুষ। অথচ কবি নীরবে একাকী মনের গভীরে প্রত্যয় রাখেন যে, যার কাছে আজ তিনি ব্রাত্য হয়ে আছেন, তারই হাতে কবি যেন দেখতে পান মুক্তির আভাস। তাই এই গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি লেখেন — '' অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্ত পাখা

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

আমারই পতাকা।'' (ছেলে গেছে বনে (২) / ছেলে গেছে বনে)

বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা, রাজনৈতিক জীবনের নানা প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তি জীবন এই কবিতায় শিল্পীসত্তার অনিবার্য ও যথার্থ উপাদান হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি সুভাষকে যারা হেঁয় করেছেন, ছোট করে দেখেছেন, তাদের উন্নাসিকতার ঢঙে জবাব দিয়েছেন কবি 'সফরী' শিরোনামাঙ্কিত কবিতায়। কবিকে যারা এতদিন দেখে এসেছেন, যারা সারা জীবন কবির সঙ্গে থেকে মিছিলে গলা মিলিয়েছেন, সহসা বিক্ষিপ্ত ও বাহ্যিক ঘটনায় কবিকে ছোট করে দেখছেন এখন। এই ভঙ্গুর বিশ্বাসে কবি ক্ষুন্ন হয়েছেন। এই ঘটনায় আঘাত পেয়ে 'সফরী' কবিতায় কবি জবাব দিয়েছেন — ''দেখ্ বেটা ! /ওপর-ওপর চোখ / বুলিয়ে বাইরেটা /কী রয়েছে মূলে — / না ভেঙে, না খুলে / যা আছে যেমন /রাখা-ঢাকা / বিষয়ে না ডুবিয়ে নিজেকে / একরকম ক'রে দেখা / যেতে যেতে / রাস্তা থেকে কিছুর ভেতর কিছু / নয় যেন / এমনি ক'রে জানো ।'' (সফরী / ছেলে গেছে বনে)

এভাবে ভুল বোঝাকে অগ্রাহ্য করেছেন কবি। তিনি বলেছেন, এতে তাঁর কিছু আসে-যায় না। ওপর -ওপর চোখ বোলানো, ভাসা-ভাসা চেনা কবির আপশোসের কারণ। যারা তাঁকে ভুল বুঝে চলেছেন তাদের কাছে গিয়ে নিজেকে নতুন করে জাহির করতে চান নি তিনি। উপরন্তু সেই বিষয়কে উপাদান করে শিল্পিত রূপ দান করেছেন 'খেলা হবে' কবিতায়। তিনি বাস্তবের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — ''আলকাতরানো দেয়ালগুলো / এখন চুনকালিতে ছয়লাপ।'' চুনকালির ভেতরের অস্তিত্ব কেউ কেউ স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সত্যকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন কবি । তিনি বলেন যারা নিজেরাই সংকীর্ণ, তারা নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে কখনো দেখতে পান না। এর জন্য সত্য কখনো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে না। কবি সেই সত্যের উন্মোচন করতে লেখেন —

''ঝাপসা চোখে চশমা লাগান
দেখতে পাবেন হাড় হদ্দ।
একবার ফিনকে দিলেই
সব লালে লাল।'' (খেলা হবে / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'লাগসই'। এই কবিতার বিষয় অভিনব। কবিতাটির কেন্দ্রীয় বিষয় দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া দাক্ষিণ্যের প্রকৃতি কবিতাটির প্রথম অনুচ্ছেদে বলেছেন —

''যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন। ঈশ্বর
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করত তাঁকেই পাকড়াও

এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত

যে যেমন জানাত প্রার্থনা।'' (লাগসই / ছেলে গেছে বনে)

এই দানের প্রতিদানে মানুষ কতটা নির্মম ও অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে তার শিল্পসম্মত রূপ দেখিয়েছেন কবি। মানুষের এধরনের অমানবিক আচরণে ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র যে নিদারুণ ব্যথিত হতেন, সেকথা বলেছেন কবি — ''পেলে পরে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না

প্রতিদানে ঢিল

ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে

মুখটা ব্যথায় নীল

অতএব লেগেছিল ঠিক

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বরের বাস্তবিক।'' (লাগসই/ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের 'রসুই' শিরোনামের কবিতাটিতে একজন বাবুর্চির মনের অপ্রাপ্তি ও অপূর্ণতার উপলব্ধি তুলে ধরেছেন। একজন সাধারণ বাবুর্চির ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এই কবিতার বিষয় নির্বাচন করেছেন কবি। একজন বাবুর্চির বিবি তার খাবার তৈরী করে দেয়। অথচ পেশাগত প্রয়োজনে বাবুমশায়ের রুচিমত রান্না তাকেই করতে হয়। কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। বাবুর্চির উক্তিতে রচিত এই কবিতাটি —''চৌপহর দিন চৌকার আঁচে / খোদা জানেন / যা পুড়ছি / করছি তৈয়ার / ফরমাচ্ছেন যা / হুজুর, আমার মনোবাঞ্ছা / পূরণ হয়না/নজের রান্নায়।'' (রসুই / ছেলে গেছে বনে)।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ধাঁধার ঢঙে রচিত একটি কবিতা 'ধরা বাঁধা'। এই কবিতায় কবি তাঁর কন্যা পুপের জন্য খেলার ছলে ও মন ভুলানোর জন্য চাঁদকে ধরে আনার কথা বলেন। সে সঙ্গে একটি বাস্তব পদার্থ আয়নার ওপর তাঁর নিজের কল্পনা আরোপ করে তার ওপর জীবন্ত সত্ত্বা জাগিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ দক্ষতার গুণে আয়নার কথা কবি নিজের মুখে প্রকাশ করেছেন এই কবিতায় — ''আয়না আয়না আয়না / সবাই দেখে নিজেকে, কেউ তোমাকে দেখতে চায়না। / গলি গলি গলি / এই বললে বসে থাকব, এই বলছ চলি। /রোয়াক রোয়াক রোয়াক / তোমায় দেখে গ্যাসের আলোর রাত্তিরটা পোহাক।/ রাস্তা রাস্তা রাস্তা শুয়ে শুয়ে দেখছ বুঝি হাঁ -করা আকাশটা'' (ধরা বাঁধা / ছেলে গেছে বনে)

এই কাব্যের অন্যতম আর একটি কবিতা 'গাঁয়ে ফিরে'। এই কবিতার বাহ্যিক শরীর দেখে মনে হয় যেন জীবনের পড়ন্ত বয়সে কবি সুভাষের রাজনৈতিক সচেতনতা হারিয়ে একজন নির্ভেজাল সামাজিক দায়বদ্ধহীন কবিতা। 'গাঁয়ে ফিরে' শিরোনামে কবিতা মূলতঃ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত তিনটি

কবিতার সংকলন।'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের যে কোনো কবিতা রচনা মূলে রয়েছে কবির রাজনৈতিক চেতনা। সে সম্পর্কে জমিল শরাফী লিখেছেন — ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন কবির মনে নতুন আশার বাতি জ্বেলেছে, তখন এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা সাথীদের ফিরে পাবার জন্যে গভীর অপেক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলি। উপরোক্ত পর্বগুলি সামগ্রিক এবং ঐকিক পটভূমিতে রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতাকে ধারাবাহিকভাবে অথবা যখন-যেটা ইচ্ছা নিয়ে মনের মধ্যে রাখলে একটা কথা নিশ্চয় কাঁটার মতো বিঁধবে। সেটা হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার রাজনৈতিকতা।

এটাকে চাপা দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার স্বাদ পাবার যে কোনো রকম বিমূর্ত চেষ্টা নখ তুলে দিয়ে সুন্দর হাতকে নরম করার চেষ্টা মাত্র। . . . . . . মুক্তি সংগ্রাম ও সাম্যবাদের রাজনীতি করলে যে কবিতার সারসত্তার গভীরতা বাড়ে এবং কবিতার জাত না গিয়ে তার মান বাড়ে, এই ধারাটির একজন প্রধান প্রতিভূ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতায়।'' (কবিতা সংগ্রহ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২, গ্রন্থপরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ২৭৫)।

'গাঁয়ে ফিরে' শিরোনামের প্রথম সংখ্যক কবিতায় আন্দোলন, মিছিল, শ্লোগান থেকে অবসর নিয়ে যেন কবি দীর্ঘ রাস্তা ঠেঙিয়ে এখন বাড়ির দোরগোড়ায়। কবির এই ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা নীরবে চোখের জল ফেলে; আর পড়শিরা দেয়ালে উঁকি দেয়, কান পাতে এবং সচকিত হাসিমুখে ফিসফাস করে। যদিও ''সমতলে ঢলে পড়েছে অস্তগামী সূর্য'', এর মতো কবির আয়ু ; তথাপি ''পশ্চিমের তুঙ্গী মেঘ ক্রমেই লালে লাল হচ্ছে।'' কবির উপলব্ধিতে এখানেই কবির দায়বদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতা নজরে পড়ে।

এছাড়া এই কবিতার ''এখন সারা পৃথিবী লড়ছে'' কিংবা ''রাত নিশুতি হলে মোমবাতির আলোয় আমরা বসি'' পংক্তিতে কবির রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট দায়বদ্ধ ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের চিহ্ন রয়েছে।''গাঁয়ে ফিরে'' শিরোনামের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় সমকালে কবির বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরার পালা। তাই কবি লেখেন —

''এখন আমার পড়ন্ত বয়স, জীবনের বেশির ভাগই গেছে যুদ্ধে,
আজও ঘরে ফেরাটা আমার কাছে খুব সুখের নয়।

. . . .

লোকে যখন ঠান্ডা খোঁজে, গাছের ছায়ার ধার দিয়ে হাঁটে,
পুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে।
আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রীতিমতো শীত,

সাঁই সাঁই করছে উত্তুরে হাওয়া,

আমার এখন উদ্বেগের অন্ত নেই।'' (গাঁয়ে ফিরে / ছেলে গেছে বনে)

''গাঁয়ে ফিরে' শিরোনামের তৃতীয় সংখ্যক কবিতাটিতে গ্রাম্য-মানুষের অকৃত্রিম আন্তরিক সঙ্গীদের পথ চলার উপহার হিসেবে সেই সব সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁদের কথা মনে রেখে কবি লিখেছেন —

''চার -পাঁচজন বুড়োর একটা দল এল

দীর্ঘ পথযাত্রার জন্যে অভিনন্দন জানাতে —

তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে উপহার।

আমার জন্যে ওদের আনা মিষ্টি মদ

ঢক ঢক করে খেলাম।'' (গাঁয়ে ফিরে / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের ভিন্ন স্বাদের কবিতা 'দূরভাষ'। এই কবিতাটি শিল্প সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি, আনন্দ সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি অথবা কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি। স্বাভাবিক গতিতে তাঁর কবিতায় উদ্দেশ্যমূলকতা অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই কবিতায় কবি প্রকৃতির বুকে নিজেকে একাত্ম করে উপলব্ধি করেছেন। নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে যেন অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারেন। সাবলীলভাবে তাঁর মানসলোকে অজ্ঞাতবাসে ফাল্গুন প্রতীক্ষা করে আছে বসন্তের গলায় মালা দুলিয়ে দেবার জন্য।

অসাধারণ কল্পনাময় রোম্যান্টিক চেতনার ভাব-বিহ্বলতায় কবি অনায়াসে বলেন — ''আকাশ দু'হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ, /চোখে বিদ্যুতের জ্বালা /থেকে থেকে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে / জোনাকির শরীরে আগুন। / আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র, / জেনে রেখো, কাল নিরবধি, / চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের, / পায়ের পাতায় লেগে লেগে মাটি ভাঙে, /কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায় নদী / আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই / কলকল্লোলিত সে আবেগে। / তোমাকে যে কথা, আমি বলতে গিয়ে / হার মেনে ফিরে ফিরে আসে। / কানে গুণ গুণ ক'রে বলা যেত / যদি আমি হতাম ভ্রমর।'' (দূরভাষ / ছেলে গেছে বনে) প্রকৃতি, কাল, সমুদ্র, নদী, ভ্রমরের ভালবাসার সঙ্গে কবির প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালবাসা অভেদ হয়ে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কবিতাটির ভাষা-ভাব-ছন্দ-বিষয়ের দিক থেকে উৎকর্ষময় শিল্প সৃজনের নিদর্শন রাখেন কবি।

আলোচ্য কাব্যের 'খাঁচা-ছাড়া' শিরোনামের কবিতাটিতে প্রকাশক কবি-বন্ধুদের লেখকের ওপর লেখা চেয়ে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির বিষয়কে নির্বাচন করেছেন। একেবারে ছোট্ট অঙ্গিকে অন্ত্যমিল যুক্ত

সহজ ভাষায় কবিতাটি লেখেন কবি সুভাষ। একটি ছোট্ট ফ্রেমে লেখকদের অসহায়তা কবি তুলে ধরেছেন। প্রকাশক বন্ধুদের সম্পর্কে কবি লেখেন —

''লেখকের দল।
একদিকে জল
একদিকে দানা।
বসিয়ে খাঁচায়,
ওরা লেখা চায়।'' (খাঁচা-ছাড়া / ছেলে গেছে বনে)

কিন্তু ভেতরে বন্দী থেকে সৃষ্টি করা কবি সুভাষের পক্ষে অসম্ভব। খাঁচায় বসে কবির পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। তাই কবি বলেন ''খাঁচা ভেঙে তাই/ মেলছি ডানা।'' বন্দী নয় চলমানতাই কবিকে আকৃষ্ট করে। তাই কবিতাটির শেষ চরণে প্রতিবাদী হয়েই যেন আকাশে উড়ে চলার জন্য কবি খাঁচা ভেঙে বাইরে এসে ডানা মেলে উড়ে চলেছেন।

এরপরের ''নিশির ডাক নাটকের গান'' শিরোনামের কবিতায় কবিতা লেখার উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন কবি। যেসব সঙ্গীদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের লড়াই একসঙ্গে চালিয়ে ছিলেন, তাদের কপালে চন্দনের তিলক দিয়েছেন কবি। তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলেন কবি। যেদিকে তাঁর দুচোখ যায় চারদিকের আলো-আঁধারে কবি কাব্য-রচনার উপাদান অন্বেষণ করেন। কবি সারা জীবনই সন্ধান করে চলেছেন । কিন্তু তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, লেখার উপাদান সংগ্রহের সময়— ''চোখ বুজেই খুঁজে পেতাম / বুকের মধ্যে খনি।''

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের 'ম্যাও' শিরোনামের কবিতায় কবি হুলো বেড়ালকে চিনিয়ে দেবার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। আমরা যাকে বাঘের মাসি বলি, সেই হুলোবেড়াল স্বভাবে নরম মাটি পেলেই তার নখ শানিয়ে নেয়। যে গৃহস্বামী তাকে অগ্রাহ্য করবেন তার রক্ষা নেই। কখনো দেহ ক্লান্ত থাকলে, দুয়োরে খিল দিয়ে ঘুমোতে গেলেও পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে সেই হুলো। এই হুলোকে চিনিয়ে দেবার জন্য কবি লেখেন —

''কাগুজে বাঘের পায়ের ধুলোয়
আমারই এখন দিন হে।
মিনির দলে আমিই হুলো
চিনে নাও দাগ চিহ্ন।'' (ম্যাও / ছেলে গেছে বনে)

এই কাব্যের 'দেখে শুনে' শিরোনামের কবিতায় নিহিত প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ। দেশমাতৃকার মাটির প্রতি কবি সুভাষের ঐকান্তিক নাড়ির টান। তাই কবি অনায়াসে বলতে পারেন — ''এই মাটিতে বুনেছি সব আশা।'' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন মহাদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কবির এই সিদ্ধান্ত। কবির নানা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে এই কবিতায়। বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ ঘুরে আত্মবিশ্লেষণ করে কবি তাঁর দেশের মাটির সঙ্গে নিজের জীবনের সম্পর্ক নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছেন। এই কবিতায় বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ ভ্রমণের বর্ণনায় কবি লিখেছেন —

''লেনিনগ্রাদ থেকে চলেছি স্কোফ
চার মহাদেশ চাপিয়ে দুই বাসে
জানলা দিয়ে দেখায় বায়োস্কাপ
রোমাঞ্চকর দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে
পিছিয়ে যায় পায়ে লাগিয়ে চাকা

....

চোখের কাছে হার মেনেছে ভাষা।
চার মহাদেশ সারাটা পথ যেন,
দু'হাত দিয়ে ছড়ায় ভালবাসা।''   (দেখে শুনে / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'দেয়ালে লেখবার জন্যে'। হয়তো দেয়াল লিখন বিষয়টি এই কবিতা সৃষ্টির সঙ্গে কোন না কোন দিক থেকে একটা সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই হিসেবে এই কবিতাটির চরণগুলির বিন্যাস-সজ্জা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এই কবিতাটির শিল্পীসত্ত্বার মধ্যে নিহিত সমাজতান্ত্রিক শ্রেণি চেতনা। বিশ্বে সমাজতন্ত্র কায়েমের পদ্ধতি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান। কবির চেতনালোকে শ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা নিচু শ্রেণির মানুষদের উঁচু করে শ্রেণিবৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর শিল্পীসত্ত্বার নির্দেশে এই পৃথিবীতে কোন শ্রেণি থাকবে না। সবার পরিচয় একটাই — 'মানুষ'। এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে থাকবে না বিভেদ ও হিংসা। মানুষের মধ্যে থাকবে না সংঘাত। এর জন্য চাই ঐক্য। জোট বেঁধে লড়াই করলে কবির বিশ্বাস সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই বিশ্বাসেই কবি লেখেন — ''শ্রেণি থাকবে না, মানুষ থাকবে / জীবনের জন্যে মৃত্যু, মৃত্যুর জন্যে জীবন নয় / আরম্ভে দেশ। দুনিয়ায় শেষ / যে ভাগে, সে ভাঙে / যে লড়ে সে গড়ে / উঁচুকে নিচু নয়, নিচুকে উঁচু করো /পরেরটা খোঁচায়, নিজেরটা গোছায় / এক হলে পারি। একা হলে হারি। /

বাঁধলে জোট, বাড়বে জোর।। / টুটলে বাঁধন, বাড়লে মান। / তবেই হবে সবাই সমান।।'' (দেয়ালে লেখবার জন্য / ছেলে গেছে বনে) তাই কবি মনে করেন সারা দুনিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হবে ভারতবর্ষেই। এখানকার পরিবর্তন সারা দুনিয়াকে পথ দেখাবে। কবি বিশ্বাস করেন সারা দুনিয়ার সব মানুষকে সমান করার প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কবিতার মধ্যে কবির শিল্পী সত্ত্বার বিশিষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে কবির সৃষ্ট প্রতিভা নির্ণয়ের লক্ষ্যে এই কবিতাটি অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই কাব্যের একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ট্রেন যাত্রার সাধারণ বর্ণনা নিয়ে লিখিত কবিতা ''কে বা কারা''। এই কবিতাটির বিষয়ে নেই বিশেষ তাৎপর্যবাহী কোন বার্তা। বা বিশেষ রচনা কৌশল। সাধারণ ট্রেন যাত্রার বর্ণনা অত্যন্ত সহজভাবে লিখেছেন কবি। নিত্য ট্রেন যাত্রার ধকল কাটিয়ে অফিস যাওয়ার বর্ণনা এতে পাই আমরা। ট্রেন যাত্রার চূড়ান্ত অব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে কবি লেখেন—

''কে বা কারা নিয়েছিল মাথার ওপর তার কেটে,
কাজেই ছ-ঘন্টা লেটে,
যখন ডানকুনি ছেড়ে ধূ-ধূ করা
মাঠে ঠা-ঠা রোদে থেমে গেল,
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত রাতজাগা দূরাগত ট্রেন
সামনে দেখি নৃশংস আমোদে
পথ আটকে হ্যা হ্যা করে হাসছে
ধৃষ্ট সিগন্যালের আলো।'' (কে বা কারা / ছেলে গেছে বনে)

এই ট্রেন যাত্রায় কবি দেখেন বাইরের দিকে তরজা চলছে। তারই মাঝে থেকে কামরায় কামরায় ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা বাচ্চাদের কাতরানি। ট্রেনে গরমের দিনে দেখেন অসুস্থ ও অশক্ত বুড়োবুড়ির আনচান। আবার কামরার চারদিকে দেয়ালে ছাদে মোচড়ানো দোমড়ানো ভাঙা চাঁছা জলের বেসিন, ট্যাপ, আয়না, ডুম সুইচ, হাতল ইত্যাদি। মাথার ওপর ফ্যানগুলো যেন কেউ হাতিয়ে নিয়েছে, ট্রেনের ভেতরে হাতের নাগালে কেবল শিকল। কবি লক্ষ্য করেন কর্তব্যরত পুলিশদের। আবার কেউ বা কারা নিজেদের প্রয়োজনে ট্রেন থামিয়ে ঝুপঝাপ মালপত্র নামিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ট্রেন যাত্রার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় এই কবিতায়।

এই কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি করিতা 'নিয়ে যাব শহর দেখাতে' কবিতায় আমরা দেখি অগ্নিগর্ভ কালের গহ্বরে স্পন্দমান দেশকে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মুক্তি যুদ্ধের যোদ্ধার শিরায় শিরায় রক্তনদী

নেচে ওঠার বিষয় মনে করিয়ে দেন কবি। দেশজয়ের বিষম সংগ্রামে দেশের মানুষ জোটবদ্ধ হয়। সামরিক প্রশিক্ষণের কথা জানাতে কবি ''ক্যাম্পে ট্রেনিং'' শব্দটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন। আলোচ্য কবিতাটিতে আমরা দেখি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সমষ্টি। দ্বিতীয় কবিতাটিতে ভোগবাদি মানুষের প্রতি কবি ঘৃণা ও ক্ষোভ বর্ষণ করেছেন। তাদের তিনি ''ভ্রাতৃরক্তে হাত-রাঙানো খুনী'' আখ্যায়িত করেছেন। কাস্তে হাতুড়ির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কায়েমী শক্তি প্রয়োগ করেছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু কবির দৃঢ় প্রত্যয় মানুষের ঐক্য ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে দেশজয় অনিবার্য। তাই কবি লেখেন —''জীবনকে সমানে সাধে আদরে-আহ্লাদে / ঘৃণা দিয়ে মৃত্যুকে ফেরায়, / কাঁধে দিয়ে কাঁধ, হাতে হাত বেঁধে / শতদলে ফোটায় একফুল / পার হয়ে জলস্থল ডাঙা-ভাঁটি / চড়াই-উৎরাই / শুইয়ে দিয়ে গাঁ-শহরে বসানো পুতুল / জয় করে দুঃখ ক্লেশ / সে করবে দেশজয়।'' (নিয়ে যাব শহর দেখাতে / ছেলে গেছে বনে)

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের আর একটি কবিতা 'সময়ের জালে'। নদীর মতো প্রবাহমান সময়। সময় রবীন্দ্রনাথের কথায় যা মহাকাল — এগিয়ে চলে নিরবধি। জীবনে চলার পথে একেকটি ঘটনা ছবি হয়ে আঁকা থাকে। সেই ছবিই আবার বিশেষ সময়ে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে। এই সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি মেহনতি শ্রমিক জীবনের সঙ্গে সকাল নটার সময় ভোঁ বেজে ওঠার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সময় কবিকে বার্ধক্যে পৌছে দিয়েছে। এখনও যৌবনের স্মৃতিতে কবি পুলকিত হয়ে ওঠেন। কবি লেখেন — ''ঢেউ -খেলানো টিনের গায়

চিড়বিড়িয়ে শিল পড়লে

এখনও

কী যে মজা হয় ।'' (সময়ের জালে / ছেলে গেছে বনে) কবি তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের দ্বারা সময়ের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রাস্তার গর্তের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় — ''রাস্তার গর্তগুলো / ছোট থেকে বড় করতে করতে /এগিয়ে চলেছে সময়।'' (সময়ের জালে / ছেলে গেছে বনে) 'সময়ের জালে' শিরোনামের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় পারিবারিক ছোট ছোট তুচ্ছ কথা কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। কবিতাটির শুরুতেই আমরা দেখি —

'বাড়িতে পায়েস হলে

জানতে পারি

আমারও একটা জন্মদিন আছে।

মাঝরোত্রে ট্যাঁ ট্যা আওয়াজ শুনে

ধরতে পারি

পৃথিবীতে নতুন মানুষ এল। (সময়ের জালে / ছেলে গেছে বনে)

এসব ছাড়াও পথ চলতে চলতে এক-বাস লোকের মধ্যে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় ভুলে যাওয়া কথা। তাঁকে আমরা দেখি একটা বাসে রড -ধরা হাত থেকে ঘড়ি হারিয়ে ফেলতে এবং বাসটির পাদানি থেকে সেটি উদ্ধার করতেও। তাঁর বিভিন্ন সময়ের পথ চলার নানা টুকরো ছবি সহজ ভাব-ভাষা -ভঙ্গিতে শিল্পরূপ দেবার প্রয়াস এই কবিতায় আমরা পাই।

আলোচ্য কাব্যের 'ফেরাই' কবিতাটি কবি সুভাষ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছেন। এই কবিতাটির চরণ বিন্যাস দেখে চারটি কবিতার সংকলন বলে আমরা মনে করি। সেখানে কবিতা চারটির জন্য দেখি নামকরণ আলাদা আলাদা। 'ফেরাই', নামকরণের ভেতরে 'সবাই সমান', 'বলির বাজনা', 'মধ্যিখানে চর', এবং 'বন্ধুরা কোথায়' — এই চারটি নামে আলাদা কবিতা বলে আমরা মনে করি। চারটে কবিতার মধ্যে প্রথমটিতে 'ফেরাই' শিরোনামের নিচেই একই কবিতার ভিন্ন শীর্ষনাম দেখি 'সবাই সমান'। এই কবিতা চারটির মধ্যে আমরা পাই কবির রাজনৈতিক জীবন চেতনা। কবি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে এক সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন। সেখানে তাঁদের দৃঢ়কণ্ঠের ধ্বনিতে আমরা শুনি "সব লাল হো যায়গা"। এজন্য সেই কমরেডরা কাঁধ ধরাধরি ক'রে নিশান হাতে ঘর ছেড়েছিল। দীর্ঘ লড়াই করে আজ তারা ছুরিবিদ্ধ ও গুলিবিদ্ধ হয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। কবি তাদের অপাপবিদ্ধের দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই সাধারণ পার্টি কর্মীরা আজ লাইন বন্দী হয়ে পুড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ; তাদের সম্পর্কে কবি লেখেন —

"নিশির ডাকে নিশান হাতে
যারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল
তারা এখন
সাড়ে তিন হাত জমির দখল ছেড়ে
আগুনের মুখে ছাই হওয়ার অপেক্ষায়।" (ফেরাই / ছেলে গেছে বনে)

এই মৃত্যুতে আমরা দেখি কবি সন্ত্রস্ত — "ঘুমের মধ্যে আমি চমকে চমকে উঠছি / কালো গাড়ি গুলো থেকে / ঘষে ঘষে তোলা হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত।" (বলির বাজনা / ছেলে গেছে বনে) এজন্য কবিকে আমরা দেখি সর্বদা আশঙ্কিত থাকতে — "রাত্রে রেডিওতে যখন খবর বলে / কানে আঙুল দিয়ে থাকি / সকালে কাগজ এলে / ছুঁতেও ভয় করে।" (বলির বাজনা / ছেলে গেছে বনে)

কেননা, কবি প্রত্যক্ষ করেন কফিন বন্দী চেনা মুখের লাইন। এছাড়া এই কবিতায় যুক্ত হয়েছে 'ছেলে ধরার' প্রসঙ্গ। কবি তাদের সম্পর্কে বলেন —

''ছেলে ধরার দল
নাকের কাছে ফুল শুকিয়ে
ফুসলে নিয়ে চলে গেছে
তাদের বলি দেবে বলে।'' (বলির বাজনা / ছেলে গেছে বনে)

এরপর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে বলির বাজনা, জয় জয়কার এবং রক্ত মাখা খাঁড়া, কতগুলো মৃত্যু এবং বলির এই পৈশাচিক আয়োজন কবিমনে এক কম্পন সৃষ্টি করে। এরপরের কবিতা অংশটি 'মধ্যিখানে চর'। এই কবিতাটিতে রয়েছে ধর্মান্ধতার জন্য দেশ বরবাদ করছেন এক শ্রেণির মানুষ। প্রবাহমান নদীর একথেকে দুই, দুই থেকে তিন করে দু'কুল যেন ভাঙছে তো ভাঙছে। নদীর পাড় ভাঙা এবং তার মাঝখানে চর গড়ে ওঠাকে কবি দেশের অবস্থার সঙ্গেঁ প্রতীকায়িত করেছেন। ধর্মের আড়ালে কবি ধর্মীয় নেতাদের সওদাগর হিসেবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। একদিকে কবর দেবার প্রস্তুতি একই কবিতায় অন্যদিকে নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলানো — রীতি মতো সম্প্রীতি বিনষ্টের উৎস হয়ে ওঠে।

'ফেরাই' কবিতার শেষ অংশ 'বন্ধুরা কোথায়' শীর্ষনামে রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে সন্ত্রাস, হিংসা, শত্রুতা, হানাহানি প্রত্যক্ষ করেন কবি। উন্মত্ত সেই বন্ধুদের সম্পর্কে কবিকে বলতে শোনা যায় —

''শহিদের স্মৃতি রাখতে শহিদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না।
যারা মৃত্যুর সওদাগর
পাখি-পড়ার মতো ক'রে তারা বোঝাচ্ছে
হয় মারো নয় মরো
এগোবার পথ তারাই প্রশস্ত করেছিল
এখন ফেরবার পথে
তারাই কাঁটা দিচ্ছে।'' (বন্ধুরা কোথায় / ছেলে গেছে বনে)

কবির এই উক্তি থেকে আমরা বলতে পারি এক শ্রেণির পার্টি কর্মী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছে যারা দেশের জন্য, পার্টির জন্য ও শহিদের মতাদর্শ ও পথ অবলম্বন করে মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

তাঁদের ত্যাগ একটা আদর্শের জন্য এবং তাঁদের লড়াই একটা ত্যাগের প্রদর্শিত পথে। কিন্তু একশ্রেণির দেশবাসী জনসাধারণের শত্রুদের সঙ্গে আতাঁত করে জনসাধারণ ও মেহনতি মানুষকেই শত্রু করে নিয়েছে। তাঁদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মানুষের দরদি বন্ধুদের আহ্বান করেছেন কবি। আমরা দেখি পৃথিবীকে ঢেলে সাজিয়ে গণতান্ত্রিক মত ও পথে সাধারণ মানুষকে চলার আহ্বান করেন কবি — ''যৌবনের ফেরাই দিয়ে,

হারিয়ে-যাওয়া নতুন বন্ধুরা আমার,
সমানে জিতে নাও সৃষ্টির পিঠ
যাবার আগে যেন দেখে যাই
মেঘভাঙা রামধনু
ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে
যেন শুনতে পাই
ভোরবেলার আজান।''   (বন্ধুরা / ছেলে গেছে বনে)

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতায় আমরা পাই একটি বাক্সের চাবি খোঁজার ছবি। আলোচ্য বাক্সটিতে তাঁর 'রাজ্যের জিনিস তালাবন্ধ'। কিন্তু তার চাবিটা তিনি একদিন খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোথাও। তিনি একদিন সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলেন। হঠাৎ তাঁর ছোট্ট মেয়েটা তাঁর মুঠোটা খুলে দিয়ে বলেছিল ''এই তো! / এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল।'' নিজের কাছেই কোন জিনিস রাখার ভ্রান্তি কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। এই সাধারণ বিষয়টি কবির শিল্প-চেতনায় কবিতার উপাদান হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের 'দ্রুতি' শিরোনামের কবিতাটিতে স্বপ্নের মতো একটি ছবি আমরা পাই। সেখানে গভীর রাতে কবি দেখতে পান তীব্র গতিতে খড়ের গাড়ি, চলমান ও বাহক গরুর চোখ, গাছের গুড়ি ভর্তি গোরুর গাড়ি আর সেই গাছের গুড়িতে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা। দু একটি বড় ফ্রেমে ছবি এঁকেছেন এই কবিতায়। এখানে কবির শিল্প-চাতুর্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শব্দে আর নিঃশব্দে'। শক্তি ও ঐশ্বর্যের অহমিকায়, সন্ত্রাসে মানুষ সাধারণ জীবনের ওপর আঘাত নিয়ে আসে। অন্যায় পথে অত্যাচার করে সাধারণের জীবনে। কখনো শাসকের অনৈতিক অত্যাচারে অন্ধকারে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। কিন্তু আপন নিয়মে সত্য প্রকাশ পায়। ক্রমশ অত্যাচারিতের মঞ্চে সঞ্চিত হয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আগুন। ক্রমশঃ তাদের বুকে জন্মে প্রতিশোধের ও অত্যাচারকে পরাজিত

করার দৃঢ় বিশ্বাস। একদিন ফাঁস হয়ে যায় সমস্ত চক্রান্ত ও শয়তানির কৌশল। এই মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি আমরা আলোচ্য কবিতায় —''রক্তের মধ্যে রক্তবীজ। /চোখের মধ্যে স্বপ্ন। / বুকের মধ্যে বিশ্বাস, /শয়তানের দল জানে না / নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।'' (শব্দে আর নিঃশব্দে / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যটির 'আজকের গান' শিরোনামের কবিতায় আমরা পাই কবির জনজাগরণের বলিষ্ঠ কণ্ঠ। প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে কবি বঞ্চিত, সহায়হীন, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সবাইকে কাঁধে কাঁধ ও হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন — ''ডাকে বান / ভাঙে বাঁধ — / হাতে দাও হাত, ভাই / হাতে দাও হাত। / দলে দলে কাঁধে কাঁধ / চলো একসাথ ভাই /চলো একসাথ।'' (আজকের গান / ছেলে গেছে বনে)

তাই কবির কণ্ঠে আমরা শুনি দৃঢ় প্রতিবাদের ভাষা সাবধান করেন কবি সেইসব কৌশলি মানুষকে, যারা ছলে বলে লোভের হাত বাড়ায়, যারা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলমান জনজীবনের পথ রুদ্ধ করে সামনে দাঁড়ায়। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার ও জোটবদ্ধ শক্তির আহ্বান করেছেন কবি। সচেতন কবিমানসে আমরা সামাজিক ও শিল্পীর দায়বদ্ধ চেতনার প্রকাশ দেখি। কবি সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের প্রেরণায় আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে তিনি নির্দেশ করেছেন — যারা আজও পিছিয়ে আছে তাদের কাছে ডেকে নিই যেন আমরা। যারা আজো নীচে প'ড়ে আছে তাদের ওপরে তুলে এনে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন কবি। কবি নির্দেশ করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসার জন্য। শাসক-শোষক-অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমাদের লাখো লাখো পায়ের সঙ্গে পা মেলানোর কথা বলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় —

''আনো দিন হাতুড়ির
আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের।
নতুন দিনের আলো লেগে করে ঝলমল ঝলমল
বঞ্চিতদের সাধ আহ্লাদ।
আমাদের লাখো লাখো পদভবে টলমল টলমল
নড়ে ওঠে বুনিয়াদ।
পার হতে বাকি শেষ লড়াইয়ের ময়দান,

দুর্দমনীয় বেগে চলো হই আগুয়ান।''   (আজকের গান / ছেলে গেছে বনে)

এই কবিতার মধ্যে কবি আমাদের শোষণহীন, বঞ্চনাহীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সাধারণের জীবনে নতুন দিনের আলো আনার গান শুনিয়েছেন। কবির শৈল্পিক দক্ষতা, জীবনবোধ, দায়বদ্ধ শিল্পচেতনার দৃষ্টান্ত এই কবিতায় পাই আমরা। এখানে কবিতাটির গুরুত্ব অসামান্য।

আলোচ্য কাব্যের একটি অসামান্য ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা 'আলোয় অনালোয়'। এই কবিতাটির মধ্যে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্ষণিকের সাম্যবাদে ও শ্রেণি বৈষম্যহীন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের অবস্থান করিয়েছেন কবি। বিস্তৃত অন্ধকারে আমরা পরস্পর একাকার। মিলেমিশে সবাই আমরা বিভেদহীন সমাজের একেকটি অঙ্গ। সামগ্রিক অন্ধকারের মধ্যে এর ওর মুখে টর্চের আলো ফেললে সেই আলোতে ওদের বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের একটি বিশেষ অবস্থায় মিলেমিশে বিভেদহীন সমাজের পরিবর্তনে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এই প্রত্যয়ে কবি লেখেন — বিশেষ ঐতিহাসিক সংকটে আমাদের আলাদা অস্তিত্ব ও বিভেদ বজায় থাকে নি। সেটি স্মরণ করিয়ে কবি আমাদের এক দিনের একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এই কবিতায় —

''সমস্ত আলো একেবারে ফস ক'রে নিভে গেল।
অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।
একজন উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা
বন্ধ ক'রে দিয়ে ....
আলোয় আমরা পৃথক পৃথক থেকেও
কেমন মিলেমিশে এক হয়ে ছিলাম ;
অন্ধকার আমাদের একাকার ক'রে
পরস্পরের কাছ ছাড়া ক'রে দিল।''   (আলোয় অনালোয় / ছেলে গেছে বনে)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা হল 'কড়া পাক'। এই কবিতায় আমরা কবির বিভিন্ন দেশভ্রমণ এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা শুনতে পাই। কবিতাটির শুরুতে গাজী সাহেবের প্রবঞ্চনাকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি। খাইবার পাস, কালাপানি, পল্টন, চীন -মার্কিন ইত্যাদি শব্দগুলি কবির বিশেষ জীবন দর্শনের দিক্ নির্দেশক। চীন-মার্কিন শক্তিকে টের পাইয়ে দেবার এবং কড়াপাকের কঠিন ঠাঁই অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে এই কবিতায় —''ঠ্যাঙানির চোটে /ফেলে পল্টন আগেভাগে ছোটে / পশ্চিমা বীর মিঞাজি / নিয়াজি। / চীন-মার্কিন টের পাক, / এ কঠিন ঠাঁই-কড়াপাক।''   (কড়াপাক / ছেলে গেছে বনে)

'ছেলে গেছে বনের' কাব্যের সর্বশেষ কবিতা 'পুবহাওয়ার গান'। আঁধারে ডুব দিয়ে ফুল ফোটানোর প্রত্যয় এই কবিতায় রয়েছে। প্রবাহমান হাওয়া ও স্রোত যেন মানুষের জীবনে ভালবাসা, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। সে হিসেবে এখানে ফুলকে আমরা জীবনের প্রাচুর্য হিসেবে দেখতে পাই। কাব্য রচনার প্রারম্ভিক লগ্নে কবি ফুলকে বুর্জোয়া সমাজের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। এই ফুলের লাল টুক টুক রং-এর মধ্যে রয়েছে কবির বিশেষ তাৎপর্যবাহী জীবন প্রত্যয়। এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন কবি রক্তিম সংগ্রাম। পুব আকাশের হাওয়া ঘরে আসবার জন্য কবি জানলা দরজা খুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন — "আমার ফুল লাল টুকটুক

নাচতে নাচতে যায়

আমার ফুল ডাঙায় ওঠে

যেখানে মাটি রক্তে ভেজা।

যা রে ফুল পুবে যা

আঁধারে ডুবে ডুবে যা —" (পুব হাওয়ার গান / ছেলে গেছে বনে)

এই কবিতাটিতে রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা। আমরা এই কবিতায় কবির জীবনে ফুল ফোটানোর অভিপ্রায় উপলব্ধি করি। এই কবিতাটির ঢঙ গানের আঙ্গিকে রচনা করেছেন কবি। এই পর্বে এসে কবির রাজনৈতিক চেতনার ফুল ফুটিয়ে মোড় নেবার অভিমুখ দেখা যায়। কবির ব্যক্তি জীবনেও এই পালাবদল সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দেখতে পাই আমরা। জীবনের আদর্শের গতি একই থাকলেও সেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। কবি উদার হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেন ফুলকে স্বাভাবিকভাবে, যা তাঁর কাছে এক সময় ঘৃণার যোগ্য বস্তু বলে বিবেচিত হত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ সাতবছর পর মৌলিক কাব্য লিখলেন, 'একটু পা চালিয়ে, ভাই' (১৯৭৯) এই বিরতি সময়কালের মধ্যে তিনি তিনটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং সেই তিনটিই ছিল অনুবাদ কবিতার সংকলন। এরপর আবার মৌলিক কবিতা লেখায় হাত দেন। চুয়াল্লিশটি কবিতা নিয়ে তাঁর 'একটু পা চালিয়ে ভাই' গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আরও এগারোটি কবিতা যা অন্য ভাষার বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৯ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত। কাব্যটি কবি তাঁর বন্ধু গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে প্রকাশিত করেছিলেন। এই কাব্যের মৌলিক কবিতাগুলি হল — 'আনন্দ', 'সাধ', 'গোলকধাঁধা', 'হিংসে', 'মরুভূমির হাওয়ায়', 'হায়না', 'এখন', 'বাইরে থেকে ভেতরে', 'টুল', 'শুভরাত্রি', 'যেখানে ব্যাধ', 'টলতে টলতে', 'যাব না সভায়', 'হিকোরি চিকোরি', 'ঝুলতে ঝুলতে',

'না কী বলেন', 'জাগ্রত', 'সাজা চাই', 'বাঘের আঁচড়', 'কমলে কামিনী', 'কোথায়', 'কথার ঝুড়ি', 'রাস্তা', 'রক্তবীজ', 'সরলা বসুর জন্য', 'শের জঙ্গ-এর ডেরায়', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'দিক্‌ভুল', 'বদলায়', 'আজ আছি কাল নেই', ও 'পাতাল রেল'। আলোচ্য কবিতাগুলি রচনাকাল পর্যন্ত কবি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তবে চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে দেখা যায় না। তাঁর সচেতন শিল্পী সত্ত্বায় রাজনীতি বাদ যায়নি তখন। কিন্তু সেই চেতনায় নেই ব্যঙ্গ ও তীর্যক শ্লেষ, নেই তেমন নেতিবাচক জীবন দৃষ্টির শব্দের ঝাঁঝ।

এইসব কবিতায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিক জগৎ সৃজনের জীবন প্রত্যয়। দেখা যায় — নিত্য দিনের সাধারণ জীবনের জলছবি। সৃষ্টি ও রাজনীতির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সৃজনশীল গতিকে বজায় রেখেছিলেন। আলোচ্য কবিতাগুলিতে এ প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতার সমালোচক অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর একটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় ' গ্রন্থে লেখেন — ''হয়তো আজকের সুভাষ মুখোপাধ্যায় — বিশ্বাসের ভাঙন নয়, বিশ্বাসেরই সংকটের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন।'' সেই সময়ের কবিমানস, শিল্পীসত্তা, জীবনপ্রত্যয় ও চেতনার প্রকৃতি আলোচ্য কাব্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্তে নির্ণয়ের চেষ্টা রয়েছে এখানে।

'একটু পা চালিয়ে, ভাই' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আনন্দ'। এই কবিতাটিতে আমরা দেখি জীবনের চড়াই-উৎরাই বিভিন্ন পথের ঘাত-প্রতিঘাতে জমানো চোখের জল প্রকৃতির বিস্তৃত বুকে মিশিয়ে আনন্দে রঙিন করে তোলার বলিষ্ঠ মানসিকতা। সাধারণের জীবন দুঃখ-বেদনা জমানো সময়কে নিয়েই চলে। তাই কবি লেখেন —

''রাস্তার ছোট ছোট গর্তে
জমানো ছিল
আমাদের চোখের জল।'' (আনন্দ / একটু পা চালিয়ে, ভাই)

এই কবিতায় একজন গ্রামীন রমনীর হৃদয়ে জীবনের দুঃখকে জয় করার রঙিন কল্পনাকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবি। রমণীটি হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে ঘাটের জলে পড়া আকাশটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। আর তখনই তার সিঁথির রক্তিম আভা ঠিক্‌রে আকাশের গায়ে যেন আনন্দের রং লাগিয়ে দেয়। নিজের ভেতরের কল্পনাকে দিয়ে শত বেদনাকে কবি শতদল ফুটিয়ে রঙিন করে তোলেন। জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে সাধারণের আনন্দে প্রকৃতি রঙিন হয়ে ওঠে। এখানে জীবন প্রত্যয় কবির সচেতন শিল্পীসত্ত্বায় বিশিষ্ট গতিতে বয়ে চলেছে।

আলোচ্য কাব্যের 'সাধ' শিরোনামের কবিতাটি কবি পত্নীর 'সাধ'-এর পূর্বরাত্রে সুখ স্বপ্নে জানলার গরাদ ধরে ঘর আলো করে জন্ম দুঃখী মায়ের সঙ্গে একাকার করে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কবির চেতনায় জাগ্রত হয়েছে ঘরের দুটো দেয়ালের টাঙানো ছবি। একটিতে দুহাতে পেরেক কাঁটায় বিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট ও অন্যটিতে হেলায় কর্ণ রথের চাকায় হাত রেখে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। এই ছবি দুটিতে কবি চেতনায় জ্বলজ্বল করে ওঠে কুমারি মায়ের গর্ভে তাঁদের জন্মের মহিমা। এই কবিতায় সাধারণ উপাদানে কবির গভীর জগৎ সত্য মিশ্রিত শিল্প চেতনা বিশিষ্টতা পায়।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'আজ আছি কাল নেই' । এই কবিতাটি মূলতঃ পাঁচটি কবিতার সংকলন। সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত কবিতা পাঁচটিতে সেই সময়কালে রচনার প্রকৃতি ফুটে উঠেছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে লেখাকে পেশা করে আর্থিক সংকটেও চলতে হয় তাঁকে। এক সময় কেউ বা কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কবি। এই জীবনচর্যা কবির শিল্প চেতনায় প্রকৃতির সঙ্গে উপমিত হয়ে অসাধারণ চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে। কবি আধ্যাত্মিক জীবন দর্শনে জীবনকে হেমন্তের হলদে পাতার সঙ্গে অভেদ কল্পনা করেন। সেই চেতনায় কবিতাটির শিরোনাম হয়েছে 'আজ আছি কাল নেই।' জীবনকে হেমন্তের হলদে পাতায় সমধর্মী জীবনচিত্র এঁকেছেন। কবি বলেছেন শীত পড়লে এক জায়গাতে স্তুপাকার করে লোক উবু হয়ে বসে আগুন পোহায়। পাতাগুলি দ্বারা তাপ গ্রহণ করে মানুষ, কিন্তু এক বর্ণও কেউ পাতাকে মনে রাখে না। তেমনি জীবনও তাঁর ঝরে পড়বে। জীবনের সেই করুণ চিত্র কবি আঁকেন — ''হেমন্তের হলদে পাতার মতন

হায়, আমার

এই দিন-আনি দিন খাই

লেখার আয়ু।'' (আজ আছি, কাল নেই /একটু পা চালিয়ে, ভাই)

তথাপি এই লেখার ধারা অবিচ্ছেদ্য। কবিও কাউকে অন্বেষণ করছেন ঠিক তাঁরই মত সে সমাজচেতনা নিয়ে লিখেই যাবে — ''আজ আমি ঠিক আমারই মতন

একজনকে খুঁজছি

যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে পারি

ভাই, একটু ধরো তো

আমি আসছি।' (আজ আমি আছি কাল নেই/একটু পা চালিয়ে, ভাই)

ভারতীয় দর্শন ও ঔপনিষদিক ভাবনায় জন্মান্তরবাদ লেখককে প্রভাবিত করেছিল। যার জন্য কবি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন মানুষের চলে যাওয়া একেবারে স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া, নাকি, আবার

চক্রাকারে ফিরে আসা। যেমন নদীর জল মোহনার দিকে ছুটে যায় আবার বৃষ্টির জল হয়ে ফিরে চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং একেবারে নিঃশেষ হয় না। লিখতে লিখতে কবির মাথায় ঝাঁকড়া চুল গুলো এই কবিতা রচনাকালে, সাদা হয়ে পড়েছিল। তাঁর লেখা সর্বদা সম্পূর্ণ ও সার্থকতা পায় নি। কখনো কখনো লেখার অসামর্থকে কবি লেকে জল উপছে মাছ বেরিয়ে এলেও তা ধরতে না পারার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। আলোচ্য কবিতা সংকলনের তৃতীয় সংখ্যক কবিতায় আর্থিক অসঙ্গতিতে একজন লেখকের জীবনের বেশীর ভাগ সময় বংশানুক্রমিক ভাড়াবাড়িতে কাটানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা পাই। কবিও

ভাড়া বাড়িতে আছেন প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি। পুরোনো ভাড়ায় এই বাড়িতে মনে করিয়ে না দিলে কখনো মনেই হয়নি সে বাড়ি তাঁর নিজের নয়। এই ভাড়াবাড়িতেই এক চিলতে জমিতে তিনটে পেঁপে গাছ, লাউ, পেয়ারা গাছ লাগিয়ে ছিলেন। এক ডজন মুরগিও ছিল ; যার ডিম বিলোনো হত বাড়ি বাড়ি। ছিল দুটো কুকুর ও চারটে লোভী বেড়াল। ভাড়া বাড়ি বলেই রোজ দুবেলা লাথি ঝাঁটা ও শাপমুন্যি করে বাড়ির মালিক দুম দুম ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামে। কবির কথায় —

''বাড়ির মালিক খুব সজ্জন।
এসে খুব সুন্দর ক'রে বোঝান
কেন অবিলম্বে আমাদের উঠে যাওয়া উচিত।

....

ছোট মুখে বড় কথা ছাড়া
তখন আর কীই-বা আমি বলতে পারি —
দয়া করে আর কিছুটা সময় অপেক্ষা করুন
শুধু এই বাড়ি নয়
দুনিয়াটাই আমি বদল করব।'' (আজ আছি কাল নেই/একটু পা চালিয়ে, ভাই)

আর্থিক সংকট ব্যক্তি জীবনে একসময় কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেন কবি। বার্দ্ধক্যে এসেও বাস্তব জীবনে কবিকে অনটনের মধ্যে অনেক কষ্টে চলতে হয়েছিল। তথাপি কবি তথাকথিত উচ্চবিত্ত লেখক জীবনের বিলাসিতাপুর্ণ জীবনকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন —''এখন আমি বাড়ি করছি / গাড়ি করছি / মদ খাচ্ছি / মেয়েমানুষ রাখছি /গড়াগড়ি দিচ্ছি / ঘুরছি / উড়ছি।'' (আজ আছি কাল নেই / একটু পা চালিয়ে, ভাই)

কবি তথাকথিত লেখক জীবনের গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। আলোচ্য কবিতা সংকলনের পঞ্চম সংখ্যক কবিতায় কবি জীবনের শাশ্বত সত্য নিয়ে শিল্প রচনার প্রয়াস করেন। কবি বলেন যত দূরে যান এই মাটি থেকে তত টান উপলব্ধি করেন। আকাশে যত উপড়ে ওঠা যায় তখনই একটু মাটির জন্য তাঁর যে কী অসম্ভব টান উপলব্ধি হয় কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন। এই কবিতা রচনাকাল পর্যন্ত তিনি অনেক পথ অতিক্রম করেছিলেন। কখনো ভিড়াক্রান্ত শহরের রাস্তা, কখনো গ্রামগঞ্জের ধূ ধূ করা মাঠ-পথ-ঘাট অতিক্রম করেছেন। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন — ''মাটির পাশে মাটি / মুখের পাশে মুখ রেখে রেখে / মনে মনে হিসেব করি / কী করলে কী হয় / কী ক'রে ফোটাতে হয় /বাগানে বাগানে ফুল / আর মুখে মুখে হাসি।'' (আজ আছি কাল নেই / একটু পা চালিয়ে, ভাই) ফুল ফোটানো ও মুখে মুখে হাসি ফোটানোর জীবনদর্শন বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এখানে। তাই কবি যা করতে চান, যা লিখতে চান তা আজকেই, কাল বলে কিছু নেই।

আলোচ্য কাব্যের 'গোলকধাম' কবিতায় কবির চেতনায় উদ্দীপ্ত স্বর্গ, নরক, মন্দির, মসজিদ, গির্জা কেন্দ্রিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ডানা-কাটা পরীর মতো সবাই স্বর্গে যেতে চায়। এই চেতনায় মানুষের মন্দির, মসজিদ ও গির্জায় যাওয়া। কবি এক বুড়ো মিস্ত্রির হাতে স্বর্গে যাবার সিঁড়ি নির্মাণ করে কর্মজীবনকে জয়ী করে দেখিয়েছেন। একজন বৃদ্ধ মিস্ত্রির হাতে সিঁড়ি নির্মাণ এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে — ''সশরীরে স্বর্গে চাস যেতে ?

আয় কাছে,
আয় এই বেলা।
বিশ্বাস ছিল না,
গেল তবু —
কী আশ্চর্য, সে বুড়ো মিস্তিরি
নরকের দ্বার খুলে,
প্রভু,
পেল স্বর্গে পৌছবার সিঁড়ি।'' (গোলকধাম / একটু পা চালিয়ে ভাই)

'একটু পা চালিয়ে, ভাই' কাব্যের 'হিংসে' শিরোনামের কবিতায় আমরা মানুষের হিংসা ও ঈর্ষাবোধের পরিচয় পাই। 'পদাতিক কবি' অবিরত পথ চলেন। এই পথ চলায় তিনি উপলব্ধি করেন এক শ্রেণির ঈর্ষাকাতর মানুষের ক্রূর হিংসা। কবি এই হিংসাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন —

''মাটি কাঁপছে ; কাঁপুক — / চলরে ঘোড়া, / হাতে তুলেছি চাবুক / মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ্ / বলেছি, আ মর্ মিন্‌সে / ও কিছু নয়, বুঝলি না রে / হিংসে হিংসে হিংসে।''   (হিংসে /একটু পা চালিয়ে ভাই)

এই কাব্যের 'মরুভূমির হাওয়ায়' শিরোনামের কবিতায় আমরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মরুভূমিতে চলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। কবির কল্পনায় মরুভূমির হাওয়া আকাশের চোখে ধুলি দেয়। সেখানে অন্ধকারে রিন্‌টিন রিন্‌টিন করে একদল উট বেশ একটু নাক উঁচু ভাবে শহর ছেড়ে সেদিন গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। কিছুটা দূরে মাটি থেকে একটু উঁচুতে গাড়ির আলোগুলোকে কবির মনে হয় পোড় -খাওয়া মানুষের কপালের রেখা বলে মনে হয়। সেই অন্ধকার মরুভূমির পথ চলায় কবির জীবন সম্পর্কে যে দার্শনিক উপলব্ধি হয় তা এরূপ —''হঠাৎ আমার চোখের জল পাথর হয়ে গিয়ে / ভয়ঙ্কর ভারী ক'রে তুলেছিল / আমার কাঁধের ওপর চেপে বসা / এক অদৃশ্য শবাধার। / আমি সেইদিন বুঝেছিলাম / জীবনের ভার মৃত্যুর চেয়ে হালকা।'' (মরুভূমির হাওয়ায় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

কবিতা রচনার প্রকৃতি তুলে ধরেন আলোচ্য কাব্যের 'হয় না' শিরোনামের কবিতায়। আমরা জানি কবিতার জন্ম বেদনা হত এক কপোতীর আর্তনাদে একাত্ম হয়ে দস্যু রত্নাকরের মুখ থেকে উৎসারিত একটি শ্লোক থেকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন দুঃখের তীব্র উপলব্ধি। এখানে আমরা কবি সুভাষকে বলতে শুনি — '' কবিতা চান ? মাপ করবেন, /হয় না। / কলমটা ঠিক কল নয় তো, /কবিরাও নয় / দাঁড়ের ঠিক ময়না।''   (হয় না / একটু পা চালিয়ে ভাই।)

অর্থাৎ কবিতা কৃষ্টির সঙ্গে কবির আত্মার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। তাঁর সত্ত্বার সঙ্গে আছে একটা নিবিড় যোগ। কলের মতো চালিয়ে দিলে কবির লেখণী থেকে কবিতা ঝরে না। অথবা কারো শেখানো বুলিতে ময়নার মতো কবির লেখনী কথা বলে না। কবিতা সৃষ্টি-রহস্য ধরা পড়েছে আলোচ্য কবিতার পরের এই পংক্তিতে —''আপনি মশাই,

পেট চিড়ে চান মুক্তো -
জানেন তো না কী যন্ত্রণা
মুচ্‌ড়ে ওঠে পাতায় পাতায়
যখন ছাপেন একটি ক'রে মুক্ত।'' (হয় না /একটু পা চালিয়ে ভাই)

তাই কবি বলেন কবিতা সৃষ্টি কৃত্রিম ভাবে হয় না। সেটা গয়নার মতো চোখ-কান ধাঁধিয়ে দেবার মতো বিষয় হয়। যাঁরা চোখ-কান ধাঁধিয়ে কবিতা লেখেন, সেটা অনেকটা ধৃষ্টতা বলে কবি মনে করেন । এই কবিতাটিতে কবির কবিতা সৃষ্টির প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন দক্ষ শিল্পীর শিল্প দক্ষতায়।

'এখন' শিরোনামের কবিতাটিতে সমকালের সামাজিক অন্ধকার, বিপর্যস্ত সাধারণ জীবন ও সামগ্রিক সর্বনাশ ধরা পড়েছে। এই কবিতাটিতে কবি সুভাষকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঢেউ এই কবিতায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবি ডানপন্থী সভাসমিতিতে ঘেষেছেন তাই চারদিকে ও কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে ও বাইরে তাঁকে কেন্দ্র করে গেলে গেল রব ওঠে। সেই বিষয়টি এই কবিতায় ধরা পড়েছে — ''এখন আমাকে ঘিরে

মাথায় আকাশ -ভাঙা অন্ধকার।'' (এখন / একটু পা চালিয়ে ভাই)

সেই সময়ের সেই সমালোচকদের প্রতি কবির পরামর্শ ''এখন তোমরা তোমাদের চোখ / সরিয়ে নিতে পারো।'' যারা দলমত নির্বিশেষে নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, প্রান্তীয় ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিনিধি করে কথা বলেন; তাদের দলভুক্ত করে কবি লিখেছেন — ''আমরা কলম নামিয়ে রেখেছি মাটিতে''। বামপন্থী মিছিল, সভা শ্লোগানের চিল চিৎকার তাঁর কণ্ঠে এখন শোনা না গেলেও কবি বুভুক্ষু শ্রেণির কথা বলে চলেছেন অবিরত। এজন্য তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব —

''আমার আস্তিনের আড়ালে এখন
গুটিয়ে রাখা বিদ্যুৎ
ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে
মা, মা-গো ব'লে ক্ষিধেয় ককিয়ে -ওঠা
এক কবন্ধ চিৎকার।'' (এখন / একটু পা চালিয়ে ভাই)

সে সময়ে যারা ক্ষিধেয় মা-মা বলে ককিয়ে উঠেছিল, যারা একটু ফ্যান ও একমুঠো ভাতের জন্য চিৎকার করেছিল, সেদিন তাদের কবি নিজের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলে মনে করতেন। তিনি সেই সব নিরন্ন মানুষের সঙ্গে নিজের একটা অসাড় হাতকে অভিন্ন করে দেখেছেন। যাকে কবি সুভাষ প্রাণ বাঁচাতে পারছেন না যেন। এখানে কবির সমাজ সচেতনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পাই।

সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় জীবনের অনেক কিছুই। 'বাইরে থেকে ভেতরে' শিরোনামের কবিতায় কবি সুভাষ কখনো কখনো খুব একাকিত্ব উপলব্ধি করেন। বাইরের বাদল-হাওয়া কবিকে উদাস করে দেয়। কবি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন — ''সারাটা দিন নিঃসঙ্গ একা / চেয়ারে দিয়ে ডুব / ব'সে রয়েছি আকাশ মুখে ক'রে — / পা টেবিলে রাখা /বাইরে তখন বৃষ্টি খুব.......''

(বাইরে থেকে ভেতরে / একটু পা চালিয়ে ভাই) প্রকৃতি কবিকে ও তার মনকে নাড়া দিয়ে এলোমেলো করে দেয়। তাই তিনি প্রত্যেককে আহ্বান করছেন যৌবনকে ভেতরে আনবার জন্য। তিনি বেদুইনের ঘোড়ার ক্ষুড়ে ও রক্তে চলমানতার দোলা লাগানোর কথা বলেছেন। কবি জীবনকে জয়ী করার জন্য যৌবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । সমস্ত জড়তা কাটিয়ে মানুষকে কেবলই চলার আহ্বান করেন।

দয়া-ভিক্ষা নয়, নিজের অধিকার লড়াই ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে রাজনৈতিক নেতার হাতে - পায়ে ধরে এবং তাদের তোষামুদের দ্বারা একশ্রেণির যুবক ও তরুণ তাদের নিজেদের সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে তুচ্ছ করে সামান্য একটা মাছি-মারা কেরানী কিংবা সর্বক্ষণের টুলে বসা পাহারাদার হয়ে একটা প্রজন্মকে বরবাদ করে দিচ্ছে। কবি দেশের যুবশক্তির এই অবমাননার প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন আলোচ্য কাব্যের 'টুল' শিরোনামের একটি কবিতায়। সেখানে শিক্ষিত বেকার-যুবকদের অবহেলা ও করুণ দুর্দশাগ্রস্ত অবমাননার ছবি অসাধারণ চিত্রকল্পে তুলে ধরেছেন । অসংখ্য বেকার সমস্যা তাঁর শিল্প চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল —"টিফিনের সময়কার

অক্ষরযুক্ত ঠোঙার কাগজের মত
আর নিরক্ষর শালপাতার মত
অসংখ্য বেকার " (টুল / একটু পা চালিয়ে ভাই)

নতুন প্রজন্ম ও যুবশক্তি দেশের চালিকা শক্তির উৎস। তাদের মেরুদন্ডের ওপর ভর করে দেশ দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ তাদের অধগতি এখন। যুবশক্তির ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত । বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছিলেন সেদিন কবি সুভাষ —

"এ-দাদা সে-দাদার পায়ে আধার মত লেগে
পানের পিক আর থু থু দিয়ে
আরও একটা প্রজন্ম বরবাদ করতে
করজোড়ে প্রার্থনা করছে —" (টুল / একটু পা চালিয়ে ভাই)

কবির ব্যক্তি জীবনের বিশেষ উপলব্ধির ফসল 'শুভরাত্রি' শিরোনামের একটি কবিতা। এই কবিতায় জীবনের দুঃখের অন্ধকারময় সময়ের কথা উঠে এসেছে। এখানে আমরা পাই কবির জীবনের আশা-স্বপ্ন-আলোর প্রত্যাশী মন। আমরা পাই মানুষের কথা দিয়ে কথা না রাখার হতাশাজনিত অযাচিত হেনস্থার উপলব্ধি। তথাপি কবি জীবনের সমস্ত হতাশা, ভয় ও খারাপ সময়কে দৃঢ় মনোবল দিয়ে জয় করবার প্রত্যয় দেখি এই কবিতায় — "তার এক মুঠোয় উঠে আসে স্মৃতি, / অন্য

মুঠোয় আশা। / কথা দিয়ে / কথা না রেখে, / জুতোর সুখতলায় / ক্ষইয়ে দিয়েছি / আমার গোনাগাথা দিন। / এখন আমার হাতে রইল / ভয়তরাসে এই রাত্তির। / আমি সাহস দিয়ে / তার গলায় গান ফোটাব।''   (শুভরাত্রি / একটু পা চালিয়ে ভাই)

এ কাব্যের ভালোবাসার কবিতা 'যেখানে ব্যাধ'। এই ভালোবাসা ও প্রেমভাবনার মধ্যে নিহিত কবির সমাজতান্ত্রিক ভাবনাপ্রসূত অত্যন্ত নিম্নবর্গের প্রতি নিবিড় সম্পর্ক। একটি পাখি এই কবিতায় ''এখান থেকে একটা নেয় / ওখান থেকে দুটো / এমনি করে বাসা বানায় / কুড়িয়ে খড়কুটো।'' এই পাখিকে কবি খেই হারিয়ে মিলিয়ে যাবার আন্তরিক আহ্বান করেছেন। একটি পাখির অত্যন্ত সাধারণ জীবনের সামান্য খরকুটোর দ্বারা বাসা বানানোর মধ্যে নিহিত অত্যন্ত মূল্যবান ও আদর্শিক জীবন দর্শন একটি মহৎ দর্শন চেতনা একটি পাখির খরকুটো সংগ্রহের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি সুভাষ। এবং একটু ছড়ানো ছিটানো দানার সঙ্গে সম্পর্কিত পুঁজিবাদী সিস্টেমের প্রতিরূপ ব্যাধের ষড়যন্ত্র। কবি এই কবিতায় লিখেছেন — ''একটি বার ফিরিয়ে ঘাড়

সহসা অপ্রস্তুত
বাঁকানো ঠোঁটে চমকে ওঠে
চোখের জল বিদ্যুৎ
রয়েছে সাধ ভালোবাসার
সাহস নেই কাছে আসার
কে জানে ব্যাধ পেতেছে ফাঁদ
ছড়ানো কোন্ দানায়।''   (যেখানে ব্যাধ / একটু পা চালিয়ে ভাই)

আলোচ্য কাব্যের 'টলতে টলতে' শিরোনামের একটি কবিতায় কবির বিশেষ কতগুলি জিজ্ঞাসার অন্বেষণ উপলব্ধি করা যায়। আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে কবি জিজ্ঞেস করেন — জগৎসংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, ভাবেন জীবন কী, জীবনের সঙ্গে আকাশের তারা ও মাটির দূরত্ব কোথায়, ইত্যাদি। কবি সুভাষকে কেন্দ্র করে সমকালের বিতর্কের ঝড়, সব তর্ক বুঝে এক শ্রেণির মানুষের কানে আঙুল দিয়ে গোপন করে থাকা কবির চেতনায় আঘাত করেছিল। কবি তাই জগৎ সংসারের সমস্ত বিতর্কের মধ্যে একটি তারের ওপর দিয়ে টলতে টলতে চলার উপলব্ধি করেছেন।

সেই অবস্থায় তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরামর্শদাতাদের কেউ বিপদ থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ করে নি। বরং কবির মরণের পথে তারা উৎসাহিত করে। কিন্তু কবি আত্মশক্তি ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এসবের উর্ধ্বে ওঠেন কবি। ওপর থেকে তাকান যারা নিন্দাকরে, কু-পরামর্শ দেয় ও ফন্দি আঁটে, তারা

অনন্তকাল ধরে মানব সমাজের একেবারে নিচের স্তরে এক জায়গাতেই অবস্থান করে। তাদের কোন উত্থান নেই। কবি তাই বলেন — ''যারা মজা পেতে / আর যারা মজা দেখাতে চাইছে / তারা সবাই একসঙ্গে / থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছে — / কানে আঙুল দিচ্ছে চোখবন্ধ ভীতুর দল / আমি খুব আস্তে আস্তে / পা টিপে টিপে এগোচ্ছি / মুখ তুলে / নীচে অনন্তকাল ওরা দাঁড়িয়ে থাক।'' (টলতে টলতে / একটু পা চালিয়ে ভাই)

থেমে থাকার মানুষ ছিলেন না কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। চলার পথে নানা বিঘ্নকে বাধা টপকে তাঁদের চলতে হয়েছিল। অনেক সময় তাঁর নিজের কাছের বন্ধুরা, সঙ্গে চলার সাথীরা তাঁকে ভুল বুঝেছিল; তার নিন্দায় সরব হয়েছিল; তাঁর চলার পথ বন্ধুর করে তুলেছিল। তার সর্বসময়ের সঙ্গী ছিল দারিদ্র। তবুও তাঁর পথচলা ছিল অবিরাম। তাঁর এই গতিশীলতার চালিকাশক্তি ছিল তাঁর নিজেরই অন্তমনের অন্তঃস্থলেই নিহিত। এ সম্পর্কে তার বিবৃতি — ''আমি হাঁটতে শিখে / বুকের মধ্যে চয়ন করেছি সেই আগুন / যে সব কিছুর কোথায় শেষ তা জানে''। শত দরিদ্রের মধ্যে তার পরম সম্পদ ছিল তাঁর নিজের ওপর অসম আত্মবিশ্বাস। আমাদের বলেন ''দেখ, আমার হাতের মুঠোয় আমাদের সর্বস্ব ধরা রয়েছে।'' কবির সেদিন বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ; সেই পঁচিশতম বিবাহ-বার্ষিকীতেও কবির নিত্য সঙ্গী অবর্ণনীয় দারিদ্র। দারিদ্র মোচন হয়তো তাঁর জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না । তাই নিঃস্ব কবি কখনো নিজেকে দারিদ্রতার জ্বালায় ভোগেননি। সাময়িক ভাবে অভাবকে মিটিয়েছিলেন তাৎক্ষণিক জোড়াতালিতে। সেই পঁচিশতম বিবাহ-বার্ষিকীর দিনের বর্ণনায় কবি লেখেন —

''সারাদিন ঘুরে ঘুরে
সন্ধ্যেবেলা খালি হাতে।
শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের চাঁদায়
বিয়ের পঁচিশ বছরে
হঠাৎ দেখি তারের ওপর দিয়ে
টলতে টলতে চলেছি।'' (টলতে টলতে / একটু পা চালিয়ে ভাই)

বিতর্ক, সমালোচনা ও নিন্দায় সেই সময়ে রাজনীতির বাঁধা ছকে কবি ক্ষুব্ধ ও বিতশ্রদ্ধ। কবি আপনমনে নিজের মনে একটি তারে বিভিন্ন সুর বাজিয়ে চলেন। তিনি রাজনীতির সীমা -বৃত্তের বাইরের মানুষের ডাকে সারা দিতেন। আমরা দেখি কোনো শ্লোগান, সভা সমিতির ডাকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন। স্পষ্ট করে কবি বলেন — ''কেন ডাকো / মন নেই, যাব না সভায়।'' রাজনীতির বিশেষ পার্টি নির্দেশিত সঙ্কীর্ণ নির্দিষ্ট পথে চলতেদেখিনা আমরা সে সময় কবি সুভাষকে।

সাধারণের জনজাগরণী জীবন দর্শনের বিস্তৃত রাস্তায় কবিকে চলতে দেখি আমরা। বিশেষ এই শিল্পী মানসে তিনি লেখেন — ''যে আমাকে চায় আমি তার কাছে যাব

গলায় খেলে না সুর

তবু আমি গাইব গান মৃদঙ্গ বাজাব

বৃষ্টি এলে

বাইরে বেরোব ভিজতে

নদী যদি পারে যেন আমাকে ডোবায়

আমি যেতে চাই না তীর্থে

পুণ্যে নেই লোভ।'' (যাবনা সভায়/একটু পা চালিয়ে ভাই)

বিশেষ রাজনৈতিক জীবনদশর্নের কেন্দ্রমূলে ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি কবির গভীর আন্তরিক প্রীতি। জন জীবনের সঙ্গে অন্বিষ্ট ছিল কবির দেশ মাতার প্রতি নাড়ীর টান। ছিল বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। যারা বাংলা ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দেন, তাদের শেষাত্মক ভাষায় তাদেরই ব্যঙ্গ করেছেন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার জন্য — ''জ্ঞানের ঝুলি ভিক্ষার / উচ্চারণে হিক্কার /ভাবটা থাকে / তারই ফাঁকে / বাংলাকে দিই ধিক্কাক্ষর।'' (হিকোরি চিকোরি / একটু পা চালিয়ে ভাই) কবি বন্ধুদের কথা স্মরণ করে লিখেছেন —

''আমার যে বন্ধুরা পৃথিবীকে বদলাবে বলেছিল

তর সইতে না পেরে

এখন তারা নিজেরাই নিজেদের বদলে ফেলছে।

আমি এক পায়ে এখনও পা-দানিতে ঝুলছি।

মুঠো আল্‌গা হয়ে এলেও, আমার কপাল ভালো,

ঘাড় ফিরিয়ে

কিছুতেই পেছনে তাকাতে পারছি না।।'' (ঝুলতে ঝুলতে /একটু পা চালিয়ে ভাই)

এই পৃথিবীরে সন্ত্রাস-দাঙ্গা-খুনোখুনি-মার জখম থেকে সরে এসে তিনি পৃথিবীতে আমাদের শান্তির রথকে ময়ূরপঙ্খে সাজাতে বলেছেন। তিনি সেইসব মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের সাজা চেয়েছিলেন — ''আরও বড় নরান্তক খুনী এক। / সেজেছে সে রাজা। / তার হাতে / শুধু তো পুত্রের নয়; / পিত্রা পুত্র / জনক জননী বধূ / আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু স্বজাতির ছিন্নমুন্ড।'' (সাজা চাই / একটু পা চালিয়ে ভাই)

কবি এই পৃথিবীর দাঙ্গাবাজ নরঘাতকদের বিরুদ্ধে আগুন ওগরাবার কথা বলেছেন। তিনি পৃথিবীর সেই সব মানুষকে 'থু' এই একটি ধ্বনি দ্বারা ঘৃণা রক্তে করেছেন এই কাব্যের 'বাঘের আঁচড়' শিরোনামের একটি কবিতায়। নরখাদক-সন্ত্রাসবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজদের ঘৃণা করেছিলেন কবি সুভাষ। তাদের বিরুদ্ধে সজাগ থেকে ভেতরে আগুন জ্বালাবার কথা আমাদের তিনি বলেছিলেন —

''নরকের সেই রাত,
সাপের মত বুকে -হাঁটা ট্যাঙ্কের সেই চাকা,
বৃষ্টির -ধোয়া ঘাসের ওপর শোয়ানো
নিহতদের শব................
সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও শালুক ফুল,
আমি চোখ চাইতে পারছি না ঘৃণায়
শেকলের ঝনঝনার সঙ্গে
বাতাসে নোংরা হাতের গন্ধ।'' (বাঘের আঁচড় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

যুদ্ধবাজ ও সাম্রাজ্যবাদী সেইসব মানুষকে ঘৃণায় থুথু ফেলে ফেলে, সেগুলিকে আগ্নেয় গিরির জ্বলন্ত লাভায় রূপ দেবার কথা আমাদের জানিয়েছিলেন কবি সুভাষ।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'কথার ঝুড়ি'। কবি এক সময়কালে নৈতিক বোধের অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর জীবন দর্শনে রাজনীতির অনৈতিক স্বার্থপরতার প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে। জারা কেবল আদর্শের উপর ভিত্তি করে নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে ফ্রন্ট করেছিলেন পদের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেনি কবি সুভাষের শৈল্পিক চেতনা। কবির ভাষায় — ''তুলেছি চাঁদা / বলছি, দাদা, / মুক্ত কণ্ঠে — সামলে চামড়া। / আছি আমরা / যুক্ত ফ্রন্ট। / করছি রফা / বত্রিশ দফা / কারণ উহ্য /।'' (কথার ঝুড়ি / একটু পা চালিয়ে ভাই) যারা কেবল মুখেই বড় বড় বুলি আওড়ান অথচ যাবজ্জীবনে নেই কোন উচ্চ আদর্শ, দেশ হিতৈষী ও মানব প্রেমের হিতাকাঙ্ক্ষা, তারা কেবল মুখের জোড়েই মানব সমাজে পূজ্য হয়ে উঠেছেন। এই কবিতায় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত করেছেন আলোচ্য কবিতায়।

আলোচ্য কাব্যের অন্যতম কবিতা 'রক্তবীজ'। এই কবিতাটি কবি সুভাষের জীবনের দার্শনিক চেতনা পরিস্ফুট। এই কাব্যে নিহিত কবির জাগরণী উদাত্ত কণ্ঠ। কবি তাঁর সাহিত্যে সেই বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা মানুষের শিরায় শিরায় চেতনা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এই প্রকৃতির সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর জীবনের দর্শন। তাই কবি লেখেন —

''মাটি হাতড়ে হাতড়ে আমাকে দেখতে হবে
অন্ধকারে ছোঁড়া
আমার বীজগুলির কী দশা হল।
বীজ তো নয়,
জলের মধ্যে
আমি পুঁতে ছিলাম আগুন।
আগুন নয় —
রক্ত।'' (রক্তবীজ / একটু পা চালিয়ে ভাই)

'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শের জঙ্গ-এর ডেরায়'। বিশেষ সময় কতগুলি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই কবিতায় উঠে এসেছে। সমকালের সংকট, সার্বিক বিভেদ, আঘাত ও হিংস্রতায় কবি-মন ক্ষুব্ধ রাজনীতি কবিকে আলোড়িত করে তোলে। সেই সময় কালের আঘাতে কবি পুনর্বার চল্লিশের দশকের 'পদাতিক'এর গতিতে ফিরে যেতে চান। তাই তিনি বলেন ''ফাঁসির দড়ি / ইন্‌কিলাব / যাবজ্জীবন / বন্ধজাল/ লোহার গরাদ / জিন্দাবাদ''/; তাই আজ ''শেষ মুক্তির লড়াই বুকের মনিকোটায় একচ্ছত্র /........ .নিশানা ঠিক রাখে।'' কবি দেখতে পাচ্ছেন লড়াই করার অসংখ্য ডেরায় ভয়ঙ্কর সুন্দরভাবে শান্তি মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী ও প্রতিক্ষিত। যার গভীরে নিহিত কবির সুন্দর স্বপ্ন। অন্তর্দৃষ্টিতে কবি যেন শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। কবি লেখেন —

''ঘুলঘুলিতে পায়রা দুটো
জোটায় খড়কুটো
ঘরের মধ্যে
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় সাদা পালক
টাঙানো তার নিচে পিকাসোর
আঁকা শান্তি কপোত।'' (শের জঙ্গ-এর ডেরায় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

হৃদয়ে ক্ষত নিয়ে, প্রাণে আঘাত নিয়েও মানুষ লড়াই করে শান্তি-কামনায়। অনুপম চিত্রকল্পে কবি ছবি আঁকেন মানুষের সেই সব দিনের কথায় —''চোখে চশমার ফ্রেমে পরানো / ঈদের চাঁদ যেন / মাথায় শুভ্র কেশ / শিয়রে জেগে / রাত্রি আর রমণী আর / অরণ্য আর দেশ / একটা শূলী এখন ও ....'' (শের জঙ্গ-এর ডেরায় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ঠাকুরমার ঝুলি' শিরোনামের কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিতান্ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষাজীবী, ঘুঁটে কুড়ুনি, পরমুখাপেক্ষি, প্রান্ত বর্গীয় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁকে আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখি সেই সব হতভাগ্য দেশবাসীদের প্রতি অসাধারণ দায়বদ্ধ শিল্পীরূপে। দেশের মন্ত্রী, কোটাল ও শাসকবৃন্দ অসহায় মানুষের প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন। এজন্য কবি কোটাল, মন্ত্রী ও শাসকের দীর্ঘসূত্রতা দেখছি, দেখব —ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন। কবিহৃদয় রক্তাক্ত হয়ে লেখেন —

"এ-দুয়োরে যায় : দূর-দূর ।

ও-দুয়োরে যায় : ছেই-ছেই।" (ঠাকুরমার ঝুলি / একটু পা চালিয়ে ভাই)

এই উপেক্ষিত, বঞ্চিত মানুষের সারল্য ও নিরীহ স্বভাব ধর্মের প্রকাশে কবি বলেন — "কাড়ে না কেউ রা / ভালো মানুষের ছাঁ।" এই অসহায় ভালোমানুষের রক্তে অধিকার আদায়ের লড়াই-এ সামিল হবার জন্য কবি বলেন — "ঢোল ডগরে পড়ে কাঠে / রক্তে হয় রাঙা মাটি।" 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র অন্তর্ভুক্ত সাত ভাইয়ের পারুল বোন, সুয়োরানী-দুয়োরানী উপাখ্যানের সমান্তরাল প্রান্তবর্গীয় মানুষের লড়াই সংগ্রাম অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণরূপে সামাজিক সংগ্রামে উন্নীত করেছেন কবি। এই কবিতায় তাঁর সমাজসচেতন, সংগ্রামী, সাম্যবাদী ও উচুঁ দরের জীবন দর্শনের নিদর্শন উপলব্ধ হয়।

আলোচ্য কাব্যের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কবিতা 'একটু পা চালিয়ে ভাই।' কবিতাটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত তিনটি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতাটিতে কবি জীবনকে দেখার বিশেষ আঙ্গিক সম্পর্কে লেখেন, মূলতঃ জীবন ও জগৎকে কে কিভাবে দেখে, কখন কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে, সেটাই তাঁর নিজস্বতা। সৃষ্টিতে, শিল্প-সাহিত্যে, জীবন ও জগৎকে যে যেমনভাবে রূপ দেবে। কবির বিশ্বাস মানুষের জীবন একদিন সব হিসেবের বাকি বকেয়া উশুল করে নেয়। ধান মানুষের ভোগ-সম্পদ সমৃদ্ধি সব কাজেই ব্যবহার হয়। আবার সেই ধান-জাত খই 'কাঁধে-তোলা খাটিয়ার আগে আগে ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া'র মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই শব যাত্রা কারো কাছে মুক্তি বলে বিবেচিত হয়, আবার সেই মৃত্যুই কারো কাছে জীবনের সবকিছুর ছেদ ও কারো কাছে 'দপ করে নিভে যাওয়া।' জগৎ-জীবন এবং দৃষ্টির পার্থক্য কবির ভাষায় "শঙ্খ লাগা সাপ যেমন একটি আরেকটিতে লগ্ন হয়ে থাকে / যেমন বানের মধ্যে থাকে পলি আর পলির মধ্যে বান। জীবনের যন্ত্রণা, ভালোবাসা, সংগ্রাম ইত্যাদি কোন্ বিষয় সৃষ্টিতে প্রাধান্য পাবে সেটা কবির মনের ওপর নির্ভর করে। কবির এই মনভূমি হচ্ছে সত্য নির্ভর। কবি সুভাষের সমাজ ও জীবন যেন সংগ্রাম করে এগিয়ে চলার পথ।

আলোচ্য কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর সৃষ্টি সত্ত্বার পরিচয় মেলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে এই কবিতার মধ্যে তাঁর লেখার বিশেষ প্রত্যয় উত্তরসুরীর হাতে অর্পন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যে বিশেষ প্রত্যয় দ্বারা জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি হবে আরো অনেক সাহিত্য, কবির এই মানস তাঁর লেখায় স্পষ্ট — ''আমার কাছে আছে অনেকদিনের পুরনো এক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র / আমার হৃদয়। / আমি সেটা কোনো আগন্তুককে দেব ব'লে / কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছি।'' কবি যে হৃদয় নিয়ে সৃষ্টির পথে চলার কথা বলেন, সেখানে — ''বছরে বারো মাস ভোঁচকানি-লাগা ক্ষিধে''— সেই পথে দেখা অসংখ্য নিরন্ন মানুষের হাহাকার। শোনা যায় আর্ত ও পীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি। তাঁরা মানুষের ও পা জড়িয়ে আছে একটু বাঁচার আশায়, কবির জীবন-জগৎ-প্রকৃতিকে দেখার বিশেষত্ব ধরা পড়েছে এই দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায়। সেখানে তিনি লেখেন —

''সকালবেলায় জানলার গরাদ ঠেলে ভেতরে আসে
হাসপাতালের রুগীর পোশাকে রোদ্দুর।
পাশ ফিরে দেখি
মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সকালের কাগজ।
সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে কাল আমার হাঁটুর বয়েসী একজনকে দেখে
বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গিয়েছিল —
চোখে একরাশ ঘুম নিয়ে
লোকটা কাজ থেকে ফিরছিল।
তার চোখের কোণ, নাকের ডগা,
লালা-ঝরানো ঠোঁট,
নখের ময়লার নিচে থেকে হাতের চেটো
সমস্তই কাগজের মতন সাদা।'' (একটু পা চালিয়ে ভাই / একটু পা চালিয়ে ভাই)

লেখার জন্য কাগজ হাতে নিয়েই কবির শ্রবণ যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয় ''মৃত সন্তান বুকে আঁকড়ানো মৃত মায়ের হাহাকার।'' সেখানে কবি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেন বেকার ছেলেদের ছটফটানি। একটা শ্রেণীর মানুষ ''দিনের আলোয় কালো দস্তানায় ঢাকা সাদা থাবা/ অন্ধকারে বার করে আনছে তার ধারালো নখ।'' এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা একটা শ্রেণী বঞ্চিত, শোষিত, উৎপীড়িত হয়ে চলেছে। তাদের আর্তনাদে কবি শোষক, শাসক, প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তোলেন

কবিতার মধ্যে। তাঁর 'একটু পা চালিয়ে ভাই' শিরোনামের কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটিতে বিশেষ এই জীবন প্রত্যয় ও সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করেছেন কবি স্বয়ং।

আলোচ্য সংকলনের তৃতীয় সংখ্যক কবিতায় কমিউনিস্ট পার্টির লেলিনবাদের স্রষ্টা লেনিনের জীবন্ত সত্ত্বাকে কবি তুলে ধরেছেন। লেনিন উচ্চ কণ্ঠে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান করে বলেন — ''শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে — / একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে।'' এই কবিতার নামই আলোচ্য কাব্যের শীর্ষনাম। কবিতা সৃষ্টির মূলে কমরেড্ লেনিনের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সংগ্রাম কবির সৃষ্টিশীল চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। এই লেনিনের মর্মর মূর্তি আমরা স্থাপন করে রেখেছি কলকাতা ধর্মতলায় ট্রামের গুমটির একপাশে। সেই মর্মর মূর্ত্তির জীবন্ত সত্ত্বার সঙ্গে অর্থাৎ লেনিনের চোখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পদাতিক কবি নিজের চোখে দেখেছেন — ''আস্তাকুঁড়ের ভাত একদল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে / ডাস্টবিনে হাত চালিয়ে দিয়ে।'' লেনিনের দৃষ্টিতে কবি দেখছেন ''গ্রামের এক লোক শহরে ডাক্তার দেখিয়ে সর্বস্বান্ত হতে এসেছিল/ তার আগেই তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেল / এক পকেটমার।'' কবি সুভাষ লেনিনের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করছেন — ''সন্ধ্যের মুখে যে মেয়েটাকে একটা ট্যাক্সি এসে / তুলে নিয়ে গিয়েছিল, / সন্ধ্যে গড়িয়ে গেলে হাই তুলতে তুলতে / সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায়।'' আর দেখছেন বাংলার সবদিকে আকাশ বাতাস উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে ''লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।'' সেই লাল নিশানের তলায় সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের উদ্দেশ্যে লেনিনের আহ্বান ''একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে ।।''

লাল নিশানের চলার পথে ও লাল নিশান নির্দেশিত মতে কোন ভুল নেই। এই বিশ্বাসে 'দিক ভুল' শিরোনামের কবিতায় নিতান্ত এক সাধারণ মেয়ে ও গ্রাম্য মহিলারও দিক ভুল হয় না। ঠিক পথেই তারা চলার শপথ নেয়। তারাও সংগ্রামী হয়ে ওঠে অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। খোঁপায় ফুল দিয়ে প্রশান্তিময় দিন গুজরানের মন আর তাদের নেই। তারাও আজ সংগ্রামের শরীক, যারা আজ তাদের ''বাড়া ভাতে ছাই দিল / পাকা ধানে মই / সেপাই এসে নিয়ে গেল / বাপ-দাদা কই।'' মনের তীব্র ক্ষোভ, অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাস যারা তাদের সর্বনাশ করল, যারা নিরুপায় মানুষের ওপর অত্যাচার করল — ''ওদের সঙ্গে যেন ফোঁড়ে / ওদের শকুনে যেন খোঁড়ে / পা ডুবিয়ে রক্তে / ব'সে আছে তখতে / আগে থেকে তৈরী আছে/ ঢুকবে কোন গর্তে।'' ওদের বিরুদ্ধে সেই গ্রাম্য সহজ সাধারণ মেয়েটিও সাহসে বুক বাঁধে। তাঁরা আজ দিক্ ভুল করবে না। ওদের দৃষ্টিতে আজ ''নিশান ওড়ে হাওয়ার তোড়ে / মিছিল এগোয় শহীদ মিনার।'' কবি সমাজের সাধারণ দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, তাঁতি, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষকে শ্রেণী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাহসে বুক বেঁধে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হবার আহ্বান করেন কবি সুভাষ।

কবি দিন বদলের ডাক দিয়েছেন আবার এক বিশেষ জাদুর জোরে দিন বদলে যাচ্ছে। যারা আজ দিন বদলের নৌকায় পাল তুলে ভেসে চলেছে তাদের লক্ষ্য সেই মোহানা — যেখানে কোন শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না, থাকবে না শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনা। 'বদলায়' শিরোনামের কবিতাটিতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিন বদলের ডাক দিয়েছেন। কবির রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যয় যে, সামাজিক পরিবর্তন এনে গণশক্তি এক সময় সমাজতান্ত্রিক সাম্য নীতি প্রতিষ্ঠা করবে। সাম্যচেতনা মানুষের কায়িক শক্তির ক্ষেত্রে ভাবিয়ে তুলেছিল কবি সুভাষকে। তিনি আলোচ্য কাব্যের সর্বশেষ কবিতা 'পাতাল রেল' শিরোনামে এক ষাট বছর বয়সী বৃদ্ধের দৃষ্টিতে ভোগবাদী মানুষের নানা চিহ্নকে দেখিয়েছেন — ''পুলিশের পায়ের কাঁটামারা বুট, ফুটপাথে ময়লা মিষ্টি মুখ।'' বৃদ্ধের এসব দেখার মধ্যে কবির অনুভূতিপ্রবণ মনের পরিচয় আমরা পাই। যেখানে অপেক্ষাকৃত কম বয়েসি ছেলের দলের লোভ ও স্বার্থ চরিতার্থতার নীতিজ্ঞানহীনতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কবি। এখানে তাঁর জগৎ, জীবন ও সমাজ ভাবনার বিশেষত্ব আমাদের নজরে আসে সহজে। কবি সুভাষ এখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক বিশেষ চেতনাপুষ্টি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী কাব্য 'জল সইতে'(১৯৮১) কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেছেন — প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে। গ্রন্থটি সর্বমোট ২৫টি কবিতার সংকলন। এরমধ্যে নাজিম হিকমত-এর একটি অনুবাদ কবিতা এবং রবার্ত রোজদেস্তবেন্স্কির তিনটি অনুবাদ কবিতা রয়েছে। এই কাব্যের কবিতাগুলি কবির ষাট-বাষট্টি বছর বয়সে রচিত। 'জল সইতে' কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় জল অশ্রু হয়ে আমাদের হৃদয়ে বেদনা ও করুণায় সিক্ত করে তোলে। কবি রাজনৈতিক গন্ডীর ঊর্দ্ধে রাজনৈতিক ব্যক্তিকে এক সর্ববন্ধনহীন জীবনের ডাক দেন 'জল সইতে' কাব্যের কবিতাগুলিতে। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি হল — 'বোবা কোকিল', 'হট্টাবাহার', 'তো', 'বোনটি', 'জীবনে প্রথম বসে আছি', 'হাওয়া', 'শেষ বাজি তঘুলক লেনে', 'আগুন লাগলে', 'খালি হাত', 'ছেলে ধরা,' 'দাড়াও পথিকবর', 'এক ঢিলে', 'এজেন্ট আবশ্যক', 'বিফলে মূল্য ফেরৎ', 'সুলভে গৃহশিক্ষক', 'রক্ষাকবচ', 'চিৎ', 'এইটুকু', 'একজন মানুষের খুব বেশি চাইনা', 'একটি সংলাপ', নাজিম হিকমত -এর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে জল সইতে এবং যাচ্ছি। এর মধ্যে 'এইটুকু', 'একজন মানুষের খুব বেশী কিছু চাই না' এবং 'একটি সংলাপ' শিরোনামের কবিতা তিনটি অনুবাদ কবিতা।

'জল সইতে' কাব্যের প্রথম কবিতা 'বোবা কোকিল'। কুহুঁ কুহুঁ ডাকে কোকিলের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। বোবা হয়ে গেলে সে কোকিলের বেদনা অসহণীয় হয়ে ওঠে। এই কবিতার শীর্ষনামে সেই বেদনা উৎসারিত। একজন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী, একজন সংগ্রামী কবিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাপটের কাছে শাসক দলের ভয়ে বাধ্য হয়ে কথা চেপে চলতে হয়েছে। এই চেপে থাকার বেদনা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে। রক্তাক্ত হয়েও আবার তাঁর অসংখ্য মানুষের অধিকারের দাবি নিয়ে সহসা উদ্ধত হাত মিছিলে উঁচিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে হয় কখনো কখনো। এই মানসে বৃদ্ধ কবি লেখেন —

''খুলে বুকের
সমস্ত খিল
খাঁচায় বন্ধ
বোবা কোকিল
হঠাৎ ডেকে ওঠে যদি. . . . . . . '' (বোবা কোকিল / জল সইতে)

আলোচ্য কাব্যের দ্বিতীয় কবিতার শীর্ষনাম 'হঁটাবাহার' এই কবিতাটিতে কলকাতার এক সময়ের ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করেছেন কবি সুভাষ। চোখের জল মুছতে মুছতে কলকাতার একসময়ের বিপ্লবকে স্মরণ করেন কবি — ''দেখ, বিনয়-বাদল-দীনেশ! /'' কব্‌জাহীন রং-চটা মরচে পড়া, টিনের তোড়ং, তিনপুরুষের পুরনো পাঁজি, তালপাতার ছেঁড়া হাতপাখা, মা-বাবার জীবনের একমাত্র ফটো, তেল-সিঁদুরে তোলা গুরুদেবের পায়ের ছাপ, ছেঁড়া নামাবলীতে জড়ানো লক্ষ্মীর পাঁচালী, পুরু কাঁচের খাপছাড়া চশমা, লোহার কাজললতা, হামানদিস্তা, কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঘোড়ায় চড়া নেতাজী, গালে হাতে দেওয়া সুকান্ত, ''ন্যাকড়ায় জড়ানো আঁশবঁটির পাশে শিলনোড়া / চটের ওপর লাল নীল সুতোয় ফুলতোলা আসনের ওপর / সাদা শাঁখ আর শ্বেতপাথরের খলনুড়ি'', মরা তুলসীর টব, উড়ন্ত ঘুড়ি, ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণ শান্তিকামী জীবনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কবি। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত জীবন-সমাজের ছবি আঁকতে কবি লিখেছেন — ''কেন না ঘুড়ি গুলোকে হটিয়ে দিয়ে / আকাশে মাথা তুলছে ভুঁইফোঁড় উঁচু উঁচু বাড়ি / ফুটপাথগুলোকে কোণঠাসা ক'রে / দুনিয়ার পায়ে দেশ বাঁধা দিয়ে / দুপাশে হাত পা ছড়াচ্ছে গাড়ির রাস্তা / মা-বাবকে দূরে হটাচ্ছে মামি ড্যাডি / দেয়ালে আশার বাণীগুলো মুছে / ফটকে নিয়নের আলোয় লেখা হচ্ছে / 'শুভ লাভ'।'' (হটাবাহার / জল সইতে)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'তো' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটিতেও পরিবর্তিত কলকাতা শহরের পরিচয় পাই আমরা। কবি আশঙ্কা করেছেন, কলকাতার রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি, পূর্বের তুলনায় অনেক

অভিজাত। যার জন্য আর্থসামাজিক জীবনও পরিবর্তিত হয়েছে। ঘর বাড়ির ট্যাক্স, বাড়ি ভাড়াও লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একশ্রেণীর মানুষ শোষিত, নিপেষিত হচ্ছে, আর একটি শ্রেণী কেবলই ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। এই উড়ে এসে জুড়ে বসা অবাঙালীদের দাপটে সেদিন কলকাতার আদি বাসিন্দা ও বাঙালীদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এদের কথায় কবি সুভাষ লেখেন —

"যারা ওঠে ফেঁপে ফুলে
মধু লোটে ফুলে ফুলে
তারাই আজ উড়ে উড়ে
এসে বসেছে শহর জুড়ে।" (তো / জল সইতে)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'বোনটি' শিরোনামাঙ্কিত কবিতাটিতে পিতৃহীন ও মৃত দাদার বোনটি ভীত-সন্ত্রস্ত। একা বোন দেখছে স্কুলের মাঠে সারি সারি কালো গাড়ী, যুদ্ধের ট্যাঙ্কের জমায়েত। সেই পরিবেশে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় সে কালে গ্রামীণ মোড়লরা বোবা-কালা হয়ে উঠেছিল। মানুষের বেদনা, হাহাকার তারা শোনে না যথার্থই। কেননা, শোনা বা জানার অনুভূতি ও উপলব্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। সমাজের মোড়লরাও ভূমিসংস্কার আইনে বর্গাদের দ্বারা দুর্বলশক্তিতে পরিণত হয়। ছোট বোনটিকে কবি দেখাতে চেয়েছিলেন — 'কার ধন /ক'রে রেখেছে দখল কে ?" প্রকৃত অধিকারী নির্দিষ্ট ক্ষেতের সেই কৃষক বর্গা। তাই বর্গার জমি এতকাল মোড়ল একাই ভোগ করে এসেছিল। তখন তা বর্গাদারদের হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিল বাম সরকার। অত্যাচার, পীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান কবি ঘরের ছোট্ট বোনটিকেও। অভয় দিয়ে দেশজ লাঠি, সড়কি, লঙ্কার গুড়ো দিয়ে লড়াই করার আহ্বান করেন কবি। কবি পিঠে বন্দুক নিয়ে সাইকেলে টহলরত যুদ্ধের সেনাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছোট্ট বোনটিকে বলেন —

"ঝোপের মধ্যে জলদি জলদি
গা ঢাকা দে, বোনটি ।
আমার আছে লঙ্কার গুঁড়ো
তোর রয়েছে সড়কি
আমাদের ভয়ডর কী ? (বোনটি / জল সইতে ভাই)

বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে কবি তাঁর কৈশোরের অনেক স্মৃতি ছবির মতো ফিরে পেয়েছেন, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি কবিতায় প্রতিফলিত তাঁর 'জীবনে প্রথম' শিরোনামের কবিতায়। জীবনে প্রথম আঁধারে জোনাকি দেখে রোমাঞ্চিত হবার অনুভূতি আলোচ্য কবিতার ভাষায় বন্দী হয়ে রয়েছে। একদিন

বিকেলে রামপুরহাট লোকাল ট্রেনে সোনাঝরা আকাশ মোড়ানো রোদে চলেছিলেন কবি। ট্রেনে হকারদের চা-পানি, আচারের সুগন্ধে জিভে জল এসেছিল কবির, ট্রেনে নানা বয়সের যাত্রীর নানা আলাপ। এবং সিঁড়ি বেয়ে চলার মতো তাঁর শব্দ বিন্যাস আলোচ্য কবিতায় বিশেষ মাত্রা যোজনা করে। কবি ট্রেনের যাত্রার কথা প্রসঙ্গে বলেন — ‘‘ছিন্ন ভিন্ন

বাংলা

বনবাসে যায়

দ্রুত ফেলে দিই

জানলা’’ (জীবনে প্রথম / জল সইতে)

চলমানতার মধ্যে একটা ভাঙনের ঐতিহাসিক ঘটনা নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আঁধারে নবপাশে গা ঢাকা ট্রেনে ছুটে চলার সঙ্গে হঠাৎ অবাক হবার দৃশ্য এবং জীবনের বহুপ্রতীক্ষিত প্রিয়জনের দেখা পেয়ে লাফিয়ে ওঠার উজ্জ্বল আবেগ এখানে ঘনীভূত হয়েছে। কবি এপ্রসঙ্গে লিখেছেন —

‘‘নিশ্ছিদ্র এ আঁধারে দেখেছে

জীবনে প্রথম

জোনাকি।’’ (জীবনে প্রথম / জল সইতে)

জীবনে প্রথম আলোর সন্ধান এবং বিস্ময়কর উপলব্ধি কবিতাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। এর পরের ‘ব’সে আছি’ শিরোনামের কবিতাটিও নিতান্ত সাধারণ বিষয়ে লেখকের শব্দ বিন্যাস, শব্দের অর্থগত প্রয়োগ এবং উপলব্ধি প্রকাশ দক্ষতায় উচ্চ শিল্প নিপুণতার পরিচয় রেখে গেছেন। বঁড়শিতে করে মাছ ধরার বর্ণনামূলক কবিতা এটি — ‘‘ফাৎনাটা সেখানে / ডুবলে / সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেয়ে যাব। / তাই আমি / হাত-টাত ধুয়ে — / গ্যাঁট হয়ে ব’সে আছি / ফাৎনাটা ডুবলেই / টানব।’’ (ব’সে আছি / জল সইতে)

এই ফাৎনাটায় যখন হাজারটা চোখ লাগিয়ে রাখার কথা বলেন কবি তখন তাতে একটি ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়। তখন সেই একটি লক্ষ্যে সামাজিক হাজার মানুষের স্থির প্রতীক্ষার কথা বলেন কবি। আর সেই বড়শি হাতে লোকগুলোর চোখে কবি যখন সেই ফাৎনা ও জল ছবি দেখেন তখন আমরা একটি ভিন্ন লক্ষণ যুক্ত শব্দ পাই। এরপর ‘হাওয়া’ শিরোনামের কবিতাটি নিতান্ত সাধারণ কথা নিয়ে রচিত। কবি উপলব্ধি করেছিলেন সমকালের একটি বিশেষ ধর্ম। তিনি বলেন ‘‘পরে এসে/আগে চলে যাওয়া / এখন / উঠেছে কী সে হাওয়া’’। কবির জন্ম সূত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সত্ত্বার সম্পর্ক।

সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্ত শরীর মনে শুয়ে পড়েন তিনি। এক সময় কাজী তাঁর শিয়রে বসে থু থু দিয়ে বলে — 'মর পাজী'। এখানে ধর্ম বিদ্বেষ ভাবনা তার সৃষ্টির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

একদিন কবি এক ভিখারীর কাছে প্রতারিত হয়েছিলেন। এই প্রতারণার ফলে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই তাঁর 'শেষ বাজি' কবিতার উৎস। কাহিনী মূলক কবিতা এটি। কবি শেষবারের মতো সেই ভিখারীটিকে দেখেছিলেন লেক-মার্কেটের সামনে। পেটে সামান্য দানা-পানি দেবার উপলক্ষে সে কবির কাছ থেকে একটি টাকা ভিক্ষা নিয়েছিল। এরপর সেই টাকাটা নিয়ে লেক মার্কেটের সামনে যা করে তাতে কবি স্তম্ভিত — ''বিশ্ব দুনিয়াকে যেন ট্যাঁকে পুরে ফেলেছে

এমনি একটা ভাব ক'রে

সে

লটারির টিকিট কিনছিল।'' (শেষ বাজি / জল সইতে)

এই দৃশ্য দেখে কবির মনে হয়েছিল একবার যে ভিখারীর হাত মুচড়ে তিনি টাকাটা কেড়ে নিয়ে আসেন। উপরন্তু সেই ভিখারীর মাথা উঁচু ক'রে সদর্পে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে তিনিই কেমন যেন চুপসে যান। এরপর সেই লোকটি কী করেন তা খেয়াল করার জন্য তিনি আড়ালে দাঁড়ালেন। বরং কবির দিকে ফিরে তাকানোর সময় সেই লোকটির চোখমুখের চেহারাই আলাদা হয়ে যায়। এরপর ''পাশেই দামী দামী সব জিনিসের দোকান, / শো-কেসের সামনে গিয়ে / সে দাঁড়ালো।'' তাকে দেখে কবির মনে হয়েছিল সেই লোকটি যেন ইচ্ছে করলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডই কিনে নিতে পারে, এমন ভাব দেখিয়ে গটগট করে রাস্তা পার হয়ে লোকটি কবির দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। সেই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, সেই ভিখারীটি এরপর এলে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু এরপর আর সেই লোকটি কোনদিন আসে নি। এই বিচিত্র স্বভাবের ভিখারীটি কবির উপলব্ধিতে একটা আঘাত নিয়ে আসে। মানুষের জীবন ও স্বভাব সম্পর্কে বিশেষ একটি অভিজ্ঞতার ফসল ''শেষ বাজি'' কবিতাটি। রাজনৈতিক চেতনার সীমারেখার বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর কবিতাটির মধ্যে কবির প্রকাশ দক্ষতা ও ছন্দ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। ভাষা প্রয়োগ ও ধ্বনি সংস্থাপনের স্বকীয়তার পরিচয় রয়েছে কবিতাটিতে।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'তঘুলক লেনে' শিরোনামের কবিতাটিতে কবি অল্প কথায় ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশ ভঙ্গিমায় আত্মোপলব্ধি ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে বীর ভারত সন্তান দেশ স্বাধীন করে। ফলে আমরা এবং আমাদের চোখের ''সামনে আশা, /বলিষ্ঠ হাত /টানছে রথ।/ অন্ধকারে জ্বলছে আলো/ নিদ্রাহারা,

ফটক খুলে /পাহারা দেয় / ফুলের চারা।'' একসময় আমাদের চোখে চোখে বন্দী করে সতর্ক পাহারায় রাখত ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের সেনা। আজ আমরা স্বাধীন। সেই পাহারা ও শাসন আজ ফুল হয়েছে কবির চেতনায়। আমরা আমদের রাজধানীকে ''সুরকি-চুনে / হৃদয় গাঁথা।/ ধরানো রং'' দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি। এইসব সম্ভব হয়েছে অসংখ্য দেশবাসীর বুকের রক্ত দানের দ্বারাই। মহাকাশে ভারতের উচ্চ স্থান। বিভিন্ন আবিষ্কারে ভারতের উচ্চ স্থান। কমিউনিস্ট গণ আন্দোলনে আজ স্বাধীন দেশবাসী লাল পতাকার নিচে চাঁদকে হাতের মুঠোয় ধরতে সক্ষম। তাই কবি লিখেছেন —

''নীল আকাশে তুলেছি ছাদ।
লাল নিশানে
ধরছি সূর্য
ধরছি চাঁদ।'' (তঘুলক লেনে / জল সইতে)

এই কবিতা বিশ্লেষণে আমরা কবির দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সৃজনশীল চেতনার দৃষ্টান্ত সহজেই উপলব্ধি করি পারিবারিক ঘটনাকেন্দ্রিক ব্যক্তিক উপলব্ধিজাত কবিতা 'আগুন লাগলে' বর্ণনা মূলক প্রকাশভঙ্গিতে কবিতাটি রচিত। কবি লিখেছেন — ''কিসের একটা পোড়া পোড়া গন্ধ / হাওয়ায় / কিসের যেন একটা হল্কা / আমি লাফ দিয়ে উঠে প'ড়ে চেঁচালাম ; আগুন/দৌড়ে এসো, / আগুন! / মনে প'ড়ে গেল, বাড়ীতে আমি একা। / চাবির ঘরে / অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার নাতনী / আর কেউ আসার আগে / একাই একশো হয়ে / আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেই আগুনে।'' এই দুর্ঘটনা থেকে একটি ফটো স্মৃতির চেতনালোকে কবিকে আঘাত করে। সেই কবেকার পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া ফটো দেখলে হৃদয় মোচড় দিয়ে নাকের ডগাদুটো একটু ফুলে উঠে বুকে অশ্রুর ঢেউ উপছে পড়তে চায় তাঁর। সেই স্মৃতি তাঁর মনে পড়লে আজও গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই ঘটনা তাঁর চেতনালোকে সমস্ত হৃদয় জুড়ে কতক গুলো সারবদ্ধ পিঁপড়ের মতো অক্ষর হয়ে কথা বলে । তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন কিংবা একটা ঘোরের মধ্যেও ''জলের তলা থেকে/ হাঁকুপাঁকু ক'রে ভেসে'' ওঠে সেই দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর স্মৃতি। কবি অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় একটি পারিবারিক ঘটনাজাত ব্যক্তিক উপলব্ধিকে কবিতার রূপ দিয়েছেন এখানে।

'জল সইতে' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'খালি হাতে' শিরোনামের কবিতাটি কবির ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক। বার্ধক্যে কবির শারীরিক শক্তি লোপ পেতে থাকে। তাঁর শারীরিক অক্ষমতার যে উপলব্ধি তার পরিচয় পাই 'খালি হাতে' শিরোনামের কবিতায়। এখানে কবির ''ঝিঁ ঝিঁ ধ'রে / পা দুটো অসাড় হয়ে আছে; / কেউ ডাকলে / উঠে দরজা খুলতে আমার একটু সময় লাগবে।'' তিনি লেখেন যে,

আমি ‘‘আঙুল গুলো মুঠো ক’রে রেখেছি / খিল ধরার ভয়ে। / প্রতিশ্রুত কয়েকটা রেখা ছাড়া / এখন আমার হাত্তে সত্যি বলতে, / আর কিছুই নেই।’’ এখানে তার হাতে ‘সত্যি’ শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তি এবং নিহিত ভিন্ন অর্থ সত্য বলার মত শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নেই। সে সত্য বলার দায়বদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কবি।

নিতান্ত সাধারণ একটি চাক্ষুষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত ‘ছেলে ধরা’। এই কবিতাপাঠে দুটি বিষয় পাঠকের হৃদয়ে প্রথমেই নাড়া দেবে। প্রথমটি কবি হৃদয়কে প্রত্যক্ষ সাধারণ কাহিনীকে কবিতা সৃষ্টির উৎস হয়ে আসা। দ্বিতীয়ত এই কবিতার স্টাইল। কবিতাটির শুরুতে কবি লিখেছেন ‘‘আমাদের পাড়ায় সেদিন হৈ -হৈ কান্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার। / হঠাৎ শোরগোল উঠল ; ‘ছেলেধরা’! ‘ছেলেধরা!’ শুনেই / তো আমরা লাঠি সোঁটা নিয়ে, আস্তিনের হাত গুটিয়ে / হুড়মুড় ক’রে সব বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।’’ ছেলেধরা হিসেবে একটি লোককে বিবেচনা করে তাকে অমানবিক ভাবে পিটিয়ে, কালি মাখিয়ে সাজা দেয় একদল মানুষ। তারা সেই ছেলেধরার ঝুলি হাতিয়ে পায় মড়ার মাথার খুলি, দুপাটি জুতো, কোমরে বাঁধার ঘুনসি, রবারের বল, মহিলাঘটিত দু-একটা টুকিটাকি ইত্যাদি। এসবের সঙ্গে কবি একটি বিষয় যুক্ত করে মোচড় দিয়ে সাধারণ মানুষের হুজুগকে ক্ষণিকে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেন। সেটি হল ‘‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা ‘বর্ণপরিচয়’।

কবিতাটি শেষ স্তবক দুটিতে লেখকের দায়বদ্ধ সামাজিক চেতনা একটু ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক ভাষায় ফুটে উঠেছে। কবি লিখেছেন — ‘‘আমরা যারা সেদিন চুটিয়ে হাতের সুখ করেছিলাম, সেই / কয়েকজন মস্তান বাদে, আর সকলের কাছেই / বুঝতে ভুল হওয়ায় ব্যাপারটা হয়েছিল সাতিশয় / দুঃখের। তাছাড়া একটু ভয়েরও- / কেননা, যারা কালি মাখিয়ে মাখিয়ে লোকের / মগজে দ্যাখ-না-দ্যাখ্ কাগজ পুরে দেয়, তারা তো, / কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আর যাই হোক সব/ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়!’’এখানে মানুষটি অস্বাভাবিক,বিকৃত-বা চিত্ত বিকারগ্রস্থ হলেও মানুষ অনুভূতিশূন্য হয়ে তাকে পীড়ন করতে দ্বিধা করে না। এই সাধারণ ঘটনায় কবির উন্নত জীবনদর্শন ও দায়বদ্ধ শিল্প চেতনা ফুটে উঠেছে।

জীবন চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পমানস, সামাজিক সাম্যচেতনা ও সমব্যথী মানসচেতনার কবিতা ‘‘দাঁড়াও পথিকবর’’। এই কবিতার শুরুতে কবি লিখেছেন : ‘‘পিঠ পেতে আছে / দেয়াল / হাত পেতে আছে / ভিখিরি — / কে ঘোচাবে বলো / এ হাল?’’ কবির এই হাল ফেরানোর জিজ্ঞাসার মধ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান! কবির উচ্চকিত কণ্ঠে ঘোষিত দৃঢ় প্রত্যয় — ‘‘কালবেলা দাও

/ কাটতে / দাঁড়াবার আগে / ওনারা / শিখছেন সবে / হাঁটতে — / দেখো, ঠিক বুলি /ফুটবে।'' (দাঁড়াও পথিকবর / জল সইতে)

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আহ্বান জানান সব স্তরের মানুষকে। কবি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় যুক্ত করেন তাঁর লেখনীতে। এই ভাবনার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'এক টিলে' শিরোনামের কবিতাটিতে। একটি ছোট্ট কবিতা এটি। এই কবিতায় কবি সুভাষ লেখেন —

''মাটিতে পড়ে না
পা ব'লে—
গদি থেকে গেছে
তাহলে
এগোনো যায় না
দু-পা কি।'' (এক টিলে / জল সইতে)

পরিবর্তনমুখী সময়কে কবি ধরার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ''বত্রিশ সিংহাসন'' শিরোনামের কবিতটিতে। কবি ভালোবাসেন মাটিকে, মাটির মানুষকে। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শাসন তাঁর অসহ্য। কবি বলেন —''আগে ছিল মাটির তলায়, / সে একরকম ভালো, / এখন ভাসছে চোখের ওপর — / বড্ডই জ্বালালো!'' শাসক , ভোগবাদী ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কবি বিক্ষুব্ধ। তাই তিনি বলেন তাদের ''গলা গুলো কী ভয়ানক! / খিঁচিয়ে দাঁত বত্রিশ পাটি ভয়ানক দাঁত এবং ''ধারালো নখ'' বের করার শব্দ ব্যবহারের মধ্যে কবির প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পাই। সেই অপশাসন, সন্ত্রাস, অত্যাচারী ব্যুরোক্র্যাসীর পরিবর্তনে জনসাধারণের শাসনকে আহ্বান জানান কবি। তিনি বলেন — সিংহাসনে 'বসুক এসে রাখালের পো।''

বিজ্ঞাপনের প্রচারধর্মী কবিতা আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'এজেন্ট আবশ্যক।' হাস্যরসাত্মক রীতিতে রচিত কবিতাটির বিষয়। কবিতায় স্রষ্টার লক্ষ্য আদর্শহীন, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যক্তি। রচনার অনুপম শিল্প কুশলতায় সরস ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি হুকারদের প্রতিনিধিত্বমূলক কবিমনের সৃষ্টি। কবি লেখেন — ''একজোড়া / পদ্মলোচন চশমা / এ চশমা পরামাত্র / সমস্ত চক্ষুলজ্জা / দুর হ'য়ে যায়। / দলীয় বা নির্দল, যাই হোন, / মনের খুঁত খুঁতুনি কাটিয়ে দিয়ে / এই পদ্মলোচন চশমা / আপনাকে শতদলে/ বিকশিত করবে।'' কবি সেই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন চশমা বিক্রেতা এজেন্টের আবশ্যকতা জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের ভঙ্গিতে বলেন —

''এ চশমা চোখে থাকলে

আগে বা পরে,
দিনের আলোয় বা রাতের অন্ধকারে,
সামনা সামনি বা পিছন ফিরে
যে কোনো সময়ে
স্বচ্ছন্দে দল বদল করতে পারবেন।
কিংবা হেসেখেলে
যে কোনো ভারী দলে ভিড়ে যেতে পারবেন
. . . .
ফলে, কামাবার সময়
আদর্শের বা
আরশির দরকার হবে না।''   (এজেন্ট আবশ্যক / জল সইতে)

রাতারাতি মূল্যবোধ ও আদর্শ বির্সজন দিয়ে যারা দল বদল করেন, যারা মুনাফার জন্য পার্টি করেন এবং আদর্শহীন ভাবে কেবল মানুষকে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা করেন সেই সব দলীয় ব্যক্তিত্বকে সরাসরি আঘাত করেন আলোচ্য কবিতায়। এই কবিতায় নিঃস্বার্থ উদার জনহিতৈষী শিল্পী মনের নিদর্শন রেখেছেন।

কবির চশমা বিক্রির বিষয়ের মতো বিংশ শতাব্দীর শেষতম বিষয়সুলভ হাতঘড়ি বিক্রির হুকারী বিজ্ঞাপনের প্রচারধর্মী কবিতা ''বিফলে মূল্য ফের।'' ঘড়িটির নাম ও ঘড়ি পাবার ঠিকানাও কবিতায় উল্লেখ করেছেন কবি। নাম 'বেদম হাতঘড়ি' এবং পাবার জন্য লিখতে হবে 'জলন্ধর ৪২০৪২০' — এই নাম ও ঠিকানাতে কবি হাস্য রসাত্মক বোধের পরিচয় দিয়েছেন। হাতে ঘড়ি অফিস কর্মীর দেরিতে অফিস আসা, হাতে ঘড়ি বাবু শ্রেণী মানুষের ভদ্র সেজে অপরের বারো বাজিয়ে দেবার বিষয়টি এই কবিতায় তীর্যক ব্যঙ্গ দ্বারা কষাঘাত করেছেন কবি সুভাষ।

কালজয়ী হওয়ার এবং সময়কে নিজের দাস করার উপায় এই কবিতায় উল্লেখ করেছেন কবি। তাঁর কথায় — ''এ ঘড়ি হাতে দিলে / সমস্তক্ষণ / সময় আপনার মুঠোয় / চিরদিন / আপনারই মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবে। / আপিসে লেট হবে না, / যখন খুশি / আসা /এবং যাওয়া যাবে। / . . . . . এর বাড়তি সুবিধে— / যখন তখন / যে কারো চোখের ওপর / বারোটা বাজিয়ে দিতে পারবেন।'' (বিফলে মূল্য ফেরত / জল সইতে) সামান্য বিষয়ের সঙ্গে কবির শুভ চেতনা বোধের জাগরণ, নিয়মানিষ্ঠ আপিস কর্মীর কর্তব্যজ্ঞান ও উচ্চ জীবনদর্শন হাস্য রসের সঙ্গে অসাধারণ শিল্প কুশলতায়

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় আপিসে 'যখন খুশি'/ আসা / এবং যাওয়া'' যে কোনো মানুষের 'বারোটা বাজিয়ে' দেওয়ার ইঙ্গিবহ তীর্যকাত্মক ধ্বনি সংস্থাপন করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

জীবনের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্কহীন মূল্যবোধহীন, পুঁথিগত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নোটবই ভিত্তিক শিক্ষালাভ, টিউশন ব্যবস্থা — এই সব কিছুকে কবি বর্জন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'সুলভে গৃহশিক্ষক' শিরোনামের কবিতাতে। এই কবিতায় পাঠ্য বই শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানুষ গড়তে কিভাবে সহায়তা করে কবি ইতিবাচক ভঙ্গিতে সেকথা বলেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কেবল পরীক্ষার গন্ডী পার হয়ে কতগুলো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা নয়। জীবন যে শিক্ষাকে আত্মীকরণ করতে সক্ষম নয় তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাবে না। এই সুলভ গৃহশিক্ষকের বর্ণনায় কবি লেখেন —

''পরীক্ষার আগে
খুব সুবিধাজনক শর্তে
ভাড়া পাওয়া যায়
মুখস্থ বিদ্যার অসাধারণ পারদর্শী
বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদকধারীদের সযত্ন তত্ত্বধানে
বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত
টিয়া ময়না কাকাতুয়া।'' (সুলভে গৃহশিক্ষক / জল সইতে)

দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গীতে কবি বলেন এই সুলভ গৃহশিক্ষক অভিভাবকদের 'ছেলেমেয়েদের হাতে হ্যারিকেন ধরাবে। সুলভ গৃহশিক্ষক ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা পাশ গ্যারান্টি করে'। তথাকথিত অসার শিক্ষাব্যবস্থাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এই কবিতায়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের প্রকৃত শিক্ষায় জীবন গড়ার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কবির আলোচ্য কবিতা সৃষ্টি।

'রক্ষাকবচ' শিরোনামের কবিতাটিতে চরণান্তিক মিলযুক্ত ধ্বনিতে সামাজিক সাম্য বজায়ের জীবনের আদর্শের শিল্পরূপ দেন কবি। এই কবিতায় তিনি বলেন ঝেঁটু সিংয়ের আজ্ঞায়, জগুবাবু ও মা-ঠাকরুণের আজ্ঞায় নিচুলার ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। তারা তাই বলেন —

''নীচের লোক থাক নিচে।
পিছের লোক থাক পিছে।'' (রক্ষা কবচ / জল সইতে)

দখলদার, জমিদারীর জমিদারিত্ব, পুলিশ প্রশাসনের দৌরাত্মে অনেকেই ভিটেমাটি ছাড়া, সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। কবি এই সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষকে রক্ষা করার তাগিদ উপলব্ধি করেছেন।

সংগ্রাম, ঐক্যবদ্ধ জীবন, জনচেতনা ও পরিবর্তনশীল মানসিকতা মানুষকে রক্ষা করবে। এসবের গুনে মানুষ টিকে থাকবে; কেউ তাদের হটিয়ে দিতে পারবে না।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'চিৎ' শিরোনামের কবিতায় জীবনের চরম সত্যকে শিল্পরূপ দান করার প্রয়াস নেন কবি সুভাষ। তিনি এক বৃদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য বিষয় এই কবিতায় শিল্পরূপ দান করেন। বৃদ্ধের জীবনের বেলা বয়ে গেছে, সে চোখেও দেখেনা।, কানেও শোনে না। কিন্তু তার রসনার তৃপ্তি পূরণ হয় না কখনো। সে ভোগ বাসনা, লোভ থেকে মুক্তি পায় না। সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডানা-কাটা পরী, মদ-মাংসের ভোগ বাসনা থেকে মুক্তি পায় না। কবি মানুষের ভোগ-বাসনা-লোভ-কাম-ক্রোধকে মানুষের সমস্ত যন্ত্রণার মূল বলে মনে করেন। এমনি এক বুড়োর জীবনের কথায় কবি 'চিৎ' কবিতায় লেখেন — ''বললাম বুড়ো, বঁচে করবে কি ? / চোখেও দেখনা, / কানেও শোনো না। / বুড়ো হেসে বলে, / 'আর সব মেকি / জীবনের সোনা আসলে রসনা।'/ ডানা-কাটা এক পরী এল ঘরে / ভরল পাত্র / মদ ও মাংসে, / বুড়োকে ডাকতে গিয়ে/ চাপা স্বরে/ দেখি চোখ তুলে চিৎপটাং সে।''

আলোচ্য কাব্যের নামকবিতায় কবির শিল্প প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক চেতনা। কবি মানুষকে সুখে ও শান্তিতে রাখতে চেয়েছেন। নিজের কষ্ট বুকে চাঁপা দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন — ''দেখে যাতে তোমাদের কষ্ট না হয়,

চোখে যাতে ভালো লাগে
তার জন্যে
আমার বুকে বেঁধানো সমস্ত কাঁটায়
আমি গুঁজে দিয়েছি
একটি করে ফুল —
তোমরা হাসো।'' (জল সইতে / জল সইতে)

কবিতা শুনেও যাতে মানুষ আনন্দ পায় সেজন্য নিজের বুকের কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কবি বুক ভাসানো কান্নাকে আনন্দের উপাদান করে তুলেছেন। কবি নিজের আত্মকথা বলতে গিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন — 'আগুনে তো অনেক পুড়েছি / এবার যাব জল সইতে। / নোঙর তুলে ফেলেছি গাঙ থেকে দরিয়ার দিকে / কে য্যানো আছে, / আমার গলুইয়ের মুখ।'. কবি জীবনের পথ চলার সঙ্গে যে সব উপাদানকে সঙ্গে নেন তাতে তার প্রকৃতি সহজেই অনিমান করা যায়। তিনি নিজেই বলেছেন, ''সঙ্গে নিয়েছি চালচিঁড়ে / হুঁকো তামাক / আর মাছ ধরার জাল /........ ঘর-বার

সমান রে বন্ধু / আমার ঘর ও বার সমান।'' পথকেই কবি জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছেন। আবার ঘরেই তিনি চলার পথকে টেনে এনেছেন। কবি এভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে সমষ্টির গোষ্ঠী জীবনে রূপ দিয়েছেন। কবি তাই লিখেছেন — ''একটু ক'রে ঘটে ভরি / আর কাপড়ের খুঁটে গেরো দিই। / পিটুলিতে গড়া সুখ সোহাগের ছবি ছাঁদে / সব পেয়েছির নয় / সবাই পেয়েছির দেশ গো!''

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ মৌলিক কবিতা 'যাচ্ছি'। কবিতাটি প্রসঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লেখেন — ''গত কয়েক বছরে সুভাষদা গুটি কয়েক সাংঘাতিক কবিতা লিখেছেন ; তার মধ্যে দুটো লেখার কথা আমাকে বলতেই হবে। প্রথমটি 'যাচ্ছি' আর দ্বিতীয়টি 'একটু পা চালিয়ে ভাই'। 'যাচ্ছি' কবিতার মধ্যে এমন একটা চাপা বিদায়ের সুর আছে, যা খুব কম কবির হাত দিয়ে বেরোতে পারে। কবি 'যাচ্ছি' কবিতায় লেখেন — ''ও মেঘ

ও হাওয়া

ও রোদ

ও ছাওয়া

যাচ্ছি'' (যাচ্ছি / জল সইতে)

আট পৃষ্ঠার এই কবিতা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। নয়তো লেখাই যেতো না। ও দেহ, ও প্রাণ যাচ্ছি।' পড়তে পড়তে গোটা কবিতাটি একটা মন্ত্রের মতো লাগে। আলোচ্য কবিতায় তিনি গ্রহণ করেছেন মেঘ, হাওয়া, রোদ, ছায়া, সাজি, মাঝি, জোনাকি, পাখি, সুতো, জামা, জুতো, পান, মমতা, টান, চোখের চাওয়া, মাটির দাওয়া, ছাদ, সিঁড়ি, কাঠের পিঁড়ি, স্মৃতি, আশা, কুয়াশা, উনুনের মাটি, শীতলপাটি, গরু মহিষ, ধানের শিষ, জল, ঝড়, সাপ, পুন্যি, পাপ, কাজল লতা, পুরনো কথা, উঁচু নিচু, সু চুম্বন, বাহুবন্ধন, বোমা বন্দুক, পিছন, সুমুখ, বাংলাভাষা, রবিঠাকুর, শীত বসন্ত, আদি অন্ত, বই খাতা, আঁকা, লেখা, মিল ছন্দ, খোলা বন্ধ, ভালো, পাজী, ঈদের চাঁদ, সাধ আহ্লাদ, গাড়ির চাকা, মিছিল, পতাকা, জলদি আস্তে, হাতুড়ি, কাস্তে ইত্যাদি সব কিছুকে কবির জীবনের উদার চিত্তে আহ্বান জানানো হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। এসবের মধ্যে কবি সুভাষের উদার উচ্চ আদর্শের ও উৎকর্ষ শিল্প প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ বয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ''চইচই-চইচই''(১৯৮৩)। কবি এই কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর তিন কন্যা পুপে, তোতা ও পাপু --- কে। সর্বমোট ৫০ পৃষ্ঠার ২২টি কবিতার এই সংকলনটি প্রকাশের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন করেন শৈবাল মিত্র মহাশয়। এই কাব্যটি রচনাকালে কবি সুভাষের শিল্প

মানস কয়েক জন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সমালোচক অরুণ সেন এ সম্পর্কে লেখেন — ''বোঝা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তলে -তলে একটা বদল ঘটে যাচ্ছে। সহজ বিপ্লবী আশাবাদ থেকে তিনি গড়ে তুলতে চাইছেন মনের ভেতরকার জোর। ষাটের দশকে সত্তরের দশকে আশির দশকে সেটাই যেন তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠে ক্রমশই দুর্বহ।'' (অরুণ সেন, ''চল্লিশের পঞ্চাশের কবিতা'','কবিতার দায় কবিতার মুক্তি', প্রতিক্ষণ,১৯৮৫ পৃ: ১২৭)।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে সমালোচক প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে লেখেন — ''মুখের ছিপ ছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করতে পারেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁর উজ্জ্বল, বর্ণিত শব্দের শাণিত ব্যবহার বাঙলা কবিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্য একটি তুলনা দেয়া চলে : তাঁর কবিতার শব্দ ছিপনৌকোর মতো কবিতাটিকে নিয়ে দৌড় দিতে পারে, কোথাও গুরুভার হয়ে পথ জুড়ে থাকে না। ইমেজিষ্টদের জন্যে লেখা পাউন্ডের সেই বিখ্যাত ফতোয়ায় এই গুণটির উল্লেখ ও সমর্থন আছে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাকালে এই গুণটির বিবর্তন লক্ষণীয়।.............সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আরো একটি গুণ ছিল তাঁর মানবিকতা বা মানবিক সমবেদনা। তিনি সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান না - তিনি চান মানুষের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকতে।'' (প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ''চল্লিশের কবিতা'', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক কবিতার ইতিহাস ,১৯৮৩ পৃঃ ১২৮)

সমালোচক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আলাপ চারিতায় মাননীয় কালীকৃষ্ণ মহাশয়কে বলেন — ''আমি এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব কাছাকাছি থেকেছি। দলের মধ্যে থেকেও উনি খুব একা মানুষ, নিঃসঙ্গ। আমার মনে হয়, সুভাষদার দলের সঙ্গে তাঁর যে বোঝাপড়া...................স জায়গা গুলোতো তাঁর যে অতৃপ্তি রয়েছে তাই ফুটে উঠেছে তাঁর শেষ বইতে........... অথচ ওঁর যে ইমেজটা তৈরী হয়েছে ''ফতোয়া দেবার কবি'' সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে পারছেন না উনি....................... এই দুটোর ভাঙাচোরার ভিতর থেকে একটা উত্তরণ নিশ্চয় ওঁর বেরিয়ে আসবে, আসছে.......................''। ('শিকড় , সংলাপ', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত , ঘুর্ণিস্রোতে, সৃজনী সংরাগে, প্রতিভাস,১৯৯১, পৃ: ১৮৪)।

'চইচই-চইচই' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দেয়ালে লেখার জন্য'। আলোচ্য কাব্যের অন্যান্য কবিতাগুলি হল — 'সুখটান', 'মাঝ রাস্তায়', 'অন্ধকার গিলে খাচ্ছে', 'গুরুভাই', 'এই যে', 'অন্ধকারে', 'খেলা,' 'ভানুমতীর খেল', 'চিৎ', 'মুখরোচক', 'গৃহস্থ, হও', 'জল নেমে গেলে পলি', 'চইচই -চইচই', 'অগত্যা', 'পেয়াঁজি', 'ছবির মতো', 'তোমার যদি কম হয়', 'কেল্লা', 'নয়-ছয়', 'নাটকের গান', 'লাতভিয়ার', 'লোকমুখে' এবং 'যুদ্ধের পর : অন্ধ শিল্পীর ছবি দেখানো'।

'চইচই-চইচই' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় খেটে খাওয়া, সৎ পথে রোজগার করা, সাধারণ গ্রাম্য জীবন ও অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, দায়িত্বহীন, নিজকর্তব্যশূন্য মার্জিত ঝাঁ চকচকে নাগরিক জীবনের বৈপরীত্য এঁকেছেন কবি। এই কবিতায় শহুরে তোষামুদে, ঘুষখোর, আপিসের কাজ ফাঁকিতে পটু নাগরিক জীবনকে কটাক্ষ করেছেন কবি। যারা আপিসে কাজ না ক'রে বাঁ হাতে কামায় সেই সব সমাজ শত্রুকে আঘাত করেছেন কবি। সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিকৃতিকে কবি সহজভাবে সাধারণ ভাষায় বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই কবিতায় লিখেছেন — ''ভোটের আগে কী যে সজ্জন

ভোটের পর কী যে গর্জন।।

এদিকে পান্ডা সর্বহারার।

কুড়োন টাকা বাড়ি ভাড়ার।।'' ('দেয়ালে লেখার জন্যে / 'চইচই -চইচই')

'চইচই -চইচই' কাব্যের দ্বিতীয় কবিতার শীর্ষনাম 'সুখটান'। জীবনের ক্ষত পুরস্কার, প্রতিদান, সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে মিশে যায় না। এই কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের সিগারেট পানের সুখটানের আমেজ কবিতার অঙ্গ হিসেবে বর্ণিত। এখানে মানুষের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভের গর্বের করুণ পরিণতির শিল্পিত রূপদানের প্রয়াস লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এখানে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের দ্বারা জাদু মন্ত্রের মতো, সবকিছু বদলে দেবার ক্ষমতা প্রদর্শনের কুৎসিত ছবি এঁকে দেখিয়েছেন কবি সুভাষ। যেখানে মানুষের কোনো জায়গা নেই, মানুষের ভালোবাসা নেই - কেবলই খ্যাতি, যশ, প্রতিষ্ঠা অর্থ, সেখানে একটু খোলস ছাড়ালে দগদগে ক্ষত চিহ্ন বাস্তবে উঠে আসে। কবি নিজের হৃদয়ের দুঃখ, বেদনা, হতাশা আর অপ্রাপ্তির জ্বালা বুকে নিয়ে অন্ধকারে কলম ডুবিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর বুকে রয়েছে আগুনের তাপ। সেখানে আলো ও আলতো ফুলের স্পর্শ বেদনা হয়ে শেকল -ভাঙার দাগ ও সারা গায়ের হাজারটা কালশিটে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আলোচ্য কাব্য রচনার কালে কবির পথ চলার একাকিত্বের ছবি ফুটে উঠেছে 'মাঝ রাস্তায়' শিরোনামের কবিতায়। এখানে কবির পথ চলার সর্বদিকে যেন অসহ্য প্রতিবন্ধকতা। সেখানে কবির উপলব্ধিতে শহরের ইট পাথর দাঁত বের করা বুনো শুয়োরের মতো তেড়ে আসে, রাস্তার অমসৃণ গভীর গর্ত তাঁর হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে ভেঙে দেবার জন্য বিকট হাঁ করে সামনে ওৎ পেতে বসে থাকে। অন্ধকার পথে কবি এখন নিতান্ত একা। তাঁর কথায় — ''এখন আমি মাঝ রাস্তায় এক / দীর্ঘমেয়াদী অন্ধকারে / বন্দী।''। দেশ স্বাধীন, ঔপনিবেশিক শাসকের শাসন নেই, তবুও কবি যেন দেশের ভবিষ্যৎ

নিজের মনের মতো করে দেখতে পাচ্ছেন না তেমন উজ্জ্বল রূপে। সেখানে দেশের গৌরব যতটা কাঙ্ক্ষিত ততটা যেন পূরণ হয় নি। চলমানতার শক্তি যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কবির দৃষ্টিতে সাহারা বা গোবি মরুভূমির রুক্ষতা সব কিছুকে ঢেকে নেয়। সেখানে কবির উপলব্ধিতে ''সময় দাঁড়িয়ে আছে/ ভর দিয়ে ক্রাচে।'' কবির সমকালের উপলব্ধি ধরা পড়েছে আলোচ্য কাব্যের ''অন্ধকার গিলে খাচ্ছে'' শিরোনামের কবিতায়। কবি সুভাষ সেখানে লেখেন — ''এদিকে আমার আশপাশে / ঘর জুড়ে অন্ধকার / গিলে খাচ্ছে / সবকিছু গোগ্রাসে — / টেবিল /চেয়ার আয়না / বইয়ের আলমারি /জুতো জামা / হালকা আর ভারী / সব ভাবনা — / অন্ধকার গিলে খাচ্ছে, চেয়ে দেখ / আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ সব / এবং দেশকে ভালোবাসার গৌরব।'' (অন্ধকার গিলে খাচ্ছে / চইচই -চইচই)

কবি প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ, প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, প্রত্যক্ষ করেছেন নিউট্রন বোমার ধ্বংসলীলা। মারণযন্ত্রের এই ধ্বংস, প্রাণনাশ ও রক্তপাতে কবি ক্ষুব্ধ। তাই তিনি আলোচ্য কাব্যের 'গুরুভাই' শীর্ষক কবিতায় লেখেন যারা ধর্মকে কেন্দ্র করে আলো বিতরণের নামে জগতে হিংসা ও রক্তপাত ছড়ায় তাদের নরকের কীটের সঙ্গে তুলনা উচিত। 'গুরুভাই' কবিতায় তিনি লেখেন —''ড্রাগনের মতো

দাঁতে তার বিষ
আর
জিহ্বাগ্রে আগুন
মাথায় সমস্তক্ষণ
খুন শুধু

. . . .

ক্রমে ক্রমে তার হাতে
নিউট্রন বোমার দায় ভাগ
যোগায় রেগান।'' (গুরুভাই / চইচই-চইচই)

কবি রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। একদা তাঁর সঙ্গে ছিল হাজার হাজার শ্লোগান মুখর রক্তিম হাত। কিন্তু রাজনীতির বন্ধন থেকে কবি এখন সরে এসেছেন অনেক দূরে। তাই তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ একা। পথের ধারে জীর্ণকায় অভুক্ত, ক্লেদাক্ত অসহায়ভাবে পড়ে থাকা প্রাণীর মতো রিক্ত। এও একমাত্র সৈনিকের লড়াই যেন। আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'এই যে' শিরোনামের কবিতায় আত্মকেন্দ্রিক চলমান নির্বিকার চিত্তের পথিকদের লক্ষ্য করছিলেন কবি। রিক্ত, নিঃসঙ্গ কবি

তাই একাকী সংগ্রামী হয়ে লড়াই করে চলেছেন। কবি তাই লেখেন —''আমিই একা ডেকে যাচ্ছি আকারে ইঙ্গিতে / টান পড়িয়ে গলার শিরায়। / ষাঁড়ের মতন তাড়া করে ফিরছে / পেছনে সময়। / সারাক্ষণ ছুটছে লোক। / একেবারে গ্রাহ্য নেই / বয়ে গেছে কারো কোনো কথায় কান দিতে। / রাস্তা দিয়ে যেই যায় / দেখি / আপাদ মস্তক / আঠা দিয়ে আঁটা — / যেন বন্ধ খাম। / তার ওপর সমস্তই অন্য নাম ধাম।'' (এই যে / চইচই -চইচই) নদীতে বন্যা আসবে, পলি কুল ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু সময় আবার সবকিছুকে স্বাভাবিক করে নেবে। এই সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে কবি প্রত্যাশী। তিনি 'জল নেমে গেলে পলি' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন —

''হানা দিলে বান
ডেকে তুলে পড়শিকে
চলে আমাদের তদন্ত তজবিজে
পেটে পড়ে টান,
পড়ুক — ....
এ দুর্দৈবে
অপূর্ণ সব সাধনা ও সাধ যদি
হয় অন্তর্জলি
যদি যায় নিবে
ফুৎকারে দীপাবলী
ঝেড়ে ফেলে সব স্বখাতে ফিরবে নদী।'' (জল নেমে গেলে পলি / চইচই -চইচই)

আলোচ্য কাব্যের নামকবিতা মূলতঃ দুটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতাটিতে কবি অন্তর্মনে শুনতে পান হাঁসকে ডাকার শব্দ -''আয় হাঁস, চইচই / আয় হাঁস / চইচই -চইচই।'' কবি বাহ্যিক জগতের মানুষের চরম ব্যস্ততা দেখে দেখে বিতশ্রদ্ধ। সেই জগতের সব মানুষ যেন ''ছুটতে ছুটতে চলে যায়/ সব কিছু ভুলে/ সমস্ত মুখোশ, সব ছদ্মবেশ খুলে।'' সমকালীন বৃদ্ধ কবি চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন ''সমস্তই টায়টায় / সব কিছুই ফাঁপা / এমনকি ঠোঁটের কোণে হাসিটাও / ফিতে দিয়ে মাপা।'' তাই কবি সেই কৃত্রিম জগতে হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ একা। তাঁর এই একাকিত্ব তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এক ফ্যাকাশে জগতে। সেখানে কবি যেন সবাইকে কাছে চেয়েও পান না। কবির এই শিল্পমানস ফুটে উঠেছে ''চইচই -চইচই'' শিরোনামের প্রথম সংখ্যক কবিতায় কবি লেখেন — ''আমি ছাড়া

সকলেরই রয়েছে কিছু না কিছু কাজ
কোথাও না কোথাও সকলেরই
পৌঁছুবার তাড়া।
হাত খালি ব'লে
রাস্তায় আমারই একা
হয়ে যায় দেরি।'' (চইচই -চইচই (১)/ 'চইচই -চইচই')

চইচই-চইচই কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় দেখি একবার পিছন ফিরে স্মৃতি রোমন্থনে বাল্যসুখের অন্বেষণ করেছেন কবি। সেই মনের মিল খোঁজার মধ্যে বয়সের কোন ফারাক থাকে না। এই মনের খেলায় কবি বিস্মিত—''এ ভারি অদ্ভুত বটে / মনের ভেতরে মন, শরীরের ভেতরে শরীর / কিভাবে যে বসে যায় ঠিক খাপে খাপে/ সব বাদ-বিসম্বাদ / গতির বুনটে / খুঁজে পায় স্বচ্ছন্দে অন্বয়।'' বাল্যকালের কবি শারদীয়া উৎসবের স্মৃতি রোমন্থন করেন। এই ফ্ল্যাসব্যাকে জীবনকে দেখার মধ্যে আমরা কবির প্রকৃতি চেতনার পরিচয় পাই।

শৈশবেও ছিল কবির চরম আর্থিক টানাপোড়েন। সেসময় তাঁর বেশীরভাগ সময় কেটে যেত এর কুর্তা, ওর টুপি, তার জুতো চেয়ে-চিন্তে প'রে। সেই ধার করে নেওয়া পুরনো পোষাক পরিচ্ছদে কাটাতে হত পুজো। সেই পুরনো পোষাকেও ছিল একটা অভাব — 'নতুনের মতো নেই তার মৃত সঞ্জবনী গন্ধের উষ্ণতা'। শরৎকালের স্মৃতিতে ছিল শৈশবের বন্ধুত্বের এক বিশেষ অঙ্গ। অন্য শিশুর মতো শিশু কবিকে শুচি শুভ্র পাটভাঙা উৎসবের নতুন কাপড়ের টাটকা আনকোরা গন্ধে মন মাতানোর প্রবল ইচ্ছে হত। শরতের অনেক ভোরে রাস্তার বাতি নেভানোর অনেক আগে জুতো খুলে খালি পায় যখন পাখিরা সবে যাবে কি যাবে না এই দ্বিধায় নীড় ছাড়ে তখন শিশির পড়ার শব্দে টুপটাপ টুপটাপ শিউলি ঝরতে দেখতেন কবি।

এই শিশুর শৈশব কেটেছিল অসম্ভব অভাবের মধ্যে। সেই অভাব কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে আলোচ্য কবিতায় —''আমাদের ছেলেবেলা, আজকে যা তার চেয়েও বেশি, / কেটেছে অভাবে। / বছরে একবার, তাও বোধনের বাজনা বেজে গেলে, / যখন চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে দু'গালে / হয় প্যান্ট, নয় জামা, নয় ফিতেবাঁধা বুট জুতো। / কোনোবার একেবারে কিছুই না পেলে, / পুরনো স্মৃতির ঝুলি ঝাড়লে দেখা যাবে - / ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে শেষকালে / বাড়িয়ে দিতেন হাত হয়তো প্রতিবেশী।'' / পেলে কী আনন্দ হতো, না পেলে যে কী হতো মন খারাপ।'' (চইচই-চইচই / চইচই-চইচই)

এরপর অনেক অভাব, অনেক সংগ্রাম, সভা সমিতি, মিছিল ইত্যাদি। যারা ছিল নিতান্ত খুব কাছের। আজ কালের অমোঘ নিয়মে কাছের জন হয়েছে অনেক পর। অদ্ভুত উপলব্ধি কবি সুভাষের। আজও তিনি দেখেন —কবির কনিষ্ঠ অনুজরাও নেহাৎ অবজ্ঞার ভরে আজকাল পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সচেতন শিল্পী মনে সবকিছু গ্রহণ করেও বৃদ্ধ কবি নিজের মনের ভেতর সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখে চলেন - আজও মনে মনে হাঁসকে ডাকেন 'চইচই- চইচই'।

চইচই-চইচই কাব্যের অন্তর্গত 'অগত্যা' শীর্ষক কবিতার বিষয় 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বুড়ো।' এই বুড়োর মধ্যে নিহিত বৃদ্ধ কবির বিভিন্ন অনুভূতি। আলোচ্য বুড়োর মতো নিতান্ত জৌলুসহীন ভোগের আসক্তিহীন জীবনে কবির একটাই লক্ষ্য মানুষকে জীবনের নানা রূপের নানা ছবি এঁকে দেখানো। তাই কবি লিখেছেন —

> ''ব'সে ব'সে সারাক্ষণ ফোলায় ফাঁপা
> রঙীন বুদ্বুদ
> যেখানে যা পায়
> মাটিতে লাগিয়ে মুখ খুঁটে খায় খুদ
> পাখিদের মতন হুবহু
> এক থেকে
> সেও হতে চেয়েছিল বহু
> একা তাকে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রত্যেকে।'' (অগত্যা / চইচই-চইচই)

এই একা বৃদ্ধ কবির শরীর ক্রমশঃ হীনশক্তি হয়ে পড়েছিল। ক্রমশঃ তাঁর দাঁতের জোর কমে যায়, কমে যায় চোখের জ্যোতি। ফলে দেহ পূর্বের গতিতে চলার শক্তি এখন আর পায় না। কুয়াশাটাকে এখন অনেক স্বপ্ন, হৃদয়ে শিল্প সৃজনের রঙিন প্রত্যয় উপলব্ধি করেন বার্ধক্যের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এখন তাঁর যৌবনের মতো চলার শক্তি নেই। আজ আর পূর্বের মতো শরীর তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেনা। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল 'অগত্যা' কবিতা।

বিদগ্ধ সমালোচকগণের অনেকেই কবিকে রাজনৈতিক দর্পণে যাচাই করেন। অথচ কবি সুভাষের বিচরণভূমি বিস্তৃত, ব্যাপক কোন কিছুতে সীমায়িত করলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকবে। স্বাভাবিক পথে অতি আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা অন্যান্যা সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবি সুভাষকে আশ্রয়স্থল করে নিয়েছেন। যথার্থই সমালোচক সত্য গুহ বলেছেন - ''কি দিয়েছে যুদ্ধ শেষের মাটি, স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দেশ তার তরুণতম সাহিত্যিকদের ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে

কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন ২২শে শ্রাবণ থেকে স্বাধীনতা লাভের দিনটি পর্যন্ত যে সময়, সে সময় টুকুকে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা সময় বললেই চলে। এ সময়ের লেখক কবিদের কাছ থেকে গ্রহণ করার মতো কিছুই পায়নি অতি আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা। তাই তাদের হাত বাড়াতে হয়েছে এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর অনেকটা লাফ দিয়ে কিছুটা পরিমাণে ঐ অধ্যায়ের শেষ দিকের সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।'' (সত্য গুহ, 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, অধুনা, ১৯৭০ পৃঃ ১০০)। কবি আলোচ্য কাব্যের অন্তর্গত ''পেঁয়াজি'' শিরোনামের কবিতায় তাঁর কাব্য সৃজনের ব্যাপ্তি নির্দেশ করেছেন। সেই ব্যাপ্তির মধ্যে অতি আধুনিক কবিদের রচনার নানা উপাদান।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতাকে তুলনা করেছেন আমাদের খুব চেনাজানা নিত্য ব্যবহার্য 'পেঁয়াজি'র সঙ্গে। পেঁয়াজির মতো কবিতার অঙ্গ ছাড়াতে ছাড়াতে স্বাদ উপলব্ধি করতে হয়। কবি সংলাপের আঙ্গিকে কবিতার বিষয়কে বুঝিয়ে বলেছেন —

''কবিতা কী ?
দাঁড়ান, ভেবে দেখি —
প্রেমেপড়া ভীরু হাতের গোলাপ
বনের গায় ফিনিকদেওয়া জোনাকি
মিছিলে গলা মিলিয়ে গান,
দূর থেকে কমরেড ব'লে চেঁচিয়ে ওঠা
ফুৎকারে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়া
কিন্তু তার আগে
আমাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে
বলুন তো —
কবিতা কী নয় ? (পেঁয়াজি / চইচই-চইচই)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ছবির মতো' শিরোনামের কবিতাটি কবি বন্ধু সাগরময় ঘোষ মহাশয়কে উৎসর্গ করে রচিত। বন্ধুবৎসল কবি সুভাষের বন্ধুত্বের মমতা, তাঁদের আতিথেয়তাকে স্মরণ করে অপার তৃপ্তিতে লেখেন ''ছবির মতো'' কবিতা। এই কবিতায় কবি বন্ধুদের আবেদনে — ''আর দুটো দিন থেকে গেলে হ'ত না ?'' সাড়া দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে বলেন : ''আগে বললে অবশ্যই থাকতাম। / এত আদর, এত অভ্যর্থনা — /এসব ছেড়ে যেতে /কারই বা মন চায় ? /কিন্তু কী

জানেন, / সাতঘাটে জল খেয়ে বেড়ানো যার কাজ — /এক জায়গায় / বাঁধা পড়লে কি তার চলে ? /আর সেটা দেখায়ই বা কেমন ? (ছবির মতো /চইচই- চইচই)

বন্ধুবৎসল কবি সুভাষ বন্ধুদের যে করেই হোক সময় দিতে ভালোবাসতেন। একথা তিনি ‘তোমার যদি কম হয়’ কবিতায় বলেছেন। -

‘‘সে যখন চায়
যত ইচ্ছে
হাত বাড়িয়ে সবাই নিচ্ছে
অনাদ্যন্ত
অফুরন্ত
সময়
আমার সময়।’’ (তোমার যদি কম হয় / চইচই-চইচই)

কম বেশি যেমন যার দরকার কবির সৃষ্টিতে সময় নিতে পারে। দূরের বন, ভোরের শিশির, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, যে বেদনার্ত, যে নিঃসঙ্গ প্রভৃতি যার যেমন প্রয়োজন ; কবি কাউকে ত্যাগ করতে চান না, তাঁর উদার হৃদয়ে এ জগতের সবারই স্থান রয়েছে।

এই জগতের সব কিছুর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানসুলভ দৃষ্টিতে কবি একটা অলঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছেন আলোচ্য কাব্যের ‘কেল্লা’ শিরোনামের কবিতায়। সেখানে একটা লোকের কথা বলেছেন, যে একটুখানি সাহচর্যে কেল্লাফতে করে দিতে পারত। তার দরকার ছিল কোনোরকমে ঢেউয়ের ওপর নৌকাটাকে ফেলে দেওয়া। কেননা সে লোকটা চিরকাল এক ভাবেই জীবন কাটিয়ে গেল। কেননা তাকে জলে নামানোর মতো ইশারা করার কোন লোক ছিল না। অথচ প্রত্যেকের হৃদয়ে নৌকার পালে হাওয়া লাগিয়ে ভাসতে ইচ্ছে করে। কেবল কোন একজনের সঙ্গ প্রয়োজন। কবি সেই বঞ্চিত ও হতভাগ্য বন্ধুকে স্মরণ করে লিখেছেন —‘‘কোন্‌টা ভাঁটি আর কোন্‌টা উজান / ঠাহর করতে না পেরে/ লোকটা /চিরটাকাল তটস্থ হয়েই রয়ে গেল। / ওর দরকার ছিল / পেছন থেকে এক মোক্ষম ধাক্কা।’’ (কেল্লা / চইচই-চইচই)

কবি ‘ও পাড়ার শিবেন গঙ্গো’ চরিত্রের রোমান্সধর্মী কথা নিয়ে লেখেন ‘‘নয় ছয় নাটকের গান’’ শিরোনামের কবিতা। এই কবিতায় ‘‘হরহর / বম বম’’ বলে ‘শিবেন গঙ্গো’ গাঁজার কল্কে দম মারেন। সে নামাবলি গায়ে দিয়ে একটি মেয়েকে বলি দিতে যাচ্ছিল। কবির ভাষায় —

''গায়ে দিয়ে না-মা-ব-লী / দিতে যা-চ্ছি-লে-ন বলি / রোখ্‌কে রোখ্‌কে /বলতে রক্ষে / পেল মেয়েটা শেষটায় / অনেক চেষ্টায়..............................।'' (নয়-ছয় নাটকের গান / চইচই-চইচই)

কবি বলিদান প্রথা ও পৌত্তলিকতাকে তরল হাস্যরসে অসার করে তুলেছেন। এখানে দেবীকে পূজার পরিবর্তে জয়ী হয় একটি সাধারণ মেয়ে। কবির জীবন ভাবনায় এর মূল্য অপরিসীম।

'চইচই-চইচই' কাব্যের সর্বশেষ মৌলিক কবিতা 'লাতভিয়ার লোকমুখে''। আটটি স্তবকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত কবিতাটির পদবিন্যাস। দ্রুতলয়ে রচিত আটটি স্তবকে একটা টান রয়েছে। ছড়ার ছন্দে রচিত 'লাতভিয়ার লোকমুখে' শীর্ষক এই কবিতাটির প্রথম সংখ্যার স্তবকে নিহিত কবির প্রেম ভাবনা। কবি ব্যক্তিজীবনে নিজেও ছিলেন নিরিবিলি স্বভাবের মানুষ। কবির ব্যক্তিজীবনে অনেক অপবাদ ও নিন্দা জুটেছিল। কবি সব অপবাদ ও নিন্দা উদারচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— ''আমার নামে নিন্দে এ-ত। /হতাম যদি ফুল্‌কো লুচি /ওরা আমায় গিলে খেত।'' (লাতভিয়ার লোকমুখে / চইচই-চইচই)

যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ ভীষণভাবে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। মানুষের এই অমানবিক পাশবিকতাকে দু-একটি কথায় শিল্পিত রূপ দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন— '' মানুষ ক'রে ছেলেকে মা / সুখের দিন গোণে। / বিয়ে ক'রে এনে খোকা /মাকে পাঠায় বনে। /ঘর করবে সুখে /মাকে বনে রেখে।। . . . . . . ছোট-বড়োয় ভাব নেই / কড়া নরমে নেই মিল। /বড়োর কাছে ছোট তুচ্ছ /কড়ার চাপে নরম কাহিল।।'' (লাতভিয়ার লোকমুখে / চইচই-চইচই') কলমের দু-একটি আঁচড়ে অল্প কথায় কবি সামাজিক ধর্ম ও একটি মূল্যবোধহীন-নীতিবোধশূন্য-শোষণ, বঞ্চনার ছবি তুলে ধরেছেন আলোচ্য কবিতায়।

'চইচই-চইচই' কাব্যের কবিতাগুলিতে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় পাঠে আমরা কবির ব্যক্তিজীবন ও শিল্পমানসের নির্দিষ্ট বিবর্তন সহজেই উপলব্ধি করি। এই কবিতাগুলিতে নিহিত কবির সমকালের আত্মজীবন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন, আর্থিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিক্রিয়াজাত কবিমানসের বাঁক ফেরার প্রকৃতি ধরা পড়েছে 'চইচই-চইচই' কাব্যে। এই কাব্যের শিরোনামের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি বিশেষ ডাক বা আহ্বান। এর মধ্যে রয়েছে চলমানতা ও বস্তুগত বিষয় ভাবনা। এর মধ্যে কবির সহজভাবে সহজভাষায় কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ শীর্ষণামের 'চইচই-চইচই' হয়ে উঠেছে সুদূরপ্রসারী অর্থবহ সাহিত্যের ইতিহাসের অনন্য সম্পদ।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানস - প্রকৃতি জানার জন্য, তাঁর কাব্যের গতি প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাব্য ''যা রে কাগজের নৌকো'' (১৯৮৯)। এই কাব্যে ধরা পড়েছে কবির

কাব্য প্রবাহের মোড় ফেরার পালা। কবির ব্যক্তি মানস চলতেচলতে বাঁক নিয়েছিল অনেক সময়। সেই বাঁক নেবার প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে ''যা রে কাগজের নৌকো'' কাব্যে। আলোচ্য কাব্যটির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রকাশকালে ছিল ৬১টি এবং কবিতার সংখ্যা ৩৪টি। কাব্যটির কবিতাগুলির নিবিড় পাঠে-সহায়ক হয়েছে কাব্যগ্রন্থটির পিছন প্রচ্ছদের বর্ণনা। সেখানে লেখা হয়েছে, ''বাংলা কবিতার মঞ্চে পরাক্রান্ত প্রবেশ-মুহূর্ত থেকেই উজ্জ্বল আলো তাঁর মুখে। সে আলো একটুও ক্ষীণ হতে দেননি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পোশাক-বদল ঘটেছে বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই তিনি কৌতূহলের কেন্দ্রে। সবিস্ময় লক্ষ করতে হয়, কীভাবে তিনি পালটে নিচ্ছেন কবিতা-ভাবনা, আঙ্গিক কিংবা প্রসাধন লাবণ্য অটুট রেখেই এক সময় তিনি কবিতায় এনেছিলেন গদ্যের ঋজুতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এখনকার কবিতা আবার নতুন বাঁকের মুখে। লোকাতীতকে ছুঁতে চাইছেন। লোকায়ত এক মেজাজে, ছোট পঙ্ক্তিতে, তাজা ছন্দে, অকল্পিত মিলের চারুতায়। মন্ত্রের মতো, গাঢ় থেকে ক্রমশ গাঢ়তর তাঁর উচ্চারণ। গূঢ় থেকে গূঢ়তর তাঁর সময় ও সমাজ-ভাষ্য। ভঙ্গি কিছুটা তির্যক, তবু গভীর মমতাময়। . . . . সার্থক ও অন্তরঙ্গ কিছু উচ্চারণ, যাতে ধরা পড়েছে আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী সময়, কৈশোরের স্মৃতিজলে ভাসানো কাগজের নৌকো, মানুষের প্রতি বাড়ানো ভালবাসা বিশ্বাসের হাত এবং এমন বহু কিছু।''

আলোচ্য কাব্যে কবির মৌলিক কবিতা ৩২টি এবং অনুবাদ কবিতা দুটি। মৌলিক কবিতাগুলি হল - 'দৃশ্যত', 'জলে পড়া', 'আওনি বাওনি চাওনি', 'যারে কাগজের নৌকো', 'ছায়াপাত', 'ডোমকানা', 'যম-যমী সংবাদ', 'হায়েনার হাসি', 'ফিরি', 'ভয় দেখাই', 'নিতে আসেনি', 'যদি বলি', 'ঘড়ির কাঁটায়', 'পাতাল প্রবেশের আগে', 'পয়লা আষাঢ়ে', 'ঘরে না বাইরে না', 'দোহাই', 'শতকিয়া', 'চোখের মাথা খেয়ে', 'সোজা নয়', 'এক দুই তিন', 'বদলাচ্ছে দিন', 'আহা রে', 'মজা দেখ', 'রাজভিখারী,' 'বগা ফোঁস', 'এসো হে', 'ভগ্নদূত', 'ঘরের বাইরে বাইরের ঘরে', 'দে-দোল', 'সপ্তাহ প্রতিদিনই' এবং 'অনেকের গান'। এছাড়া অনুবাদ কবিতা দুটি হল : 'আন্না আখমতো ভা-কে', ও 'হে তরঙ্গরাশি ! সুপ্রভাত।'

আলোচ্য কবিতাগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্য সমালোচক অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী এ বিষয়ে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায় - ''এই সময় থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষায় নৈরাশ্যবোধের ও বিদ্রূপোক্তির প্রাধান্য। ভাষার ঝকমকে চতুর বিন্যাস আমাদের মুগ্ধও করেছে। কিন্তু এই সময়ের কবিতাবলীতে আমরা কবিমানসের কোনো প্রত্যয়-ভূমির সন্ধান আর পাচ্ছি না। যেখানে সহজ মানবিকতার কবিতা লিখেছেন সেখানে তবু তা স্বাভাবিক

ভালো লাগার একটি বলয় তৈরী করে। কিন্তু যেখানে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার কবিতা লিখতে চেয়েছেন তখন আর কোনো বিশ্বাসের আগুনে জ্বলে ওঠেনি তাঁর রচিত পঙক্তিগুলি। তার বদলে বিশ্বাসের ভাঙনের ছবিই সেখানে স্পষ্ট।

কবির এই মানসপটের পরিবর্তনে ক্রিয়াশীল ছিল কয়েকটি বাহ্যিক আলোড়ন। আশির দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনোস্তের নীতি ও অবস্থান, পূর্ব-ইউরোপ ব্যাপী কমিউনিষ্ট শাসনের অবসান, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কোনো কোনো মতবিরোধী আদর্শিক ত্রুটি ইত্যাদি কবির ব্যক্তি মানসের এইসব তোলপাড় ওঠা ঝড়ের ছাপ রয়েছে ''যা রে কাগজের নৌকো'' কাব্যের কবিতা গুলিতে। কবি সংগ্রাম ও লড়াইকে আজ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চ্যুত করেন নি। কিন্তু পার্টিশান হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নির্দেশিত সর্বহারা শ্রেণীর জন্য লড়াইকে তেমনভাবে সমর্থনে তখন তাঁর কোথায় যেন আপত্তি ছিল। সময়ের দাবি মেনেই তাঁরমধ্যে এসেছিল নতুন নতুন ভাবনা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ পরিবর্তনকামী সমাজ মানস। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও মধ্যবিত্তের জীবনচর্চাকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন আলোচ্য কাব্যে।

''যা রে কাগজের নৌকো'' (১৯৮৯) কাব্যের প্রথম কবিতার শীর্ষনাম 'দৃশ্যত'। এই কবিতায় কবি একজন লেখকের কথা বলেছেন। রাস্তায় চলমান পথিকেরা তাকে শুধু বাইরে থেকে দেখে, কিন্তু তাঁর স্বভাব ও মনের খোঁজ রাখে। কবির জিজ্ঞাসা বাইরে থেকে দেখে কেউ তাঁর মনের থই পায় কি। নাকি কারো সেই মনের থই পাবার সাধ্য আছে।

কবি যে প্রশাসক ও পার্টির কাছে সেকালে অবজ্ঞার ও অবহেলার ব্যক্তি ছিলেন তা ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য কবিতায়। কবি বলেন তাঁর ''খোঁজ রাখে না কেউ''। কবি একজন লেখকের বর্ণনায় সাধারণ ভাব ও সহজ ভাষার শিল্পিতরূপ দিয়েছেন আলোচ্য কবিতায়। সেখানে তিনি লিখেছেন—

''রাস্তা দিয়ে সেই যায়, খোলা জানলা, উঁকি মেরে দেখে
কে একজন সারাক্ষণ গদি-আঁটা কাঠের চেয়ারে
টেবিলে দু-ঠ্যাং তুলে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকে।
চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, ভাঙাগাল, দেখতেও চোয়াড়ে,
মাঝখানে সামান্য ভুঁড়ি, যে রকম হয় ভারী ট্যাকে-
বেড়া ভেঙে ভাবনা ঢুকলে সম্ভবত দেয় সে খোয়াড়ে।''(দৃশ্যত / যারে কাগজের নৌকো)

কেউ খোঁজ রাখুক বা না রাখুক, কবি নিজের সমস্ত ভাবনা নৌকোয় ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে একনিষ্ঠ রূপে এখন লেখায় মগ্ন রাখেন। শত বঞ্চনা, অভাব কষ্টকে নবাবের মতো সহ্য করে

বাইরে কোনরকম আড়ম্বরহীন ও প্রকাশহীন কাজ করে চলেন কবি। তাই তাঁর মনের সঙ্গেও চলে অনেক লড়াই। সমাজ, পার্টি, বন্ধু-পরিজন, জীবনে নানা ভাবনা নিয়ে ''নিজের সঙ্গে চলে তার সওয়াল জবাব।''

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ''জলে পড়া'' শীর্ষক কবিতায় ফুটপাতের কাদা-জল পূর্ণ খানা-খন্দের মধ্যে চলমান একজন পথিকের চলার নানা বিপত্তির কথা বর্ণনাত্মক ঢঙে তুলে ধরেছেন। এই বিঘ্নপূর্ণ চলার বর্ণনা অনেকখানি সত্য তাঁর নিজের জীবনেও। তাঁর জীবনে পথচলা মসৃণ ছিল না কখনোই। তাঁর প্রতিশব্দ হতে পারে 'সংগ্রাম'। সত্যকে বজায় রেখে সত্যের জন্য লড়াইটাকে কখনো কখনো নিজের কাছে মনে হয়েছিল অনর্থক। কিন্তু কখনো বিন্দুমাত্র সত্য থেকে, আদর্শ থেকে চ্যুত হন নি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই ব্যঞ্জিত অর্থে এই কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ। আলোচ্য কবিতায় কবি লিখেছেন —''এক হাঁটু জলে ছপাৎ ছপাৎ ক'রে লোকটা হাঁটছে / আর ভাবছে, /রাস্তায় জল দাঁড়াবে /এমন তো কথা ছিল না। /জল দাঁড়ালে /ভেতরের আরও অনেক কিছু চাপা পড়ে /এটা ওর খেয়াল ছিল না। /হঠাৎ এক অদৃশ্য গর্তে পরক্ষণেই /. . . . . ওর হাঁটুর জল / তৎক্ষণাৎ গলায় উঠে এল।।'' (জলে পড়া / যা রে কাগজের নৌকো)

ছড়ার ছন্দে দ্রুত লয়ে রচিত কবিতা ''আওনি বাওনি চাওনি'। এই কবিতায় কবি পুরনো ভিত নড়িয়ে দেবার আগুনের হলকা বুকে নিয়ে দিন বদলের আহ্বান করেছেন। কৃষকদের তাঁর ন্যায্য অধিকার অর্জনের এবং শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহাজন, মোড়ল ও বর্গীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের, শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান করেছেন কবি। তিনি কৃষকের দুঃখে সমব্যথী। তাঁদের কষ্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি লেখেন — ''পোড়া কপালের বছর গেছে /কেটে /কখনও খরায় মাঠ গিয়েছে / ফেটে /কখনও বান নিয়েছে ধান /চেটে /ঘরের মানুষ ভুঁয়েতে শোয়া / জ্বর গায় /আগ পড়েনি আখায় / আলগা মুঠোয় ছটাক জমি /বর্গায়''। (আওনি বাওনি চাওনি / যা রে কাগজের নৌকো)

আলোচ্য কাব্যের নাম কবিতা 'যা রে কাগজের নৌকো' মূলতঃ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত পাঁচটি কবিতার সংকলন। এই কবিতায় আমরা কাব্যের শিরোনাম নির্বাচন ও সমকালের কবিমানসের পরিচয় পাই। জীবনের সমস্ত কষ্ট ধরে রেখে তিনি জগৎ জীবন ও সৃষ্টির ধারাকে মহাকালের স্রোতে কাগজের নৌকোয় ভাসিয়ে দিয়েছেন। সে নৌকোকে ভাসমান রাখার দায়িত্ব আজ আমাদের। কবি লেখাকে অবলম্বন করে সত্যের সঙ্গে যেন সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছেন। তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে - কাগজের নৌকায় চলেছেন কবি স্বয়ং। কাগজের নৌকায় ''ভেসে গিয়েছে / আমার সৃষ্টি / চোখের কোণে / নামিয়ে বৃষ্টি।''

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম কবিমনের প্রকাশ রয়েছে আলোচ্য কবিতায়। কবি বর্ষা প্রকৃতির অনুপম চেতনার ছবি এঁকেছেন। তাঁর এই বাদলার দিনের বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ককে বিজ্ঞান চেতনামূলক ভাবনা থেকে প্রকাশ করেছেন কবি। প্রাগৈতিহাসিক কালে ''জলের বুকে জন্মেছিল/ জীবন স্পন্দমান''। কবি বলেন, তাই হয়তো জলের সঙ্গে এই ঋতুর সঙ্গে তাঁর সেই অমোঘ টান। এই প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত তাঁর শৈশব, ছেলে বেলার নানা স্মৃতি। কবি এই কথায় তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করেছেন সত্য নির্ভর যুক্তিতে। তাঁর জন্ম, মাতৃগর্ভধারণ, মায়ের কষ্ট, জলের সঙ্গে সম্পর্ক জন্মসূত্রে ইত্যাদির প্রকাশ আমরা পাই আলোচ্য কবিতায় —

'' যখন আমি জন্ম নেব ব'লে
জল ভাঙছি, জল ভাঙছি
মা নিদারুণ ব্যথায় তখন
ক্লিষ্ট
মনে পড়ে না কেমন ক'রে
ল্যাজ খসিয়ে
হেঁট মুণ্ডে
হয়েছিলাম কী কুস্বরে
এই আমি ভূমিষ্ঠ''। (যা রে কাগজের নৌকো (১) / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি এখানে ''মেঘের গায়ে গা ঢেকে'' কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছেন। বর্ষাকাল, তাই ''টেলিগ্রাফের তার ঝোলে / ছেঁড়া ঘুড়ি / হাঁটুজলে পা ডুবিয়ে / গাছের গুড়ি'' অবাক দৃষ্টিতে যেন চারিদিকে চেয়ে আছে। শব্দের অসাধারণ প্রয়োগ দক্ষতায় মেঘের সঙ্গে কবির আদরের সম্পর্ক এখানে প্রকাশ। কবি তাকে ''ও আমার বোন মেঘরূপী'' সম্বোধন করে আদর প্রকাশ করেন। শ্রাবণের বৃষ্টিতে যেন ''টাপুর টাপুর টাপুর টুপুর /বাজছে কারও পায়ের নূপুর''। সেই সঙ্গে কবি শ্রবণ অঙ্গেরদ্বারা বৃষ্টি, তাল, ছন্দ, মিলিয়ে নৃত্যের ঢঙে মনোরম ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেন ; সেই সঙ্গে মিশে আছে একটু ভয়। সেই সঙ্গে মিশে একাকার তাঁর শৈশবের স্মৃতি। কেন না ''মেঘ করছে গুড়গুড় / আকাশ বেজায় কালো'' এবং ''ঝড় উঠল অগ্নিকোণে / ঝড় উঠল ঝড় / কচুর পাতায় নুন এনেছি / একটি আম পড়''/ তাঁর ভালোলাগা ও বর্ষাকে ভালবাসার সঙ্গে অন্বিষ্ট গ্রামের অসামান্য নিদারুণ কষ্ট। স্পষ্ট ভাষায় কবি বর্ষার মনমোহিনী রূপের অন্য পিঠের কথাও বলেন - ''এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।'' এই বর্ষাকালে ''বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম/ ঢেঁকিতে কোটে চিঁড়ে / দমাদ্দম পেটাতে

পেটাতে/ কুলো গেছে ছিঁড়ে'' এবং ''উনুনের মোটে আঁচ পড়ে নি/ হবে না আজ আন্না / ভিজে গায়ে মাটি -মায়ের/ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।''

আলোচ্য কবিতা সংকলনের চতুর্থ সংখ্যক কবিতায় বৃষ্টি পড়ার কালে রথের মেলায় নাতিকে সঙ্গে নিয়ে খাবার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রাম্য সমার্জিত বলিষ্ঠ কায়িক শ্রমের জীবন এবং শহুরে আলতো সাজানো কৃত্রিম জীবনের বৈপরীত্য আলোচ্য কবিতায় শিল্পরূপ দানের কবিমানস লক্ষিত হয়। কবি নিজেই গ্রাম্য জীবনের ''রোদ জল শীত গ্রীষ্ম সবই'' স্ব-বশ করে তাঁর লোহার শরীর নির্মাণের কথা বলেন। বৃষ্টি পড়া শুরু হলে কবির মনে দোলা দেয় নতুন আবেগ। কবি তাই নাতিকে সঙ্গী করে রথের মেলায় যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন - ''বৃষ্টি পড়ছে ? তবে তো এক্ষুনি / যেতে হবে রথের মেলায়। / যাবি তুই / সঙ্গে গেলে তোকে দেব রথের পার্বনি/ হেঁটে যাব। রাজি ?'' বৃষ্টি পড়লে কবি হেঁটে খালি পায়ে রথের মেলায় যান। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন - '' আমার হয় না কিছু/ পেরেকে বা কাঁচে / পাওয়া গেলে কিনে দেব তালপাতার ভেঁপু/ যাবি দাদু, যাবি ?'' বার্ধক্যে কবি এখন শারীরিকভাবে হীনবল হয়ে পড়েছেন। তাঁর শারীরিক অক্ষমতা প্রকাশ করে লেখেন — ''চোখে ছানি, শুনি কম, /একটা কান একেবারে কালা / নেই দম/ ফোলানো বেলুন কিনি, নিজে আমি দিতে পারি নে ফুঁ।/ তালপাতার ভেঁপু পেলে/ আমার কানের কাছে মুখ এনে রাস্তায় দাড়িয়ে/ খুব জোরে একবার বাজাবি ?'' (যা রে কাগজের নৌকো (২) / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি নিজের ও তার ছেলের শৈশবের অকৃত্রিম, অমার্জিত, স্বাভাবিক বলিষ্ঠ জীবনের কথা শুনিয়েছেন আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নাগরিক ও বর্তমানের শিশুকে। শৈশবের স্মৃতি নাতির কাছে তুলে ধরেছেন — ''যখন ছিলাম আমি ঠিক তোর মতো/ যতই ঝড়বৃষ্টি হোক/ খেলা থাকলে বেরোতেই হত। / সারাটা দুপুর কাটত ছিপ হাতে বিলে। / ভিজে জামা, ভিজে জুতো / রোদ উঠলে গায়েই শুকুতো। / ছুটিটা মজায় কাটত ঠাকুরদার কাছে/ দেশের বাড়িতে। /'' কিংবা - ''এ ক'রো-না, সেক'রো-না খালি। / ডুববে, সাপে কাটবে কিংবা করবে অসুখ-বিসুখ-/সব সময়/ভয়।/অন্ধকারে তুমি যদি দেখতে জোনাকি/ হাতে কেউ লণ্ঠন নেয় নাকি ? / ঝুঁকে পড়ে ইঁদারার জলে/ দেখা যাবে কাকে ? / কথা ব'লে জানবে না একবার / কে সেখানে থাকে ? / নষ্টচন্দ্রে ফল চুরি করাই তো রীতি।'' কবি নাতিকে বলেন '' তোর বাবাকে তো জানি - / ফেলে রেখে পরীক্ষার পড়া/ খালি খেলা, খালি খেলা, সারাক্ষণ খেলা। / সেই তোর ডানপিটে দস্যি বাবা বড় হয়ে / আপিসে যাবার আগে রোজ / তোকে কি না বলে -'খবর্দার, বেরোবে না জলে। / বড় হয়ে লোকে এত ভুলে যায় / নিজেদের ছেলেবেলাটাকে -''।

কবি-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর আত্মিক সম্পর্ককে যুক্তিনির্ভর, বিচিত্র ছন্দ, কাহিনী, আটপৌরে ভাষায় আদর্শিক বোধে আলোচ্য কবিতায় শিল্পরূপ দিয়েছেন।

যৌবনের স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ছায়াপাত' শীর্ষক কবিতায় কবির নিজেকে প্রকাশ করার ভঙ্গি চমৎকার। কবি অনেকটা আত্মকথনের ভঙ্গীতে লিখেছেন —

''মাঠ জুড়ে সারা বেলা
শুধু ঘুরে ঘুরে
ঠা-ঠা রোদ্দুরে
ভেঙেছি দু -পায়
শক্ত মাটির ঢেলা।'' (ছায়াপাত / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি অনেকসময় আত্ম বিশ্লেষণ করেছিলেন। কখনো কখনো মাঠ-ঘাট-শহর-গ্রাম-কারখানা ঘুরে ঘুরে চলার নেশাটাকে ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে নেশা কবির ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। কখনো কখনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-লড়াই-মিছিল, শ্লোগান থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে একেবারে সাধারণের ভিড়ে মিশে নীরব জীবনে ডুব দিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দু-পায়ে শক্ত মাটির ঢেলা ভাঙার নেশার ছায়া তাঁকে কখনো ছাড়েনি। কবির মনের গভীর থেকে উৎসারিত নিজেকে প্রকাশের প্রয়াস এখানে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পিত প্রয়াস। জরা, ব্যধি ও মৃত্যু ভাবনা কবির সমাজচেতনার সঙ্গে অন্বিত। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা বৃদ্ধের একাকিত্বের জীবনে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বয়ে নিয়ে চলার কথা কবি ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য কাব্যের 'ডোমকানা' শিরোনামের কবিতায়। এখানে সেই ''এককালে ঠেকা / এক আঁটকুড়োঁ / বুড়ো / বেঁচে থেকে শেষবারের মতন/ নিজেকে সে টেনে হিঁচড়ে / এনে কোনো মতে দরজায় / দিয়েছিল তুলে হুড়কো''। সেই বাড়িতে ঘরের বাইরে ক'জন গাল-চড়ানো জন্মদুঃখী হিজড়ে হেঁড়ে গলায় হাঁক দেয় ''ওগো মা, ও দিদি / খোঁকা দেখা না রে।'' ঢোলক বাজাতে বাজাতে হাততালি দিয়ে সেই বৃদ্ধের ঘরে কড়া নাড়ে হিজড়েরা। অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী ধ্বনিতে এদের সামাজিক অবস্থান প্রকাশ করেন কবি সুভাষ। তিনি সমাজের করুণ, অসহায়, অবহেলিত ও নিরুপায় মানুষের কষ্টে কাতর হয়ে পড়তেন। তাদের দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতেন। এই কবিতায় সমাজের সেই হিজড়ে মানুষের বেঁচে থাকার কঠিন বিন্যাস এক একাকী বৃদ্ধের সঙ্গে সমবিন্দুতে মিশে যাবার অভিমুখকে প্রকাশ করেছেন - ''মুখোমুখি দুই অন্ধ দুদিকে, / ডোমকানা দুই মূর্খ।''

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্গত ''যম-যমী সংবাদ'' শীর্ষক কবিতায় প্রতিহিংসা পরায়ণ সমবয়সী এক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসার বিষয়কে অবলম্বন করেছেন। এখানে দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে বার্দ্ধক্যের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সময় কবির জীবনের টুকরো ছবিগুলো নিয়ে মালার মতো বন্ধন তৈরী করেছে শিল্পের উপাদানের সঙ্গে। কবি দীর্ঘ জীবন পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন ''আমি পা বাড়ালে/ বরাবর কেড়েছে সে পা-রাখার জমি'/; আবার বলেছেন ''সে চেয়েছে বেঁধে দিতে / সমস্ত গতিবিধি / লক্ষ্মণের খড়ির গন্ডিতে''/ কবি যখন কমিউনিষ্ট মতাদর্শে নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবনকে পার্টি নির্দেশিত পথে অতিবাহিত করিয়েছিলেন সেখানেও সেই হিংসুক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতেন। তাই কবি লিখেছেন —'' ও আমাকে হিংসে করত/ কিছুটা বা ঘৃণা /কালের পুতুল হয়ে/আমি কি না নিয়তি মানি না /যাতে আমি না পাই নাগালে/ সমস্ত বাঞ্ছিত ফল . . . . . . ফুটিয়ে জানলার কাঁচে সৌভাগ্যের মুখ / চকিতে সহসা /হানত দ্রুত বিদ্যুতের কশা।'' (যম-যমী সংবাদ /যা রে কাগজের নৌকো)

এই কবিতায় কবির বিশ্লেষণাত্মক শিল্পীসত্ত্বা, সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই ছানি-কাটা চোখে মোটা পরকলা পরা সমবয়সী প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা ও হিংসা যথার্থ শিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে কবির বিস্ময়কর প্রতিভার গুণে।

কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনে অনেক সোনার ফসল এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় মহাকালের রথের ঘোড়া মানুষের সেই সোনার ফসলকে তাঁর সোনার তরীতে স্থান দেয়, কিন্তু সেই কর্মী মানুষের জায়গা হয় না সেখানে। সেই ব্যস্ততার মধ্যে উপেক্ষিত হয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়। একজন লেখকের কাছে স্বাভাবিকভাবে অকাতরে উপেক্ষিত হয় স্ত্রী ও সন্তানের সামান্য চাওয়া, মেলামেশার একটু সময়। কবি স্মৃতির পটে তাকিয়ে জীবনের ছবিতে দেখেন ও বলেন —''পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে/ বলেছিলাম/আমাকে বিরক্ত ক'রো না / এখন যাও/ নাচতে নাচতে চ'লে গিয়েছিল/পেছন থেকে একদিন/ অতর্কিতে টিপে ধরায়/ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায়/ কলমের গোড়ায় চোখ রেখে/ বলেছিলাম/ আমার সময় নেই, তুমি যাও/ ছুটতে ছুটতে চ'লে গিয়েছিল।'' (যম-যমী সংবাদ / যা রে কাগজের নৌকো) — এখন কবি সমস্ত সময় অতিক্রান্ত করে হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর সামনে গাছের পাতা থেকে সমানে জল প'ড়ে যাচ্ছে, তাঁর পাশে দেয়াল ঘড়িতে অবাধ্য সময় টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ করে অতিবাহিত হচ্ছে। কবির সেই উপেক্ষা, এড়িয়ে চলার ভালোবাসা কবিকে হায়েনার মতো আঘাত করছে। কবি তবুও বলেন — কাগজের মতো সাদা হাড়

নিয়ে/ একটা পরিতৃপ্ত হায়েনা /হাসি মুখে/ বেশ রসিয়ে রসিয়ে/ শব্দ ক'রে জিভ চাটছে।।'' (হায়নার হাসি / যা রে কাগজের নৌকো)

তাঁর কাব্য প্রবাহের সৃষ্টি সম্ভারে লক্ষিত হয় একটি গতি, একটি প্রবহমান জগৎ ও জীবন। কোথাও হাঁটা, চলা, কোথাও দৌড়, কোথাও ওড়া, কোথাও নৌকার চলমানতা, কোথাও একরকম শুধুই চলমানতা। আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ফিরি' শীর্ষক কবিতায় কবি বন্ধ দরজার ঘরের মেঝের ওপর রোদ গায়ে দিয়ে সেই চলমান উপলব্ধিতে উড়িয়ে চলেন —

জলে এখন
টান খুব
. . . .
কানের কাছে বাজছে ভোঁ
মন বলছে যাব যাব
যাওয়ার নেই জো
. . . .
হাতে চাবুক, ঘোড়ায় দেওয়া জিন
তর সয় না
আমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছে দিন
. . . .
থলির ভেতর স্মৃতি
হাতড়াচ্ছে শব্দ গন্ধ ছবি।'' (ফিরি / যা রে কাগজের নৌকো)

বার্ধক্যেও বয়সকে উপেক্ষা করে কবিকে নিত্য বাজার করতে হয়। বাজার করার আলু, কুমড়োর ফালি, মাছ, শাক ইত্যাদি নগণ্য বিষয়গুলি কবির স্পর্শকাতর শিল্পী মনেও আলোড়ন তোলে। কবির চেতনলোকে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে বাজারের খাদ্য দ্রব্যও। কবি নিজের আত্মচেতনার কথা লেখেন — ছোট হয়ে আসে।/এখন আমার দৌড় বলতে/ বাড়ি থেকে বাজার/ আর বাজার থেকে বাড়ি।/ কুমড়োর ফালিগুলো / ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকায়/ আমার নাকি চেহারা হয়ে যাচ্ছে/ পোড়া কাঠের মতন।'' (ভয় দেখাই / যা রে কাগজের নৌকো)

সেই বাজারের দ্রব্যগুলির বর্ণনায় আমরা জানি, ''মড়ার মতো প'ড়ে থাকে কই,/ মাঝে মাঝে মুখ ঝামটা দেয় শোল।'' কবি নির্দ্বিধায় তাঁর বয়েসকে উল্লেখ করেন। তাঁর এখন বেঁচে থাকাটা

অনেকটা 'কেঁচো হয়ে' থাকার মতো। বৃদ্ধ কবিকে নিয়ে সবাই যে তটস্থ সেটাও তিনি উপলব্ধি করেন। এই বয়সে কবি কখনো কখনো সাগর ও নদীর মধ্যে ভুল করে থাকেন। যখন তিনি তলিয়ে দেখেন যে, এই বিশাল জলাশয়ের ক্ষেতে নতুন সোনার ফসল ফলে, সেই জলাশয়ের জলে নতুন পলি জাগে। কবি তখনই নিশ্চিত হন যে — আমি / অগণ্যকে /সাগর বলি /লাবণ্যকে / পলি।।'' (যদি বলি / যা রে কাগজের নৌকো) তবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্তরে ছিলেন সচেতন প্রতিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনের মানুষ। তিনি নিজের মধ্যে যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বিশ্বাস, সেটাই হবে মুক্তিকামী ও প্রতিবাদী মানুষের পথের দিশারী। তাই তিনি আলোচ্য কাব্যের 'ঘড়ির কাঁটায়' শিরোনামের কবিতায় হিংসা, দাঙ্গা, বিরোধ ও ভেদকামী মানুষের পতন কামনা করেছেন। সেখানে কবির দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখাবে। ভোগবাদী ও ঐশ্বর্যলোভী মানুষের বিরুদ্ধে কবি জেহাদ ঘোষণা করেছেন এই কবিতায়। তাঁর লেখায় সমকালের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাই আমরা। তিনি লেখেন — ''আমাদের আগাপাশতলায়

ঘড়ির কাঁটায় ছিন্নভিন্ন
এক রক্তাক্ত সময় !
পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতে
কোলাকুলির জন্যে
মুখিয়ে আছে বাঘ নখ।'' (ঘড়ির কাঁটায় ? যা রে কাগজের নৌকো)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত ''পাতাল প্রবেশের আগে' শীর্ষক কবিতায় গঙ্গার ঘাটে বৃদ্ধ পুরুতের সারাদিন ধরে বিড়বিড় বিড়বিড় করে সমানে 'তর্পণের মন্ত্র' পাঠ করাতে শুনেছেন কবি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিগারেট পান করার আমেজ। তাঁর কথায় ''আমার দু-আঙ্গুলের টুস্কিতে ছুঁড়ে-ফেলা/ সুখটান দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেট মুখে/ ছ্যাঁককরে ওঠা /''কবির অন্তরে সহানুভূতি পায় ''রাস্তার এক নিরাশ্রয় মৃত্যু পথযাত্রী''। সেই বৃদ্ধের অন্তরের সঙ্গে কবি নিজেকে সুখ দুঃখের অভিন্নতার বাসিন্দা বলে ভেবেছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করে নেওয়ার বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছিল। সেখানে কবি লেখেন শহরের ঢঙে — ''আধকপালে হওয়া পৃথিবীটাকে/ একটা রমণীয় পরিণামের জন্যে/ মাথার ওপর/ দাঁড় করিয়ে রেখে/ পাতাল বরাবর/ আমি নেমে চলেছি/এরপর আর কোথাও/ভূমিষ্ঠ হব বলে।।'' (পাতাল প্রবেশের আগে / যা রে কাগজের নৌকো)

আড়ম্বরহীন ছোট্ট পরিবারে কবির শান্তি ও সুখের নীড়। আর্থিক অনটনকে তিনি উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন পরিবারের সবার সম্মিলিত সহমতের দ্বারা। সেখানে ভালবাসার গভীর বন্ধনে অশ্রু

ঝরে কবির হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। কবি তাই ভালবাসার স্বীকৃতি জানিয়ে লেখেন — ''গুচ্ছের ফুল দেখো, ও বউ /হাসছে তোমার খোঁপায়। / ফুলের মালা /কেবল আমার গলা জড়িয়ে /জানি না কেন কিসের জন্যে ফোঁপায়।/ জানলা দাও, দরজা খোলো /কড়া নাড়ছে/ বাইরে পয়লা আষাঢ়/ শুধু জ্বলুক একটি জোনাক/ আমাদের এই/ বাবুই পাখির বাসার।।'' (পয়লা আষাঢ়ে / যা রে কাগজের নৌকো)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ঘরে না, বাইরে না' শীর্ষক কবিতায় দেশ ও জগতের মধ্যে একটি বিশ্ব মানবতাবোধ ও বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ ঘটানোর সার্থক প্রয়াস। এই কবিতাটিতে কবি মহাভারতীয় রূপকল্পের মধ্যে নিহিত রেখেছেন জাগতিক মিলনের উচ্চ আদর্শ। সমকালে কবির সচেতন শিল্পী মন রক্তাক্ত হয়েছিল দেশের আভ্যন্তরী ধর্মীয় দাঙ্গা, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সংঘাত ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদে। কবি লক্ষ্য করেছেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের শক্তির প্রতিযোগিতা, বিশ্বের পারমাণবিক শক্তির প্রতিযোগিতা, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অস্থির বিশ্বের সামরিক প্রতিযোগিতায় কবিহৃদয় ক্ষুব্ধ। কবি মহাভারতের মিথ ভাবনায় দেখিয়েছেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন ও তার তাত-পুত্র পাণ্ডব শক্তির কুরুক্ষেত্রের প্রাণহানি। অর্জুনের সারথী যুদ্ধ পরান্মুখ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধ সর্বদাই প্রাণহানির ক্ষেত্র। কবি পৃথিবীতে কারো প্রাণহানি চান না। তাই তিনি লেখেন যে কোনো যুদ্ধে —

''প্রত্যেকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা
সংশপ্তক
ভয় কাকে বলে তা জানে না।
যে জন্যেই হোক
(এরাও কৃষ্ণেরই জীব।)
প্রাণ দেয় হেলায়।'' (ঘরে না, বাইরে না / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি কারো প্রাণহানি চান না - ঘরে না, বাইরেও না, দেশেও না, বাইরের দেশেও না। কবি সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে, জগতের সমস্ত দেশের উদ্দেশ্যে, সমস্ত শক্তির উদ্দেশ্যে মানবিক প্রেরণায়, মানুষের প্রতি মমত্ববোধে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি সমস্ত শক্তিধর উন্নত দেশের যুদ্ধ মনোভাব ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে লেখেন —

''বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না -
ঘরে না, বাইরে না।'' (ঘরে না, বাইরে না / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি শান্তি ও মৈত্রী বিশ্বব্যাপী গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর এই উচ্চ মানবিক চেতনা ফুটে উঠেছে আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'শতকিয়া' শীর্ষক কবিতায়। কবি ঘরের ও বাইরের শত্রুদের পরাজিত করার এবং বিজয়ী শান্তিকামী মানুষের হাতে প্রীতির রাখি বাঁধার কথা বলেছেন। তিনি জগতের আকাশে বাতাসে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেবার কথা বলেছেন উদ্দীষ্ট কবিতায় — ''ঘরের ক্ষমতালিপ্সু এবং/বাইরের শত্রুরা।/ রক্তের রঙ/ ত্রিবর্ণে বেঁধে রাখী/ জয় ক'রে নেবে হাতে হাত দিয়ে/ শান্তি মৈত্রী মুক্তির সব/ অভ্রংলিহ চূড়া।/আকাশে আকাশে উড়ুক প্রাণের পাখি।'' (শতকিয়া/যা রে কাগজের নৌকো)

এই কবিতায় কবি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বল শরীরের উল্লেখও করেছেন। কবি তাঁর জীবন থেকে সময় শক্তি, ক্ষমতা, গতি কেড়ে নেবার কথা বলেন। তাঁর কথায় তাঁর এখন ''হাত ধুয়ে ফেলে বিদায় নেবার/ সময়।'' কেননা তাঁর এখন ''যদিও কণ্ঠ ক্ষীণ,/ দুপায়ে নেইকো আগের ক্ষিপ্র গতি।'' দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের নাশকতামূলক কার্যকলাপে কবির শিল্পী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তাই সচেতন শিল্পী দেখেন — ''মাথার ওপর সমস্তক্ষণ

খাঁড়া রয়েছে ঝুলে

মুখ লুকিয়ে মেঘে

খুনীরা আছে জেগে।'' (চোখের মাথা খেয়ে / যা রে কাগজের নৌকো)

একারণেই কবি 'চোখের মাথা খেয়ে' শীর্ষক কবিতায় লেখেন, তাঁর ''স্বপ্ন নাকে খৎ দিচ্ছে/ ধুলোয় মুখ ঘষে ছিন্ন-পাখা রক্ত মাখা/ কল্পনার ডানা।'' কবি কলম ও কাগজ নিয়ে নিজের হৃদয়ে ডুব দিয়ে সেই রক্ত-বন্যাা দেখে আঁতকে ওঠেন। তিনি তাঁর কাব্য ধারায় সেই প্রতিক্রিয়া নিহিত রেখেছেন।

কিন্তু কবির দৃঢ় প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ বিশ্বাস - একদিন মুছে যাবে রক্তের দাগ। কেননা, কবি দেখছেন জগত ক্রমশঃ বদলাচ্ছে। এই ভাবনায় তাঁর সৃষ্টি 'বদলাচ্ছে দিন।' তিনি জগৎ ও মানুষের বদলে যাওয়াকে ছন্দবদ্ধ করেছেন আলোচ্য কবিতায়।

এখানে তিনি বদলে যাওয়া দুনিয়া, দুনিয়ার মানুষের জীবনশৈলী ও মানসচেতনা বিবৃত করেছেন। কবি তাই লিখেছেন, ''দুনিয়া ছিল কাল যেখানে,/আজ আর-/সেখানে নেই/ বদ্ধ স্রোতে ঢল নেমেছে/ কূল-ছাপানো/ বন্যার।'' এবং তিনি দেখছেন, ''খুলে যাচ্ছে দরজা জানলা/ বন্ধ কপাট/ সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।''

কবি দেশ-বিদেশের মানুষের প্রাণ নাশকারী শত্রুদের রক্তে জমাট চিহ্ন মুছে দেবার দৃঢ় প্রত্যয়ী। উচ্চকিত কণ্ঠে তিনি মনুষ্যত্ববোধের বিজয় ঘোষণা করেছেন এই কবিতায় — ''সামনেই/ ভেসে যাচ্ছে রক্তে জমাট/ নিষ্ঠুরতার জবরদস্ত স্মৃতি। . . . . তোলপাড়! / রসাতলের হাঁ-মুখ থেকে/ পিছিয়ে এলে বুঝিয়ে দেবে/ সবার ওপর আজ সত্য/ মনুষ্যত্ব।'' (বদলাচ্ছে দিন / যা রে কাগজের নৌকো) স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের সুবিধাভোগী অসহায়, বিপর্যস্ত, নিরীহ নাগরিকের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভয়ে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। দলে দলে দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা - কবির ভাষায় : ''রাজায় রাজায় যুদ্ধ'' তাদের আসক্তি ভোগে, ক্ষমতায়, শোষণে, কৌশলে আর ভোটের বাক্সে। সাধারণ নাগরিকের সামনে নেতারা নিজেদের অনেক বড় আদর্শের, উচ্চমাপের, জনহিতৈষী প্রজাকল্যাণকামী সততার ভান করে। কবি তাই - মানুষের চেতনা জাগাতে লেখেন —

''চাহিদার একমাত্র যোগান
জনপদে ভোটের পসরা।
সততার ভেক ধরে ভান।
দাঁড় করিয়ে পুতুল মুখরা
মজা লোটে বান আর খরা।'' (মজা দেখ / যা রে কাগজের নৌকো)

'যা রে কাগজের নৌকো' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত ''রাজভিখারী'' শিরোনামের কবিতাটিতে কবি সুভাষ একটা সময়ের সামাজিক অবক্ষয়, রাজনীতির নীতি ভ্রষ্টতা, ধর্মীয় গোড়ামী ও সার্বিক ভণিতার মুখোশ উন্মোচন করার প্রয়াস রাখেন। এখানে সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পচেতনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমরা পাই। কবি আলোচ্য কবিতায় লিখেছেন — ''হাটে মাঠে বটে মোসাহেবদের/ সভায় খেউড়খিস্তি -/ সাধু সেজে রাজা সাহেব স্বয়ং/ বড়ে ঠেলে হাঁকে কিস্তি। . . . . মন্ত্রীরাদের কুমন্ত্রণায়/ ভেকধারী রাজভিখারী-/ আগাছার জঙ্গল মাথা তোলে/ মুখ টিপে হাসে শিখারী।।'' (রাজভিখারী / যা রে কাগজের নৌকো) সমাজের কলকাঠি নাড়ে একশ্রেণীর ক্ষমতাবান মানুষ। তারা ভণ্ডামির নামাবলী গায়ে দিয়ে কেবল শোষণ ও ভোগের নেশায় মত্ত। এই ক্ষমতাবান মানুষের কুচক্রে জনসাধারণের দুর্গ প্রাচীর রূপ ঐক্য ভেঙে যায়। কবির ভাষায় ''কামানের মুখে মাটি টলমল/ ভাঙছে দুর্গপ্রাচীর।''

এই কাব্যের অন্তর্ভূক্ত ''এসো হে'' শীর্ষক কবিতায় কবির লোকায়ত জীবন চেতনা প্রকৃতির বুকে জায়গা করে নেবার আহ্বান জানায়। এই মাটির জীবন চেতনার সঙ্গে সঞ্চিত তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতি। কবি যে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছেন, তাঁর বয়স তাঁকে অনেক সময় মনে করিয়ে দেয়।

সেই ভাবনার ছাপ রয়েছে আলোচ্য কবিতায়। তিনি বলেন, ''অনেকটা রাস্তা উজিয়ে/ আজ এই পড়ন্ত বেলায়/ আমি আসছি।'' ছেলেবেলায় কবি ধুলো-বালি-কাঁদা-কাঁটা-জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করে তাঁর ''দুটো পা-য় /কাঁটায় কাটা ছেঁড়ার দাগ।'' পুরনো দিনে গৃহের মহিলারা দিতেন লম্বা ঘোমটা। আজ আর সেই রুচি নেই কারও। তিনি লেখেন — ''গোধূলির শূন্য দাওয়ায় / এমন কেউ নেই যে তার মুখ ঘোমটায় ঢেকে / পিঁড়ি পেড়ে দেয়, / কনুই ছুঁয়ে এগিয়ে দেয় / এক ঘটি তৃষ্ণার জল।'' কবি বাল্যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে খেলা করতেন। সেই ছেলেবেলার কচি মনে সাড়া দিয়ে কবি লেখেন - ''উঠোনে খেলে বেড়ায় / একা একা / হাতের লাঠির ঠক ঠক / আর গাছের পাতার / টুপটাপ শব্দ।'' কবি অন্তরে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে সেই সুখের দিনগুলি, সেই সহজ মানুষগুলি খুঁজে বেড়ান। কিন্তু আর তাদের দেখা পান না কিছুতেই — ''ঘরে ফেরা পাখির কলরবে, /দূরাগত শাঁখের আওয়াজে/ দিনাবসানের আজানে/ আমার সেই ডাক/ আর কাউকে না পেয়ে/মাথা নিচু ক'রে/ আবার আমার কাছেই ফিরে আসে।।'' (এসো হে / যা রে কাগজের নৌকো) কবি চোখ বুজে তাঁর মানসলোকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সমাজ সংস্কৃতির অন্ধকার ছবি তুলে ধরেছেন 'ভগ্নদূত' শিরোনামের কবিতায়। সেই অন্ধকারে হানাহানি ও মানবজগতের শত্রুদের মুখোমুখি ''সামনে এসে দাঁড়াবে/ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ/ সজোরে/ চোখের পাতা খুলে/ শুধু তখনই আমি তাকাব।'' প্রতীক্ষা করছেন সেই প্রতিবাদের মুখ, সেই আগুনের মুখের জন্য। তিনি সমাজের চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন —

''কে কী কেন কোথায় কেমন ক'রে
পাতায় পাতায় হেঁটে চলেছে
কারো গর্দান নেবে ব'লে
শকুনের মুখে হাসি ফুটিয়ে
নতুন কার
কার লাশ পড়বে ভাগাড়ে।'' (ভগ্নদূত / যা রে কাগজের নৌকো)

জগতের সমস্ত জঞ্জাল দূর করার জন্য যৌবনে যাদের সঙ্গে কবি রণে, বনে, জলে ও জঙ্গলের পথে মরণকে সঙ্গী করে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে ছিলেন তাঁদের খোঁজ করে এখনও কবি হৃদয়। কবি তাঁদের নাম ধরে হাঁক দিয়ে বিফল মনোরথে হতাশ হন আজও। কবির এই ভগ্নহৃদয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ''দে-দোল'' শিরোনামের কবিতায় — ''নিরুত্তর ধ্বনি/ স্খলিত পায়ে টলতে টলতে ফেরে/ স্মৃতিবিধুর পাষাণভাঙা পথে/ নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ একা /বিফল মনোরথে।'' (দে-

দোল / যা রে কাগজের নৌকো) কবি আজও সেই সাধারণ জীবনের অখ্যাত সংগ্রামী বন্ধুদের স্মরণ করেন আলোচ্য কবিতায়—

''দীন-দরিদ্র বন্ধুরা সব
অখ্যাত নাম
তারা কোথায় গেল ?
বুকের মধ্যে ছিল যাদের ভালোবাসার খনি ?''(দে-দোল / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি পৌরাণিক মিথ-কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য কাব্যের ''সপ্তাহ প্রতিদিনই'' শিরোনামের কবিতায়। কবি অখ্যাত নাম-যশ-প্রতিষ্ঠাহীন সেই সব দানবীর শ্রমিক ও কর্মী মানুষকে পৌরাণিক মিথের রূপকল্পে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। দানবীর শ্রমিক-কর্মচারী-খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের প্রতিকল্পে দধীচিকে কল্পনা করেছেন। অথর্ব মুনির ঔরসে একদা শান্তির গর্ভে যার জন্ম হয়েছিল। স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বলিদান দিয়ে যিনি বৃত্রাসুরকে নিধনের বজ্র নির্মাণের জন্য অস্থি দিয়েছিলেন। বিনা স্বার্থে, বিনা যশে, বিনা লোভ ও লাভে যিনি নিরূপায় দেবতাদের স্বর্গে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত অস্থির বজ্রে স্বর্গে শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা বৃত্রাসুরের হাত থেকে রক্ষা পান। সেই অখ্যাত, নীরব মহান দাতার রূপকে কবি শ্রমজীবি মানুষকে স্মরণ করেছেন। এখানে উন্নত জীবনদর্শনের পরিচয় পাই আমরা।

'যা রে কাগজের নৌকো' কাব্যের সর্বশেষ মৌলিক কবিতা 'অনেকের গান'। এই কবিতাটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সম্মেলন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণ করেছেন কবি প্রথম কবিতাটিতে। কবি দিন বদলের রূপ-বৈচিত্র্য বিচিত্র রঙে এঁকেছেন আলোচ্য কবিতায়। কবি অনেক প্রাণ বলিদান ও অনেক রক্ত ঝরানোর ফলে ইতিবাচক ফল যেন হাতে হাতে পেয়েছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ জেগে উঠেছেন। তিনি আশান্বিত যেন লড়াইয়ের সুফল এতকাল তাঁরা হাতে পেয়েছেন। কবি তাই সংগ্রামে নিহত সন্তানের মায়ের উদ্দেশ্যে ডাক দেন — '' চোখ মেলো, / ও শহীদের মা, / ও বাছা, ও প্রিয়তমা, / যে খুনী সে পায় না ক্ষমা / রক্তের ধার আছে জমা / লক্ষ হাত আজ নখে ধার দেয়।/ দেখো, দেখো. . . . .।'' (অনেকের গান / যা রে কাগজের নৌকো) ভারতের কোটি কোটি মানুষের জনজাগরণের জোয়ারে উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কবি উচ্ছ্বসিত। কবি এই নতুনভাবে জেগে ওঠার নতুন জগৎ, নবজীবনের নববিধান আমাদের দেখাতে চেয়েছিলেন। কবি জগৎ, জীবন ও মানসের পরিবর্তনের বিন্যাস ও প্রকৃতিকে আমাদের শিল্পিত রূপে উপহার দিয়েছেন। কবি পুলকিত হৃদয়ে লেখেন —

''জাগো, জাগো, দেখ মা গো
কলের মজুর ক্ষেতের কিষাণ
শিকল ভাঙে, ওড়ায় নিশান
জগৎ জুড়ে নতুন বিধান
কোটি কণ্ঠে জীবনের গান গায়।।'' (অনেকের গান / যা রে কাগজের নৌকো)

জীবনের সমস্ত গ্লানি দূর করে অন্ধকারের দিনগুলি আজ পরিবর্তন হয়েছে। দিন বদলে কবি পুলকিত; স্বদেশবাসীদের বদলে যাওয়া দিনের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র সুখ নিজের হৃদয়ে নেবার জন্য আহ্বান জানান —''দেখ, দেখ দিন বাদলায় -/ও আমার দেশের ভাই,/ পুব আকাশে রং ধরেছে/ আলো আসে,/ আঁধার যায়।'' কেবল মুখে বড় বড় বুলি ছাড়া নয়, ''কাজে কথায় সমান''হবার কথা বলেছেন কবি 'অনেকের গান' শিরোনামের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায়। কবি মানুষের সামনে শুধু লম্বা চওড়া ভাষণ পছন্দ করেন না ; কারণ যে মেঘ গর্জে শুধু, সে কখনো বর্ষে না। যারা যাত্রা নাটকে অশুভ শক্তিকে দমন করে তারা বাস্তবে সমাজের শত্রুদের দমনে সত্য বলে গণ্য হয় না। কবি তাই বলেন — '' লাগে না সে/ কোনো কাজে/ যাত্রাতেই যা ভিমের সাজে/ ভাঙে দুর্যোধনের উরু''। পুরাণের মিথকল্পে কবি মহাভারতের দুর্যোধনের দমনের মধ্য দিয়ে শোষণকারী, অত্যাচারীর দমন কল্পনা করেছিলেন। সে তো যাত্রা-অভিনয়ে অনেকেই দেখান। কবি চান সামাজিক সত্যতায় বাস্তবায়িত করতে। সমস্ত গ্লানি, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন দূর করে একটি সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কবি —

''মুক্তধারায় বাঁধ দিলে তো বিজ্‌লি পাবে
লাগাম ছাড়ো, অশ্বমেধের ঘোড়া যাবে।
যেখানে হয় সবাই সমান
সবার জন্যে সকলের টান
সেখানে হাত আপনি বাড়ান
আল্লাহরি মারাংবুরু
ডাক দিয়েছে. . . . . .।'' (অনেকের গান / যা রে কাগজের নৌকো)

কবি সুভাষের উপলব্ধিতে বহুবার চিন্তনের মোড় ফেরা আমরা উপলব্ধি করি। কবি নিজেকে যেন ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছেন। নিজেই নিজের ভাব শিল্পপ্রকরণ, শৈলী, বিষয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারে এগিয়ে চলেছিলেন। কবি এই মোড়ফেরা পর্বের শেষ লগ্নের কাব্য 'ধর্মের কল'

(১৯৯১)। তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন সুবীর রায়চৌধুরীকে কবি 'ধর্মের কল' কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন। প্রকাশকালে এই কাব্যটির কবিতার সংখ্যা ছিল মোট ৪৩টি। সেই কবিতাগুলি হল 'স্বর্গীয়', 'এক মাঘে শীত যায় না', 'মুক্তকণ্ঠে' 'বহুবচনে', 'গদির মধ্যে যদি', 'সাত রাজার ধন', 'নিরঞ্জন', 'নেই মানে?', 'বুড়ি বসন্ত', 'হাল ছাড়া', 'ফেউ', 'উড়োচিঠি', 'কিংবদন্তি', 'দেয়ালে লেখার জন্যে', 'এখন কে যায়?', 'যেতে বললে', 'লাফ দেওয়ার গল্প', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'জর্জ সেফেরিস-এর অবতার', 'সখা হে', 'বাপু হে', 'হচ্ছেটা এই', 'ধর্মের কল', 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া', 'নাটকের গান', 'দেয়ালের লিখন', 'বাপ সকল', 'লোকে বলে', 'ময়দানব', 'ওঠাপড়া', 'এক মাকড়সা', 'এক দুই তিন', 'দাদা মশাইয়ের বৈঠকখানা', 'রমুলা', 'পিফ্-এ', 'ভুট্টা', 'ষটকে', 'দূর থেকে', 'ভাষ্যি', 'পৃথিবী', 'চিআ চিচার', 'ববি', 'আনন্দ', 'শিগ্গি শিগ্গি', 'ভাগ', 'হাউজ দ্যাট'। এগুলির মধ্যে দুটি কবিতা অনুবাদ কবিতা এবং ৪১টি মৌলিক কবিতা। অনুবাদ কবিতাদুটি হল - 'জর্জ সেফেরিস-এর অবতার' এবং 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া নাটকের গান'।

'ধর্মের কল' কাব্যের প্রথম কবিতা 'স্বর্গীয়'। এই কবিতাটিতে একটি ছোট্ট কাহিনী স্মৃতিচারণার মতো করে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। কবিতাটি এক নিমেষে বলার মতো করে বিবৃতি ধর্মী ভঙ্গিতে রচিত। এই কবিতাটিতে নিতান্ত সাধারণ ব্যবহারিক উপাদান কবিতার অঙ্গরূপে সুষম ব্যবহারের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কবি যে বাইরে কাঁচের চুড়ির শব্দ শুনেছিলেন— 'অবিকল তার মতো/ অথচ সে নয়।'' - ভ্রান্তি মোচনে কিন্তু দেখেন ''সাদা সিঁথি, মোটা থানে তাকে/ দেখাচ্ছে স্বর্গীয়।'' - দুয়ের মধ্যে কবির ভাবনা ''অন্ত্যমিল অনুপ্রাস/ উৎপ্রেক্ষা যমক/ কিছু নেই''।

আলোচ্য কবিতায় দ্রুত চলমান ছবির মতো আমরা দেখি—''দাওয়ার ওপর রাখা /বুল চৌকি/ পা-ধোয়ার জল, গামছা -/ কাঠের খড়ম/ দড়ির আলনায় ঝুলছে/ উর্দি ছেড়ে পরবার মতন/ আটপৌরে কাপড়/ শূন্য ঘর, /পিঁড়ি পাতা, / পাথরে গরম ভাত, /কাঁচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবু/ মেঝেতে শোয়ানো হাতপাখা।।'' (স্বর্গীয় / ধর্মের কল) কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বারে বারে বদ্লে নিয়েছিলেন কাব্যের গতি। কখনো ভাষা, কখনো রীতি, কখনো প্রকরণের দিক থেকে সেই মোড় ফেরাকে আমরা উপলব্ধি করি। 'যা রে কাগজের নৌকো' কাব্যের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র ভাষা ও প্রকরণে 'ধর্মের কল' কাব্যের কবিতাগুলি।

এই কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'এক মাঘে শীত যায় না'। এই কবিতাটির মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের স্মৃতিভরা ছবিগুলি কবির বৃদ্ধ বয়সের হৃদয়ে আজও অমলিন। কবির প্রত্যাশা যেন পূরণ হয়নি স্বাধীনতা লাভের পরও। দেশের গণতন্ত্রের সুযোগে

স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক কোন্দল, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রক্তপাত, বিভেদ, অসাম্য, জনসাধারণের জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি সমকালের স্বাধীন ভারতের ছবির কদর্যরূপ দেখে ক্ষুব্ধ। তাই বলেন— ''শূন্য শ্মশানে শুরু হল/রক্ত বসনে / জনগণতান্ত্রিকের শবসাধনা।''

সমকালে কবি দেখেন ভারতের অসংখ্য মানুষ অনাহারে, অনশনে, ফুটপাথে, কলে-কারখানায়, বাগানে, খোলা আকাশের তলে দিন কাটায়। পরাধীন ভারতেও একদা অনশন-সংগ্রাম ভাঙার জন্য ''বাছারা যাতে কিছুতেই অনশনে না মরে / তাই পাঠানো হয়েছিল / কামান দাগা ট্যাঙ্ক''। তাদের ওপর চলে বন্দুকের গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল, লড়াই করে সংগ্রামীরা তো কোনো অন্যায় করে নি। দেশের প্রতি সেদিনের সংগ্রামীদের হয়ে কবিকে যেন আজো কেউ জানায় ''আমরা কোনো অন্যায় করিনি, মাগো. . . . . .''।

সেই সংগ্রামীদের শবদেহের ওপর এই স্বাধীন দেশের ভিত গড়ে উঠেছিল। কবি সংগ্রামীদের প্রতি একাত্ম হয়ে তাদের ব্যথা ও কষ্টকে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের ত্যাগের কথায় বলেন— ''টাটকা ঘাসের চাপড়ে

চাপা পড়ে গেল চাপ চাপ রক্ত

ঝাটার হাত ফসকে থাকার মধ্যে রইল

জামার কয়েকটা বোতাম, জুতোর ছেঁড়া ফিতে

মাথার কয়েকটা ক্লিপ

বইয়ের ভাঁজ থেকে খ'সে পড়া ফুলের শুকনো পাঁপড়ি।'' (এক মাঘে শীত যায় না/ধর্মের কল) কবি অন্যায়, বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন তীব্র প্রতিবাদী। ন্যায়ের পথে, মানুষের জন্য, সত্যের জন্য যারা কাজ করেছিলেন তাদের প্রতিও কবির ছিল উচ্চকিত প্রসংশা। কবি 'মুক্ত কণ্ঠে বহুবচনে' শীর্ষক কবিতায় একজন কমরেড নেতার বার্ধক্যেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা স্বীকার করেছেন কুণ্ঠাহীন ভাষায়। সেই কমরেড দাদার এখন ''তিনকাল গিয়ে এককাল।'' এই বৃদ্ধ দাদার প্রতি সবার শুভেচ্ছা ''অতএব উঠল ধুয়ো'' ''দাদাকে দাও জোরসে দুয়ো''। সবার ইচ্ছে ছিল তাঁদের প্রিয় দাদাকে সবার নেতা করে নেবার। দাদার হাতে রথের রশি অর্পণ করার। সেই দাদা আজ জীবনের শেষলগ্নে পৌছেছে। দাদার উদার হৃদয়ে সবার ছিল সমান স্থান, প্রত্যেক মানুষের একমাত্র পরিচয় ছিল দাদার কাছে মানুষ বলে। কবি সেই রকম একজন দেশনেতার কল্পনায় লেখেন — ''ভুঁয়ে পেতে ভোটকম্বল/ দিতে চান সবাইকে কোল/শ্রেণীমত নির্বিশেষে/ ইস্ কী সর্বনেশে. . . . . / বলেন, সবার ওপর সত্য/ প্রকৃতি মা-র কোলজোড়া ধন/জগৎজোড়া মনুষ্যত্ব।'' (মুক্তকণ্ঠে বহুবচনে / ধর্মের কল)

সমাজে যারা অসত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, কথার সঙ্গে যাদের কাজের কোন মিল থাকে না, মানুষকে ভাওতা দিয়ে সমর্থন আদায় করে যারা, ভণ্ড ''শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট'' সেই পশুরাজের মুখোশ খুলে দেবার আহ্বান কবির ''গদির মধ্যে গদি'' শিরোনামের কবিতায়।

কবি মনে করতেন মিথ্যাচারিতার মধ্য দিয়ে কেবল লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে তারা 'জী-হাঁ' করে রাখতে চান। সেই ভণ্ড নেতার একদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙবেই। অসত্যের ওপর তাদের প্রতিষ্ঠা বলেই তাদের সর্বদাই ভয় - কখন কী হয়! কবি বলেন —

''ঘাঁটি
যতই কেন আগলে রাখত সদলে সবলে
কথার সঙ্গে কাজের অমিল মাত্রা ছাড়া হলে
আস্তে আস্তে পায়ের তলায় সরে যাবেই
মাটি।'' (গদির মধ্যে গদি / ধর্মের কল)

কবির আলোচ্য কবিতার শীর্ষনাম নির্বাচনের মধ্যে আছে বিশেষ ইঙ্গিত। যারা মানুষকে ভাওতা দিয়ে গদি আঁকড়ে থাকে তাদের সেই গদির কোন স্থায়িত্ব নেই যদি সেই নেতার মধ্যে সততার অভাব থাকে। মানুষের জন্য কাজ করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতে যারা কেবল আত্মকেন্দ্রিক ভোগ সর্বস্ব হয়ে পড়েন সেইসব ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতার পতন অবশ্যম্ভাবী। কবি মনে করেন তারা জনগণের, দেশের ও দশের শত্রু। তাই একসময় তাদের ''ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে হাঁকচম্‌কা / হালুম।''

মানুষ অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন সেইদিকে, যেদিকে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারেন। মানুষের জন্য কাজ করার মতো মানুষ চান কবি। সেরকম মানুষের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু পৃথিবী যে সেরকম দেশনেতার দিকেই তাকিয়ে থাকে। তারা এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করার পরও ভালো কাজের মধ্যে হয়ে থাকেন অমর। মানুষের হিতার্থে, মানুষের শুভার্থে যারা নিবেদিত প্রাণ সেখানে সত্যের শক্ত ইমারত নির্মিত হয়। সেখানে তৈরী হয় মানবতার ইতিহাস। কবি সেরকম সত্য পূজারী, প্রজাহিতৈষী। জনদরদী কাজের মানুষকে জননেতা হিসেবে পেতে চান। কবি তাই লেখেন —''যার হাতে প'ড়ে /ধুলোমুঠি হয় সোনা।/দুনিয়া ডাকছে/তার দিকে হাত বাড়িয়ে/যেখানে শেকড়/সেখানে সে থাকে দাঁড়িয়ে (সাতরাজার ধন / ধর্মের কল) মানুষের নিজস্বতা থাকে জগৎ ও জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টির মধ্যে। তবে কেউ কাউকে ছোট দেখার মধ্যে বীরত্ব নেই। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে যেন ''বাঁধনের মধ্যে ছাড়।'' কবির পথ চলা, মাঠ, ঘাট, বন্দর, শহর ঘুরে ঘুরে চলার ও জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

মধ্যে ছিল স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীন জীবন শৈলীকে বাধা দেবার পক্ষে ছিলেন না তিনি। জীবনের সংগ্রাম, মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে, নিজের নিজের চলার পথকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার পক্ষপাতি ছিলেন না তিনি। তাই তাঁর আহ্বান —

''জল থাক জলের মতো
আগুন আগুনের মতো
এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে
জল যেন জ্বালাতে
আগুন যেন জুড়োতে না চায়।''(বুড়ি বসন্ত / ধর্মের কল)

কবি নির্দেশ দেন, ''যার যে জায়গা/ সেখানেই সে যেন / মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকে''। কেউ যেন তার নিজস্ব জায়গা থেকে সরতে বাধ্য না করায়। তাই ভাওতা দিয়ে, মিথ্যাচারিতার মধ্যে কবিকে যেন কেউ ঠকাতে না আসে। মিথ্যা গল্প, মিথ্যা তোষামোদ তাঁর পছন্দ ছিল না। কবির নির্দেশ ''ফুল থাক ফুলের মতো / খাঁড়া খাঁড়ার মতো / ফুল তুলে কেউ যেন আমাকে কাটতে / খাঁড়া তুলে কেউ আমাকে / যেন গন্ধ শোঁকাতে না আসে।''

কবি সচেতন শিল্পীমনে লক্ষ্য করেন শহর কলকাতার ক্রমবিবর্তন। তাঁর ''কলকাতা আর থাকে না তার/ আগের সেই বাসায়।'' কালো টাকার কারবারি, প্রমোটর, ফাটকা কারবারীরা শহর কলকাতার পুরনো বাড়ি নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়ে, সাবেকী ডোবা, পুকুর বুজিয়ে সেখানে গড়ে আকাশচুম্বি ব্যবসার বাড়ি। সেখানে ''এখন তারাই আকাশটাকে ঢাকে/ ইঁট পাথরের বানানো মৌচাকে।''

আলোচ্য কাব্যের 'হাল ছাড়া' শিরোনামের কবিতায় জন্ম দুঃখী, ইতর মানুষের মাথায় কাঁটার মুকুট দেখে কবিআত্মা কাতর। সমাজের একশ্রেণী আকাশচুম্বী পুঁজিতে, কালোবাজারী ও ভোগবিলাসিতায় মানবতা বোধহীন জীবন নিয়ে নির্বিকার রয়েছে। আর একশ্রেণী অবর্ণনীয় দৈন্যে ধুকতে ধুঁকতে দিন যাপন করে চলেছে। সেইসব হতভাগ্য আজও উপস্থিত — ''চাঁদির জুতোয় /লাঠির গুঁতোয়/ বাড়ি ছাড়ার মিছিল/ মুছে যাচ্ছে পায়ের চিহ্ন/ গুলির দাগে ছিন্ন ভিন্ন/ রক্তঝরা পাঁচিল।'' (হালছাড়া / ধর্মের কল) কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি হাসিমুখে সহ্য করে নিয়েছিলেন সমালোচনা। তাঁর বাল্যস্মৃতি ফুটে উঠেছে 'ফেউ' শিরোনামের কবিতায়। ছেলেবেলায় কবি পরিচিত কয়েক জায়গায় গিয়ে বাল্য স্মৃতিতে ধরা পড়ে - আঙুলের আংটি, তামার রিং, হাতের তাবিজ, পুরনো পয়সার মতো টিকের দাগ, পানদোক্তার পুঁটুলি,

ঠোঁটে টেপার খৈনী, বুক পকেটের নোটবই, বাড়ির ন্যাড়া ছাদ ইত্যাদি। তাঁর যেকোন কিছুর ভালমন্দের সঙ্গে যুক্ত পথচলা। কবির সরল নিরলঙ্কার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নিহিত ছিল স্বতন্ত্র মনের বিষয়। এর মাঝে তাঁকে অনুসরণ করে মানবিক চেতনা। কবিতাটির শেষ স্তবকে সেই ভালবাসার ছবি নিখুঁত রূপে এঁকেছেন কবি —

''পেছন থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে
এক শশব্যস্ত পদশব্দ
আর আমাকে চমকে দেয়
একেবারে ঘাড়ে এসে পড়া
কার যেন গরম নিঃশ্বাস।।'' (ফেউ / ধর্মের কল)

এই কবিতায় কবির বিষয় বিন্যাস ও শব্দ যোজনা নিখুঁত শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। এই পর্বে মানুষের জন্য কবির হৃদয়ে আকুল করা ভালবাসা। কল্পনার সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাঁর ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস ফেলে। তবে ভালবাসা নিছক লৌকিক ভালবাসা নয়। মানুষকে নিয়ে মানুষের পাশে থাকার সম্মিলিত ভালবাসা। উত্তম পুরুষে কবি বলেন —'' ব'সে রয়েছি কালবোশেখি/ঝড়ের আশায়/ ভালবাসা বাড়াচ্ছে হাত/নীলকণ্ঠ পাখির বাসায়।।'' (উড়ো চিঠি / ধর্মের কল) কবি একবার মাটির দিকে, আর একবার শান্তির প্রত্যাশায় তাকান। তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানে মর্মান্তিক রক্ত, সেখানে ছিন্ন ভিন্ন পাখির পালক। শান্তিকামী কবিমন আহত হয়।

কখনো কখনো হাল্‌কা লোক ব্যবহৃত শব্দকে কবিতার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন কবি সুভাষ। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধস্পৃহায় কবি আবেগের আতিশয্যে লঘু শব্দকে ব্যবহার করেছিলেন অনায়াসে —

''পণ চায় যে গুখেকোর ব্যাটা
মুখে মারো তার মুড়ো ঝাঁটা।।''

(অথবা)

''খাচ্ছি গাছের খাচ্ছি তলার
সংসদে জোর দেখাই গলার।।

(অথবা)

''গৌরী সেনের বাপের টাকায়।
বাছাধনেরা ফলার পাকায়।।'' (কিংবদন্তী / ধর্মের কল)

রাজনীতির কোণে কোণে ঘুণ ধরেছে। মূল্যবোধ, আদর্শ, দায়িত্ব ও ত্যাগের রাজনীতি কবি আজ আর দেখতে পান না। মানুষকে ঠকানো, কৌশল, ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা রাজনৈতিক মঞ্চকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। কবি সেই ঘুণ - ধরা রাজনীতিকে তাঁর কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন। যার থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে কবি নির্দেশ করেন —''রডনের ডন বৈঠকে করে/বাবুরা যে ওঠাবোস/হাত থেকে পাছে খ'সে যায় দিন/ পুরুষের খোরপোষ।/ . . . . রাজা করবার লোভ দেখালেও ডাইনী/ প'ড়ো না কো, দাদা, প্যাঁচে।/ শেষকালে ও-ই কেড়ে নেবে মই/ চড়িয়ে তোমাকে গাছে।।''(দেয়ালে লেখার জন্যে / ধর্মের কল) বৃদ্ধ কবির সঙ্গে এই জগতের মায়া আরো গভীরতর হতে দেখা যায়। কবির মনে কখনো কখনো নাড়া দেয় মৃত্যু-ভয়। একদিন কবি শবযাত্রা প্রত্যক্ষ করে শেষ যাত্রার কথা কল্পনা করেন। পরিবার পরিজনদের নিয়ে, এই জগৎ সংসার থেকে একেবারে চলে যেতে চায় না কবির অন্তরাত্মা। কবিমন বলে ওঠে ''এমন মজার খেলার ঘর ছেড়ে/ দূর! এখন কে যায় ?''। 'ধর্মের কল' কাব্যের অন্তর্গত 'এখন কে যায়?' শিরোনামের কবিতায় কবি এই ভাবনার কথা বলেছিলেন। কবি মেয়ে, নাতনি ও অন্যান্য পরিজনদের বন্ধন ঘুঁচিয়ে এই মুহূর্তে একেবারেই যেতে রাজি নন। কবি তাঁদের নাতনিদের কাছ থেকে সরে যেতে চান না। কবি তাঁর আত্মকথায় লেখেন —

রঙের বাক্স খুলে বসেছে
আমার দুই নাতনি
তারা কী আঁকে না দেখে
আমি নড়ছি না।'' (এখন কে যায়? / ধর্মের কল)

এই শেষকালে কবি যে কারও আহ্বানে সাড়া দিতে উৎসুক। সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। কাউকে না করতে চান না। কবি মনের ভাব নিখুঁত বিশ্লেষণে মেলে ধরেছেন —'' কেউ যেতে বললে হয়/ আমি অমনি/এক পায়ে খাড়া /যাবার জন্যে মন উচাটন হয়/কান খাড়া ক'রে থাকি/হয়ত কেউ/ এখুনি দরজায় কড়া নাড়বে।'' (যেতে বললে / ধর্মের কল) কবি বাস্তব জীবন থেকে কাব্যের ভাষা গ্রহণ করেছেন। পার্টির রেষারেষি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনৈতিক বিরোধকে এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন —

'' হ্যান করব ত্যান করব
সতীন কেটে আলতা পরব . . . .
কত সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!
ঝ্যাঁটা মারো ওদের মুখে।'' (লাফ দেওয়ার গল্প / ধর্মের কল)

একদল আর একদলকে শাপশাপান্ত করছে, অন্যদল ছ্যা ছ্যা করছে। অন্যজন মুখে কুলুপ দিয়ে আছে। এই দলাদলির মধ্যে যেমন সভ্যতা ও সৌজন্য শিষ্টাচারের লেশমাত্র নেই, তেমনি তাদের ভাষারও কোন পালিশ নেই। কবি সামাজিক সত্যকে বাস্তবিক প্রয়োগ করেন 'লাফ দেওয়ার গল্প' কবিতায়। কবির অন্তরে নিহিত চল্লিশের দশকের পরাধীন দেশের সন্তানদের আদর্শ, চেতনা ও ত্যাগের ছবি। এই স্মৃতি রোমন্থন করে কবি হৃদয় রক্তাক্ত হয়। তিনি এই অন্ধকার ও সামগ্রিক অবক্ষয়ের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের নিষ্ঠা ও ত্যাগের স্মৃতি। দৃঢ়তার সঙ্গে কবি বলেন - "অন্ধকারে ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে/ তুলে আনব হারানো সব খেই"। এই পড়ন্ত বেলায় কবি সমাজ, দল, রাজনীতি প্রশাসন ও শরীরের বিরুদ্ধে যে আজও লড়াই করে চলেছেন সেটা তার কাছে "সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে খেলা"। কবি দেখেন যে দিন বদলে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তার পথ খুলে দিয়েছে। সেখানে সমন্বয়, সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালবাসার পথ তৈরী অনেক সহজ। কবি পুরাণের কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের রূপকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কানে বার্তা দিতে চান যে —" চাই এবার/ পায়ের নিচে মাটি।/ রাজলোভ, রক্ত, কাটাকাটি/ আর নয়। .... ফোটাও সুখে আবার ভুবন -/ ভোলানো সেই হাসি, / জীবন হোক ধন্য।।" (সখা হে / ধর্মের কল) এই জগতের, দেশের, সমস্ত মানুষের শুভ চেতনা ও মঙ্গল কামনায় কবি মন আলোড়িত। কবি জগৎ ও জীবনের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখেন নিজের মনকেও। আত্ম বিশ্লেষণ করে নিজের ভালো, মন্দ, সুখ-শান্তি, কুৎসিত-সুন্দর, অমৃত-বিষ, ভদ্র-ইতর - সবকিছুকে দেখে নেন। গান্ধীজীর জেলে বন্দীর মতো তাঁর জীবন। যেন কোথাও বন্ধনে যুক্ত —"নিজেকে আমি খালি বলেছি, বাপু হে --/ আর তো প্রায় মেরে এনেছিস/ যাবজ্জীবন মেয়াদ/ স্বয়ম্ভুর ব্যূহে/ নামিয়ে রেখে খানিক ভার/ চোখের ঠুলি খুলে এবার/ মনের সুখে দে শিস্/ আর তো প্রায় মেরে এনেছিস/ যাবজ্জীবন মেয়াদ/ সামনে থেকে সরিয়ে ফেল্ গরাদ।"(বাপু হে / ধর্মের কল) কবি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে শারীরিক শক্তির সঙ্গে যেন সহমত হয়ে চলতে চান। এ সময় প্রকৃতি ও শক্তির সঙ্গে তাঁর বিরোধে না যাবার সময়। ভাল-মন্দ সব কিছুকে কবি তাঁর উদার হৃদয়ে স্থান দিতে চান। সমাজের একশ্রেণির শঠ, কৌশলী, ভোগবাদী মানুষ সমাজের লাভের গুড় চিরকাল খেয়ে এসেছে। কোয়ালিশন সরকার যেন কবির দৃষ্টিতে "এজমালি / লাভের গুড় খাবার সরকার"/, আর যারা লড়াই করে, সংগ্রাম করে তারা যেন এক ধরনের বোকা। কবি এই বৈপরীত্য এঁকেছেন — "পেটে পিঠ ঠেকে/ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়/ বোকাদেরই মরণ/ পা-চাটারা গুছিয়ে নেয়/ ভোটবাজির ভোজবাজিতে/ ভানুমতীর খেল্ দেখায়।।" (হচ্ছেটা এই / ধর্মের কল)

'ধর্মের কল'কাব্যের নাম কবিতা সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতাটিতে কবি পৌরাণিক পটভূমিতে সময়ের ধর্মকে নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, বৃষ্ণিবংশের জাঁহাবাজ বীর প্রমুখ বীরদের দুর্নীতিতে যদুকুলের ক্ষয় হয়। পাশাপাশি কবি একশ্রেণির মানুষের মানবিকতার অবক্ষয়ের রূপ এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। সময় কলের মতো অবিরাম চলছে। চলাই তার ধর্ম। কবি সময়টার প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন —''সময়টা সুবিধের নয়/কিছু না ক'রে/ যে পারে সেই হাতিয়ে নিচ্ছে/খোলা মঞ্চে /চোখের পর্দাটুকুও না ফেলে/বহুরূপীরা /ঘড়ি ঘড়ি নিজেদের রং বদলাচ্ছে।'' (ধর্মের কল / ধর্মের কল) অভুক্ত মানুষের, সংঘর্ষে নিহত মানুষের লাশ-মর্গে লাইন করে ময়না তদন্তের অপেক্ষারত লাশ দেখেছিলেন কবি। মানুষের ভণ্ডামির কৌশল, শঠতার মুখোশে রূঢ় বাস্তবের মুখ দেখেছিলেন কবি। সেই সময়ের মুখোশধারী মানুষের ছবি আঁকতে কবি লেখেন —

সে সময় বিশেষ কালের ধর্মে মানুষের
''ভিক্ষের ঝুলি থেকে বক্ষের ধন
নামাবলীর ভেতর থেকে নেপালা
নগর সঙ্কীর্তনে
এখন হরিবোলের জায়গায়
বলো হরির রমরমা।'' (ধর্মের কল / ধর্মের কল)

কবি কাল্পনিক চরিত্র ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপেক্ষাযোগ্য চরিত্রগুলোর কালোপযুক্ত রং বদল করেন এখানে। আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'দেয়ালের লিখন' শিরোনামের কবিতায় স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপন্ন পরিস্থিতি ও কুফলের শিল্পিত রূপ দান করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গণ সাধারণের ভোটে একশ্রেণীর মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গদিতে একবার বসতে পারলে বাবু হয়ে সে ভুঁয়ে পা দিতে ভুলে যায়। এই শাসন ব্যবস্থায় দেশের মানুষের বৈষম্য দূর হয় না। একশ্রেণীর মানুষ রাজনীতির ফায়দা তুলে গাড়ি বাড়িতে ফুলে ফেঁপে ওঠে। পরের ধন আত্মসাৎ করে আর একটি শ্রেণী। কবি গণতন্ত্রের মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যেও বলেন — ''মন্ত্রীমশাই, করেন কী ? /পরের ধনে পোদ্দারি।/হাকিমসাহেব, করেন কী ? / খোদার ওপর খোদ্‌দারি।'' (দেয়ালের লিখন / ধর্মের কল)

এই ক্ষমতাবান মানুষ ''দেমাকে ভাবে ধরাকে সরা।'' কবি এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মজার বিষয়টি জানান — ''গণতন্ত্রে এটাই মজা।/ আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা।।'' কবি উদার, সততা ও হিতৈষীতে পরিপূর্ণ মানবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে নেতা হিসেবে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করার কথা

বলে। কবি স্বার্থন্বেষী আত্মকেন্দ্রিক নেতাদের 'পাততাড়ি' গোটানোর এবং স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার পরামর্শ দেন। কবি স্বার্থান্বেষী মানুষ গণতন্ত্র সরিয়ে দেবার জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি ঘৃণার সঙ্গে নির্দেশ দেন — ''ভোটে ও ভাই, ওটাকে সরা।।'' মানুষের সমস্ত কালিমা দূর করে স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে নবজীবনের আহ্বান জানান।

অত্যাচারিত, প্রতারিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের বিবেক জাগ্রত করার আহ্বান জানান কবি সুভাষ। তিনি এই জগৎ সংসারের মানুষের জীবনটাকেই ''এক অদ্ভুত নাটক'' হিসেবে বিশেষিত করেন। এখানে ''পালাক্রমে এর অভিনয় হয়, লোকেও পালা ক'রে দেখে। / যে দর্শক সেও এর অভিনেতা, / যে অভিনেতা সেও এর দর্শক। মারনেওয়ালার ওপর মার খাওয়া মানুষের বিবেককে, নতুন শতাব্দীর মানুষকে জাগানোর আহ্বান জানান। তিনি মানুষের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিবেক জাগ্রত করার আহ্বান জানান। কবি নতুন শতাব্দীতে বিবেককে জাগ্রত করে নতুন জীবন ও নতুন জগৎ নির্মাণের পরামর্শ দান করেন —

'' আমরা চোখ বুঁজলে
উত্তেজনায় টান টান হয়ে তোমরা দেখবে
যবনিকার সামনে জয়ধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে
নতুন শতাব্দীকে বরণ ক'রে নিবেহ
বিপদকে তুচ্ছ করা বিবেক ।।'' (বাপসকল / ধর্মের কল)

কবি মানুষের বিবেক জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন যারা ভয়, সংস্কার, রাজনৈতিক চাপের কাছে নত হয়ে ছিলেন। কবি সেই সব দুর্বল মানুষকেও নিজের শিরদাঁড়া খাঁড়া করে দাঁড়াতে বলেছিলেন যারা আর্থিক ও সামাজিক ভাবে দুর্বল। কবি সেইসব মানুষকে ঘৃণায় ধিক্কার জানিয়েছেন, যারা জো-হুজুর হয়ে সর্বদা আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকেন। সমাজের শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষণ করেছিলেন। কবি তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন —''সব শেয়ালের এক রা।/ঘটি নিলো, বাটি নিলো, /সুদখোর ঐ ড্যাকরা।/কড়ি গাছে ওর গজায় কি লো / নিত্যি নতুন ফ্যাকড়া ?'' (লোকে বলে / ধর্মের কল)

এছাড়া ''ধর্মের কল'' কাব্যের অন্যান্য কবিতায় রয়েছে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ কয়েকটি শৈল্পিক প্রতিক্রিয়া। ''ময়দানব'' কবিতাটিতে সুর সুরে হাওয়া , ময়দানব, শালপাতার বাতাস খেলা, রাস্তার বাতি, জোনাকির আলো ইত্যাদি প্রকৃতির সুন্দর ছবি এঁকেছেন কবি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা কবির শিল্পচেতনায় ছবি হয়ে ধরা পড়েছে। কখনো পাহাড়ের চূড়া, কখনো বানরের স্বাভাবিক চলাফেরা,

কখনো নাতি-নাতনীদের বায়না এই পর্বে কবি মনকে আলোড়িত করেছিল। ঘরের কোণের ছোট্ট মাকড়সাও কবির নজর এড়ায় নি। কখনো দমকা হাওয়া, কখনো হাডুডু খেলা, কখনো ক্রিকেট খেলার নিপুন শৈল্পিক চেতনা এই পর্বের কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। দেশের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল কখনো কখনো কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আবর কখনো কখনো পৃথিবীর ভিয়েনা, পেরিস, বার্লিন, লন্ডন, প্রভৃতি উন্নত দেশ কবিকে নাড়া দেয়। তারা এসে দেশের মেধাকে নিজের বলে চুরি করে নিতে দেখেছিলেন কবি সুভাষ। তাঁর ছোট নাতি কিংবা নাতনি পুপেকে নিয়ে কবিতা লেখার পাশাপাশি এই সময় দেশের চরম সংকটের কথাও শিল্পের বিষয় করেছিলেন এই পর্বের কবি সুভাষ। জাতীয় শোষণকে নিখুঁত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে কবি লেখেন ''ধনী দেশরা করছে শুনছি গরিব দেশের / ব্রেন চুরি।।''

সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত একটি অসাধারণ কাব্য ''বাঘ ডেকেছিল'' ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত। এই কাব্যটির অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে অসামান্য গুরুত্বপুর্ণ বিখ্যাত কবিতা হল 'এককাঠি দুকাঠি', 'আরে ছো', 'দূরান্বয়', 'বুড়ি ছুঁয়ে', 'পালানো', 'টানা জগতের প্রার্থনা' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রবাহের মোড় ফেরার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এখানে কবির সমকালীন বাস্তবের কতগুলি ঘটনা ও বিষয় অন্তর্মনে বিশেষ আলোড়ন ফেলেছিল। আলোড়িত বিশেষ প্রতিক্রিয়ার পরিণাম কতগুলি কবিতায় শিল্পিত রূপে আমরা পাই। সত্তর ও আশির দশকে কবি মনে ভারতের জাতীয় রাজনীতি ও বাংলার বাম সরকার পরিচালিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে কবি হতাশ ও ক্ষুব্ধ। সেখান থেকে মুখ ফিজিয়ে কবি ডুব দিতে চেয়েছিলেন মাটির প্রকৃতির বুকে। এই মানস পরিবর্তনের ফসল ''বাঘ ডেকেছিল'' কাব্যের কবিতাগুলি।

''বাঘ ডেকেছিল'' কাব্যের গুরুত্বপুর্ণ কবিতা 'এককাঠি দুকাঠি'। এই কবিতাটিতে কবির বাইরের বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর্মনের উদ্দীপনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কবি আলোচ্য কবিতার শুরুতেই লেখেন —''এক পা বাইরে।/এক পা / মনের ভেতরে।/ডালে দোল খায়/আকাশ কুসুম, /শৃঙ্খলে বাঁধা / স্মৃতি যায় ঘুম/ শেকরে।'' (এককাঠি দুকাঠি / বাঘ ডেকেছিল) এখানে কবি 'পা' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী সামগ্রিক ঘটনায় আলোড়িত মনের কথাগুলি ব্যঞ্জনাধমী হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর পা এর ব্যঞ্জনায় লিখেছেন — ''ঐ যখন ছাড়ে/লাগে ওর টান/থেকে থেকে হলে/ওর উত্থান/এ পড়ে। . . . . যখন ভয়ে / নিজেকে গোটাবে/এ তখন রাগ/ ফোটাবে ফোলানো /কেশরে।/এক পা বাইরে/ এক পা / মনের ভেতরে।।'' (এককাঠি দুকাঠি / বাঘ ডেকেছিল)

কবি তাঁর বার্ধক্যের ছবি এঁকেছেন নিজের রচিত কবিতায়। আলোচ্য ''বাঘ ডেকেছিল'' কাব্যের 'দূরান্বয়' শীর্ষক কবিতায় তাঁর বার্ধক্য জনিত উপলব্ধির কথা আমরা জানতে পারি। সেখানে কবি লিখেছিলেন —

''সাদা চুলে
দেখতে পাচ্ছি দরোজার
ঝন্‌কাঠে দাঁড়িয়ে -
টেবিলে পা তুলে
কোথাকার কে এক ছোকরা
তর্জনী নাড়িয়ে
সামনের দেয়ালকে বলছে,
'কে ওখানে বটে ?'
হটো হটো হটো !''   (দূরান্বয় / বাঘ ডেকেছিল)।

এখানে কবি নিজের জায়গা উত্তরসূরীকে ছেড়ে দেবার কথা বলছেন। কায়গা ছাড়তে ছাড়তে তিনি যেন একাকী অনেক দিক থেকেই। তাঁর যৌবন এখন কেবলই স্মৃতি। কবি সেই যৌবনের স্মৃতিকে পুণচ্চারণ করে বলেন —''ঘরের ভেতরে কোনো দৃশ্য নয়, / টেবিলে পা তুলে/ ঝাপ্‌সা এক দূরের অন্বয়-/ বহুকাল আগে তোলা / আমাদের যৌবনের ফটো।''। (দূরান্বয় / বাঘ ডেকেছিল) কবি এখন যৌবনের উত্তরসূরীর আহ্বান শোনেন। তাঁরা যেন তাঁকে ''হটো হটো হটো'' করে নিজেরা জায়গা দখল করতে চাইছে। কবির এই উপলব্ধি একজন বৃদ্ধ শিল্পীর বার্ধক্যের উপলব্ধিজাত নিদর্শন মূলক সৃষ্টি। এই উপলব্ধি মূলতঃ জগতের সমস্ত বৃদ্ধের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

''বাঘ ডেকেছিল'' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ উল্লখযোগ্য কবিতা 'আরে ছো'। এই কবিতাটিতে কবি মানুষের মধ্যে আজনৈতিক সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন। কবিতাটির শীর্ষনামে রয়েছে কবির বিশেষ মানস ক্রিয়ার ছাপ। কবি মানুষের নিছক রক্তপাত ও প্রাণনাশে নিজে রক্তাক্ত হয়েছেন। তিনি দেখেছেন মানবিক বিশেষ মূল্যবোধ ও শুভচেতনা সমাজে বিলুপ্তির পথে। কবি দেখছেন একশ্রেণীর রক্তলোলুপ স্বার্থন্বেষী মানুষের কাছে মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কবির জগদ্বিখ্যাত মানবিক উক্তি — ''শুনহ, মানুষ সত্য / সবার উপরে।'' কবি আজ যারা এই সর্বনাশী রক্তপাতের খেলায় মেতেছে তারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ নয়। তারা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কবির ভাষায় — ''তবুও যদি হত কোনো মাংসাশী ও মেছো / বেদব্যাস/ বোঝা যেত/ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ টুদ্ধ!/ তা নয়, কে এক বুদ্ধ. . . . . / আরে ছো !   (আরে ছো / বাঘ ডেকেছিল)

কবি মানুষকে ডেকে ডেকে চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছেন মানুষের হত্যালীলা ও ভয়ঙ্কর সর্বনাশের পরিণাম। মানুষকে ভেতরে মানবিকতার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন শিল্পের দ্বারা। কবি মানুষের সর্বনাশা উন্মত্ততা সমাজ থেকে বিদায় করার প্রত্যাশা শিল্পের বিষয় করেছিলেন। তিনি লিখেছেন —

“ আরে ছো !
এখানে আমার সঙ্গে
তুমু এসো এই মোড়ে
চেয়ে থাকো।
দাঁড়াও, এখুনি পড়বে
এ রাস্তায় আরও একটা লাশ।
ফেটে পড়বে জয়গর্বে
উন্মত্ত উল্লাস।” (আরে ছো / বাঘ ডেকেছিল)

যারা আজ মানুষের প্রাণনাশ করছে তারা সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। কবি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে সেই সব ধর্মীয় অন্ধ ব্যক্তিত্ব ও খুনী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ব্যঙ্গের কষাঘাত করতে চেয়েছিলেন এই কবিতায়। সেখানে তিনি লেখেন —“শুনতে পাবে প্রাতঃ স্মরণীয় /সকলের কণ্ঠস্বর /জয়হিন্দ্ জিন্দাবাদ যুগ যুগ জীও/বন্দেমাতরম্ আর/ আল্লা হো আকবর।” (আরে ছো / বাঘ ডেকেছিল)

“বাঘ ডেকেছিল” কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ‘তার কাছে’ শিরোনামের কবিতায় কবি ধর্মীয় ভাবনা, সামাজিক চেতনা ও জীবনের দার্শনিক চেতনা একটি খাঁচায় পোষা পাখির আত্মকাথার ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি তাঁর একটি উচ্চ শিল্প দক্ষতার নিদর্শন। একটি কবিতার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় একটি বিশাল ব্যাপ্তি জগৎ ও জীবনের প্রেক্ষিতকে ছন্দ বন্ধে গাঁথার চেষ্টা করেছেন এই কবিতায়। সমাজের অনেক বিত্তশালী মানুষ তার সৌখিনতার জন্য বনের পাখিকে সুদৃশ্য খাঁচায় বন্দী করে রাখে। তাকে মানুষের মতো কথা বলানোর বোলতে শেখায়। কোনো কোনো পাখির অভ্যাস গড়ে ওঠে ‘রাধে রাধে’ কিংবা ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ধ্বনিতে কথা বলার। অথচ সে পাখি গুলির যে ভেতর থেকে সেখানে সোনার খাঁচায় খিধে নিবৃত্তির জন্য থাকতে চায় না কবি আলোচ্য কবিতায় তা ব্যক্ত করেন। ধনি মানুষের সখ হয়তো তাতে মেটে, তাদের যথোচিত ঠাট বাট হয়তো তাতে প্রকাশ পায় কিন্তু পাখির অন্তরাত্মা সেই খাঁচার ভেতর ছটফট করে। ক্রমশ কবিতার শেষ স্তবকে কবি নেমে আসেন সামাজিক চেতনা,ধর্মীয় ভাবনা, দার্শনিক ভাবনায়। জাগতিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন আলোচ্য পংক্তিতে—

“ সমস্ত যন্ত্রণা

সে নিজের করে নিতে জানে
হো হো করে হেসে,
মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ খরায় বানে
বাঁচে আর
বাঁচায় অক্লেশে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! বলো পাখি,
গিয়ে বলো,
রাধে রাধে রাধে !
তার কাছে
মহানন্দে থাকি।'' (তার কাছে / বাঘ ডেকেছিল)

এখানে খাঁচায় বন্ধ একটি পাখির রূপকে কবি জগতের প্রতিষ্ঠা, সত্য, যশ ও স্থায়িত্ব প্রকাশ করেছেন। মহাকাল যাকে ধরে রাখে। তার কথাও কবি এখানে বলেছেন। জারা ভোগ বিলাসে, প্রাচুর্যে ডুব দিয়ে কালাতিপাত করেন তারা দেহ থেকে আত্মার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সংসার থেকে মুছে যান। যারা সমাজের মানুষের জন্য কাজ করেন, যারা প্রকৃতির বিপর্যয়ে মানুষের জন্য অক্লেশে কাজ করেন এবং মানুষের মঙ্গলের সাধনায় ত্যাগ করেন তাদের মহাকাল সত্য হিসেবে চিরকাল মনে রাখেন। কেননা এই জগৎ সংসার ও সমাজকে —''সে বেঁধে দিয়ে ছাড়ে/এবং যতটা পারে/ ছেড়ে দিয়ে বাঁধে।'' (তার কাছে / বাঘ ডেকেছিল) ইংরেজ সরকারের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছে ভারত বহুকাল আগে। কবি তথাকথিত গরীব ও দুঃখী মানুষের কাছে প্রকৃত স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই। তাদের কাছে স্বাধীনতা অর্থহীন। মুদ্রার অন্যপিঠে আজ তাদের দারিদ্র্য। বুড়ি নিতান্ত অভাবে বয়সকে উপেক্ষা করে দেয়ালে এতকাল ঘুঁটে দিয়ে এসেছিল। দেশ আক্ষরিক অর্থে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আজো তারা অন্ধকারের নিচে জীবন যাপন করেন। আজো সেই বুড়ি দেয়ালে দেয় ঘুঁটে।

কবি রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এখানে। কেননা দরিদ্র মানুষের কাছে মাটির পথে মানুষকে ভোটের জন্য আহ্বান করেন রাজনৈতিক কর্মীরা ভোটের আগে ; তারা প্রত্যেকে অনেক বড় বড় কথা বলেন। প্রতিশ্রুতি বন্যা বইয়ে দেন - মিছিল, সভা সর্বত্র। কিন্তু দিনের পর দিন সেই একই চিত্র। কেউ আন্তরিকভাবে সমাজের জন্য কাজ করে না। রাজনৈতিক দলগুলো যা করে কেবল তাদের নিজের জন্য। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গরিব মানুষের দুঃখ ও ব্যথা প্রকাশ করেছেন এখানে। তিনি লেখেন—

''একই দেয়ালের বাগ করে দুই পিঠে
দু-দলই যায় দু-দলের ঢাক পিটে
ওরা বলে, মুখে ধরব দুধের বাটি
ভাই, আমাদের ওঠাও আরেক কাঠি
এরা বলে, আরে । চুপচাপ বসে থাকো
কলে কৌশলে গরিবি হটাই, দেখো -
ভদ্রলোকের এক কথা খালি শুনে
মজা করে গেল দিন-গুনে, দিন-গুনে
বুড়ি ভাবে, হাতে নিয়ে গোবরের ঝুড়ি -
আজাদির হল ক'বছর? দুই কড়ি! (বুড়ি ছুঁয়ে / বাঘ ডেকেছিল)

বৃদ্ধ কবির পথে হাঁটার ও সর্বত্র ছুটে বেড়ানোর প্রবল ইচ্ছাকে শিল্পে আত্মকথা প্রকাশের শৈল্পিক রূপ ''পালানো'' শীর্ষক কবিতা। আলোচ্য কবিতায় কবি সুভাষ নিজের আত্মবিশ্লেষণ করে মনের আয়নায় নিজের অহংকার ও গর্ব কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখেন। তারপর সহজ ভাষায় নিজের অভ্যাসের কথা প্রকাশ করেন — ''এসে বসতে না বসতে -/ ভাঁজে মতলব খাওয়ার/ ঘরে ওর মন রয় না / যেতে তৎপর, ওদিকে আবার/ শানে পা ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে/ ফিরতেও ত্বর সয় না।/ হেঁটেই বেড়াত, আজকাল খুব উড়ছে/ নুড়ো জ্বালা ওর পুচ্ছ।/ হ্যাঁ, তুমি ভায়া যা বলেছ তা ঠিক- ভ্যালা পদাতিক !' (পালানো / বাঘ ডেকেছিল) তাঁর চলার অফুরন্ত শক্তি শরীর ও বয়সকেও উপেক্ষা করে চলে। অনেকটা হালকা ও তরল রসে কবি তাঁর অভ্যাসের কথা ও বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতা এই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন —''ধর বুড়োটাকে / ভালো করে ঠ্যাং চেপে/ কেবলি সে ক্ষেপে ক্ষেপে/ সরে পড়তে না পারে।/ বুজিয়ে চোখের পাতা / গোঁজ তুলো ওর নাকে।/ ও কিন্তু সব দেখছে চোখের আড়ে।'' (পালানো / বাঘ ডেকেছিল) ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ''টানা ভগতের প্রার্থনা'' শীর্ষক কবিতাটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত মোট চারটি কবিতার সংকলন। এই কবিতা চারটির মধ্যে প্রথম কবিতাটিতে একটি গল্প লেখার অসমাপ্ত কথা ও মনের অতৃপ্তির শিল্পিত রূপ। এই কবিতাটিতে তিনি যে গল্পটি লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, সেই পাণ্ডুলিপিগুলি ঝুলিতে তিনি তুলে রেখে ছিলেন। তাঁর কথায় সেগুলির মধ্যে ''কয়েকটা গল্প / বার করতে গিয়ে দেখি / কারো শেষ, কারো গোড়া, কারো পাশ, কারো মধ্যেটা / ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে / সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে। এরূপ পরিণতি হবার কারণও কবি এই

কবিতায় নির্দেশ করেছেন। সম্পূর্ণ না করতে পারার কারণ হিসেবে তিনি বলেন — ''আমারই গল্প / কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায় / আর আমার থাকেনি।'' সেই অসম্পূর্ণ গল্প ও আলোচ্য কবিতার বিষয় খুবই উঁচু মাপের। বৃদ্ধ কবি আলোচ্য কবিতায় তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী স্রষ্টার প্রতি তাঁর অসম্পূর্ণ রচনার বিষয় নির্দেশ করেছেন। তিনি উত্তর সাধকের কাছে তাঁর শিল্পীসত্ত্বা নির্দেশ করে বলেছেন — ''মাটির পেট থেকে সব কথা /আজ্ও বার করা যায়নি।/আরো কত পাথরের হাতিয়ার, /হাড়ের অলঙ্কার আর মাটির তৈজস, /মুখের আরো কত কথা।/ খোদাই করা আরো কত অক্ষর/ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার অপেক্ষায়।'' (টানা ভগতের প্রার্থনা / বাঘ ডেকেছিল) ।

এই কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটিতে কবির প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধ ও সংহতি অটুট রাখার আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উচ্চকিত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ব্রিটিশরাজের অপশাসন আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। যে জাতীয় পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরে আমরা আজ স্বাধীন, সেই পতাকার মর্য্যাদা ভুলতে বসেছি। সেখানে কেবল রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুন, জখম, বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এতে কবি সুভাষ অত্যন্ত শঙ্কিত। একসময় রাজনৈতিক উন্মাদনা কবিকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। সেদিনের সেই যৌবনের শক্তির ঐক্য কবি যেন আজও অন্তর্মনে দেখতে পান। সেদিনের যুবশক্তির উন্মাদনার কথা স্মৃতিরোমন্থনে কবি আজও আপ্লুত হয়ে ওঠেন—

''আমাদের ধমণীতে বহমান সে রক্ত,
তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে
সেই রঙে আমরা ছাপিয়ে নিয়েছিলাম
আসমুদ্র হিমাচলের আকাশে তোলা
আমাদের নিশান।
ভাই ও ভাই।
তোমরা কি সেসব ভুলে গিয়েছ ? (টানা ভগতের প্রার্থনা / বাঘ ডেকেছিল) পরাধীন দেশে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মুক্তিকামী জনতার ত্যাগ ও ঐক্যতার বন্ধন। প্রত্যক্ষ করে ছিলেন জাতীয় পতাকা ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনির কত শক্তি। সেদিনের কথায় কবি সুভাষ লেখেন ''গুরুজনেরা বন্দেমাতরম্ বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে / তিনটে রং / কলাপাতার সিঁদুর চন্দন বুলিয়ে / আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।'' সেদিন জাতীয় পতাকার প্রতি আমাদের ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে আমাদেরই হাতে দেশ লাঞ্ছিত। দেশের ঐক্য ভঙ্গুর। বর্তমানকালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি কবি ক্ষুব্ধ। দেশের প্রতি তাদের শ্রদ্ধায় তিনি নিঃসন্দিগ্ধ নন। তাই কবি লেখেন —

''আজ নোংরা হাতের টানাটানিতে/ আর ক্রমাগত/ হাত বদলের ঠেলায় -/রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে, দেখো / বাজে রঙের মেশালে আর সাত নকলে/ আমাদের সে নিশানের/ সে রং আর নেই।'' (টানা ভগতের প্রার্থনা / বাঘ ডেকেছিল) আজ যে রং ফিকে হয়েছে আমাদের ঔদাসীন্যে কবি তাকে গাঢ় করার আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশের পতাকাতলে সামিল হবার আহ্বান জানান। তিনি দেশবাসীর প্রতি পরামর্শ দিয়ে বলেন - ''মাটি থেকে তুলে তিনটি রং / গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই / টকটকে লাল হবে। / ভাই, ও ভাই।''

'টানা ভগতের প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতা সংকলনের চতুর্থ সংখ্যক কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালকে নিখুঁত শিল্পের পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এখানে কবির ব্যক্তি ভাবনাও বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। কবি এমন একটি সময়ের কথা আলোচ্য কবিতায় লিখেছেন সে সময় মানুষ প্রতি পদক্ষেপ বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছিল। কবি তাই মানুষকে সাবধান করে লেখেন, ''যখন হাঁটবে/ খুব পা টিপে টিপে / এখানে পেছল হয়ে আছে, / ওখানটাতে গর্ত - / যখন হাঁটবে / খুব পা টিপে টিপে / পা টিপে টিপে।'' এই সময়কালে সমাজ মানুষ যেন মুখে একটা আলগা মুখোশ মসৃণভাবে লাগিয়ে রেখেছিল। সেই সত্য প্রকাশে এগিয়ে আসছে না। ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, ঠকবাজিতে মানুষ একটা গভীর অন্ধকারের মধ্যে চলেছিল কবি সেই সময় সম্পর্কে লেখেন —

''সময় পড়েছে বড় খারাপ
কালো চশমা দিয়ে চোখ
বাঁদুরে টুপিতে কান
যে পারছে সেই ঢেকে রাখছে।'' (টানা ভগতের প্রার্থনা / বাঘ ডেকেছিল)

সামগ্রিক অন্ধকার সারা দেশের মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবি কলকাতা শহরে বসে উপলব্ধি করেছিলেন - ''সন্ধ্যের পর শহরময় আলো নিভে গেলে, / অন্ধকারের কালো পর্দায়'' সময়ের অন্ধকার সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কবি এই অন্ধকাসর জগতে নিজের সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একারণেই একাকীত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত কবির উপলব্ধি - ''সরতে সরতে আজ আমি সব কিছুর বাইরে।'' সেই অন্ধকার মানুষের বুক থেকে সরিয়ে আলোয় পূর্ণ করার জন্য উদ্বেল। উত্তেজিত কবি হৃদয় আর্তনাদ করেছিল সেদিন। সেই দিনগুলির রক্তাক্ত কবি হৃদয় সময়ের অমানবিক ও অসার চেতনা সম্পর্কে লেখেন — ''হাত নাড়াতে নাড়াতে ড্যানা দুটো /খসিয়ে ফেললেও কেউ দেখে না, /চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ফাটিয়ে ফেললেও/ কেউ শোনে না।'' (টানা ভগতের প্রার্থনা / বাঘ ডেকেছিল) কবির গভীর আত্মপ্রত্যয় যে, সমাজের মানুষ আবার সচেতন হবে। যাবতীয় কালিমা দূর

করে ভেতরের ''শক্তিকে জাগ্রত করবে / মানুষ আজ তাঁর শক্তিকে সে বেঁধে রেখেছে / অঙ্গারের মধ্যে।'' সেই অঙ্গার পুড়ে মানুষ সঞ্চয় করবে অসীম শক্তি। সমাজ জেগে উঠবে, মানুষ সচেতন হবে। টানা-ভগৎরা ''টান-বাবা-টান'' করতে করতে এগিয়ে চলেছে। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অপরিসীম আশাবাদে কবি জাগরণী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন আলোচ্য কবিতায়। আলোচ্য কবিতা ও -''বাঘ ডেকেছিল'' কাব্য কবি সুভাষের কাব্য প্রবাহে বিশেষ মর্যাদা যোগ্যতা নিয়ে বাংলা কাব্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ বয়সের একখানি মৌলিক কাব্য ''একবার বিদায় দে,মা'' ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত। এই কাব্যটির অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি হল - 'একবার বিদায় দে, 'মা', 'মোট বারো,' 'যা, অন্ধকার', 'বেলা যে যায়', 'রাম নাম সত্ হ্যায়', 'কথা রাখো,' 'আলালের দুলাল', 'আপ-ডাউন', 'হাওয়াই চটি', 'জোড় কলম', 'তোবা', 'অন্ত্যাক্ষরী', 'ছাপাই ছবি' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে কবি সুভাষের কাব্য প্রবাহ বিষয়, আঙ্গিক ও দার্শনিক চেতনা চলতে চলতে বাঁক নিয়েছে। এই পর্বে কবি মুখ ফিরিয়ে মাটির বুকে কান পেতে মানবিক চেতনা ও দৈনন্দিন সাধারণের জীবনের ছবি এঁকেছেন কাব্য শিল্পে। শিল্প ভাবনায় এসেছে নতুন বিন্যাস। কবি একবার বিদায় দে, মা কাব্যে বার্ধক্যে পৌছে মা-মাটির সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন।

আমরা দেখতে পাই 'একবার বিদায় দে,মা' কাব্যের নাম কবিতা মূলত সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত সাতটি কবিতার সংকলন। সাতটি কবিতা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম সংখ্যার কবিতাটিতে কবি শরতের আকাশে তাকিয়ে যেন মাকে দেখতে পাচ্ছেন। আকাশের সঙ্গে কবির উপলব্ধিতে নীলাম্বরী একাকার হয়েছেন। সেই আকাশ প্রকৃতি মায়ের কোলে কবি নেহাত একটি ছোট্ট খোকা। খোকার চেতনায় মায়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য যুক্ত হয়েছে। সেই সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি সুভাষ নিতান্ত সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। কবির বর্ণনায় — ''কলাপাতায় আলতা-সিঁদুর/ পাড়ে রেখে সুয্যি ঠাকুর/ ঝাঁপ দেন জলে/ মার কপালে কাঁচ পোকার টিপ/ চাঁদ হিংসেয় জ্বলে/ খোকার হাতে ছিপ/ জলের গায়ে ছবি/ ক্ষীর নদীর কুলে ব'সে/ হাই তুলতে তুলতে খোকা / দেখতে পাচ্ছে সবই'' (একবার বিদায় দে,মা (১) / একবার বিদায় দে,মা) ।

কবি স্বপ্নে দেখেন নদীতে ঢেউ খেই হারায়, কোলাব্যাঙে ছিপ নিয়ে যায় এবং চিলে মাছ নিয়ে যায়। সেই গাঙ মরে গেছে। কবি সেই মরা গাঙের জন্য তাঁর মায়ের কাছে জল প্রার্থনা করেছেন। মায়ের কাছে জল প্রার্থনার মধ্যে কবি ব্যঞ্জিত করেছেন সাধারণ মানুষের ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্ন আশা, সুখ ও

নিতান্ত বেঁচে থাকার উপাদান। এই চাওয়ার মধ্যে কবি সমাজ ভাবনা ও উদার চেতনার পরিচয় আমরা পাই।

'একবার বিদায় দে,মা' শীর্ষক কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতায় কবি সুভাষ আশ্বিনের ঝড়ে সাধারণ গ্রাম্য জীবনের বিপদসঙ্কুল ও ভয় জড়িত পরিবেশ তুলে ধরেছেন। কবি লিখেছেন - ''আলটাপ্কা আশ্বিনের ঝড়ে / হঠাৎ সব / টালমাটাল / মাথার ওপর হ্যাঁকাচম্কা আকাশ ভেঙে পড়ে''/ কবি কবিতাটির শুরুতেই ''আলটাপকা ঝড়'' শব্দ দ্বারা আশ্বিনের ঝড়ের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। এই ঝড়ে গ্রামবাংলার প্রকৃতির ছবি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি সেখানে লিখেছেন —

''গ্রামগঞ্জ শহর বাজার মাঠ ময়দান দিয়ে
শন শন শন সাঁই সাঁই সাঁই
বাতাস ছোটে
আগুন মুখে নিয়ে
পায়ের নীচে বাসুকি নড়ে ওঠে
শাঁখ বাজছে শাঁখ
দূরে অদূরে ঘরে দুয়োরে
শাঁখ বাজছে শাঁখ
একের পর এক''। (একবার বিদায় দে,মা (২) / একবার বিদায় দে,মা)

ঝড়ের ভয়ঙ্কর পরিবেশে গ্রাম্য জীবনে প্রাণ সংশয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘরের ছেলে বাইরে থাকলে মা আকুল আর্তনাদে তাকে ঘন ঘন ডাকতে থাকে। কবি লেখেন মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হরি হরি ডাকতে থাকে। কবিতাটির শেষ স্তবকে মায়ের ডাকের সঙ্গে শহীদ ক্ষুদিরামের প্রসঙ্গে মানুষের জীবনের ঝড়ের ব্যপ্তি অনেক বিস্তৃত হয়। এখানে কবির দেশাত্মবোধ সাধারণের জীবনের বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ, আশঙ্কা ও ভীতি আলোচ্য কবিতায় শিল্পিত রূপ পেয়েছে।

''একবার বিদায় দে,মা'' কবিতা সংকলনের তৃতীয় সংখ্যক কবিতায় হত দরিদ্র মায়ের অভাবী সংসারের মুখ্য বিষয় নির্বাচন করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এখানে বর্গাচাষীর মুখের হাসি/ মিলিয়ে যায় / বিঘে দুই ভুঁই ভাগ হতে ভাগ হতে''/ বর্গাচাষীর ''ধান পাকলে / ক্ষেতে হও সব চড়াও'' সব দেনা দারেরা। চাষীর গোলা থাকে শূন্য। পরিবারের ''জোয়ান গুলো হন্যে হয়ে / ঘুরে মরছে

কাজের জন্যে / কারখানাতে কুলুপ।'' নিদারুন অভাবের সংসারে ''মা, জননী ছেঁড়া মেঘের / কাপড়ে দেন গিঁট।।'' এখানে অভাবী মায়ের সঙ্গে প্রকৃতি চেতনা অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

''একবার বিদায় দে,মা'' কবিতা সংকলনের চতুর্থ সংখ্যক কবিতাটিতে নারী ভাবনা ও কল্পনার বৈচিত্র্য প্রকাশ আমরা দেখি। কবিতাটির ছ'টি স্তবকে কবির নারী ভাবনা, মাতৃভক্তি, প্রকৃতিচেতনা ও বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। অভাবের কঠিন জ্বালা জীবনের অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি কবিতাটির প্রথম স্তবকে রয়েছে। সে কবির গর্ভধারিণী মা বাংলার সমস্ত অভাবী মায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কবি লেখেন — '' নামিয়ে মুখ তাকিয়ে দেখি এ কী

সামনে আমার স্বর্গীয় মা-র মতন অবিকল
দাঁড়িয়ে আছে মাটিতে মা-সকল
লজ্জা ঢাকতে লজ্জা পাচ্ছে পরণে ছেঁড়া শাড়ি
চোখের কোলে জল থই থই
ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ি
শুকনো মুখ রুক্ষ চুল সর্বাঙ্গে খড়ি
দু-হাত করে খাঁ খাঁ
আঁচলে মোছা সিঁথির সিঁদুর
মাটিতে ভাঙা শাঁখা''। (একবার বিদায় দে,মা (৩) / একবার বিদায় দে,মা)

এখানে কবির গর্ভধারিণী মায়ের দুঃখ, অভাব, কু-সংস্কারের কু-ফল, ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় সমাজের সমস্ত মায়ের ব্যপ্তিতে। সমাজের কু-সংস্কারের শত মায়ের জীবনে নেমে আসে বৈধব্যের অভিশাপ, ধর্মীয় অন্ধ শাসনে 'তালাক তালাক তালাক' শব্দ জীবন বন্ধনের সমস্ত সম্পর্কে বিচ্ছেদ এনে দিয়ে থাকে। একটা মুখের শব্দই দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সম্পর্ক নিমেষে নিঃশেষ করার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতীয় নারীর ওপর অমানবিক দৈহিক, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে কবি ব্যথিত। মানবিক চেতনা জাগরণে লেখেন —'' হাতে পায়ে হাতাবেড়ি/ বাঁদীকে কড়া নজরে রাখে চেড়ি/ চোখের নীচে ক্ষিধেয় রাত-জাগার ভুসোকালি/ ঠোঁটের কোলে রক্ত গড়ায় খালি/ বুকে পিঠে/ দগদগে কালশিটে/ সারাটা গায়ে আঁচড়ানো কামড়ানো''। (একবার বিদায় দে,মা (৪) / একবার বিদায় দে,মা) অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত সেই মাতাকে কবি তীব্র ক্ষোভে বলেন - উচ্চবিত্ত, সমাজের সেই ''রাজা উজির কোটালকে'', মুখোশ খুলে সমাজের অখ্যাত সাধারণ মানুষ আজ কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়

করাতে পরোয়া করে থোড়াই। কবি তীব্র ক্ষোভে বলিষ্ঠ প্রতিশোধ স্পৃহায় ঘোষণা করেন- সেই সব পাপিষ্ঠরা ''পাবে না কেউ ছাড় / কাউকে নেই ক্ষমা।''/
মানুষের দুঃখ-শোক অশ্রুকে বাষ্প করে চেতনা জাগাবে যেমন করে সাগর থেকে জল বাষ্প হয়ে বিন্দু বিন্দু করে বিশাল মেঘের সঞ্চার হয়। কবি পৌরাণিক মিথের ভাবনায় রাবণের পতনের মধ্য দিয়ে সমকালের অত্যাচারীদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন। যাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে এই নারীর অপমান প্রকৃতি সহ্য করবে না। কেননা এরা ''কারো জননী কারো কন্যা / কারো বা প্রিয়তমা / কানে আঙুল দিলেই শোনে / সমস্ত ক্ষণ রাবণের সেই চিতায় / জ্বলছে চরম অপমানের আগুন ধিকি ধিকি।'' / কবি তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে চান সহৃদয় পাঠকের অন্তরে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান জানান তিনি কবিতার দ্বারা। তবুও কখনো কখনো সামনা সামনি পাঠকের হবার লোভ কবিকে ব্যাকুল করে তোলে।

''একবার বিদায় দে,মা'' কাব্যের নাম কবিতা সংকলনের পঞ্চম সংখ্যক কবিতায় স্পষ্ট কথা ও সহজ ভাষায় কবি সরাসরি বলেন - ''আমার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলেছে। / কাকে বলি ? / লেখক তার মনের / কথা সহৃদয় পাঠক ছাড়া আর কাকেই বা বলবে ?.. . . . . / শুধু নিজ গুণে সাজিয়ে নেওয়া নয়, / এমন কিছু করা যাতে কথায় কাজ হয়, / কবির সাধ মেটে। / কবির সঙ্গে পাঠকের পিঠোপিঠি সম্পর্ক। / তাকে সামনা সামনি আনা যায় / না জেনেও সেই অসম্ভবের পায়েই আজ আমি মাথা কুটে মরছি।।''

দেশকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য যারা আত্ম বলিদান দিয়েছিলেন তাদের প্রত্যাশা ছিল এদেশের সবার প্রতি সম অধিকার থাকবে। সবাই সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য ও স্বাধীনতা সমানভাবে ভোগ করবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর মানুষের প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়নি। একশ্রেণীর মানুষ সমস্ত অধিকার, ঐশ্বর্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখেন। আবার দেশের বেশীরভাগ অংশের মানুষ অনাহার, অনিদ্রা, বন্যা, খরার মধ্যে নানা ভোগান্তির জীবন অতিবাহিত করে। এই সামাজিক বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন কবি আলোচ্য কবিতায়। কবি এখানে লেখেন —'' রঙিন স্বপ্ন দেখছেন কে/ গদিতে হেলান দিয়ে/ শেষ অঙ্কের পর্দা পড়বে/ মাটিতে পা পড়ে না তবু গর্বে/ নীচে তাকালে জল থইথই বন্যা / ক্ষেত জ্বলছে খরায়/ চুনি কোটালের মা দাঁড়িয়ে/ নেহারবানুর কন্যা।''(একবি বিদায় দে, মা (৫)/একবার বিদায় দে, মা) স্বাধীন দেশের সামাজিক বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানান কবি সুভাষ। তিনি আলোকিত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন ''দিন বদলের পালা''। সেখানে সমস্ত মানুষের ''সবার

হাতে হাত মিলিয়ে'' সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। তাই নিজেদের অধিকার থেকে সরে আসা নয়। বঞ্চনাকারী, পীড়নকারী, ভোগলিপ্সু ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা। কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে, উচ্চারিত ও প্রত্যয়দীপ্ত ভাষায় লেখেন —

''একবার বিদায় দে মা ব'লে
ঘুরে আসা নয়
ঘুরে দাঁড়ানোর
দিন এসেছে এবার
বিদায় নেবার দিন গিয়েছে
দিন এসেছে
বিদায় করার।'' (একবার বিদায় দে,মা (৫)/একবার বিদায় দে, মা)

অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার এবং মানুষকে সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে দেবার শপথ নেন কবি। কবি এই উপলক্ষে প্রয়োজন উপলব্ধি করেন সবার হাতে হাত মিলিয়ে সংঘবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার সমাজ পরিবর্তন ও মানুষের মধ্যে শোষণহীন শাসন প্রবর্তনের কথা বলেন কবি।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কবিতা ''মোট বারো''। এই কবিতায় এমন একজন শিল্পীর শিল্পচেতনা দেশাত্মবোধ, সমাজভাবনার নিদর্শন পাই যিনি দেশকে ভালবেসে জেলে বন্দীজীবন কাটিয়েছেন। তাঁরা জেলের ভিতরে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে 'অনশন সংগ্রাম' করেছিলেন। সাহিত্যিকের 'হাংরাস' উপন্যাসেও এই অনশন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা শিল্পিত রূপে কায়ারূপ পেয়েছে। জেলে বন্দী অবস্থায় দেশের হয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন প্রণব, লেখক, অরুণদা প্রমুখ মোট বারো সৈনিক। তাদের সেই লড়াইয়ের চেতনা ও স্মৃতি রোমন্থনে প্রণবের উদ্দেশ্যে কবি লেখেন — ''তোমার মনে আছে প্রণব, / আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে একতলার সেই অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ওয়ার্ড/ যার এককোণে তুমি আর অরুণদা স্থিতপ্রজ্ঞ দুই নবীন আর প্রবীন/ আর তার ঠিক পাশেই কম্বল ফেলেছিল/ সকলের মুখনাড়া-খাওয়া বেয়ারা হতচ্ছাড়া/ বাপে-খেদানো মায়ে-তাঁড়ানো বারোটা দলছাড়া ছেলে।'' (মোট বারো/একবার বিদায় দে, মা)।

যাঁদের লড়াই দেশাত্মবোধ, সংগ্রামী জীবন কবির চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। এই বারোজনের সংঘবদ্ধ নামকরণে রয়েছে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মোটবারো' গল্পের মতো। এই বারোজনের ব্যক্তিজীবন কবিকে ভাবিয়েছিল অনেক সময়। কবি একজনের কথায় বলেন ''আমাদের

অচ্ছুত অন্তেবাসীদের সেই দলে যে ছিল সবচেয়ে ছোট/ সে ছিল বেলেঘাটার বস্তির ছেলে/ বৈঠকখানায় তার বাবার ফুলের দোকানে বসে সারাদিন সে মালা গাঁথত/ আমাকে সে বলেছিল কী কী মশলা দিয়ে বাড়িতে বসে সে পেটো বাঁধে/ জীবনে ওরা কিছুই পায়নি, শৈশবও নয়/ বিশ্ব সংসারের ওপর ওদের রাগ'' - পরাধীন দেশে ওরা একসময় রক্তঝরা সংগ্রাম চালিয়েছিল। তারা সেদিনের সেই রক্তিম সংগ্রামের দিনগুলিতে যেভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, তেমনি আজো পথের ধুলোকণা ভেজানো রক্ত এবং রক্তাক্ত রাস্তা দেখে কবি উত্তেজিত —''মুখে বলে নামা নামা / দুর্নামে/ চড়াদামে/ যা পাস তাই নে/ আমাদের লাইনে............।।'' (রাম নাম সত্ হ্যায়/ একবার বিদায় দে, মা) ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'কথা রাখো' শীর্ষক কবিতাটিতে কবি মানুষের জন্য তাদের প্রতিনিধিত্বমুলক - জাগরণী সুরে সাহিত্য সৃষ্টির উত্তরসুরীর প্রয়োজন অনুভব করেছেন। সেই স্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে আগামী দিনের উত্তরসুরীদের উদ্দেশ্যে কবি নির্দের্শ দেন মানুষের হাত ধরার, নির্দেশ দেন মানুষের পাশাপাশি থাকার। কারণ নির্দেশ করে কবি তাদের বলেন — ''তুমি হাত একটু বাড়ালে/ তবে ওরা বাঁচে/ তুমি কথা রাখবে কি, লক্ষ্মীটি।'' (কথা রাখো/ একবার বিদায় দে, মা)। অসহায়, পীড়িত মানুষের হয়ে তাদের মুখের কথাগুলোকে সারাজীবন সাহিত্যের বিষয় করেছিলেন কবি সুভাষ। আজ সেই কাজে আগামী দিনেও সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এগিয়ে আসুক যুবশক্তি, এগিয়ে আসুক নব-প্রজন্ম। কবি তাদের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টির বিষয়ে লেখেন —

''এর ওর তার কাছ থেকে
নিয়ে আমি
কথাগুলো করেছি নিজের
সারাটা জীবন তার জের
টেনে এসে
দিতে চাইছি আর কাউকে সে ভার
আমি গেলে
এ সব অনাথ অপোগণ্ডদের
কে থাকবে দেখবার।'' (কথা রাখো/একবার বিদায় দে, মা)।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের জুলুম সাধারণ মানুষের ওপর। তাদের জুলুম আজ সাধারণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কবির বিশ্বাস আজ হাটে হাঁড়ি ভাঙবে। কেননা ''বাইরে চটক ভেতরে ফাঁপা/কতদিন আর থাকবে চাপা''। মানুষের ঘরে ঘরে অসংখ্য বেকার। কাজ নেই, রুজি রোজগারের

ও ''কাজের জন্যে মানুষ হন্যে/দরজাগুলোয় তালা।'' রাজনৈতিক নেতৃত্বের অমানবিক অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা কবিকে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে তুলেছে বিরক্ত কবি তাই লেখেন — ''এ গাঁয়েতে বান তো / ও গাঁয়েতে খরা /যে করে হোক আখেরে ভোট/ ভাতের টোপে ধরা . . . . মন ভুলিয়ে ঝাণ্ডায়/ চাইবে গদি না দাও যদি/ ঠাণ্ডা করবে ডাণ্ডায়।'' (আলালের দুলাল/ একবার বিদায় দে, মা) ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত বিখ্যাত কবিতা 'আপ-ডাউন'। আলোচ্য কবিতায় কবি মানুষের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং শতাব্দীর সমস্ত ''মোহভঙ্গ, হিংসা, দ্বেষ, মারণাস্ত্র, কথা দিয়ে কথার খেলাপ, সব ক্ষয়, সমস্ত জীর্ণতার থেকে মুক্তি কামনা করেছেন। এই কবিতাটির মধ্যে সংখ্যা দ্বারা দুটি কবিতা নিহিত রয়েছে। কবি দাঁড়িয়ে আছেন শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। মানুষ আগামী শতাব্দীতে সমস্ত কিছু বহন করে নিয়ে যাবে। একটি ট্রেনের সঙ্গে কবি এই শতাব্দী এবং তার আগের পরের অবস্থানরত মানুষকে বুঝিয়েছেন । যেখানে মানুষ তার সমস্তই শুভ চেতনায় ফুল চন্দন নিয়ে বরণ করে নেবে । এবং চোখের জলে বিদায় জানাবে পিছনে ফেলে তার লোভ , ভোগবাসনা , শোষন , বঞ্চনা ও ক্ষতবোধ । এই সংকলনটির প্রথম সংখ্যক কবিতাটিতেও রয়েছে মানুষের সারল্যকে হাতিয়ার করে বঞ্চনা করার প্রতিরোধ । কবি সেই সুবোধ বালককে বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন — '' স্মৃতি ভারি সুবোধ বালক/ যা কিছুই তার সামনে ধরে দাও / কিছুতে 'না' নেই।/কখনও সে তোমাকে ছেড়ে/ নড়বে না এক পা-ও।/তুমি সে চোখের মাথা খেয়ে/ ঘাড়ে তার সব কিছু চাপাও, / তবুও সে গলা তুলে তোমাকে বলেনা তুমি ঠক।।''(আপ-ডাউন / একবার বিদায় দে মা) শেষ বেলার পর্বে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাজে দেখা যায় নিতান্ত গ্রাম্য ও সাধারণ মানুষের নিত্যজীবনের জনছাপ । এই পর্বের কবিতায় আমরা শীর্ষনাম বাছাইয়ের মধ্যেও দেখি তাঁর এই শিল্পমানস ।

এই কাব্যের অন্তর্গত একটি কবিতার নাম 'হাওয়াই চটি'। এই কবিতাটিতে 'নিদাঘ' শব্দটিতে কবি বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন । কবিতাটির শুরুতে কবির সমকালীন শিল্পমানসের চিহ্ন পাই আমরা । কবি এই কবিতার শুরুতে লেখেন—

> ''আসছি বলে বিদায় নেয়
> নিদাঘ
> ঠাণ্ডা পিচ শক্ত হয়ে ধরে রেখেছে বুকে
> ভারী চাকার
> গভীর সব দাগ

তার মধ্যে, হা অদৃষ্ট, ও কার

জোড় ভাঙা একপাটি

হাওয়াই লাল চটি।''   (হাওয়াই চটি / একবার বিদায় দে মা)

কবি শতাব্দীর সমস্ত 'জঞ্জালের মধ্যে মাথা গুজে' মানুষের শান্তি , ঐক্য , সুখ , সংহতি ও সুস্থ্য-সাম্য-সামাজিক জীবনের সন্ধান করেন।

যারা মানুষের জন্য কিছুই করেন না কিন্তু সাধারণের মন ভোলানোর জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি , বাকচাতুতা , কথার কথা তারা ভোটের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ কবির বক্তব্য - ''কথার সঙ্গে কথা কেবল/ জুড়লেই তো হয় না।'' মুলত বাক্যকে বলা হয় ব্রহ্মস্বাদ সহোদর ! সুতরাং বাক্যকে ব্যবহার করে মানুষকে ঠকানো অন্যায় । বাক্য তো একটি প্রাকৃতিক শক্তি। কবির ভাষায় — ''কথা কি তবে ফাঁকা আওয়াজ, /শুধুই ধোঁকার টাটি ? / নিকম্মা এক সরফবাজি, / স্বপ্নের আড় কাঠি ? /এমন করে জুড়বে কথা সাঁটে/ কথায় যেন কথার জোর থাকে, / প্রকৃতি দেখো, কত সহজে আঁটে/ পরমাণুর ভেতর ক্ষমতাকে।''   (জোড় কলম / একবার বিদায় দে মা) একদিকে সাধারণের নিত্যজীবনের জলছাপ অন্যদিকে লালগাড়িতে ঘোরাফেরার বিশেষ মন্ত্রীমশাইদের মাঝে কবি জীবন-মরণ প্রসঙ্গ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'তোরা' শীর্ষক কবিতায় ।

এই কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবকে কবি সাধারণ সহজসরল মানুষের উদ্দেশ্যে কবি একবার ভাববার কথা বলেন । তাদের মধ্যে ব্যক্তিসত্ত্বা জাগাতে বলেছেন। পরের কথায় নেচে নেচে শেষে একদিন বেঘোরে সুন্দর জীবনটাও জলাঞ্জলিতে যায় । কবি তাদের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ একবার জীবনের মূল্যায়ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সেখানে তিনি লিখেছেন —''ভেবে দ্যাখ্ , বাপ —/ এই যে তুই দ্যাখ না দ্যাখ্ / পরের কথায় নেচে /পারলেই দিস্ ঝাঁপ/ ঘাট - আঘাটায়/ অজলে অস্থলে ! /একদিন না মুন্ডুটা যায় ছেঁচে।/ হেঁটোয় কাঁটা, ওপরে কাঁটা হয়ে/ মজবি ব্যাটা দ-য়ে।/ জীবনটাকে দিয়ে জলাঞ্জলি/ ভেবে দ্যাখ্ বাপ -/ কী পেলি, কী হলি ?'' (তোরা / একবার বিদায় দে মা) পরের তিনটি স্তবকে কবি ক্ষমতাবান শাসক শ্রেনী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে তাদের অন্তঃসারশূণ্য, অসার পরিণাম সুখী জীবনকে নির্দেশ করেছেন । কবি তাদের নিশ্চিত মৃত্যু এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও ক্ষুদ্রতাকে নির্দেশ করে তাদের চেতনায় আঘাত করেছেন । তিনি লিখেছেন —

''পেরেছিস কি তুলতে জলে

একটুখানি স্রোতও ?

একটুও চিড় ধরেছে শৃঙ্খলে ?

এর সঙ্গে ভাব করছিস
ওর সঙ্গে আড়ি ।
মাঠে সমানে গলা ফাটাস
হাটে ভাঙিস হাঁড়ি ।
ছোঁবে না কেউ, যখন হবি
লাল গাড়ি - পাশ ।''   (তোরা / একবার বিদায় দে মা)

এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'অন্ত্যাক্ষরী'। এই কবিতায় কবি পরীক্ষামূলকবিন্যাসের প্রয়োগ করেছেন । তাঁর এই পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কবিতাটির পংক্তিগুলির সজ্জা গদ্যের মতো । কিন্তু কবিতাটি পড়তে পড়তে গদ্যের থেকে আলাদা বলে অনুমেয় হয় । অভিনব আঙ্গিকে কবির প্রকৃতিপ্রেম শিল্পরূপ পেয়েছে । শেষ পর্বে এসে কবির এই পরীক্ষা নিরীক্ষা রীতিমতো বিপ্লব । একটি দৃষ্টান্ত — 'সব কিছু বদ্‌লায় । কাগজে কাগজে ঢোল শহর। সাঁত্রাগাছির । / বিলখানা ডোবা ভরে গেছে পরিযায়ী পাখিতে পাখিতে ।''   (অন্তাক্ষ্যরী / একবার বিদায় দে মা)

নিত্যদিনের সাধারণ মানুষের সাধারণ ছবি কিংবা প্রকৃতির আবেগহীন বাস্তব ছবি আঁকতে গিয়েও এসেছে কবির বিশেষ রাজনৈতিক, চেতনাপুষ্ট জীবন দৃষ্টি । কবির বার্ধক্যে পৌছে প্রৌঢ়ের ফসল জীবনের উপেক্ষিত , অখ্যাত সামান্য বিষয়ের বিশেষ ছবি। এই ছবি আঁকার শিল্পীকে আমরা পাই আলোচ্য 'ছাপাই ছবি' শিরোণামের কবিতায় । এই কবিতায় কবি ''দেখেছিল/ ব্যথায় নীল আকাশ / মাথায় নিয়ে অনন্ত শূণ্যতা ।'' কবি নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে দেখেন যে , সেখানে কেবল ''জলছাপ নয়, / আগুন নিয়ে লাল হরফে / সব আদ্যোপান্ত ছাপা ।''

এই কবিতাটি কবির ফেলে আসা দীর্ঘজীবনের তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়গুলি শিল্পের উপাদান হিসেবে হাজির হয়েছে। আমরা ''ছাপাই ছবি'' শীর্ষক কবিতার শুরুতে দেখি — ''দুটি ভুরুর মধ্যিখানে/ ঠিক/ কপালে ছিল/কাঁচ পোকার টিপ/ সিঁথিতে/ লাল সিঁদুর ।' (ছাপাই ছবি /একবার বিদায় দে মা) এখানে রয়েছে মানুষের সমস্ত বঞ্চনা, দুঃখ ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি ও জীবনের যাবতীয় অন্ধকার থেকে আলোর জীবনে ফেরার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির সার্থক সহধর্মিণীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ও তার বৈবাহিক জীবনের নববধূর বিভিন্ন স্মৃতি । ভোরের সূর্যের লাল আভার সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি হৃদয়ে হাজির হয় ''আলতা পরা পা দুখানি'' এবং ''পায়ের আলতা , মাথার সিঁদুর ।''

কবি সুভাষের প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্য ''ছড়ানো ঘুঁটি''(২০০১) । এই কবিতাটির রচনাকালে কবি আশির উর্ধে । এই বরিষ্ঠ কবির সর্বকালের চিরন্তন সত্যসন্ধান , জীবনের বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ

অতিক্রান্ত পথের অভিজ্ঞতা সমকাল ও সমাজ ভাবনার পরিচয় রয়েছে 'ছড়ানো ঘুঁটি' শীর্ষক কবিতায় । কবিতার প্রতিটি বর্ণে নিহিত রয়েছে কবির সচেতন মনের উপলব্ধি । এই কাব্যটির শীর্ষনামের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই কবি সুভাষের শৈশব স্মৃতি ও জীবনের সবকিছু মেলে ধরার অভিব্যক্তি । কাব্যটির গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলি হল— 'ছড়ানো' , 'পরম্পরা' , 'পালাবদল' , 'অরণ্যেরোদন' , 'আমার নিশানায়' , 'সম্ভবামি' , 'বারোটা বাজার পর্বে' , 'যদি পাওয়া যায়' , 'কানামাছি' , 'বলছিলাম কী' , 'কেডারে' , 'যদি বলি' , 'তেরোস্পর্শ' , 'মুখনাড়া' , 'কালাকানুন' , 'কুমার সম্ভব' , 'ছড়ানো ঘুঁটি' , 'মৃদঙ্গ' , 'যাও পাখি' , 'তুমি তো কাঁদ না' ইত্যাদি ।

আলোচ্য কাব্য রচনাকালে কবির বয়স উল্লেখিত হয়েছে তাঁর কবিতা 'ছড়ানো'তে । সেখানে তিনি লেখেন — তাঁর এখন ''একাশি পেরিয়ে বিরাশি ।'' ''এ জমজমাট আসর'' ছেড়ে কবি চলে যেতে চান না কিছুতেই । কবি এই জগৎ ও জীবনের সব রং সব রস নিংড়ে নিতে চেয়েছিলেন , জগতের কোনো কিছুকে বাদ দিতে চান নি কবি সুভাষ । তাই তিনি আজ জগতের সমস্ত নবজাতকের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত সত্ত্বা প্রকৃতির মধ্যে দেখতে চান তিনি । নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি প্রকৃতিকে নিজের করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতির কাছ থেকে জীবনের সমস্ত পাওনা উশুল করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর উক্তিতেই পাই —

''যা ছিল পাওনা করেছি উশুল
চক্রবৃদ্ধিহারে
জীবনের রসে হয়ে গিয়ে মশগুল ।'' (ছড়ানো ঘুঁটি / ছড়ানো ঘুঁটি)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতায় দেখা মেলে অতীতের স্মৃতিরোমন্থন । সেই স্মৃতি কবিকে অনেকভাবে প্রভাবিত করেছিল । সেই স্মৃতির কথায় কবি লিখেছেন —

''আধকপালে হয়ে আমি থেকে গেলাম।
আমি যতই এপাশ ওপাশ করি
আমাকে সমানে বিঁধবে
স্মৃতির চোরকাঁটা ।'' (পরম্পরা / ছড়ানো ঘুঁটি)

এখানে চিরন্তন সত্যটাকে উপলব্ধি করে কবি বলেন — ''মৃত্যুর পাশে মুখ বাড়িয়ে দেয় জীবন , / স্মৃতির পাশে স্বপ্ন ।'' কবির হৃদয়ে একটি স্বপ্ন ছিল সে সন্তান উপযুক্ত কর্মে যোগ দেবার মতো চাকুরীর প্রথম মাইনের টাকায় এক হাতে মিষ্টি, আরেক হাতে মাছ নিয়ে যে , অনাবিল আনন্দে মেতে উঠবেন । এখানে কবির স্বপ্ন ও মনের সাধ শিল্পিত রূপের মর্যাদা পায় ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'পালাবদল' কবিতাটি কবি সুভাষের সমকালের বিশ্ব-প্রেক্ষিতে মাটির কথা জগতের বুকে কান পেতে শোনার এক বিশেষ আদর্শিক চেতনার শিল্পিত রূপ । বিশ্ব প্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলির ও পারমানবিক শক্তিধর দেশগুলি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে উপেক্ষা করে চলেছে বহুকাল ধরে । ভারতকে বঞ্চনা করে তারা কতটা সুখে আছেন সেটা কবির জানতে কৌতুহল হয় খুবই। বন্ধু দেশ ভারতকে সঙ্গ দিয়ে এবং উন্নত দেশগুলি ভারতকে সদস্য না করে কেমন আছে এই বৈপরীত্য কবির দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলোচ্য কবিতায় । সেখানে কবি লিখেছেন — ''খুব জানতে ইচ্ছা করে —/মস্কো /এখন শূন্যের কতটা নীচে।/ আমাদের ভালোবাসার শতাব্দী/ মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে/ ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে/ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে ।/ সোয়েৎলানা , / সাশা এখন কত বড়োটা হল ?'' (পালাবদল / ছড়ানো ঘুঁটি) । এই প্রেক্ষিতের মধ্যে কবি সঞ্চিত করেছেন মানুষের ''কাঁধবদল করার গুরুভার'' ও শীত বসন্ত ইত্যাদি নানা ঋতুতে দুখিনী মায়ের রূপকথা । আন্তর্জাতিক পটভূমিতে মানবিক চেতনা , ভালোবাসার মাহাত্ম্য প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে , সৌন্দর্যচেতনা , মাটির গন্ধ কবিচেতনাকে এই কবিতায় সমৃদ্ধ করেতুলেছে ।

কবি সুভাষের 'ছড়ানো ঘুঁটি' কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'অরণ্যে রোদন'। কবির রাজনৈতিক চেতনা কবিকে তাড়া করে ফিরিয়েছে সারা জীবনই। শেষ পর্বে এসেও কবি লক্ষ্য করছিলেন সামাজিক বঞ্চনা ; শ্রেণী শোষণ, অত্যাচার ইত্যাদি সামাজিক বিচার। এখানে কবি হতাশ হৃদয়ে ভাবেন যে দিবা-রাত্রি তার এই ছুটে বেড়ানোর পরিণাম এক 'অরণ্যে রোদন'। কবি যে রাজনৈতিক চেতনায় পার্টির জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন সেই রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত মানুষগুলি রাজনৈতিক সংঘর্ষে অযথা রক্তপাতে মেতে উঠেছে । তারা যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসের সঙ্গে । কবি আজো দেখতে পাচ্ছেন ''হিস্ হিস্ শব্দে / আকাশে উৎক্ষিপ্ত নিশান/ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে বিষ ।''

কবি সমাজের মানুষকে প্রত্যক্ষ প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মনে করেন সরোজ রায় , সত্য ঘোষাল এবং তীর ধনুক নিয়ে বিয়াল্লিশ ঝাঁপিয়ে পরা রবি মিত্তিরকে । কবি জনজাগরণের যে উচ্চকিতধ্বনি দৃঢ়পদক্ষেপে এতকাল স্লোগানের মিছিলে বয়ে এসেছেন তার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী । এর প্রভাবে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদের শক্তি আজ পাচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্ত রূপে । পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ সমাজতান্ত্রিকসাম্যের ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হচ্ছেন । কবি তাই লেখেন — ''গড়বেতা থেকে কেশপুর/ কেশপুর থেকে চন্দ্রকোণা —/ নাম ধরে ধরে ডেকে/ বৃথা যায়/ টআমার নিশুতি রাত্রে অরণ্যে রোদন ।'' (অরণ্যে রোদন / ছড়ানো ঘুঁটি) কবি তাঁর রচনায় নিজের কাব্য প্রকৃতির চিহ্ন রেখেছেন 'আমার নিশানায়' শীর্ষক কবিতায়। কবি অন্ধকার পথে চলে ছিলেন মানুষকে আলো

দেখাবার জন্য। মানুষ নিঃসহায় , শীর্ণ ও রুগ্ন হয়ে তার কবিতায় অধিকার অর্জনের ও সাম্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। শ্রেণীসংগ্রামে কবি অন্ধকার সমাজকে আলোয় টেনেআনার প্রতি দায়বদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কবি কাব্যপ্রকৃতি ও রচনার বিষয়কে পরিস্কার ভাষায় প্রকাশ করতে লিখেছেন — ''দুঃখিনীর পোড়া কপালে / লাল টিপ /আমাকে অন্ধকারে/ আলো দেখায় ।'' (আমার নিশানায় /ছড়ানো ঘুঁটি) কবি সুভাষ এই ন্যায্য , সহজ , সাধারণ ও অসহায় মানুষ গুলোর মাঝে নতজানু হয়ে একাত্মতা উপলব্ধি করেন । আমরা দেখি সেই সাধারণ , সহজ ও সরল মানুষগুলোর সমবেত শক্তির সম্মিলিত সমাবেশে সমাজ বদলের রঙিন স্বপ্ন দেখেন কবি। সেই সহজ , সরল , সাধারণ মানুষগুলো সামান্যতেই বিপদগামী হতে পারেন আবেগবশত । সেই সব মানুষের সঙ্গে মিশে থেকে কবি তাদের স্বভাব-প্রকৃতি অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করেছিলেন । তাদের ইতি-নেতির প্রকৃতি সামান্য উপমায় সুন্দর ব্যক্ত করেছেন কবি —''আমি নতজানু হই/ ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের কাছে —/আর. . . . . .শীর্ণদেহ সেই ছুঁচের/ আমি প্রার্থণা করি/ বল্লমের ফলা হয়ে/ যেন তা কারো বুকে না বেঁধে ।'' (আমার নিশানায় /ছড়ানো ঘুঁটি)।

এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ তা কবিতায় প্রয়োগ করে অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন কবি । এখানে তুচ্ছ ও ন্যায্য বিষয় দিয়ে কবি মহৎ আদর্শ ও সমাজতন্ত্রের সামাজিক বিশেষ উপায়কে শিল্পিতরূপে ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'সম্ভবামি'। এই কবিতায় প্রথম চরণে কবি আমাদের ১৯৪৭-এর পূর্বের পরাধীন ভারতকে স্মৃতির শিকেয় তুলে রেখেছেন কবি । বরং সেখানে একটি নতুন সম্ভাবনাকে শিল্পিত রূপেই ব্যক্ত করেছেন । আলোচ্য কবিতায় তিনি লিখেছেন —''পঞ্চাশোর্ধ্বে স্বাধীনতা /বনবাসে যাবে কি যাবে না, /এই নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে/ এতদ্দেশে, জানায় কী প্রথা /বিক্ষোভে, মিছিলে, পথ-অবরোধে।/বাইরে যা হা-ঘরে হা-ভাতে/ ফুঁসে ওঠে ক্রোধে/ কেড়ে নিয়ে লাঞ্ছিত পতাকা / ধুলো থেকে তুলে নেয়/ দলিত লুণ্ঠিত স্বাধীনতা।'' / (সম্ভবামি / ছড়ানো ঘুঁটি) এখানে কবি 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে এখানে বিস্তৃত ব্যাপ্তি দানকরে প্রয়োগ করেছেন ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'বারোটা বাজার পর্বে'। এই কবিতাটির মধ্যে কবি স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন নির্মোহ শিল্পীর দৃষ্টিতে । স্বাধীনতার বারোটা বাজার পর্বে কবি অবস্থান করেছিলেন । যে পতাকা সমস্ত ভারতীয়ের প্রাণের সামগ্রী রূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি সুভাষ ; সেই পতাকা আজ 'জরাজীর্ণ বিবর্ণ'। যে পতাকার নীচে সমস্ত ভারতের আবেগ অবস্থান করতে দেখেছিলেন তিনি সেই পতাকা উচুঁ করার কণ্ঠ কত দুর্বল এখন । সেই পতাকার প্রতি আহ্বান করে সামান্য মানুষ হাক দেন — ''দূর থেকে ভেসে এলো নির্বিকার নিরাসক্ত গলা — / কে

আছো হে , খোলা'' জীর্ণ ও বিবর্ণ পতাকাটুকু । সেই পতাকা উড্ডীণের জন্য যে অসংখ্য প্রাণ শহীদ হয়েছে ; সেই সব প্রাণের কথায় কবি লিখেছেন —

''বেদিতে পুতুল হয়ে ব'সে
শহিদেরা ;
পার্শ্বচর ফাঁকা মাঠে বলতে শুধু
গরু আর ভেড়া ।
তাম্রপত্র বুকে নিয়ে কাটা -সৈনিকেরা
ধর্ণা দেয়
খাজাঞ্চিখানায় ।'' (বারোটা বাজার পর্বে / ছড়ানো ঘুঁটি)

উপরন্তু এদেশের স্বাধীন মানুষের এক কদর্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন তিনি। একশ্রেণীর মানুষ তাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করছে 'ষোলকলা' পূরণ করে । এই শ্রেণীর মানুষ ''তার জন্যে তৈরি করছে ভস্মলোচনেরা / পৃথিবীকে করতে ছারখার''। এই শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক , স্বার্থমগ্ন ও ভোগপন্থী মানুষ দেশের পক্ষে অশুভ । তাদের নির্দেশ করে কবি বলেছেন — ''কালো বেড়ালের ঘেরাটোপে/ আপাদমস্তক ঢেকে/ নিরাপদে কাকচক্ষু খোপে/ কেবল গলার জোরে/ হয়ে গেল দিব্যি বাঁধা গতে/ লালকেল্লা ফতে ।'' (বারোটা বাজার পর্বে / ছড়ানো ঘুঁটি) প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলে নখের দর্পনে ওদের স্বরূপ উন্মোচন করার আহ্বান জানান আলোচ্য কবিতায় ।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'যদি পাওয়া যায়' শীর্ষক কবিতাটিতে কবির সমকালের ভাবনাকে পাই আমরা । সমাজের দুটি বিপরীত চিত্র অত্যন্ত বাস্তব ও সত্য হয়ে ধরা পড়েছে। যারা সমাজের নিন্দনীয়, অহিতকর, ক্ষতিকর, অসামাজিক খারাপ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সে সব অপরাধী , হাজত অথবা আসামীর কাঠগড়ায় তারাই আজ 'সামনে ভোঁ আর মাথায় / লালবাতি জ্বেলে / জোরহাতে জনতাকে ভজাবে ।'' এদের মধ্যে যাদের নিদারুণ দরিদ্রের সংকটে ধুঁকে বাঁচতে হচ্ছে। তাদের ছবি আঁকতে কবি লিখেছেন — ''প্রভাতফেরিতে যাদের গলা দেবার কথা
পার্টি করে অনেক রাত্রে ফিরে তারা সব
তারা সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ।'' (যদি পাওয়া যায় / ছড়ানো ঘুঁটি)

স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছরে দেশপ্রাণ ও দেশপ্রেমী সেই সব মহৎ প্রাণ চরম আঘাতে যেন পাগল হয়েছে আজ । স্বাধীনতা যেন মৃত । সেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণকে বাজি নিয়ে দেশমাতার মুক্তির জন্য

হাহাকার করছে। সেইসব প্রাণীর বিকৃত জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কবি সুভাষ মর্মান্তিক হৃদয়ে লিখেছেন —

“এক পাগল
একা একপাশে দাঁড়িয়ে

ফুঁ দিয়ে দিয়ে
স্বাধীনতার ছাই উড়িয়ে আস্তাকুঁড়ে খুঁজছে

কিছু দামি জিনিস
যা সে হারিয়েছে।” (যদি পাওয়া যায় / ছড়ানো ঘুঁটি)

অন্যায় , বঞ্চনা , শোষণ ও সামাজিক অবিচার সহ্য করে চলেছে মানুষ। কবি সে কারণে দেশকে বলছেন “আমরাও সব যে যেখানে আছি / চোখ বন্ধ ক’রে / খেলছি কানামাছি / করে চলেছি ভোঁ ভোঁ”। গণতান্ত্রিক সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কুৎসিত রূপ দেখে কবি বিরক্ত। সেই ব্যবস্থার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে কবি লিখেছেন — “ঝোলার মধ্যে লুকিয়ে সিঁদকাঠি/ চোর জোচ্চোর/ ব’সে প’ড়ে সব/ সংসদে আর/ মসনদে/ শেখায় জগৎ নিছক ধোকার টাটি।” (কানামাছি / ছড়ানো ঘুঁটি) এই প্রবঞ্চনা ও তঞ্চকতার পরিবর্তনে কবি প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন গণ মানসের সচেতনতা। প্রয়োজন মনে করেছেন জনজাগরণের। কবি তাই লিখেছেন —

“চোখ খুললে তবে দেখবে বাপ সকল —
একটা শুধু উল্টো প্যাঁচেই হবে
দিনের পালাবদল।” (কানামাছি / ছড়ানো ঘুঁটি)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত “বলছিলাম কী’ শীর্ষক কবিতায় কবি অনেককথা বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথা মানুষের জন্য , দেশের জন্য , সমাজের জন্য। একটা স্বাধীন দেশের মানুষের ভাগ্য কত পরাধীন। একশ্রেণীর মানুষ দেশের সমস্ত সম্পদের অধিকারী। সেই ভোগ বাসনা ও অধিকার তারা পূরণ করছে নিতান্ত অন্যায় পথে। সেই অন্যায়ের “কী আসে যায় হাতে নাতে / প্রমাণ এবং সাক্ষ্যে।” পুঁজিবাদী মানুষ , জমিদার , জোতদার , মোড়ল , সুদখোর মানুষ একটা সমাজের সাধারণ শ্রেণীর কঙ্কাল চুষে চুষে খাচ্ছে ,’ কবির সচেতন ও সংবেদনশীল হৃদয়ে সেই আঘাত অসহনীয় হয়ে ওঠে। সেই বেদনা প্রকাশ করতে কবি লিখেছেন —“মোড়লেরা ব্যস্ত বেজায়/যে যার

কোলে ঝোল টানতে ।/সারাটা দেশ হাপিত্যেশে , /পান্তা ফুরোয় নুন আনতে।/চোর - বাটপাড়/সাধুর ভেখে/ ফাঁদে কারবার/ আড়াল থেকেলিখেছেন —/ হাতিয়ে জমি , বানিয়ে বাড়ি/ করছে টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি ।'' (বলছিলাম কী / ছড়ানো ঘুঁটি) সামাজিক বিকার ও অন্যায়কে শিল্পিত রূপ দেবার প্রয়াস, আমরা লক্ষ্য করি আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'কেডা রে' শীর্ষক কবিতায় । কবির জনচেতনা ও সমাজ পরিবর্তনের মানসে রচিত আলোচ্য কবিতাটি । একই ভাবনা থেকে কবি সেখানে লিখেছেন —

''বাড়ি । গাড়ি । অঢেল টাকা ,
প্রাচুর্য আজ দিয়েছে ঢাকা ,
সাবেকের সেই দৈন্য ।
স্বয়ং যেতে হয়না জেলে
ফেললে কড়ি বাজারে মেলে
লড়াই করার সৈন্য।
দল পাকিয়ে ছেলে বুড়োয়
গাছের খায়, তলার কুড়োয় ।'' (কেডা রে / ছড়ানো ঘুঁটি)

অথচ এই অন্যায়কারী, সামাজিক অপরাধীরাই সমাজে বুক চেতিয়ে ঘোরাফেরা করা। অথচ যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যারা সমাজকে শোষণ মুক্ত করার প্রয়াস রাখে তারাই যমের বাড়ি যাবার মতো বাধ্য হয়ে ওঠে, কবি তাই অনেকটা অনুতপ্ত হয়ে লিখেছেন —

''ওদের মাপ সাতখুন ।
বেঁচে থাকুক সর্বহারা ।
যমের বাড়ি পাঠাও , যারা
জোঁকের মুখে দেয় নুন ।'' (কেডা রে / ছড়ানো ঘুঁটি)

কবি শুধু সামাজিক কদর্য বিষয়টির শিল্পিত রূপ দেন নি, তার শিল্পে আশাবাদিতার বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই। কবি তাই লিখেছেন —''নয়কো নুন, /জলে কেবলি/জাগে নতুন/পলি ! / নেই গলায়/ কোনো ঘোষণা, / ক্ষেতে ফলায়/ সোনা ।'' (যদি বলি / ছড়ানো ঘুঁটি) কবির ব্যক্তি জীবন। এই জগৎ সমাজ ও সব শ্রেণীর মানুষের মঙ্গল কামনা ছিল কবি সুভাষের রচনার মুলমন্ত্র। সমস্ত অবিচার , অন্যায় , শোষণ , বৈষম্য ও মানবিকতার অবমাননায় তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত হতে দেখি আমরা , কবি জীবনের একেবারে অন্তিম প্রান্তে এসে অবস্থান করেছিলেন আলোচ্য কাব্য রচনাকালে । এখন সহস্র রণ পা দেখেও লাঠি হাতে দৌড়োবার শক্তি তাঁর শরীরে অবশিষ্ট নেই। শরীর তাঁকে এখন

বার বার জানিয়ে দেয় ''পেছনের সব টান যাক চুকে -বুকে।'' বয়স যেন তাকে বলে ''এখন পড়ন্ত বেল।/ ছায়ারাই শুধু পিছু হাঁটে / শেষ করো খেলা।'' তাঁর বয়স জানিয়ে দেয়, যেকোন মুহূর্তে এক ফুঁয়ে নিভে যেতে পারে তাঁর জীবন প্রদীপ। এই শেষ বেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছেও কবির প্রত্যাশা মানুষের জেগে ওঠার উৎসব, মানুষের শান্তি, জীবনের আলোকিত অধ্যায়। কবি তাই লিখেছেন — ''এখুনি কালের এক ফুঁয়ে / নিবে তো যাবেই, তার আগেই বাপু, হে /স্বয়ং সূর্যের কাছ থেকে অল্প স্বল্প / কায়কল্প / শিখে নেওয়া ভালো —/ কি করে জ্বালেন /তিনি নিবিয়ে নিজেকে / কনে-দেখা -আলো / তাঁরই হাত ধ'রে /রাত্রিশেষে জমে উঠবে /এ মাটির কোল - আলো -করে / নতুন উৎসব —''। (কুমার সম্ভব / ছড়ানো ঘুঁটি)

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'তেরোস্পর্শ' শীর্ষক কবিতায় কবি সুভাষ কবিতার পদবিন্যাস ডায়রি লেখার ঢঙে রচিত। কবিতাটি ডায়রির ধর্ম বজায় রেখে লেখার স্থান , বার , কাল , তারিখ , বাংলা ও ইংরেজি উভয় নির্দেশ করেন। তাঁর ডায়েরী লেখার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, একজন নিকট আত্মীয়ের লেখার অভ্যাস দেখে। তিনি তাঁর বনগাঁ-র পিসেমশাই কবিতায় সেটাও উল্লেখ করেন কবি , সে পিসেমশাই লেখার আগে মুখে গলিয়ে নিতেন আফিঙের একটা গুলি। কবির নিজের অনেক দিনের সখ একটা ডায়েরি লেখার। বছর শুরুর আগে এক মক্কেল বড়বাবুকে দিয়েছিলেন। পাড়ার এক পূজোর উদ্বোধনে একটা মালার সঙ্গে সেই ইস্তক ডায়েরিটা কবি সুভাষকে দিয়ে দেন তিনি। দীর্ঘ ''এক যুগ পর আজ আবার সেই ফেলে -আসা তেরোকে স্পর্শ করছি।'' সেই থেকে নাম ''তেরোস্পর্শ''। তাছাড়া ''তেরো থেকে বাকি সবটাই সাদা। বারোর পর কালির আর / কোনো আঁচড় নেই।'' ডায়েরি লেখা নানা ব্যক্তিগত কথা — নতুন রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে। এই কবিতা কবির পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল।

আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভূক্ত উল্লেখযোগ্য কবিতা ''মুখনাড়া'। জীবনের একেবারে অন্তিম পর্বে এসে পৌঁছে গেছেন কবি সুভাষ। সেই বয়সে বার্দ্ধক্যের জন্য ধীরে ধীরে শরীর শক্তি হারিয়ে ফেলছে। তার কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে পারছে না। কবির ভাষায়—

''দেয়াল ধ'রে আবার সেই
হাঁটি-হাঁটি পা - পা ,
এখন শুধু হামা দেওয়া বাকি।

ঠাকুরের ভক্ত একজন

আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল

যিনি দিয়েছেন

তিনি-ই সব একে একে ফিরিয়ে নিচ্ছেন ।''   (মুখনাড়া/ছড়ানো ঘুঁটি)

জীবনের পিছন ফিরে কবি নিজেকে নিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন মানুষের জন্য , প্রাণীর জন্য এ-জগতের জন্য তিনি কি কি করেছেন। এই চলে যাবার সময়ে তিনি নিজেকে নিয়ে মূল্যায়ণ করছেন । কখনো কখনো তাঁর মনে হয়েছিল তাঁকে নিয়েই যেন সবাই বলাবলি করে। যেন তার অকমর্ণ্যের বোঝা এ জগতের কেউ বয়ে চলতে রাজী নয় । তাঁর কথায়—''সকলের ঠোঁট নড়া / পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি । / আমাকে নিয়ে কারা কী সব যেন / বলাবলি করছে। / রান্নাঘরের চালে কাক , /মাছের গন্ধে ছোঁক -ছোঁক করা বেড়াল /এমন কি অমন সাধের কুকুরটা পর্যন্ত / আমাকে লক্ষ্য ক'রে কী সব বলছে । / কী করেছি আমি ? / আমাকে সবাই কেন অমন করে / কীটোচ্ছ ? /একজন সহৃদয় লোক একটা কাগজে , /হিজিবিজি ক'রে লিখে / আমার সামনে ধরে দিল / তাতে লেখা : / 'তুমি কী করেছ নয়, ওরা বলছে / কী - কী তুমি করো নি ।''   (মুখ নাড়া / ছড়ানো ঘুঁটি)অর্থাৎ জগতের বিড়াল , কাক , কুকুরের জন্যও করার মতো মানুষের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে । কবির আক্ষেপ তাঁর এই মানব জীবনের অনেক কিছুই না করা কাজ রয়ে গেল ।

করা হল না অথচ বার্ধক্য তাঁকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিয়েছে । তাঁর অপেক্ষমান অক্ষমতা উত্তরসুরীকে কর্মোদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলার শক্তি জোগাবে । তবে যারাই কিছু করবেন তাদের জন্য জগতে একটা শ্রেনী থাকবেন অপবাদ দেবার , সমালোচনা করার জন্য । কাজ করে প্রতিদানে এরকম আঘাতটাকে সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতি নেবার উপায় দেখিয়েছেন কবি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে । এই জাগতিক সত্য ও কর্ম সংস্কৃতি কবিতার বিষয় করে তুলেছেন কবি । নিন্দা , অপবাদ ও কুৎসা বৃদ্ধ বয়সে মেনে নেওয়া অধিক কষ্টজনক । কবির উপলব্ধি থেকে আমরা জানতে পাই । কবি আলোচ্য কাব্যে লিখেছেন —   ''কেউ হ্যাঁ করলেই মনে হয়

আমাকে নিয়েই

কথা হচ্ছে

/

চোখ মুখের ভাব দেখে

বোঝার চেষ্টা করি

কথাটা ঠিক কী ।''   (কালা কানুন / ছড়ানো ঘুঁটি)

তিনি কতটা মানুষের জন্য করতে পেরেছেন তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে সমালোচকরা কেবল সমালোচনা করেন যে, তিনি কি করেন নি। এই সমালোচনা ও নিন্দাকে পেরিয়ে নিজের পথে অবিচল থাকার দৃঢ় মানসিকতা রাখার পথ নির্দেশ তার কবিতায় আমরা পাই। তিক্ত কবি লিখেছেন —

''দুটো বুড়ো আঙুলের ডগা নেড়ে
সবাইকে স্রেফ বুঝিয়ে দেব
আমি হলাম
যাকে বলে বদ্ধ কালা।'' (কালা কানুন / ছড়ানো ঘুঁটি)

আলোচ্য কাব্যের নাম কবিতায় কবির সামাজিক নিন্দা, অপবাদ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার শৈল্পিক পথ দেখিয়েছেন। এই জগতের সবকিছু গ্রহণ করে বৃদ্ধ কবি বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কবি। তার সবাইকে ছেড়ে চলে যাবার শান্তির পথকে আহ্বান জানান তিনি—''সবারই সেই এক প্রশ্ন /কে যায় /যায় না তো কেউ / আসে /নতুন মুখ /ভিড় করে চারপাশে / গল্প করে বলতে হয় / বেঁচে থাকার কী সুখ ।।'' (ছড়ানো ঘুঁটি / ছড়ানো ঘুঁটি) মানুষের জন্য মানুষের সমাজের জন্য কাজ করে ভালো ফসল নিজের গোলা ভর্তি করে নিয়েছেন তিনি । তিনি সবুজ ঘাস, হলদে পাখি, গাছের পাতাকে ভালোবাসেন। প্রকৃতি ও মানুষকে ভালোবেসে কবি লিখেছেন —''সুখে দুচোখ জুড়ে আসছে / খুলে যাচ্ছে জীবনভর /পাকানো দুটো মুটি ।'' (ছড়ানো ঘুঁটি / ছড়ানো ঘুঁটি)

আলোচ্য কাব্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা মৃদঙ্গ । এই নামকরণ বেছে নেবার মধ্যে নিহিত অসামান্য ও গভীর তাৎপর্য । বৃদ্ধ কবি ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বে লেখনী হাতে আরো একবার একেবারেই বৃদ্ধ বয়সে জ্বলে ওঠার দৃঢ় মানসিকতা রাখেন । এই কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন —

''হাতে যদি আর
একটু সময় পাই
তবে কেল্লা ফতে
জ্বলে উঠবে সন্ধ্যা দিবা রাতে'' (মৃদঙ্গ / ছড়ানো ঘুঁটি)

কবি সবার ঘরে ঘরে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার প্রতি সাড়া জাগানো বাদ্যযন্ত্র 'মৃদঙ্গ' রেখে চলে যেতে চান কবি । সবারই দ্রুত বেগে চলার ও জয়ী হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন — ''ভাঙে না যেন অনেক সাধের/ মাটির এই মৃদঙ্গ ।।''আলোচ্য কাব্যের ''যাও পাখি'' শীর্ষক কবিতায় প্রগাঢ় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন তিনি । সেখানে তিনি লিখেছেন — ''বারান্দার কোলে মাটির টবে/ ক্যাকটাসের গায়ে ধরেছে কুঁড়ি ।/ বলা রইল । যেখান থেকে পারো / কুড়িয়ে এনো ঝিনুক আর

নুড়ি।'' (যাও পাখি / ছড়ানো ঘুঁটি) এই কবিতাটিতে কবির স্বপ্ন এবং শারীরিক অক্ষমতা প্রকাশ পায় । তিনি নিজেই বলেন — ''বলতে পার , কানা মেঘের মতন / দশা আমার এখন । / একচোখে রোদ , জল অন্য চোখে / চেয়ে দেখুক লোকে ।'' এই অবস্থায় চূড়ান্ত অবহেলা , একাকীত্বের ও অব্যবস্থা তার শেষ বেলা অতীব কষ্টে কেটেছিল । 'ছড়ানো ঘুঁটি' কাব্যের শেষ আলোচ্য কবিতা 'তুমি তো কাঁদো না'। এই কবিতায় কবির একজন সহিষ্ণু , অসম ধৈর্য্যশালী মহিয়সীর কথা বলতে চেয়েছিলেন । বুকের সমস্ত বেদনা পুঞ্জীভূত করে সহ্য করে গেছেন , আজীবন। কবি তা উপলব্ধি করে অসহনীয় বেদনা উপলব্ধি করছেন । বেদনা সহ্যের ক্ষমতায় বিস্মিত কবি লিখেছেন — ''কী আশ্চর্য/ কখনই তুমি তো কাঁদো না /পুঁটুলি পাকিয়ে রেখে গেছ/ এ — বাড়ির আঁনাচে কানাচে/যে মনো বেদনা /পুড়ে যাচ্ছি আমি তার আঁচে ।'' (তুমি তো কাঁদো না / ছড়ানো ঘুঁটি) কবি সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাতে তাঁর বিস্ময়ের কারণ জানতে পারেন নি লজ্জায় । কিন্তু কবির কৌতুহল মানুষের বেদনা, কষ্ট সহ্য করে মাটির মতো সেই মানুষ কিভাবে অন্যের বেদনা নিজে বহন করে চলেন। কবি বলেছেন — ''তবু খুব জানতে ইচ্ছে করে

কখনও না - কেঁদে
সমস্ত বর্ষার জল কেন তুমি হাসি মুখে
তুলে নাও দু-চোখের কোলে—
একদিন বাঁধ ভেঙে দিয়ে
আমাকে ভাসিয়ে দেবে ব'লে ? (তুমি তো কাঁদো না / ছড়ানো ঘুঁটি)

বেদনা , কষ্ট , দুঃখ ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কবিতাটির শীর্ষনামের 'তুমি' সর্বনামের থেকে ক্রমশ সেই দুঃখিনী মায়ের ; ঘরের আনাচে কানাচে , গলির ছোট্ট এক চিলতে বাগানে , ছেঁড়া সেলাইয়ের ছুঁচে , ভাঙা জোড়া দাওয়ার আঠায় । কবি সবকিছুর মধ্যে সেই মহিয়সীর অবস্থান উপলব্ধি করেন । কবি তাই বলেছেন — ''ছেঁড়া সেলাইয়ের ছুঁচে , / ভাঙা জোড়া দেওয়ার আঠায় / তুমি আছ / ছুঁলেই টের পাই / লাঠি হাতে উঠে / এ-ঘর ও-ঘর করি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ।'' বার্দ্ধক্য কবিকে দুর্বল করে দিতে চাইলেও উপলব্ধির সুক্ষ্মত া, সচেতন অনুভূতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা কবি সুভাষকে চলমানতা থেকে এক মুহূর্তের জন্য পথ আঁটকে দাঁড় করাতে পারে নি । আটকে থাকে নি তার সৃজনী ধারার চলমান গতি ।প্রচলিত কাব্য রচনার ধাবায় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয় তাঁর অনুবাদ কাব্য। অনুবাদ কবিতা সৃষ্টিতে কবি সুভাষকে আমরা স্বতন্ত্র স্রেষ্টা হিসেবে দেখি। সেখানে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন পাই।

সেখানে রয়েছে ভাষা। ছন্দ ও বিষয় বৈচিত্র্যের নতুন সৃজনী শক্তির পরিচয়। কবি সুভাষের ভিন্ন সম্পদ তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হল— ১) নাজিম হিকমতনের কবিতা, ২) দিন আসবে ৩) পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ ৪) ওলঝাস সুলে মেনভ – এর রোগা ঈগল ৫) নাজিম হিকমতের আরো কবিতা ৬) হাফিজের কবিতা ৭) চর্যাপদ এবং ৮) অমরু শতক।

কবি সুভাষ যাঁদের কবিতা অনুবাদের তাগিদ উপলদ্ধি করেছিলেন সেইসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নাজিম হিকমত। তার সঙ্গে কবি সুভাষের প্রথম সাক্ষাৎ তাশখন্দ শহরে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে ১৯৫৮ সালে। নাজিম হিকমতের সংগ্রামী জীবন কবি সুভাষের অধিকতর আকর্ষনীয় ছিল। সে সম্পর্কে কবি স্বয়ং লেখেন — “তুরস্কে বড়ো ঘভরে তাঁর জন্ম। সতেরো বছর বয়সে নৌ বাহিনীর অফিসার হিসেবে শিক্ষানবীশ থাকার সময় নৌ বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় দেশ ছেড়ে তাঁকে সরে পড়তে হয়। এই সময় তিনি যান সদ্য বিপ্লবোত্তর রুশদেশে। কিছুদিন পরে ফিরে এলে তিনি বামপন্থী দলভুক্ত হয়ে তুরস্কে জাতীয় বিপ্লবে অংশ নেন। নাজিম হিকমত লিখতে শুরু করেন চোদ্দ বছর বয়সে। সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেও তাঁর কলম কখনও থামেনি। এরপর তিন-চার বছরের মধ্যে আরও দুবার তিনি সোভিয়েত দেশে যান। ১৯২২ সালে রুশ কবি মায়াকভস্কির সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর নাজিম হিকমতের কবিতা নতুন মোড় নেয়। ১৯৩৭ সালে হিকমত স্বদেশের কারাগারে বন্দী হন। দীর্ঘ তেরো বছর জেলে থাকার পর আন্তজাতিক জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ শরীরে তিনি মুক্তি পান। হিকমতকে মোট যে মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়েছিল, তা যোগ করলে হয় ৫৬ বছর।

এর পর তুরস্কের শাসকশ্রেণী তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে সেই অবস্থায় বাধ্য হয়ে হিকমতকে গোপনে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। সোভিয়েত দেশ তাঁকে সাদরে আশ্রয় দেয়।” কবির ব্যক্তি মানসে এরকম লড়াকু কবির সাকর্ষণের ব্যাক্তি হবেন এটাই স্বাভাবিক। কবি হিকমতের কবিতা কবি সুভাষ অনুবাদ মূলের থেকে করতে পারেন নি। কিছুটা ফরাসি অনবুবাদ থেকে বাকি ইংরেজি অনুবাদ থেকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। কবি এই অনুবাদ কবিতায় হিকমতের জীবনকে প্রতিফলিত করার প্রয়াসী ছিলেন। সাহিত্য মানুষের জীবন ও সমাজকে প্রতিফলিত করাই ছিল কবি নাজিম হিকমতের

কাব্যেরও মৌল ধর্ম। তিনি এ সম্পর্কে বলেন — "সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত। সংগ্রাম আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব ক'টি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যে ধারণা দেয় না। 'কবিতার, গদ্যের কথা বলাবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন — যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর , একন্ত জটিল – অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমসত উপাদান। কবি যখন লেখেন আর যখন কথা বলেন কিংবা অস্ত্র হাতে নেন – তিনি একই ব্যাক্তি। কবিরা তো আকাশ থেকে পড়েনি যে, তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলাবার স্বপ্ন দেখবেন, কবিরা হলেন সমাজের একজন – জীবনের সঙ্গে যুক্ত, জীবনের সংগঠক।" (নাজিম হিকমতের কবিতা" – গ্রন্থের সূচনা অংশ)। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা পাই তেইশটি অনুবাদ কবিতা। কবিতাগুলি মূলের অক্ষরানুবাদ নয়। কমি মহৎ কবি নাজিমের উচ্চ সংগ্রামী জীবনদর্শন প্রেরণামূলে রেখে তাঁর সৃজনী শক্তির মৌলিক ধর্ম বজায় রেখে সৃষ্টি করেছেন অনুবাদ কবিতাগুলি। সেগুলিতে আমরা পাই কবি সুভাষের শৈল্পিক ও মননশীল জীবন চেতনা। পাই বাংলা কাব্যে নবীন চেতনার উন্মেষ। অনুবাদ কবিতাগুলি কবির স্বকীয় শিল্প চেতনার নিদর্শন আমরা পাই।

নাজিম হিকমতের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প ভাবনাও কবি সুভাষকে অআকর্ষন করেছিল। সেই শিল্প চেতনার নাগাল আমরা পাই কবির নিজেরই কথায়। তিনি বলেন "সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়-পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সবকটি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যে ধারনা দেয় না।" এই সত্য উন্মোচনের তাগিদ এবং মানুষের জীবনের সবকটি দিগ সাহিত্য প্রতিফলিত করার জন্য কবি অনুবাদ কাব্যে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। যদিও তাঁর মৌলিক কবিতার বাইরে অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে অনেক বিঘ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বিশ্ববন্দিত কবি নাজিম হকিমতের মূলের অনুবাদ তার পক্ষে সম্ভ ছিল না। কবি নাজিম হিকমত তাঁর মাতৃ ভাষা তুর্কী ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে কবিতা লেখেননি। আর সেই তুর্কী ভাষাতে কবিতা লেখেনি। আর

সেই তুর্কী কবি সুভাষের জানা ছিল না। তিনি বাংলা অনুবাদ করেছিলেন হিকমতের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে। তিনি যে বন্ধুর কাছ থেকে সেই ইংরাজি অনুবাদ পেয়েছিলেন তার নাম ডেভিড কোহেন। অথচ সে কবির কবিতা কবি সুভাষ অণুবাদ করেছিলেন তাঁর সঙ্গেও কবি সুভাষের দেখা হয়েছিল দু'বার – ১৯৫৮ সালের এবং ১৯৬২ সালে। এ সম্পর্কে কবি বলেন – "নাজিমকে কাছে পেয়েও তাঁর সঙ্গে কখনোই আমার সে রকম বাক্যলাপ হতে পারেনি। নাজিম জানতেন ফরাসী আর রুশ। আমি শুধু ইংরাজী। তাছাড়া সম্মেলনের বাঁধাধরা আর ভিড়ে – ঠাসা প্রোগ্রাম। ফলে, নাজিমের সঙ্গে আমার হয়েছে শুধুই চোখের দেখা। যা কিছু লিখেছেন সবই তুর্কী ভাষায়। আমার দুভার্গ্য – আজ পর্যন্ত তুর্কী ভাষা জানেন এমন কাউকেই হাতের কাছে না পাওয়ায় ইংরাজী তর্জমাই হয়েছে আমার কাছে অন্ধের ষষ্টি।" (কবিতা সংগ্রহ–সুভাষ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ১১৩)।

নাজিম হিকমতের সংঘাত পূর্ণ–জীবন ও তাঁর বিশ্ব মানবতাবোধ কবি সুভাষকে আকৃষ্ট করেছিল। নাজিম সম্পর্কে কবি সুভাষ যা বলেন তা সংক্ষেপে এরকম টান নাজিমের জন্ম ১৯০২ সালে। বড় হন ইস্তান্‌বুলে। ঠার্কুদা ছিলেন তুরস্কের একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ। কবিতায় নাজিমের হাতে খড়ি হয় যখন তাঁর চোদ্দবছর বয়স। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির দখলের চলে যায় তুরস্ক। ১৯২১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য নাজিম ইস্তান্‌বুল ছেড়ে গোপনে চলে যান আনাতোলিয়ায়। তার সীমান্ত পেরিয়ে বাতুম। সেখান থেকে মস্কো। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াড়শুনা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় তিনি নানা দেশের লেখক শিল্পীদের সম্পর্কে আসেন। দেশ স্বাধীন হলে নাজিম তুরস্কে ফিরে এসে এক বামপন্থী পত্রিকায় কাজ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। তার পর কোনরকমে পালিয়ে সোভিয়েতে চলে যান। ১৯২৮ সালে সব বন্দীছাড়া পেলে নাজিম দেশে ফেরার অনুমতি পান। দেশে ফিরে নাজিম প্রুফরিডার, সাংবাদিক, চিত্রনাট্যকার এবং অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। দশ বছরে তাঁর নয়টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

তুরস্কের গোয়েন্দা পুলিশ তখনও তাঁর পেছনে লাগা ছাড়েনি এবং কমবেশি মেয়াদে মোট প্রায় চার বছর তাকে জেলে আটক থাকতে হয়। এর পর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৩৮ সালে, সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যে তিনি নাকি বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছিলেন। নাজিমের কবিতা পড়তে দেখা গেছে তাদের

অনেক কে – এই সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়েই নাজিমকে ২৮ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। তেরো বছর জেলে থাকাকালীন তাকে জেল কর্তাদের চোখ এড়িয়ে কবিতা লিখতে হয়েছিল। তার পর সেগুলি গোপনে চালান করতে হয়েছিল বাইরে অস্বাভাবিক অবস্থার কারণের তার অনেক কবিতা খোয়া গেছে। তাঁর মুক্তির জন্য প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। সেখানে ছিলেন নেরুদা, পিকাসো, আরাগঁ, সার্ত্র্। দেশে দেশে নাজিমের মুক্তির দাবীতে জোরদার হতে থাকে সভাসমিতি, মিছিল। এ সময় হয় তার গুরুতর হার্টের অসুখ অসুস্থ ও বন্দী নাজিম আঠারোদিন ধরে দীর্ঘ অনশন ধর্মঘট করেন ১৯৫০ সালে। তিনি বিশ্ব শান্তি পুরস্কার পান ১৯৫০ সালেই।

এরপর অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তিনি ছাড়া পান বিশ্ব জনমতের চাপে। কিন্তু ছাড়া পেয়েও তাঁর মুক্তি নেই। ৪৮ বছর বয়সে তাকে জোর করে মিলিটারীতে ভর্তি করার চেষ্টা হয়। ফলে বাধ্য হয়ে স্ত্রীপুত্র ফেলে দেশে তাকে পালাতে হয়। জীবনে শেষের তেরো বছর কাটে সোভিয়েত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে। অবশেষে নাজিম মারা যান ১৯৬৩ সালের জুন মাসে। কবি নাজিম হিকমতের জীবন আর তাঁর কাব্য অভিন্ন। তাঁর কবিতাই তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত। তাঁর কবিতার যে সার্বজনীনতা, তার শেকড় রয়েছে তার স্বদেশের মাটিতেই। তাঁর কবিতা কালক্রমে সাজালে তুরস্কের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে উঠে। তুর্কী ভাষায় নাজিম আধুনিক কার্যতার জনক। প্রথাগত ছন্দ ভেস্তে তাকে তিনি দাঁড় করান মুখের কথার কাছাকছি। কবিতায় তথাকথিত বাঁধাধরা নিয়ম ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নিজেকে তিনি ক্রমাগত বদলে গেছেন। তাঁর বলবার কথা থেকেই ফুটে উঠেছে তাঁর বদলাকার বিচিত্র ধরন। নিজের ভাষার ঐতিহ্য অবিচল থেকেও অন্য ভাষার সার্থক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার।

মহান কবি নাজিম হাকিমতের সর্বমোট ৭১ (একাত্তর) টি কবিতার অনুবাদ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবি সুভাষ এই কবিতা গুলির মধ্যে মোট ২৯টি কবিতা নিয়ে 'নাজিম হিকমতের কবিতা' গ্রন্থ। এর মধ্যে 'জেলখানার চিঠি' শিরোনামের কবিতা টি মূলত সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছয়টি কবিতার সংকলন। সেই হিসেবে এই গ্রন্থের কবিতার সংকলন। সেই হিসেবে এই গ্রন্থের কবিতার সংখ্যা ২৪টি। কবিতাগুলি হল —

১) প্রমিথিয়ূসের ডাক ২) শয়তানের জন্য যেন না মরি ৩) ছাপ ৪) না - ধরানো সিগারেট ৫) কলকতার বাঁড়ুজ্যে ৬) বিদায় ৭) রবিবার ৮) শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে ৯) আহম্মদ ড্রাইভার ১০) জেলখানার চিঠি ১১) আমি জেল যাবার পর ১২) ক্ষমা করব না ১৩) বিংশ শতাব্দী ১৪) হয়তো ১৫) তুমি আমি ১৬) ভূখ হরতালের পাঁচ দিনের দিন ১৭) দুচোখের বিষ ১৮) তুমি আমার দেশ ১৯) পল রোবসন-কে ২০) আমার হৃদয় ২১) সকাল ২২) বিকেলের হাওয়ায় ২৩) আটটি বছর ২৪) এখন প্রশ্ন।

কাব্যটির ১৯৫২ সালে প্রথম সংস্করনে শেষ কবিতাদুটি যথা 'আটটি বছর' এবং 'এখন প্রশ্ন' কবিতা দুটি ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ-১ গ্রন্থে সেই কবিতাদুটি অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম সংস্করনে দু চোখের বিষ কবিতাটির শিরোনাম ছিল – দুশমন। 'কলকাতার বাড়ুজ্যে' আহম্মদ ড্রাইভার' ও 'শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে' কবিতা তিনটি হিকমতের তিনটি পৃথক মহাকাব্যের এককেটি অংশ বাঁড়ুজ্যে হলেন কলকাতার একজন বিপ্লবী। তাঁকে নিয়ে হিক্‌মত। বাঁড়ুজ্যে কেন খুন হলেন' নামে একটি মহাকাব্য লিখেছিলেন। আহাম্মদ ড্রাইভারের স্থান তুরস্কের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে। শেখ বদরুদ্দিনের তুরস্কের পুরনো যুগের এক গণবিদ্রোহের নায়ক। আদিম সাম্যবাদী সমাজের আদর্শে তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। সোলের শাসক শ্রেণির হাতে তাঁর ফাঁসি হয়। এই গ্রন্থের প্রায় সবকবিতা গুলিই হিক্‌মতের ইংরেজি অনুবাদ থেকে কবি সুভাষ বাংলা অনুবাদ করেন। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত একটি কবিতা সংকলন থেকে কয়েকটি কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে কবিে সাহায্য করেছিলেন কবি পত্নী শ্রীমতি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী রনজিৎ গুহ মহাশয়। এই কবিতাগুলি অনুবাদে কবি সুভাষের ভাবনা বৈচিত্র্য, ভাষা ও ভাবের মৌলিকত্বের পরিচয় আমরা পাই।

কবি নাজিম হিকমতের অনুবাদ হিকমতের অনুবাদ নিয়ে কবি সুভাষের দ্বিতীয় গ্রন্থ, নাজিম হিকমতের আরো কবিতা, প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি হল – ১) মাথা উঁচু করে ২) খালি পায়ে ৩) আমাদের সন্তানসন্ততির প্রতি উপদেশ ৪) কেটে যাচ্ছে এই ভাবে ৫) লোহার খাঁচায় সিংহ ৬) নির্বন্ধ ৭) আমাদের এই মেতে ওঠা ৮) কবির ক্ষণিক কুঁড়েমি ৯) চলে গেছে ১০) বন্দিমুক্তি ১১) আমার দেহস্থ কীট ১২) চানকিরি জেল থেকে চিঠি ১৩) ১৪) তাবাস্তা – বাবুকে লেখা পত্রাবলী ১৫) ইল্‌

দুচের বশম্বদ সেপাই ১৬) শেষ চিঠি ১৭) প্রাহায় সকাল ১৮) একটা চিঠিতে মুনেভার আমাকে এই কথা লিখেছিল ১৯) মুনেভারকে এই ব'লে চিঠি লিখেছিলাম ২০) বর্ হোটেল ২১) আশাবাদী প্রাহা ২২) মিথাইল রেফিলির স্মৃতিতে ২৩) মৌমাছি ২৪) ভোরের আলো ২৫) চলে গেলে ২৬) অকস্মাৎ ২৭) সকাল ছ'টা ২৮) 'স্বর্ণকুন্তলা' ২৯) আমার অন্তিমে।

এগুলির মধ্যে 'চানকিরি জেল থেকে চিঠি' কবিতাটি সর্বমোট পাঁচটি কবিতার সংকলন। 'তারাস্তা–বাবুকে লেখা পত্রাবলী' কবিতাটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত নয়টি কবিতার সংকলন। 'ইল দুচের বশম্বদ সেপাই' কবিতাটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত চারটি কবিতার সংকলন এবং স্বর্ণকুন্তলা – কবিতাটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দুটি কবিতার সংকলন।

এই গ্রন্থদুটির অনুবাদ কর্মে আমরা পাই কবি সুভাষের সামাজিক দায়বদ্ধ চেতনা ও বিশিষ্ট জীবন চেতনা। কয়েকটি কবিতার কয়েকটি চরণে সেই বিশেষ বোধের দৃষ্টান্ত ঃ

১। "আমিস্তম্ভের কাঁধে কাঁধ দিয়ে
রক্তিম দিগন্তে আমরা উন্মুখ হয়ে খুঁজি
আগ্নিময় চোখ।।"
(প্রমিথিয়ুসের ডাক/ নাজিম হিক্‌মতের কবিতা)

২। নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তা,
আমি তোমার দিকে তাকায়ে।"
(জেলখানার চিঠি/ নাজিম হিক্‌মতের কবিতা)

৩। "রক্তের নদী উজিয়ে
আমাদের নিশানা
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়–"

(আমি জেলে যাবার পর/ নাজিম হিক্‌মতের কবিতা)

৪। “আর তোমার মোনালি চোখের ভেতরটা আবার হেসে ঠবে
সারা পৃথিবীর ব্যথাবেদনা ভাগ করে নিয়ে।”
(মাথা উঁচু করে/ নাজিম হিক্‌মতের কবিতা)

৫। আশ্বাস ছাড়াই আমি বেঁচে থাকতে পেরেছি,
এবং আশ্বাস ছাড়াই আমি মরে যেতে পারব –
তোমার মতন বেফিলি।।
(মিথাইল রেফিলির স্মৃতিতে/ নাজিম হিক্‌মতের আরো কবিতা)।

হিকমতের অনুবাদ আমরা পাই বুর্মার অটোমান কবি গজলী, তুর্কী শিল্পী আবিদিন দিনো হিকমতের প্রথম ছাড়াও দ্বিতীয় স্ত্রী – পিয়ারে তৃতীয় স্ত্রী মুনেভার আন্‌দাক, পুত্র মেমেৎ এর পরিচয়। অনুবাদ কাব্য দুটির কোনো কোনো কবিতা সৃষ্টির রচনাকাল, রচনা স্থান উল্লেখ। কোনো কোনো কবিতা সামান্য কয়েকটি চরণ আবার কোনো কোনো কবিতা সুদীর্ঘ। নাজিম হিকমতের আরো কবিতা গ্রন্থের তারাস্তা বাবুকে লেখা প্রত্রাবলী, স্বর্ণকুলন্তা কবিতা দুটি দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতা দুটির একেকটির চারশশতাধিক। অনুবাদকের শ্রদ্ধা ও বিশিষ্ট জীবনচেতনা থেকে সৃষ্ট হিক্‌মতের কবিতা দুটি গ্রন্থ। এছাড়াও হিকমত নিয়ে রচিত আরেকটি কবিতা স্থান পেয়েছে কবির ‘জল সইতে’ কাব্য গ্রন্থে। সমালোচক অশ্রুকুমার সিদার ‘আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়” (পৃষ্ঠা ২৬৪) গ্রন্থে লিখেছেন সে হিকমতের তর্জমারী তাৎপর্য সুভাষের বিবর্তনে এবং হিকমতের তর্জমা সুভাষের পরবর্তী মৌলিক রচনাকে প্রভাবতি করেছে।

কবি সুভাষ যাদের রচনার অনুবাদ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি নিকোলো ভাপৎসারভি। কবির জন্ম বুলারীয় পিরিন পাহাড়ের সানুদেশের ছোট্ট শহর বানসকোয় ১৯০৯ সালে। তাঁর মা এলেনা ছিলেন দেশ বিদেশের লোক সাহিত্য ও কবিতা সচেতন। কবি তাপৎসার্রভ মায়ের কাছ থেকেই দেশবিদেশের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে আকর্ষন বোধ করেন। কবি ছাত্রজীবনে নৌ বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন কালে জাহাজীদের সংস্পর্শে কমিউনিষ্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। এরকম গ্রামাঞ্চলে, কার্ডবোর্ডের কারখানায়, নাটক, গান সাহিত্যপাঠ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করেন। কবি শ্রমিক পার্টির

সঙ্গে যোগাযোগ করে কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে – পত্র পত্রিকা প্রচলন করে প্রগতীশীল ভাবধারার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কারখানায় ১৯৩৬ সালে ছাঁটাই হয়ে ভাপৎসারভ চলে যান সোফিয়ায়। এর পর বহু চেষ্টা করে কারখানায় কাজ যোগার করেন। পরে আগরাওয়ালার রেলে কাজ পান। এর পর তাঁর কাজ জোটে সরকারী কশাই খানায় যন্ত্রকুশলী হিসেবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নিকোলো পিরিন প্রদেশে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার ও পার্টির কাজের দায়িত্ব নেন। প্রতিরোধ আন্দোলনে নিকোলো নেতৃত্ব দেন। বুলগারীয় প্রশাসন তাঁকে সাজা দেয়। এবং তৎকালীন বুলগারীয় ফ্যাশিষ্ট সরকার তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। কিন্তু অত্যাচার ও নিপীড়ন তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। পরিশেষে ১৯৪২ সালে ২৩শে জুলাই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে নিকোলর কবিতা সম্পর্কে কবি সুভাষ স্বয়ং লেখেন – — "নিকোলো ভাপৎসারভ লিখেছেন সংগ্রামের কবিতা – যা তাঁর জীবন থেকে উঠেছে। তাঁর কবিতায় এই নীরক্ত পান্ডুরতা নেই, প্রগলভ্ চিৎকার নেই। আছে যন্ত্রণার কথা, ভালবাসার কথা। আছে দাঁতে দাঁত দিয়ে সংগ্রামের কথা। আছে মানুষের অনিবার্য জয়ের কথা। অফুরন্ত আশার কথা।" ('দিন আসবে' কাব্যের ভূমিকা অংশ – পৃঃ ২৬)

কবি নিকোলোর চোদ্দটি কবিতার অনুবাদ নিয়ে 'দিন আসবে' কাব্যটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ সালে। কবি সুভাষ সরাসরি বুলগারীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করেননি 'দিন আসবে'। নিকোলোর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে কবি সুভাষ এই কাব্য সৃষ্ট করেছেন। 'দিন আসবে' অনুবাদ কাব্যের সম্পর্কে কবির স্বীকৃতি – "বুলগেরীয় ভাষা আমার জানা নেই। ফলে, মূল থেকে কতটা সরেছি তা জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যথাসম্ভব ইংরেজি অনুবাদের পায়ে পায়ে চলবার চেষ্টা করেছি। নিকোলো ভাপ্ৎসারভের কিছু কিছু কবিতা একজন পড়ে শুনিয়েছিলেন। ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছিল এমন কি ইংরেজিতেও মূল কবিতার ছন্দ ও মিল সব ক্ষেত্রে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কাজেই সে চেষ্টা না ক'রে দু-একটা ছাড়া সব অনুবাদেই আমি সোজাসুজি গদ্যের আশ্রয় নিয়েছি। (কবিতা সংগ্রহ – সুভাষ মুখোপাধ্যায় – ২ পৃঃ ২৬০)

আলোচ্য কাব্যের কবিতা সংখ্যা চোদ্দ। কবিতাগুলি হল - ১) খাবার আগে ২) কারখানা ৩) ছবিঘর ৪) বাড়ি তুলব ৫) একটি চিঠি ৬) গ্রামবার্তা ৭) মানব-বন্দনা ৮) গোর্কি ৯) স্পেন ১০) দ্বৈরথ ১১) দিন আসবে ১২) স্মৃতি ১৩) রোমান্স ১৪) শেষ কথা। কবি নিকোলোর জীবনের সংগ্রাম নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবনের ত্যাগ স্বীকার কবি সুভাএসর আকর্ষন ও শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। কবি সুভাষ নিকোলোর জীবনের সংগ্রাম, সাধারণের জীবনে অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা, মুক্তির বাসনা, ভালোবাসা, কারখানার দাঁত-খিঁচানো কুকুরের মতো রংচটা জীবন দিন আসবে কাব্যের বিষয়। ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের স্বপ্ন। দম বন্ধ করা অন্ধকার ঘুপ্‌চির বস্তি থেকে রোদ্দুরের মুখ দেখার প্রয়াস এই কাব্যের বিষয়। জীবনের প্রতি ভালোবা এবং অত্যাচার, নির্যাতন, ফ্যাসীবাদী বর্বতার বিরুদ্ধে জীবনকে জয়ী করে পৃথিবীতে মানবতার জয় এই কাব্যের উচ্ছাঙ্গ বিষয় ভাবনার নিদর্শন। নিকোলোর মতো সুভায হলেন — "পৃথিবী যখন তার গা থেকে/ অন্যায়ের ধুলোকাদা/ সব ঝেড়ে ফেলেছে/ যখন নবজন্ম হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের, / ঠিক তখনই মৃত্যুকে বরণ করব/ গানের মতো -" / (একটি চিঠি/ দিন আসবে)।

কবি যাঁদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের কাব্য-কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পাবলো নেরুদা। নেরুদার কবিতা নিয়ে কবি সুভাষের দুটি গ্রন্থ - ১) পাবলো নেরুদার কবিতা গুচ্ছের এবং ২) পাবলো নেরুদার আরো কবিতা। প্রথম গ্রন্থটি একুশটি কবিতার সংকলন এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি আঠারোটি কবিতার সংকলন। পাবলো নেরুদার 'কান্তো হেনেরাল, হোয়াকিম মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে মোট ৩৯টি কবিতা অনুবাদ করেন। তাঁর 'পাঁবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ" গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ সালে। এং সংকলন গ্রন্থটির অন্তর্ভূক্ত কবিতার সংখ্যা একুশ। কবিতাগুলি হল - ১)ভুলতে পারছিলা ২) মিতালি ৩) স্বপ্নের পক্ষিরাজ ৪) একত্ব ৫) রুচি ৬) কাব্যকৃতি ৭)আবার শরৎ ৮) কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি ৯) মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেট ১০) ব্রুসেলস্ ১১) স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন ১২) যারা আবিস্কার করেছিল ১৩) অকর্ষিত অঞ্চল ১৪) আমি

দক্ষিণে ফিরতে চাই ১৫) শীতের বন্দনা ১৬) মাগোলানের হৃদয় ১৭) মহাসমুদ্র ১৮) নতুন পতাকার নিচে পূর্ণমিলন ১৯) মাচু পিকচুর শিখর থেকে ২০) রমণী দেহ ২১) মাটির স্বর্গে।

পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ করেছিলেন তাঁর হাংবাস উপন্যাসটি লেখার ফাঁকে ফাঁকে। এবং গদ্য লেখার একঘেয়েমি কাটাতে কবি এই সময় পাবলো নেরুদার কাব্য-কবিতা আশ্রয় করেছিলেন। কবি সুভাষের পাবলো নেরুদার কবিতাসমলম্বনে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা"। এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতার সংখ্যা আঠারো কবিতাগুলি হল — ১) আর কিছু নয় ২) মৎস্য কন্যা আর একদল মাতালের উপাখ্যান ৩) আমার বিস্তর ৪) বড় বেশি নাম ৫) আমি চাই স্তব্ধতা ৬) ভয় ও পাথরের মুখ ৭) স্মৃতি ৮) হে পৃথিবী দাঁড়াও ৯) প্রাচ্যদেশে ধর্ম ১০) কবিতার ব্যাপার ১১) আস্তেরিও ১৩) টগবগিয়ে দক্ষিণে ১৪) নড়ছি না ১৫) পতাকা ১৬) টমেটোর ওজন ১৭) কুড়ের বাদশা ১৮) পলাতক।

কবি পাবলো নেরুদার যার আসল নাম রিকার্দো নেফ্‌তালি রেয়েজ বোসেয়ালতো চিলি দেশে ১৯০৪ সালে জন্ম। চিলির সীমান্ত শহর তেমুকোয় দশ বছর বয়সে তিনি লেখেন প্রথম কবিতাগুচ্ছ। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তেমুকোতেই ছিলেন। এরপর পড়াশুনা করতে যান সান্তিয়াগোতে। সেখানে তিনি পাবলো নেরুদা ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। তার দ্বিতীয় কবিতার বই 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' প্রকাশ হয় ১৯২৪ সালে। তাঁর উপন্যাস 'নিবাসী ও তার আশা এবং কবিতা সংকলন গ্রন্থ 'অসীম মানুষের, বাজিয়ে দেখা' প্রকাশ হয় ১৯২৬ সালে। ১৯২৭ সালে কূটনৈতিক চাকরিসূত্রে যান বর্মায়। এর পর বর্মা থেকে কলম্ব এবং সেখান থেকে জাভা। এই সময় তাঁর মাতৃ ভাষা স্প্যানিশে ১৯৩৩ সালে প্রকাশ হয় কবিতার বই 'পৃথিবীতে বাসা'। এই সময়কার কবিতায় স্থানপায় বস্তুনিষ্ঠা, নিসর্গপ্রীতি, ইন্দ্রিয়া নুভূতি বেং নির্জনতা। এর পর ১৯৩৪ সালে স্পেনে যান চিলির কন্সাল হয়ে। প্রথমে স্পেনে বার্সিলোনায় এবং তারপর মাদ্রিতে। এই পর্বে তার লেখার পালাবদল ঘটে। এই সময় তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত কবি ফেদোরিকো গার্থিয়া লর্‌কা (১৮৯৯-১৯৩৬) সাহচর্য পান। কবি লরকার অমানবিক হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় কন্সালের পদ হারাতে হয়। তার পালাবদলের কবিতার বই "স্পেনে আমার হৃদয়ে" প্রকাশ হয় ১৯৩৮ সালে। এই গ্রন্থে ছিল চড়াগলার সুর। এরপর ১৯৪০-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি আবার

কন্সাল হিসেবে মেক্সিকোয় যান। ১৯৪৫ সালে তিনি চিলির আইন সভায় যোগ দেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই পর্বে তার খনি মজুর, খেতমজুর, খেটে খাওয়া সাধারণের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট ভিদেলা ইউরোপের বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করায় সাধারণের স্বার্থে আঘাত আনেন। এই ঘটনার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ করায় নেরুদা প্রশাসনের কোপের মুখে পড়েন। বাধ্য হয়ে নেরুদা আত্মগোপন করেন। ১৯৫০ সালে পাবলো নেরুদার ''কান্তো হেনেরাল' শীর্ষক চিলির মহাকব্য রচনা করেন। এরপর কবিতার জগৎ জীবন ও নিসর্গ নিয়ে ১৯৫৪ সালে প্রকাশ পায় তার 'পঞ্চভূতের স্তোত্র'। এই পর্বে কবিতাকে সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার করেন নেরুদা। এর পর ১৯৫২ সালে 'কাপ্তানের কবিতাবলী' এবং ১৯৫৯ সালে সপ্রেমবিষয়ক সনেটশতক' গ্রন্থ প্রকাশ হয়। এর পর ১৯৬৭ সালে। 'ভাটিয়ালী' কাব্যগ্রন্থ এবং ১৯৭০ সালে 'জাজ্বল্যমান তরবারী' গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এর পর চিলির রাষ্টদূত করে তাকে পাঠানো হয়। ১৯৭১ সালে নেরুদা বিখ্যাত নোবেল পুরস্কারের সম্মানিত হত। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি মানবতার জয়গান ও দেশ জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে মর্মঘাতী বান নিক্ষেক্ষেপর কাজ ক্করেন যান। সে সময় সন্ত্রাস, জঙ্গী-তৎপরতা ও নৈরাজ্যের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মহান কবির শব যাত্রাই ছিল সেদিনের চিলির জঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসী প্রথম বিক্ষোভ মিছিল।

নেরুদার জীবন সংগ্রাম ও কবিতাকে ভালোবেসে পদাতিক কবি তাঁর কবিতার অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কর্ম মূলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে না পেরেও দেখতে পাই বিষয় বৈচিত্র্য, ভাবের বহুগামিতা, সংগ্রামী চেতনা, জাগরনী সুর। কবি লেখেন — ''আমি সত্যের সঙ্গে করার করেছিলাম/ দুনিয়ায় আবার এনে দেব রোশনাই।/ আমি হতে চেয়েছিলাম অন্যের মতন।/সংগ্রামে আমি নেই এমন কখনও হয়নি।'' (আর কিছু নয়/ পাবলো নেরুদার আরো কবিতা)। কবি যাঁদের জীবন সংগ্রাম ও রচনাকে ভালোবেসে অণুবাদ করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন — ওলঝাস ওমর- উলি সুলেমেনভ। কবি জন্ম কাজাক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আলমা-আতায় ১৯৩৬ সালে। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে সুলেমান কাজাক রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। পড়া শেষে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে যোগ দেন। কাজা খেয়ে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে

স্থানীয় পত্র পত্রিকায় লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর। এর পর মস্কোতে গিয়ে সাহিত্যের তালিম ও পড়াশোনা একসঙ্গে চলে। তার প্রথম দিকেই কাজাখ জাতির ইতিহাস, মানব জাতির সৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধিৎষা তাঁর কাব্য-কবিতায় পাওয়া যায়। কাজাখরা তুর্কীদের থেকে উদভূত শেষ যাযাবরের জাত। প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের মাঝে তাদের অবস্থান ছিল। তথাকথিত গতানুগতিক ভাবধারা এবং উন্নত আধুনিক সংস্কৃতির মাঝখানে সুলেমেনভের বেড়ে ওঠা।

কবি দেখেছেন তুর্কীদের গোঁড়ামি, বৌদ্ধদের ধ্যানশীলতা, মুসলিমদের নৈব্যাক্তিকতা এবং ইউরোপীয়দের অনুসন্ধিৎষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবল আকাঙ্খা দেখা যায়। রচনার পাশাপাশি দশবছর কবি ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অন্ততয় আগ্রহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন কবি সুলেমেনভের কবিতার দুটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৬১ সালে "আর ঘামাকসার আর পৃথিবী" এবং "মানুষকে প্রণাম" শিরোণামের দুটি কাব্যের কবিতায় মানুষের অতীত ইতিহাস, মানুষের অলিখিত ইতকথা পাওয়া যায়। কবি সুলেমেনভের অন্যতম রচনা হল রাতের নিবাস পারি, সূর্যোদয়ের শুভক্ষণ বাদুরে বছর, মাটির কেতাব ইত্যাদি। কবি সুলেমেনভর কাব্য কবিতার অনুবাদ করেন ৩৪টি। এই কাব্যনাম একটি কবিতার নামেই করেছেন - "রোগা ঈগল" (১৯৭৪)। কবিতাগুলি হল —১) মা ২) কুরগাল জিনো হ্রদে ৩) রাতের বিমানে ৪) পাঞ্জা ৫) বৃষ্টি-এরোপ্লেন থেকে ৬) এক অন্ধ দর্শক ৭) বলো দেখি ৮) প্রচন্ড গরমে ৯) তিন সেলাম ১০) আমি জেগে আছি ১১) মন্ডলাকার নক্ষত্র ১২) রোগা ঈগল ১৩) সুমবুলের তারা ১৪) আহাম্মকের কথা ১৫) আঙুর ক্ষেতে ১৬) আমাদের গ্রামে ছিল এক চর্মকার ১৭) হে মরুভূমি ১৮) ইষ্ট নাম জপি ১৯। মাটির কেতারের দুটি খণ্ডাংশ ২০। উড়াল ২১। কোজাগরী ঃ লায়লাতুল কাদার ২২। ফাঁসির আগে মহম্মদের মোনাজাত ২৩। অগস্টের এইসব রাত ২৪। মরুভূমিতে রাত্রি ২৫। কথাটি ২৬। বিলম্বিত ২৭। বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে ২৮। পদার্থবিদের প্রার্থনা ২৯। হে পর্বতমালা ৩০। যায় আসে ৩১। পদচিহ্ন ৩২। বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে পদ্য ৩৩। রে বিমুর খান, লোহায় তৈরি খঞ্জ ৩৪। নিউইয়র্কে বৃষ্টি। মোট চৌত্রিশটি ছোট-বড় কবিতা নিয়ে রচিত বোগা ঈগল অনুবাদ কাব্যটিকে কবি সুভাষ উৎসর্গ করেছেন মারিয়াম সালগানিক-কে।

কাব্যটির প্রথম কবিতাতেই আমরা দেখি একজন মা তার সন্তানকে শৈশবে কোনো ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে, কিংবা বাঁচার কি উপায় সেসব আগলিয়ে মানুষ করার মন্ত্র দিচ্ছেন না। একটি শিশুকে দৈহিক বিকাশে মুখে ভরে ওঠা স্তন গুজে দেন কেবল। মানুষ হয়ে দুনিয়ায় নিজের স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করার ব্রত শৈশবে সন্তানের মধ্যে নিহিত করেন সংগ্রামী মা। তার সন্তানকে শৈশব থেকে লড়াইয়ে দিক্ষিত করে তোলে। একজন সত্যিকার মানুষ গড়ে তুলতে চান মা। মানুষ, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, স্বদেশ, প্রেম, লড়াই এই কবিতাগুলির আলোচ্য বিষয়। কবি সুলেমেন ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় উভয়ই জীবন ভাবনায় সত্যিকার মানব সমাজের কারিগর করে নিজে ভাবিয়ে ছিলেন। সেই জীবন ভাবনায় বাঁচার জন্য লড়াই, আবার অন্যায়, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নিঃসহায়কে তীর্যক ব্যঙ্গ ও শ্লেষে আঘাত করেছেন কবি সুভাষ। এই অনুবাদ কাব্যের দ্বিতীয় কবিতায় 'করুগালজিনো হ্রদে' এক ঝাঁক রাজহাঁস আফ্রিকার লাল সূর্যের জন্য জোটবদ্ধভাবে উড়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু শাসক শক্তি গুলি করে মারে। এই নারকীয় হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কবি সুভাষ হাঁসের রূপকে মানুষের লড়াই ও সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু জীবনের অমোঘ নিয়ম। কবি তাই জীবনের পর-পারে যাবার আগে এই ইহ-জীবনের মানুষের জন্যে কিছু করার আহ্বান জানান —"আফ্রিকার আর এশিয়ার সমস্ত গোরস্থানেই তুমি রয়েছো

কবরে কবরে মানুষের হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ।
তোমরা, যারা বেঁচে আছো,
অবমানিতদের দয়ার্দ্র হৃদয়ের কথা।
প্রমাণ ক'রে দেখাও।" (পাঞ্জা / রোগা ঈগল)

এই পৃথিবী, বৃষ্টি, সমুদ্র, মৃত্তিকার সত্তার সঙ্গে কবি নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁর উপলব্ধি দিয়ে। তিনি তাঁর সৃষ্টির সাহায্যে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যতের পৃথিবীকে আরো মহান, আরো সৌন্দর্যময়ী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। যতদিন তাঁকে পৃথিবীর প্রয়োজন ততদিন সে কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন। তাঁর জীবনের দর্শন ও সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন —"হে অতীতের কবি সকল, / আমার মনে পড়ছে না তোমাদের, / কিন্তু এক প্রাচীন তরবারির গায়ে / কিংবা কালের কলঙ্ক-পড়া এক

সুরাইয়ের / নিপুন গ্রীবায় / এক ব্রহ্মস্বাদ সহোদর মিল এনে দেবার জন্যে / শহর আর গ্রাম আমি তোলপাড় করব।" (তিন সেলাম / রোগা ঈগল)

আলোচ্য কাব্যের নাম-কবিতায় কবি শিকারী ঈগলের দৃষ্টিতে এই জীব-জগতের সব কিছুতেই নিজেকে দেখেন নিজের মতো। কিন্তু বিবেচক, বিজ্ঞান মনস্ক, সচেতন শিক্ষা তাঁর ভাবনাকে বিচার করতে পারে। কবি কবি একটি শিকারী পাখির ভাবনা ও শোষনহীন, অত্যাচারহীন, সৌন্দর্যময়ী জগতের কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি লেখেন —"ঈগল কখনও জন্মেও নিজের ছায়া দেখতে পায়নি

তার শিকার দেখতে পায় তার অগ্নিময় ছায়া।

ঈগলের যে কায়া সেই তার ছায়া,

আর সে নিজেই হল ছায়ার অপচ্ছায়া।"(রোগা ঈগল/রোগা ঈগল)

কবি সুলেমেনভ্ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিহিত করেছিলেন। কখনো পাহাড়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, কখনো পাখির মতো উড়ে বেড়ানো, কখনো বা জেলে বন্দী মানুষের ভাবনা, কখনো মৃত্যুর আগে ফাঁসির আসামীর ভাবনাকে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন কবি। কবির 'রোগা ঈগলের' চৌত্রিশটি কবিতার মধ্যে আমরা 'বৃষ্টি – এরাপ্লেন থেকে আঙুর ক্ষেতে, সুম্বুলের তারা, প্রচণ্ড গরমে – নাতি-দীর্ঘ কবিতাগুলির পাশাপাশি দেখি 'মাটির কেতাবের দুটি খণ্ডাংশ, 'ফাঁসির আগে মহম্মদের মোনাজাত', 'বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে', পদার্থবিদের প্রার্থনা, 'রে তিমুর খান', 'লোহায় তৈরী খঞ্জ', শীর্ষক অতিদীর্ঘ কবিতাগুলির সুসামঞ্জস্য সহাবস্থান। মূলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ব্যতিরেকে আমরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে জীবন জগৎ সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখতে পাই 'রোগা ঈগল' কাব্যে। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় এগুলি মূল্যবান সম্পদ।

কবির অন্যতম অনুবাদ কাব্য হল 'হাফিজের কবিতা'। কবি যাঁদের কবিতা ও লেখা ভালোবেসে অন্যভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি হাফিজ। যাঁদের ব্যক্তিজীবন ও রচনা উভয়ই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আকৃষ্ট করেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পারস্যের কবি হাফিজ। আনুমানিক ছয়শো বছর আগে পারস্যের সিরাজ শহরে কবি হাফিজের জন্ম হয়। আর্থিক

সংকটের মধ্যে, অর্থাভাবে পুঁথি নকল করে তাঁকে দিনযাপনও করতে হয়েছিল। কবি হাফিজ সংকটময় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুনোখুনি, কাটাকাটি, হানাহানি, মারামারির রাজত্বকালে হাফিজের বেড়ে ওঠা। তাঁর প্রত্যক্ষগোচরে কেবল নৈরাজ্য আর রাষ্ট্রদ্রোহ। এই সংকটেরকালে কবি গজল ও কবিতার মধ্যে সুর বেঁধে ছিলেন সত্য, সততা ও ঐক্যের জয়গান। তাঁর গজল ও কবিতায় ক্ষমতাবান রাষ্ট্রনেতার প্রতি অকারণ স্তুতি বা অতিশয়োক্তি দেখা যায় না। আবাার ভালো কাজের জন্য প্রশংসার সমান চোখে দেখেছিলেন রাজা, উজির বা ফকিরকে। সংঘাত, খুনোখুনি রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। কিন্তু ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী বা ভণ্ড সুফীদের মিথ্যাচারিতা ও কপটতার ছিলেন বিরোধী। দর্শনে তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব, মসজিদ বা মঠ, ধর্মীয় আচার বিচারের তোয়াক্কা করেন নি। তাঁর রচনার প্রথম পর্বে দেখাযায় দার্শনিক তত্ত্বের অভাব। বস্তু সেকালের রচনায় কেবলই বস্তু থেকেছে; তেমন কোনো কিছুর অর্থবাহী প্রতীক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শেষপর্বের কবিতা ও গজলে এসেছিল অতল গভীরতা। শেষদিকের রচনায় কম কথায় অধিক প্রকাশ, সহজের মধ্যে অধিক গভীরতা এসেছিল। তার রচনারীতিতে লক্ষণীয় ছিল শব্দের অর্থের দ্ব্যর্থকতা, অনুপ্রাস, উপমা ও রূপকের ব্যবহার। সেকালে তাঁর পার্সি ও ফরাসীতে রচিত কবিতায় ভারত ও বাংলার উল্লেখ আমরা পাই — 'দূর ভারতের শর্করাপ্রিয় তোতা পাখি' রূপসী বাংলায় আনা পারসী মিঠাই' ইত্যাদি। তাঁর রচনা প্রথম ছাপা হয় ১৭৯১ সালে কলকাতায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পারস্যের কবি হাফিজের পঞ্চাশটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। একমাত্র হাফিজের কবিতার মূল থেকে কবি সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। একাজে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করেছিলেন রাজস্থানী ব্যবসায়ী রেওতীলাল শাহ। ইলেকট্রনিক্স-এর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার ডিগ্রি এই রেওতী লাল শাহ ছিলেন উর্দু ও ফার্সীতে সমান দক্ষ। তাঁর সহযোগিতা ও নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫০টি কবিতা মূলের অনুগত নিজের দেওয়া পঞ্চাশটি শীর্ষ নামে প্রকাশ করেন। সেই কবিতাগুলি ক্রমানুসারে হল — প্রেম সহজ না, কোথায়, স্বর্গে যা নেই, সুবাতাস, এ বসন্তে, কর্মলোক, গভীর নিশীথে, দুই-দুয়ারী, নাম আছে তাই, পোহালে রজনী, পবনবাহন, নিজেরই মধ্যে, হে দিশারী, আতস, এখনও হৃদয়, দাও, যাবাার আগে, মদ পুজো, জানতেও পারে, ঢের ভালো হত, ভেতরে

করুণা, জ্যোতিশ্চক্রে, আত্মা যেখানে, যা পেয়েছি, সাদা আর কালো, যুগলবন্দী, বাংলায়, ফুটলে গোলাপ, সুখের সময়, শিরাজ, নামরূপ থেকে প্রপঞ্চরূপে, শরাবখানায়, ফুল ব'লে দেয়, আশা ভরসা, মনে কি পড়ে, সুসমাচার, ধৈর্য, কেবল ধৈর্য, মার্জনা ক'রো, আজব, প্রেমের ভাষা, আপ্তগরজী, মাতাল, জীবনের ধাঁধাঁ, কুসুমের মাস, বাউল হরিণ, জানতে চেয়ো না, অতুলনীয়, এনে দাও, স্বাগতম্ , স্বর্গত হাফিজের সঙ্গে স্বগত আলাপ।

কবি সুভাষের এই পঞ্চাশটি কবিতা নিয়ে রচিত 'হাফিজের কবিতা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন আবু সয়ীদ আইয়ুব'কে। গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, ৪৫বেনিয়াটোলা লেন থেকে প্রকাশিত। বাংলা সাহিত্যে হাফিজের কবিতা অনুবাদে ঐতিহ্য আছে। হাফিজের অনুবাদ অনেকেই করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কাজী নজরুলের 'রুবায়াৎ-ই-হাফিজ'। এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ কবি নজরুল স্বয়ং লেখেন — 'হাফিজকে আমরা কাব্য-রস-পিপাসুর দল — কবি বলেই সম্মান করি, কবি রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুখী দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খাইয়ামের দর্শন প্রায় এক। এঁরা হলেন আনন্দ বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা এই জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শরাব সাকী নিয়ে দিন কাটাতেন, এত মিথ্যা নয়। তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমময় আনন্দের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।'

আলোচ্য 'হাফিজের কবিতা' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রেম সহজ না' শীর্ষক কবিতার প্রথম স্তবকে আমরা দেখি 'এসো সাকি, এসো, রেখো না বসিয়ে / হাতে হাতে দাও ভর্তি পেয়ালা; / আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ, / আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা।' (প্রেম সহজ না / হাফিজের কবিতা)

মদ্য পানের বাহ্যিক ছবির রূপকে নিহিত সুফী ধর্মভাবনার গভীর অর্থ। যখন কবি লেখেন — 'বুড়ো মাজি বলে, নমাজ পড়ার / আসনে ছুটুক মদের ফোয়ারা;' ইংরেজি ম্যাজি / ম্যাজিক অর্থে, পুরনো

ফার্সীতে 'মগুস' ইরানীতে 'মগু' যার অর্থ যাজক সম্প্রদায়। আবার আলোচ্য কবিতার তৃতীয় স্তবকে কবি যখন লেখেন 'প্রাণ বধূয়ার পান্থশালায় / এ সুখশান্তি ক'দিনের বলো।' তখন মহৎ জীবন দর্শন মদ্যপানের রূপকে সহজেই উপলব্ধ হয়। ভেকধারী মঠমন্দির-মসজিদ-গীর্জার ভণ্ডামীকে কবি ধিক্কার জানিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। হাফিজের কবিতা গ্রন্থে আমরা দেখি মহৎ জীবন দর্শন। জীবনভাবনা ও মৃত্যু ভাবনার মাঝে অহেতুক রক্তপাত খুনোখুনির পরিবর্তে জীবে প্রেম ভাবনার মহৎ দর্শন। আমরা পাই সাহিত্যে সংযম ও সৎকর্মে নিজেকে যুক্ত করার আহ্বান। কবির ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ পাই আলোচ্য গ্রন্থে। কবি পাঠকের উদ্দেশ্যে 'এ বসন্তে' কবিতায় লেখেন ঈশ্বরে মতি রয়েছে যাদের / তাদের সঙ্গে তুমি ভাব রাখো;'। এই কবিতায় কবি পাঠককে বলেন 'জেনো, মুক্তি নিজবাসভূমি, / একা এককোণে শান্তির ঠাঁই'।

হাফিজের কবিতায় বাগানের গোলাপ, শরাবখানার মদ্যপান, উত্তুরে আর পুবের হাওয়া, সুরা প্রেমিক, শ্রেয়সী, বধূয়া, প্রেম, রাঙা সুরা ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশ গভীর ভাবনা রূপকের অর্থে কাব্যে প্রয়োগ করেছেন কবি। জীবনের যাবতীয় দুঃখ জয় করে সুখ বিলাসে জীবন ভাবনার কথা বলেন কবি। আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থে আনন্দ ভাবনার মহৎ দর্শন কাব্যটির ঐতিহ্য বর্ধন করে। জীবনে শান্তি, সুখ ও প্রেমভাবনা প্রকাশে এ কাব্যের মহৎ আদর্শ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। সেইসব পুরনো বাংলাকে সমকালের বাংলায় অনুবাদ করতে আগ্রহী, হয়েছিলেন 'চর্যাপদ'-এর প্রতি। তাঁর চর্যাপদ অনুবাদ প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৮৬ সালে। কবি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর স্নেহের জয়শ্রী – নুবুকে। গ্রন্থটি চর্যাগীতির মূল পদ সংবলিত। এই গ্রন্থ অনুবাদে কবি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, মহম্মদ শহীদুল্লা, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমুখ এঁদের প্রত্যেকের ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কবি চর্যাপদ অনুবাদ প্রসঙ্গে স্বয়ং বলেন 'কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র শুধুই একজনকে আমি অনুসরণ করিনি। যেখানে যাঁকে মনে ধরেছে তাঁর সঙ্গ নিয়েছি। কোথাও নিজেই দিয়েছি অন্ধকূপে ঝাঁপ। সুমঙ্গল বণিকের চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা হঠাৎ হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বই থেকেই

আমি রসদ পেয়েছি সবচেয়ে বেশি।' কবি এই চর্যাগীতি অনুবাদের তাগিদের কথায় গ্রন্থের মুখবন্ধের আকারে 'তর্জমার পেছনে' শীর্ষক অংশে উল্লেখ করেন 'প্রাচীন সাহিত্য' পত্রিকার চাহিদার অতিরিক্ত তাঁর হাজার বছর পূর্বের বাংলাকে নতুন রূপ দেবার আগ্রহের বিষয়টি। এছাড়া তাঁর সবথেকে বেশি আগ্রহ চর্যার কালের সাধারণের জীবনের ছবি আঁকার প্রতি ছিল। তিনি চর্যার নবরূপ দানের ক্ষেত্রে চর্যার প্রতি বাংলা ভাষার দাবি কিংবা চর্যার নিগূঢ় বৌদ্ধ ধর্মভাবনাকে খুঁচিয়ে ব্যাখ্যার তাগিদ উপলব্ধি করেন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা — 'প্রায় হাজার বছর আগের ভাষাকে আজকের মুখের কথায় ঢেলে সাজাতে গিয়ে আমাকে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ছায়ার মতন পায়ে পায়ে চলতে। নিহিতার্থ বা পরমার্থের পথ বড় একটা মাড়াইনি। প্রতিভাসিকের গতিতেই নিজেকে বেঁধেছি। চর্যার গানে সে জীবনচিত্র, তা থেকে আজও আমরা খুব দূরে নেই।' মূল চর্যার অনুসরণে কবি আটপৌরে শব্দে, অন্ত্যমিল রেখে সাধারণের হৃদয়স্পর্শী করার যথাসাধ্য প্রয়াস রেখেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কর্মে বাঙালী সাধারণের প্রাচীন জীবনচিত্রের প্রতি নিখাদ মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কবি প্রাচীন বাংলাকে আধুনিক বাংলার উপযোগী করে তুলেছিলেন। কবি সাধারণের মুখের ভাষাকে প্রাচীন নবরূপ ঢেলে সাজিয়েছেন। চর্যার আদিকবি লুইপাদের প্রথম গানটি কবি সুভাষের সঙ্গে পাশাপাশি তুলনায় বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। লুইপাদ লিখেছেন —

'কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভইই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।
সঅল স(মা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।।
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করপক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস।।

ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।
ধমন চমণ বেণি পাণ্ডি বই ঠা।।

কবি সুভাষের অনুবাদের ভাষায় —

'শরীর বৃক্ষে পাঁচখানি ডাল
মন চঞ্চল, ঢুকে আছে কাল।
পাও যাতে মহাসুখ ঠিক বুঝে
লুই বলে, নাও সদ্ গুরু খুঁজে
সুখ দুঃখের সংসারে যবে
মৃত্যুই ধ্রুব, সমাধি কী হবে?
কপাটে ছন্দ বন্ধ মুয়ে
থাক শূন্যের পাখা পাশ ছুঁয়ে।
লুই বলে, ধ্যানে পাই দর্শন
পেতে দুই পিঁড়ি ধমন চমন।।'

এই পদটির অনুবাদে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চর্যাকার লুইপাদের ভাব ও বিষয় অক্ষুণ্ন রেখে যতি চিহ্ন নিজের মতো প্রয়োগ করেছেন। শব্দ চয়নে কবি আধুনিক ভাষাকে বেছে নিয়েছেন। চরণান্তিক অন্ত্যমিল বজায় থাকলেও কবি নিজের মতো করে শব্দ প্রয়োগ করেছেন। একই ভাব হাজার বছর পরের কালের ভাষায় নিজস্ব আঙ্গিকে প্রকাশ করার মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিকত্বের পরিচয় আমরা পাই। কবি মূলপাঠের ক্ষেত্রে কোন একজনকে অনুসরণ করেন নি। তাঁর পাঠের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৃতীয় সংস্করণের চতুর্থ মুদ্রণের ভিন্নতা আমাদের চোখে পড়ে। যেখানে প্রথম চর্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠের লেঙ্গ, ঝাণে, পিণ্ডি কবি সুভাষের — মূল পদে হয়েছে লাহু, সাণে ও পাণ্ডি। দ্বিতীয় পদটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠের তেন্তলি, চৌরে, সমীইড় কবি সুভাষের মূল পাঠে হয়েছে তেন্তলী, সমাইড় ও সান্ধে। এরকম প্রত্যেক পদে মূল পাঠের ভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি। এ থেকে অনুমান করা যায় কবি সুভাষ একাধিক মূলপাঠ অনুসরণ করেছিলেন। কোথাও কোথাও কবি তার চরণ বিন্যাসে নিজের মতো

করে সাজিয়েছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা দেখা যায় এগারোটি চর্যায় যথাক্রমে — ডোম্বীপাদের চর্যা (১৪), শান্তিপাদের চর্যা (১৫), মহীধরপাদের চর্যা (১৬), ভুসুকপাদের চর্যা (২৩), ঢেনঢণপাদের চর্যা (৩৩), দারিকপাদের চর্যা (৩৪), তাড়কপাদের চর্যা (৩৭), সরহপাদের চর্যা (৩৯), ভুসুকপাদের চর্যা (৪১), ভুসুকপাদের চর্যা (৪৩), এবং শবরপাদের চর্যা (৫০)।

কবি সুভাষের হাজার বছর পূর্বের পঞ্চাশটি চর্যার গভীর নিগূঢ় তাত্ত্বি সমালোচনা আলোচনার বাইরে সেকালের সাধারণের সহজ সরল, স্বাভাবিক জীবনচর্যা অধিক আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেকালের যৌথ সমাজে শ্বশুর-শাশুড়ি-বউ-ননদ-শালী সম্পর্কের মানুষ জন, সোলের ডোম-চাঁড়াল, শবর-শুড়ি, জেলে-মালো, চাষী-কাপালিক, বার্জকর-ব্যাধ বিদ্বান পণ্ডিত মানুষের আমোদ প্রমোদ-বিয়ে বাড়ি নাটক গীতি, সুধীখানা, নাচগান, নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঙালী জীবনের সামাজিক ছবি কবি সুভাষের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর অনুবাদ কাব্যের মুখবন্ধে কবি তাই লেখেন — 'চর্যাগানের মধুর বোলে ফুটে ওঠা এ আমার আবাল্যের নদীমাতৃক চেনা জগৎ।' সেকালের চর্যার পদকর্তাদের সম্পর্কে কবি সুভাষের স্বীকারোক্তি চর্যার পদকর্তারা যে সাধকগোষ্ঠী হোন বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক, সহজখানী বা বজ্রখানী - ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে গিয়ে জীবনকে যে রঙেরসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই। জোর দিয়েই একথা বলা যায়, জন্ম যে কুলেই হোক - তাঁরা ছিলেন সোলের খেটে-খাওয়া ইতরজনের কাজের মানুষ।' (চর্যাপদ, তর্জমার পেছনে - সু. মুখোপাধ্যায়)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ কাব্যের ধারায় 'অমরুশতক' মূল্যবান প্রয়াস। কাব্যগুণের অধিক এই অনুবাদ কাব্যের মহৎ উদ্দেশ্য সুপ্রাচীন কালের অতিক্রান্ত জীবনকে ফিরে পাওয়া ও ফিরে দেখা। এ সম্পর্কে এই অনুবাদ কাব্যের সূচনায় 'অনুবাদকের কথা' অংশে কবি স্বয়ং বলেন - 'অমরু শতক'কে যদি গাথাসপ্তশতীর সমসাময়িক ব'লে ধরা যায়, তাহলে তো এতে মেলে হাজার দুই বছর আগেকার অতিক্রান্ত জীবন। তবু মনে হয়, মানুষের মন যেন আজও তেমনিই থেকে গেছে। জীবননিষ্ঠ ব'লেই বোধহয় অমরুর এই কবিতাশতক আমাদের হৃদয়ে এত নাড়া দেবার ক্ষমতা রাখে। .... কবি অমরু কে ছিলেন, তিনি রচয়িতা না সংকলন - এসব নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে অমরু যেই হোন

কিংবা এসব শ্লোক যিনি বা যাঁরাই রচনা ক'রে থাকুন – তিনি বা তাঁরা যে অসাধারণ কবি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় – কবিতা সংগ্রহ -৪, প্রথম প্রকাশ, দে'জ্ প্রকাশনী পৃঃ - ২৬৭) 'এই কাব্যের কবিতা সংখ্যা ১০০। এই একশটি কবিতায় কবি সংযোজন করেছেন প্রত্যেকটির শীর্ষনাম। এই কাব্যের রস সম্পর্কে সমালোচকগণ নিছক শৃঙ্গাররস মেনে নিলেও কবি সেই মতের বিরোধিতা করেছেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম কবিতার নাম দিয়েছেন 'শ্রীদুর্গা সহায়'। এই কবিতায় কবি শ্রীদুর্গা দেবীকে সকল দুর্গতি নাশ করে সমস্ত রক্ষার ভার অর্পণ করেন। মূল সংস্কৃত ভাষাকে কবি বাংলায় নিজের মতো করে আধুনিক রূপে সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে নিজের অক্ষমতা স্বীকার ও ত্রুটি মার্জনা করার আহ্বান জানিয়েছেন অনুবাদক। এই অনুবাদ কাব্যে ভাবের বৈচিত্র্য, ভাষার দখল এবং মৌলিক আঙ্গিকে বেঁধেছেন — একশটি কবিতা। এই অনুবাদ কাব্যে আমরা দেখি কবির ঈশ্বরভাবনা ও অনুগত প্রার্থনা — 'সূর্যরশ্মি মুখ দেখে নখদর্পণে যাঁর,

ফুল কানে ভেবে লুব্ধ ভ্রমরা
যাঁর কটাক্ষ,
সেই মা-দুর্গা গ্রহণ করেন যেন রক্ষার ভার।।' (শ্রীদুর্গা সহায় / অমরু শতক) আলোচ্য কাব্যে আমরা দেখি কবির প্রেমভাবনা —

'ঢলো ঢলো প্রেম, ঢুলু ঢুলু আঁখি
একবার চেয়ে, পরক্ষণেই
লজ্জায় মুখ চকিতে ফেরাতে রোজ দেখি তোকে,' (সখী বলে / অমরু শতক)

আলোচ্য কাব্যের সিংহভাগ কবিতা বিরহিনী প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদন, মান-মন-দেহ-উজার করে অর্পণ করার আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই বর্ণনায় অনেক সময় দেখা দিয়েছে শৃঙ্গার বা আদিরস। কবি সেই মিলন ভাবনাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে আদিরসকে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আলোচ্য কাব্যে কবির সৌন্দর্যচেতনা, প্রেম-ভাবনা ও ভাষার দখলের পরিচয় আমরা পাই।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ কাব্যের ধারায় আমরা দেখি মূলের ভাবানুবাদের প্রতি ঝোঁক। কবি অক্ষরানুবাদ যথাসম্ভব বর্জন করেছিলেন। সেগুলিতে কবির কাছে প্রাধান্য পেয়েছে মূল কাব্যের

কবিগণের মহৎ জীবন দর্শন, ব্যক্তি জীবনের সংগ্রাম ও সংগ্রামী রচনা। কবি নিষ্ঠা ও প্রত্যয় সহ বাংলা অনুবাদ কাব্যের ধারাকে পুষ্টি জুগিয়ে ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কবির বিভিন্ন ভাষাকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য "একবার বিদায় দে মা"। এই কাব্যটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ সালে। কাব্যটি কবি উৎসর্গ করেন প্রবাদপ্রতীম কবি জয় গোস্বামী ও তাঁর স্নেহের কাবেরী মহাশয়াকে। কাব্যটির অর্ন্তভুক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হল — 'একবার বিদায় দে মা', 'মোট বারো', 'রাম নাম সত্ হ্যায়', 'আপ-ডাউন', 'ছাপাই ছবি', 'যা-অন্ধকার', 'কথা রাখো', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হাওয়াই চটি', 'জোড় কলম', 'তোবা', 'অন্ত্যাক্ষরী' চোদ্দশো সাল', 'আশমান-জমিন', 'জানীরমণ', 'বেলা যে যায়', 'ভর সন্ধে', 'ফুসমন্তর', 'জানি না', 'পরবের দিন', 'তালবেতাল', 'দূরদর্শী', 'এত্ত এক রকমের খেলা', 'কানামাছি', 'কথা রাখো', 'হাওয়াই চটি', 'দিন গেলে', 'দেখি কী হয়', 'হাত বাড়িয়ে', 'হাঁ করে', 'তাল গাছ', 'মাথামুন্ডু', 'ইষ্টিকুটুম', 'একার টি খোঁজ নে', 'দেয়ালের লিখন', 'তাল কানার গান', 'সাহস', 'মানুষ যা কিছু ব্যানায়' ইত্যাদি। এই সব কবিতার মধ্যে নিহিত রয়েছে কবির বিশিষ্ট চেতনা ও নির্দিষ্ট জীবন দর্শন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-প্রবাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ছড়ানো ঘুঁটি'। কাব্যটি উৎসর্গ করেন তাঁর পরম স্নেহের প্রতিমা দেবী এবং কবি শঙ্খ ঘোষ-কে। এই কাব্যটির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি হল - 'ছড়ানো', 'পরম্পরা', 'পালাবদল', 'অরণ্যে রোদন', 'আমার নিশানায়', 'সম্ভবামি', 'বারোটা বাজার পর্বে', 'যদি পাওয়া যায়, 'কানামাছি, 'বলছিলাম কী', 'কেডা রে, 'যদি বলি', 'তেরো স্পর্শ, 'মুখনাড়া', 'কালাকানুন', 'কুমার সম্ভব', 'ছড়ানো ঘুঁটি', 'মৃদঙ্গ', 'যাও পাখি', 'তুমি তো কাঁদোনা', 'পুনশ্চ', 'সই পাতানো', 'পথের পাঁচালী', 'পেছনে ডাক শুনে', 'এক পা বাড়িয়ে', 'প্রলয়ের আগে', 'ধরা ছোঁয়ার বাইরে', 'মুদ্রাদোষ', 'কেমন লাগে', 'পাকা কথা', 'মোহরের ছিপছাপ', 'সুখের যখন অসুখ', 'এর পরের পিঠে', 'দিব্যি আছি', 'চুপ হাওয়া', 'আজ নয়', 'আলগোছ', সময় এলে', 'ট্রেন লেট করেছে', 'রসো হে', 'উঠ কিস্তি' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে কবি সুভাষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা পাই।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য প্রবাহের একটি বৈচিত্র্য-পূর্ণ রচনা হল তাঁর অসংখ্য ছড়া সৃষ্টি। তাঁর ছড়াগুলি একদল নিপুণ ও দক্ষ শিল্পীর নিদর্শণ বহন করে। এগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। আমরা তাঁর প্রচলিত কাব্যগুলিতে ছড়া সৃষ্টির শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাই। তাঁর শুদ্ধ ছড়ার গ্রন্থ বলতে পাই 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো' (১৯৮০), 'সাত সালের ছড়া' (২০০০), 'বক্‌বক্‌ম' (২০০০) ও 'হরেকরকমবা' (২০০২) এছাড়াও শিল্পগুণে এবং জাতের বিচারে অসংখ্য ছড়ার পরিচয় পাই – 'চিরকুট' (১৯৫০), 'ফুলফুটুক' (১৯৫৭), 'কালমধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে, ভাই'; 'জল সইতে', 'বাঘ ডেকোছিল' (১৯৮৫), 'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল' (১৯৯১) ও 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫) কাব্য গ্রন্থের একাধিক কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর ছড়া সৃষ্টির শিল্প নৈপুণ্যের উৎকর্ষ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাই আমরা। তাঁর ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও দিলীপ কুমার গুপ্তের সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সারস্বত প্রকাশ' — এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' শীর্ষক রচনায় হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লেখেন — "তাঁর দুই যুগের রচনাতেই আরেকটি প্রকরণের অনায়াস ও ব্যক্তিত্বমন্ডিত নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে — সেটি ছড়া। লৌকিক ছড়ার চালে প্রযুক্ত তাঁর আপাত হালকা রাজনৈতিক ছড়াগুলি অনুভূতির তীব্রতা, বিশ্বাসের গভীরতা, প্রচন্ড ও অন্তরঙ্গ উত্তাপ এই আপাত ছোটদের ছড়াগুলোকে বয়স্ক পাঠকেরও মনোমুগ্ধকর ক'রে তোলে। অন্নদাশঙ্করের ছড়ার চেয়েও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর ছড়ার ভঙ্গিটী যুগপৎ লৌকিক ও শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও অনুভূতিময়, কৌতুকে - ভরা পরিচ্ছন্ন, অনয়াস ও সংযুক্ত।" (সারস্বত প্রকাশ - ১ম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়ার গ্রন্থ 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো-ছিটানো' ১৯৮০ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ৬৪টি ছড়া অন্তর্ভুর্ক্ত। কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রকাশকের প্রথম প্রচ্ছদ — বিবৃতিতে আমরা পাই — "গত চার দশক ধরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় — কখনো বিষয়ে, কখনো প্রকরণে। এবার

তিনি হাত বাড়িয়েছেন ছড়ার রাজ্যে। এবং প্রথম আবির্ভাবেই এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন। 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো' বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংযোজন হয়ে থাকবে; কেননা, ছড়ার রাজ্যে নতুন এক ভূখন্ড যুক্ত করলেন তিনি। প্রাচীন প্রবাদের মতো অমোঘ ও স্মরণীয়, সংহত ও মিলদার, টাটকা ও সাম্প্রতিক এই-সব ছড়া একবার পড়লেই বুকে গেঁথে যায়। পঠনে দারুণ মজা করেছেন তিনি। দৈনন্দিন জীবন থেকে সমধর্মী কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন, আর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন জুতসই একেকটি পংক্তি।" (মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো, প্রথম প্রচ্ছদ, ১৯৮০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড, কলকাতা)

ছড়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমধিক জ্ঞান ছিল। তিনি ছড়ার রাজ্যে নিজেকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্যে রূপ, রঙ ও রসে তাঁর দখল ছিল। ছড়া একটি বিশেষ শিল্প মাধ্যম। এই সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন — "ভাবের দিক দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুলর্ক্ষ্য ইঙ্গিতমাত্র আছে; রূপের ভিতর দিক দিয়া ইহার অপরিণতি ইহার রসগ্রাহীকে আঘাত করে না। কারণ, ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা হৃদয় বড়, অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয় সৃষ্টি তাহারা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না।" (বাংলার লোক-সাহিত্য পৃঃ ১৩১) রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধে লিখেছেন — "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা-বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।" ছড়ার অন্তঃ প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লেখেন — "ছড়ার কোন বিশিষ্ট একটি ভাবের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ভাবই ইহাতে নাই, যদি থাকে তবে তাহাও অসংলগ্নভাবে প্রকাশ পায়। গীতিকায় একটি আনুপূর্বিক কাহিনী থাকে। তাহা চিত্র বলিতে পারা যায়। কিন্তু সেই চিত্রও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, একই চিত্রপটের উপর

যেন খেয়ালী শিশু ইহাতে বিভিন্ন চিত্রের রেখা কাটিয়া রাখে; কিন্তু রেখাগুলি স্পষ্ট ও বর্ণোজ্জ্বল" (বাংলার লোক-সাহিত্য)।

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে মনে করেন — ছড়াগুলি হল সেইসব ভাবের উপযুক্ত যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রে মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে চলার চিহ্ন ধূলোর উপর পড়ে আর লোপ পায়।কবি সুভাষ "মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো" গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে 'মিউ' প্রসঙ্গে "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায় তপন গোস্বামী তাঁর 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন — "সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিড়াল ভালোবাসতেন খুবই, বিড়াল পুষতেনও তিনি। সেই রকমই একটি পুষির নাম মিউ। সেই মিউ এর জন্যে ছড়া লিখেছেন এ-বইয়ে, একটা আধটা নয়, সবগুলো। তথ্যগত দিক থেকে কবির কুকুর-বেড়াল-পশু পাখি প্রীতির কথা সকলেরই জানা কিন্তু 'মিউ' তাঁর কোনো পুষ্যির নাম নয়। 'মিউ'-তাঁর আদরের নাতনি, তাঁর জ্যেষ্ঠা পালিতা কন্যা পুপের বড়ো মেয়ে।" (দিবারাত্রির কাব্য/ দ্বাদশ বর্ষ/ ১ম-২য় সংখ্যা/ জুন ২০০৪)।

প্রচলিত ছড়ার ধারায় মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধে। তিনি সেখানে 'মিউ'-এর জন্যে লিখেছেন — "ছড়া পড়তে একটি চরণের পিঠোপিঠি — পরবর্তী চরণ সম্পর্কে আমাদের মনে এক ধরনের প্রত্যাশা জেগে ওঠে, এখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে আঘাত করা হয়েছে, আমাদের অনুমান, ভাবালুতার জায়গায় বাস্তববোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য। এটা কেবল দু একটা ছড়ার ক্ষেত্রে নয়, সবগুলো ছড়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে খুব স্বাভাবিক ভাবে যে তা করা হয়েছে এমন নয়, যেন থাপ্পড় মেরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে ছড়া নামে এক ধরনের ছন্দচটুল তারল্যের মোহে আমরা এতদিন মজে ছিলাম যে, চিন্তাহীন কল্পজগতে এতটাই ডুবে ছিলাম যে, একটু জোরে ধাক্কা দেবার দরকার ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ বইয়ে সেটাই করেছেন।" আলোচ্য গ্রন্থে আছে মোট ৬৪টি ছড়া। এই ছড়াগুলো সম্পর্কে 'পরিচয়' পত্রিকায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ একটি প্রবন্ধে যথার্থই লেখেন — .... ৬৪টা এ রকম হিরের টুকরো দিয়ে ঝলমল ক'রে ওঠা এই বই কিন্তু

শুধু ছন্দমিলের খোসখেয়ালেই কথা সাজায়নি, কথার মধ্যে দিয়েই ছুঁয়ে গেছে জীবন, তার দৈনন্দিন, প্রাণের কত হেলদোল, পথের যত তালগোল, আবিস্কার ও উন্মোচন, ভালোবাসার মতমাতন।

এই ছড়ার গ্রন্থের সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত প্রথম আটটি (১-৮) ছড়ায় পাই বিভিন্ন খাবারের কথা। সাধারণভাবে বাঙালী ভোজন রসিক। দিনের বিভিন্ন সময়ে খাবারের প্রকৃতি ভিন্ন থাকে। এমন কি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্বাদের খাবার পছন্দ করেন বাঙালী বাবুরা। এই বিভিন্ন খাবারের রকমারী জ্ঞানের পরিচয় পাই কবি সুভাষের ছড়াগুলিতে। কবি আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখিত সংখ্যার ছড়ায় বৈচিত্র্য পূর্ণ কথা বলেন। পানীয়ের বৈচিত্রে বলেন — চা, কফি, কোকো, ঘোল সরবত লেবুপানি; সোডা লেমোনেড অরেঞ্জ স্কোয়াশ; সিরাপ লস্যি কুলফি ইত্যাদি। জলখাবারের বিভিন্নতা আমাদের সকালের বিশেষ আহারকে মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন চিঁড়ে মুড়ি খই পিঠে; ছোলা মটর ছাতু; তন্দুরী নান পাউরুটি; বাতাসা কদমা মিছরি; মধু চিনি ভুরো; মুড়কি মেয়া তিলের চাক; রস পাটালি ঝোলাগুড়, নাড়ু খাজা মোরব্বা ইত্যাদি খাবার। তিনি রেস্টুরেন্টের মুখরোচক বৈচিত্র্যের খাবার নিয়ে, আমাদের রসনায় রস ঝরানোর খাবার নিয়ে ছড়ার তৃপ্তি আনেন বাংলা ছড়ায়। তিনি সেই ছড়াগুলিতে খাবারের কথায় বলেন — সিঙ্গারা নিমকি কচুরি পুরি। চপ কাটলেট ডেভিল; বেগুনী ফুলুরী তেলেভাজা; ইডলি সম্বর মশলাদোসা, আলুবড়া আলুকাবলি ঘুগনি ফুচকা ভেলপুরী। এছাড়া ভারী খাবার হিসেবে ভাত-দই মিষ্টির বিভিন্ন পদের কথা তাঁর ছড়ায় আমরা পাই। ভাত রুটি খিচুড়ি পোলাও; কাসুন্দি ডাল পোস্তবাটা; সুক্তো নিমঝোল পল্‌তার বড়া; বড়ি পাঁপড় স্যালাড রায়তা; আলুসেদ্ধ; বেগুন পোড়া; ক্ষীর রাবড়ী পায়েস দই সন্দেশ রসগোল্লা; পান্তুয়া ল্যাংচা লেডিকেনি, কাঁচা গোল্লা ইত্যাদি।

ফলমূলের বৈচিত্র্যে বাংলার বিভিন্ন স্বাদের ফলমূলের নাম নিয়ে ছড়া সৃষ্টি করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছড়া নির্মাণের একটি বিশেষত্ব হল যে, প্রতিটি পংক্তিতে দুই চরণের দুই প্রকৃতির কথা বলেছেন কবি। প্রত্যেক পংক্তির প্রথম চরণগুলিতে বৈষয়িক অভিন্নতা রক্ষা করেছিলেন। এবং প্রত্যেক পংক্তির দ্বিতীয় চরণগুলিতে বিশেষ বক্তব্য খাপছাড়া ভাবে বলতে চেয়েছিলেন কবি। তিনি বিভিন্ন ফলমূলের কথায় বলেন আম, জাম, কাঁঠাল; আঁশফল, জামরুল, লিচু; কুল, কূলা, পেয়ারা, বেল,

কদবেল, আতা, শাঁকালু ইত্যাদি ফলমূলের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণগুলিতে ফলমূল ভিন্ন খাপছাড়া বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন —"ল্যাংড়া ফজ্‌লি বোম্বাই।

মোচাক থেকে মোম পাই।।
ক্ষীরসাপাতি গিন্নি পসন্দ
কালকে সারা বাংলা বন্‌ধ।।
গোপালভোগ মৌচুষী।
শাড়ি গয়না পেয়ে নতুন বউ খুশি।।"

এরকম বৈচিত্র্য এসেছে তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ঘরবাড়ির খাট পালঙ্ক, মাদুর, সতরঞ্চি, তোশক, গদি, লেপ, নাটবল্টু, ইসক্রুপ, হাপর, নেহাই, চরকা, লাটাই, হাতুড়ি, কোদাল, কাস্তে, খুন্তি, হাতা, হামানদিস্তা, শিলনোড়া, ঘর, দালান, বারান্দা, ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থের খুঁটিনাটি ছড়ার বিষয় করে তুলেছেন স্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নারীর ব্রতকথা, সাজসজ্জা, নিয়মকানুন ও মেয়েলী ঢঙে চলার বিশেষ প্রকৃতি তাঁর নজরে আসে। কবি নারীর বিভিন্ন গহনায় ডিজাইন এবং সাজার উপকরণ সম্পর্কেও ছড়া লিখেছেন।চুড়ি শাঁখা বালা তাগা বিছেহার নেকলেস লকেট নাকছাবি নথ ইয়ারিং মান্তাসা চূর আংটি মল গোট টিক্‌লি; সোনা হীরে অভ্র ইত্যাদি ধাতুতে নির্মিত মূল্যবান বিভিন্ন গহনার উল্লেখ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ছড়ার সঙ্গে শিশুর খেলার একটা গাড়ীর যোগ রয়েছে। এই খেলা ইন-ডোর বা আউট-ডোর দুই-ই হতে পারে। কোন কোন ছড়া বলতে বলতে খেলায় ঝোঁক আসে আবার কোন কোন ছড়া পড়তে পড়তে খেলার নানা খুঁটিনাটি মনে আসবে।'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো' গ্রন্থের ২১ নং সংখ্যক ছড়ায় কবি লেখেন — "হকি ক্রিকেট ফুটবল। /উঠোনে আমর ডুবজল।।/ভলি বাস্কেট রাগবী।/ষাড় দেখলেই ভাগবী।।/ব্যাডমিন্টন টেনিস। /এই তো লেখা ফুমন্তর, ভ্যানিশ।।" এছাড়াও কবি আরও নানা খেলার কথা বলেন। গোল্লাছুট, ডাঙাগুলি, লাট্টু, মার্বেল, হাডুডু ইত্যাদি খেলার সঙ্গে কবির অভিজ্ঞতা ছিল।

কবি ছড়ার জগতে নিজের সঙ্গে নানা রঙে নানা উপকরণ দিয়ে লিখেছেন। কখনো একেবারে এলোমেলো ভাবে ছোট্ট শিশুমন দিয়ে ডুব দিয়েছেন। লিখেছেন —

"বেলুন জলছবি ষ্টিকার।
হয়েছে ভুল করছি স্বীকার।।
দোয়াত কলম পেনসিল।
মুশকিলে ফেলে টনসিল।।
খাতা কাগজ বই।
অটোগ্রাফে বলো তো এটা কার সই?"

খেলতে খেলতে শিশুর অভ্যাস চুইংগাম চেবানো। এছাড়াও তার মুখরোচক আমসত্ত, ঝালমুড়ি, চানাচুর ইত্যাদি — খাওয়া ও খেলার সম্পর্কে জুড়ে দিয়েছেন কবি। যখন সেখানে রঙ দিতে চেয়েছেন তখন সেখানে যেন লুটোপুটি খেলেছেন।কখনো কবি খেলেছেন শায়া শাড়ী শালোয়ার; ব্লাউজ শেমিজ ওড়না নিয়ে খেলেছেন পোষাক পরিচ্ছেদের দুনিয়ায়। আলোচ্য ছড়ার গ্রন্থে আমাদের পরিচিত বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে সৃষ্টি করেছেন একেকটি হিরের টুকরো। সেগুলো তাঁর কল্পনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয়ে আমরা বিস্মিত হই। আমরা যে নিত্য সবজি আহার করি তিনি সেগুলি নিয়ে একখন্ড ভাসমান মেঘের ছবি এঁকেছেন। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের ছড়ায় স্থান পেয়েছে বিভিন্ন মানুষ, জীব-জন্তু, বন্য-প্রাণী, সরীসৃপ, গৃহপালিত প্রাণী, হিংস্র প্রাণী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অনেক কিছু। কবির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। শুধু সাপে কিংবা পতঙ্গের কিংবা শুধু কীটের এতো বৈচিত্র্য দেখে আমরা বিস্মিত হই। যেমন পতঙ্গের কথায় কবি বলেছেন —"কেঁচো কেন্নো উঁই।/দাদা ছেড়েছে হাউই।।/কাঁকড়া গুগ্‌লি শামুক।/বৃষ্টি এবার থামুক।।/প্রজাপতি মথ শুঁয়োপোকা।/কাঁধে লাঙল, মাথায় টোকা।।/জোনাকি ঝিনুক গুবরে।/ফোক্‌লা বুড়োর গাল গিয়েছে তুবড়ে।। (৩৮ সংখ্যক ছড়া)

কবি সুভাষ প্রকৃতি – বিষয়ক ছড়া রচনায় ছড়ার ধারায় স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। প্রকৃতির অসংখ্যক গাছ-গাছালির সঙ্গে অনুপম পরিবেশে ছড়া সৃষ্টি করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই শ্রেণির ছড়ায় লেখেন —

"তাল খেজুর নারকোল।
খোকা ছাড়ে না মা-র কোল।।
বট পাকুড় শিরীষ।
সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরিস।।
ইউক্যালিপ্টাস দেবদারু।
টিনের কৌটোয় আছে নাড়ু।।
বাবলা সিসু গরান।
গলাটা একটু চড়ান।। (৪১ সংখ্যক ছড়া)

এই শ্রেণির ছড়ায় গোলাপ, বেল, জুঁই, সূর্যমুখী, মোরগঝুঁটি, করবী, শিউলি, দোপাটি ইত্যাদি নানা রঙের ফুল ছড়িয়ে রয়েছে অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে। সেখানে অসংখ্য ঝোপ জঙ্গল নিয়ে বিশেষ প্রাকৃতিক ছবি ফুটে ওঠে —

"শন বোনা নলখাগড়া।
দাদার পায়ে লাল নাগরা।।
বেত হোগলা প্যাকাটি।
চুপ্‌সে গেছে চাকাটি।।
ময়নাকাঁটা ফণীমনসা।।
ফুটপাতে ফেলোনা কলার খোসা।। (৪৬ সংখ্যক ছড়া)

এই প্রকৃতির বনরাজির মাঝে কবি উড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্যক পাখি। পাখিরা সেখানে কলকাকলিতে ছড়ার রাজ্যে অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সেখানে কাক কোকিল পায়রা শালিক চড়াই পাপিয়া টিয়া দোয়েল কাকাতুয়া ময়না মাছরাঙা, বক ইত্যাদি পাখিরা সেখানে কলতান সৃষ্টি করেছে। সেই পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে সবুজঘেরা প্রকৃতি। কবি সেই প্রকৃতি নিয়ে লেখেন —"কাঠঠোকরা ছাতারে।/ভর্তি হব সাঁতারে।।/টুনটুনি চখা জলপিপি।/কোন বোতলের কোন্ ছিপি? /চাতক যাহুক তিতির।/উত্তর নেই চিঠির।।/পানবরের বাবা কোন জন?" (৪৯ সংখ্যক ছড়া)

প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বনরাজিতে প্রাণখোলা গান গেয়ে চলে বিভিন্ন সুরে নানা পাখি। আকাশ তাদের গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। শুধু আকাশ নয় জলে ঢেউ তুলে নেচে বেড়ায় অসংখ্য মাছ। ঝাঁক ঝাঁক মাছ জলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেখানে খয়রা ইলিশ বাটা শাল শিলোন ভেটকি পারশে পাবদা বোয়াল ইত্যাদি মাছগুলি ছড়ার জলে ভেসে বেড়ায়। তাই নিয়ে কবি লেখেন —

"ভোলা মহাশোল কালবাউশ।
আমনের আগে ওঠে আউশ।
খরশল্লা তপসে।
চুমরে নিচ্ছে গোঁফ সে।।
সরল পুঁটি মৌরলা।
বাজার ছিল চৌদোলা।" (৫৪ সংখ্যক ছড়া)

বাংলার প্রকৃতি নদী-কেন্দ্রিক। বিভিন্ন নদ-নদীর কুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জনবসতি। নদ-নদীর জল বাংলার প্রকৃতিকে পুষ্ট করে তুলেছে। কবি তাঁর ছড়ায় নদ-নদী গুলির নামকে নিয়ে যে ছড়ার ছন্দ নির্মাণ করেছেন তাতে যেন চলমানতার স্পন্দন উপলব্ধি করি আমরা। কবি সেখানে হুগলী, ভাগীরথি, গঙ্গা, ইচ্ছামতি, মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, জলঢাকা, তিস্তা, রংগিত, রানু, টাংগন, তোরসা, মহানন্দা, করতোয়া, আত্রাই প্রভৃতি নদ-নদীকে ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন —

"দামোদর অজয় কংসাবতী।
দাদুর পায়ে নক্সা-চটি।।
দারকেশ্বর ময়ুরাক্ষী।
দাদা মেরেছে, আমি সাক্ষী।।. . . . .
বাঁকা কালিঘাই হল্‌দি।
তৈরী হও জলদি।।" (৫৬ সংখ্যক ছড়া)

এছাড়াও বাংলার বাইরের প্রকৃতিকে পুষ্ট করেছে এমন নদ-নদী এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশকে সমৃদ্ধ করেছে এমন নদ-নদীকে নিয়েও ছড়া সৃষ্টি করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই-সব

নদনদীর নামকে নিয়ে বিভিন্ন চরণ যুক্ত করে বিক্ষিপ্ত চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন কবি। সেখানে তিনি একদিকে যেমন ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-শোন-তাপ্তী-বিতস্তা-সিন্ধু-কাবেরী-কৃষ্ণা-পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলী-নর্মদা - গোদাবরী প্রভৃতি নদ-নদীর উল্লেখ করেছেন তেমনি এ দেশের ও বিভিন্ন দেশ মহাদেশের নানা নদ-নদীকে তিনি ছড়ায় স্থান দিয়েছেন।

তাঁর 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো'' ছড়া গ্রন্থটির ছড়াগুলি বিস্তৃতি পেয়েছে বাংলার নানা জায়গায়। সেখানকার মাঠঘাট-নদ-নদী-পশু পাখি-শাক-সবজি ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন সেইসব স্থানের নাম দিয়েও তিনি রচনা করেন ছড়া। সেই সব স্থান উঠে এসেছে ছড়ার সংসারে। কবি সেই সব ছড়ায় উল্লেখ করেছেন — মালদা - বালুরঘাট - বর্ধমান - মেদিনীপুর - বহরমপুর - পুরুলিয়া - বাঁকুড়া - সিউড়ি - চুঁচড়ো - দার্জিলিং - কোচবিহার - জলাপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা ও স্থানের নাম দিয়ে। সেই স্থান শহর - বন্দর ও নগরী বাংলার বাইরে ও শহর - বন্দর ও নগরী বাংলার বাইরে ও একদেশ থেকে ভিন্ন মহাদেশ ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি সুভাষ। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে এসেছে —

''দিল্লী বোম্বাই কলকতা।
বৃষ্টি পড়ছে খোল ছাতা।।
মাদ্রাজ, কানপুর, পুণা।
নাল নীল আলোয় নাচছে কেও?
পাপু না?
লখ্‌নৌ পাটনা পাঞ্জিম।
সিংজি দু'বেলাই খান ডিম।।'' (৫৮ সংখ্যক ছড়া)

কবি সুভাষের ছড়ায় অন্তর্ভূক্ত বাংলার বারোমাসের তেরো পার্বণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর উৎসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্থানের লৌকিক নিত্যগীত নিয়ে ছড়া সৃষ্টি করেছেন কবি

সুভাষ। তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কথায় মন্দির, মসজিদ, গীর্জা গুরুদ্বার প্যাগোডা ইত্যাদি উল্লেখ করেন তার ছড়ায়। উৎসব ও পূজাপার্বণের কথায় উল্লেখ করেন —

দূর্গাপূজা - দেওয়ালী।
রাত্রি হবে কাওয়ালী।।
মহরম মিলাদ ঈদ।
হব আমি জোতর্বিদ।।
দোল চড়ক ভাই ফোঁটা।
কী উঁচু সব দালানকোঠা।। (৬২ সংখ্যক ছড়া)

বিভিন্ন অঞ্চলের উৎসবের সঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্য। লোকজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো নিয়ে তিনি বৃহৎ জীবনকে ছড়ায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। লোক জীবনের কথায় তিনি লেখেন —"যাত্রা পাঁচালী কথকতা।/হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা।।/কীর্তন ঝুমুর বাউল।/বুনছেন ব'সে মা উল।।/সারী জারী ভাটিয়ালী।/ডাকো, যাচ্ছে ফুঁটেওয়ালী।।/টুসু গম্ভীরা বোলান।/গরুর গাড়ি হল গুলান।।/গাজীর পট তরজা।' /(৬৪ সংখ্যক ছড়া)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম ছড়ার গ্রন্থ "সাতসকালের ছড়া।" গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২০০ সালের জানুয়ারী মাস। এই গ্রন্থের সর্বমোট প্রকাশ ২০০ সালের জানুয়ারী মাস। এই গ্রন্থের সর্বমোট ৫০টি ছড়ার মধ্যে ৩২টি ছড়া যুক্তাক্ষর বর্জিত। এই গ্রন্থটি কবি উৎ!সর্গ করেন তাঁর আদরের নাতি হী-ম্যান সৌমজিৎ কে। ছড়াগুলি কবি দুটি শীর্ষনামে প্রকাশ করেন। প্রথম ১৪টি ছড়া নিয়ে "সাত সালের ছড়া" এবং পরে ৩৬টি ছড়া নিয়ে "সাত সালের ছড়া সংযোজন" আলোচন্য গ্রন্থের ছড়াগুলি হল - বাবা গেছে, পশমী শাল, আকাশ নীল, একটা লোক পকেট কেটে, বলদ বলে ভাবছে নাকি, আলুকাবলির পলকা কাঠি, ময়দানে বইমেলা, ছড়াচ্ছে রাস, বাপুজি বললে তাঁকে, বনের ভেতর, রোজ সাঁজে শাঁখ বাজে, ও আমার, একই ঘরে মুখোমুখি, বাইরে চাও, কী শীত, পিছলে, মাটির মানুষ, জোনাকি, তালগাছ,

দুই ভাত, সাঁকো, দাদা, খাই কী, চাই কী, খুঁটি, যেমন কর্ম, সিঁদেল, বাহন, চোদ্দশো সাল, একবিংশ রসকষ, বারো মেসে, বারোয়ারী, ফল কথা, বন্দর নামা, হিন সত্যি, হুড়ুম, পদার্থে, সা রেগা, খরকুনো, তাসের ঘর, মাথায় থাক, খানতল্লাসি, ঘরানা, মন্ত্রী বলেন, দেখছি; নানা থামা, হাওয়া প্রবল, ঘরগেরস্তি এবং বেলুন ফোলাই। এগুলির মধ্যে 'সাত সকালের ছড়া সংযোজন গ্রন্থগুলির ছড়াগুলি শীর্ষনাম দিয়ে এবং 'সাতসকালের ছড়া' গ্রন্থের ছড়াগুলি প্রথ মচরণ অনুসারে নামকরণ কথা হয়। এগুলিতে গতানুগতিক নামকরণ করা হয়নি। ছড়াগুলির মধ্যে পাওয়া যায় কবি সুভাষের বিচিত্র ভাবানার প্রতিফলন। কবি রবীন্দ্রনাথ কে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করে ছড়ায় লেখেন —"বনের ভেতর

বট পাকুড়

মনের ভেতর

রবি ঠাকুর।

কখনো প্রকৃতির সাধারণ সত্য সুন্দর কে ছড়ায় রূপ দিয়েছেন কবি সুভাষ। গ্রাম্য প্রকৃতির চিত্র রূপ ময়তা তাঁর ছড়ায় আমরা অসাধরণ শিল্প নিপুণতায় পাই। তিনি লেখেন —"বলদ বলে ভাবছ নাকি/বুঝি না কিছু, এতই বোকা/পিঠে বসিয়ে চড়াই পাখি/বাছিয়ে নিই গায়ের পোকা।।"কখনো ছড়ায় প্রতিবিম্বিত তাঁর শ্রদ্ধা দেশনেতা মহাত্মা গান্ধির প্রতি। মহান নেতার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং দেশপ্রেম স্মরণ করে তিনি লেখেন —"বাপুজি বললে তাঁকে / কে না চেনে এক ডাকে / খাঁটি মহাজন তিনি / দেশ তাঁর কাছে ঋনী।।

ছড়াতে আমরা পাই কবি সুভাএসর স্বদেশ প্রীতি, প্রকৃতি প্রীতি, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সৌন্দর্য চেতনা। আমরা পাই তাঁর জাতীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তিনি ছড়ায় লেখেন —

"রোজ সাঁজে শাঁখ বাজে

ভোর হয় অজানে

কোথা গেলে মধু মেলে

মৌমাছি তা জানে।।

কবি ছড়ায় বাবা-মায়ের কথা, বিভিন্ন ঋতুর কথা, আকাশ, চিল, চাঁদ, পকেটমার। কাবলিওয়ালার কথা বলেছেন ছড়ায়। ছড়ায় ভিড় করেছে তাঁর মনের কোণে কলকাতা বই মেলা। তাঁর সঙ্গে বইমেলার সম্পর্ক ছিল নাড়ীর সম্পর্ক। তিনি সেই বইমেলার কথায় লেখেন —"ময়দানে বইমেলা / মা আমাকে নিয়ে যাবে / যেতে হবে এই বেলা / পরে গেলে ঠেলা খাবে।।" দারুন শীতে সাধারণ খেঁটে খাওয়া গরীব মানুষেরা অসম্ভব কষ্ট হয়। এই শীতে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র পাখিরও কষ্ট হয় অসম্ভব। সাত-সকালের ছড়া সংযোজন গ্রন্থের - ছড়ায় কবি লেখেন —

"মাঘের শীত

পাখির গায়

থামল গীত

জীবন যায়।। ('কী শীত'/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)।

সাধারণ জনজ্জীবনের অভাব ও দৈন্যতার সাধারণ ছবি আমরা পাই তাঁর ছড়ায় তিনি সাধারণ অভাবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। অভাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞছতা দিয়ে । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কবি ছড়া রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন ঝোপ জঙ্গল বাঁশ ঝাঁড়, জোনাকির সঙ্গে। কবি লেখেন — "ঝোপের গায়ে ঝিকমিক করে

রুপো কিংবা সোনা কি?

সোনাও নয় রুপোও নয় —

আঁধারমানিক জোনাকি।। (জোনাকি/ সাতসালের ছড়া সংযোজন)।

পৌরাণিক চেতনা কবির ছড়া শিল্প সত্ত্বাকে পুষ্টি জোগান দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র ও

স্বর্গলোকের দেবদেবীর বাহন নিয়ে বিশেষ ছড়া নির্মাণ করেন এই ছড়ায় আমরা পাই বিভিন্ন দেবদেবীকেতাদের বাহনসহ কবি স্মরণ করেছেন । 'বাহন' শীর্ষক ছড়ায় কবি লেখেন —

"শিল্পের বাহন?

বৃষভ।

লোকটা বলছে কী সব।। . . . . .

সরস্বতীর বাহন?

রাজহাঁস।

গরমে করি হাঁসফাঁস।। ('বাহন'/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

আলোচ্য ছড়ায় গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'বারোমেসে" শীর্ষক ছড়ায় কবি বাংলা বারোমাসের ঋতু বৈচিত্র্য এবং বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য বিভিন্ন রঙে ছবি এঁকেছেন কবি সুভাষ। এই ছড়ায় তিনি বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতির রংবদলের ছবি এঁকেছেন। একই ভাবনায় ইংরেজি বারোমাসে বাংলার রূপকে ছড়ায় ধরার প্রয়াস করেন কবি সুভাষ। তিনি আলোচ্য ছড়ার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বারোয়ারী' শীর্ষক ছড়ায় লেখেন —"এপ্রিল থেকে মে-জুন/মাথার ওপর আগুন।/জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর/টইটম্বুর চরাচর।/অক্টোবরে আকাশ নীল/উৎসবে হয় প্রাণের মিল।/নভেম্বরে ভরলে গোলা/চড়ব আমরা নাগরদোলা।/ডিসেম্বরটা হলে কাবার/নতুন বছর শুরু আবার।"(বারোয়ারি/ সাতসালের ছড়া সংযোজন)।

বিভিন্ন জায়গা সাংবাদিকতা সূত্রে কবি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। পাহার বনজঙ্গল, নদী সমুদ্র কবির ছড়া রচনায় উৎস কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কবির আলোচ্য – গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'বন্দর নামা" শীর্ষক ছড়ায় আমরা পাই — 'বোরিবন্দর মাজগাঁও ভক।

ঠগী রাজা,

মন্ত্রীও ঠক।।

মেরিন ড্রাইভ মালাবার ছিল।

চোরের ভয়ে

দরজার খিল।।   (বন্দরনামা/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

ছেলেভুলোনো চাঁদমামা কে এবং রূপকথা কবির ছড়া রচনার অন্যতম উপাদান হিসাবে আমরা পাই। আলোচ্য গ্রন্থে 'তিন সত্যি'। শীর্ষক ছড়ায় আমরা দেখি চাঁদমামা এবং চাঁদে চরকা কাটা বুড়ির ছেলে ভুলানো। ঘুমপাড়ানি রূপকথার গল্প।ছড়া রচনায় অন্যতম উপাদান ধ্বন্যাত্বক শব্দ ও শব্দদ্বৈত ধ্বনি এবং শ্বাসাঘাত প্রধান ধ্বনি। এই রকম ধ্বনির প্রয়োগে কবির শিল্প নৈপুণেযণ অসাধারণ দক্ষতার নিদর্শন আমরা পাই। কবি লেখেন —   "কলকল খস খস কড় কড় কড়াৎ।

বেঁচে গেছে খুব জোর, একে বলে করাত।।

কটমট খটখট, ঠকঠক ঠকাস।

ঘুমেও পড়ছে তুলে, কেন ওকে বকাস।।

'গড় গড় ঘড়ঘড় দুড়দাড় দুড়ুম।

ছাঁকা তেলে ভাজা চিঁড়ে, যার নাম হুড়ুম,, (হুড়ুম/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

এই গ্রন্থের ছড়ার মধ্যে কবি শিল্পিত রূপ দিয়ে ফুটবল খেলার খুঁটিনাটি, সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ–রাগিনী, মক্কার হজ যাত্রা। দার্জিলিং - শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাস খেলার মজা, পরিবারের অভাব, সন্তানের অসুস্থতা, মানব জাতির মাহাত্ম ইত্যাদি। 'ঘরকুনো' শীর্ষক ছড়ায় দ্বিতীয় সংখ্যা ছড়ায় লেখেন পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ - কৃষ্ণাঙ্গ, ধনি-গরীব ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য। তিনি বৃহৎ মানবিক চেতনায় ছাপ রাখেন এই ছড়ায় তিনি লেখেন —"ঘর একুনে চৌষট্টি।/খোকার মাথায় জলপট্টি।।/লড়াই হবে কালা–ধলায়।/বেড়ালদুটো খাটের তলায়।।/কেল্লার মধ্যে ঢুকল রাজা।/কুড়মুড় কুড়মুড় কলাইভাজা।।/ঘোড়ার চালে মন্ত্রী কাত।/আমরা মানুষ একটি জাত।।"(ঘরকুনো/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

তাঁর ছড়া সৃষ্টিতে অসাধারণ বিষয়-বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল স্থান পেয়োছেন জগতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলি উল্লেখের সঙ্গে একএকটি স্তবকে শেষ চরণে ছেলেবেলার হজমোলা খাবার স্বাদ, নালার মাথায় জঞ্জাল জমে থাকা, দৈনিক সংবাদের কথা সহজ ভাষায় বৈচিত্রপূর্ণ করে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন — "ঋক্ অথর্ব সামবেদ যদু।/নমাজ পড়লে/তার আগে করে নিতে হয় অজু।/বাইবেল গীতা জেন্দআবেস্তা।/দেখেছিলি তুই? /বলতো কী হল ছবির শেষটা।।/গ্রন্থসাহেব কোরান তাও ত্রিপিটক।/শস্তার আম/কিনে এনে দেখি, বাপরে, কী টক।।/(মাথায় থাক/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

কবি সুভাষের বেড়ে ওঠা একটি অত্যন্ত অভাবী পরিবারে। সেই পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। সেই পান্থার ও অন্যান্য অভিজাত খাবারের পাশাপাশি ছড়ায় স্থান পায়। সংসারে আর্থিক সংকট ছিল। কিন্তু তাঁদের পরিবারের অন্যান্য পরিজনদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এক-একেক গুণের অধিকারী। খানাতল্লাশী শীর্ষক ছড়ায় কবি লেখেন —

"পান্তা ঘি-ভাত ফ্রায়েড-রাইস ভুনিখিচুড়ি।

বন্ধু পাশে থাকলে আমি

ভয় করিনা কোনো কিছুরই।

তন্দুরী নান পাউরুটি বান পরোটা লুচি পুরি।

আমরার দিদি নাচতে পারে

কত্থক কুচি পুড়ি। (খানাতল্লাসি/ সাতসকালের ছড়া সংযোজন)

বিভিন্ন খাবারের তল্লাসি করেছেন কবি ছড়ার মধ্য দিয়ে। আলোচ্য ছড়াটির প্রত্যেক স্তবকের অন্তিম চরন দুটিতে করেন কবির ব্যক্ত জীবনের অনেক কথা। তিনি এভাবে কবি ছড়াকে বর্ণময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলেন। কবি লেখেন কোর্মা কোপ্তা দোপেয়াজি চিলচিকেন শিককাবাব।/ বিদ্যালয়ে হয় আমাদের/ গুরুর কাছে দীক্ষা লাভ।।" আলোচ্য ছড়া-গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত "ঘরানা" শীর্ষক চূড়ায় কবি লেখেন – "রোয়াক চাতাল দরদালান।/ রোজ দুবেলা চাই ঠাকুমার/ জর্দাপান।।"

বর্ষায় বাঙলার পথ-ঘাট অসম্ভব দুদর্শাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ব্যবহার - যোগ্যতা প্রায় থাকে না বলেই হয়। কবি বর্ষায় সেই অবস্থাকে কৌতুকের বিষয় করেছেন ছড়ায়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে দেশের মন্ত্রীদের যে কোনো অভিযোগের কথা, দুর্যোগের কথা দুদর্শার কথা জানালেন তাদের কেবল একটাই আশ্বাস - 'দেখছি'। কবি 'মন্ত্রী বলেন, দেখছি' শীর্ষক ছড়াটিতে ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ব্যাপ্তিতে ক্রমশঃ চিন্তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কবি লেকেন —''হাতা খুন্তি উড়কিমালা কড়াই চাটু।/আকাশ ফুটো, রাস্তায় জল, ডুবছে হাঁটু।।/কুরনি কুলো চাকিবেলন হামানদিস্তা।/দাদু কাগজ নষ্ট করেন দিস্তা দিস্তা।।/সাঁড়াশি বেড়ি চিমটে জাঁতা শিলনোড়া।/কী সুন্দর ছড়ায় দেয় মিল ওরা।।/খড়া কলসী খোরা খুরি মটকা।/ভারতের জয়, তাই ফাটছে পটকা।।/হাঁড়ি পাতিল সরা মালসা ডেকচি।/মন্ত্রী - হলেন এক - কথার লোক, শুধু বলেন, 'দেখছি'।

ব্যক্তি জীবন থেকে পরিবারের সংকট যেখানে তাঁর লেখার কাগজের জন্য অন্যের সাহায্য নিতে হয়েছিল। একজন জ্ঞানেশ্বরী পুরস্কার প্রাপ্ত বাঙালী সাহিত্যককে এতটা অবহেলার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হতো। এই ভাবনা ক্রমশ সমাজ- প্রতিবেশীর অভাব অভিযোগের আঙিনায় হাজির হয়েছে। সেখানে চলার রাস্তায় হাঁটু ডুবে যায়। এরপর তাঁর ভাবনা ক্রমশ দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর করুন অবস্থার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 'ঘরগেরস্তি' শীর্ষক ছড়াটিতে বাংলার জনজীবন ও সামাজিক অবস্থানের ক্রম বিবর্তনের শিল্পিত রূপের একটি উৎকৃষ্ট প্রয়াসের দৃষ্টান্ত। বাংলার সামজে গ্রামীণ জীবনে মানুষের ঘরবাড়ি, খাবার-দাবার ইত্যাদি সর্বাঙ্গীন জীবন শৈলীর মান এখন অনেক উন্নত। গ্রামের মানুষের চেতনা বেড়ে চলেছে ক্রমশ। তাঁরা এখন খর-ছাউনি ইত্যাদি ঘরবাড়ির অতিরিক্ত ব্যায় সংকোচন করে পাকা - দালানের প্রতি আগ্রহী। জীবন শৈলীর এই উন্নতী কবির নজর এড়ায়যনি।

'বকবকম' ছড়ার গ্রন্থের অন্যতম ছড়া ''আগডুম বাগডুম'। এই ছড়াটিতে কবি বাধর্ক্যে যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। বার্ধক্যে কবি বিভিন্ন ঘটনা-অঘটন নিয়ে কারণ - সন্ধান করেন কবি। এই ছড়াটিতে তিনি লেখেন —

''স্মৃতি ছাড়া সময়কে

পেরোবার সেতু নেই

না ছুঁড়লে বৃথা তীর

থাক যার যে তুনেই

মাথা কাটা গেছে তাই

রাহু আছে কেতু তাই

অকারনে ঘটে সব

কিছুরই তো হেতু নেই''।('আগডুম বাগডুম'/ বকবকম)

কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছড়ার গ্রন্থ ''ছড়ানো ঘুঁটি''। গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেন তাঁর ''পরম স্নেহের প্রতিমা আর শঙ্খ ঘোষকে তৃতীয় সহস্রাব্দের পয়লা দিনে। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২০০১ সারলের কলকাতা বইমেলায়। প্রকাশকালে গ্রন্থটিতে স্থান পায় ৬৯টি ছড়া। এই গ্রন্থের অন্যতম ছড়াগুলি হল —আইডিয়া, বেড়াল সঙ্গী, দৌড়, কম বোঝ, ঠাকরালি, ট্যাংরায়, শীতল পাটি, হাতে হাত, লাইনে, বাবার ছবি, তুতাক, জংশন, একেক্কে এক, ছড়ানো, বাল্যসখা, পরম্পরা, অরণ্যে বেরাদন, চূড়ান্তে, সই পাতানো, সম্ভবামি, কানামাছি, ডোরাকাটা, কালাকানুন, ছড়ানো খুঁটি, আলগোছে, মৃদঙ্গ, রসো হে, যাও পাখি, তুমি তো কাঁদো না ইত্যাদি।

আলোচ্য ছড়াগুলির প্রায় প্রতিটিতে একটি সাধাররণ ধর্ম লক্ষিত হয়। কবি প্রায় প্রত্যেক ছড়ার একেকটি স্তবক দুটি চরণের মধ্যে অন্ত্যামিল বজায় রেখেছেন। প্রত্যেক স্তবকের প্রথম চরণটিতে নাম বিশেষ্য বৈচিত্র্যে যেন মালা গেঁথে ছিলেন। এবং দ্বিতীয় চরনটিতে একটি করে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন কবি। আলোচ্য কাব্যে — 'আইডিয়া' শীর্ষক ছড়ায় রয়েছে স্থানের নামবাচক বিশেষ্য। যেমন –''লিলুয়া শ্রীরামপুর রিষড়া/ঠ্যাঙায় যদি কড়িস রা।/চন্দননগর চুচঁড়ো/নোট নিয়ে ব্যান্ডেল/ছিঁড়ে গিয়েছে স্যান্ডেল।/তারকেশ্বর শ্যাওয়াফুলি/পৌষ পরবে পিঠেপুলি।'' /('আইডিয়া'/ ছড়ানো খুঁটি)

আলোচ্য ছড়া গ্রন্থের 'বেড়াল সাক্ষী' শীর্ষক ছড়াটিতে আমরা পাই নদ-নদী নাম বিশেষ্যের বৈচিত্র্যের সম্যক জ্ঞানের পরিচয়। কবি ছড়াটিতে লিখেছেন —

দামোদর অজয় ভাগীরথী

উকিল পরেন মামলার নথি।

জলঙ্গী তোরসা জলঢাকা . . . . . .

কংসাবতী ময়ূরাক্ষী

কাকা নিয়েছে মাছের টুকরো,

বেড়াল সাক্ষী।" ('বেড়াল সাক্ষী'/ ছড়ানো খুঁটি)

আলোচ্য ছড়া-গ্রন্থের 'দৌড়' শীর্ষক ছড়াটিতে কবি নাম বিশেষ্যের অসাধারণ জ্ঞানের নিদর্শন রেখেছেন। ঐতিহাসি স্থানের নাম দিয়ে তিনি ছড়াটিতে বর্তমানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙেখগ ইতিহাসের পরিমন্ডল যুক্ত করেছেন। এতে আমরা দেখি —"অঙ্গদেশ রায় অবন্তী অম্বর।/কাকে খুঁজছেন? কী রোড? কত নম্বর? /উজ্জয়িনী উদয়গিরি উৎকল।/বিকেল হলেই মাঠে পড়বে ফুটবল।।/কপিলবস্তু কণিষ্কপুর কঙ্কন।/এখান থেকে পাতাল ট্রেন এটা দমদম জংশন।/কান্যকুব্জ কিষ্কিন্ধ্যা কাঞ্চি।/এই রইল চায়ের কাপ, পাঁপড় ভাজা আনাছি।।এছড়াও এই ছড়াটিতে আমরা পাই ইতিহাসের নাম বিশেষ্য হিসেবে কুন্তীভোজ, কৌশাম্বী, কোশল, তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণপথ ও গৌড়। ঐতিহাসি স্থানের নাম বিশেষ্য প্রয়োগের বৈচিত্র্যে পাই আমরা তাঁর আলোচ্য ছড়া-গ্রন্থের 'কম বোঝ' শীর্ষক ছড়াটিতে। এই ছড়াটিতে যেসব ঐতিহাসি স্থান বিশেষ্যের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল - ওদন্তপুর, উত্তরাপথ, কর্ণাটক, কুরুক্ষেত্র, কলিঙ্গদেশ, কম্বোজ, হস্তিনাপুর, ভোজ-মগধ, লিচ্ছবি, তক্ষশীলা, বৈশালী, প্রাগজ্যোতিষপুর, ক্রোড়মন্ডল, তাম্রলিপ্ত, পাঞ্চাল, ব্রক্ষাবর্ত, বারণাবত ও গান্ধার।

কবি সুভাষ আলোচ্য ছড়া গ্রন্থের 'ঠাকুরালি' শীর্ষক ছড়াটিতে নাম-বিশেষ্য হিসেবে লৌকিক দেবদেবীর নাম। এই ছড়ায় কবির লোক-জীবনের সঙ্গে একাত্মার একটি নিদর্শন রেখেছেন। এই ছড়াটিতে আমরা দেখি —"দক্ষিণবায় ধর্মঠাকুর বনবিবি।

খেলার পাট চুকিয়ে এবার পড়ায় একটু মন দিবি।।

বাগুলি টুসু ঘন্টাকর্ণ পেঁচো।

ছিপ ফেলব, খুঁজে বেড়াচ্ছি কেঁচো।।

সত্যপীর হুদুমদেও ভাদু।

গোলগপ্পা কেমন করে হয় এত সুস্বাদু।।" এছাড়া আলোচ্য ছড়াটিতে কবি সুভাষ যেসব দেব দেবীর নাম প্রয়োগ করেছেন, সেগুলি হল— মা-ডুমনি, একাচোরা, এঁতেল, ঠাকুরগাজী, শিয়ালকালী, রায়বাঘিনী, বর্গভীমা, করম, যাত্রাসিদ্ধ, মানিকপীর, তিস্তাবুড়ি এবং ইতু।

আলোচ্য ছড়া গ্রন্থের 'লাইনে' শীর্ষক ছড়াটিতে কবি প্রয়োগ করেছেন ইহলৌকিক ও প্রকৃতি বিষয়ক বিভিন্ন বিশেষ্য পদের একাধিক সমার্থক শব্দ। সমার্থক শব্দের ব্যবহহারে দুটি চরণের অন্ত্যমিল যুক্ত ছড়ায় আমরা দেখি —"রবি ভাস্কর সূর্য তপন অরুন মিহির অর্ক।/দুই পন্ডিত দেখা হলেই বাধবে তুমুল তর্ক।।/ইন্দু শশী মৃগাঙ্ক চাঁদ বিধূ সোম সুধাংশু।/বাবার পায়ে হাওয়াই চটি, দাদুর পায়ে পামশু।।/জগৎ ভুবন বসুন্ধরা পৃথিবী মহী বিশ্ব।/ট্রেন চললে দেখবে বাইরে পিছু হাঁটছে দৃশ্য।।/আকাশ গগন দ্যৌ আশমান নভ অম্বর ব্যোম।/ভয়ের কথা মনে পড়লেই খাড়া হয়ে যায় লোম।।" এছড়াও আলোচ্য ছড়াটিতে কবি সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করেছেন জলের - জল অপ্ পানি নীর পয় বারি অম্বু, নদীর স্রোতস্বতী তরঙ্গিনী গাঙ নদী সরিৎ এবং মাটির সমার্থক শব্দ - জমি মাটি স্থল ভূমি মৃত্তিকা ও ভূপৃষ্ঠ। সমার্থক শব্দ ছাড়াও আলোচ্য ছড়া-গ্রন্থের কবি ছড়া নির্মাণে প্রয়োগ করেছেন ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দ দ্বৈত ধ্বনি।

কবির অনন্য সাধারণ ছড়ার গ্রন্থ "হরেকরকমাবা"। গ্রন্থটির প্রকাশ ২০০৩ সালের কলকাতা বইমেলা। ১২টি ছড়া এবং ১২টি চিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থটির কবি উৎসর্গ করেন তাঁর ছোট নাতনি বুমলা-কে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ছড়াগুলি হল — একেক্কে এক,

বা রে বা, হী ম্যানের জন্মদিন, যোগেনদাদার

দিক্‌দারি, টরে টক্কা, দ্যাখো তো হে, যত গোল,

দোহাই। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন- "ছড়া কাটার ব্যাপারটা ছেলেখেলার মতোই এক সময়ে আমাদের পেয়ে বসে। অভ্যেসটা বুড়ো বয়সেও যায় না। কিন্তু তাই বলে ছড়ার হাত সবার সমান নয়। ছোটদের ভালোবাসি। ছড়ায় আমার নাক গলানো সেই স্পার্ধায়। বিষ্ণুশর্মা শট্‌কে শেখাতে নাকি পঞ্চতন্ত্র ফেঁদেছিলেন। শটকের বদলে আমি বেছে নিয়েছি রকমারি হরেক শব্দ আর নাম। নিরেট বস্তু থেকে ভাব – কিছু বাদ নেই।"

আলোচ্য গ্রন্থের – অন্তভূক্ত "একেক্কে এক" শীর্ষক ছড়ার শীর্ষনামের উৎস শিশুপাঠ্য ধারপাত। 'এক' সংখ্যাটি দিয়ে আলোচ্য ছড়াটিতে আমরা পাই —

"এক আঁটি খড়, এক ঘটি জল, এক তাল মাটি।
এই টুকু পথ বাসে ভিড়, চলো
তার চেয়ে হাঁটি।।
একপাল ভেড়া, এক মুঠো চাল, এক গাছি সুতো, ...
এক ভাঁড় দই এক খিলি পান, তেল এক পলা।।
ফের দুষ্টুমি?
ঐ মা আসছে
খাবে কানমলা।। ('একেক্কে এক'/ "হরেকরকমা")

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ছড়া 'বারে বা'। আলোচ্য ছড়াটিতে শিশুমন দিয়ে বয়ঃ জ্যেষ্ঠদের ধৃষ্টতাকে শ্লেষাত্মক ভাষায় আঘাত করেছেন কবি। বার্ধক্যের শরীরকে অক্ষমতাকে অকপট ভাষায় কবি প্রকাশ করেছেন আলোচ্য ছড়ায়। তিনি লিখেছেন —"দাঁত কোকলা, কানে খাটো, /দাদুর চোখে ছানি/কলম খুঁজে পাচ্ছে না, তো/আমি তার কী জানি! /কাগজের নৌকোয় তারিখ আজকের যে ছেপেছে তার দোষ।/আমার ঘাড়ে চাপাও দায় এর/হায় কপাল, কী আপসোস।" ('বারে বা'/ হরেকরকমবা) আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত সংযোজন ছড়া সংকলনের অন্যতম ছড়া 'বারে বা'। এই ছড়াটতে শিশুমন ও

জ্যেষ্ঠের আচরণের অসঙ্গতী ধরেচেন কবি। ছড়াটির শুরুতে কবি বার্ধ্যক্যের ছবি এঁকেছেন। যেখানে বৃদ্ধ মানুষের দাঁত ফোকলা, কানে খাটো,/ দাদুর চোখে ছানি"।

বৃদ্ধ বয়সে নাতি–নাতনি কবিকে স্নেহের বন্ধনে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ করেছিল। তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবর্গের নাতি নাতনিরা শিল্প মনে আলোড়ন ফেলেছিল। বন্ধু সম্পর্কীয় বিশেষ সম্পর্কের নাতি "হী ম্যান"। ছী ম্যানের জন্মদিনকে স্মরণ করে রচিত ছড়া 'হী ম্যানের জন্মদিন' আলোচ্য ছড়াটির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বেনুপুকরের এ. সেন। সেন মশাইয়ের মিসেসের সঙ্গে কবি সুভাষের বিশেষ আলাপ ছিল। তাঁদের নাতিই হলো আলোচ্য ছড়ার হী ম্যান। সেই হী ম্যানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির উপলব্ধি —

"বিমানের বেটা হী ম্যান?

দেখে নেবেন

হয়ে উঠবে বিরাট বড়ো

পুঁচকে ঐ শ্রীমান

চিনবে ওকে এক ডাকে সব

হবে এমনি নামের জাদু

লোকে বলবে ঐ যে সেই কালো ঘোড়াটা

সে হল এর দাদু।" (হী ম্যানের জন্মদিন / হরেকরকমবা)

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত "যোগেনদাদার দিক্‌নারি' ছড়াটিতে দশ দিকের নির্দেশ করে সংখ্যা মিলিয়ে অসাধারণ ছড়া নির্মাণ করেছেন কবি সুভাষ। দশটি দিক নির্দেশ করে কবি সুভাষ। দশটি দিক নির্দেশ করে কবি যোগেন দাদার ঝুলি ভরানো নিয়ে ছড়া নির্মাণ করেছেন। আলোচ্য ছড়ায় দশটি দিক – পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নিকোণ, বায়ুকোণ, নৈর্ঋত কোণ, ঈশান কোণ, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ কোণ। দশদিক বেং এক-দুই সংখ্যা মেলানোর অসাধারণ পদডধতি নির্দেশ করেছেন কবি সুভাষ। ছড়াটিতে আমরা দেখি – দশটি স্তবকে দশটি দিকের নির্দেশ করেছেন কবি। কবি লেখেন —"যোগেনদাদার দিকদারিতে/পুবের পুবের ঠাঁই একে।/ভোরে যে ঘুম ভাঙলে সবাই/তাকেই আগে দেখে।।/পশ্চিমে যান সূর্য ডুবে/আমিও খেয়ে শুই।/পুব পশ্চিম যোগ করে পাই/এক আর একে দুই।।"("যোগেনদাদার

দিক্দারি/ হরেকরকমবা")।এভাবে ক্রমশনুসারে দশটি দিক ও দশটি সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এভাবেই এক থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় "টরে টক্কা" শীর্ষক ছড়ার জগুর কৌটোয়।

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত "দ্যাখো তো হে" শীর্ষক ছড়ায় কবি আমাদের দৃষ্টিতে এনেছেন সোলের গ্রাম্য ছবি"। গ্রামের রাতে সোলে মন্দ মানুষের আনাগোনা করতো। একটা মন্দ সময়, সামাজিক অমঙ্গল ও সর্বনাশের আশঙ্কায় কবি হৃদয় বিক্ষত। কবির সেই চেতনাক্ষত শৈল্পিক নিদর্শন পাই আলোচ্য ছড়ায়। সেখানে কবি লেখেন — "দ্যাখো তো হে, কাছে পিঠে

তবলা বাজাতে পারে
আছে কেউ?
কেউ কি পড়েছে ঘাড়ে?
এত রাতে কুত্তারা
করে কেন কেউ কেউ
একবার ঝোপঝাড়ে
দ্যাখো তো হে
শেয়ালেরা কাকে দেখে ডাকে ফেউ? (দ্যাখো তো হে/ হরেকরকমাবা)

সামাজিক ও সামার্থক এক সর্বনাশ থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেছিলেন কবি। তিনি মানুষকে বুকে সাহস' সঞ্চয় ও প্রতিবাদের আগুন জ্বালানোর জন্য, মানবতার ঐক্য সাধনে শিল্পের হাত ধরার পথ নির্দেশ করেছেন। এজন্য তিনি আগুনকে খুজেঝেন। তাঁর কথায় "দ্যাখো তো হে' ওই দূরে/ আগুনের অভভা না? এবং মানুষের পাশাপাশি শিল্প চেতনার জাগরনী সুর খুঁজেছেন "দ্যাখো তো হে, কাছে পিঠে/ তবলা বাজাতে পারে/ আছে কেউ?" রাজনৈতিক উন্মাদনা এবং জনচেতনা পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তি। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দলবাজি এবং আত্মকেন্দ্রিক ভোগ সর্বস্ব জীবন চেতনার বিরুদ্ধে কবি জনচেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন। মানুষ – রাজনৈতিক উন্মাদনার ভোটের ভান্ডার পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু একবার গদিতে বসতে পারলে আর সমাজের দিকে তাকানো অবসর কিন্তু অভিমুখ কোনটাই রাখতে পারেন না নেতারা।

সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধি, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতা-নেতৃত্বের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কবি আলোচ্য উক্তি করেছেন। কবির শিল্পচেতনার বিশিষ্টতা এখানে পাই আমরা।সামাজিক অব্যবস্থা মূল্যবোধের হানি ও মানবিকতার অবমানন থেকে রক্ষা করার তাগিদ উপলব্ধি করেছিলেন কবি সুভাষ। তিনি মনে করেন যে একজন সর্বশক্তিময় কারিগর মানুষের দেহে প্রাণ সন্তার করেন। কিন্তু সব প্রাণীই মানুষ নয়। প্রকৃত মানুষের জন্য প্রয়োজন মানবিকচেতনা ও বিশেষ গুণ। কবি সেই গুণ সমন্বিত আস্ত মানুষকেই চেয়েছিলেন —"মন দিলে হবে তবেই মানুষ/ আস্ত/" মৃত্যুর পর দেহে তো আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। মানুষের স্থায়িত্ব, পৃথিবীতে আসার মাহাত্ম ইহলোক ত্যাগ করার সারসত্তা করি চেতনালোকে ছড়াটিতে একদিকে তাঁর মৃত্যুচেতনা অন্যদিকে জন্মচেতনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মৃত্যু চেতনার অন্যদিকে জন্মচেতনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মৃত্যু চেতনার সঙ্গে ভূত-প্রেত ইত্যাদি চেতনা দ্বারা কবি - সমকালে আলোড়িত হয়েছিলেন।ছড়ার সাহায্যে কবি সমকালের সামাজিক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রিক অ-ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গগুলি নির্দেশ করেছিলেন।

আলোচ্য ছড়ার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'চকখড়ি' শীর্ষক ছড়ায় কবি মানুষের চেতনার অভাব দেখে বিস্মিত। তিনি দেখেন যে সমকালে ভারত তথা পশ্চিম বাংলা - অনুপ্রবেশকারী ক্রমশ, বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেখানে ভারত জনবিস্ফোরণ সেখানে অনুপ্রবেশ কারীদের ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের বোঝা গদির লোভে বহন করতে আগ্রহী সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দল। আলোচ্য ছড়ায় কবি দেখিয়েছিলেন যে মানুষের মধ্যে লোভ, ভোগ কঠিন রূপে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যায়ভাবে অপরাধ করতে মানুষের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। মানুষ রাতারাতি সম্পদের প্রাচুর্যে মাহিমাধিত হয়ে উঠতে চায়। মানুষের এ ধরনের ভোগবাসনাজাত অন্যায়গুলি সঞ্চারিত হবে ব্যক্তি থেকে সমষ্টিগত সামাজিক স্তরে। অন্যায় পথে যেন-তেন- প্রকারেণ - ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেই হবে। প্রয়োজনে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নোট জাল' প্রাচুর্য ভোগ করতে হবে। আবার প্রয়োজনে কৌশল করে, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে ভোট জাল করে ক্ষমতা ছিনিয়ে গদিতে বসতেই হবে। এখানে মানুষের শুভচেতনা ও মূল্যবোধের ঘাটতি উপলব্ধি

করেছিলেন কবি। কবি প্রান্তীয় বর্গের একেবারে নিম্নশ্রেণির আর্থিক সঙ্কটাপন্ন মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার লড়াইটার টুঁনটুনি টিপে হত্যা করতে চাইছিলেন এক শ্রেণির ক্ষমতা লোভী মানুষ।

ছড়াকার শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে স্মরণ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থ-ভুক্ত "ছর্ বা" ছড়ায়। এই ছড়াটির শুরুতে হাস্যরহস্যের যথার্থ শিল্পী শিবরাম কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। 'ছর্‌রা' ছড়াটি দীর্ঘ এবং এটিকে কবি সতেরোটি ছোটবড় স্তবকে বিন্যস্ত করে ছিলেন। স্তবকগুলির কোনোটি চার কোনটিতে, দুই কোনটিতে আরো বেশি চরণ বিন্যস্ত করেছেন কবি সুভাষ। ভোট প্রসঙ্গ তুলে কবি – বলতে চেয়েছিলেন বাংলার অনেক উপদ্রুত সাধারণ মানুষ ঘরছাড়া, অনেকে ঘর-পোড়াও বটে। ভোটের মুখে এসে এই অসহায় সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুকে একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এই ভোটের কারণ এবং ক্ষমতা দখল, গদির লোভ মানুষকে উন্মত্ত করে তুলেছে। এই বাসনায় – মানুষ তার বিরোধী জনকে অবলীলায় আঘাত করতে পারে। একে অন্যের প্রতি আঘাত, সন্ত্রাস, ভীতি নিয়ে আসে। আসে মানুষে মানুষে বিবাদ, ঝগড়া, মামলা ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ করছিলেন কবি অসহায়ের পীড়ন এবং ক্ষমতাবান মানুষের ভোগ-ব্যাপ্তি। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসিত সরকারে। রাজ্য রাজনীতি ও পার্লামেন্টীয় রাজনীতিতে কয়েক নেতা নেত্রীর বৈশিষ্ট্য দু-এক পংক্তিতে ধরতে চেয়েছিলেন কবি। তিনি লেখেন —ক্ষমতা গেলে মমতায়।

মমতা ফেলে ক্ষমতায়।।

. . . .

হাত তোলাদের বাজারে আজ
কি রকম কি ভাও।।   (ছর্‌রা/হরেকরকমবা)

মানুষকে হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, পুলিশ বন্দুকে নলে স্বাধীন চিন্তাকে বন্ধ করতে চায় রাজনীতি। রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সর্বদা ক্ষমতা দেখাতে চান। মন্ত্রীরা সরকারের টাকায় জনসাধারণের ওপর আঘাত নিয়ে আসে নিজেদের জাহির করেন। কি এই অসঙ্গি, অন্যায়, অত্যাচার ও আঘাতের

অবসান কামনা করেছিলেন। এবং মানুষের সচেতনা জাগরণের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। শোষনহীন, বঞ্চনাহীন ভয়হীন, সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পরিষেবা প্রত্যাশা চেয়েছিলেন কবি সুভাষ।

কবি সমাজে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা প্রত্যক্ষ করেন। এক শ্রেণির মানুষ এই বাংলায় মানুষে গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছেন। গণতন্ত্রের সুবিধা নিয়ে কোনো মানুষ পার্টির শিখরোবান এবং সরকারের মন্ত্রী হয়ে ওঠে। কবি – স্পষ্ট ভাষায় বলেন এরা হলে চোর, জোচ্চোর, খচ্চর ও সাধারণদল। ক্ষমতাবান শাসক ও শোষক শ্রেণির চরিত্র ধরা পড়েছে কবির আলোচ্য গ্রন্থের "ছড়াছড়ি" শীর্ষক ছড়ায়। রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃত্বের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জনসচেতনা জাগাতে কবি লেখেন –"একটি গাধা, একটি খচ্চর/এক ব্যাটা চোর, এক ব্যাটা জোচ্চোর/একজন বাইরে, একজন জেলে/কাকে ভোট দিই কাকে ফেলে।।/দলের হলে আছো, /না হলে তুমি গেছ।।/যে করবে আড়ি।/মাথায় তার বাড়ি।।" ("ছড়াছড়ি"/ হরেকরকমবা) কবি প্রত্যক্ষ করেন যে সে কালের নেতারা প্রজাসাধারণের জন্য কাজ করেননি। তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক, অহংকারী, উদ্ধত ও ভোগ সর্বস্ব। তাদের মধ্যে জনকল্যাণকামী ও জনমুখী মানসের সন্ধান পাননি কবি সুভাষ। তার কথায় — "নেতা হলে পার্টিতে।

পা পড়ে না মাটিতে।।
অথবা "ট্যাকো কড়ি, হাতে দড়ি, মুখে হরি।
অর্থাৎ কিনা, 'যার যা আছে হরণ করি'।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মেধার অভাব, সংঘর্ষ, রক্তপাত, স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার অভাব, রাজনৈতিক আদর্শের অভাব। কবি শাসক বামফ্রন্টের রানৈতিক নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশাভঙ্গ ও আদর্শের চ্যুতি ও সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসফলে ব্যাথিত হয়েছিলেন। সমাজের সর্বত্র কবি লক্ষ্য করেছিলেন বিকার। তাই কবি চড়ায় লিখেছিলেন " কেবল দাঁত খিঁচনো ছাড়া/ কাউকে কীইবা আছে বলার/ আঁটি ফেললেই গজায় চারা/ গাছের খাইকুড়োই তলার।" (দোহাই') রাজনৈতিক আদর্শের অভাব, ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ভন্ডামি, ভোগবিলাশ কবি সুভাষকে মর্মান্তিক আঘাত করতো। মসাজের মানুষকে বিকৃত দেখে কবি সত্য প্রকাশে লেখেন লাটাই থেকে "ঘুড়ি কেটে গেলে কী

থাকে?"। সাধারণতন্ত্রের বুলি আত্তড়িয়ে যে নেতা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে যারা যেতে পারে না, ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা ভোগ বিলাসের গন্ডি পার হতে পারে না, মানুষ হয়েও যারা অবাব, কষ্ট ও দুঃখের সঙ্গ রাখতে বাদ্য হচ্ছেন সেই সমাজের একজচন মানুষ হিসেবে কবি সুভাষ পরিচয় দিতে কষ্ট পান। তাঁর অসংখ্য ছড়ায় জীবনের বিশেষ দর্শনটির আমরা সাক্ষাৎ পাই।

ছড়া-শিল্পে কবি সুভাষ সার্থক। তাঁর প্রচলিত ছড়ার সম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে প্রচলিত কাব্যগুলির ছড়া সংযোজনে। তাঁর 'চিরকুট' (১৯৫০) কাব্যটিতে শিল্পের বিচারে চারটি ছড়া পাই – পারুল বোন, দিয়েন বিয়েন ফুঃ, পারাপার, এক যে ছিল। কবি সুভাষের ফুলফুটুক (১৯৫৭) কাব্যে এই শ্রেণীর রচনা তিনটি। যথা ছি-মন্থর, ফোঁটা, হেঁ-হেঁ আলির ছড়া। তাঁর 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬) গ্রন্থে আমরা এই শ্রেণির সংখ্যা পাই সাত শিল্প ধর্মের নিরিখে সেখানে আমরা পাই সাতটি ছড়া- এ ও তা , বলিহারি, পটলভাঙার পাঁচালী – যাঁর, সর্ষে, পুপের পয়, সিনে মামা, পুপের মা-র গল্প। 'এই ভাই' (১৯৭১) গ্রন্থে এই সংখ্যা চার। যথা- ধরা বাধাঁ, বায়নাক্কা, 'দ্রুতি' ও 'কড়াপাক'। তাঁর 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২) গ্রন্থে এই সংখ্যা অপরিবর্তিত। সেখানে চারটি ছড়া হল – হিংসে, হিোকরী চিকোরী। কথার ঝুড়ি এবং ঠাকুরমার ঝুলি। আলোচ্য প্রসঙ্গ ব্যতিক্রমী গ্রন্থ একটু পা চালিয়ে, ভাই" (১৯৭৯)। এই গ্রন্থটিতে ছড়ার সংখ্যায় পাঠক কখনো কখনো ছড়ার গ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। এই গ্রন্থে ছড়ার সংখ্যা চৌষট্টি। শিল্পের বিচারে এগুলি সার্থক ছড়া। ছড়ার দ্রুত লয়, স্বরাঘাত, ধ্বনি প্রয়োগ ও ছন্দে এগুলি সার্থক ছড়া।

তাঁর 'জল সইতে' ১৯৮১ গ্রন্থের ছড়ার সংখ্যা চারটি যথা – 'মনে পড়ে কি' ছড়াই, একটু আদটু ও বুড়ি ছুঁয়ে। তাঁর 'বাঘ ডেকেছিল' – ১৯৮৫ গ্রন্থে আমরা ছয়টি ছড়া পাই। ছড়াগুলি হল – 'আওনি বাওনি চাওলি, ডোমকানা, যদি বলি, দোহাই, কেদুই তিন, ওবগাফোঁস। কবি সুভাযের যারে কাগজের নৌকো (১৯৮৯) কাব্য গ্রন্থের অন্ততঃ কুড়িটি কবিতা শিল্পের বিচারে ছড়ার শ্রেণিভুক্ত করতে পারি আমরা। সেই কবিতাগুলি হল – গদির মধ্যে যদি, সাতরাজার ধন, কিংবদন্তি, লোকে বলে, ময়দানে, ওঠাপড়া, এক মাকড়সা, দাদামশায়ের বৈঠকখানা, বুমলা, পিক-এ, ষট্‌কে, দূরথেকে, ভাষ্যী পৃথিবী, চিন্তা বিচার, রবি আনন্দ, শিগ্রিশিগ্রি, ভাগ ও হাউজদ্যাট তাঁর 'ধর্মের ফল' (১৯৯১) কাব্য গ্রন্থেও আমরা ছ'টি ছড়া পাই।

যথা-হাত বাড়িয়ে হাঁ করে, তালগাছ, মাথামুন্ডু, ইষ্টিকুটুম,এবং একবারটি খোঁজ নে।তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫) ছড়া-ধর্মের নিরিখে আলোচ্য কাব্য গ্রন্থে আমরা শ্রেণি বিন্যাসে অন্তঃত চৌত্রিশ টি ছড়ার সন্ধান পাই। সেগুলি হল – বই রাখো তাকটায়, নুপূর পায়, বাঁশবনে পাক্‌ড়ে বটের ঝুরি, আমার কাছে লাটাই আর, কবে যে কে লাগিয়েছিল, পরিপাটি করে বাঁধা, জলে ডোবে চারিধার, একদিকে ধান পাকে, কী করে বাড়ে গলার আওয়াজ ফাঁকা ধূ ধু, সাপুড়েরর হাতে ওটা, কেউ হলে দাঁত বসাবে, পাড়া গাঁর বাড়িতে, মাছ ধরা নয়, দাঁড় করিয়ে অটো, দেয়ালে দাদুর ছবি, উড়োজাহাজ হরদম, ঘুমোন উনি, গোফঅলা বাবুটির, সেদিন দেখি চুপি চুপি, খেতে গিয়ে বিয়েবাড়ি, দই ছিল এক কিলো, বাপরে বাপ, মশার ঠেলায় নয় মোটে দূর পথ, বড়দিনে কেক চাই, ঝোপের গায়, ঘুরখুটি আঁধারে, তাকের ওপর কাঁচের শিশি, দিদিভাই রং মেখে ফুটপাথে খোসা দেখে, ওরা ছিল তা সে কালের নতুন বউ, এবং ময়দানে আজ। আলোচ্য ছড়াগুলিতে আমরা কবি সুভাষের শিশুসুলভ মেজাজ, শব্দ বাজনার বৈচিত্র্য, ভাব ও ভাষার বৈচিত্র্য আমরা পাই। তাঁর কাব্য ভাবনার সম্ভার সমৃদ্ধ করেছে অসংখ্য ছড়া। তাঁর ছড়াগুলিতে বিষয় বৈচিত্র্য আমরা পাই। তাঁর মৃত্যুত্তোর প্রকাশিত 'নতুন কবিতার বই' গ্রন্থে ছড়া শীর্ষক মানুষের প্রকৃতি এঁকেছেন তিনি স্বল্প কথায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্য ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্যের সম্ভার সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে বিপুল এবং গুণগত বিচারে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পরূপের অধিকারী। তাঁর বিপুল সম্ভারের গদ্যসাহিত্য, রূপভেদের ভিন্নতার নিরিখে আমরা এই অধ্যায়টিতে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি — ক) গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায় ঃ উপন্যাস খ) গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ রিপোর্টাজ, ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য গদ্য রচনা গ) অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত রচনা। এই অধ্যায়ে আমরা পর্যায় তিনটিতে তাঁর সাহিত্যের প্রকরণের বৈচিত্র্য খোঁজার চেষ্টা করেছি। গদ্য সাহিত্য তাঁর লেখনীতে কতটা স্বচ্ছন্দ গতিতে বাংলা সাহিত্যে কোন্ কোন্ অভিনব মত ও পথের দিশা দিয়েছে আমরা তা এই পর্যায়ে বিশ্লেষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাঁর জীবনের নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে সেই সাহিত্যের অন্বয় দেখার চেষ্টা করেছি। গদ্য সাহিত্যে তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকৃতি, জগৎ-জীবনের ভাবনা, মাননিক চেতনা, জীবনদর্শন এবং জাতীয়তাবোধকে পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি আমরা এই পর্যায় তিনটিতে তাঁর গদ্যসাহিত্যের শিল্পরূপের ভিন্নতার প্রকৃতি যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করেছি।

ক) গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায় : উপন্যাস

উপন্যাস সৃজনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা সীমিত - পাঁচটি। তাঁর প্রথম উপন্যাস হল 'হাংরাস'। ১৯৭৩ সালে সত্যজিৎ রায়কে উৎসর্গ করে কলকাতা বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর তিন বছর পর ১৯৭৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কে কোথায় যায়' প্রকাশিত হয়। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল এই উপন্যাসটি। কলকাতার নবপত্র প্রকাশন থেকে এই উপন্যাসের প্রকাশ হয়েছিল। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস --'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'। ১৯৮৩ সালে সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'কাঁচা-পাকা' ১৯৮৯ সালে আনন্দ পাবলিশার্স

থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ উপন্যাস ‘কমরেড, কথা কও’ পরের বছর ১৯৯০ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পাঁচটির মধ্যে আমরা একজন মহৎ সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন পাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস হাংরাস (১৯৭৩)। উপন্যাসটির রচনার প্রেরণা ও নামকরণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন। একটা উপন্যাস লিখব। বিশ-বাইশ বছর ধরে এটা একটা ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। কেমন করে লিখতে হয় না জানায় লেখবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সত্তর সালের পর অবস্থা বৈগুণ্য ধাক্কা দিয়ে আমাকে জলে ফেলেদিল। ভেসে থাকার জন্যে আমাকে হাত- পা ছুড়তেই হল।কিন্তু তাতে উপন্যাস হল কিনা জানি না। হাংরাস নামটা অনেকের কাছেই একটু খটমটে লেগেছে। লবণ আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরের সে গ্রামবাসীরা কারাকরণ করেছিল, পরে তাদের কাছ থেকেই ধার করে নিয়েছি। এই উপন্যাসটি লেখার কুড়ি-বাইশ বছর আগে থেকে কবিতা দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। যাত্রা শুরু তাঁর পদাতিক দিয়ে (১৯৪০)।

ফলে তাঁর উপন্যাসের শৈল্পিক ধর্মিতা নিয়ে একটা সংশয় মনে রয়েই গেল। একসময় একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন আমার উপন্যাস কতটা উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আমার যথেস্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি নিজেকে হাড়েহাড়ে একজন সাংবাদিক হিসেবে চেনেন। উপন্যাস লেখার সামার্থ সর্ম্পকে তার নিছক ধারণা হাংরাসের কথকের উক্তিতে ধরা পরে। তিনি বলেন - আমার অনেক দিনের শখ একটা উপন্যাস লেখার। কিন্তু আমি মনে মনে জানি, আমাকে দিয়ে হবে না। আসলে আমি হচ্ছি হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক। এর ওর কাছ থেকে ঘটনা, থাকে আমরা সাংবাদিকের ভাষায় বলি স্টোরি বা গল্প, জেনে নিয়ে সে সাজিয়ে গুছিয়ে আমি লিখতে পারি। কিন্তু গল্প মাথা খাটিয়ে বানানোর কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মুশকিল, কিউ কাঁচামাল না যোগালে আমি কিছু তৈরী করতে পারি না। কথক আরো বলে ক্রমে আমি রিপোর্টাজ লিখতে পারছি দেখে বন্দুদের কেউ কেউ বলল, এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও। এখন ভারি এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও।

এখন ভারি এমনও হতে পারে যে, সত্যি গল্পগুলোকে ওরা মেন করেছিল আসলে আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখছি। তাই তার পেছনে শুধু যে উৎসাহ দেওয়ার ভাবছিল তাই নয়, বোধহয় খানিক খোঁচাও ছিল। কথকের বন্দুরা উপন্যাসিদের সম্পর্কে কতগুলো যুক্তি দেখিয়ে এই উপন্যাসে কথক কে উপন্যাস রচনায় নিরুৎসাহিত করে। সেই যুক্তিগুলি হল প্রথম, তুমি তো লিখ না - তুমি দেখে দেখে টুকলিফাই কর। এই টুকলিফাই কথাটা আমার খুব আঁতে বিঁধত কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনি। শুধু তখন নয়া এখনও। দ্বিতীয়ত, তুমি মেয়েমানুষ কী জানলে না। প্রেম করনি। খারাপ পাড়ায় যাওনি।

তার মানে,মানুষ জাতের অর্ধেক যে স্ত্রীলোক এবং মনুষ্য জীবনের অর্ধেক যে দেহমনের মিলন তার তুমি খবর রাখনা। মানুষের তুমি যেটা জাগ, সেটা অর্ধসত্য। কিন্তু উপন্যাসে চাই গোটা সত্য কেননা অর্ধ সত্য জিনিসটা আসলে মিথ্যেরই কারসাজি। বেশ আর তৃতীয়ত , ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, পার্টি, গণসংগঠন ইত্যাদি তোমাদের যা যা আছে, সব জায়গাতেই লোকে দেখায় তাদের একটা দিক। তাদের ভালর দিক। দেখায় শুধু সেইদিক যেদিকটা দেখালে তাদের ভাল হয়। আর চতুর্থত, তোমার ঐ বাংলার লেটার। তুমি সুন্দর সুন্দর কথ বসাতে পার। কিন্তু ডানাকাটা পারি দিয়ে উপন্যাসের হেঁশেল ঠেলী, ছেলেমেয়েদের গুমুত পরিষ্কার করা, বদ্‌লোকদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগানো এসব করা যায় না। পঞ্চমত,--- কিন্তু না, ও পর্যন্ত আর পৌঁছুতে হয়নি। তার আগেই আমার উপন্যাস লেখার বাসনাটা পঞ্চত্ব পেয়েছিল। কথক অরবিন্দর উপন্যাস সম্পর্কে মতামত মূলত লেখক সুভাষেরই উপন্যাসের মতামতের নামান্তর।

অরবিন্দ মেয়েমানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বেশী মেলামেশা করতেন না। কেননা তিনি ছিলেন পার্টির হোলটাইমার। আর সেকালে রাজনীতিতে নারীরা আজকালের মতো ব্যাপক অংশ গ্রহণ করতেন না। পার্টিগণ সংগঠন, কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি তাদের নিজেদের লোকেদের ভালর দিক দেখালে যে উপন্যাসের গোটা সত্য বিস্মিত হয় সে বিষয়ে ঔপন্যাসিক সুভাষ সচেতন ছিলেন। যেহেতু সচেতন শিল্পী তাই উপন্যাসের শিল্পীর নিরপেক্ষতা অটুট রাখার চেষ্টাও করেন। ডানাকাটা পরি দিয়ে যে উপন্যাস ও সমাজের কাজ হয় না তার কথাও লেখক অরবিন্দর মুখে বলেন। এই উন্যাসের সৃষ্টি আনন্দ সর্ম্পকে কথকের ভাবনা লেখকেরই ভাবনার। হাঙ্গার স্ট্রাইকের বন্দী বরুণবাবু বলেন --- সমাজের ব্যাপারে মার্ক্সবাদ ঠিক আছে, সাহিত্যে অচল। সাহিত্য হল সাহিত্য তার আবার উদ্দেশ্য কী? এর জবারে কথক অরবিন্দ বলেন যাকে সৃষ্টি বলি সেও তো একটা কাজ। বা নেই তাকে হওয়ানো। এই তো? কিন্তু কেন? না, আমরা কাজ করে অভাব মেটাই। অভাব মেটানোটা উদ্দেশ্য। পেটের খিদেমেটে কাজে মেনের খিদে মেটে সৃষ্টিতে। ---- উদ্দেশ্য বলতেই উনি সে একটা ঘাড়ে জোয়াল দেওয়ার ভাব মনে আনেন সেটা ঠিক নয়। কিন্তু একটা কিছু তো গড়ে উঠবে? বরুণ বাবুর প্রেরণা কথাটার আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুদ্দেশ প্রেরণা তো হয় না। --- উদ্দেশ্যটা হল সংকল্প। সম্ভাবনা। তাকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত আয়োজন চাই। শুধু বীজ নয়, তার জমি চাই। ছাড়া ছাড়া ভাব হলে চলবে না। আগাগোড়া টেনে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে জাহির করতে চাইলে উদ্দেশ্যই পন্ড হবে। এ শুধু কলকাঠি নাড়ার ব্যাপার নয়। সৃষ্টির মধ্যে চাই প্রাণ। চাই আনন্দ। এই আনন্দ আসলে অহৈতুকী আনন্দ। ভারতীয় কাব্য তত্ত্বে যাকে বলে ব্রহ্মাঃস্বাদ সহোদর।

এই সৃষ্টির আনন্দ সৃষ্টিতে লেখক সুভাষ লেখেন হাংরাস। তাঁর এই উপন্যাস লেখার প্রেক্ষিত তৈরী হয়ত বাংলার মানুষ ও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী আবার সংবাদ পত্রের সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সূত্রে তাঁকে বাংলার মাঠে ঘাটে কলকারখানায় শ্রমিকদের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হত। দারিদ্র্য, শোষিত বঞ্চিত মানুষের সামাজিক বৈচিত্র্য তার রিপোর্টাজগুলির সুতিকাগার। এমন অনেক রিপোর্টাজ আছে যেগুলিতে গল্প ও উপন্যাসের বীজ নিহিত রয়েছে। 'দীপংকরের দেশে', 'কলের কলকাতা,' 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা,' 'বাবর আলির চোখের মতো,' 'একটি অমানুষিক কাহিনী,' 'মরা জালে কুল', 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর' প্রভৃতি রিপোর্টাজগুলির কাহিনী তাঁর একাধিক উপন্যাসের সৃষ্টি বীজ। রিপোর্টাজগুলির পাশাপাশি ফুলফুটুক ও অন্যান্য কাব্যের একাধিক কবিতার ফ্রেমে যে গল্প ও কাহিনী নিয়ে নিখুঁত তুলির টানে সুন্দর ছবি এঁকেছেন, তার মধ্যে লেখক সুভাষের উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি ঘরের ভেতরকার কথা।

কোন শনিবারের ডায়েরী লিখতে বসে অরবিন্দ বলে হাংরাস। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরডিহায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দেলনে ও এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস হাংরাস হ্যাঁ, হাংরাস। পাশে ছিলেন সুরজিৎ বাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিলেন, মানে হাঙ্গার স্ট্রাইক। হাংরাস শব্দটা সেই থেকে আমার মনে গেঁথে আছে । এই মনে গাঁথাটা বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় লেখক সুভাষের জীবনের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত।

গতানুগতিক উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অধ্যায় বিন্যাস রীতি ঔপন্যাসিক সুভাষ এখানে গ্রহণ করেন নি। তিনি সন তারিখহীন শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এভাবে বিভিন্ন বারের নাম দিয়ে আমার কথা এবং বাদশার কথা শীর্ষনাম দিয়ে ডায়েরী লেখার রীতিতে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। হাঙ্গার স্ট্রাইক বা ভুখহরতালের দিনগুলির ডায়েরী, কথক অরবিন্দ বলাই, বংশী কনক প্রমুখ অনোসৈনিক অনশনের দিনগুলিতে জেলের ভেতরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে। তাদের লড়াইয়ের সমান্তরালভাবে লেখক সাজিয়েছেন বাদশার কথা অংশটি বাদশার কথায় জীবনের নানা কথা ও গল্প জেলখানায় বসে অরবিন্দ শোনে। বাদশা তাকে বলে- যখন বললেন আমার জীবনের গল্প শুনবেন আমার তখন একদিকে লজ্জা হচ্ছিল, অন্যদিকে লোভ হচ্ছিল। আমি একজন লোহা কাটা মজুর, আমার আর কী এমন কথা থাকতে পারে যে লোক ডেকে বলা যায়। ---- আমার লোভ হলো, বলতে গিয়ে পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে পাওয়া যাবে

৩

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কথক অরবিন্দ ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতা বাদশা। এই চরিত্র দুটি তাদের আত্মকথনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাস্তব সত্য উত্থাপন করেছেন। এদের আত্মকথায় উঠে এসেছে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকের অপশাসন অত্যাচার, নিপীড়ন। উঠে এসেছে রবীন্দ্র নাথ সম্পর্কে তৎকালীন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিশীল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা, জেলখানার ভেতরে ও বাইরে সমাজতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট মতাদর্শে উদ্দীপ্ত শ্রেণী সংগ্রাম এসেছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ছবি। এই উপন্যাসে এসেছে লেখকের জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি বদলের আভাস ও তার প্রতিক্রিয়া। এসেছে বাস্তব সত্য ও জগৎ সত্যের সঙ্গে সংগ্রামীদের নীতিগত আত্মবিরোধের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। এসেছে শৈশবচেতনা ও পস্তুতি চেতনা। এসেছে জাহাজ যাত্রার অভিজ্ঞতা, কারখানার শ্রমিকদের বাস্তব জীবনসত্য। এসেছে বাংলার হতদরিদ্র মানুষের প্রতি লেখকের সহমর্মিতা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত বিভিন্ন উপমা ও আটপৌরে মুখের ভাষায় স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে এই উপন্যাসে এসেছে আবদুলের পকেটমার হওয়ার গল্প।

উপন্যাসের কথক অরবিন্দ আত্মপরিচয়ে বলে- আমার পিতা শিবকালী দেবশর্মা পিতামহ --- গুরুদাস দেবশর্মন। কথক আত্ম বিশ্লেষণে বলে - যে অন্যদের জানে সে চতুর, যে নিজেকে জানে সে চক্ষুষ্মান। যে অন্যদের পরাস্ত করে, তার জোর আছে। যে নিজেকে জয় করে, সে শক্তিমান। কথক নিজেকে জানার জন্য আমার কথা শীর্ষক অধ্যায় গুলিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে স্বখাদ সলিলে এগিয়ে চলে। সেই পথ চলায় আমরা পরিচয় পাই লেখক উপন্যাসের বাস্তবতা, তাঁর জীবনদর্শন, সংলাপ - ভাষা ও চরিত্র সৃজনের বিচক্ষণ অর্ন্তদৃষ্টি।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় বিপ্লবের এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। বিপ্লব অর্থে হাঙ্গার স্ট্রাইক। এর জন্য কথক আছে আট নম্বর সেলে। সংগ্রাম করতে করতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের লাশগুলো মর্গে নিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত কথক ও তার বন্ধুদের দেখাতে আনা হয়েছিল। কথক বলে -- খাটিয়াগুলো একে একে নামাল। তারপর তুলে নিয়ে গেল। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। কনকের মুখটা শিউলি ফুলের বোঁটার মতো হলুদ। বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ভগ্নাবশেষ ছিল বলেই বোধহয় আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু ভুলো মাৎ স্লোগানে সারা জেলখানা আমরা কাঁপিয়ে তুললাম। তারপর আমরা যে যার সেলে ফিরে গিয়েছিলাম। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল শরীর। কাল সারাদিন ন্যাতার মতো ঘুমিয়েছি। উপন্যাসের গোড়াতেই জেলের পরিবেশের পরিচয় রয়েছে। অরবিন্দর কথায় -- পুরো ঘটনা এখনও আমরা জানিনা। ওয়ার্ডগুলো একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। তার ওপর

আমাদেরটা একেবারে একপাশে। ওয়ার্ডগুলোর পাশ দিয়ে গেছে টানা রাস্তা। তার একটা দিকে ইউ-টি ওয়ার্ডে ঢোকার গেট, আর পশ্চিম গেটটা পেরোলে পামেলা এভিনিউ, আর একটা দিকে জেল আপিস, অন্যদিকে ঘড়িঘর। পরদিনের ঘটনার ঝটিকাকেন্দ্র ছিল এই পশ্চিম ফটক। -- কাল থেকে অনশন শুরু হবে, এটা আগে থেকে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু অন্য জেলে গুলি চলেছে, এ খবরটা পরশুর আগের দিনই লোকমুখে আমাদের কানে এসেছিল। এ-জেলের কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ করে খবরটা চাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। পরশু সকালে মিটিং করে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সন্ধেবেলা আমরা লক-আপ করতে দেব না। লক-আপ হতে না চাওয়া জেল কানুনে সাংঘাতিক অপরাধ। আমরা জানতাম, ওরা জোর খাটাবে ওরাও জানত, আমরা বাধা দেব। দুপুরের পর থেকেই আমাদের এ তল্লাট থেকে সেপাইরা সব হাওয়া। রান্নাবান্না সমেত বিকেলে ফালতুদেরও বিদায় করে দেওয়া হল। বোঝা যাচ্ছিল, গোলমাল বেশ ভালরকম ভাবেই লাগবে। জেলের এই সংগ্রামের মধ্যে কথকের যে চরিত্রটির জন্য খুব কষ্ট হয় তিনি তার দাদু। কথক বলে ভয়ে মুখ শুকিয়ে খোঁড়া পায়ে দাদু আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সশস্ত্র পুলিশ জেলখানাটাকে ঘিরে রয়েছে -- দাদু নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছিলেন। দাদুর কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল্ল। অরবিন্দদের মধ্যে সবথেকে কনিষ্ঠ সংগ্রামী কনক। সে কলেজে পড়ে। ধরা পড়ে সে এই জেলে এসেছে মাস দুয়েক আগে। তার মিষ্টি মায়াবী মুখ। হালি শহরের এই কনকের কথায় কথকের নিজের শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে ঐ বয়সে আমিও ওর মত ভিতু ছিলাম। আকাশে কড়কড় করে মেঘ ডাকলে ভয় পেতাম। অন্ধকারে ছিল পোকামাকড়ের ভয়। আস্তে আস্তে বুঝেছি, ভয়ের কথা যত ভাবা যায় ভয় তত পেয়ে বসে। আসলে ঝড়জলে ঘরের বাইরে থাকলেই যে মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে কিংবা অন্ধকারে পা বাড়ালেই সাপে ছোবল দেবে তার কোন মানে নেই। ভয়কে আমি অনেকটা গা-সত্তয়া করেছি। ভয় পেয়ে পেয়ে। সংগ্রামের মধ্যে চলতে চলতেই নিজেকে জানার ও চেনার চেষ্টা করে কথক। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে তারা বোতল গ্লাস ও ইটপাথর সিঁড়ির মুখে মজুত করে। এবং মনে মনে বলে, ভয়ের মত সাহস জিনিসটাও যে ছোঁয়াচে, ছুটে ছুটে লোহার খাট টানতে টানতে বার বার কথাটা মনে হচ্ছিল। নাকি ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম এবং ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ ভয়ের কিছু ছিল না বলেই নিজেকে আমার সাহসী বলে মনে হয়েছিল? নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করা, এটা আমার হালে শুরু হয়েছে। সেসময় জেলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কথকের অন্তর্জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। সে বলে আগে থেকেই মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম যে, আমাকে যদি বলতে বলে তাহলে রবি ঠাকুরকে আচ্ছা করে তুড়ুং ঠুকে দেব। রবি ঠাকুর বুর্জোয়া। আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। বলব বলে বাছা

বাছা কিছু শব্দ আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম । ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে বলেই জানতাম। দেখলাম ধুনোর গন্ধে মাথায় ভূতও চাপে। একেবারে গোড়াতেই যে আমার ডাক পড়বে আমি জানতাম না। দাঁড়িয়ে উঠতেই আমার মগজের সাজানো কথাগুলো সব উল্টে গেল। --- তারপর কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল। --- তবু সেদিন আমার একটুও ভয় করেনি। তার কিছুদিনের মধ্যেই রবি ঠাকুর সম্পর্কে বাইরে থেকে আমাদের পার্টি লাইন এসে গেল। পড়ে সেদিন আমার কী যে আত্মগ্লানি হল বলার নয়।সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমার ভয় এ নয় যে, কমরেডরা এবার আমাকে এক হাত নেবে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। আমি মার্ক্সবাদ এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি বলে। আমি এখনও পেটি বুর্জোয়া থেকে গিয়েছি বলে। তাঁর এই চারিত্রিক দ্বন্দ্ব এসেছে জীবনের পোড়া থেকে আমি বুঝতে পারছি আমার সমস্ত ভুলের গোড়ায় আমার জন্ম।আর আমার সমস্ত দুর্বলতার মূলে আমার দাদু।

জেলের লড়াইয়ের সেনাপতি ছিল বলাই। তাকে বলা হত অনোসেনাপতি। আর যারা সৈনিক তাদের বলা হয় অনোসৈনিক। অনোসৈনিকদের মধ্যে সাতনম্বরে ছিল নিতাই সর্দার , বড় শৈল, ছোট শৈল, তার নম্বর জেলে শ্রমিক আন্দোলনের কাঞ্চন, বংশী, ছাত্র আন্দোলনের কর্ণক, অরবিন্দ, শ্রমিক নেতা শিবপুরের বাদশা, গৌরহরি, শঙ্কর, কালীপদ, আবদুল, বরুণবাবু মুরারীবাবু প্রমুখ। এঁদের আন্দোলনের প্রকৃতি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত আন্দোলন লেখকের বর্ণনায় ছবির মতো অঙ্কনরূপ পেয়েছে। লেখকের ভাষায় আন্দোলনকারীদের সংগ্রামের অভিনব কৌশলের সুন্দর বর্ণনা আমরা এই উপন্যাসে পাই। সংগ্রামের বর্ণনা পাই। ঔপন্যাসিক সংগ্রাম জীবনের খুঁটিয়ে দেখা ছোট ছোট বিষয়কে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সংগ্রামীদের সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। কথককে বাদশা বলেন, কিন্তু সে আপনি যাই বলুন, এই না খেয়ে থাকা এ আবার কী? আপনারা পারেন। আপনাদের পেটের খোল ছোট। কষ্ট আমাদের। মাঝে মাঝে মনে হয়, ধ্যুৎ! কী দরকার এসব করার। তার চেয়ে সব ভেঙে ভেস্তে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাই। --- চলুক। দেখা যাক কোথায় এর শেষ। আমি বলি, পড়েছি পার্টির হাতে খানা খেতে হবে সাথে। এখন তো পেটে কিল মেরে বসে থাকি, খাবার হলে সবাই একসঙ্গে খাব। এই উক্তির মধ্যে সংগ্রামী শ্রমিক নেতা বাদশার হাংগার স্ট্রাইকে পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিপাক একটি শারীরিক প্রক্রিয়া। এ সত্য বিজ্ঞানের সত্য। একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কোন তত্ত্ব বা রাজনীতি তার উর্দ্ধে নয়। কথকের একসময় মনে হয়েছে দুনিয়ায় পেটই তো সব। হাংগার স্ট্রাইক চালানোর সময় কথক অরবিন্দর মনে হয় আমি ওদের সঙ্গে লড়িনি, লড়েছিলাম নিজের সঙ্গে একেবারে দাঁতে দাঁত

দিয়ে। মনের জোরে পেরেছিলাম। হেরে গেলাম গায়ের জোরে। বিছানায় ঠেসে ধরে নাকের ভেতর দিয়ে যখন নল চালিয়ে দিল, তখন আর করবার কিছু থাকল না। শুনেছি নাক দিয়ে ওরা যেটা খাওয়ায় তাতে দুধের সঙ্গে নাকি ডিম থাকে। আর তাতে নাকি ব্র্যান্ডিও থাকে। চোখ বন্ধ করে ছিলাম। একটা ফিডিং কাপে করে ফানেলে দুধ ঢালবার শব্দ। তখনও মন একেবারে ফাঁকা। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ক্লান্ত। হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার ঘটছে বলে মনে হল। একটা নির্জন খাঁ খাঁ করা জায়গা হঠাৎ যেন জনকণ্ঠে প্রাণের সাড়া পেয়ে সরগরম হয়ে উঠছে। আর জিভ বঞ্চিত হলেও সারা শরীর তারিয়ে তারিয়ে তাই আস্বাদন করছে। ফোর্সফিডিং করালে অনশনকারীদের পেটের ভেতরে যে ক্রিয়া করে তা লেখকের কথায় অনির্বচনীয়। অনাহার ক্লিস্ট শরীরে এই ফোর্স ফিডিং প্রাণের সাড়া জাগায়। এখানে রাজনৈতিক যে কোন তত্ত্বের উর্দ্ধে জীবন ও জগৎ সত্য বাস্তবরূপ পেয়েছে। এতে শরীর তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করে। জীবন ও জগতের বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে শিল্পরূপ পেয়েছে। এতে সংগ্রামের সঙ্গে শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরোধ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে সংগ্রামীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখানে ব্যক্তির সঙ্গে তার অন্তর্সত্তার দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির জীবনের মতাদর্শের মিল থেকে লড়াইএ অংশ গ্রহণ। পার্টির নির্দেশ ও মতাদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলেই কথক জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছে। এই লড়াই-এর ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে নিজেই সংগ্রামী আরও ভিন্ন এক লড়াই করে থাকেন। সেই স্বতন্ত্র লড়াই - এর স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। তিনি কথকের একটি উক্তিতে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্ট করে তোলেন। কথক মনে মনে ভাবে ---- তার চেয়েও ঢের বিশ্রী একটা চিন্তার মধ্যে যেন পা পিছলে পড়ে গেলাম -- এই ভাবে জেলে পচে মরার কী মানে হয়? আমি যদি হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই, তাহলেই যে লড়াই ভেস্তে যাবে তা তো নয়। বলাইদা আছে, বাদশা আছে ওরা ঠিক শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে পার্টিকে বলব আমি আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে চাই। যদি বলে ব্যারিকেড করে লড়াই করো, তাও করব। আমি শুধু চাই এই দম আটকানো জেলখানা থেকে বেরোতে, না খেয়ে তিলে তিলে মরবার হাত থেকে বাঁচতে। নিজে বাঁচার অর্থ পার্টির শৃঙ্খলা নস্ট করা নয়। কথক নিজেকে বাঁচিয়ে পার্টির হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। শুধু হাঙ্গার স্ট্রাইকের পথ ও মত কে বদলাবার বিরোধ নিজের অন্তর্মানসে উপলব্ধি করছেন কথক। সেই অনশন সংগ্রামের শরিক হয়েও তার মনে হয় এবার বেরিয়েই কী কী খাব। রয়ালের চাপ। আমজাদিয়ার মোরগমসল্লা। মোল্লারচকের দই। বাগবাজারের, উচ্ছ রসগোল্লা নয় -- তেলে ভাজী। বড়বাজারের হিং

দেওয়া কচুরি। নারকোলের দুধে রান্না ভাত। নারকোলের মালার ভেতর পুরে, ওপরে মাটি দিয়ে বন্ধ করে উনুনের তলায় রেখে দিয়ে গুমসো আঁচে ঝল্‌সানো চিংড়ি। জেলের ভেতরে হাঙ্গার স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় খাবার প্রসঙ্গে মনে পড়ে পাইকপাড়ার কাকিমাকে। মনে পড়ে পাইকপাড়ার সেই কাকিমা, আমি জেলে আসার আগে অনেকবার খবর পাঠিয়েছিলেন যে, এক রবিবারে গিয়ে তাঁর হাতের রান্না যেন খেয়ে আসি। রান্না বলতে চিংড়িমাছের ঝোল। পাইক পাড়ার কাকিমা যে যুব ভাল রাঁধিয়ে তা নয়। কিন্তু ঐ ঝোল রান্নায় তাঁর জুড়ি নেই। জেলের ভেতর এই স্মৃতি রোমন্থনে সংগ্রামী সত্তার সঙ্গে তাঁর অর্ধচেতন মনের ও নির্জ্ঞান মনের একটা পার্থক্য রয়েছে। সংগ্রামের নীতি অনশন কিন্তু মনের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার ও ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

এই উপন্যাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাঙ্গার স্ট্রাইকের সংগ্রামীদের লড়াইয়ের ছবি বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকের ন্যায় নিপুণ হাতে অঙ্কন করেছেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের প্রকৃতি ঔপন্যাসিক যেভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা হল - প্রথমত: হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময়কে যেন ভুলেও কোনরকম খাবার দাবারের কথা না বলে। খাবারের কথা মনে হলে তক্ষুণি অন্য কথা ভাবতে হবে। দ্বিতীয়ত: অনশন হল লড়াই তবে খোলা ময়দান আর বন্ধ জেলখানা, এ দুটো এক নয় লড়াইয়ের অস্ত্র তো বটেই, লড়াইয়ের ধরণও আলাদা। তৃতীয়ত: হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় খুব ধীরে সুস্থে ওঠা হাঁটা করা দরকার। নইলে বুক ধড়ফড় করে। চতুর্থত: অনশনের সময় হালকা বই পড়া উচিত। তাস চলবে। দাবা নয়। সংগ্রামীদের বলাইদার মুখে তাদের প্রতি নির্দেশগুলি অধিকাংশ বলানো হয়েছে। বলাইয়ের মুখে এগুলি সুন্দরভাবে মানিয়েছে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে আছে লেখকের বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠার অভিজ্ঞতার পরিচয়।

এই উপন্যাসে আমরা লেখকের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জীবনের সঞ্চয়কে শিল্প রূপে পাই। এটি কারা উপন্যাস নয়। তথাপি এ উপন্যাস পরাধীন ভারতবাসীর সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও বুর্জোয়া সমাজের প্রতিপত্তির প্রতি আঘাত আনার সংগ্রাম। এই লড়াই উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় লেখক উপন্যাসের শুরুতেই লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়ে লিখছেন - সকাল থেকে অনশন শুরু হবে, এটা আগে থেকে ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু অন্য জেলে গুলি চলেছে এখবরটা পরশুর আগের দিনই লোকমুখে আমাদের কানে এসেছিল। এ জেলের কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ করে খবরটা চাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। পরও সালে মিটিং করে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সন্ধেবেলা আমরা লক আপ করতে দেব না। লক আপ হতে না চাওয়া জেল কানুনে সংঘাতিক

অপরাধ আমরা জানতাম, ওরা জোর খাটাবে। ওরাও জানত আমরা বাধা দেব বিপ্লবীদের বাধাদান বিষয়টির মধ্যে সে সময় সাহস ও শক্তির

পরিচায়ক একটা রাতের লড়াইয়ের বর্ণনায় উপন্যাসিক লিখেছেন -- পরশু আমাদের লড়াইটা ছিল শুধু রাতটুকুর জন্যে। একটা রাত্তির যদি কোন রকমে লক আপ এড়ানো যায়, তাহলে সরকারের বোঁতা মুখ আমরা ভোঁতা করে দিতে পারব। বিপ্লবী জেলের ওর্য়াডে, ওয়ার্ডে লড়াই করছে। এই বিপ্লবের জন্য এক রাতে তারা জেলের লোহার খাটগুলি টেনে টেনে নিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করে। এ সময় রাস্তায় কারা যেন খ্যাপা কুকুরের মত একবার এদিক একবার ওদিক করছেন আমাদের মা বাপ তুলে বিশ্রী রকমের সব মুখ খারাপ করেছে। ওরা কি ভাবছে ওদের গালাগাল শুনে রেগে খালি হাতে বেরিয়ে গিয়ে আমরা ওদের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেব একবার করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের দরজায় ওরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে বাজিয়ে দেখে গেল আমাদের ব্যারিকেডগুলো কতটা মজবুত। বিপ্লবীরা সরকারের সঙ্গে লড়াই ও প্রতিরোধ করার জন্য কয়েকটি দল করে নেয়। ঠিক হয় পেছন থেকে একদল হাতিয়ার যোগাবে আর একদল সামনে ওগুলো ছুঁড়বে। এভাবে একদল হাঁপিয়ে পড়লে বা জখম হলে আর একদল তাদের জায়গায় আসবে। যারা জখম হবে তাদের জায়গায় আসবে। যারা জখম হবে তাদের সেবা শুশ্রূষায় জন্য থাকবে বিশেষ টিম। সে দলের মধ্যে থাকবে দুটো টর্চ, দু-বান্ডিল তুলো, ছেঁড়া ধুতি এবং টিংচার আইডিনের শিশি। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে দমাদম ঠাস্-স-স করে দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে আসে। এরপর ঝনঝন করে দুড়দাড়িয়ে লোহার খাট উল্টে ফেলার শব্দ হয়। এরপর সাত নম্বর থেকে বাজখাঁই গলায় নিতাই সর্দার চেঁচিয়ে বলে -- কমরেড, চার নম্বরের দরজা ভেঙে ফেলেছে, হুঁশিয়ার থাকুন। আর চার নম্বরের কমরেডরা সমানে শ্লোগান দেয়। স্লোগান থেমে যাওয়ার পর ঠুঁ-ই-ঠাঁ-ই-ঠুঁ-ই-ঠাঁ-ই করে ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। তারপর আবার স্লোগান তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। এরপরই পর পর করেকটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ। এদিকে সাত নম্বর থেকে চেঁচিয়ে বলে - ওরা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে, কমরেড। ড্রামের জল মেঝেতে ঢেলে দিন। সঙ্গে সঙ্গে যে-কথা সেই কাজ। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার জন্য প্রচন্ড ঝাঁঝ বিপ্লবীদের নাকে মুখে চোখে এসে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এর মোকাবিলার জন্য বিপ্লবীরা আগে থেকেই যে মার রুমাল ভিজিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় ইউটি ওয়ার্ডের ছাদ থেকে হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো এসে পড়তেই বাদশা বলে উঠল শুয়ে পড়ুন কমরেড শুয়ে পড়ুন। ভিজে জবজবে হয়ে আছে বারান্দা । তারই ওপর উপুড় হয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে তিনতলার বারান্দার জলে লেগে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ল। দু এক

রাউন্ড ছোঁড়ার পরই ওরা বুঝেছে, ইউ-টি ওয়ার্ডের ছাদ থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ে খুব একটা সুবিধে করা যাবে না। জুতোর আওয়াজ শুনে আমরা বুঝলাম ছাদে ওঠার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওরা আস্তে আস্তে নামছে। যেটুকু টিয়ার গ্যাস ওরা ছুঁড়েছে, তার ঠেলাতেই তখন আমরা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আছি। সেই সঙ্গে কান খাড়া করে রয়েছি, এবার ওরা কোথা দিয়ে কোথায় যায় সেটা ওদের পায়ের শব্দে বোঝবার জন্যে। লেফট্-রাইট লেফট্ রাইট করতে করতে মচ্ মচ্ শব্দে একটা দল ক্রমশ গেটের দিকে এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই শব্দ গেটের কাছে একই রকমের আরেকটা শব্দের সঙ্গে যোগ হল। তারপরে দুটোই ক্ষীণ হতে হতে একই সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেল। আমরা যারা কান খাড়া করে ছিলাম, সবাই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম ওরা চলে গেল। আসলে আমরা সবাই কিন্তু মনে মনে বলতে চাইছিলাম -- ওরা হেরে গেল। এই লড়াইয়ের সময় বিপ্লবীদের লড়াইয়ের অন্য অস্ত্রটি ছিল অনশন। সে সময় আজ আমাদের অনশনের চারদিন। না, চার রাত তিন দিন। হিসেবের দিক দিয়ে এবার সব উল্টে পাল্টে গেছে। সাধারণত গোড়ার বাহাত্তর ঘন্টা খিদেয় ভোঁচকানি লাগে। এবার সব উল্টো। খিদে যেন দিন দিন বাড়ছে। উঠে উঠে বার বার ঢক ঢক করে জল খাচ্ছি। সেই সঙ্গে একটু করে নুন। এভাবে তারা নজের শরীরের সঙ্গে লড়াই করে। ভেতরের খিদেটাকে চাপা দিয়ে লড়াই চালায়। শিল্পে সত্য হয়ে উঠেছে।

এই অনশনের লড়াইয়ে সব বিপ্লবীরাই যে সমানভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তা নয়, মাঝপথে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে খান্তও দিয়েছে, তখন অন্য বিপ্লবীরা তাকে বিশেষভাবে আঘাত করে আবার উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। লেখকের ভাষায় -- আবার অনশন চলতে চলতে ভাঙবার লোকও থাকে। লক-আপের পর ঘরে ঘরে স্ট্রেচার এলেই বুঝতে হবে হাসপাতেলে যাচ্ছে নির্ঘাত হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙতে। আশপাশের জেল থেকে কমরেডরা তাদের দিকে থুথু ছিটোয়, মা বাপ তুলে গাল দেয়। কমরেডদের গলা শুনে শেষ পর্যন্ত মনে জোর এনে স্ট্রেচার ফিরিয়ে দিয়েছে এমনও অনেকে আছে। অনশন ভেঙে দিয়ে পরে আবার মুখ চুন করে ওয়ার্ডে ফিরে এসেছে, পরের যার বীরবিক্রমে শেষ পর্যন্ত অনশন করেছে, এ রকম হয়েছে চাষী মজুর কমরেডদের মধ্যেই বেশী। অনশন সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় আলোয় ঔপন্যাসিক পদাতিক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন - জেলে বন্দী অনশন কারীদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবনেন্দ্রিয় অধিক ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন সে সময় সংগ্রামীরা আওয়াজ শুনে বিরোধী শক্তির গতিবিধি বুঝতে সক্ষম হন। তারা কানে অনেক বেশী শোনেন - দূরের খাঁটিনাটি আওয়াজগুলো পর্যন্ত কানে আসছে। এসময় প্রশাসন নানাভাবে অনশন ভাঙার চেষ্টা চালায়।

জীবনের প্রতি মমতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য গামোফোনে পরিকল্পিত গান শোনায়। এ সময় সংগ্রামীরা নিজের শরীর ও মনের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। লড়াই চলে নিজের সঙ্গে নিজের। সেই সঙ্গে সহ সংগ্রামী কেউ সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে লাথি মেরে নাকে খৎ দিয়ে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবার লড়াই চালাতে হয়। প্রশাসন থেকে নাকে নল ঢুকিয়ে ফোর্স ফিডিং করাতে এলে বিপ্লবীরা তাতে প্রচন্ড বাধা দেয়। সরকার পক্ষ থেকে জেলকমিটির সঙ্গে বিপ্লবীদের শক্তি খর্ব করে দিতে চেষ্টা করে। খুঁচিয়ে আশা জাগিয়ে, আবার সে আশায় ছাই দিয়ে তাদের মনোবল ভাঙতে কৌশল করে। কিন্তু বিপ্লবীরা আত্মশক্তি বাড়ানোর কৌশল নেয়। লেখক অনশনকারীদের একটা উপমা দিয়ে সংগ্রামীশক্তি ও প্রাণশক্তির জোর সম্পর্কে এক ধরণের প্রাণীর কথা লিখেছেন যে বছরের পর বছর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তিনি লিখেছেন - মাকড়সার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক রকমের খুব খুদে প্রাণী আছে, তারা বছরের পর বছর না খেয়ে থাকতে পারে। লোকে এদের অনেক সময় বলে জলভল্লুক, এদের আসল নাম টার্ডিগ্রাডা। এদের স্বভাব স্যাঁৎ স্যাঁতে জলো আবহাওযায় থাকে। কিন্তু কোনো কারণে যদি আবহাওয়া বদলে শুকনো খটখটে হয়, তাহলে এরাও একেবারে শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে এদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর শরীর পাকিয়ে গিয়ে শুঁটকো বীচির মত দশা হয়।

এই অবস্থায় তারা বছরের পর বছর থাকবে। বাইরে থেকে দেখে সবাই ভাবে মরে গেছে। কিন্তু একবার জল পাক, অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠবে। গায়ের মধ্যে কোথাও আর কোঁচকানো ভাব থাকবে না। পাগুলো টান টান হবে। তারপর আস্তে আস্তে ওরা চলতে আরম্ভ করবে। এক ঘন্টার মধ্যেই ওরা হয়ে যাবে আবার যে কে সেই। কাজ কর্ম, হাঁটাহাঁটি সব ঠিক সেই আগের মত। মাকড়সার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই খুদে প্রাণীর কাছ থেকে ঔপন্যাসিক লড়াইয়ের জীবনীশক্তি আহরণ করার কথা লিখেছেন। এই হাঙ্গার স্ট্রাইকের মধ্যে আছে মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের ভাবনা। এই লড়াইয়ের বর্ণনায় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের পার্টির কর্মসূচী পালনের নিষ্ঠা, আছে ব্যক্তি জীবনের জেলে থাকার বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাস্তব সত্যের সঙ্গে হাঙ্গার স্ট্রাইকের বর্ণনায় লেখক পারস্পর্য ও সাজুয্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি জীবনের মানুষটির সঙ্গে তার শিল্পী সত্তার মেলবন্ধন ঘটেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের সহ যোদ্ধা ঔপন্যাসিকের তথা কথকের সঙ্গে জেলে পরিচয় বাদশার। এই সংগ্রামের জেলজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাদশার জীবন অঙ্কন। বাদশার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার মধ্যে সমান্তরালভাবে আমার কথা শীর্ষক পরিচ্ছেদগুলিতে ঔপন্যাসিক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে ব্যক্তি জীবনের উর্দ্ধে, পার্টির উর্দ্ধে শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লেখকের জবাব -- এ পর্যন্ত বাদশা এমন কিছু বলেনি, যাতে আমার বন্ধুদের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় - বাদশা অর্ধসত্যের বেশি কিছু বলেছে মেয়ে মানুষ একদম বাদ। কখনও কখনও মনে হয়েছে জিজ্ঞেস করি। যদি থাকেও ও কেন আমাকে বলতে যাবে? আমি ওর এমন কিছু প্রাণের বন্ধু নই। তার ওপর আগে হলেও কথা ছিল। বাদশা এখন নেতা। যারা নেতা হয় তারা কখনো নিজেদের দোষ দুর্বলতার কথা বলে না। বারে কিংবা শুঁড়ি খানায় যায় না। খারাপ জায়গায় যেতে পারে না। তাতে লোকের চোখে, শুধু নিজেরা নয়, পার্টিকেও ছোট হতে হয়। আমাদের পার্টিতে যারা গল্প কবিতা লেখে, তাদেরও তাই খাড়া গুঁজে লিখে যেতে হয় কেবল বীর বিপ্লবী আর সাধুসচ্চরিত্রদের কথা। যারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা বুর্জোয়া যারা মাতাল, যারা পুলিশে কাজ করে এমনকী যারা অন্য পার্টির লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুধু নিন্দনীয় হলে কথা ছিল। সেটা হবে সন্দেহ জনক। ঞ্জ এতে শিল্পীর দায়বদ্ধতা, শিল্পধর্ম ও জীবন দর্শন একটি বন্ধনে রসমূর্তি ধারণ করে।

এই উপন্যাসের দুটি জীবন সমান্তরাল ভাবে বেড়ে উঠেছে। কথক অরবিন্দ ও বাদশার শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবন বেড়ে ওঠার টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে হাংরাস। এতে দুটি চরিত্রের সামগ্রিক জীবনের পাশাপাশি নানা ঘটনার শিল্প রূপ দান করার মধ্যে ছোট ছোট আলোড়ন ধর্মী ঘটনা পাঠকের বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কাহিনীর পরিপূরক উপকাহিনীর ন্যায় ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের উৎগীরণ দেখা দিয়েছে। এই উপন্যাসের অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বাদশা। অরবিন্দের তেল মাখার অভ্যাস নেই। জেলের গেলে বন্দীরা যাদের গায়ে তেল মাখার অভ্যাস আছে, তারা একে অন্যের নয়তো নিজে নিজে তেল মাখছো অরবিন্দের নিজে নিজে পায়ে তেল ডলতে দেখে বাদশার আর্বিভাব। বাদশার বাড়ি শিবপুরে। সে অরবিন্দকে কোড়ন কেটে বলে নিজের পায়ে ভাল করে তেল দিন, দাদা লক্ষণ ভাল নয়। সে ভারী মজা করে কথা বলে। গোড়ায় গোড়ায় সে খুব লাজুক ছিল। ওর চলায় বলায় আড় ভেঙেছে জেল কমিটিতে যাওয়ার পর। তার এই লাজুক স্বভাবের সঙ্গে লেখকের শৈশবের স্বভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাদশার ঠাকুর্দা এব্রাহিম মন্ডল। রিপুর কাজ করত। ঠাকুর্দাকে সে দেখেনি। তার বা জানের কাছে থেকে ঠাকুদার নানা গল্প শুনেছে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেলাই করে বেড়াতেন। খুব ভালো কাজ জানতেন না। বোকাসোকা ভালমানুষ ছিলেন। তার সুযোগ নিয়ে লোকে ঠকিয়েছেও প্রচুর। বাদ্‌শার পিতার স্মৃতিচারণে শৈশবের দারিদ্র পীড়িত পরিবারের অসহায় ছবি আমরা পাই। এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রাম লেখকের শিল্পী মনের দরদ দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে। বাদ্‌শার বাবা তারে মিঞার উক্তি -- বাবার ছিল

গোলপাতার ঘর। বর্ষার সময় জল পড়ত। ঠেলাগোঁজা করে কোনরকমে চলছিল। একবার ঝড় এসে মাথার চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন আমাদের কী কষ্ট। তখন শীতের সময়। রাত্তিরে আমরা জেগে বসে ঠকঠক করে কাঁপতাম। বাবা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকত। যাতে বাবার বুকের গরমে আমি একটু আরাম পাই। আরাম হত না ছাই। বাবা বুঝত না, টস্‌টস্‌ করে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াত। আর আমার গা ভিজে গিয়ে আরও বেশি গা সিরসির করত । আমার মা গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দিত । কখনও যেত রেললাইনে কয়লা কুড়োতে । বাছতে গিয়ে ভেতরের গরম কয়লায় প্রায়ই মার হাতে ছ্যাঁকা লেগে যেত। ফোস্কা পড়ত। পাড়ার লোকে তাই নিয়ে বাবাকে টিটকিরি দিত। এব্রাহিমের বউ এই যে বাইরে বাইরে ধিঙ্গি হয়ে বেড়ায় এটা ভাল নয়। মুসলমান পাড়ার এতে বদনাম হয়। বলত কে? না পাড়ার মোড়ল। আমাদের ঘর ভিটে ছাড়াও পূর্বপুরুষদের দু-টুকরো জমি ছিল। তা দশ বারো কাঠা হবে। বাবা জানত না। ঐ মোড়ল ব্যাটাই এতদিন তা মেরে খাচ্ছিল। বাদশাকে তিনি বলতেন,-- ছেলেবেলায় আমার সে কী কষ্টে মানুষ হয়েছি তোরা বুঝবিনে। রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে মনে মনে জেকের করতাম হায় আল্লা বড় হয়ে বাপের দুক্ষু যেন ঘোচাতে পারি। এই যে আমি মুখ্যু রয়ে গেলাম, সেকি আর এমনি এমনি? আমার যখন আট ন-বছর বয়েস, তখন আমি এক রসিলে কাজ নেই। রোজ যেতে আসতে ষোল - আঠারো মাইল। এই পুরো রাস্তাটা আমাকে হাটতে হত। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মোড়লরা অন্যায়ভাবে সাধারণের জমি-জায়গা ভোগ করত। চরম দারিদ্র্যে অস্বাভাবিক কায়িক শ্রমে দিনপাত করতে হত তাদের। বাঁচার জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার বর্ণনায় লেখকের দরদ ও সহমর্মিতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। সন্তানের জন্য দারিদ্র পিতার স্নেহের দুর্গ, পিতার দুক্ষু ঘোচাতে সন্তানের মুখ্যু হয়ে শৈশবে রশিকলে কাজ নেওয়ার বর্ণনায় লেখকের সমাজ বাস্তবতা ও সমাজ চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাদ্‌শার ঠাকুর্দা মারা যান দুঃখকষ্ঠের মধ্যেই। তার বুবু অর্থাৎ ঠাকুমাও মারা যান নব্বই বছর বয়সে। তাদের সংসার দুঃখকষ্টের মধ্যে চলছিল কোন রকমে ঘষটে ঘষটে। জ্ঞান হওয়া থেকে বাদশা দেখে আসছে তার বাবার রোজগার রোজ ষোল - আঠারো আনা। পুরো পাঁচ সিকেও নয়। সেই আট-ন বছর বয়স থেকে তার বাবা বহু কষ্টে কলে কাজ করে চলে। তিনি গোটা রাস্তা হেঁটে কখনও ঘুসুড়ি, কখনও খিদিরপুর যেতেন। খালি পায়ে। গরমের দিনে তার ফোস্কা পড়ে পা ফুলে যেত। পরের দিকে অবশ্য একটা সাইকেল হয়েছিল তার । সেই সাইকেল লেখকের ভাষায় - তার প্যাডেল, তার রড, সিটের নিচেকার জয়েন সব আগাপাছ তলা ঝালাই করা। ডানদিকের হ্যান্ডেলে বেল ছিল। কিন্তু

বাজাতে গেলে বাজত না। কেবল খোয়া-তোলা রাস্তায় ঝাঁকানি খেলে তা থেকে আপন মনে ঠননং করে বোল

উঠত। আর টয়ার? তার তিন-চার জায়গায় বড় বড় তালি। তালিগুলো সংখ্যায় যে-হারে বাড়ছিল, তাতে কিছুদিন পরে তালির নিচে আদর টায়ারটা আর দেখাই যেত না। মোড় ঘুরতে হত খুব সাবধানে কেননা টায়ারের দাঁতগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে বুড়োদের মাড়ির মত প্লেন হয়ে গিয়েছিল। ব্রেক ছিল না। পরে মাড়গার্ডটাও খসে যাওয়ায় সওয়ারির ডান পাটাই ব্রেকের কাজ করত। তিন-চার মাইল রাস্তার মধ্যে অমন সাইকেল দুটো ছিল না। ফলে, সে সাইকেল যেই চড়ে যাক? রাস্তার লোকে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলত বাবরিঅলা বলত না। বলত ফকির সাহেব। সামান্য একটি সাইকেলের দীর্ণ দশা বর্ণনায় লেখকের রসবোধ ও বাস্তব বস্তুনিষ্ঠার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ফকির সাহেবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক উপমার চমৎকারিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। সেই সঙ্গে তাহের মিঞার নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনায় লেখকের সহমর্মিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহের মিঞার গোঁফ নেই, জুলফি নেই, থুতনির নিচে নৌকোর মতো একটু দাড়ি। সাদা হয়ে যাওয়ার পর কালো মুখের মধ্যে দাড়িটা দেখাত ঠিক ঈদের চাঁদের মত। একটা বুকখোলা হাত-কাটা সুতির কোর্ট, ছেঁড়া তেলচিটে গেঞ্জি, সেলাইকরা আটহাতি ধুতি -- বাজানের এই ছিল বরাবরের ড্রেস। বা-জান কোটটাকে একটু বেশি খাতিরযত্ন করত। বাড়ি থেকে কারখানা আর কারখানা থেকে বাড়ি -- শুধু আসা যাওয়ার এই পথটুকু কোটটা বাজানের গায়ে উঠত। কারখানায় পৌঁছেই গা থেকে কোর্টটা খুলে ফেলত। বাড়ি এসে কোটটা খুলে হেৎনের দেয়ালে পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখত। নতুন অবস্থায় অবশ্য পুরো হাতার কোর্টই ছিল। তারপর যেমন যেমন ছিঁড়ত তেমন তেমন কাঁচি দিয়ে কোটে দেওয়া হত বলে হাতাটা ছোট হয়ে আসত। শেষের দিকে কোর্টেহাতা বলে আর কিছু থাকত না। পিঠে কলারের কাছটাতে তখন তালি পড়ত। পেছন ফিরলে তবে সেটা দেখা যেত। গেঞ্জিটা যখন একেবারে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত, গায়ে ঝোলাবার ও আর কোনো উপায় থাকত না, একমাত্র তখনই গায়ে নতুন গেঞ্জি উঠত। বা-জানকে আমরা ক-বার নতুন গেঞ্জি পরতে দেখেছি, প্রায় আঙুলে গুণে বলে দিতে পারি। আর বা-জানের ধুতি সেলাই করতে করতেই তো দেখলাম মা-র নজরটা চলে গেল। এই বর্ণনা লেখকের শিল্পীমনের সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার অভেদ সৃষ্টি বলে অনুমেয়। সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের প্রতি সামাজিক নিষ্ঠা এর মধ্যে নিহিত। লেখকের সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের সঙ্গে সৃজনী শক্তির অসামান্য মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। বাদ্‌শার বড়বুবু অর্থাৎ দিদি হওয়ার পর তাহের মিঞার সত্যিগতি হঠাৎ একদম

চলে যায়। সে পীরের কাছে গিয়ে মুরীদ হয়। পীর তাকে কলমা শেখায়, দোয়াতাবিজ দিতে শেখায়, কারো গায়ে বাতাস লাগলে দাওয়াই দিতে শেখায়। সেই থেকে তার মন ঘুরে যায়। তার মন চলে যায় রোগ ব্যামো সারাবার দিকে। তার বাড়ির চালা তুলে তৈরী হয় দরগা, মানিক পীরের দরগা। আস্তে আস্তে সে জলপড়া টলপড়া দিতে লাগল। অনেকে তার কাছে হাতও দেখাতে লাগল। এইকরে তার রুগী দেখার নেশা পেয়ে বসল। এভাবে কোবরেজি, হেকিমি, টোটকা এসব ওষুধ টষুধ ফকির সাহেব শিখে নিয়েছে। কারখানা থেকে ফিরেই ফকির সাহেব তাগাতাবজ, কোবরেজি, টোটকা বা হেকিমিতে বেড়িয়ে পড়ত। কিন্তু রোগ যেমনই হোক, সারুক আর না সারুক ফকির সাহেবকে ডাকতে কেউ ভুলত না। কেননা মানুষটা যে ভাল। রোগ যতক্ষণ না ছাড়ছে ফকিরসাহেব সেই রুগিকে ছাড়বে না। নিজের মুরোদে না কুলোলে ডাক্তার বদ্যি নিজেই সে ডেকে আনবে। এনে বলবে, দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনিই দেখুন -- হাতুড়েদের ওপর এখন তো আর এদের বিশ্বেস নেই। বা - জান নিজের দৌড় জানত বলেই লোকে বাজানকে ডাকতে ভরসা পেত। আর বা-জান একবার যে বাড়িতে ঢুকত, সে বাড়িতে হয়ে যেত তার মৌরুসিপাট্টা। সন্ধেবেলা গল্পগাছা করার একটা জায়গা। গড়ে উঠত আত্মীয়তা বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক। বাদ্‌শার বা-জানের সমাজ মনস্কতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় পাই। এভাবে ফকির সাহবের বাড়ি একটা সামাজিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বাদ্‌শার কথায় -- মহরমের দিন আমাদের বাড়িতেই ফাতোহা হত -- ইমাম সাহেবের ফাতেহা। ঐ দিন খুব ধুমধাম করে কলমা পড়া হত। আর খিচুড়ি ভোজ হত। এই স্মৃতি কথায় বাদশার শৈশবের একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে যায়। সে বলে -- আমরা শুয়ে পড়লে মাঝে মাঝে বাজান আমাদের মাথার কাছে এসে বসত। বাজান তারে ছেলেবেলার গল্প করত। বলত, -- তখন লোকের এত বাস ছিল না। জঙ্গলে শেয়াল ডাকত। আমাদের ছিল গোলপাতার ঘর। আমার যখন আট বছর বয়েস, তখন কলে কাজ করতে ঢুকেছি। নে মত ঘুমিয়ে পড়। তারপর আমার পিঠে একটা চড় এসে পড়ত, এই হারাম জাদা চোখ বোঁজ। এখনও মনে পড়ে, বাবার হাতের সেই চড়টা খাব বলে রাত্তিরে শোয়ার পরেও আমি অনেকক্ষণ ধরে চোখদুটো খুলে রেখে চেস্টা করতাম জেগে থাকতে। এখানে শৈশবের স্মৃতিকথা বর্ণনায় উপন্যাসিক শিশুর মনস্তত্ত্বের বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সহজে নজরে আসে। বাদ্‌শা জেলের ভেতর কথকের সঙ্গে আলাপচারিতায় কারখানার যে বর্ণনা করেছেন, তা মূলতঃ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন বৈচিত্র্যের একটি নিদর্শন। শৈশব পেরিয়ে বাদশা শালিমার কারখানায় কাজ নেয়। বাদশার কারখানা হল জাহাজ মেরামতের কারখানা। সেখানে সব সময় ঘ্যাস্‌ ঘ্যাস খ্যাড়র খ্যাড়র শব্দ।

মেশিনের সে শব্দ সর্বক্ষণের। নিজেদের ছাড়াও সেখানে সিলভার লাইন, ক্রক লাইন, সিটি লাইন, ব্যাঙ্ক লাইন, জাভা লাইন এরকম সব জাঁদরেল জাঁদরেল লাইনের বড় বড় জাহাজ মেরামতের কাজও তারা করে । বাদশার কথায় -- ডকে যখন জাহাজ আসে প্রথমে যায় সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে জরিপ করতে। সঙ্গে থাকে ঘাট ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজের তলা থেকে শুরু করে ইঞ্জিন, বয়লার ডেক, মাস্তুল, ট্যাঙ্ক, ডীপ ট্যাঙ্ক সব কিছু তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। যে যে পার্টস মেরামত করা দরকার, তার ওপর দাগ দেয়, জাহাজের নক্‌শাকেও সেইমত চিহ্নিত করে। তারপর কেউ টেন্ডার চায়, কেউ বা তাদের কাজ দেয় আগে থেকে যাদের ঠিকা দেওয়া থাকে। আমাদের কারখানায় দু-তরফে কাজ - আউটডোর আর ইনডোর। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে আউটডোরের ফোরম্যান তার দলবল নিয়ে যাবে জাহাজে। দাগানো জায়গায় পার্টর্সগুলো যদি সরিয়ে নিলে চলে তাহলে খুলবে, যদি ঝরঝরে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কেটে বাদ দেবে। ইনডোরে সেই জিনিস, হয় সারিয়ে নয় নতুন তৈরী করে, আবার যাবে আউটডোরে। আউটডোরের মিস্ত্রি কারিগররা করবে ফিটিঙের কাজ। এ কাজের অনেক ভজকট। প্রথম থেকে শেষ অবধি অনেক হাতে নানা স্তরে কাজ হবে। কারখানার নানা স্তরে বিভিন্ন কাজের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক কানার বাস্তবতা রিয়ালিজম তত্ত্বের ওপর সৃষ্টি ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫২ সাল নাগাদ বজবজ চটকলে সস্ত্রীক মজুর সংগঠনের কাজ করেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে দুজনেই মজুর সংগঠনের কাজ করেন। এরপর বজবজ থেকে ফিরে কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করেন পোর্ট অঞ্চলে। পোর্ট অঞ্চলের কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতার চিহ্ন রয়েছে তাঁর হাংরাস উপন্যাসে। শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করে চলে। কোন কোন শ্রমিক লোকচক্ষুর আড়ালে অকালে ঝরে যায়। এই মমার্ন্তিক বিষয়টি সংবেদনশীল শিল্পীর নজর এড়ায়নি। সমাজতান্ত্রিক কর্মী জীবনের শিল্পী হিসেবে শ্রমিক জীবন অধিকতর গুরুত্ব পাবে খুবই স্বাভাবিক। এই জীবন দৃষ্টিতে হাংরাস উপন্যাসে বাদশার কথায় ঔপন্যাসিক লেখেন -- কারখানায় ফার্নেস থেকে মাল নেওয়া আর মাল ছাঁচে ঢালা -- দুটো কাজ ই করতে হয় সাক্ষাৎ যমের মুখে দাঁড়িয়ে। একটা পা হড়কালে কিংবা একটা হাত ফস্‌কালে। নিশ্চিত মৃত্যু। একেকটা ফার্নেসে রোজ এক থেকে দেড় টন মাল গলানো হয়। বুঝে দেখুন তাহলে, কী ব্যাপার । ডাবুতে মাল ভরার পদ্ধতিও থেকে গেছে সেই মান্ধাতার আমালের। ফানের্সের মুখ বরাবর দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন কারিগর। একজনের হাতে শাবল, আরেক জনের হাতে বাঁশ। ফার্নেসের মুখ তখন বন্ধ। একতাল কাদা শুকিয়ে গিয়ে ফার্নেসের মুখ আটকে রেখেছে। শাবল মেরে ফার্নেসের মুখের সেই শুকনো মাটি যেই না ভেঙে দেওয়া, অমনি গলা

লোহা সেই খোলা মুখ দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে এসে ডাবুর মধ্যে পড়তে থাকবে। ডাবু ভরে যাওয়ার মত হলে তখন আসবে ফার্নেসের মুখ বুঁজিয়ে দেওয়ার পালা। বাঁশওয়ালা তখন তাড়াতাড়ি বাঁশের আগায় এক তাল কাদা দিয়ে ফার্নেসের মুখের মধ্যে পুরে দেবে। যাতে ফার্নেসের মুখ জ্যাম হয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মাল পড়া বন্ধ হয়। কোনো ডাবুতে এক হন্দর, কোনটাতে এক টন অবধি মাল ধরে। এক টন ওজনের মাল ভর্তি ডাবু ক্রেনে করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রেনে করে ধরে মাল ঢালা - তাতেও হুজ্জতি অনেক। একটু বেসামাল হলে, হয় অতখানি মাল পড়ে পয়মাল হবে, নয় লোকের জান চলে যাবে। আমাদের কারখাতেই এখবার একটনের ডাবু থেকে মাল ঢালাইয়ের সময় মালভর্তি ডাবুতে একজন লোক পড়ে যায়। ডাবুতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার শুধু হিসেয়ে উঠল নীল আলোর একটা শিস্। ব্যস্ তারপর তার আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। আপনি যদি আমাদের কারখানায় যান, তো দেখবেন ঢালাইওয়ালাদের সারা গায়ে পোড়ার দাগ। সব সময় কারো না কারোরশরীরের কোথাও না কোথাও দাগদগ করছে ঘা।ঞ্জ এই দগদগে ক্ষত লেখকের মনে দাগ কেটেছে। শ্রমিক দরদী শিল্পী জগতের মানুষকে শ্রমিকদের এই পোড়া গা দেখায় ও উপলব্ধির আহ্বান করেছে। এবং করে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। এটা তার বিশেষ জীবনদর্শনের শুভ পরিণাম।

জাহাজের কাজ নানা রকমের। লস্কিম্যান, বয় বাবুর্চি বার্বার ক্রু ইত্যাদি। ক্রুদের হেড হল সারেং। ঔপন্যাসিক লিখেছেন -- ক্রুদের ওপর জুলুম যেমন, তেমনি তাদের অমানুষিক খাটুনি। অনেক সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি। ক্রু-ফায়ার ম্যানদের কাজ জাহাজের তলায় বয়লার ঘরে। কিছুদিন কাজ করলেই শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাই জোয়ান বয়েসের ছেলেরা টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। অবশ্য পোর্টে পোর্টে সারেংদের গ্যাং থাকে। অনেক সময় তাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দাউদ ভাইয়ের মামা হোসেন সে জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছেন আজ অবধি তার কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। ধোপাপাড়ার কেউ কেউ আবার ট্যাকে মেঘ গুঁজে নিয়ে ফিরেছে। এই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে ঔপন্যাসিকের আর্থ সামাজিক দৃষ্টি। কারখানার শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান লেখকের বর্ণনায় মাধুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের সংবেদনশীল হৃদয়ে শ্রমিকদের সামাজিক জীবন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পোর্টের ঘুণধরা কুৎসিৎ সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন -- মনে মনে দেশ ঘোরার ইচ্ছে হলেও আমার ভয় হত, পোর্ট এলে আমাকেও তো ঐ মদ মেয়েমানুষের পেছনে ছুটতে হবে আর তারপর বিচ্ছিরি সব ব্যামোয় অঙ্গ পড়ে যাবে, সারা গা পোকায় খাবে। সারাক্ষণ জল দেখে দেখে তারপর ডাঙ্গায় এলে মানুষ নাকি বেহুঁশ হয়ে হরিপরিদের মেকুর বনে যায়। পরে দেখেছি, শুধু দরিয়ায় কেন, উজানি জাহাজেও

ঐ মুশকিল। একবার গিয়েছিলাম এক সমস্ত উজানি জাহাজ মালতে। অনেক সময় জাহাজের কলকব্জা নিজেদের দোষে বিগড়ে গেলে সারেংরা গোপনে লোক ডেকে সারিয়ে
নেয়। সেই জাহাজে দেখেছিলাম তেরো চোদ্দ বছরের একটা ফুটফুটে ছেলেকে। মুখে ছিল বেদনা মাখানো। মাইনে নেই, শুধু পেটভাতা। সারেঙের খুপরি কেবিন হলে কেবিন ঝকঝকে তকতকে রাখা ফাইফরমাস ঘাটা আর রাত্তিরে সারেঙের বউ হওয়া। পোর্ট জীবনের বাস্তব ছবি ঔপন্যাসিক জীবনসত্যের অনুসন্ধানে নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন।

কথক বাদশার জীবনকথার উপাদান নিয়ে উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। এতে জেলে বসে কথক বাদশার অতীত জীবনের স্মৃতি কথাকে অবলম্বন করেছেন। এতে উঠে এসেছে বাদ্‌শার নিজের মুসলিম জনজাতির জীবনালেখ্য। মুসলিম সমাজের - তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধ সংস্কার। এবং অনগ্রসর সংখ্যালঘু জনজীবনের জীবনকথা। ছেলেবেলা থেকে বাদ্‌শা চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে। তার কথায় -- এদিকে সংসারেও খুব টানাটানি। গেস্ট জীনের সামনে ছিল একটা ফুলুরিবেগুনির দোকান। সেখানে খাতা লেখা আর বাজার কনার কাজে লেগে গেলাম। মাইনে নেই, তবে বিনিপয়সায় ফুলুরি বেগুনি খেতে পাই। তখন আমার রোজগার বলতে ফতেভাই আর কাদের শেখকে পড়িয়ে বাসে একটাকে দুটাকা এরকম টানাপোড়েনের মাঝে তাহের মিঞা ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে -- বাজানের রাগ আমি কিছু করছি না। শুধু গিল্‌ছি আর বয়েসের চেয়ে মাথায় বেশি ঢ্যাঙা হয়ে যাচ্ছি। এর পর কি আর কেউ কাজ দেবে? বা-জান মুখ-ঝাড়া দিয়ে খালি বলত, ধোপাদের সঙ্গে মিশছিস গাধা হয়ে যাবি। আমাকে টিট করার জন্যে বা-জান আমাকে তার কারখানায় রিবিটম্যানের কাজে ভর্তি করে দিল। কারখানায় কাজে গিয়ে বাদশার কারখানার খোশামুদে নিয়মের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। তার এই উপলব্ধি থেকে বাদশা চরিত্রের আত্মমর্যাদা বোধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ছোট বেলা থেকে সে শুনে এসেছে কারখানায় তার বাবা কেস্টবিস্টু লোক। কারখানায় তার খুব খাতির, কিন্তু কারখানায় প্রথম ঢুকে দেখে - শোনা সব কথাই উল্টো। তার ভাষায় -- একেবারে সেই গেট থেকে বাজান সবাইকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যাচ্ছে ছেঁড়া তালি মারা টাইম আপিসের ক্লার্ক, এমনকী যুদ্ধ ফেরতা হোঁতকা দারোয়ানটাকে পর্যন্ত। সবাই বাজানকে তুই, তুই করে কথা বলছে। ---- টিকিটটা দিয়ে এসে বা-জান পেটির কাছে কাপড় ছেড়ে জিব বার করে পান খাচ্ছে, এমন সময় বা-জানদের ফারবাবু মানে, খগেনবাবু ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বা-জান সেলাম করে ডিবেটা বাড়িয়ে দিল। খগেনবাবুর মুখের চেহারার কোনো ভাবান্তর হল না। বা-জানকে তিনি দেখেও দেখছেন না, এই রকম ভাব। বা-জান হাত

বাড়িয়েই আছে শেষকালে খগেনবাবু যেন, খুব দয়া করে ডিবে থেকে পান নিলেন। অমনি, বা-জানের চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা কৃতার্থ হওয়ার ভাব। খগেনবাবু বা- জানের হাঁটুর বয়সী। তাঁর মধ্যে বা-জান সম্বন্ধে এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। এরপর গঙ্গা নস্করকে দেখে বাদশাকে তার বা-জান ধমক দিয়ে বলে মালকোঁচা মার। এ যেন বাবুগিরি করতে এয়েচ? হাঁটুর ওপর কাপড় তোলো। এ ঘটনায় বাদশার কারখানার লোকজনদের আত্মমর্যাদা অবমাননার প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। শ্রমিকদের এই তোশামুদে মনোভাবের প্রতি প্রচন্ড রাগ হয়। এ থেকে বাদশা চরিত্রের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তার চরিত্রের বলিষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিকদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আদায় তার চরিত্রের ভিন্ন এক ধরনের লড়াই।

তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কারখানায় অনেক তুচ্ছ বিষয়েও বাদশা কখনো কখনো অসহিষ্ণু হয়ে উঠতো। কারখানায় কাজে যেতে যেতে, অথবা কোন মাল কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বা-জানের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে সে যেন মরমে মরে যেত। এভাবে আত্মগ্লানি সহ্য করতে করতে ছোট বাদশা কখনো কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠত - রাগে দুঃখে অভিমানে এমনভাবে ভেতরে ভেতরে ফুলছিলাম যে, একদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না তুচ্ছ একটা কারণে একেবারে ফেটে পড়লাম। একদিন একটা হ্যাংলাইনে কাজ হচ্ছিল। এমন সময় তার হাতের ব্লেড হাত ফসকে প্রচন্ড শব্দে পড়ে যায় । সেই হ্যাংলাইনের একটা কোন ধরে ছিল গঙ্গা নস্কর। আরেকটু হলে রেঞ্জটা তার পায়ে পড়ত। পড়লেই তার পা দুঞ্চটুকরো হয়ে যেত। তাই গঙ্গা মিস্ত্রি তাকে মা তুলে গাল দিয়েছিল। সে গাল শোনামাত্র হঠাৎ বাদশার মধ্যে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ধাঁই করে রেঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলেদিল। মাথা সরিয়ে নেওয়ায় রেঞ্জটা সজোরে পেছনে লোহার দেয়ালে লেগে ছিটকে গঙ্গা মিস্ত্রির কাঁধে এসে লাগে। মিস্ত্রিদের মধ্যে খিস্তি, গালি বা অশালীন নোংরা ভাষা ছোট বাদশাকে ভীষণ পীড়া দিত। অন্যদিকে অনেক সহকর্মী মিস্ত্রিকে সে ভালবাসত। তার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগত হরী মিস্ত্রিকে। কারণ সে খুব মন দিয়ে কাজ শেখাত। ধীরেন সরকার সহ অনেকেই তার সঙ্গে কাজ শিখত। এভাবে কারখানার কাজের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন তাদের মধ্যে একটা নতুন ধরনের আত্মীয়তা গড়ে উঠত, অন্যদিকে তেমনি তাদের মধ্যে চলত হিংসা ও বিদ্বেষ

কারখানার শ্রমিক জীবন থেকে বাদশার সমাজতান্ত্রিক মজুর আন্দোলনের পর্বটি লেখক অসাধারণ শিল্প চাতর্যের দ্বারা পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারম্পর্য সন্নিবেশ করেছেন । এ দুয়ের যোগ সাধনের সূত্র মসৃণ ও যৌক্তিকতার বন্ধনে নির্মিত। কারখানার পরিবেশ অনেক সময় মিস্ত্রিরা মদ

আর বেশ্যায় বুঁদ হয়ে থাকত। গঙ্গা মিস্ত্রি স্বভাব চরিত্রের খারাপ অবস্থার কারণে কারখানার শ্রমিকদের পাঁচ-ছ মাসের টাকা উড়িয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়।এই অবস্থায় বড় সাহেব কারখানা থেকে বাদশা সহ অন্যান্য শ্রমিকদের বার করে দেয়। এ নিয়ে কোর্টে গেলে একজন উকিল শ্রমিক নেতা শ্রীনাথ বাগচীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। বাদশা অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে শ্রীনাথ বাগচী তাদের সব আদায় করে দেবার আশ্বাস দেয়। এবং বলে -- দেখো আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা নয়, ডিমের ওপর যেন শক্ত খোল থাকে এও তেমনি, আসলে চাই দেশের স্বাধীনতা, আমাদের লক্ষ্য মজুররাজ আনা। এরপর শ্রীনাথ বাবু মজুরদের ইউনিয়ন গড়ার পরমর্শ দেন। বাদশার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিত এই উপাদান দ্বারা সূচিত হয়।

এই সময়কালে ইউনিয়ন গড়া সম্ভব হয় না, এরপর নানা কারখানায় কাজ করতে হয় বাদশাকে। নানা কারখানার নানা অভিজ্ঞতা। বাদশা তার বাবা এবং দাদা - পরিবারের প্রত্যেককেই শ্রমিকজীবনের যারপরনাই অমানবিক বাড়তি কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করতে বাধ্য হতে দেখে। সে তার দাদাকে দেখেছে - গণি মিস্ত্রির এপার গঙ্গায় বাঙালী বউ ও ওপর গঙ্গায় হিন্দুস্থানী বউয়ের বাজার করা ছেলেমেয়েদের কাঁথা ধোওয়া, মিস্ত্রির হাতে চড় খাওয়া, লাথি খাওয়া। মায়ের অবস্থার কথায় বাদশা বলে - রোজ তার বা-জানের আনা বলাই মিস্ত্রির তেলচিটে ময়লা জামাকাপড় কেচে কেচে তার মার নিজের হাত কালি হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে বাদশাও মিস্ত্রিদের মন পেতে হাসিমুখে টিফিন এনে দেওয়া ও ফাইফরমাশ খাটার কাজ করত । তারপর বাজগঞ্জে টানার মোর্শনে, মাকদাপুর জাহাজে ঝালাইয়ের কাজ এবং গঙ্গায় নোঙর করা বি.আই.এস.এনের একটা বড় জাহাজে সে কাজ নেয় । এখানে আমরা তার কাজের বর্ননায় লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই -- জাহাজের খোলের ভেতর যেখানে তলায় সাইড প্লেট আর বটম প্লেট ধরে রাখার জন্যে ব্রিজ ব্র্যাকেট থাকে - সেই ব্র্যাকেটের কাজ। কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথাও শুয়ে, কোথাও হামাগুড়ি দয়ে, কোথাও কাত হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সারাদিন সারারাত ধরে একা সাতখান ব্র্যাকেট কেটে ভোর চারটে পাঁচটার সময় যখন ডেকের ওপরে উঠেছি, তখন বমি করে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। এভাবে অমানুষিক কাজ করে পাড়ায় তার ইজ্জত বেড়ে যায়। রোজ আমার একটাকা হলেও ওভারটাইম করেও কিছু হচ্ছিল। তা কোনো কোনো মাসে সব মিলিয়ে তখন ষাট টাকাও হাতে এসেছে। কাজেই পাড়ায় যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বুলু ছিল, সে এবার হয়ে গেল খাতিরের বাদশা । বাদশা এবার ভিন্ন এক জীবন কে দেখল। দেখল বন্ধুবান্ধবকে। দেখল পাড়ার অন্যান্য মানুষ ও কারিগরদের। এখানকার দুর্গতি দেখে তার তাকে হাড়কলে কাজ দেয় । সেখানে ছিল তার সকাল পৌনে আটটা থেকে

বিকেল ছটা পর্যন্ত ডিউটি। মাঝখানে বারোটায় টিফিন বাবদ এক ঘন্টার জিরেন। নাইট ডিউটির সময় ছিল সন্ধে ছ-টা থেকে এগারোটা আর ভোর চারটে থেকে আটটা। হাড়কলের ভেতরের কথায় বাদশা বলে -- ওঃ সে কী জায়গা! আপনারা যাকে নরক বলেন, মুসলমানরা যাকে বলে দোজখ -তার সঙ্গে সামান্যই ফারাক। কারখানায় মালগাড়ির ওয়াগন ভর্তি করে করে হাড় আসে। ওয়াগনের দরজা খুললেই ভক করে একটা হাড় পচা ভ্যাপসানো ঝাঁঝানো গন্ধ নাকে মুখে এসে এমন ভাবে ধাক্কা দেয়, যেন মাথা ঘুরে পড়ে যেতে হয়। ঐ গন্ধে প্রথম প্রথম কুলিকামিনরাও ভিরমি খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। ওয়াগনে করে সেসব হাড় আসতো ছোটনাগপুর, হাজারিবাগের জঙ্গল থেকে। মানুষ, ঘোড়া, মোষ, গরু, ছাগল, ভেড়া কোনো বাছাবাছি নেই। হাড় আছে এমন কিছু একটা হলেই হল। সব সময় শুধু হাড় নয়। একেবারে ছাল মাংসসুদ্ধ আস্ত জানোয়ার তাতে ঢোকানো থাকত। সেই সব মাংস পচে গলে এমন ফুলে উঠত যে তার গন্ধে তখন কারখানা ছেড়ে পালাবার অবস্থা হত। শুধু কি গন্ধ? ওয়াগনের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত এক হাত লম্বা লাল লাল তেতুঁলে বিছে। শোনা গেছে, কখনও কখনও নাকি হাড়কঙ্কালের সঙ্গে বিষধর সাপ এসে ওয়াগন থেকে নেমেছে। কিন্তু বিষের জন্যে বিছে বা সাপের দরকার নেই। সেদিক থেকে ঐ হাড়গুলোই যথেষ্ট। কেননা, যদি দৈবাৎ কারো গায়ে কোথাও ঐ হাড়ের খোঁচা লাগে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই জায়গাটা বিষিয়ে যাবে। সেপ্টিক হয়ে আগে কুলিকামিনেরা মারাও গেছে অনেকে। এই হাড়কলের বর্ণনায় বাদশা বলে - বিভিন্নভাগে হাড় কলে কাজ হয়। ওয়াগন থেকে প্রথমে মাল খালাস করে হাড় ভেঙ্গে গুড়োঁ করা। গুঁড়ো হাড় বস্তাবন্দী হয়। তারপর মাংসের নিচে হাড়ের গায়ে থাকে একটা পাতলা চামড়ার পর্দা। হাড় ভাঙলে সেই পাতলা চামড়া আলদা হয়ে তৈরীর কাজে লাগে, গুড়োঁ করার সময় মেশিনের যে যে জায়গায় হাড় জমে যায় সেগুলো পরিস্কার করা, মেশিন ঝাড়পুঁছ করার কাজ করে বিলাসপুরীরা। মেশিনের যেসব পার্টস্ খোলা যায় না, সেগুলো মেরামতি করে নাইট ডিউটির মিস্ত্রিরা। এছাড়া চামড়াগুলো সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে অথবা আগুনে ভেজে নিয়ে সেগুলো গুড়ো করে প্যাকিং করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ওয়েল্ডিঙের কাজ। হাড়কলের এই বর্ণনায় ঔপন্যাসিক শিল্পীর জীবনদর্শনের ভূমিকা পালন করেন। শিল্পীর বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতার নিদর্শন এগুলি ।

হাড়কলের কর্মজীবনের সঙ্গে ঔপন্যাসিক ইতিহাসবোধের বিস্ময়কে যুক্ত করেছেন। এ থেকে তাঁর সমকালবোধ ও বিশ্ববীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। সেসময় হাড়কলের খাবি খাওয়ার অবস্থা। কেননা -- তখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ফ্রান্স যায় যায়। ক্যালে বন্দর হাতছাড়া। প্যারিসের পতন হয়েছে,

আমাদের হাড়ের বড় খদ্দের ছি বেলজিয়াম নাৎসি জার্মানি তাকে গিলে খাওয়ায় হাড়ের চালান গেল বন্ধ

হয়ে। তাছাড়া কোনো দরিয়ার অবস্থাই তো তখন ভাল নয়। বিশ্ব বাজারে তখন চরম মন্দা চলছে। বিশ্ব মহাসংগ্রামের এই আঁচ লেগেছে আমাদের দেশীয় বাজারে। চলছে কারখানায় প্রচুর কর্মী ছাঁটাই। পরিবারের চরম আর্থিক বিপর্যয় এদেশের মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনে বিশ্ব প্রেক্ষিত ধরা পড়েছে।

এই সময় বাদশার পরিবারে খুব খারাপ অবস্থা । কারখানায় কাজের দিন কমে গিয়ে সপ্তাহে তিন-চার দিনে গিয়ে ঠেকে। এদিকে তার এক ছোট ভাই আর এক ছোট বোন টাইফয়েডে সাতদিন আগে পরে মারা যায়। এদিকে কারখানার পরিবেশ চরম নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র, সেখানে শুধু মদ নয় সেই সঙ্গে ছিল মেয়ে মানুষের নেশা। সেসময় মজুররা পরিবারে কোন রকমে দিনযাপন করে। কারখানায় লাইনের মিস্ত্রি ও বিলাসপুরীদের গোঁসাই ছেদিলালের কথায় বাদশা বলে -- তখন লড়াই সবে লেগেছে। তখনও ছিল শস্তাগন্ডার বাজার। ছেদিলালের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, ওরা খায় নুন দিয়ে ফ্যানেভাত। কোনো কোনো দিন শখ করে ডাল। ব্যস্ দেড় টাকা ঘরভাড়া। মাসে পাঁচ টাকা খোরাকি। বছরে দুখানা কাপড় দুখানা গেঞ্জি। --- ছেদিলালের দুই বউ। প্রথম বউয়ের ছেলেপুলে হল না বলেই দ্বিতীয় বিয়েটা একে করতে হল। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বউয়েরও ছেলেপুলে হয়নি। ওরা তিন জনেই হাড়কলে কাজ করে। তিনজনের রোজগারে কোনরকমে সংসার চলে যায়। তিনজন একসঙ্গে থাকায় খোরাকি খরচ কম পড়ে। তার ফলে, কিছু টাকা বাঁচিয়ে বাপ মা ভাইদের জন্যে ছেদিলাল পাঠাতে পারে। শ্রমিক মিস্ত্রি ছেদিলালের বর্ণনায় সোলের শ্রমিক জীবন সম্পর্কে উপন্যাসিকের আর্থসামাজিক বোধের ও শ্রমিক জীবন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম মানুষের জীবনের স্বাভাবিক জৈবিক তাড়নাজাত, জীবশক্তির ও সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণ বোধ করে। মেয়েটির নাম সোনারেন, দেশ থেকে চলে এসেছিল। সোনারেনের বাপ মা ভাই বোন কেউ ছিল না। ও থাকত একা একটা ঘরে। সে ছিল সেরা সুন্দরী, ঐরকম ঘরে কী করে যে ঐ রকম মেয়ে হয়, সেটাই আশ্চর্য লাগে বাদ্‌শার। বাদশার মতে সে ছিল ডাকসাইটে সেরা সুন্দরী। ওর ছিল অনেক খেঁড়ু। ধনপত, ভিখুয়া, মাংলু, ওয়ালি খাঁ -- এই রকম অনেক। সবাই লাইন লাগিয়েছিল ওকে সাদি করবে বলে। ওকে সাদি করবার কথা বেশি বলত মাংলু। প্রত্যেকেই খুব গুমর করে বেড়াত তার সঙ্গে নাকি সোনারেনের লটঘট। এই সোনারেনের প্রতি যৌবনে আকর্ষণ বোধ করে বাদশা। সে বলে -- আমি

অনেক দিন থেকেই সোনারেনের সঙ্গে ভাব করবার তাল খুঁজছিলাম। একদিন সোনারেনকে পুকুরের ধারে ধরে ফেললাম। কথা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি কি বেআক্কেলের মতো ওয়ালি খাঁর কথা পাড়লাম। তখন সোনারেনকে দেখতে হয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রেগে মুখ ঘুরিয়ে সে যা তার চলে যাওয়া যদি দেখতেন। না সত্যি, সোনারেনকে যে দেখেছে তারই বুকের মধ্যেটা কী রকম যেন করে উঠত। কোন একজন রূপসী মেয়েকে দেখে বাদশার ভেতরে কীরকম যেন করে ওঠার উপলব্ধি প্রেমের পরিপূর্ণতা আসেনি। একদিন সোনারেনকে কেন্দ্র করে কারখানায় কৈলু সর্দার ও ভিখুয়া কুলির মধ্যে চলে ছুরি মারামারি। দুজনেই হয়ে যায় জবাব। এর পরই সোনারেন আর কৈলু এ তল্লাট ছেড়ে হাওয়া হয়ে যায়। এই হাড় কলে কাজ করার সময় বাদশার মনে প্রেম জাগলেও শেষে আর হয়ে ওঠেনি। এই কারখানায় বাদশা দেখেছে এখানকার একমাত্র ওষুধ ধানী মদ। ছেলে মেয়ে সবাই খায় মদ। ওটাতো ওদের কাছে ওষুধ। তাই মদ ওরা খায় না। ওদের গিলতে হয়। এই কারখানায় বাদসার জীবনে আরেকটি ঘটনার আবির্ভাব হয়। ছেদিলাল তার ছোট বউয়ের ছোট বোনকে আনিয়েছিল। ছেদিলালের ছোট বউয়ের ইচ্ছে ছিল তার ছোট বোনকে সাদি করে বাদশা রাখুক। ছোট বউ বলত, খিদের সময় খাওয়া উচিত -- পরে খিদে মরে গেলে সাদি করবে? হোলির সময় সারাদিন মদ ভাঙ আর হুল্লোড় করে রাত্তিরে লিট্টি, ভাঙ আর লাড্ডু খেয়ে সরারাত কাটায়। এতে বাদশার অনেক বদনাম হয়।

এরপর বাদশা হাড়কলের কাজে জবাব দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় কোন্নগরের লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলে। এই মিলে প্রচুর ওভারটাইম করে, দিনে রাতে কাজ করে বাদশা। এতে তার অবস্থা বেশ একটু ভাল হয়। পাড়ায় খাতির হয়। বাদশা হয়ে উঠল বাদশাবাবু। পাড়ার ও বাড়ির সবাই বাদশাকে ভালবাসতে লাগল। বাড়িতেও তার ওপর বাপের টানটা একটু বাড়ে। বাড়িতে ঝগড়াঝাটি কমে আসে। এ সময় পরিবারের অন্যরা তার খাতির করতে থাকে। অর্থের সঙ্গে বা রোজগারের সঙ্গে পরিবার ও সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত - এই জীবনসত্য ঔপন্যাসিক বাদশা চরিত্রের এই অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাদশা এই সময় অ্যাকুলে কারখানার ওয়েল্ডিঙের মিস্ত্রি। কারখানার মিস্ত্রিদের তুলনায় সে স্বতন্ত্র। কারখানায় যে বয়রা কাজ শিখতে আসে তাদের উদ্দেশ্যে অনেকেই বাদশাকে বলে -- অত সহজে কাজ শেখাবে না। তাহলে নাকি ওয়েল্ডিঙের কাজের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু বাদশা সবাইকেই শেখাত। যদি গরিবের ছেলে হত, মুখটা করুণ করুণ দেখতাম -- তাহলে তো কথাই নেই। আমাকে খাওয়ানো আমার ফাইফরমাস খাটা -- আমার দিক থেকে এসব উপদ্রব তো ছিলই না, বরং আমিই তাদের

অনেককে নিজে পয়সা খরচ করে টিফিন খাওয়াতাম। এখানেই বাদশা শ্রমিক শ্রেণীকে অনেক উচুঁতে উন্নীত করে। বাদশা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি মহৎ চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়।

বাদশার কারখানা জীবনের পরিচয়ে লেখক সমকালের কালোবাজারীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। যুদ্ধের বাজারে এক শ্রেণীর মানুষ মুনাফা করে রাতারাতি উচ্চবিত্ত হয়ে ওঠে। এ রকমই একটি চরিত্র বাদশার চোখে দেখা গোপাল দাস। গোপাল দাসের ছিল একটি লোহা লক্করের ছোট্ট দোকান। লড়াই লাগার পর যখন পেরেকের খুব অভাব হল, গোপাল তখন একটা মেশিন কিনল। তারপর বাজার থেকে কট্‌পিস্‌, মানে ছঁাটি লোহা, কিনে জুতোয় হাফসোল লাগাবার শেয়ালকাঁটা তৈরী করতে লেগে গেল। এই কাঁটা বাজারে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ধরে গেল। দুঞ্চার মাসের মধ্যে গোপাল আর দাস থাকল না, লাল হয়ে গেল। যুদ্ধের পর এখন তার এখানে বাড়ি, সেখানে বাড়ি, নিজের মোটরে ছাড়া চড়ে না। সে এখন লাখ লাখ টাকার মালিক। যুদ্ধের বাজারে ফাটকা কারবারিতে কিভাবে পুঁজিতন্ত্র ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সে সত্য ঔপন্যাসিক গোপাল দাস চরিত্রের দ্বারা তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধের বাজারে চলছিল খুন, রাহাজানি জখম, গুম ইত্যাদি স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব। গোপাল দাসের মতো চরিত্রগুলো সেদিন সাধারণ মানুষকে যখন তখন গুম করে ফেলত। এরকমই একটা চক্রান্ত জালে গোপাল দাসের গুন্ডার হাত থেকে বাদশা সনাতন নামের একজন শ্রমিকের জীবন বাঁচায় । বাদশারা পাঁচজন ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে -- সে যখন জুলুম করত, আমরা ছিলাম তার বিরুদ্ধে।-- একদিন বলাই সনাতনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাগীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মদের সঙ্গে সিগারেটের ছাই মিশিয়ে ওকে বেহুশ করবার চেষ্টা করেছিল। এরপর সেদিন সনাতন যখন রাতে কাজে আসবে তখন মেথর পাড়ায় সনাতনকে ওরা ধরে খুন করে তার লাশ ময়লা ফেলার খালে ফেলে দেবে, জল সেখানে এত ভারী যে, সহজে ধরা পড়ার ভয় নেই। বিকেলের দিকে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। গল্প করতে করতে সনাতনকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বললাম, আজ আর রাতে কাজে আসবেন না। ক্ষতি হতে পারে। এর বেশি কিছু বলব না। সনাতন আমার হাতদুটো ধরে বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। বাদশার এই উক্তি থেকে তার চরিত্রের সহমর্মিতা ও ভালো মানুষের পরিচয় মেলে। অন্য দিকে ঔপন্যাসিক এ ঘটনা দ্বারা একটা সময় কে তুলে ধরেছেন। একটা সময়ের গোটা ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধের বাজারে জীবনকে দেখিয়েছেন। এর পর যে ঘটনাটি ঘটল তা বাদশা চরিত্রে শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান অসামান্য হয়ে ওঠে। গোপাল দাসদের মতো লাখ লাখ টাকার ধনিক শ্রেণীর অত্যাচারীদের হাত থেকে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটানা দু-বছর ধরে আমরা পালা করে

সাইকেলের পেছনে কিংবা সামনে রডে বসিয়ে সঙ্গে ছুরি নিয়ে সনাতন মিস্ত্রিকে রাতে কাজে কারখানায় পৌছে দিয়েছি। এভাবে বাদশা মজুর থেকে শ্রমিকদের নেতৃত্বের শিখরে পৌছে যায়। এথেকে মজুর বাদশা হয়ে উঠল বাদ্শা বাবু। বাদশার কথায় পাড়ার লোকের চোখে একবার সেই উচুঁতে উঠে গেলাম, ব্যস্। তখন সব ব্যাপারে আমাকে তারা ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল। ফুটবল টিম হবে। বাদশা। ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি হবে। বাদশা যাত্রার দল হবে। তাও বাদ্শাকেই করতে হবে। এরপর বাদশা পাড়ায় ক্লাব তৈরী করে দিল। পাড়ার সবাই মিলে বাদশাকেই ক্লাবের ম্যানেজার করে দিল। বাদশা ক্লাবঘরে গিয়ে বাধ্য হয়ে উদবীর পালায় যাত্রা করে। এর পরই বাদশার জীবনের পালাবদল ঘটে। বাদশার বিয়ে হয়ে যায়।

কারখানার কর্মী জীবনে বাদশার ভাবনা ছিল মজুরদের কিসে সুবিধা আর কিসে অসুবিধা হয়। বিয়ের পরবর্তী কালে বাদশার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এর মাঝে লেখক মানুষের ব্যক্তি জীবনে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি একটা সহজাত নাড়ীর টান ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সন্ধানে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাদশাকে দিয়ে মানুষের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিসত্ত্বার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তুলে ধরেছেন। বাদশার আত্মকথায় ঔপন্যাসিকের নিজের সাম্প্রদায়িক গন্ডি ছাড়িয়ে বিবেচনার দৃষ্টি দিয়ে ধর্ম করে দেখার পথ নির্দেশ করেছেন। নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি একটা টান থাকা অন্যায় নয়। তবে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতাকে দূর করার পক্ষে ঔপন্যাসিকের শিল্পীমন ছিল সচেতন। ঠিক একই ভাবে বাদশা বলে -- কাগজে মুসলমানের উন্নতির কোনো খবর দেখলে ভাল লাগত। মুসলমানদের যেসব স্বাধীন দেশ -- তুর্কি, মিশর, ইরান, আফগানিস্থান - এসব খুব আপন মনে হত। যেখানে মুসলমান শুনলে কেউ নাক সিঁটকোবে না, বরং মুসলমান হওয়াটাই যেখানে গর্বের বিষয়। বাংলায় তখন লীগের মিনিস্ট্রি। রাজা ইংরেজ হলেও, তার উজির হল মুসলমান। এটাও কম কথা নয়। কোথাও খেলায় মুসলমানরা জিতলে, কোনো মুসলমান ছাত্র বিলেতে গেছে শুনলে খুব ভাল লাগত। মহামেডান স্পোর্টিংসের খেলার আগের দিন পাড়ার লোকে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত। ছোট থেকে শুনে এসেছি যে, হিন্দুরা মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের উঠতে হবে। এই ভাবটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। বা জানতে চাইত মুসলমানরা উঠুক, কিন্তু হিন্দুদের ধরে। সেটা আবার পাড়ার লোকে পছন্দ করত না। আস্তে আস্তে জানতে পারলাম জিন্না সাহেব আমাদের নেতা, মানে মুসলমানিদের নেতা। জিন্না মায়ের চোদ্দ দফা দাবি রেখেছেন। সে দাবি না মানলে তুলকালাম কান্ড করে ছাড়বেন। এই সব শুনে মনে খুব জোর পেতাম। যখন কারখানায় কাজ করছি তখনও হিন্দু মজুর মিস্ত্রিদের সঙ্গে লীগের হয়ে তর্ক

করতাম। হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত দোষ অবিচার, আর ইসলাম ধর্মের কী গুণ, এই সব জোর গললায় বলতাম। আক্রমণের সুরে বললেও আসলে আমি আত্মরক্ষা করতে চাইতাম। একদিকে যেমন তর্ক করছি, অন্যদিকে এক সঙ্গে কাজ করার ভেতর দিয়ে ভাবভালবাসাও গড়ে উঠছে। একদিকে মুসলমানদের হয়ে কারখানায় তর্ক করছি, অন্যদিকে পাড়ায় করছি লীগের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তর্ক। এই ভাবে তর্ক করতে করতে দেখলাম দুদিকেই অনেক কিছু বলবার আছে। আস্তে আস্তে আমার মধ্যে বিবেচনা বোধ এল। নিজের গন্ডিটুকু ছাড়িয়ে দেখতে শিখলাম। সমাজতাত্ত্বিক শিল্পীর দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সুভাষ সমকালীন সমাজ মানসকে ও প্রগতিশীল মানসকে ধরার চেষ্টা করেছেন বাদশা চরিত্রে। এই চরিত্রে লেখকের ধর্মীয় চেতনায় উদারতা ও মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে প্রত্যয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরেই বৃহৎ জীবনে পদচারণা হয় বাদশার। বাদশা রাজনৈতিক বোধে ও সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল পূর্ববাংলার মেট্রিক পাশ ট্রেনি আলি আর সালে। সেসময় গেস্টকীনে প্রথম ইউনিয়ন গড়েছিল আর এস পি। লড়াই লাগার পর সে ইউনিয়নের মরনদশা হয়। আলির সঙ্গে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক। আলি কাঁধ লাগিয়ে গেস্টকীনের ইউনিয়ন ঠেলে তোলে। আশপাশের সম কারখানায় ইউনিয়ন করে দলের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করে আলি। কমিউনিস্ট কর্মী আলি বাদশাকে একটি বই পড়তে দেয় সাম্যবাদের ভূমিকা। আলির সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে যাতায়াত করে বাদশা। সেখানেই সালের সঙ্গে আলাপ হয় বাদশার। বাদশা সমস্ত মজুরের একতা চেয়ে সভায় সভায় বক্তৃতা দেয়। সারা রাত জেগে হ্যান্ডবিল লেলে। ক্রমে বাদশা লিভার হয়ে ওঠে। ক্রমে বাদশা লিভার হয়ে ওঠে।

ক্রমে বাদশা নিজের উপলব্ধি করে - রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বুঝতে পারলাম আমি আর এখন শুধু ফকির সায়েবের ছেলে ধুলু নই। আমি বাদশা তো সত্যিই বাদশা। এপাশ থেকে ও, ওপাশ থেকে সে - ডেকে ডেকে দাঁড় করাচ্ছে। স্ট্রাইকের খবর জিগেৎস করছে। যেখানেই থামাচ্ছি সেখানেই ভিড় জমে যাচ্ছে। ভিরের মধ্যে থেকে আমার কানে আসছে ছেলে ছোকরার গলা নামিয়ে বলছে উনি কে জানিস তো? বাদশা এই স্ট্রাইকের লাড়ার। তবুও বাদশার মনে দুঃখ হয় তার বাবার কথা ভেবে। তাদের লড়াইকে বাদশার বা-জান সায় দিতে পারছিল না। কিন্তু পার্টির কাজ ও ইউনিয়নের সংগ্রামকে বাদশা মনে করে একটা বিশেষ বস্ত্র। তার কথায় - বা জানের মুশকিল বা জানের হাতে একটাই যন্ত্র। সেটা থেকে যাচ্ছে মেশিন ঘরে। আমার হাত খালি নয় মুঠো করে ধরেছি অন্য একটা যন্ত্র, মা মানুষকে

নড়ায়। এ কাজেরও খুব একটা নেশা আছে। আমি খুব মেতে গেলাম। এই ধরুন, হাঙ্গার স্ট্রাইক। এটাও অনেকটা অসুখেরই মত অন্যদিকে তখনও যুদ্ধে চলছে। বাংলাদের ওপর দিয়ে ঐ রকম ঝড় বয়ে গেল - না আমি মেদিনীপুরের সাইক্লোনের কথা বলছি না। - আমি বলছি পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। খিদির পুরে বোমা পড়ার কথা? আমরা তখন কারখায় । ওঃ বোমা ফাটার সে কী আওয়াজ। আমার তো ভাবলাম এবার গেলাম। কয়দিন দেখতে গেলাম খিদিরপুরে। কাগজে তো কিছুই হয়নি। লোক মরেছিল অগুন্তি। পরে খোঁজ নিতে নিতে জানলাম তার মধ্যে আমাদের চেনা পরিচিত লোকও দু- চারজন ছি লড়াই তো চললেঞ্জ

বাদশা উঠে এসেছে একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত অরাজনৈতি ও সাধারণ পরিবার থেকে। ক্রমে বাদশা হয়ে ওঠে হাঙ্গার স্ট্রাইকের লিডার। তথাপি বাদশার এই পরিবর্তনে ওর পিতা বিরক্ত হয়ে ওঠে। বাদশার উক্তিতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাজান একদিন মা কে বলল, তোমার ছেলের পাখা গজাচ্ছে আগুনে পুড়বার জন্যে। রায় পাড়ায় গিয়েছিলাম গোবিন্দবাবু বলছিলেন থানার বড়বাবু নাকি ওঁর কাছে দুক্ষু করেছেন - ফকির সাহেব এত ভাল লোককিন্তু ওর ছেলেটা এমন হল কেন? কারখানার মিস্ত্রিদেরও কেউ কেউ বলছিল সাহেবদের পেছনে লাগতে যাচ্ছে, টয়টি পাবে বাছাধন। মা মুখ শুকনো করে এসে আমাকে বলল তাহলে বুলু তোর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভা। আমার বউ সাহস পেত না আমাকে কিছু বলার। কিন্তু সেও নিশ্চয় মনে মনে ভয় পেত পরিবারের অন্য সব সদষ্যই বাদশার বিপরীত পথে চলছিলেন। অথচ বাদ্শার চরিত্রের উদারতায় তারা ক্রমে রাজনীতিতে সামিল হয়। ক্রমে বাদশার পরিবার হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক পরিবার।

বাদশঅর খালু পুলিশের ভয়কে উপেক্ষা করে রাত্তিরে তার বাড়িতে থাকার কথা বলে স্ট্রাইক ফান্ডে দুটো টাকা দিয়ে আসে। বাদশার বাবা ইউনিয়ন অফিসের ডিউটি করে। বলে আমি ভেবে দেখলাম বাদশা ডুব মেরেছে, তোরা সব রাস্তায় থাকবি, আলি - সালে ওদেরও একটু সরে থাকতে হবে, কাজেই ইউনিয়ন অফিসে বসে থাকা আমার পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধের। যদিও রাজনৈতিক কর্মীদের হঠকারিতায় মর্মান্তিক অঘটন ঘটে যায় বাদশার বা জানের। একদিন ইউনিয়ন অফিসে সারাদিন থাকার উদ্দেশ্যে তার বা জান টিফিনের বাক্স হাতে করে, পকেটে বাড়ির ডিবে পানের ডিবে নিয়ে কারখানার ড্রেসে সাইকেলে যাচ্ছিল। কারখানার ড্রেসে সাইকেলে যাচ্ছিল। কারখানার ড্রেসে যাচ্ছিল বলেই বাদশাদের ভলান্টিয়াররা তাকে লোহার রড দিয়ে মারে। শুয়ে জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পাশেই বা - জানের সাইকেলটা কাত হয়ে পড়েছিল। একটু দূরে টিফিনের কৌটোটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় পড়ে।

কয়েকটা রুটি ছেঁড়াছেড়ি করছিল একদল কাক। সেখানে পৌছে সাইকেলটা নিয়ে বাদশা সোজা হাসপাতালের দিকে জোরে চলতে থাকে। যেতে যেতে এক জায়গায় একজন বুড়োমত লোক বলল শূনলাম, বাবরি অলার পা-গাড়ি। একজন ছোকরা আপত্তি করে বলল, না না। ওটা তো ফকির সায়েবের পা গাড়ি। গাড়িতে বেল ছিল না, ব্রেক ছিল না। মাথা ঠান্ডা ছিল। কিন্তু যাচ্ছিলাম ঝাড়ের বেগে। তার পর বাদশার বা জানের খবর ঔপন্যাসি আর দিতে পারেন নি। সংগ্রাম জীবনের কাহিনীর সঙ্গে বাদশার বাজানের ট্র্যাজিক উপকাহিনী পাঠকের সামনে অনেক জিজ্ঞাসা ভিড় করে। ভলান্টিয়াররা নিজেরা মজুর হয়ে অন্য একজন মজুরকে লোহার বড় দিয়ে খাবার সঙ্গত কিনা উপন্যাসি শ্রমিকদের দ্বারা মজুররাজ সৃষ্টির প্রতয়ী ছিলেন। চেয়েছিলেন ঞসব মজুরের একতা । যে পেটের তাগিদে বাঁচার লড়াইয়ে সংগ্রামে সামিল না হয়েও কাজ করতে যায় সে শ্রমিক ও ঔপন্যাসিরে দৃষ্টির আর এক ভিন্ন সংগ্রামী। তার সংগ্রাম পরিবারকে দারিদ্রের মোচনের লড়াই। ভলান্টিয়ারদের নেতা বাদশার বা - জানের মাথায় বড় দিয়ে খারার মর্মান্তিক ঘটনা দিয়ে উপন্যাসিক যে কোন একজন শ্রমিকের মাথায় খাবার সাংঘাতিক অপরাধ উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন।

বাদশা চরিত্র তার পরিবারের রাজনৈতিক রূপ এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চরম দারিদ্রের মধ্যে মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশের প্রতি কৃলতার বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রাম শিল্পে। উন্নীত করেছেন ঔপন্যাসি। একটি সাধারণ মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ পরিবারবারকে মজুরদের স্বার্থে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে একটি রাজনৈতিক পরিবারের রূপদানের স্বার্থকতা অসামান্য। হৈ কাহিনী বর্ণনার ঔপন্যাসি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। জেলে বসে কথকের সঙ্গে আপাপচারিতায় বাদশার আত্ম কথায় স্মৃতি চারণের রীতিতে ঔপন্যাসিক অভিনব পদ্ধতি অবল্বন করেছেন। জেলে বসে কথকের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাদশার আত্ম কথায় স্মৃতিচারণের রীতিতে ঔপন্যাসি বাদশার কাহিনী তুলে ধরেছেন। স্মৃতিকথায় টুকরো টুকরো বিভিন্ন ছবি ছায়াছবির মতো উঠে এসেছে। বিভিন্ন বিস্তামালা একে একে বাদশার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। রাজনৈতির সংঘাত, জাতীয়জীবন, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, ঐতিহাসি পটভূমি শ্রমিক বাদশার উপলব্ধি ভাল লাগা মন্দ লাগা শৈশব পারিবারিক জীবন ও সংখ্যালঘু জনজাতির নানা কথা ঔপন্যাসি অভিনব আঙ্গিক শিল্প রূপের দ্বারা রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের একটি বড় অংশ কথক চরিত্র । কথক আমার কথা শিরোনামে তার কথা বলেছেন। উপন্যাসের কথকের নাম অরবিন্দ তার পিতা শিবকালী দেব বর্মণ প্রতিতামহ গুরুদাস দেব

শর্মন। এই কথকের বিভিন্ন উপলব্ধি ও আত্মকথার মধ্যে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি জীবনের ছায়া দেখা যায়। জীবনকে দেখার ভিন্ন কোন নিয়ে অঙ্কিত এই চরিত্র। উপন্যাসের একবারে শেষে এসে কথকের ভাবনার সঙ্গে এক হয়ে ঔপন্যাসি লিখেছেন জ্ঞজ্ঞমানুষ বাইরের প্রকৃতিক কতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃ প্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায় মানুষ তার জানার সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্য তার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আমাদের শরীরে আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোনো খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা। বাইরের ও অন্তঃ প্রকৃতি দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ অনেক সময় করেছেন কথক। তার নিজেকে নিয়ে এই পর্ববেক্ষণ বিশ্লেষণ এবং জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিরে ব্যক্তি জীবনের নানা সংগ্রাম, সংঘাত ও জয় পরাজয় নিহিত রয়েছে। জেলে বসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে জানার ও উপলব্ধির এক বিশেষ লড়াই করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে কথকের ভাবনা ফুটে উঠেছে। কথকের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চরিত্রে ছোট ছোট দুর্বলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শিল্পের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

একটি বিভীষিকার রাত নিয়ে উপন্যাসের শুরু আবার কথকের কথা বলাও শুরু। মগে নিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত আমাদের বন্ধুদের লাশগুলো এনেছিল দেখাতে। তা দেখে কথক তার বন্ধুদের সঙ্গে সকাল থেকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে গুম হয়ে বসেছিল একে একে খাটিয়াগুলো এনে নামিয়ে রাখে এবং তুলে নিয়ে যায়। সঙ্গীদের গলা অবধি চাদরে ঢাকা। খুলো মাৎ শ্লোগানে সারা জেলখানা কাঁপিয়ে তোলে তারা। তারপর যে যার সেলে ফিরে যায়। জেলে ক্লান্তিতে শুয়ে শুয়ে তার দাদুকে মনে পড়ে। কথকের সমস্ত সত্তার সঙ্গে জুড়ে ছিল তার দাদু। দাদুও উপলব্ধি করতে পারে কথক অরবিন্দকে। অরবিন্দ হাঙ্গার স্ট্রাইকের রাজনৈতিক বন্দী। সেলের ভেতর থেকে সে উপলব্ধি করে ভয়ে মুখ শুকিয়ে খোঁড়া পায়ে দাদু আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সশস্ত্র পুলিশ জেলখানাটাকে ঘিরে রয়েছে দাদু নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছিলেন। দাদুর কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে ভয়টাকেও অনেকটা গা-সওয়া করে নেয়। কেননা, সে বুঝেছে ভয়ের কথা যত ভাবা যায় ভয় তত পেয়ে বসে একদিন অনেক রাতে যখন একতলায় অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন চলছিল চোঙ মুখে দিয়ে বক্তৃতা। বক্তৃতা চলতে চলতেই ঝনঝনাৎ করে সামনের গেটটা খুলে যাওয়ায় একটা

আওয়াজ হয়। তারপরই আলোয় ঝলমল করে উঠল কয়েকটা লাঠি আর ঠিক সেই মুহূর্তে এদিক থেকে এক

পসলা শিলা বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ি মরি করে পালানোর সে কী দৃশ্য! এদিক থেকে তখন জয়োল্লাসে স্লোগানের পর স্লোগান উঠছে। ফটকের ওপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। হঠাৎ বিনু মেঘে বজ্রপাতের মতো ফট্-ফট্ করে একটা আওয়াজ। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল-গুলি! সামনের ভিড়টি সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ তুলে পেছনের দিকে আছড়ে পড়ল। এবার যে যার ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়োঞ্জ এরপর কথক সঙ্গী সহ পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুক্তি নেয়। একতলা থেকে সবাই জোটবদ্ধ হয়ে তিনতলায় জড়ো হয়। আর কেউ বাইরে আছে কিনা দেখে নিয়ে ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারী ভারী লোহার খাট ফেলে দরজার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাট টেনে টেনে সিঁড়িটা নিচে থেকে ওপর অবধি জ্যাম করে দিয়ে একতলা দোতলা খালি করে দিয়ে সবাই চলে যায় তিনতলায়। সিঁড়ির মুখে মজুত করা হয় বোতল গোলাম আর ইটপাথর। ''ভয়ের মত সাহস জিনিসটাও যে ছোঁয়াচে'', ছুটে লোহার খাট টানতে টানতে বার বার কথাটা মনে হয়েছিল কথাকব। নাকি ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম এবং ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ ভয়ের কিছু ছিলনা বলেই নিজেকে আমার সাহসী বলে মনে হয়েছিল? নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করা, এই সময় থেকে শুরু হয় কথক চরিত্রে। তার মধ্যে ঘটে যায় ওলটপালট। তাই নিজেকে নিয়ে তার অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক ভয় সেবলে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। এই উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গি লেখক অরবিন্দের মধ্যে অসাধারণ শিল্প চাতুর্যে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দ বলে আমাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে আমার দাদু। সষানের দড়ি দিয়ে বাঁধলেও কথা ছিল, দাদু আমাকে বেঁধেছে ভালবাসার মায়াডোরে। নইলে আমার তো আজ জেলে থাকার কথা নয়। পার্টি বলেছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে। দাদু রাজি হয়নি। দাদু বলেছিল, আমি তো তোকে পার্টির কাজ করতে বারণ করছি না। ধরা পড়ে জেলে গেলেও আমার আপত্তি নেই। ইন্টারভিউ তো পাব। কিন্তু এই বার? দাদু বুঝুক, বাইরে আর ভেতরে কোনো তফাৎ নেই। যেদিন আমার লক-আপে যেতে অস্বীকার করলমা ঠিক সেই দিনই ছিল আমার ইন্টারভিউ। লুচি আর পায়েসের কৌটো হাতে নিয়ে আমাকে না দেখে কী মন নিয়ে দাদু ফিরে গিয়েছিল বেশ বুঝতে পারি। পরের দিন থেকে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হবে দাদু জানত। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিল পরের দিন। কারা যেন রাষ্ট্র করে দিয়েছিল যে, আমি মারা গিয়েছি। গুজবটা কি দাদুর কানে পৌছেছিল ? দাদু ,দাদু, দাদু! আচ্ছা দাদুকে সামনে খাড়া করে আমার নিজের দুর্বলতা কি আমি আড়াল করছি না? এই অনাবিল আত্মবিশ্লেষণ অরবিন্দ

চরিত্রটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পথচলার ও জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়, শুধু জীবন নয়, জগৎ-প্রকৃতিকে দেখার মন ছিল কথকের। কথক প্রকৃতিকে ভালবাসতে জানে। কথক চরিত্রে গাম্যজীবনের স্মৃতি ও প্রকৃতি প্রেম একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে মনে মনে ভাবে সকালে রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। খুব লোভ হচ্ছিল শুয়ে শুয়ে আকাশটাকে দেখবার। ছেলেবেলায় ঘাসে শুয়ে আকাশটাকে নিয়ে মনে মনে আমি খেলতাম। অনেকটা সিনেমা দেখার মত। চলন্ত ভেড়ার পাল, রাখল কত সব মজাদার মুখ উদ্ভট জানোয়ার। কিন্তু ন-নম্বরের মাথঅয় ছোট্ট একটা নীল ফালির মত আকাশ আর একটা চারাগাছ ছাড়া আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর কিছু নজরে আসছিল না। মুঠোটাকে গোল করে দৃষ্টিটাকে চারা গাছে ফেলতেই বিরাট একটা গাছ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, কালীতলার সেই জঙ্গলের কথা। বছরে একটা দিন আমরা গাঁ সুদ্ধ সবাই সেখানে যেতাম বনভোজনে। সেই একটা দিন কোনো জাত মানামানি থাকত না। সবাই আমরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেতাম। বিল থেকে তুলে আনা হত পদ্মপাতা। পদ্মপাতার গন্ধটা নাকে এখনও লেগে আছে। বস্তুনিস্ট প্রকৃতি প্রীতি কথক চরিত্রের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। শঙ্করের মুখে অরবিন্দ একপ্রকার বা কথা শোনে ঘরে সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে রান্না করা পক্ষর চরে মাঝিরা নাকি এক অদ্ভুত কায়দায় রান্না করে। শঙ্কর বলল টাটকা ইলিশ মাছ নেবে। তারপর কাটবে। উঁহু ছুরিবঁটি নয়। ধারালো বাঁশপাতা দিয়ে। তারপর লঙ্কাবাটা নুন-হলুদ দিয়ে কলাপাতায় মুড়ে একটু গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর রাখবে। ওপরে বালি চাপা দেবে। রান্না হবে রোদে তাতা বলিতে তেল তো ঐ ইলিশের গায়েই আছে। ভাতটাও ঐ বালির আঁচেই বাঁধা হবে। ঐ ইলিশ দিয়ে ঐ ভাতের নাকি তুলনা নেই।

কথক অরবিন্দদের একটি গুপ্ত সমিতি ছিল। তার নাম কারখানা। তাদের মধ্যে গৌহরি সেই সমিতির নাম রাখতে চেয়েছিল খামার। কিন্তু এ নামে শেষে মার কথাটা থাকায় অরবিন্দ আপত্তি ছিল। জেলে বন্দী থাকলে বাইরের বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া হয় অরবিন্দ চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরবিন্দ জেলে। সেবার হাঙ্গার স্ট্রাইক দশদিনে মেটে। বন্দী অরবিন্দ ভাবে আমার বন্ধুরা? কই তারা তো কেউ একটা চিঠি চাপাটি দিয়েও কোনদিন আমার খোঁজ নেয় না। পুলিশ পেছনে লাগবার ভয়? পুলিশ কি কচি খোকা? তারা জানে না, কোন্ কোন্ বন্ধুর বাড়িতে বসে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতাম? ধরবার হলে এমনিতেই তাদের ধরত না? কিন্তু পরক্ষণেই তার হুঁশ হয়। বন্ধুদের প্রতি আমি অবিচার করছি। তাদের সকলেরই নিজের নিজের জীবন আছে। নিজের

নিজের সমস্যা আছে। এই দেড় বছরে আমিই কি চিঠি লিখে কখনও তাদের খবরা খবর করেছি? তাহলে? আসলে অভিমানটাও বন্দিদশা থেকে আসে। বাইরে হাসপাতালে থাকলেও ছেলেমানুষের মত এই রকমের একটা বায়না আমাদের পেয়ে বসে। আমি শহীদ। আমি গেলাম। আমাকে দেখো। এই রকমের একটা ভাব। এক কথায়, আমাকে নিয়ে আদিখ্যেতা করো। কথক নিজে বন্দী হয়েও বন্দী মনের অন্তর্লোকের কথা খোলা মনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ঔপন্যাসিকের নিখুঁত আত্মবিশ্লেষণের শিল্পিত রূপ এখানে কথক চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন। জেলে বন্দী একটি কয়েদি আবদুলের পকেটমারের সত্য মিথ্যা প্রসঙ্গে লেখক অকপটে কথকের নিজের কথা বলে - কয়েদিদের বলব কী, নিজের বেলাতেও তো সে জিনিস অহরহ দেখি। কোনো ঘটনা একটু দূরে গিয়ে যখন স্মৃতি হয়ে যায়, তখন আর সেটা ফটো থাকে না- অনেকটাই কল্পনায় আঁকা ছবি। সেটা আর তখন যদ্দৃষ্টং থাকে না। যখন সজ্ঞানে কিছু ঢাকবার জন্যে কিংবা জাহির করার জন্যে আমরা নয়কে হয় কিংবা হয়কে নয় করি, তখনই আসে মিথ্যের ব্যাপার। এই মিথ্যাকে বলার ও উপস্থাপনের শিল্প কুশলতায় পাঠকের মনে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক চরিত্রের স্মৃতিচারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে বৈচিত্র্য দানের জন্য কাহিনীর পরিপূরক হিসেবে উপকাহিনী সৃষ্টি করে থাকেন। 'হাংরাস' উপন্যাসেও একই উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন ছোট ছোট গল্পের অনুসঙ্গ এনেছেন প্রাসঙ্গিক ভাবে। কথকের সঙ্গে জেলে বন্দী আবদুল। আবদুল নামের দুজন কয়েদি। দুজনই পকেটমার। এই পকেটমার চরিত্র দুটি মানুষের নানা জীবন অভিজ্ঞতার রূপ বৈচিত্র্য। প্রথম পকেটমারের গল্পে দেখা যায়আবদুলের জন্ম হিন্দু ঘরে। বাড়ি ত্রিপুরা জেলার কোনো গাঁয়ে। কথকের সামনে আবদুল তার পকেটমার হয়ে ওঠার কাহিনী বলে চলে। সে বলে, আমরা ছিলাম দু'বোন, এক ভাই। আমি বড়। আমাদের খুব ছোট রেখে বাবা মারা যায়। আমরা তিনজনেই ছিলাম পিঠোপিঠি। আমার তখনও ভাল জ্ঞান হয়নি। তাই বাবার কথা মনেই পড়ে না। মা-র কথা এখনও আমার মনে পড়ে। কিন্তু ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা আমার কাকা জ্যাঠারা মা-কে ঠকিয়ে জমি জায়গাগুলো হাত করে নেয়। মা এর ওর বাড়িতে কাজ করত। ঢেঁকিতে ধান ভানত। আর কাঁদত। মাকে কাঁদতে দেখলে আমার খুব মন খারাপ হত। না, খোদা নয়, আমি তো তখন হিন্দু ছেলে, মনে মনে ভগবানকে ডাকতাম। বলতাম, আমাকে তাড়াতাড়ি বড় করে দাও, ভগবান- গায়ে জোর দাও কাকা জ্যাঠাদের আমি মারব। শুনেছিলাম লোকে শহরে যায়। সেখান থেকে টাকা রোজগার করে বস্তা বস্তা টাকা বাড়িতে পাঠায়। মাকে বলিনি। একাই একদিন গ্রাম থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে কীভাবে কতদিনে একটা জাহাজঘাটের মত জায়গায় যে পৌঁছেছিলাম মনে নেই। এইটুকু মনে

আছে যে, রাত্তিরে ইলেকট্রিক আলোয় জায়গাটা ফুটফুটে হয়েছিল। তারপর এক ফাঁকে টুক করে একটা জাহাজে উঠে পড়েছিলাম। কী একটা যেন বড় নদী। কী বড় বড় ঢেউ। আমার খুব ভয় করছিল, কিন্তু আমি কাঁদিনি। তারপর কোথাও জাহাজ থেকে নেমে রেলগাড়িতে উঠেছিলাম। এসে নেমেছিলাম শেয়ালদায় সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এর ওর বগলের তলা দিয়ে গলে প্ল্যাটর্ফমের বাইরে কোনরকমে তো এলাম। রাস্তায় পা দিয়েই ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। চারপাশে সব দোকানপাট, লোকের ভিড়, গাড়িঘোড়া কেথায় যাব কিছু জানি না। বলতে গেলে তখন তো খুবই ছোট। ছয় কি সাত। আমি তো বড় রাস্তাটা ধরে সোজা হাঁটতে লাগলাম হাঁটতে হাঁটতে যখন মৌলালির মোড়ে পৌঁছেছি, তখন কোথাও কিছু নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। ঠিক সেই সময় দাড়িঅলা লুঙ্গিপরা একজন লোক এসে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল খোকা, তোমার খিদে পেয়েছে? চলো, খাবে চলো। বলে দোকানে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। তারপর ওর ডেরায়। এই থেকে নাম হল আবদুল। সেই লোকটারই আবদুলকে মানুষ করল। পকেট মারতে শেখাল। সেই থেকে আবদুল শিখল কি করে পকেট মারতে হয়। পকেটমারের বিষয়টী পুরোটা ম্যাজিকের হাত-সাফাইয়ের মত। হল চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপার। নজরটাকে সরিয়ে দেওয়া। এ-কাজে লোক চিনতে হয়। কার আছে কার নেই, চোখ মুখের ভাবেই বোঝা যায়। মানুষকে অন্যমনস্ক করার হাজার গন্ডা উপায় আছে। ধরুন, একজনের গলার নলী বরাবর বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়ে আপনি দিব্যি বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার ডান হাতটা সেই ফাঁকে লোকটার বুকপকেট ফাঁক করছে। এখন তো আরও সুবিধে। ট্রামে বাসে যা ভিড়। পয়সা বার করতে গিয়ে বিশিষ্ট ভদ্দরলোকদের হাতও পরের পকেটে ঢুকে যায়। আর সুবিধে হয় কোনো লোক যখন ওঠে। প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই তখন বেসামাল হয়ে পড়েন। আমাদেরও সেই মওকা আর একজন পকেটমারের গল্প অরবিন্দের আগের জেলে জানা। সে ছিল ও ফগজ চোর। সেই জেলে তার নাম আবদুল। খাস কলকাতায় তার নাম আবদুল। বজবজ মেটেবুরুজে তার নাম ফুলচাঁদ। একদিন হাসপাতালে একজন কমরেডকে দেখে ফেরার সময় কথক দেখে আমগাছের তলায় জুয়োখেলার দলের একজনের সঙ্গে আবদুল দাঁড়িয়ে। আবদুলই কথা বলছিল। কথক একটু এগিয়ে গেল। ইদুঁর পচা একটা বিশ্রী গন্ধ। সে যত এগোয় গন্ধটা ততই নাকে এসে লাগছিল। কথা বললে ভক্ করে কথকের নাকে এসে লাগে ইদুঁর পঁচা একটা বিশ্রী অসহ্য গন্ধ। কথা থামিয়ে দিলে গন্ধটা একটু কমে। কথকের ভাষায় এক মুহূর্তে আমার কাছে সব জল হয়ে গেল। আবদুল ওর লাইনে আবারও উঠবার চেষ্টা করছে। গলায় থলি পনাচ্ছে না। গন্ধটা কাঁচা অবস্থাতেই থাকে। পরে গলার ঘা শুকিয়ে থলি যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন আর বাইরে থেকে ধরাই যাবে না।

গলায় থলি থাকলে তার দাম আছে। টাকা পয়সা, সোনাদানা রাখা যায়। হাজার গা তল্লাসি করুক ধরতে পারবে না। এমন কী কেউ ঠেকায় পড়লে গুদাম ঘরের মত চড়া দামে থলিটাকে ভাড়াও দেওয়া যায়। এই দুটো চরিত্রে পকেটমারের জীবনও শিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজ দায়বদ্ধ শিল্পীর নিষ্ঠায় গলায় থলে তৈরী মানুষটাও এক বিশেষ ধরনের মেহনন করে। মেহ্‌তন করে বিশেষ কৌশলে সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি পকেটমারও। জেলে বন্দী এই কয়েদিরা কথকের মুখে সমাজতন্ত্রের কথা শোনে, শোনে মার্কসীয় তত্ত্ব, শোনে শ্রেণী সংগ্রামের কথা। সে কথককে কথা দেয় যে, সে এবার ফিরে গিয়ে ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দিয়ে পার্টিতে নাম লেখাবে, অন্য পকেটমার অবদুলও এই শ্রেণী সংগ্রামের কথা শুনে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সেকথক কে বলে - ভুখ হরতালের ওপর আপনি যে গানটা বেঁধেছিলেন সেটা আমি সাত নম্বরের মাস্টারমশাইকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। আমি বাইরে গিয়েই ওটা ছাদি ফেলব। লোকজনদের দেব। আরেকটা কথা, দাদাবাবু, আপনাকে বলছি, আপনি যখন বাইরে যাবেন, কাজকর্ম করতে গেলে তো টাকার দরকার হবে আপনি শুধু আমাকে একটা খবর দেবেন। এখানে পকেটমার চরিত্রদুটি অনেক উচুঁতে উন্নীত হয়। এখানে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সমাজ বদলের প্রত্যয়। অশিক্ষিত, অর্ধ্য শিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ তার লেখনীতে হয়ে উঠে একই দলের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। এখানে লেখকের জীবন দর্শনের প্রতিফলন। এদের জীবনের ঘটনার সত্য-মিথ্যা প্রসঙ্গে লেখক দার্শনিক ভাবনার আশ্রয় নেন। তিনি লেখেন এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, খাঁটি সত্যি বলে জীবনে কিছু নেই। প্রকৃতির কথা বলছি না। আমি বলছি মানুষের জীবনের কথা দড়িকে সাপ বলে আমি ভুল করছি। ভুল করে আমি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যতক্ষণ সত্যি ততক্ষণ সাপটাই বা সত্যি হবে না কেন? শুধু নিজের কাছে নয়, পরের কাছেও? যে ওটাকে দড়ি হিসেবেই দেখছে, সে কেন এটাও ভাববে না যে, দড়িটাকে সাপ বলেও ধরে নেওয়া যায়? সত্যি আর মিথ্যের সম্পর্কটা বোধ হয় শুধু ঠোকাঠুকিরই নয়, দুটোর মধ্যে একটা ঠেকাঠেকি হওয়ার সম্পর্কও হয়ত থেকে যায়।ঞ্জ লেখকের উন্নত সমাজভাবনা ও দার্শনিক চেতনায় পকেট মারের জীবন সমাজ সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ যাই থাকুক, ছোটবেলা থেকে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনপ্রাণ জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কবিতা ও গানের ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রসঙ্গেও স্বাভাবিক ভাবে এসে যায় কথকের ভুখ হরতালের দিনগুলিতে। একদিন সকালে বেড়িও কিংবা গ্রামোফোনে বাজছিল রোদন ভরা এ বসন্ত, সখি কখনও আসেনি আগে। তাঁর ভাবনা হয় - এগান বাজানোর পেছনে নিশ্চয় কোনো ষড়যন্ত আছে। যাতে আমাদের মন আন চান করে।

যাতে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। বাঁচবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙি।--- মনে আছে, একবার ভুল করার পর যখন নিভুলভাবে বুঝে গেলাম যে রবিঠাকুর বুর্জোয়া তাঁর লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে, তখন ন-নম্বরের বিল্টুবাবুকে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, আচ্ছা তার মানে রবি ঠাকুরের গানুগলোও তো গাওয়া চলবে না? ভদ্রলোক মার্ক্সবাদের তত্ত্ব ভাল বোঝেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। জেল কমিটির সদস্য। কিন্তু মেকি কমিউনিস্ট নন। আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, কেন? না গাইলে খুব কষ্ট হবে? আমার ঠিক উল্টো বরং গাইলেই বেশি কষ্ট হয়। শুনলে আরও। বিশেষ করে, যদি সেইসব গান হয় যা ছেলেবেলায় শুনেছি। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে এবং মন কেমন করে? একা একা কোথাও গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে এই মনোভাব প্রকাশে ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতা শিল্পগুণের এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের একদিন দুপুরে অরবিন্দের তন্দ্রায় একটু চোখ বুঁজে গিয়েছিল। দিনে দুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখে। মনে পাপ বিস্তা করছে। তার নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য টেবিলের ওপর প্রচন্ড জোরে ঘুষি মারে। কেননা তার ভাবনা হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙে বাইরে গেলে পার্টি তাকে তাড়িয়ে দিলে দিক। তাহলে সে দূরে কোন গ্রামে যাবে যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। গ্রামে গিয়ে মাস্টারি নিবে। চাষীদের মধ্যে কাজ করবে। সমিতি গড়ে তুলবে। এ ব্যাপারে কাউকে না, এমনকি পার্টিকেও তোয়াক্কা নয়। কেবল আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল শুধু একজন? আমার দাদু। অথচ আমি জানি, দাদু এখন দিবারাত্তির ভগবানকে ডাকছে। বলছে ঠাকুর তুমি আমার অরুকে গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছ, এবার ভালয় ভালয় হাঙ্গার - স্ট্রাইকটাও যেন ও পার হতে পারে। পার হতে পারে? তার মানে, মাঝরাস্তায় যেন ডুবে না যায়? ডুবে যাওয়া মানে হাঙ্গার স্ট্রাইক ছেড়ে দেওয়া? কিন্তু আমি যদি গিয়ে বলি - না দাদু, আমি ডুবিনি। হাঙ্গার-স্ট্রাইক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। দাদু হাসবে। বলবে, রাখ রাখ। তোদের হাঙ্গার স্ট্রাইক তাহলে আজকেই মিটল? তোদের সবাইকে ছেড়ে দিল? জামাল বংশী সবাইকেই? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দাদুর মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল কেন? মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা হয়ে গেল কেন? মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন - এসে ভাল করেছিস। এই শরীরে এখন আর বাইরে বেরোসনে। তাছাড়া তাছাড়া! তাছাড়া কী? আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, দাদু কি তাতে খুশি নন? লোক লজ্জার কথা ভাবছেন? নিজেকে কেন আমি বাঁচালাম? দাদুর জন্যেই তো হঠাৎ গা ছাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আর অর্ধচেতনে নিজ্ঞান মনে নিজের প্রাণের প্রতি মায়া এবং লোক লজ্জা ও দাদুর বিরোধ মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরেছেন। এতে করে শিল্পচেতনা ও জীবন অভিজ্ঞতার যুক্তিনিষ্ট প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করার সময় নিজের কাজের প্রতি মন থেকে জোর পাওয়ার জন্য অরবিন্দ ক্যাপিটাল পড়ে। কোন পুস্তক পাঠে পাঠকের ইচ্ছে এবং তন্ময়তার মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা বলেন ঔপন্যাসিক। এই সঙ্গে উৎপাদন ও শ্রমের পারস্পরিক সম্পর্কে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট ধারণা দেন। তিনি লেখেন মানুষ আর প্রকৃতি, এই দুই শরিকে মিলে হয় খাটুনির ব্যাপারটা। মানুষ প্রকৃতিরই একজন হয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়, তার হাত পা মাথা - এসমস্তই প্রকৃতিদত্ত - সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির জিনিসগুলোকে এমন করে সে বাগিয়ে নেয় যাতে তার নিজের অভাব মেটে। বাই প্রকৃতিতে হাত লাগিয়ে, তাকে বদলে সেই সঙ্গে মানুষ নিজের স্বভাবেও বদল আনে। নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষ তাকে মুঠোয় আনে।

মাকড়সাও জাল বোনে, মৌমাছিও বাসা বানায়। কিন্তু মানুষ যেটা করে সেটা আগে থেকেই তার মাথায় থাকে। তার হাতে পড়ে উপাদানগুলোর শুধু যে একটা গড়ন পায় তাই নয়? তার নিজের মতলব হাসিল হয়। তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যেভাবে যা করবার সে তাই করে। তার জন্য তাকে মনে প্রাণে হতে হয়। আর এই মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারটা ক্ষণস্থায়ী হলে চলে না। কাজের সময় হাত পা তো তাকে চালাতেই হবে; কিন্তু শুধু তাতে হয় না। যতক্ষণ কাজ হবে ততক্ষণ তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছেটাকে সমানভাবে ঠায় জুড়ে রাখতে হবে। তার মানে, রীতিমতো তন্ময়তা চাই। কাজের প্রকৃতি কিংবা কাজের ধরন মনকে যত কম টানবে খোশমেজাজে হাত পা চালাতে বা বুদ্ধি খাটাতে তত কম ইচ্ছে হবে ততই জোর করে কাজে মন বসাতে হবে। মার্ক্সের ওটাই ঠিক কথা। কাজটা কেমন, তারই ওপর মন লাগার ব্যাপারটা নির্ভর করে। বেশি জোরজার করতে গেলেই মন ভাঙে। কাজের সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেখক অরবিন্দের 'ক্যাপিটাল' পাঠের প্রসঙ্গ যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে ছ-নম্বর সেলের বরুণ বাবুর সঙ্গে আলাল চারিতায় সমাজের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক, সাহিত্যে মার্কসরাদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য , সাহিত্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মূলকতা, সৃষ্টির সঙ্গে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে সংকল্প সম্ভাবনা, সৃষ্টি ও প্রাণের বিষয় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরবিন্দের ভাবনার মধ্যে ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় নিহিত রয়েছে। মনের সঙ্গে বাইরের ঘটনার ও তত্ত্বের বিস্তর পার্থক্য থাকে। অরবিন্দ ফোর্সফিডিং এর সময় উপলব্ধি করে ভুখ হরতালের সময় জেলে জোর করে নলদ্বারা দুধ, ডিম ব্রান্ডি দিয়ে দেহে প্রাণের সাড়া জাগে এবং একটা অনিবর্চনীয় সত্য কিছু ঘটে যায়। ফলে আপাত দিক থেকে বন্দীরা ফোর্সফিডিং করাতে বাধা মিদলেও তাদের মন বাধা দিতে চায় না। নলের ভেতর দিয়ে পেটের মধ্যে দুধ যাওয়ার আরামের কথা বার বার মনে পড়ে অরবিন্দের নিজের ওপর নিজের রাগ হয়। সে

উপলব্ধি করে ভাল লাগাটা তার উচিত হয়নি। কেননা তাহলে সে ভেতরে ভেতরে চাইছিল যেখতে। এর জন্য ফোর্সফিডিং করার সময় তা করতে বাধা দিয়ে প্রায় কিছুত্ত করার কথা ভাবে অরবিন্দ।

অরবিন্দ হঠাৎ এক দিন জেলের মধ্যে পার্টির একটা সার্কুলার দেখে চমকে ওঠে। সার্কুলারে সোজসুজি লেখা তার এক সময়ের বিশেষ বনন্ধু সেকালের উদীয়মান কথাসাহিত্যিক মনীশ মজুমদার আর তার দলবল দালাল হয়ে গেছে। এককালের এম.এ ক্লাসের ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, পাঠক স্কুলের সাড়া জাগানো কথাসাহিত্যিক অনেক অভাবের সময়েও পার্টি ছাড়েনি। অথচ পার্টিই একদিন হঠাৎ ওকে ছেঁটে দেয়। ওকে একা নয়, ওদের গোটা দলটাকে। ও তখন পার্টিতে গুপ্ত ধরনের কাজ করছিল। বাইরে সবাই জানত সে বসে পড়েছে। গোপন কাজে সেটাই রেওয়াজ । হঠাৎ দালাল হয়ে যাবার সার্কুলারে কথকের বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে। তবুও বুদ্ধিজীবী মহলে সব কালে একশ্রেণীর মানুষ সমাজে দালাল হয়ে ওঠে। কথক ভাবে হয়ত মনীশ নিজে ওর মধ্যে ছিল না। তবুও দশচক্রে ভগবান ভভূত হয়। তাই কথকের বুক পরক্ষণে হিম হয়ে ওঠে - তাহলে কি কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না? কাউকে নয়? নিজেকেও নয়? কেননা মনীশের সঙ্গে তার অন্য সব বিষয়েই মনের খুব মিল ছিল। তাই দালাল হয়ে যাবার সার্কুলার পেয়ে অরবিন্দ মর্মে আঘাত পায়। যে কোন কারনে বুদ্ধিজীবী মহলে কেউ দালাল হয়ে গেলে তার সতীর্থদের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এখানে। বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই অনুষঙ্গ খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে।

জেলের ভেতরের বড়মাপের বন্দী নেতা শিবশম্ভু হালদার এবং তার দিদিমাদের দেখে কথকের সত্যিকার কমিউনিস্ট সম্পর্কে মনোভাব ও অবস্থান একটি অংশে সমম্পর্ক হয়ে ওঠে। কথক স্পস্ট করে জানায় সন্ত্রাসবাদ আর সাম্যবাদ দুটো দু ধরনের আদর্শ । ব্যক্তিত্বের এই তফাৎ কি শুধু আদর্শ থেকে আসে? --- লোকের কাছে যেটাকে আমি মেলে ধরি, সেটা আমার বাইরের মানুষ। যতক্ষণ না পেছন ফেরা অমনি আমার ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে আসে। সে তখন যা কিছু ভাল নিজের জন্যে তাড়াতে থাকে। পরের ছেলেকে রাস্তায় নামতে বলি, কিন্তু নিজের ছেলেকে বাড়িতে আগলে রাখি।

স্বভাবের এই একটা টান নিয়ে কেউ কথা তুললে বলব - ‘‘সে দোষ আমার নয়। যে অবস্থায় আমি মানুষ, সেই অবস্থার দোষ। অর্থাৎ এই সমাজ ব্যবস্থার। তার মানে নিজেকে বদলাব না। তার বদলে দুনিয়াকে বদলে দেব। দুনিয়াকে বদলালে আপসে আমিও বদলাব তা হয় না। সত্যিকার কমিউনিস্ট হতে গেলে, কথায় আর কাজে এক হতে হবে। দিমিত্রিকের সেই কথাটা মনে পড়ল, কমিউনিস্ট হতে হলে চাই স্পর্ধা, চাই গোঁ, চাই নিজের বিশ্বাসের জোর জেলখানায় শিবশম্ভু হালদার

এলেন। তার আসাটাকে বলতে হয় আবির্ভাব। কেননা ,তার আসবার রাস্তার দুপাশে সেপাই কয়েদি সবাই দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করছিল। কায়েদিরা তাকে বলে দেবতুল্য লোক। জেলে থাকতেই সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদে তিনি বিশ্বসী হন। কথক তাঁকে মুগ্ধ নেত্রে দেখে। অথচ এই নেতার বাস্তব চরিত্র দেখে কথক রাগ ও স্থানীয় জর্জারিত হয়। যে জেলে কথক ও তার সঙ্গীরা সারবন্দী লোহার খাটে থাকে, সেই ঘরের এককোণে একটা চট-ঢাকা দেওয়া প্রস্রারের জায়গা। রাতিটাতে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হয়। নিজেদের কিচেন ছিল না। স্নানের ব্যবস্থা বলতে সেই। তোল্ বাটি ঢাল মাথায়, গোছের। যেই জেলে শিবশম্ভু হালদার একজনকে সরিয়ে দখল করে একটা ভাল জায়গা। জেলে নিজেকে আলাদা করার জন্য খাটের চারপাশে খাটিয়েছেন ঘেরাটোপ। আসতে না আসতেই তার জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। তিনি ফালতুদের দ্বারা নিজের পা টেপান। চলাফেরায় যেন জেলখানাটা তার জমিদারি। অথচ আর আগে পর্যন্ত কথক তাদের নেতা ও পার্টির সাধারণ কর্মীদের একই ভাবে থাকার কথা জানত। উভুয়ের মধ্যে কোনো তারতম্য থাকার কথা জানত না। হালদার মশাইকে দেখে কথকের বিশেষ অভিজ্ঞতা হল।

আর কথকের আমার একটি ভৎসনা কথককে ভীষণভাবে আঘাত করে। সে কালে খাওয়ার অভাবে দেশে খুব কষ্ট চলছে। তার দাদুর বাড়িতে দুটিমাত্র ছোট ছোট ঘর। কিন্তু লোক একগাছা। তার দাদুর এক বিধবা বোন, তার কাচ্চা বাচ্চা। প্রবাসী এক মাসির কলেজে পড়া ছেলে। বুড়ো বয়সে চাকরি খোয়ানো দাদুর ছেলেবেলার এক খেলার সাথী। কাজেই বাড়িতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। সেই বাড়ির তার দিদিমা বা আম্মার সঙ্গে বদল ও পড়ায় যত গরিব দুঃখীদের ভাব। কার ছেলের জামা নেই, তাকে তাদের পুরনো জামা দেওয়া, কারা ঠোঙা বানিয়ে সংসার চালায়। তাদের বাড়ির সমস্ত পুরনো কাগজ দেওয়া - এসব কাজ করতো সেই আম্মা। একদিন তার আম্মা মুন্সিগঞ্জের একটা ফ্যামিলিকে কালী ঘাটের রাস্তা থেকে তুলে এনেছে বাড়িতে। আম্মার কথা আমি বলে দিয়েছি বাইরের বারান্দাটায় থাকবে। নিজেদের রান্না নিজেরা করে নেবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে নিজেদের একটা ব্যবস্থা করে বস্তিতে ঘর ভাড়া নেবে। কিন্তু ওদের আনার পর থেকে বাড়ির সবাই কথকের আম্মাকে কথা শোনাচ্ছিল। তার ভরসা ছিল অরু ও তার ছোট মামা। কেননা ওরা স্বদেশী করে। কিন্তু ওরা ও এটা জে দুজনে প্রায় এক সঙ্গে গলায় ঝাঁঝের সঙ্গে বলে - ‘‘কিন্তু বারান্দাটা তো বাইরে নয়’ এতে তার আম্মা গুম হয়ে বলেছিল এ বাড়িতে সব সমান। মনে মুখে কেউ এক নয়।’ এই ঘটনায় কথক ও ঔপনাসিক দেখিয়েছেন প্রকৃত কমিউনিস্টদের জীবনশৈলী ও আদর্শবোধ কেমন হওয়া আবশ্যক। যে জীবন শৈলী শিবশম্ভু হালদারের বা যে আচরণে আম্মা মর্মাহত হন তা মার্কসীয় আদর্শ নয়। সমাজ

ব্যবস্থায়, পদ্ধতিগত ত্রুটিতে মার্কসীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা এভাবে পদে পদে ব্যাহত হয় এই বিষয়টি উপন্যাসের অঙ্গ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই আম্মার কাছে কথকের ছোট মামা একদিন মারা গেল। যদিও এখনও সে বেঁচে আছে। লড়াই শেষ হতে না হতে সে কীভাবে কীভাবে যেন বিদেশ চলে গিয়েছিল সেখানে সে মেম বিয়ে করেছে সেই চিঠি আর ফটো আসার পরই চিঠিটাতে আগুন দিয়ে অরবিন্দকে তার আম্মা বলেছিল এই দ্যাখ মা হয়ে আমি মরা ছেলের মুখে আগুন দিচ্ছি। আম্মা চরিত্রের স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয়তাবোধের গভীরতা খুব স্বল্প অবয়বে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। অরবিন্দ সেই দাঙ্গার থেকে একটাই শান্তির জায়গা অরবিন্দ খোঁজেন সেটি শ্মশানে আম্মাকে কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার সময় দেখলাম রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। শ্মশানে পা দিয়ে মনে হল বাঁচলাম- এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত। দেয়ালের এদিক ওদিক থেকেই গায়ে কাঁটা দিয়ে কখনও বন্দেমাতরম, কখনও আল্লাহু আকবর আওয়াজ ভেসে আসছিল। আম্মার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে মানবিকতা মৃত্যু। এই মৃত্যু তাই উপন্যাসে আসামান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকময়তায় সার্থক মৃত্যু চেতনা হয়ে ওঠে।

কথকের কথায় ঔপন্যাসিক সমকাল বোধের পরিচয় দেন। শুধু জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নয়। আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রেক্ষিত উপন্যাসে অসাধারণ শিল্পকুশলতায় পাঠকদের বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সে সময় মার্কিন মুলুকে ধর্মঘটের ঢেউ ওঠে। বিদ্যুৎগতিতে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলে নাৎসীরা। --- সেভিয়েটের একটার পর একটা জায়গা জার্মাণরা সত্যিই দখল করে নিচ্ছে। এককেটা শহর যায় আর আমাদের বুকে যেন এককেটা শেল এসে লাগে, রাস্তাঘাটে লোকে আমাদের ধরে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নেয়। বলে কি হে লাল ফৌজ, তোমাদের বাপের দেশ তো এবার গেল। স্টালিন গ্রাড থেকে লড়াইয়ের তখন মোড় ঘুরে গেছে। একে একে জার্মাণদের হাত থেকে নিজেদের শহরগুলো কেড়ে নিচ্ছে লাল ফৌজ। সেটা ছিল ঐ ধরনের একটা জবর বিজয়ের দিন। নিশান দিয়ে চারদিক লালে লাল করে আমরা সভা করছি। সেদিন আমাদের সবাই আনন্দে নাচানাচি করছে। বিশ্ব মহা সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে। সেভিয়েতের লাল ফৌজের সমেগ ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকদের একাত্মতার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিকের সমাজতান্ত্রিক চেতনা কথকের ভাবনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়। কথক বলে দেশ চাইছে স্বাধীনতা। আমরা চাইছি জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা। একদল বলছে, বিদেশী সরকারের কাছে আমরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছি। আমরা বলছি, সমাজতন্ত্র গেলে স্বাধীনতা থাকে না।

রাস্তায় মার খাচ্ছি, তবু বলছি দুনিয়ার মজুর এক হও। --- আমার তো মনে হয় শ্রেণী সংগ্রামও সেই জন্যে। যাতে শেষ পর্যন্ত সব মানুষের ভাল হয়। উৎপাদনের কলকাঠি যারা নিজেদের ট্যাঁকে পুরে রেখেছে, তারা চায় শুধু নিজেদের ভাল। দল বেঁধে জোর করে সেটা কেড়ে নিতে হবে, যাতে তার ওপর সকলের অধিকার বর্তায়। একাজে সবার আগে থাকবে সঙ্ঘবদ্ধ সেই কাজের মানুষেরা, যাদের নিজের বলতে কিছু নেই। কিন্তু এতে আসবে মানুষের মুক্তি। লাভ নয়? ভোগ হবে লক্ষ্য। শুধু শরীরের সুখ নয়, মনের স্ফুর্তি। এখানে অরবিন্দ মার্কসীয় মতবাদে দিক্ষীত রাজনৈতিক কর্মী । রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে এখানে শিল্পীর সচেতন শিল্পনিষ্ঠা যুক্ত হয়েছে। লেখক রাজনৈতিক চেতনাকে এখানে শিল্পকুশলতায় উত্তীর্ণ করে তুলেছেন। অরবিন্দ ব্যক্তির গন্ডী উত্তীর্ণ করে এখানে একটি বিশেষ জীবনাদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠেছে। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। অরবিন্দের জীবনের কথা বলতে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রেম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে অরবিন্দের জীবনেও দেখা যায়। কেননা সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে বিয়ের একটা হুজুগ পড়ে গিয়েছিল। যদিও তার আগে পর্যন্ত পার্টিতে একটা চিরকুমার সভা বানানোর ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে যারা পার্টিতে হোল টাইমার তাদের বিয়েটা ছিল ব্রাত্য। এরপর ঠিক হয় সংসার থেকে, সমাজ থেকে সরে যাওয়া নয়, গৃহী হয়ে সমাজের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দেবার পালা শুরু হয়। একা পার্টির লোক হওয়া নয়, গড়তে হবে পার্টি পরিবার। ধীরে ধীরে অরবিন্দ উপলব্ধি করে তাকেও একজন জীবনসাঙ্গিনী পাওয়া দরকার। এরপর পার্টিতেই প্রতিমা নামে একটি মেয়ের প্রতি অরবিন্দ প্রেম উপলব্ধি করে। তার এই প্রেম ভাবনার গভীরতা। সেই প্রতিমাকে কয়েকদিন মিটিঙে দেখে অরবিন্দর একটু মন টলেছিল। অরবিন্দর মনে হয় মেয়েটি বেশ তো দেখতে। অরবিন্দর তখন সারা শরীরে একটা শিহরণের ভাব। সে প্রতিমাকে নিয়ে বিপ্লবের সব দুঃখ বরণ করে নেবার স্বপ্ন দেখে। প্রতিমার পাইক পাড়ার বাস আসছে দেখে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সে বলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এর প্রতিক্রিয়ার কথা অরবিন্দ নিজে ব্যক্ত করেছে শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পেরেছি, এতেই তখন আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে আছি। ভিড় ঠেলে আপিসে ফিরে গেলাম যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আচ্ছা, বিয়ে করা মানেটা কী? ঘর বাঁধা। তা মানে, ঘর ভাড়া করা। বাজার করা, রান্নাবান্না ইস, এ-সময় আম্মা বেঁচে থাকলে খুব ভাল হত। আচ্ছা, একটা সংসার চালাতে কত টাকা লাগে? পরদিন অন্যদিক তাকিয়ে তার হাতে একটি কাগজ গুঁজে দিয়ে চলে যায়। অরবিন্দ একটি বাথরুমে কাঁপা হাতে চিঠিটি খোলে। গোড়ার লাইনে চোখ পড়তেই এক ফুঁয়ে কেউ যেন তাকে নিবিয়ে দেয়। সে লেখে কমরেড, মনে কিছু করবেন না। আপনাকে পছন্দ করি

কি একজনকে ভালবাসি। আশা করি, আপনার বঞ্চিত হব না। সেই সঙ্গে কামনা করি, পাপ জীবনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। বিপ্লবী অভিনন্দন সহ। এই চিঠি সম্বন্ধে অরবিন্দের মুখে ঔপন্যাসিক ব্যর্থ প্রেমিকের হতাশাকে একটি আঁচড়ে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দর চিঠিটা পড়ে নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হল। এভাবে বোঝে মাথায় কেন নিজেকে খাটো করতে গেলাম? মেটেটি আমার সম্বন্ধে কী বিশ্রী ধারণা করল? ভাদ্র মাসের কুকুর নাকি আমি? সে সঙ্গে একটা মজুর বিষাদ আমার মন ছেয়ে ফেলল। মধুর কেননা একটা ব্যথার জায়গা থাকলে তারও আলতো করে আঙুল বোলাতে ভাল লাগে। একটি উপমা দ্বারা ঔপন্যাসিক মধুর বিষাদের উপলব্ধি বিশ্বাস্যভাবে তুলে ধরেছেন। সেই প্রসঙ্গে প্রতিমা নামের তার বাল্য প্রেমের স্মৃতি মনে আসে। অরবিন্দ বলে ঐ প্রতিমা আমাদেরই ক্লাসে পড়ত। প্রফেসরের টেবিলের মুখোমুখি আমরা। তাঁর ডান দিকে মেয়েরা আমরা কয়েক জন বসতাম পেছনে। মেয়েদের দিয়ে তাকাতাম। তার মধ্যে বিশেষ করে একটি মেয়ে। তারই নাম প্রতিমা। যাকে হরিণ চোখ বলে, ঠিক সেই রকম। কিছু দিনের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করে ফেললাম যে, প্রতিমাও আড় চোখে আমাকে দেখে। এটা নাকি আরও বোঝা যায়, যেদিন ক্লাসে আমি থাকি না। আস্তে আস্তে এমন হল যে, ক্লাসে আমি সারাক্ষণ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। প্রতিমা তো মেয়ে ওর পক্ষে সম্ভব হত না। তবে মাঝে মাঝে চোখের চাউনিতে বুঝিয়ে দিত যে, এই লুকোচুরি খেলায় তারও মজা লাগছে। নাটক ক্রমে জমতে চলেছে। আলাপ কর। অন্য মেয়েরা আমাকে আর প্রতিমাকে নিয়ে খোশগল্প জুড়েছে, এটা বুঝতাম ওদের গা টেপাটেপি করে হাসবার ধরণ দেখে প্রতিমাও ক্লাসে গিয়ে প্রথমেই আড়চোখে খোঁজে অরবিন্দকে। এরপর অরবিন্দ ক্লাসের বাইরে প্রতিমা ধরবার কথা ভাবে। কিন্তু সে রোজ গাড়িতে আসে না। তাকে একদিন আলিপুরের ট্রামে দেখে, বাস থেকে নেমে সে ও ট্রামে চাপে। এত বুঝে যায় যে প্রতিমা কোন স্টপ থেকে গাড়িতে ওঠে। এরপরে প্রতিমাকে সে সেই স্পটো পেয়ে যায় । কিন্তু তার মনের কথা আর খুলে বলা হয়ে ওঠে না। এরপর প্রতিমাকে সে আর স্টপে দেখতে পায় না। প্রতিমা ক্লাসেও আর আসে না। তারপর নাগ নাম দিয়ে টেলিফোনের বইতে আলিপুরের সমস্ত নম্বর খুঁজেও প্রতিমার হদিশ পায় না। শেষ কালে যে ভাসা ভাসা একটা খবর পায় যে প্রতিমা রাঁচির মেয়ে। আলিপুরের এক মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থাকত। কিন্তু কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে ওর বাবা নাকি ভয়ে কলকাতায় নাম কাটিয়ে রাঁচি চলে যায়। ফলে তার প্রেমের প্রতিমার ক্ষেত্রে একেবারে বোধনেরই ভাসান হয়ে যায়। কৈশোর ও যৌবনে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার মাঝে প্রেম বিষয়কে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে শিল্পিত রূপ দেন। প্রেমের শুরু প্রেমের মাঝে ও

প্রেমের ব্যর্থতায় প্রেমিকের মনের গোপন কথা যুক্তি সহ মনস্তাত্ত্বিকের নিরিখে তুলে ধরেছেন লেখক। প্রেম ভাবনার কথায় 'হাংরাসে' উপন্যাসেক শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অরবিন্দ ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। মাঝে মাঝে তার নিজেকে নিয়ে ভয় হয় মধ্যবিত্তীয় স্বভাবের জন্য। ভয় হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক করার ক্ষেত্রে তার নিজের আত্মবিশ্বাসের প্রতি। এর মধ্যে একজন হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙেছে। সে মাঝারি চাষী, কিন্তু খেতমজুর নয়। যেহেতু সেও মধ্যবিত্ত ঘরের এজন্য তার নিজেকে নিয়ে সন্দেহ। কেননা, যে শ্রেণীতে সে জন্মেছে সে শ্রেণীর দোষ আছে, না এদিক, না ওদিক। সব সময় একটা দোটানা ভাব। এরা পাহাড়ে একটা জায়গা থেকে ঢাল বেয়ে ক্রমাগত চেষ্টা করছে ওপরে উঠতে। দু-চারজন ঠেলাঠেলি করে এর ওর ঘাড়ে পা দিয়ে উঠেও যাচ্ছি। কিন্তু বেশির ভাগই পা জড়কে একেবারে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সমাজের মধ্যেবিত্ত শ্রেণীর সমাজ মানসিকতা নিখুঁত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দর দাদুও ওপরে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাউকে ঠেলতে কিংবা কারো ঘাড়ে পা দিতে রুচি হয়নি তাঁর। তাই যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে যান। সে বাজারে একই বাজারে থাকার অর্থ নিচে নেমে যাওয়া।

অরবিন্দ তার মা-বাবার চেয়ে দাদু দিদা ও আম্মার কথা বেশি করে বলে। কেননা সে বলে যে জন্মের দিক থেকে সে একজন হতভাগ্য। সে বলে আমার জন্মের পরই আমার মা মারা যায়। আমাকে মানুষ করেছে দিদিমা। দিদিমা আমার কাছে ঠিক মা-র মত। ছোটমামা আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। দিদিমার কোলের ছেলে বলেই বোধ হয় ছোটমামার সঙ্গে আমার হিংসেহিং সিটা একটু বেশি ছিল। আমার মা আমার মা বলতে বলতে ছোটমামা আমি-দিদিমা হয়ে গিয়েছিল আমাদের দুজনেরই আম্মা। --- আমার বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। জ্ঞান হয়ে মা-কে দেখিনি। গোড়ার ক-বছর বাবা মাঝে মধ্যে মামার বাড়িতে আসতেন। আমার জন্যে নানা রকম খেলনা আনতেন।

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল জিনিস বাগানোর আমার কাছে বাবা ছিলেন কিছুটা দূরের মানুষ। বাবাকে পছন্দ করতাম। কিন্তু ভালবাসতাম দাদু কে। --- বাবা যে পরেবিএ করেছিলেন, সেটা দাদু দিদিমারই মত নিয়ে। বিয়ে করেছিলে এক অবস্থায় বাপের একমাত্র মেয়েকে। কিন্তু এবার আর ছেলে হয়ে নয়, ছেলে পেটে নিয়েই ছোট মা মারা গেলেন এরপর বাবা নাকি খুব মদ খেতে শুরু করে দিলে এমন খাওয়া যে, মদ খেয়ে চুর হওয়া অবস্থায় অ্যাকসিডেন্টে গলাকাটা বাবার দেহটা নাকি দূরের এক রেললাইনে পাওয়া যায়। এই বিষয়টায় তার মনে একটা সন্দেহ ছিলই । তার বাবার মৃত্যুটা কি সত্তাস্থায় রেলে কাটা পড়ে? না আত্মহত্যা? না তার পেছনে ছিল কোন বিষয়লোভী খুনীর হাত ছেলে বেলা থেকে সে এবিষয়ে নানা জনের নানা কথা শুনে এসেছে, তার আম্মা বলত সব কিছুতেই ওর

ছিল বাড়াবাড়ি বেহিসেবির চূড়ান্ত। রেলের গার্ড আর তুই নিজেকে একটু গার্ড করে চলতে পরলি নে? তার দাদু বলত যদি অ্যাকসিডেন্টই হবে, তাহলে বলতে হয় নেশার ঘোরে রেল লাইনে ও গলা দিয়ে শুয়ে ছিল। তা কখনও হয়?'' তার দাদুর এক উকিল বন্ধু বলেছিল, ব্যাপারটা অত সহজ সরল নাও হতে পারে। ওর এ বউ তো শুনেছি বাপের এক মেয়ে ছিল। বাপের নাকি যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি। কাজেই বিষয়ের লোভে জামাই বাবাজিকে কেউ পথের কাঁটা বলেও তো মনে করতে পারে? সে যে কারণই হোক গর্ভধারিণী মা ও জন্মদাতা পিতার থেকেও তার দাদু আম্মা ছোট মামা চরিত্র তিনটি তুলনায় তার জীবনের ও বোধের সঙ্গে অধিক প্রভাব যুক্ত চরিত্র। তার চরিত্রের দর্শন, মূলত দাদু ও আম্মাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যাদের কাছে যে পরিবেশে অরবিন্দ বেড়ে উঠেছে তাদের প্রভাব তার কাছে অনেক খানি।

এক সময় অরবিন্দ খিদিরপুর ডকে যাতায়াত শুরু করে। সে কাজ করে লেবার পার্টিতে কিন্তু মজুরদের মিছিলে থাকে। পাশ দিয়েছাত্ররা মিছিল করে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির চেনা বন্ধুদের দিকে সে তাকায় করুণার চোখে। এবং সে মনে মনে ভাবে ওরা সব মজুর শ্রেণীর কথা বলে। কিন্তু ওদের পার্টিতে মজুর নেই। পেটি-বুর্জোয়ায় ঠাসা। এটা প্রথম বলে কমরেড তেওয়ারি। তিওয়ারি বলে,কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে আসলে ওরা চালাচ্ছে ভেজাল মার্ক্সবাদের কারবার। আসল বলশেভিক আমরা। ওরা বুর্জোয়াদের হাতধরা হয়ে চলতে চায়। তাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ওদের মানে না। কোথাও ভারতীয় পার্টির নাম পর্যন্ত করে না। আমরা বসে নেই। পোর্টফোলিওতে করে থিসিস নিয়ে আমাদের লোক বিলেতে গেছে। এবার এখানকার গোটা ব্যাপারটা ওরা জানতে পারবে। আমরা মামলা রুজ করে দিয়েছি। রায় আমাদের পক্ষে যাবে। তখন ঐ সাইনবোর্ড আমরা পাব।' এই অংশে ঔপন্যাসিক ভেজাল মাক্সবাদ পেটি বুর্জোয়া ও পার্টির অন্তকোন্দলকে উপন্যাসের অঙ্গ করে তুলেছেন। এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের ধারণাকে এখানে তুলে ঔপন্যাসিক পার্টির অবস্থানের সত্য ছবি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বের কলহ ঔপন্যাসি ব্যক্তিজীবনেও দেখেছেন। সেটাকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছেন।

সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে এক শ্রেণীর উগ্র-জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ড চলেছে। এই দলে ছিল উমা। সে আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলনে পুলিশের লাঠি খেয়েছিল। সে লোক বসে সিগারেট খায়, রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যায় শালা হারামি বলে গালিগালাজ করে। একদিন অরবিন্দের পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে উমা বলে -গরু খেয়েছেন? সে খায়নি শুনে উমা তেওয়ারিকে বলে ওকে এক্ষুনি শিককাববা খাইয়ে দাও গরুর কথা শুনে অরবিন্দ তাড়াতাড়ি বলে - আজ আমার পেটটা খুব খারাপ।

উত্তর শুনে উমা হো হো করে হেসে বলে গরু শুনলে সব হিন্দু কমরেডেরই পেট খারাপ হয়ে যায়। সে সময়ে ভারতীয় বামপন্থায় উগ্র নীতির এক সার্থক দৃষ্টান্ত উমা। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক দল বদলের দল ছাড়ার আত্মপক্ষ সমর্থন অরবিন্দের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে লেখকের আত্মবিশ্লেষণ জাত প্রতিক্রিয়া এই অংশে পাই। পুরনো দল ছাড়ার পেছনে কি আমার ছোট দল থেকে বড় দলে যাবার লোভ একেবারেই ছিল না? আর দল ছেড়েছিল কি নিছক মতে মিলল না বলে -- দল যত ছোটই হোক, ছাড়া সহজ নয়। বড় দল যত ছোট হয়, ছাড়াটাও হয় তত কঠিন দলবদলের ব্যাপারটাও ঘটে ঠিক হয় উল্টো। যে পার্টি যত বড়, তার সঙ্গে নতুন করে নিজেকে মানানো ব্যাপারটাও হয় তত শক্ত।

হাঙ্গার স্ট্রাইএর কারণে জেলে গিয়ে অরবিন্দের জীবনে নানা অভিজ্ঞতা হয়। কমল নামে ব্যক্তির সঙ্গে অরবিন্দের প্রথম দেখা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। কমল ছিল মহাপেটুক। সে ছিল প্রেসিডেন্সির নামকরা ছাত্র। সে ম্যাট্রিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে ছিল। সে ইউনিয়ন করে। বাইরে কাউকে কাউকে অরবিন্দ বলতে শোনে,পার্টি করলেও ভেতরে ভেতরে কমল পুলিশের মানুষ। একথা শুনে অরবিন্দের ভেতরে ওলট পালট হয়ে যায়। সে ভাবে কমল যদি পুলিশের লোক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। বংশী তো ছার এমনকী নিজেকেও নয়। কথকের সঙ্গে পরিচয় হয় এক বুড়ো কয়েদির। তার নাম শেখ বাঙাল। এই শেখ বাঙালের সঙ্গে সংযুক্ত হয় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধুর বন্ধীকাহিনী দেশবন্ধুর জেলে বন্দী বিষয়টি প্রথম যুক্ত হয় একটা সময়কে বোঝাবার জন্য। কথকের কথায় দেশবন্ধু যখন জেলে ছিলেন ওর জেলখাটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। সেই যে জেলে আসা ধরেছে আর ছাড়েনি। সেই যে পকেট মার হয়ে জীবন শুরু করেছিল, আজও সেই পকেট মারই থেকে গেছে। কথক জেলে গল্প শোনে হামিদের মুখেই তার গল্প। হামিদ ছোকরা ধরনের ভিন্ন প্রকৃতির চোর। যারা হজ করতে যায়, তাদের টাকা পয়সা হাতানোর ব্যাপারে একদল বিশেষ চোর থাকে, হামিদ সেই দলের একজন বড় চোর আরওই দলে ছিল হরি। তার সম্পর্কে কথক বলে হরি আসলে আরও বড় চোর। আমাদের মন গুলোকে চুরি করে নিয়েছিল। আমরা জানতাম রেলে বিনা টিকিটে ধরা পড়ে হরি জেলে এসেছে। হরি শুধু যে অমায়িক সজ্জন চটপটে তাই নয়, হরি সব সময় আমাদের সবাইকে যেন বুকে করে আগলে রাখত। নইলে কোনো ফালতুকে কি ডেটিনিউ বাবুরা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেয়। যার মা আছে উজাড় করে উপহার দেয়? এমনকী চোখ পর্যন্ত ছলছল করে? হরি ছিল আমাদের কাছে এ সমাজের অবিচারে একজন নিরীহ ভালমানুষের সাজা পাওয়ার দৃষ্টান্ত।

জেলে ফোর্সফিডিংসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় অরবিন্দর। নাকে নল ঢোকানের বিষয়ে তার কখনো কখনো ডাক্তারের ওপর রাগ হয়। আসলে কাজটা ডাক্তারবাবু তেমন মন দিয়ে করছিলেন না, তার আসা বসা যাওয়ার মধ্যে ছিল একটা দায়সারা ভাব। আজ এই প্রথম ফোর্সফেডিংয়ের সময় আমার ভয় হল। নল ঢোকাতে গিয়ে ফুসফুস ফুটো হয়ে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ভুল জায়গায় দুধ গিয়ে নিউমোনিয়া হয়ে অতীতে কম বন্দী মারা যায়নি। ---- কাজেই ব্যথা পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভয় পেয়েছিলাম। লাকি এর সবটাই জেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত? যখন ওরা দেখছে, না খাওয়ার দরুণ যে ভয়, সে ভয় দেখিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। তখন এবার দেখাতে শুরু করেছে খাওয়ানোর ভয়। --- মরে গেলেও নিজের কাছে একথা স্বীকার করতে পারব না যে, আমি মরতে ভয় পাই। সেটা হবে মাথা নিচু করার, হেরে যাওয়ার ব্যাপার। আমি ভয় পাই, এ-দুটো এক নয়। প্রথমটার মধ্যে আছে একটা তাৎক্ষণিকতা আর দ্বিতীয়টার মধ্যে আছে পরিণাম। কিন্তু যখন বাঁচার কথা ওঠে? যখন বলি, আমি বাঁচতে চাই? এই খানেই মজা মরতে ভয় না পেয়েও বাঁচতে চাওয়া যায়। ফোর্সফিডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের জীবন মৃত্যু ও ভয় ভাবনা। লড়াই পরিস্থিতিতে কিভাবে সংগ্রামীদের লড়াইটা একটা নিছক পরিণত হয় ঔপন্যাসিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন এখানে।

অরবিন্দর লড়াই করতে করতে মনে হয় এই লড়াই কেন কিসের জন্য তার মনে হয় আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ ভোল বদল করেছে মাত্র। --- এ দেশের বুর্জোয়ার বরাবরের মত সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়ে গেছে। তা তো হবেই, ওরা যে দেশের সর্বহারাদের অনেক বেশি ডরায়। এই একই ভয় থেকে ওরা বিপ্লবীদের অন্য কোথাও পাঠাতে চায়। কোনো দূরের জায়গায় আত্মীয় বন্ধুদের থেকে ছিনিয়ে রাখতে চায়। বক্সার জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা হয়। ব্যক্তি জীবনের জেলের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক রূপে উপন্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিপ্লবীরা সংগ্রামী জনতার কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনে দূরের জেলে না যাওয়ার জন্য লড়াই করে। কিন্তু সরকার উপলব্ধি করে বিপ্লবীদের জনবিচ্ছিন্ন করার। সর্বহারার লড়াইয়ে বিপ্লবী নেতাদের সর্বহারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সরকারের এই কৌশল। এই সর্বহারাদের শ্রেরী বিন্যাসে ঔপন্যাসিকের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠার নিখুঁত বিশ্লেষণ লক্ষণীয় বিষয়।

অরবিন্দ যখন বাদশার পারিবারিক দৈন্য দশার সঙ্গে তার দাদুর আর্থিক অবস্থার তুলনা করে বলে- বাদশা শ্রমিক বটে কিন্তু নিঃস্ব নয়। ওদের নিজেদের ঘরভিটে আছে। সেদিক দিয়ে বড়াই করতে পারি আমি। বিষয়সম্পত্তির বালাই নেই। মাসোহারা পেন্সনটা বাদ দিলে আমার দাদুও সর্বহারা।

আমাদের নিজেদের ঘরভিটে বলেও কিছু নেই। কিন্তু মাথার কাজ। আর হাতের কাজ। ঐখানেই হয়ে যায় শ্রেণীর তফাত। ভিটেমাটি শুণ্য সর্বহারাদের শ্রেণী বিন্যাস ঔপন্যাসিক যুক্তিসহ নির্ণয় করে তাঁর সমাজ সচেতনতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। জেলে বন্দী অরবিন্দর কাছে পার্টির লাইন নির্ভুল বলে মনে হয়। আর পার্টির লাইন ঠিক আছে বলেই ইংরেজ চলে যাবার পর এখন আমরা আর পরের দিকে তাকিয়ে নেই। এখন আমরা নিজেদের দিকে তাকাতে শিখেছি, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। এখন আমরা শুধু বর্তমান নয়, অতীতকে বিশ্লেষণ করে খুঁড়ে খুঁড়ে যা গ্রহণ করার করছি এবং যা ছুড়ে ফেলার ফেলছি। অরবিন্দ ভাবে পার্টির সংস্কারবাদ ত্যাগ করে আমরা যদি পার্টির লাইন মতো চলতে পারতাম তাহলে হয়তো স্বাধীনতা জিনিসটা ভিক্ষের দান হিসেবে পেতাম না ঞ্জআমরা পেতাম সশস্ত্র লড়াই করে বীরের ভোগ্য স্বাধীনতা। ইংরেজকে তাড়িয়ে তাহলে আমাদেরই হাতে ক্ষমতা আসত। দেশের পুরো চেহারাটাই যেত বদলে। দেশ ভাগ হত না। হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি হত না এই উক্তি দ্বারা অরবিন্দের প্রকৃত স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয় বোধের পরিচয় পাই অরবিন্দ ধর্মীয় বিভেদ নীতিকে ঘৃণা করত এই সত্যের পরিচয় আমরা এখানে পাই।

অরবিন্দ চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা একটি বড় গুণ। সে যে নিজেকে উল্টে পাল্টে দেখে। এর মধ্যে তার কোন অপরাধবোধ নেই। সে জানে যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। তাই খাওয়া বন্ধ করলে মানুষ তার মুখে অনেক লাফঝাঁপ, কিন্তু তার সমস্ত তড়পানি মনে মনে। সে বসে বসে জেলের ভেতরে ডাইরি লেখে। সে বলে লেখার একটা ধর্ম আছে। ঞ্জমনে মনে যা হয়, লেখবার সময় তা হুবহু এক হয় না। শুধু যে কাটছাঁট হয় তা নয়, লিখতে গিয়ে মনের ভাব বদলে যায়।

জেলে আসার আগে খাবার এবং পেটের বাড়তি গুরুত্বে তার খুব বিচ্ছিরি লাগত, কিন্তু জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইকে এসে সে মানুষের জীবনে পেটের গুরুত্ব কতটা উপলব্ধি করতে পারে। তার সত্যি কথা বলেই মনে হয় যে দুনিয়ায় পেটই সব। মনে হয় সবাই যদি পেটে কিল মেরে বসে থাকে তাহলে কী দশা হবে এই দুনিয়ার? হাঙ্গার স্ট্রাইক মালিক হয়ে মনে মনে সে ভাবে জেল থেকে বেরিয়ে সে অনেক কিছু খাবে। সে ভাবে জেলের বাইরে গিয়ে খাবে বখালের চাপ, আমজাদিয়ার বোঝা মসল্লা, মোল্লারচকের দই, বাগবাজেরের তেলেভাজা, বড়বাজারের হিং দেওয়া কচুরি, নারকেলের দুধে রান্না ভাত, নারকেলের মালার ভেতর পুরে ওপরে মাটি দিয়ে বন্ধ করে উনুনের তলায় রেখে দিয়ে গমসের আঁচে ঝলসানো বিড় চি, মনে হয় পাইকপাড়ার কাকিমার হাতে চিংড়ি মাছের ঝাল খাবে সে। মনে হয় দার্জিলিং-এ কনফারেন্সে গিয়ে জীবনের প্রথম ডালমুট খাবার কথা। হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় খাবার কথা ভাবাটা নিয়ম বিরুদ্ধ। পার্টির নিয়ম অগ্রাহ্য করে জীবন ও জগতের সত্যকে উপলব্ধি করে অরবিন্দ।

জেলের ভেতরে অরবিন্দর মনে হয় পার্টির দলাদলির কথা। কমরেড চৌধুরীর সঙ্গে হরেনবাবু ও জিতেনবাবুর দলাদলির বিষয় অরবিন্দ বুঝতে পারে। পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন সেটা সে ধরতে পারে সেদিন খুব মন খারাপ হয় তার। জেলে বসে পাটির কাগজের জন্য তার মন খারাপ হয়। পার্টির কাগজ তার জীবনের কতখানি তা তার একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়। সে বলে পার্টিতে কাগজ আর আমি এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। চৌধুরী আমার পেটিবুর্জোয়া অভিমানকে মেরে মেরে কাগজের কাজ শিখিয়েছেন। আপিসঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ এমন কিছু নয়। নেতারাও দিয়েছেন। কিংবা কাগজ ভাঁজ, বান্ডিল করা, ঠিকানা মারা, টিকিট সাঁটা এসব করেছি সবাই একসঙ্গে। কিন্তু ছাপা খানা? প্রুফ দেখা, মেকআপ করা, বাদ দেওয়া, ঢোকানো ছবি তোলানো, ব্লক আনা, গ্যালি সরানো, প্রুফ টানা, নিজে হাতে স্টিক ধরে হেডিং কম্পো ব্লকে চিপি দেওয়া, কাতুরি দিয়ে বুল কাটা, চিৎপুরে গিয়ে কাঠের হরফ করানো - তখন আমার কত বয়েস? তারপর সেই কাগজ কত বড় হল। নিজেদের প্রকান্ড প্রেস। প্রত্যেকটা কাজের জন্যে আলাদা আলাদা লোক -- পার্টির সেই কাগজটার জন্যে আমার এখনও মন কেমন করে। পার্টির কাগজের সঙ্গে অরবিন্দর সম্পর্ক লেখকের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে পার্টির কাগজের সম্পর্ক সমান গুরুত্বপূর্ণ। অরবিন্দের জীবনে পার্টির কাগজের সম্পর্ক মূলত ঔপন্যাসিকেরই জীবনের কথার রূপান্তার।

অরবিন্দ চরিত্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিকে ব্যক্তি মানুষের সাধারণ বৈশিষ্টের অসাধারণ মিল দেখা যায়। এক শুক্রবারের ডায়েরিতে অরবিন্দ তার নিজের কথায় বলে - আমার মুশকিল, আমি আদৌ তর্ক করতে পারি না। পরের পর যুক্তি দাঁড় করিয়ে কোনো জিনিস কাউকে বোঝাতে পারি না। আমি নিজেও কোনো জিনিস বুঝতে পারি না। কিন্তু কমল যেন অনুভব করতে পারি। লোকের মন কখন কোন দিকে ফিরছে, এটা আমি ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে, লোকের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে, গালির মধ্যে চায়ের দোকানে বসে তাদের চলাবলার ধরণ থেকে কেমন যেন ধরতে পারি। আমার মধ্যে কখন চাঙ্গা, কখনও মিসোনো ভাব দেখে কোনো কোনো চটে যায় ঔপন্যাসিকের বাহ্যিক আচরণ ও অন্তমনের ভাব অরবিন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে এখানে প্রকাশ পায়।

অরবিন্দ লড়াই করছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অরবিন্দ হাঙ্গার স্ট্রাইক করছে। এই অরবিন্দের শৈশবের স্মৃতিতে তার নিঃসহায় শ্রেণীর প্রতি দরদভরা হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দরিদ্রদের প্রতি মিথ্যাচারিতার প্রতিবাদ জানায় ক্ষুদে শিশু অরবিন্দ। দাদুর সঙ্গে পথ চলার একদিনের স্মৃতিতে সে বলে একবার, তখন আমি খুবই ছোট, তোমার হাত ধরে হাঁটছি। একজন ভিখিরি পয়সা চেয়েছিল। তুমি নেই মাপ করো বলতেই আমি

তোমার পকেটে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলাম, ব্যাগটা খোলো, ওতে পয়সা আছে। নেই বলতে তুমি তো ইচ্ছে নেই নয়, তুমি বোঝাতে চেয়েছিলে পয়সা নেই। আমি তোমাকে আদৌ মিথ্যেবাদী বলতে চাইনি। শিশুর সরলচিত্তে আমি শুধু আছে কি নেই বলার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এই স্মৃতিচারণা থেকে অরবিন্দ চরিত্রের মিথ্যেচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মানুষ কতগুলি ধর্ম নিয়েই জন্ম নেয়। অনেকের চরিত্রে স্বতঃগুণের প্রাধান্য বেশি থাকে। কারো চরিত্রে রজ গুণের প্রাধান্য আবার কেউ কেউ সহজাত তম গুণের অধিকারী অরবিন্দ জন্ম থেকে স্বতঃগুণের অধিকারী ছিল। একবার ছেলেবেলায় তার দাদু এক দুঃস্থ ভাইয়ের চাকরির জন্যে আগে থেকে এক বন্ধুর কাছ থেকে প্রশ্নপত্র আউট করে এনে তাকে মুখস্থ করিয়েছিল। দাদুর এই কাজকে ভালভাবে সেদিনের শিশু অরবিন্দ মেনে নিতে পারেনি। সরকারি উকিল তারকবাবু সন্ত্রাসবাদীদের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ করে তথ্য সংগ্রহ করতেন আবার সন্ত্রাসবাদীদের হীরের টুকরো ছেলে বলে বাহবা দিতেন। এভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বিপথে চালিত করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ওদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করেন। তারকবাবুর এই জঘন্য আচরণের প্রতিবাদ করে শিশু অরবিন্দ। সেই সব শৈশবের কথা মনে করে অরবিন্দ সেই সব কুচক্রীর ছদ্মবেশ টেনে হিঁচড়ে খসিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা নেয় । আশৈশব অরবিন্দ চরিত্রে প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় শৈশব থেকে অরবিন্দকে তার দাদুই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও জগৎ সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। শৈশবে তার দাদু দোহাবলী বাংলা করে করে শেখাতেন। সে তার দাদুর কাছ থেকে জানতে পারে - ''পথে চলতে গিয়ে যে পড়ে যায় তার দোষ নেই, সে বসে থাকে তার মাথায় চাপে কোটি ক্রোশ রাস্তা।'' পন্ডিত আর মশালচি, এই দুজন দেখতে পায় না। অন্যদের আলো দিয়ে এরা নিজেরা অন্ধকারে থাকে। যেমন করকরে জিনিসের মধ্যে বালি, উজ্জ্বলের মধ্যে রোদ, তেমনি চুপ করে থাকার চেয়ে মিষ্টি আর কিছু নয়। ক্ষুধার কুকুর বিঘ্ন আনে, তাকে একটা টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধনা করো। প্রাণ যাক, প্রতিজ্ঞা থাক। যারা প্রাণ রেখে প্রতিজ্ঞা ছাড়ে, তাদের জীবনে ধিক। সবার সঙ্গে মিলেজুলে সবাইকে জী আজ্ঞে বলে নিজের ঠাঁইতে ঠিক থাকো। মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। যে মনে মনে জপে তাকে বলিহারি যাই। শৈশবে দাদুর মুখে এসব নৈতিকজীবন, কর্মজীবন ধর্মীয় ভাবনা ও জীবন দর্শনের কথায় কথকের জীবনের ভিত গড়ে ওঠে। পরে বড় হয়ে সে লাওৎসু-র তাও তে চিং গ্রন্থ ইংরেজিতে পড়ে সে শেখে যে অন্যদের জানে সে চতুর, যে নিজের জানে সে চক্ষুমান। যে অন্যদের পরাস্ত করে, তার জোর আছে।

যে নিজেকে জয় করে, সে শক্তিমান। জ্যান্ত থাকতে মানুষের থাকে নরম ঢিলে ভাব, মরে গেলে হয় শক্ত টান-টান। ঘাস আর গাছ জ্যান্ত অবস্থায় সহজে হেলে, সহজে ভাঙে - ঝরে গেলে শুকিয়ে পাকিয়ে যায়। এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গীসাথী হচ্ছে শক্ত আর কড়া, জীবনের সঙ্গীসাথী হল নরম আর দুর্বল। কাজেই শক্ত হাতিয়ারে জেতা যায় না। দুনিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল বশংবদ হল জল। কিন্তু তবু শক্ত আর কঠিনের ওপর চড়াও হওয়ার ব্যাপারে জলের জুড়ি নেই। তার কারণ জলের জায়গা জুড়ে বসার কারো সাধ্য নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মশক্তি বৃদ্ধির উপকরণ এই গ্রন্থ থেকে পেয়ে যায় অরবিন্দ। নিজের মনের গড়ন তৈরী করে নেবার উপায় এ থেকে পেয়ে যায় অরবিন্দ।

জেলে বিভিন্ন কয়েদির সঙ্গে মেলামেশা করে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অরবিন্দ। সে নানা জীবনের নানা কথা থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। নিজের আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও নিজের চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে জেলের কয়েদিদের জীবন কথা থেকে। ঔপন্যাসিকও ব্যক্তি জীবনে জেলে বন্দী হয়ে জীবনকাটানোয় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর পদাতি (১৯৪০) কাব্য গ্রন্থের বিশ বাইশ বছর পর উপন্যাস রচনা শুরু করেন। এই উপন্যাসের কথাও বাদশার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভাবেন। এই পরিকল্পনায় বাদশার সঙ্গে বসে তার জীবনের নানা নোট নেয় অরবিন্দ। কিন্তু কথক মনে মনে ভাবে যে তাকে নিয়ো উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা সে আসলে হচ্ছে হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ছিলেন একজন পেশাদারি সাংবাদিক। তিনিও মনে মনে ভাবতেন যে তাঁকে নিয়ে কারা উপন্যাস সৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে কথক তার উপন্যাস সৃষ্টির অক্ষমতার বিভিন্ন কারণ লিপিবদ্ধ করে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পগুণ আত্মজীবনীর সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য এই অংশে কথক বিবৃত করে। এ থেকে ঔপন্যাসিকের কথা সাহিত্যের সম্যক ধারণার পরিচয় মেলে।

উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গে কথকের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের গুনাগুণ চেতনার স্তরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবী পার্টি নেতৃত্বর স্বাধীনতা ও সামাজিক অবস্থান কথকের বিশ্লেষ বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং লড়াইয়ের গূঢ় দর্শন এতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বলে আমাদের কাগজে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বড় সুন্দর কুরে এ কথা বলা হয়েছে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর তাঁবুতে পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু মাথাগুলো রেখে এসেছেন বুর্জোয়াদের তাঁবুতে। খুব ঠিক কথা। তবে আমার আশা আছে, মাথা কাটা যাবার আগে নিশ্চয়ই তাঁরা মাথাগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। একেই বলে একাধারে শ্রমিক শ্রেণী এবং পার্টির নেতৃত্ব। এই যে আমরা এতদিন পরে নিজেদের নিয়ে পড়েছি, এবারকার পার্টি লাইনের এটাই বিশেষত্ব। তার জন্যে অমন যে বড় নেতা মাও সে তুং তাকেও আমাদের পার্টি রেয়াত

করেনি। এ দেশের অবস্থাটা কী সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। তারপর সেইমত ব্যবস্থা আমাদের যে বুর্জোয়া, তারা যেমন জোরদার তেমনি টেটিয়া। জমিদারদের দলে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটা বাগিয়ে বসে আছে। আসলে এরা সাদা সায়েবদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতার ভেখ পরে হয়েছে কালো সাহেব।ঞ্জ এই অংশে অরবিন্দ চরিত্রে পরাধীন দেশমাতার প্রতি তার দেশাত্মবোধ, দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের গোপন আঁতাত এবং পার্টির লাইনের প্রতি লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা এই অংশে ফুটে উঠেছে। এখানে লেখক কথক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এদেশের মুখোশ পরা দেশীয় জমিদার দের ভৎসনা করেছেন ঔপন্যাসিক। জেলের ছ-নম্বর সেলের কমরেড তপন সান্যালের সঙ্গে একই ক্লাসে অরবিন্দ মার্ক্সবাদ লেলিনবাদ পড়ে। পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। গড়ে তোলে কৃষক আন্দোলন। খেত মজুরদের আলদা সংগঠন শ্রমিক আন্দোলন। রাজনীতিতে একটু একটু করে অরবিন্দের মাথা খুলতে থাকে। সে রাজনীতিতে সাবালক হতে থাকে। সমাজের নীচু তলা থেকে উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রথায় চালায় যে ভাবে সে নেতাদের মুখ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। দক্ষিণ দেশের খবর পেয়ে অরবিন্দ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সেখানে আড়াই হাজার গ্রাম জমিদার জায়গিরদার দের কবল থেকে মুক্ত হয়। এই খবরে অরবিন্দ যেন চোখ বুঝে দেখতে পায় গাছের মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় পত্ পত্ করে উড়ছিল লাল নিশান।

অরবিন্দদের হাঙ্গার স্ট্রাইক দলের মধ্যে আসলে অনেক ঘাত প্রতিঘাত। ওরা লড়াই করে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই। এক সময় সাত নম্বর সেলের বন্দী প্রণবকে পাঠান হয় হাসপাতালে। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক সময়ে সে গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগী ছিল বলে জেল কমিটি থেকে হাঙ্গার-স্ট্রাইক থেকে ওকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু প্রণব পাল্টা জানিয়েদেয় যে জেলে তাকে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে না দেওয়া হলে সে আলাদা হয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে। কেউ কেউ নিজেদের দলের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিদেয়। দীর্ঘকাল লড়াই চলে। এবং কোম্পানী সংগ্রামীদের মধ্যে ফাটল ধরায়। তবুও ভয়ঙ্করের আঘাত এড়িয়ে দল নিজেকে রক্ষা করে। সংগ্রাম চলে।

ঔপন্যাসিক ব্যক্তি জীবনে বাংলার মাঠ-ঘাট-খেত চষে বেড়িয়েছিলেন । ঘুরে ঘুরে কাগজের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। অরবিন্দও একজন সংবাদিক। সে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে। নিজের কথায় সে বলে একবার আমি কাজের রিপোর্ট করতে ত্রিপুরার পাহাড় এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম। তখন ছিল নভেম্বরের ঠান্ডা সকালে রওনা হয়ে দুপুরে মাঝপথে কোনো গ্রামে খেয়ে সন্ধে পর্যন্ত হেঁটেছি। এইভাবে সাত দিন হেঁটেছিলাম একশো মাইল রাস্তা। কেবল শরীর টিকিয়ে সংগ্রামে বিশ্বাসী অরবিন্দ। এ সম্পর্কে সে বলে শরীরটা থাকলেই আমি খুশি। এই পৃথিবীর রূপ রস

শব্দ গন্ধ স্পর্শ আমি এই শরীর দিয়ে বুঝি। আমার অনুভূতিগুলো আমার দেহরক্ষী। তারা জানিয়ে দেয় এটা মন্দ ওটা ভাল। ---- জীবন রক্ষা, বংশ রক্ষা যখন যে কাজেই লাগুক, এই শরীরের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই।ঞ্জ অরবিন্দ আত্মবিশ্লেষণ করে অনেক সময় সে ভাবে তার শরীর শরীরের বাইরের প্রকৃতি, শরীরের ভেতরের অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ে। মানুষের বোধগম্যতা, জানা আজানার সীমা ক্ষমতা সম্পর্কে সে নিজে নিজেকে বলে মানুষ বাইরের প্রকৃতিকে যতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায়,মানুষ তার জানার সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্যতার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আমাদের শরীরের আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোন খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা মনের খিল দেওয়া কোন পথ আকস্মিক খুলে যায় একটি ঘটনায়। সব জেলের বন্দীদের অবস্থা বুঝে সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক তুলে নেবার। ধর্মবন্ধীদের একটু লেবুর রস ও গরম হরলিক্‌স্‌ দিয়ে প্রথম দিন অনশন ভাঙা হয়। পরের দিন গলাভাত। শহীদ স্মরণসভা করে জেলে জেলে অনশন ভঙ্গ করা হয়। এই অনশন ভাঙার দিনটিই ছিল অরবিন্দর জন্ম দিন। এই দিনটি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। অনশন ভাঙার দিনের সঙ্গে অরবিন্দর জন্মদিন প্রসঙ্গ যুক্ত করার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তার ব্যক্তি জীবনের বিশেষ দিক চিহ্নিত করেছেন। অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পূর্ণজন্ম।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে হাংরাস অভিনব। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু কল্পনাশ্রয়ী বর্ণবতুল ছবি নয়। সাধারণ ও তুচ্ছ কয়েদি, বন্দী, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি এই উপন্যাসের উপকরণ। সাধারণের সামান্য শিল্পিত রূপ 'হাংরাস'। রোম্যান্টিক ভাববিলাসী ও স্বপ্নাবিষ্ট প্রেমের উপাখ্যান রচনায় আবিষ্ট হয়ে রচিত 'হাংরাস' নয়। গতানুগতিক ছকে বাঁধা উপন্যাসের ধারায় হাংরাস অভিনব। উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয়বস্তুর বন্ধন মুক্তি ঘটেছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের পটভূমি অতীত জীবনের বর্তমানের জীবনসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ করে। এই উপন্যাসের সমকাল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সে সময়ে যুগধর্ম সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পর থেকে মার্কস্‌বাদ বাঙালার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রসার লাভ করে। --- এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বিশের দশক এবং ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে বাঙলা সাহিত্যে রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদী ও সমাজ তান্ত্রিক মনোভাবের প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষ প্রভাব কেবল এক ধরনের মানবতাধর্মী গণ চেতনারূপ নিয়েছে। তখনকার সব লেখকই যে রুশ বিপ্লব চেতনা বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় প্রভাবিত হয়েই গণজীবনের কাহিনী লিখতে শুরু করেছেন, তা হয়ত নয়। কিন্তু তখনকার আলো হাওয়ায় এসব ভাবনা ভেসে বেড়াত, লেখকদের উজ্জীবিত করত। এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। বাঙলা কথা সাহিত্যকে নিছক মধ্যবিত্ত সুলভ রোম্যান্টিক প্রিয়কথা কিংবা মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক ধরনের গণচেতনা সাহিত্যে জীবনের প্রসারিত রূপটিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হল। অখ্যাত অনভিজাত অবজ্ঞাত নরনারী ভিড় করে এল বাঙালী লেখকের কল্পনার আঙিনায়। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য পৃঃ ১৮৬)। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঔপন্যাসিকের বিশেষ জীবনদর্শনের সঙ্গে অন্বিষ্ঠ। একটি বিশেষ সময়ের সাধারণের জীবনের স্বপ্ন যন্ত্রণা, স্বদেশ চেতনা, সামাজিক অবস্থান ও ব্যক্তিমানসের টানাপেড়েন হাংরাসের বিষয়বস্তু। সমাজের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে সাধারণ এর মুক্তিই হাংরাস উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন। চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জীবন প্রত্যয় নিয়ে রচিত হাংরাস। এই জীবন প্রত্যয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিষ্ট। এই জীবন প্রত্যয় কে শিল্পিত রূপদানের জন্য উপন্যাসিক বিষয় বস্তু বর্ণনার স্বতন্ত্র আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। ঔপন্যাসিক বিষয় বস্তু বর্ণনা করেছেন নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে অরবিন্দ ও বাদশার কথার সাহায্যে। সেই হিসেবে এই চরিত্র দুটির আত্মকথন রীতি হাংরাস উপন্যাসে প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অরবিন্দ চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তথাপি গোরা, সত্যকরণ শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির মতো অরবিন্দ চরিত্রে ঔপন্যাসিকের সম্পূর্ণ আত্মজীবনী মূলক উপাদান সম্পূর্ণ নয়। তাই এই উপন্যাসের রীতিতে মিশ্র রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে লেখকের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। হাংরাস উপন্যাসের ভাষারীতি চরিত্র ও বিষয়বস্তু অনুগামী। এই উপন্যাসের চলিত আটপৌরে গদ্যভাষা ও কথ্য বাংলা চরিত্র সৃষ্টিতে বিষ্ময়কর শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। উপন্যাসের শিল্প গুণ অনন্য সাধারণ। হাংরাসে উদ্দেশ্য মূলকতা অনুধাবন যোগ্য তথাপি লেখকের শিল্প প্রতিভার জন্য তা পাঠকের হৃদয়ে ভাবের বিগলন ঘটায়। হাংরাস পাঠকের অন্তরের সঙ্গে একাত্মীকরণ ঘটায়। উপন্যাসের সংকল্প সৃষ্টির আনন্দ রসের সঙ্গে তঞ্চিত। হাংরাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি মাইল স্টোন।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কে কোথায় যায়'। এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৬ সালে, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯ থেকে। সংখ্যা চিহ্নিত ১৮টি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি বিন্যস্ত। এই উপন্যাসটি লেখক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। এই উপন্যাসটিতে লেখক কাহিনী বিন্যাসের একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসে চা বাগানে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে তেত্রিশ বছর মাটি কামড়ে পড়েছিলেন — এমন একটি চরিত্র উপেন মজুমদারকে প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই চরিত্রটিকে চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরই সুবাদে তিনি জীবনে প্রথম ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামড়ায় বসে যাত্রা করেন। এই উপন্যাসে আমরা তাঁকে একজন খাঁটি মানুষ ও খাঁটি কমিউনিস্ট রূপে দেখতে পাই। উপন্যাসে তাঁর জীবনকথার সঙ্গে পাঠকের বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে সহদেব ও তাতিয়ার জীবনালেখ্য। কোনো এক সময়ের নকশালপন্থী সহদেবকে আমরা দেখি সোভিয়েত বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত পশ্চিম জার্মানীর বেতারে চাকরী করতে। ট্রেন যাত্রায় সেও একই কামড়ায় হাওড়া থেকে নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে উপেন মজুমদারের সঙ্গে চলতে থাকে। ক্লেদাক্ত পারিবারিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তাতিয়া বিদেশের উদ্দেশ্যে স্বামীর সঙ্গ নেয়। উপন্যাসে এই আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গিরিজার গল্প। এবং সেই গল্পের সঙ্গে গিরিজার স্মৃতিকথায় আরও তিনটি টুকরো গল্প পাই আমরা। প্রথম গল্পে — একবার ট্রেনে একজন সংসার ত্যাগী, কামিনী-কাঞ্চন বিমুখ ও বিধর্মী সাধুর হাতে গ্রামের লজ্জাশীলা এক গৃহবধূ ঘরভর্তি লোকের সামনে পরম আশ্বাসে তার গর্ভের সন্তানকে সপে দেয়। দ্বিতীয় গল্পে — একটি উদ্বাস্তু মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচারকারী দালালের হাতে সপে দেওয়ার চক্রান্ত। অবশ্য সামান্যর জন্য সে রক্ষা পায়। উপন্যাসের তৃতীয় গল্পে — এক মুমূর্ষ গুর্খা টিবি রোগী একদিন একটি সাপের কামড় থেকে আত্মরক্ষা করতে লাফ দিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। এই উপন্যাসের ঔপন্যাসিক সর্বত্যাগী উপেন মজুমদার চরিত্রের মধ্যে কমিউনিস্টের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেছেন। সেই উপেন মজুমদারকে দেখে তাতিয়ারও মনে হয় — ভয় নেই, আছে ভালোবাসা। এবং সেই ভালোবাসার জোরেই সে দুনিয়া বদলাবে। উপন্যাসটিতে লেখক উপেন মজুমদার চরিত্রটিকে নিছক একটি প্লট নির্মাণের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেন নি।

এঁর মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন একটি সহায়-সম্বলহীন মানুষ কিভাবে মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে জীবনের অধিকাংশ সময় বিলিয়ে দিতে পারেন। শুধু মুখে বড়বড় বক্তৃতা দিলেই কোন পার্টির নেতা হিসেবে জনমানসে নেতা জায়গা পাওয়া যায় না ; কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার উপায়কে লেখক উপেন মজুমদারের মধ্যে দেখিয়েছেন। সারাজীবন না

উঠলেও ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামড়ায় জায়গা দিয়ে উপেন মজুমদারকে লেখক এইবার নতুন পোষাকে সাজিয়েছেন। নতুন পোশাক পড়ে উপেন মজুমদার একটি সুটকেস হাতে নিয়ে , হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে কিনে আনা কাঁধে ঝোলান ব্যাগ নিয়ে ঘটকবাবুর বাড়ির গাড়ি করে ট্রেনের উদ্দেশ্যে রওনাহয়। সেই যাত্রাপথের একটি পথিকের কথায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন —''বার বার নিজের ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ের দিকে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ছিল । এমন চোস্ত পোশাক কখন তাঁর গায়ে ওঠেনি বলে নিজেকে কেমন যেন অচেনা - অচেনা মনে হচ্ছিল। সামনে একটা রিক্সা রাস্তা আটকানোয় হঠাৎ তাঁর খুব রাগ হল। মুখ ফসকে ' এই ইস্টুপিট ' বলতে গিয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন।'' সেই যাত্রাকালীন উপেনবাবু দেশ-বিদেশের গন্ডী ঘুঁচিয়ে একটি বৃহত্তর ও উদার রাজনৈতিক সত্ত্বায় নিজেকে উন্নীত করে নেন। সেই বৃহত্তর জগৎ লেখকের ভাষায় '' তাছাড়া কমরেডদের বার বার বিদেশ বিদেশ বলাটা তাঁর ঠিক বরদাস্ত হচ্ছিল না। বিদেশ কোথায় ? বলতে গেলে নিজেরই তো দেশ। সত্যি বলতে কী, তাঁর তো পাসপোর্ট ভিসা এসব লাগাই উচিত নয়। শুধু একটু দূর। এখানে গরম, ওখানে ঠান্ডা। ওদের গায়ের রংগুলো ফর্সা । এই যা । নইলে ওরাও তো সেই কমরেড । নয় কি ? '' এখানে একজন যাত্রীর উপলব্ধিতে লেখক রাজনৈতিক সমাজের পরিধি প্রসারিত করে তুলেছেন । অসুস্থ্য পার্টিকর্মীর চরিত্রের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন — দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে ও বিভিন্ন অবস্থান নির্বিশেষে মানুষের পার্টিসত্ত্বা তাকে এক বৃহত্তর চেতনা উন্নীত করে ও ঐক্যবদ্ধকরে তোলে । সেই ঘটকবাবু ড্রাইভারের কথায় উপেন মজুমদার ভাবেন —''তাছাড়া এটা তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন যে , ঘটকবাবু তো আর তাঁকে খাতির করছেন না । আসলে খাতির করছেন পার্টিকে । সেটাই হওয়া উচিত । এ তো আর ব্যক্তিরব্যাপার নয় । তাছাড়া উপেনবাবু কী আর এমন ব্যক্তি । এম.পি নন, এম-এল-এ নন উচ্চপদস্থ নেতা-টেতা হলেও বা কথা ছিল । নিতান্তই ঝান্ডা-বওয়া লোক । তাও মফস্বলের । '' বাইরে যাবার প্রক্কালে উপেনবাবু একবার পার্টি অফিস ঘুরে আসেন — এর মধ্যে লেখক পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন , পার্টির অবদানকে স্বীকার ও সমকালের ধর্মকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

এই উপন্যাসের প্লটের সঙ্গে লেখকের স্বদেশপ্রেম সংযুক্ত হয়েছে শিল্পধর্ম অটুট রেখেই। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব , কালের পরিবর্তনে নাগরীকের জীবনশৈলীর রূপান্তর ও স্বদেশীদের প্রকৃতি উপন্যাসের স্বল্প বয়সের দুজন পার্টি কর্মী চরিত্রে রূপদান করেছেন লেখক । তাদের কথায় লেখক লিখেছেন—' 'তবে যে আজকালকার ছেলেদের লোকে এত গালাগাল দেয় ! তারা নাকি বয়সের সম্মান দেয় না , রাস্তায় কেউ পড়ে গেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় , দামি জামাকাপড় পরে , নেশা ভাঙ করে — এই রকম কত সব আ-কথা কুকথাশোনা যায় । হঠাৎ ছোকরা দুজনের দিকে চোখ

পড়তেই উপেনবাবু সভয়ে দেখলেন দুজনেরই পরনে টেরিলিনের জামা। তবু ওদের ওপর ঠিক চটতে পারলেন না ।মনে মনে বললেন , এটা উচিত নয় । স্বদেশী করবে তো বাবুগিরি করবে কেন ! অবশ্য দেখাচ্ছে বেশ । ....কমরেডকে গুরুজন বলা কি ঠিক? তাছাড়া ওদের এই সিগারেট খাওয়ার মধ্যে তাঁকে অবজ্ঞা করার ভাব আছে বলে তো মনে হল না। পার্টির কাজ করে জেল খেটেছেন উপেনবাবু । তিনি জেল থেকে বের হয়ে তেত্রিশ বছর ধরে চা- বাগানের শ্রমিক সংগঠনের কাজ করেছেন । সেখানকার পার্টির সঙ্গে তিনি শহর কলকাতার পার্টির একাধিক বৈসম্য উপলব্ধি করেন । তাঁর অনুভবের কথায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন —''তাছাড়া এত বড় শহরে এসে তাঁর কেমন যেন জলছাড়া মাছের মত অবস্থা হয় । আরও একটা কথা কখনও মুখ ফুটেতিনি বলতে পারবেন না কাউকে । মানে , শহরের কমরেডরা যেন কেমন । পার্টি-অফিসে দু চার বার এসে দেখেছেন সবাই নিজের কাজ নিয়ে তাও ঠিক নয় , কেমন যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ।তাদের মধ্যে আঠা-আঠা ভাবটা ঠিক নেই ।'' এখানে লেখক একজন নিষ্ঠাবান পার্টি-কর্মীর চেতনায় শহর -গ্রামের পার্টির নেতা কমরেডদের অনৈক্যের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক । একজন পার্টি-কর্মী তাঁর অসুস্থতার সময় বা অন্যকোন সঙ্কটকালে পার্টির সাহচর্যে একাকীত্বের হতাশায় ডোবেন না ডড সেটাই এখানে দেখিয়েছেন লেখক । একটা সংগঠনের ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজনীয় দিকটি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে লেখক এখানে উপন্যাসের উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন । সার্থকতার সঙ্গে শৈল্পিক চেতনায় লেখক দেখিয়েছেন যে , ''সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় উপেনবাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল ।পার্টির ছেলেরা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটা অবধি তাঁকে বইতে দিল না । পার্টির টান নাড়ির টানের চেয়েও বেশি । একথাটা তিনি অনেককে অনেকবার বলেছেন । এটাই হওয়া উচিত - এই বোধ থেকে বলেছেন । কিন্তু আজ তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কথাটা উঠে আসছে । মনের সমস্ত তার ঝন ঝন করে বাজছে ।'' ভেতরের অন্তস্তলে অবগাহন করে উপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংগঠনিক ব্যক্তিসমূহসের বিশেষ দিক নির্দেশ করেছেন । এখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উপেনবাবুর জীবনের শেষ অদ্যায় থেকে ফ্ল্যাসব্যাক রীতিতে চরিত্র ক্রমবিকাশের ধারা বজায় রেখেছেন ।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক যুক্ত করেছেন একটি অরাজনৈতিক পারিবারিক জীবনসূত্র। এই আধ্যায়ে বাইরে ভ্রমণরত এক দম্পতিকে এঁকেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । তারা বিদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বিক্রমের গাড়িতে । পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে তাতিয়া বিদেশে যাবার আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে । গাড়িতে যাওয়ার পথে নববধূ তাতিয়া একটাও কথা না বলে রাস্তাঘাটগুলো যেন গিলতে গিলতে যাচ্ছিল । ''বিদেশে যাওয়ার রোমাঞ্চে রাত্রে তার ঘুম

হচ্ছিল না।'' সহদেব বিদেশে চাকরি করে। বছর দুই আগে তার বাবা মারা গেছেন। বাড়ি ছেড়ে বিদেশে যাবার পথে অন্যদের মতো এর আগে সহদেবেরও কষ্ট হতো। লেখকের কথায় ''এর আগেরবার যখন সহদেব এসেছিল, সেবার তার যাওয়ার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল। কেননা ফিরে গেলে অনাত্মীয় শহরে আবার সেই একা।'' বাবার মৃত্যুর পর সে বিলেতে চলে যায়। এখন কোলম (কলম্ব)-এ রেডিওতে একটা চাকরী করে পশ্চিম জার্মানীতে। সেখানে এবারে তার যাওয়ার পথে নতুন বউকে নিয়ে আনন্দি হচ্ছে। এই পরিচ্ছেদে লেখক সুখের পরিবারের সাংসারিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাতিয়ার পরিবার এবং সহদেবের পরিবারকে নিয়ে লেখক উপন্যাসের আলোচ্য অংশের পুষ্টি জুগিয়েছেন। তাতিয়া ও সহদেবের বাবা-মা-ভাই-বোনের যৌথ প্রয়াসে সুখী সংসারের ছবি। সেখানে যুক্ত হয়েছে পরিচিত বন্ধু মহলের রোমাঞ্চকর পরিবেশ। সেই পরিবেশে যুক্ত হয় অরূপকুমার নামের এক যাত্রা-শিল্পীর চরিত্র।

এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে সহদেবের বন্ধু বিক্রমের উচ্চমধ্যবিত্ত ব্যাঙ্কে চাকুরী জীবনকে এই অধ্যায়ে যুক্ত করেছেন। বন্ধু অরূপকুমারের মুখে বাঙালী-মানসিকতার অসম্ভব ও অকম্পনীয় অথচ সত্য জীবনযাত্রার কথা শুনে সহদেব বিস্মিত হয়। লেখক এ কথায় বলেন ড়'' সহদেব সত্যিই ভাবতে পারছিল না। এটা কি করে সম্ভব হয়? তুরুপের মত ধারালো ছেলে, ইংরিজিতে যার মুখে খই ফুটত, স্ট্রেচলনের প্যান্ট ছাড়া যে পরত না, সে কিনা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যাত্রা করছে? ভাবা যায়?''এ যে বাংলে; সেকারণেই এখানে সব কিছু সম্ভব। বিক্রম ও সহদেবের এই আলোচনা তাতিয়ার বিদেশের প্রতি অধীর আগ্রহে একটি আঘাত নিয়ে আসে। কলকাতায় ফিরে আসার প্রসঙ্গে তাতিয়া ক্রূর হয়ে ওঠে। এখানে নববধূর কাঁচা বয়সের আবেগের আধিক্য ও ভেসে বেড়ানোর মানসিক অবস্থানকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা উপেনবাবুর সঙ্গী ও পার্টিকর্মী অনুকূল চরিত্রটি পাই। সে উপেনবাবুকে দিল্লির ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। সে ট্রেনে উঠে উপেনবাবুর শোবার জায়গা করে দেয়। অতীব দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে অনুকূল একজন সহকর্মীর যথোচিত যত্ন নিয়েছিলেন। অথচ তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল না। এমনকি কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল না। সেই অনুকূলই তাকে ট্রেনের টিকিট হাতে দিয়ে দেয়। বাইরে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় হেল্থ্ সার্টিফিকেট হাতে দিয়ে দেয়। প্লেনের টিকিট হাতে দিয়ে যত্ন করে রাখার পরামর্শ দেয়। অনুকূল তাকে বলে ড়''তবে দিল্লিতে পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই। পার্টির লোকজনেরা থাকবে। আপনাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যথাসময়ে জায়গামত ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর এই খামটা রাখুন। সেক্রেটারি দিয়েছেন

আপনার রাস্তার খরচ-খরচার জন্যে ।'' ট্রেন সিগনালের মুহূর্তে উপেনবাবুকে ফুল দিয়ে যাত্রার শুভেচ্ছা জানায় উত্তরবঙ্গের অসংখ্য মানুষ । তারা সবাই কলকাতায় কাজকর্ম করে । কেউ ব্যাঙ্কে মাঝারি কাজ করে , কেউ কলেজে পড়ায় , কেউবা ব্যবসা করে । জেল থেকে বেরোনোর পর তিনি সটান ডুয়ার্সে গিয়েছিলেন শ্রমিক সংগঠনের কাজে । তাঁর সঙ্কটকালে বিদেশে চিকিৎসার যাত্রা পথে ডুয়ার্সের সেই চেনামুখগুলি আজ এগিয়ে এসেছে ।

'কে কোথায় যায়' উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায় থেকে আরেকটি মজার চরিত্র পাওয়া যায় ড্ড 'ঢ্যাঙা গির্জা' । উপন্যাসিক এ ধরণের নামকরণের যথার্থতাও উল্লেখ করেছেন । সেই ঢ্যাঙা গির্জা সেই রেলের কয়েকটি কামরার কণ্ডাক্টর-গার্ড । এই অধ্যায়ে যাত্রীদের টিকিট নিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় উপেনবাবুর । যাত্রীরা বিভিন্ন ট্রাভ্ল এজেন্সির কাছ থেকে টিকিট কেনার পর যাত্রা পথে বিভিন্ন কারণে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় । কিভাবে তারা এই টিকিটের ব্যবসা চালান -তার নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ সরস বর্ণনাও আমরা এখানে পাই । ট্রেন যাত্রার বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় আলোচ্য উপন্যাসে আমরা পাই । কোথায় কিভাবে কে যাচ্ছে , সেই জীবন যাত্রার আলেখ্য এই উপন্যাস । আনুপূর্বিক কোনো প্লটকে টেনে নিয়ে পাঠকের মনের রসাস্বাদন লেখকের অভিপ্রায় এই উপন্যাস সৃষ্টিতে ছিল না । যার ফলে কাহিনী বর্ণনার আদল এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র্য । ঢ্যাঙা গির্জা এক যাত্রী সম্পর্কে বলে ড্ড''রাজুর অ্যাটাচিতে তাঁর পুরো নাম ; চন্দ্রশেখর রাজু । তার নিচে কোম্পানির নামটা সাঁটা ড্ড এন . বি . জি . টি কোং । তার নিচে গুন্টুর' এ . পি । নি:সন্দেহে তামাক ব্যবসায়ী । জি . টি. সম্ভবত গোল্ডেন টোব্যাকো গুন্টুর তো তামাকেরই জায়গা । গুপ্তর ব্যাপারটা তার মুখ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন ঢ্যাঙা গির্জা । গুপ্তর টিকিটে যে-ব্যক্তি যাচ্ছে , তার বয়েস খুব বেশি হলে তিরিশ-বত্রিশ । বিয়াল্লিশ তো কিছুতেই নয় । ঢ্যাঙা গির্জা ইচ্ছে করেই একবার কাগজের দিকে একবার তার মুকের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন । স্রেফ মজা দেখার জন্যে । যার টিকিট সে তাড়াতাড়ি মুখটাকে অন্যমনস্ক করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল । ভেতরে ভেতরে যে নার্ভাস হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছিল এক হাতে তাস ধরে তারপর অন্য হাত রেখে তার আঙুল নাচানো থেকে ।'' (৪ - কে কোথায় যায়) । এই অধ্যায়ে লেখক আর একজন বৃদ্ধের কথায় বলেন ড্ড'' ঢ্যাঙা গির্জা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেখলেন একেবারে শেষদিকের কুপেটা থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক বোধ হয় বাথরুম যাবেন বলে ট্রেনের গা ধরে নিজেকে সামলে সামলে এদিকে আসছেন । ভদ্রলোকের বোধ হয় খেয়াল নেই ওদিকে বাথরুম আছে । খেয়াল থাকলে নিশ্চয় এতটা রাস্তা টলমল করতে করতে হেঁটে আসতেন না।

উনি উঠেছিলেন এই দরজা দিয়ে । তখন নিশ্চয় এই দিকে বাথরুম লক্ষ করেছিলেন । ওঁর মুখ দেখে কীরকম কীরকম মেনে হয় । উনি কি অসুস্থ ? '' (৪/ কে কোথায় যায়) ।

উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে সদ্য বিবাহিত দম্পতির ট্রেন যাত্রার কথা আমজরা পাই । এই অনুসঙ্গ - উপন্যাসের বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে । উপেনবাবুর খোঁজ নেবার প্রসঙ্গে সহদেব ও তাতিয়ার কথোপকথনে আমরা দেখি - '' ডিনারের অর্ডারটা দিয়েই ওঁর কামরায় চলে যাব । আমার তো খিদের কোন লক্ষণই নেই । দুপুরে তোমাদের বাড়িতে যা সাঁটিয়েছি । ভুলে গেলাম , বোতল কয়েক বীয়ার আনলে ঠিক হত । আর ভুলেই যখন গিয়েছি , তখন অভাবে - ' বলে আচমকা তাতিয়ার গালে একটা চুম্বন দিয়েই এক ছুটে গেল তোড়াগুলো গুছিয়ে কামড়ার এক কোনে রাখতে । সহদেব হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় তাতিয়া মারার ভঙ্গিতে হাত উঠিয়েই থেমে গেল । শুধু গলাটা তুলে বলল, ' দুষ্টু - । '' (৫/ কে কোথায় যায়) । এর পর '' রাত্তিরে সহদেবের কানে কানে তাতিয়া বলেছিল , ' ইস , গুণতিতে একটা দিন ভুল করে ফেলেছি । আজকের রাতটা , প্লিজ , মাপ করে দিও । ' তারপর নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল। '' (৫/ কে কোথায় যায়) এখানে লেকক সহদেব ও তাতিয়ার দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেমভাবনার পরিচয় দিয়েছেন ।

উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দুটি পৃথক শ্রেণীর রাজনৈতিক চরিত্রের স্বাক্ষাৎ পাই। এদের মধ্যে একজন সত্য নিষ্ঠ পার্টি প্রেমিক উপেনবাবু অন্যজন দল ত্যাগী স্বার্থবাজ ও বর্তমানের এম . পি. যদুবাবু । লেখক অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে এবং স্বল্প কথায় চবিত্র দুটি ফুটিয়ে তুলেছেন । আমরা দেখি যদুবাবুকে উদ্দেশ্য করে উপেনবাবু বলেন -- '' দল বেঁধে দীক্ষা নেব কেন ? দীক্ষা নিয়ে দল বেঁধে ছিলাম । দীক্ষা নিয়েও সবাই কি আর ভক্তিনিষ্ঠা রাখতে পারল । না পেরে তখন ভেঙে বেরিয়ে গেল । তাতেও শেষ হল না । শেষে নিজেরাই ভেঙে চৌচির হল । '' (৬/ কে কোথায় যায়) । এই উপেনবাবুর সর্ম্পকে লেখক বলেছেন - '' তবে সত্যিই উপেনদার রান্নার হাত খুব ভাল ছিল । আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকার সময় তাই । তবে উপেনদা রাজনীতিতে বরাবরই কাঁচা । পাবলিক মিটিঙে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা , পার্টি ক্লাস নেওয়ার ভারও ওঁকে ঠিক দেওয়া যেত না । ফলে , যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন । পার্টিতে বাড়লেন না । তাছাড়া কোনরকম প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে থাকবেন না । ওতে কি হয় ? রাজনীতি তো আর ধুনি জ্বালানোর জায়গা নয় , খেলার মাঠও নয় । তার আসল ব্যাপারই হল ক্ষমতা । শুধু পথ বলাই যথেষ্ট নয় । পথ কাটার ক্ষমতা চাই । '' (৬/ কে কোথায় যায়)। উপেনবাবু চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান করেছেন উপন্যাসের যদুবাবু চরিত্রটি ।

তার সম্পর্কে যদুবাবু বলেন - " উপেনদার মতন লোকের যাওয়া উচিত ছিল রাষকৃষ্ণ মিশনেও নয় , ভারত সেবাশ্রম সংঘে । পরোপকার আর বিপ্লব এক নয় । অনেকে গালাগাল দিয়ে আমাদের বলে , আমাদের আজ এক কথা কাল আরেক কথা । আর উপেনদার দলবলের পিঠ চাপড়ে বলে - দেখো , এরা ভদ্দর লোক ; এদের এক কথা । লোকগুলো তো ঠিকই বলে । অবস্থার নড়চড় হলে আমাদের কথারও নড়চর হয় । আমরা সত্যিই কোঁচা-হাতে-করা ভদ্দরলোক নই আমরা হলাম দলবাঁধা সর্বহারা । " (৬/ কে কোথায় যায়) । উপন্যাসিক এখানে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন ।

ট্রেনের একটি স্বাভাবিক ও সাবলীল বর্ণনার মধ্যে অসাধারণ শিল্পগউনের সমাবেশে রাজনৈতিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন । এখানে লেখকের উপন্যাস রচনায় শিল্পগুণের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকতার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন । রাজনৈতিক জীবনের হাতিয়ার হয়েও তাঁর লেখা এখানে শিল্পগুণের উৎকর্ষতাকে অধিক সৌন্দর্য দান করেছে । এই উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা আবার সহদেব ও তাতিয়ার দেখা পাই । তাদের জীবনের কথা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে জীবনের গূঢ়সত্যকে লেখক একানে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন । বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় গণমাধ্যমগুলো বেশীর ভাগই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে । সহদেবের ঘনিষ্ঠ প্রফুল্লদার স্মরণ প্রসঙ্গে উপন্যাসে গনমাধ্যমের বাস্তব সত্যটিকে লেখক এখানে সন্নিহিত করেছেন । সহদেবের প্রফুল্লদা একসময় একটি নামকরা ইংরেজী কাগজে কাজ করতেন । সহদেব কে তার প্রফুল্লদা একদিন বলেছিলেন -- " দ্যাখ , আমি কখনও কাগজ পড়িনা । ময়রা মিষ্ট খায় না এই কথা ভাবছিস তো ? কিন্তু তা নয় । আমি পড়ি না অন্য কারণে । খবরের ভেতরকার খবর আমি জানি বলে । খবর পড়িনা বটে , কিন্তু খবর রাখি । যতটা খবর দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি খবর ওরা চেপে রাখে । আর দরকারমত খবর বানায় । খবর মানেই হল প্রচার । অর্থাৎ ট্যাঁড়া পেটানো । কোনটা স্থুল , কোনটা সূক্ষ্ম । কোন্ পক্ষে ? আসল প্রশ্ন সেইখানে ? " । (৭/ কে কোথায় যায়) । সহদেব কে তিনি আরো বলেছেন -- " শোনা যায় , কুলি মেয়েরা নাকি কাজে বেরোবার সময় দুধের বাচ্চাদের মুখে একটু করে আফিম ছুঁইয়ে যায় । কাগজ ওয়ালারাও তাই করে । লোকের মগজগুলো খুলে নিজেদের ভাবনার কলগুলো বসিয়ে দেয় । তার ফলে , লোকে সারাদিন ওদের ভাবনাগুলোই নিজের বলে ভেবে যায় । " (৭/ কে কোথায় যায়) । এখানে লেখক সমাজ সচেতন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে শিল্পের সৌন্দর্যবোধ ও জন জাগরণী সুর এক সঙ্গে বেধেঁছেন । এখানে সহদেবের দেশের বাইরে থাকার অভিজ্ঞতাকে লেখক যুক্তকরে ছেন । পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে এদেশের বৈষম্য সহদেব অনেকদিন থেকে

দেখে আসছেন --" সেই সঙ্গে পুবে-পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত একটা জেতের উত্থানপতনও সে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে । এপারে কাজ কমে গিয়ে কাজের লোকে টান পড়ছে। এর মধ্যে সে বারকয়েক পুবে ঘুরে এসেছেব , জিনিসপত্তর কিনে সে আসা-যাওয়ার ভাড়া তুলে নিয়েছে। এপারে আগুন দাম । কিন্তু ব্যাপারটা শুধু অর্থনীতির মধ্যে আটকে নেই । মানুষের মূল্যবোধ , মনের স্ফুর্তি, গুণের সম্মান, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, শিশুর যত্ন - কোন দিক দিয়েই পুবের পাশে পশ্চিম দাঁড়াতে পারে না । " (৭/ কে কোথায় যায়)।

ঔপন্যাসিক একটি সাধারণ যাত্রার মধ্যে জগৎ,জীবন, দেশের রাজনৈতিক , সামাজিক ও আর্থসামাজিক গূঢ় তাত্ত্বিক বিষয়কে এখানে নিহীত করেছেন । সদ্য বিবাহিত সহদেব ও তাতিয়ার দাম্পত্ত লীলার যৌনক্রীড়া ও লঘু হাস্যরসাত্বক যাত্রায় ঘন ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের রহস্য উন্মোচন করেছেন । বন্ধু প্রফুল্লর জীবনের নানা কথা প্রসঙ্গে লেখক সহদেব সম্পর্কে বলেন -- " লেখাপড়ায় ভাল ছেলেরা ভেতরে ভেতরে যে এরকম শুকনো বারুদ হয়েছিল , তারা নিজেরাও সেটা বোঝেনি । সহদেব সেই দলের । তার বনবাসের বয়স চোদ্দ বছর না হয়ে কেঁদে - ককিয়ে চোদ্দ মাস ।

কিন্তু প্রত্যেকটা দিনই ছিল ঝড়ে-ঠাসা । . . . সহদেবের ধারণা , এই ঝোড়ো দিনগুলোকে নিয়ে যা কিছু বলা - লেখা হয়েছে তার সবই অন্ধের হস্তি - দর্শন । হয়তো সব সাপ্টে দেখার মতো দূরত্বে না গেলে এখন এর বেশি সম্ভবও নয় । সে শুধু এটুকু বলতে পারে যে , এর পেছনে কেবল দেশ নেই -- আছে দুনিয়া । " (৭/ কে কোথায় যায়) । সহদেব বাইরে থেকে তার বাবর কতা স্মরণ করে । তার বাবা বলতেন -- " দ্যাখ, অত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল -- তার পুরোটাই রয়ে গেল তোদের চোখের আড়ালে । আজ পৃথিবীকে তোরা ঢেলে সাজাতে চাইছিস কীসের ভরসায় ? একটা ঠোকাঠুকিতেই তো দুনিয়া ফৌথ । নদীতে বাঁধ না দিয়ে কি কেউ শুধু চাষ-আবাদের কতা ভাবে ? " (৭ / কে কোথায় জায়)। একানে সহদেবের বাবার উক্তিতে জগৎ সংসারের বৃহত্তর সত্যকে লেখক উন্মোচন করেছেন ।

এই উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ যাত্রীদের বৈচিত্রে পূর্ণ । সেখানে যাত্রীরা ট্রেনে তাস খেলে । সেখানে ছিল মিষ্টার লতিফ , মিষ্টার ব্রাউন, ব্রাউনের স্ত্রী গ্লেন, অবাঙালী মেয়ে মিস মীরা খান্না, মিষ্টার মুখার্জী, সোম সুন্দর , মিষ্টার বড়ুয়া ও ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের দল। এদের মধ্যে ব্রাউন ও তার স্ত্রী গ্লেন ছিলেন সমবয়সী। এরা সম্ভবত এদেশে গবেষণা করতে আসে । অবাঙালী মিস মীরা খান্নার চেহাড়ায় খুব ব্যক্তিত্ব আছে। লেখক বলেছেন এর গড়ন ছিপছিপে লম্বা । লেখকের কথায় সে খুব

সপ্রতিভ । ট্রেনে তারা খেলার সময় গানও করছিল। তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত গান পাগল ছিলেন মিষ্টার মুখার্জী । তার গান ----------

“ ও মন , উড়োজাহাজ উড়ছে
দেখ রে আশমানে
তিন রঙের তিনটে আলো
জ্বলছে নিভছে সমানে । ... ”

জাত বাউল নাহলেও তার এই গানটি তাদের যাত্রাপথে ভিন্নস্বাদ এনেছে এবং উপন্যাসে বৈচিত্র্য দান করেছে ।

এই উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে আমরা উপেনবাবুর মূল্যবান আত্মবিশ্লেষণ পাই । চরিত্রের নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখার মধ্যে যাত্রার গতিপথ ক্রমশ অগ্রসর হতে দেখি । সেখানে উপেনবাবু ভাবে -- “ বড় বড় কথা মুখে বলি , ছোট ছোট কাজ গুলোও নিজেরা করতে ভুলে যাই । আসলে এর পেছনে রয়েছে আত্মপর ভেদ । এটা আমার , ওটা আমার নয় । এক সময়ে সমাজে আমি-তুমির ভেদ ছিল না সবাইকে নিয়ে ছিল একটা বড় যূথবদ্ধ আমরা । মানুষে মানুষে তফাত তারপরে এল । এর আছে ওর নেই -- এই ভাবে । ” (৯/ কে কোথায় যায়) । এখানে সমাজ মানুষের মানসিকতাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষন করেছেন লেখক । উপেনবাবু আরো ভাবে -- “ দেশ আমার । ইংরেজ থাকতেও আমার ছিল , চলে যাওয়ার পর তো আরও বেশি করে আমার । মালিক বলে নিজেকে জোর করে কেউ কায়েম করলেই তো আর তার মালিকানা পাকা হয়ে যায় না । ইংরেজের বেলাতেও তা হয়নি , এখনও তা হবে না । ” (৯ / কে কোথায় যায়)। যাত্রাপথে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও আত্মীয়তা সৃষ্টি হয় । এই অধ্যায়েই আমরা তাতিয়া - সহদেবের সঙ্গে উপেনবাবুর অনাবিল হৃদ্যতা দেখতে পাই।

‘কে কোথায় যায়’ - উপন্যাসে যাত্রীদের নানা পেশার , নানা শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল একটাই পাই । সেই সঙ্গে পাই নানা জায়গায় যাত্রার নানা অভিজ্ঞতা । এই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে লেখক লিখেছেন -- “ ঈশ্বরদি পেরিয়ে ট্রেন হু হু করে চলেছে সান্তাহারের দিকে । লালমণির হাট হয়ে গাড়ি যাবে আমির গাঁও । ট্রেনে মিলিটারির কড়া পাহাড়া ।” (১০ / কে কোথায় যায়)। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকেও এক সূত্রে বেঁধেছিল উপন্যাসিক । সেখানে লেখক বলেন -- “ ট্রেনের কামরায় অল্প কিছু সংখ্যক হিন্দু । সবাই প্রায় বুড়ো বুড়ি । যাত্রীদের বাদবাকি সকলেই মুসলমান। হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন কোন মিশনের সাধু । মুণ্ডিত মস্তক ।

পরনে গেরুয়া । রং ময়লা । মাথা বেশ লম্বা । হাড়গুলো চ্যাটালো । আপন মনে গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে চলেছেন । " (১০ / কে কোথায় যায়) । এই অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন জীবন যন্ত্রণা, বয় ও বাঁচার তীব্র লড়াই । সেখানে শেষ অবস্থার একটি গুর্খা টি-বি রোগী ও তার স্ত্রী । লেখক বলেন -- " বউটিকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল । কাঁদছিল না বটে , কিন্তু মুমূর্ষ স্বামীর শিয়রে কেমন যেন গন্ধ লাগা অবস্থায় সে বসেছিল। তাকে দেখে সত্যিই মনে হচ্ছল সে যেন বিষাদের প্রতিমা ।" (১০ / কে কোথায় যায়) -- যাত্রাপথে ট্রেনে উঠেছিল একটি সাপ । একজন সেই সাপদেখে চিৎকার করে উঠেছিল । " তাঁর চিৎকার শুনে গুর্খার বউ ব্যাপার দেখার জন্য দৌড়ে এল । আমি পেছনে একবার তাকিয়ে দেখলাম সেই গুর্খা রুগীটি আতঙ্কে উঠে বসেছে । তার সারা মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । " (১০ / কে কোথায় যায়) । ফণা তোলা সেই সাপের কামড়ের থেকে বাঁচার জন্য সেই গুর্খা রোগিটি ট্রনের নঈচে ঝাঁপ দিয়ে মারা যায় । " বন্ধ দরজা খুলে সে নিজেই ঝাঁপ দিয়েছিল । আত্মহত্যা করবে বলে নয় । সাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য । কখন ? না যখন দুরন্ত টি-বি রোগ তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছিল । ছিল শুধু টান দেবার অপেক্ষায় । লড়াইতে কিংবা রোগে মৃত্যুবরণ করাটা তার কাছে ছিল স্বাভাবিক । তাতে সে কখনও সাহস হারায়নি । কিন্তু সাপের কামড়ে ? সেটা তার কাছে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু । তাই সে ভয় পেয়েছিল । (১০ / কে কোথায় যায়) । জীবন , মৃত্যু ও ভয়ের একটি করুণতম কাহিনী এখানে উপন্যাসের বিষয় সয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এক একটি চরিত্র ও ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা উপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার দক্ষতায় এবং সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পারর্ম্পযে পাঠকের মনে আর বিচ্ছন্ন হয়ে থাকে না । এই উপন্যাসে এই ছোট ঘটনাগুলি একটি অন্ত:গূঢ় আকর্ষনে আবদ্ধ । ঠিক এভাবে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র উপেনবাবু ক্রমশ: চলতে চলতে ১১ শ তম পরিচ্ছেদে সহদেব তাতিয়ার সম্পর্ক বৃত্তে অন্তভুক্ত হয় । ক্রমশ একটি বিস্তৃত পরিধী যুক্ত বৃত্তে উপেনবাবু-সহদেব-তাতিয়া অনুকুল আবর্তিত হয় । আসাধারন শিল্প সার্থকতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের ছোট ছোট কাহিনীগুলি একটি অভেদ্য বেষ্টনীযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন । উপন্যাসের ১১ শ তম অনুচ্ছেদের প্রথমেই আমরা দেখি সহদেবের " সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে সন্দে হ আর অবিশ্বাস । নিজের ভেতর জোর পায় না । ওর বেশিরকম জোর খাটানোর ইচ্ছের মধ্যেও আছে ওর এই জোর না - পাওয়ার ব্যাপারটা । এখন একটা জিনিসও বুঝে উঠতে পারছিনা । উপেনদাকে ও মুঠোয় পুরেছে , না উপেনদা ওকে ট্যাঁকে গুঁজেছেন । " (১১/ কে কোথায় যায়) । তারা অনুকূলকে শেষ মুহুর্তে পেয়েছে। অনুকুলের সঙ্গে তাদের তর্কের শেষ সুযোগ আজকের এই রাত — "গতবার এসে একচোট হয়েছিল। অনুকুল তর্কে

সহদেবের সঙ্গে পারেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সহদেব যে ঠিক, এটাও সে মানেনি। অনুকুল খোলাখুলি বলল, 'তোমাদের যুক্তিতর্ক আর সুক্ষ্মবিচার নিয়ে তোমরা থাকো — আমি জীবন আঁকড়ে নিজেকে ধরে থাকব।'' (১১/ কে কোথায় যায়)

এই অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের প্রধান চরিত্র নির্বাচনের এবং উপেনবাবুর প্রতি লেখকের গুরুত্ব প্রদানের কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারি। জীবনকে যে দার্শনিক চেতনায় তিনি দেখেছেন তার ব্যাখাও আমরা এই অধ্যায়ে পাই। এখানে তাতিয়ার উপেনবাবুকে শ্রদ্ধার মধ্যে, তাঁকে সেবা করার মধ্যে এবং ভালোবাসার মধ্যে। এখানে প্রধান চরিত্রের প্রতি স্রষ্ঠার শিল্পীসত্ত্বার নমনীয়তার অর্ন্তনিহিত কারণটিও আমরা মুপলব্ধি করতে পারি। উপেনের কয়েকটি উক্তির সাহায্যে আমরা এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে পারি — অ) ''জানো, তাতিয়া — জানো, সহদেব — যদি তোমরা জিগ্যেস কর, স্বদেশীতে কেন আমি এলাম — তাহলে আমি ইংরেজদের সামনে রেখে এখুনি দশ কথা শুনিয়ে দিতে পারি, তার জন্যে আমাকে কিছু ভাবতে হবে না।......... দেশ আর মানুষ। বন্ধন আর মুক্তি। আমার ভেতরে থেকে সে-ই সব চিনিয়ে দেয়। (১১/ কে কোথায় যায়) আ) ''সব যদি আগেভাগে জেনে নেওয়া যায়, বাঁচার আনন্দটাই তো তাহলে মাটি হয়ে যাবে। তারপর কী? জীবনে যদি তারপরটাই না থাকে, তাহলে সে — জীবনে কোনো স্বাদ কিংবা আহ্লাদ থাকে? এক পা করে এগোব আর মন বিস্ময়ে ভরে উঠবে।'' (১১/ কে কোথায় যায়) ই) ''একেবারে নির্ভুল ব্যাপার আমরা যন্ত্রের কাছ থেকে চাই। ঠিক আর ভুল, দোষ আর গুণ মিশিয়ে হবে মানুষ। ভুল না থাকলে কোথায় থাকত উদ্ভাবন? কোথায় থাকত আবিষ্কারের বিস্ময়?''

একটি ট্রেন যাত্রার সঙ্গে অনায়াসে লেখক সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যের মধ্যে দেশপ্রেম ও জীবনসত্যের নিগুঢ় তত্ত্বকে তুলে এনেছেন উপন্যাসের দ্বাদশ অধ্যায়ে — ''গোটা দেশটা যেন উল্টোপাল্টা ট্রেনে বসে আছে। ভয়ের কথা এই, ভুলটা যে ধরিয়ে দেবে ধরিয়ে দেবে সেই চেকার কোথায়?(১২/ কে কোথায় যায়) এই উপন্যাসের ত্রয়োদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদেও আমরা লেখকের জীবনদর্শন ও চরিত্র অঙ্কণের দক্ষতার পরিচয় পাই। সেখানে একবার উপেনবাবু সম্পর্কে সহদেব বলে — ''তত্ত্বের চেয়েও ঢের বড় জিনিস হল জীবন। উপেনদাকে দেখো, যতক্ষণ আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করব, উনি তার মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হয় ডুবন্তকে তুলবেন নয় মরবেন।''(১৩/ কে কোথায় যায়)

এই উপন্যাসের চতুর্দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাতিয়ার অভিশপ্ত পরিবারে বেড়ে ওঠার কথা আমরা জানতে পারি। যে পরিবারে মানুষগুলো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি। তাতিয়া আশৈশব

দেখেছে তার মা-বাবা উভয়েরই অস্বাভাবিক সম্পর্কের কুৎসিত চিত্র। সমাজের মানুষের কাছে সে ভয়ে ভয়ে সর্বদা মুখ লুকিয়ে রাখত। তার মা-বাবার কথায় সে আমাদের জানায় — বাবা বোধহয় বিয়ের আগেই বেশি লোভ করতে গিয়ে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছিলেন।মা-র লোভ ছিল পরিচয় দেওয়ার মত স্বমীর, মা-র মন ছিল না, শরীর ছিল।''(১৫/কে কোথায় যায়) ছেলেবেলা থেকেই সে কারো ভালোবাসা তেমনভাবে পায়নি। সেজন্য সে এখন মানুষের ভালোবাসার কাঙাল। এই কাঙালিপনা থেকে এবং উপেনবাবুর সাহচর্যে সে এখন চা-বাগানের সামান্য শ্রমিক-মা-বাবা-সমাজের অন্য সবার সবকিছু বদলাবার কথা ভাবে। এভাবে একটি সাধরণ চরিত্রকে উন্নীত করে অসাধারণ করে তোলেন ঔপন্যাসিক। তার ক্রমোন্নতি আমার এর আগের আধ্যেয়েই দেখি। সেখানে সে নিজের আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে উপেনবাবু সম্পর্কে বলে — ''অমন করে এ-পর্যন্ত আমি কারো ভেতর দেখতে পাইনি। তুমি আমি আমরা সবাই নিজেদের ঢেকে রেখেছি। নইলে যে ফাঁস হয়ে যাব। এই একজন লোক দেখলাম যার ভয় নেই। ভয় নেই বলেই আছে ভালোবাসা। কাকুতিমিনতি নেই। তার ভালোবাসায় আছে জোর। সেই জোরেই পৃথিবীকে সে বদলাতে চাইছে।''(১৫/ কে কোথায় যায়)

এই উপন্যাসের বিশেষ এক আদর্শের চেতণায় উপেনবাবু চা-বাগানের বঞ্চিত দুখন্তি, সোনিয়া, সোনিয়ার-মা এমনকি তার ছোট্ট বাচ্চাটিকেও ক্রমশ: দীপ্ত হয়ে জয়ীরূপে দেখেন। এই উপন্যাসে পরাধীন ভারতের স্বদেশীদের আন্দোলন, জেলে যাওয়া, ফাঁসী, তাঁদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি প্রভৃতি অনুষঙ্গ পাই আমরা। সংগ্রামী মানুষের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং সংগ্রামী মানুষের মাহাত্ম্য ঔপন্যাসিকের ভাষায় উচ্চমানের মাত্রা যুক্ত করেছে — ''সেই জানোয়াররা লড়াই করে মানুষ হয়েছে। আর তাদের শুষতে শুষতে একদলমানুষ জানোয়ার হয়ে গেছে।'' (১৫/ কে কোথায় যায়) এই উপন্যাসটির ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আমরা ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক চেতণা, সমাজভাবনা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপেন মজুমদারের মধ্যে লেখকের রাজনৈতিক সত্ত্বার উৎকর্ষতার পরিচয় নিহিত রয়েছে। উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে উপেন মজুমদারকে পার্টির মানুষজন ফুল দিয়ে বরণ করে মিছিল ধরে স্বাগত জানায়। এভাবে একজন নি:স্বার্থ পার্টিকর্মীকে সম্মান জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা বশত: তার চিকিৎসার ব্যাবস্থা নেবার দিক নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে। কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, গদ্য ভাষার অভিনব বয়ন, মহৎ জীবনদর্শন ও পাঠকের হৃদয়ের রস সৃষ্টির সার্থকরূপ এই উপন্যাসে আমরা পাই।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস ''অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ'' (১৯৮৩)। লেখক এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকে। উপন্যাসটি

পাণ্ডুলিপি ভূমিকা অংশ ছাড়া সংখ্যা ছাড়া সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছয়টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন লেখক। অসামান্য উপলব্ধি ও উচ্চ জীবনদর্শন এই উপন্যাসে পাই আমরা। সমাজ মানুষের স্বাভাবিক জীবনে কারো 'কুষ্ঠ' রোগ হলে সেই রোগীর জীবন ভাবনা এবং সেই রোগী সম্পর্কে সমাজ-পরিবার-জগতের কেমন প্রতিক্রিয়া ও ভাবনা আসে নিপুণ প্রজ্ঞা ও সমাজ সচেতন দৃষ্টিকে শৈল্পিক রূপদানের প্রয়াস এই উপন্যাস। এতে আমরা সাম্প্রদায়িক বৈসম্যহীন শুদ্ধ মানব সমাজ গঠনের উৎকর্ষ জীবন চেতনা ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে পাই। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ভোট পদ্ধতি সমাজে কিভাবে মানুষকে স্বার্থপর ও সংকীর্ণ করে তোলে সেই ত্রুটিপূর্ণ সিস্টেমকে প্রত্যক্ষ করি আমরা আলোচ্য উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কাহিনী অভিনব পদ্ধতিতে লেখক উপস্থাপন করেছেন। পট বিন্যাসের স্টাইল ও কাহিনী বর্ণনার পদ্ধতিও অভিনব।

'অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ' উপন্যাসের কাহিনী প্রত্য জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। অথচ কাল্পনিক কোনো কাহিনীও নয়। এতে রয়েছে একটি ছোট্ট ইতিহাস। কোনো একদিন কোনো একজন ট্রেনযাত্রী এই উপন্যাসের কাহিনী সম্বলিত পাণ্ডুলিপি লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম-ঠিকানা লেখা একটি বড় খামে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটি পুরোপুরি ইংরেজি লেখা পাণ্ডুলিপি।

সেই অজ্ঞাত পরিচয় ট্রেনযাত্রী সেই পাণ্ডুলিপিটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা সেই বড় পাণ্ডুলিপিতে লেখক ও প্রেরকের পরিচয়ের হদিশ নেই। অবশ্য লেখকের এই নাম প্রকাশে অনীহার কারণ নির্দেশ করেছেন সম্ভাব্যরূপে। সেই সম্ভাব্য কারণ গুলির মধ্যে আমরা একজন নিষ্কাম ও নির্মোহ লেখকের পরিচয় পাই। এতে নিজের সৃষ্টির প্রতি লেখক নিজের স্বত্ব আরোপ করেন নি। একজন স্রষ্টার পূর্বের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন লেখক। তিনি বলেন - ''আগে বিয়েবাড়িতে হাতমোছার কাগুজে রুমালে পদ্য লেখার জন্যে কবিদের ডাক পড়ত।'' সেকালে নবজাতকের নামকরণে ও শখের কাগজে কেবল লেখকদের প্রয়োজন ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন প্রকাশকগণ।

লেখার জগতে প্রকাশকদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিক উপলব্ধি আমরা এই উপন্যাসের ভূমিকা অংশে পাই। লেখক বলেছেন - ''আমাদের প্রকাশকেরাও চিজ বটে। মাইনে দিয়ে সম্পাদক না রেখে তাঁরা শুধু বাঘা বাঘা পত্রিকার সম্পাদকদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরা চান বড় জোর চেনাজানা লেখকদের সুপারিশ। বই লেগে গেলে প্রকাশকের হাতযশ, না লাগলে লেখকদের মুন্ডুপাত। এইভাবে কত পাণ্ডুলিপি নিয়ে যে প্রকাশকদের দোরে দোরে ফেরি করে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বেশির ভাগটাই হয়েছে 'ভস্মে ঘি ঢালা'। দু-চারটি ক্ষেত্রে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও পরে

প্রকাশক আর গ্রন্থকারই কৃতিত্বটা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে নিয়েছে যে আমাকে তার একটু খুদকুঁড়োও ছুঁড়ে দেয়নি।'' (ভূমিকা/ অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ) সেই পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে লেখক তাঁর জীবনের আর্থিক সংকট ও প্রকাশকগণের ব্যবসায়িক উপেক্ষা এখানে অত্যন্ত শৈল্পিক চেতনায় বিন্যস্ত করেছেন। এখানে নাম ভাঁড়িয়ে, কোথাও ছদ্মনামে আবার বেনামীতে লিখে লেখক অনেক সময় মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছেন। জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভূমিকা অংশ যুক্ত করার সার্থকতা।

উপন্যাসের লেখকের স্বত্ব নিয়ে দাবি করা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। সাহিত্য দৃষ্টিতে বেনামীতে, নাম ভাঁড়িয়ে বা ছদ্মনামে লেখার আঙ্গিককে এখানে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। এখানে উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির অভিজ্ঞতাকেও যুক্ত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক স্বার্থশুণ্য, সাম্প্রদায়িক বৈসম্যহীন, সাম্যতান্ত্রিক সুস্থ সমাজ ও সুস্থ্য জীবন ভাবনার উন্নত, জীবন দর্শনের শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন রেখেছেন।

এই উপন্যাসে লেখক মহৎ জীবন দর্শন ও কাহিনী বিন্যাস একটি রোগকে আশ্রয় করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। রোগটি হল কুষ্ট। কুষ্ট রোগটির লেখক পোষাকি নাম দিয়েছেন 'হ্যানসেনের অসুখ'। এই রোগের ওপর ভিত্তি করে এই উপন্যাসে শৈল্পিক নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ। হাসপাতালে এই রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন - ''তুমি সেরে গেছ, তোমার আর অসুখ নেই। শুনে শুনে কান পচে গেছে।'' (১ - অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই রোগের ভয়ঙ্করতা ও সামাজিক উন্নাসিকতাপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন - ''কিন্তু এই রোগে সেরে যাওয়ার চেয়ে বড় অসুখ আর নেই। তুমি জান না, না ? ন্যাকা। তুমি হাড়ে হাড়ে জান, সেরেছ কি মরেছ। এখান থেকে গেলে দুনিয়ার কোথাও তোমার ঠাঁই হবে না। নরকেও নয়।'' (১ - অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষণী দক্ষতায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, প্রথম প্রথম এই ধরনের রোগীর বাড়ির লোকজন যখন হাসপাতালে দিয়ে যায়, তখন তাদের 'হাপুস' নয়নে বুক ভেজানো কান্না। যেন 'মাটি অবধি ভিজে কাদা হয়ে যায়।' হাসপাতালে রোগী রেখে এই সমস্ত রোগীর বাড়ির লোকেরা বাড়িতে ফেরে। 'যাবার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি সান্ত্বনা আর পিপে পিপে আশ্বাস। প্রথম দিকে বাইরে থেকে একটা দুটো চিঠি দিয়ে, কেউ কেউ হাসপাতালে এসে এক আধবার দেখাশুনা করে যান। তারপর রোগী যত ভাল হতে থাকে, ততই রোগীর খবর নেওয়ায় ভাঁটা পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীও উপলব্ধি করে যে তার সেই পরম নিকট আত্মীয়েরা তাকে তার আগের মতো কাছে পেতে চায় না। এই বিষয়টি ঔপন্যাসিকের ভাষায় - ''দিনে দিনে রুগিরও জ্ঞানচক্ষু খোলে। নতুন পরিবেশে

গোড়ায় তার যতটা অসহ্য লেগেছিল, আস্তে আস্তে সেটা সয়ে যেতে থাকে। স্নেহমমতার ঘনবদ্ধ খাপি ভাবটা কীরকম জ্যালজেলে হতে হতে ফর্দা ফাঁই হয়ে যায়। পুরনো মুখগুলো সব দোকানের মুখোশের মত স্মৃতির দেয়ালে সার বেঁধে ঝুলতে।

তারপর একদিন হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার সেই চরম দিনটা এসে যায়। আগেই বাড়িতে নিয়ম মত খবর যায়। কেউ নিতে আসবে না সবাই জানে। তবু অপেক্ষা করাটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই জানে এ-রোগে হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া।'' (১-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক দুর্বিসহ অবস্থা নিখুঁত পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে পাঠককে নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ। সমাজের মানুষ এই শ্রেণীর মানুষকে রুগ্ন অবস্থায় ভয় পায়। সেকারণে সেই রোগীর বাড়ির লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে হাসপাতালে দেওয়ার জন্যে। কেননা হাসপাতালের নিরাপদ জায়গায় দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টার ত্রুটি হলে পাড়ার লোকের চাপ পড়ে। অগত্যা সেই রোগীকে নিরুপায় হয়ে রাস্তায় এসে বসতে হয়। জনমতের প্রচন্ড চাপে সেই রোগী বাধ্য হয়ে হাসপাতালে পৌছে যায়। কেননা রাস্তায় পড়ে থাকলে সুস্থ্য মানুষের ভয় আবার দেখায়ও খারাপ। তাই লেখক বলেন - ''মরে গেলে আপদ যেত, কিন্তু সেরে গেলে ?'' অতিবাস্তবতার দৃষ্টিতে লেখক সেইসব রোগীর অবস্থা সম্পর্কে বলেন - ''ভালবাসা, নাড়ির টান, রক্তের সম্পর্ক - সবই কিছুদূর অবধি।''

লেখক আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক মানুষের সমাজ জীবন এবং কোষ্ঠী রোগীর অন্তর্ভেদী মর্মবেদনার স্বরূপ। কুষ্ঠ রোগীদের উপলব্ধির জায়গাটিতে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের একাত্ম হয়ে তাদের কথাকে শিল্পিত রূপে নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর ভাবপ্রকাশ খুবই স্বাভাবিক, সাবলীল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন - ''শুনি নাকি মরার বাড়া গাল নেই। আছে। তার প্রমাণ আমরা। আমাদের মধ্যে যাদের নাকগুলো রোগে খেয়ে নেয়, তারা ভূত আর শাঁকচুন্নির মত খোলা গলায় কথা বলে। রাতবিরেতে আমাদের কাউকে আচমকা দেখলে লোক ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাবে। অথচ ভূতদের যে সুবিধে আছে আমাদের তা নেই। ভূতে মারে ঢেলা। আর আমাদের উল্টে ঢিল খেতে হয়। ভূতকে ঢিল যদি মারাও হয়, ভূতের লাগে না। আমাদের ঢিল মারলে লাগে। ভীষণ লাগে। রক্ত বেরোয়।'' (১-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সমাজের চোখে বোঝার মতো উপেক্ষিত সেই সব মানুষের হৃদয়ের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে লেখক সুভাষ তাঁর সমাজ সচেতন, সংবেদনশীল, উচ্চ অনুভূতির শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন এখানে। আলোচ্য

উপন্যাসের ১ম অধ্যায়ে আমরা কুষ্ঠ রোগীর সামাজিক অবস্থানের শৈল্পিকরূপ আমরা পাই। এই অধ্যায়ের বিষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে লেখকের মহৎ জীবন দর্শনের জলছবি।

উপন্যাসের ২ অধ্যায়ে আমরা দেখি একটি চরিত্র চার্টার্ড অ্যাকুন্ট্যান্ট জমিদারদের বড়বাবু। চলমান উচ্চবিত্ত জীবনে এই কুষ্ঠ তামাশাচ্ছলে কোনোক্রমে এলে জীবনের অন্তঃসারশূণ্য, নিঃস্ব, একেবারেই অস্তিত্বহীন ও পৃথিবীর দরিদ্রতম অবস্থার উপলব্ধি যে হয় ; তার জীবন্ত ছবি সেই বড়বাবু। অসামান্য নিখুঁত শিল্প সৃজনের বিন্যাসে এই অধ্যায়ে সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের দেহে এই রোগের চিহ্ন দেখিয়েছেন লেখক। এখানে কুষ্ঠ রোগীর স্বাভাবিক লক্ষণগুলির সম্যক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। আকাশ পথে প্লেন যাত্রায় এই বড়বাবু ফাইলপত্র নিয়ে অফিসের কাজে বেড়িয়েছেন। প্লেনে সিগারেটের আগুনে সেদিন তার হাতের আঙুল পুড়ে গেলেও টের না পাওয়া ও পরে সিটের যাত্রীর তামাশা তারপর সেই আঙুলগুলো ভালোকরে নখ দিয়ে টিপে ও চেপে ধরলেও টের না পাওয়ায় কুষ্ঠের আন্দাজ হয়। তারপর সেই সহযাত্রীর পরামর্শে বড়বাবু ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে যে, তার কুষ্ঠ হয়েছে। কুষ্ঠ হওয়ার পর একজন সমাজের মানুষের যে যন্ত্রনাকাতর উপলব্ধি আসে তার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক এই অধ্যায়ে। কুষ্ঠ রোগ শরীরে হলে মানুষের যে মাসিক প্রতিক্রিয়া হয় তার বাস্তব ও শিল্পসম্মত রূপ এখানে পাই। বড়বাবু ডাক্তারের মুকে তার কুষ্ঠ হয়েছে শুনে ভাবে ''কুষ্ঠ । ছোট্ট একটা শব্দের মধ্যে যে এত জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, আগে কখনও ভাবিনি।'' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন যে কুষ্ঠ তলে একজন মানুসের মনের ভেতরে কিরকম প্রতিক্রিয়ার ঝড় হতে পারে। নিপুণ হাতে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে লেখক সেই প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা পাই সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জমিদারদের বড়বাবু চরিত্রে। বড়বাবু তার সদ্য কুষ্ঠ হয়েছে জেনে ভাবে - ''একটু আগেও আমি যা ছিলাম এখন আর তা নই।'' সে বলে - ''রাস্তার কোনো সুস্থ লোককেই আমি সহ্য করতে পারছি না। নিজেকে যতই অসুখী মনে হচ্ছে, ততই সুক সম্ভোগের জন্যে একটা হন্যে হওয়া ভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে। '' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবু এই অধ্যায়ে নিজেই বলে - '' আমার ভেতরে ফুঁসছে একটা অন্ধ রাগ। ঘৃণা ছাড়া তখন আমার শরীরে আর কিছুই নেই।'' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবুর সংসারের প্রতি আর কোন টানই থাকল না। উড়তে উড়তে একটা ঘুড়ি হঠাৎ উপড়ে গেলে যে অবস্থা হয় বড়বাবুর বর্তমান মানসিক অবস্থা সেরকমই। লেখক বড়বাবুর কুষ্ঠ হয়েছে নিশ্চিত হবার পর যেরকম মানসিক টানাপোড়েন আসে এই অবস্থাটা সুন্দর উপমায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে বলে, - ''বাইরে এসে দেখি সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের নীচে টলছে। এরোপ্লেন থেকে

ঝাঁপ দিয়ে প্যারাসুট না খোলা অবধি যে অবস্থাটা হয় আমারও হল সেই রকম হাল। সোঁ সোঁ করে নামতে নামতে হঠাৎ এক সময়ে প্যারাসুটটা ছাতার মত খুলে যায়। পায়ের নিচে জমি না পেলেও শূণ্যের মধ্যেই ভাসতে ভাসতে একটু করে ক্ষণস্থায়ী ঠাঁই মেলে। শেষ পর্যন্ত ধপাস করে মাটিতে পড়া - একমাত্র তখনই যা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।'' (২- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এরকম অবস্থায় বড়বাবু আত্মহত্যার কথা ভাবে।

সে ডাক্তারের কাছে নিশ্চিত হয়ে বাড়ইতে ফিরে বলে যে তার কুষ্ঠ হয়েছে। এরপর তার বাড়িতে তার ছোট্ট ছেলে যতবারই তার কোলে আসার জন্য হাত বাড়ায়, সে কায়দা করে ততবারই এড়িয়ে যায়। বাড়ির ভেতরের চেয়ার, টেবিল, সোফা কোনোটাকেই আর নিজের বলে মনে হয় না। নিজেকে মনে হয় বাইরের লোক। এমত অবস্থায় তার স্মৃতিতে আসে সারা জীবনের নানা কথা। মা-বাবা ও শৈশবের কথা। বাড়ির কথায় সে বলে - ''বাড়িতে এসেই বলে দিয়েছিলাম আমি আর মাছ-মাংস খাব না। রোগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না - তবে আমার কেমন যেন গন্ধের একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আঁশটে গন্ধটা কিছুতেই আমার সহ্য হচ্ছিল না। বসার ঘরে গোছা গোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি পড়েছি। বাবার কিছু ধর্মগ্রন্থ ছিল ; এই প্রথম ধুলো ঝেড়ে সেগুলো টেনে বার করলাম।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। মানুষের বিপদের একমাত্র আশ্রয় - পরম শক্তিময় কোনো অধ্যাত্ম শক্তি। এখানে বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিতে লেখক বড়বাবু চরিত্রে দেখিয়েছেন সেটি।

এখান থেকেই বড়বাবুর জীবনের আর একটি পালাবদলের অধ্যায় শুরু হয়। তার কথায় - ''অসুখটা যখন ধরা পড়ল, তখন প্রথমেই আমার আত্মহত্যার কথা মেন হয়েছিল। কিন্তু ভাবতে গিয়ে বয় হল।.....................কিছু নেই, শুধু শূন্যতা - এমন একটা অন্তহীন একঘেয়ে অবস্থার কথা ভেবেই আমি পিছিয়ে গিয়েছিলাম। জীবনকে নাকচ না করে আমি বেছে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় এক জীবন।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। আগের জীবনের সঙ্গে এই দ্বিতীয় জীবনের কোনো মিল নেই। নিজেরই শরীর সম্পর্কে তার এক স্বতন্ত্র্য অনুভূতি হয়। সে বলে - ''একই আমি দুই হয়ে গিয়েছি। জেগে থাকার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি যেন আর কেউ হয়ে নিজেকে দেখছি। শরীরটা যেন আমার হয়েও আমার নয়।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে সেই ভয়াবহ অসুখের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে নিঃশব্দে নিজেকে বাড়ির বাইরে আত্মগোপন করে। রাস্তায় রাস্তায় তীর্থ-তীর্থ, আমুক পীর, তমুক পীর, বিভিন্ন দরগা, দেবস্থান, হিমালয়ের সব দুর্গম গুহাগুম্ফা ও সব তীর্থস্থান ঘুরতে ঘুরতে তার ঠাঁই হয় এক হাসপাতালের বারান্দা।

আলোচ্য উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই সে বলে - " হাসপাতালে না এসে পড়লে আমার হাত দুটোকে কিছুতেই আর রক্ষা করা যেত না। বসে যাওয়া নাকের ডগা আর ফোলা -ফোলা কানের জন্যে আমার মুখ সে কী বীভৎস দেখতে হয়েছিল, বলার নয়।" (৪ -অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এরপর সে হাসপাতালে সেরে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছোট্ট একটা পুঁটুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে। হাসপাতালের গেট পার হয়ে সে পৃথিবীতে নিকট আত্মীয় পরিজনহীন একাকী জীবনকে উপলব্ধি করে। রাস্তায় পা দিয়ে এই প্রথম তার মনে হয়, তার সামনে এখন আর কেউ নেই কিছু নেই। জীবনের যে এক ভিন্ন অনুভূতি। তার স্মৃতি পুরনো জীবনের সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায়। তার আপনজনের মুখ গুলো ঝাপসা ও অপরিচিত মনে হয়।

এরপর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে তার চোখ বুজে আসে। হঠাৎ আঙুলখসা একটা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ডাকে। ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতে সে দেখে, 'বিশ-তিরিশটা লোকের একটা দঙ্গল। সবার কাধে একটা করে ভিক্ষের ঝুলি।' সেদিনের তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ভিন্ন উপলব্ধি হয়। সে বলে - " আমার কোথাও যাবার ছিল না। ওরা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। আমি সেই বাতিল মানুষগুলোর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দিলাম। শুরু হল আমার অন্য এক জীবন। বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমি শুধু ভেসে ভেসে বেরিয়েছি। এবার আমি পায়ের নিচে পেলাম থিতু হওয়ার মাটি আর সঙ্গী হিসেবে পেলাম সমান সমান মানুষ। একসঙ্গে এত ভাঙাচোরা আর তেড়াবাঁকা মানুষকে আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে থাকতে আগে কখনও আমি দেখিনি।" (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

বড়বাবুর এই উদ্ধৃতিতে লেখকের শব্দ ব্যবহারে - 'বাতিল মানুষ', 'সমান মানুষ' সমাজতান্ত্রিক সাম্যভাবনার মানবতাবাদী সাহিত্য স্রষ্টার পরিচয় পাই। বড়বাবু চরিত্রটির বিভিন্ন সময়ের উপলব্ধি প্রকাশ ও চরিত্র নির্মাণে লেখকের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাহিত্য স্রষ্টার নিদর্শন পাই। কুষ্ঠের মতো একটি রোগে আক্রান্ত বড় বাবু চরিত্রের মধ্যে লেখক জগৎ জীবনের কঠিন সত্য সাহিত্যের বিষয় করে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সফল স্রষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ, চরিত্র নির্মাণ, জীবন দর্শন ও সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পীর সার্থক নিদর্শন এখানে পাই।

এরপর কুষ্ঠরোগী বড়বাবু সেই রোগীরই এক খোলা বস্তির জীবনে মিশে যায়। সেই বস্তি যে গ্রাম তার নাম তালবেতালিয়া। এই তালবেতালিয়ার সমস্ত বিকলাঙ্গ মানুষগুলো হৈ হৈ করে শহরে গিয়ে বর্গীর মতো হানা দিয়ে ভিক্ষে আদায় করে নিয়ে আসে। এখানে কতগুলি বিকলাঙ্গ মানুষের উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণির কাছ থেকে বাঁচার অধিকার একপ্রকার ছিনিয়ে নেয়। জীবন সংগ্রামে ও অধিকার

অর্জনের লড়াইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এরা শহরে গিয়ে বিকলাঙ্গ ও কুষ্ঠ রোগটাকে অবলম্বন করে সামাজিক ও স্বাভাবিক মানুষের কাছ থেকে বাঁচার রসদ অভিনব ভিক্ষে পদ্ধতির মধ্যে লেখক সুভাষ বিকলাঙ্গ ও বস্তিবাসী মানুষ গুলোকে দায়বদ্ধ শিল্পীসত্ত্বায় জীবন যুদ্ধে জয়ী করে তুলেছেন।

তাদের সেই বিস্ময়কর ভিক্ষে পদ্ধতি সম্পর্কে লেখক সুভাষ বড়বাবুর জবানীতে বলেন - ''যে ক-জনের নাক খসে গিয়ে দাঁতগুলো ঠেলে বেড়িয়ে এসেছে, সেই গলাকাটা, আঙুল -খসা, খোনা লোকগুলো গলা দিয়ে গোঙানের আওয়াজ বার করে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে এমনভাবে তান্ডবনৃত্য জুড়ে দিল যে আমি তো একেবারে হতভম্ব।....................আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো বর্গীর দল। হা রে রে রে বলে হানা দিয়েছি এক ভিনদেশী রাজত্বে।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অধ্যায়ের শেষে সেই বিষয়ে বড়বাবু আবার বলে - ''যারা চোখ খামচে জল বার করে ভিক্ষে চায়, তাদের সঙ্গে এদের এক ফোটা মিল নেই। বিকলাঙ্গ বটে, কিন্তু ভাবখানা হল পাইক পেয়াদার। ভিক্ষে নয়, একেবারে যাকে বলে গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায়।.....................তারপরই নাকি বাপু বাছা করে ভিক্ষে দেওয়ার ধূম পড়ে গেল।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা শহরে হৈ হৈ রৈ রৈ করে আতঙ্ক ও কঠিন রোগের ছোঁয়াকে আশ্রয় করে। নিজেদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে স্বাভাবিক সমাজের অবজ্ঞার ও ঘৃণার প্রাণী গুলিকে লেখক বিশেষ জীবন দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। সেখানে লেখক এও দেখিয়েছেন সভ্য শিক্ষিত নাগরিক সভ্যতা কতকগুলি অসুস্থ্য মানুষের প্রতি কতটা অমানবিক ও নিষ্ঠুর হতে পারে। তাদের কথায় লেখক বলেন - ''গোড়ায় গোড়ায় গেরস্থরা নাকি ভারি হুজ্জতি করত। ভেতর থেকে হবে-না হবে-না বলে খেদিয়ে দিত। এমনও হয়েছে যে, ছাদে উঠে গিয়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছে।'' - সেই সব অসহায় মানুষগুলিকে লেখক সংঘবদ্ধ সংগ্রামী জীবনে দীক্ষিত করেন। তারা ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলে। লেখক বলেন - ''হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা জোটেনি, তারাই মাঠ-রাস্তার ধারে এই প'ড়ো ডাঙা জমিটাতে পাতার ছাউনি বানিয়ে জলরোদে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করে নেয়। আস্তে আস্তে এই জবরদখল জমিতে পত্তন হয়েছে সেরে যাওয়া কুষ্ঠ রোগীদের গাঁ। এখন মাঠের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পরের পর সারবন্দী ঝুপড়ী।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড় বাবুও ভাবে - ''সমাজ থেকে ছেঁটে ফেলা দাগী মানুষের এই দঙ্গলটাতে এসে আমার মনে হল এই আমার নিজের জায়গা।'' বড়বাবু ছাড়াও এখানে যারা এসে ঠাঁই নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম চরিত্র ব্যাংমুড়ি। চরিত্রগুলির মধ্যে পৈলু, হাঁড়িচাচা, সেনিয়া, পল্টন, ভৈবি প্রভৃতি - এদের একটাই পরিচয়। এরা প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতাহীন, বৈসম্যহীন, অর্থনৈতিক অবস্থানের ছোট-বড় হীন একই শ্রেণীর

মানুষ। যারা কেবল জানে কেবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। এরা যে জীবনের ছবি তালবেতালিয়াতে গড়ে তুলেছে তা সভ্য সমাজের কাছে লক্ষণীয়। লেখক এখানে জীবনের যে ছবি গড়ে তুলেছেন তার তাৎপর্যপূর্ণ ও মহৎ। এখানে ঔপন্যাসিক যে নাম দিয়েছেন তা হল - 'নবজীবনগড়।'

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে শেকরহীন জীবনের সঙ্গে বিলাসবহুল উচ্চবিত্ত সভ্য সমাজের জীবন এবং সুস্থ্য মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিকলাঙ্গ অর্ধেক মানুষের অন্তরীপের জীবনের বৈপরীত্য আশ্চর্য শিল্প দক্ষতায় উপন্যাসের প্লট-এর বিষয় করে তুলেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে বিকলাঙ্গ মানুষের জীবনের মানবিক সত্ত্বার প্রতিষ্ঠা আমরা দেখি। জমিদারদের বড়বাবু তালবেতালিয়া সম্পর্কে বলে - "আমাদের এটাকে গাঁ বললেও যেন ঠিক পুরো বলা হয় না। আসলে আমরা একটা খুব বড় পরিবার। এক পুরুষে শুরু হয়ে এখন দু-পুরুষে এসে ঠেকেছে। লোকে স্বীকার করুক না করুক - আহা, আমরা মানুষ তো।" এই গ্রামের বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর কারো ঘরে বাচ্চা হলেই শাঁখ বাজতে থাকে। উঠোনে এত ভিড় হয় যে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। বাচ্চা হলে তালবেতালিয়ায় উৎসব শুরু হয়। বাতাসা দিয়ে সেখানে সবাই মিষ্টি মুখ করে। লেখক এই উৎসবের অতল গভীরে ডুব দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে কারণ নির্দেশ করেছেন। তিনি লেখেছেন - "এটা যে শুধু আনন্দ করার একটা উপলক্ষ তা নয়। এর মধ্যে আছে একটা মহিমার ব্যাপার। ফুরিয়ে যাওয়া, ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জায়গাটায় টিকে থাকা, প্রাণবান করা। সেই সঙ্গে আশ্চর্য হওয়া। দুই বিকৃত বিকলাঙ্গের আলিঙ্গনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কী হতে পারে ?" (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

লেখক তালবেতালিয়ার যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ অন্ধকারের জীবন। লেখকের কথায় তালবেতালিয়া দিনের বেলায় খাঁ খাঁ করে। তখন শুধু বিকলাঙ্গ সেইসব মানুষেরা নিজেরাই থাকে। বাইরের একটিও জনপ্রাণী - তখনকার সেই পথ মারায় না। তাই সেখানকার মানুষগুলো সর্বদা অন্ধকারের প্রতিক্ষা করে থাকে। লেখকের ভাষায় - "রাত্রিই এখানকার অন্নদাতা। তালবেতালিয়া জমজমাট হয়ে ওঠে সন্ধ্যের পর। ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে বসে মদের আর জুয়ার আড্ডা। সব জায়গাতেই টিমটিমে আলো। কোনো ঝুপড়ি থেকে ভেসে আসবে ঝুমুর গান। কোনো ঘরে আলো জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ ফস করে নিভে যাবে। কান পাতলে শোনা যাবে কিছু অস্ফুট শব্দ।" (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। লেখক সেখানকার বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর প্রকৃতিকে মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছিলেন। সামাজিক সুস্থ্য মানুষের সঙ্গে তালবেতালিয়ার ভিন্ন দৃশ্য

আমরা আলোচ্য ৫ম অধ্যায়ে পাই। সেই বিকলাঙ্গ মানুষ গুলোর কারো নাক নেই, কারো আঙুল নেই, কারো চোখের পাতা পড়েও না, ঘষটানি লেগে লেগে কারো পায়ে দগদগে ঘা। এই অর্ধেক মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের জগৎটার সঙ্গে সেই মানুষগুলোর বনিবনা নেই। লেখকের কথায় এই মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের পার্থক্য স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক লিখেছেন - ''ওরা আস্ত মানুষ আর আমরা ভাঙা চোরা। সুস্থ্য-স্বাভাবিক মানুষগুলো থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একদিকে ভালোই হয়েছে। নইলে আমাদের ভেতরটা সর্বক্ষণ জ্বলে পুড়ে খাক হত। তাও ঘৃণায় নয়, হিংসেয়। কারো কোনো ভাল আমাদের সহ্যই হত না।'' (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবু এ সম্পর্কে বলে - ''দাগী মানুষ বলেই দিনের আলোকে আমাদের কেমন যেন নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। দিনের আলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের শরীরের খুঁতগুলো দেখিয়ে দেয়। (৫- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। তালবেতালিয়ার সেই অসুস্থ জীবনের সঙ্গে -বাইরের সুস্থ্য-স্বাভাবিক জীবনের পার্থক্য লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষণী -দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন। সেই অন্ধকার জীবনে মদ, মেয়েমানুষ, চোরাকারবারী ও ভুতোর মতো মানুষকে আলোচ্য অধ্যায়ে পাই। তালবেতালিয়ার জীবন স্বাভাবিক সুস্থ্য-জীবন থেকে অনেক দূরে। অনেকটা অন্তরীপে বসবাস তারা যেন করে। এই অন্তরীপে সৃষ্টি হয় নিষ্পাপ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন। বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় পূর্ণাঙ্গ শিশু। সেটা দেখে দেখে এই স্বাভাবিক জগৎ বিস্মিত হয়ে ওঠে।

ঔপন্যাসিক উত্তম পুরুষে সভ্য শিক্ষিত সমাজ ও তালবেতালিয়ার কুষ্ঠ রোগীর সমাজ সম্পর্কে বলেন - '' এ তো দ্বীপ নয়। একটা অন্তরীপ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি। নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে, যাতে ওদের যত ময়লাজল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।'' (৬- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অন্তরীপে জগতের সমস্ত আবর্জনার স্তুপে ঔপন্যাসিক পূর্ণাঙ্গ সমাজের পূর্ণাঙ্গ মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কুষ্ঠ রোগীদের তালবেতালিয়া মানুষের সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অন্তরীপ। এখানে কোনো লাশও বাইরে যায় না। ''কুষ্ঠ রুগিদের ছোঁয়া লাশ কোনো মুর্দাফরাশই ছুঁতে রাজি হবে না।'' লেখক জানিয়েছেন - ''তালবেতালিয়া হল জীবন্ত নরক - দুনিয়ার জাহান্নম।...............এত মদোমাতাল চোর-জোচ্চোরের আনাগোনা এখানে, কিন্তু মরে গেলেও কেউ এখানে রাত কাটাবে না। বাইরের সবাই এখানে দিনের বেলায় ভয় পায়। সেই ভয়ের জন্যেই মেদ খেলেও মাত্রা ছাড়াতে কারো সাহস হয় না। তালবেতালিয়ার আকাশের তলায় রয়েছে একটা ভয়ের অদৃশ্য ঘেরা টোপ।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

অদৃশ্য ভয়ের ঘেরাটোপের তালবেতালিয়ার জীবন ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এখানে ক্রমশঃ আনাগোনা শহুরে বসবাসকারী চোরাকারবারী ও শয়তান কতগুলো মানুষ। সভ্য সমাজের চোর, ডাকত, খুনী, বিভিন্ন আসামী এখানে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। এভাবে দেখা যায় যে মহৎ আদর্শ নিয়ে তালডাংরা ও তালবেতালিয়ার পত্তন হয়েছিল। সেটা ক্রমশঃ ভেঙে যেতে শুরু করে। এমনকি যে সব শিশু পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে এই তালবেতালিয়ায় আছে। তাদের সঙ্গে এই বিশিষ্ঠ সমাজ অবিশ্বাস্যের - বাতাবরণ তৈরী করে। কেননা সেই সমাজের অগ্রদুত ও আজকের দিনের যুবশক্তি একেবারেই দুর্বল। লেখক বলেন - ''যাদের দিকে তাকিয়ে সবকিছুর হিসেব হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তারা একেবারেই নড়বড়ে। একেবারেই নশ্বর। তারা আর যাই হোক, কোনো পাকা কিছুর ভিৎ হতে পারে না। এখানকার নারীরা ক্রমশ সভ্য সমাজের পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। ফলে তালবেতালিয়র সেই ভয়ের পরিবেশ ক্রমশঃ থিতু হয়ে যায়। এখানকার মানুষগুলোও যা এতকাল করে নি সেই খুনো খুনিও করে এখন। বেতাল হয়ে পড়ে তালবেতালিয়া। লেখক অসামান্য শিল্প দক্ষতায় ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপন্যাসের শিল্পগউণ বজায় রেখে বিশেষ জীবনদর্শনের বিকাশে সার্থক প্রয়াস রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। একটা সুস্থ্য সমাজ থেকে নির্মল এক বিচ্ছিন্ন সমাজ গড়ে তোলেন লেখক তালবেতালিয়ায়। আবার সেখানে সমাজের ক্লেদাক্ত বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন সূত্র একে একে কিভাবে সেই সমাজে একটু একটু করে প্রবেশ করতে থাকে - সেই সত্য উন্মোচন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। আমরা সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার, বৈসাম্যের সূত্র গুলির মধ্যে মানুষের যৌনতা, ধনলিপ্সা, ভোগাশক্তি, ভোটের রাজনীতি ও মানুষের ক্রমাগত উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও পরের অন্ধ অনুকরণ অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে আলোচ্য উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাসের কুষ্ঠ রোগীদের বিচ্ছিন্ন অন্তরীপে রেখে ঔপন্যাসিক এক নতুন সমাজের দিশা দিয়েছেন। আবার সেই সমাজের যে ঘুণ পোকাগুলি মানুষের মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসে সেগুলিও অঙ্গুলি নির্দেশ লেখকের ইপ্সিত লক্ষ্য। সেই প্রয়োজনে জনমানসে কুষ্ঠ রোগীদের সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে সেটিকে তাদের সম্বল করে পথ চলা করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই রোগ সম্পর্কে উত্তম পুরুষে ঔপন্যাসিক বলেন - ''হ্যানসেনের অসুখ, ধ্যুৎ, রোগটা হল কুষ্ঠ। আমরা সব কুষ্ঠরোগী। সেরে গিয়েছে তো কী, আমরা যে কুষ্ঠরোগী সেই কুষ্ঠরোগীই থেকে যাব। চিরজন্মের মত। লুকোবার উপায় নেই, এক নজর দেখলেই লোকে ঠিক ধরে ফেলবে।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। কিন্তু এই রোগের ভয় ও রোগীদের ভীতিই এই বিচ্ছিন্নতার একমাত্র অবলম্বন। সেই পার্থক্য ক্রমে দূর হতে থাকে। তাঁর কথায় - ''লোকে আমাদের ভয় করে, ঘেন্না করে। এতদিন তারই ওপর আমাদের টিকে থাকা নির্ভর

করে এসেছে। কেউ আমাদের ছোঁবে না, এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় বল, ভরসা।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

বিকলাঙ্গ শরীরগুলো যৌন ধর্মে নিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ সুস্থ্য মানুষ। তালবেতালিয়া বিচ্ছিন্ন অন্তরীপে আসামীরা পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে তিনটি ছোকরা আশ্রয় নেয় সেখানে। সেই ছেলে তিনটি অন্তরীপের মানুষগুলোকে বন্দুকের নলের কথা বলে। ওদের সম্পর্কে লেখক বলেন - ''ছেলেগুলোর কথার আড়ে যতটা বুঝেছি তাতে ওরা চায় দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজাতে। ওপর ওপর ঝাড়পুঁছ করা মানে পুরনো জিনিসটাকে টিকিয়ে রেখে মানুষেরফ যন্ত্রণা বাড়ানো। স্যাকরার ঠুকঠাক দিয়ে হবে না। ওরা দিতে চায় কামারের এক ঘা। পারে তো ভাল। কিন্তু পারবে কি ? ছেলেগুলো যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই। চলে যাওয়ার আগে ওরা আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়ার একটা রাস্তা বানিয়ে রেখে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গলায় এমনভাবে ওরা গান ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ওদের কথা আমরা কিছুতেই চাপা দিতে পারছি না।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সেই ছেলেগুলো ওদের নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। সেই ছেলে তিনটির মধ্যে একটি তালবেতালিয়ার সোনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এই তালবেতালিয়ায় এত বছরে এই প্রথম বাইরের লোক এসে থাকা ছেলে তিনটির মধ্য দিয়ে।

এই শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখি তালবেতালিয়া ক্রমে 'নবজীবনগড়' হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এখানে পৌঁছায় চিরুনির সঙ্গে আয়না, পৈলু প্রথম আয়না ও দাড়ি কামানোর খুর নিয়ে আসে এখানে। পৈলুর গায়ের জোটে বাহারি গেঞ্জি। তার দেখাদেখি সেখানকার অন্য ছেলেরা সেগুলি বাইরে থেকে আনে সেখানে। সেখানকার রোগীদের মনে সেই ভয় দেখানোর বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাসে চিড় ধরে। লেখক বলেন - ''কুষ্ঠ আমাদের কবচকুন্ডল। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেলেই এ-গাঁয়ের আর তখন সীমান্তের কোনো বালাই থাকবে না। আমাদের সন্তান সন্ততিরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আজ আমরা ওদের বর্ম। কিন্তু সে আর কতদিন?'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

এরপর তালবেতালিয়ায় 'নবজীবনগড়' রূপায়নে তৎপর হয়ে ওঠে জমিদার পরিবারের বড়বাবু। তার বাবার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট। পেশায় আইনজীবি এবং পুরনো কংগ্রেসী মানুষ তার বাবা। আদর্শের দিক থেকে তিনি উদারনীতিক এবং গান্ধীবাদী। তিনি তার কুষ্ঠরোগী বড়বাবুকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যত্নে রেখেছিলেন, এবং আরো ভাল চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করে দক্ষিণ ভারতে ব্যয়সাধ্য হাসপাতালে পাঠিয়ে সেখান থেকে সারিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন, এবং এই বড় বাবুর বিয়েও হয়েছে সেও ভবীরই সঙ্গে। এই বড়বাবুই নিজ হাতে নবজীবনগড় গঠনে ব্রতী হয়েছেন। একজন কুষ্ঠরোগীর হাতে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব সেটাও দেখালেন ঔপন্যাসিক। এরজন্য প্রয়োজন

বড়বাবুর পিতার মতো সহানুভূতিশীল উদার মানুষ। ক্রমে নবজীবনগড়ে মানুষের অন্ধকার জীবন রঙীন হয়ে ওঠে। মুখে স্নো আর ঠোঁটে রং লাগায় সোনিয়া। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙিন ফিতেয় চুল বাঁধে আংটি নামের মেয়েটি। লেখক - এই পরিবর্তনকে তাঁর ভাষায় বলেন - ''বৃত্তের মধ্যে গজিয়ে উঠছে আরেকটা বৃত্ত।''

তালবেতালিয়ায় শেষবারে বড়বাবু হাসপাতালের ডাক্তার প্যানসাহেব ও ভবীকে নিয়ে আসে। উত্তম পুরুষের ব্যক্তিকে বড়বাবু জানায় তালবেতালিয়াকে ঢেলে সাজানোর জন্য এলাহি ব্যাপার করছেন। তালবেতালিয়ার চারগুণ জায়গা নিয়ে সেখানে গড়ে তুলবেন 'নয়া বসত'। পুরনো কুষ্ঠরোগী গুলি চোখ বুঁজলে তালবেতালিয়া এক সময় আর পাঁচটা গ্রামের মতই হবে সম্পূর্ণ সুস্থ্য মানুষের পত্তন। কুষ্ঠরোগীদের তালবেতালিয়ায় চলে জমি জরিপ, খুঁটি পোঁতা, ব্যারাক বাড়ি নির্মাণ - ''কী দিনে কী রাতে তালবেতালিয়াকে এখন তেনাই যায়না। ভোরবেলা থেকেই রাস্তা দিয়ে শুরু হয়ে যায় মাল-লরির আনাগোনা।'' এখানকার রাতটাও হয়ে যায় দিনের মত। হাঁড়ি চাচার চোরদের জুটেছে নতুন কাজ - রাতজেগে মালপত্র পাহারা দেওয়া। পৈলু-পল্টনদের দম ফেলার ফুরসত নেই - ওরা এখন মিস্ত্রির যোগানদার। গাছতলায় বসেছে হাজী সাহেবের পাঠশালা, পঙ্গুদের জন্যে রয়েছে চাকা লাগানো প্যাকিং বাক্স। তাতে দড়ি লাগিয়ে পৈলু, পল্টন, আংটিও সোনিয়া দলবল সহ সেগুলো টেনে নিয়ে চলে। বাগানে উঠেছে উঁচু উঁচু পিলার। তার মাথায় বসানো হয়েছে জলের ট্যাঙ্ক। এখানে ডাক্তারখানা-ডিস্পেন্সারি গড়ে তোলা হয়। সেখানে কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয় পৈলু আর সোনিয়াকে।

ক্রমে বিস্তার করে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন মতাদর্শের বিভিন্ন মানুষ তাদের প্রয়োজনের জাল বিন্যাস। রথের মেলায়ও মানুষের সমারোহে তাদের কুষ্ঠরোগীদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। একটা গ্রাম তালবেতালিয়া সেবা শুশ্রুষায় সেখানে নির্মিত হাসপাতাল -'নবজীবনগড়'-এর মতো একটা শুশ্রুষাগার হয়ে ওঠে। যদিও এই পরিবর্তন তার পুরাতন পন্থী - এই বিভাজনও দেখা যায় তালবেতালিয়ায়। যদিও শেষ পর্যন্ত 'নবজীবনগড়'কে আর পুরনো তালবেতালিয়ায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। ক্রমে সভ্যসমাজের সভ্যমানুষের সঙ্গে অসুস্থ সমাজের সদস্যরা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপন্যাসের কথক বলেন - ''আমরা তো ছিলাম দুনিয়ার বার। দুজনের এক হয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের জগৎজয়ের আনন্দ।'' (৬- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

কুষ্ঠরোগীরা নবজীবনগড়ে নিজেদের পরিবর্তন করে নেয়। পৈলুর হাত ধরে সাতপাকে বাঁধা পড়ে সোনিয়া। কথক চরিত্র আইনসিদ্ধভাবে চ্যাংমুড়ি নাম পরিবর্তনে কুলসুম বিবির সঙ্গে জীবন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঔপন্যাসিক সেখানে সমস্ত পাপ-তাপ-শূণ্য এক নতুন জীবনে উন্নীত করার জন্য ভারি

সৌম্য চেহারার স্বামীজীকে হোমাগ্নি সম্বলিত উপস্থিত করান। সেই স্বামীজীর বেদমন্ত্রে আনন্দযজ্ঞে - নবজীবনগড়ের মানুষগুলো সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ঢেকে দিয়ে সেবা ধর্মে দিক্ষিত হয়। মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে স্বামীজী সেই পৌরাণিক ও বৈদিক চরিত্র কাক্ষীবান মেয়ে ঘোষার কুষ্ঠরোগ সেরে যৌবন ও বিয়ের যোগ্য স্বামী পাবার কাহিনী -শোনান। লেখক এই বৈদিক ও পৌরাণিক কাহিনী সংযোজন করে এই উপন্যাসের ক্ল্যাইমেক্সের উৎকর্ষতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। মানুষগুলোর নতুন জীবন প্রাপ্তির সঙ্গে এই কাহিনী অসামাণ্য সামঞ্জস্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সেই নবজীবনগড়ে শহর থেকে রং বেরঙের পোস্টার নিশান নিয়ে হাজির হয় শহরের মানুষের ঢল। রোজ সভাসমিতি ও বক্তৃতা হয় সেখানে। এরপর একটা সময় চ্যাংমুড়ি মারা যায়, এবং নবজীবনগড় থেকে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে আসে উপন্যাসের কথক। এরপর সে কোথায় যাবে কিছুই জানে না। এখন কেবল নিজেকে দেখে পিছন থেকে। এভাবে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়।

উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ, মৃত্যু ভাবনা, উপন্যাসিকের মহৎ জীবনদর্শন, সঙ্গীত সৃষ্টি, ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগ, মৃত্যু ভাবনাও কহিনী বিন্যাস, প্লট নির্মাণ, উপন্যাসের শীর্ষনাম ও সমাপ্তি অত্যন্ত বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, সংবেদশীল হৃদয়ানুভূতিশীল উচ্চ সৃজনী ব্যক্তিসম্পন্ন স্রষ্টার নিদর্শন 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'। লেখক অসামান্য যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে ; চরম সমাজতান্ত্রিক ও চরম সাম্য নির্ভর সমাজের স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প। সেখানে মানুষ তার বাঁচার তাগিদে, যৌবিক চাহিদায়, জন্মগত বিভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়নায় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্বিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অন্তরীপে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না। তাদেরই সৃষ্ট উত্তরসুরী বাইরের জগতের ভোগশক্তির উদ্দীপকের ইশারায় সাড়া দিয়ে নালা তৈরি করে মিলিত হবেই। এই উপন্যাসে লেখক সুভাষের মহৎ জীবনদর্শন ও সেবাধর্মের মহৎ দিশা বাংলা কথা সাহিত্যের অসামান্য ও কালজয়ী সম্পদ।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীতে সোভিয়েতের ছায়া অনুমান করা যায়। লেখক সুভাষ কমিউনিষ্ট মতাদর্শে আস্থাবান ব্যক্তি মানুষ ছিলেন। তাছাড়া কমিউনিস্টবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্র যেন সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যেন কোনভাবেই তার প্রভাব না পড়ে। যেমন সভ্য সমাজের মানুষ তালবেতালিয়ার কুষ্ঠরোগীদের অন্তরীপে রাখে। কোনোভাবেই তা যাতে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাভাবিক মানুষের সমাজে না ছড়াতে পারে। সেই দাগী মানুষগুলো যাতে কোনোভাবেই তালবেতালিয়ার গন্ডীর বাইরে না আসে - সেটাই বাইরের পৃথিবীর কাম্য। তাদের বাসভূমে অন্তরীপের ন্যায় সভ্য শহুরে

সমাজ থেকে যেন দূরে থাকে। আবার তালবেতালিয়ার বড়বাবু, হাঁড়িচাচা, প্রভৃতি কুষ্ঠরোগীরাও 'ভয়'কে আশ্রয় করে নিজেদের একটি বৃত্তবর্মে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। বড়বাবুর 'নবজীবনগড়' অনেকটা লেলিনের সোভিয়েত ভূমির মতো। সেখানে দুই ভূমিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ্য মানুষের পরিবর্তিত জীবনের একটি নতুন জগৎ। সর্বোপরি কুষ্ঠ রোগীদের সমব্যথী লেখক সুভাষ উত্তম পুরুষে সেই সব রোগীর মর্মব্যথা, কষ্ট, প্রত্যেকের পূর্ব জীবনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই উপন্যাস শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের উৎকৃষ্ট হৃদয়ের ও অনুভূতির নিদর্শন পাই। বাংলা কথা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে এই উপন্যাসটি নিশ্চিতরূপে সমৃদ্ধ করেছে।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস 'কাঁচাপাকা' ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত। রচনাকালের নিরিখে এটি তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসটি স্নেহপ্রতিম 'আবু'কে উৎসর্গ করেন তিনি। উপন্যাসটি ১১টি অধ্যায়ে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে রচিত। তাঁর এই উপন্যাসের ঠিক পূর্বে রচিত 'অন্তরীপ' বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, অন্য লেখকের বলে যে কাহিনী উল্লেখের তাগিদ উপলব্ধি করেছিলেন; 'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও সেরকম একটি উপকাহিনী যুক্ত করেছিলেন তিনি। যেন পাণ্ডুলিপিটি তার নিজের নয়। পনের বছর আগে এক যুবক একটি পাণ্ডুলিপি তার কাছে রেখে বেপাত্তা হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন পর অনন্যোপায় সম্পাদক ও প্রকাশকের তাগিদে সেটিকে তিনি নিজের লেখা বলে চালিয়ে নিয়েছেন। এই উপকাহিনীর মধ্যে নিহিত লেখক যৌবনের অনভিজ্ঞ, কাঁচা অভিজ্ঞতার ও অপরিণত শিল্পীর, অপরিণত জীবনের স্মৃতিকে শিল্পের রূপদানের প্রয়াস লক্ষ্য করি আমরা। কেননা আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কচিও কাঁচা বয়সে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ছিল। এক সময়ে বিশেষ এক ঘটনা তার জীবনের মোর ফিরিয়ে চলে। সেখানে একটি মাত্র ঘটনায় যে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও পরিণতলব্ধ হয়ে ওঠে। লেখকের জীবনে কাজের সন্ধান, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পরিপক্কতা এনে দেয়। এখানে আমরা এক পরিণত বয়স, অভিজ্ঞ জীবনের ফসল ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর শিল্প রচনার নিদর্শন পাই। কাঁচা ক্রমশঃ নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে জে পাকা হয়ে ওঠে সেই জীবনকে নিয়ে রচিত উপন্যাস 'কাচাপাকা'।

উপন্যাসটি কঁচির নামে আত্মকথন রীতিতে রচিত। এতে লেখক নিজের লেখা কবিকে দিয়ে লেখা এবং কচির লেখা নিজের লেখনীতে শিল্পরূপ দেবার সুবিধে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহন করেছেন। এতে ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে একটি উপকথা যুক্ত করে ঔপন্যাসিক

একেবারে শুরুতেই প্রকাশক ও সম্পাদকের লেখা জমা দেবার চাপটিকে শিল্পিত রূপ দান করেছেন। শিল্প ও সাহিত্য সৃজনে একটি আর্থিক চাহিদার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রন্থ সম্পাদক ও প্রকাশকের তাগিদ। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা যেমন সাহিত্য সৃজনে ভূমিকা পালন করে ; আলোচ্য উপন্যাস সৃষ্টির আড়ালে প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদকের তাগিদা, অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। সৃষ্টির এই পার্শ্বচাপ গুলিকে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক উল্লেখ করেছেন - ‘‘কথা দিয়ে ফেলেছি লিখব। সংসার চালাবার জন্যে টাকাটা আমার খুবই দরকার। ক-টা দিন কী হাঁচড়-পাঁচড় করে কেটেছে। ভেবেছিলাম কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলে মাথায় ঠিক কিছু এসে যাবে। বসেও ছিলাম। কিন্তু ভেবে কোনো কুল কিনারা পেলাম না। এদিকে লেখা দেবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে তাতে শুধু কথার খেলাপ হবে তাই নয়, আমার তো বটেই সেই সঙ্গে আরও অনেকেরই মাথা কাটা যাবে।’’ (১ - ‘কাঁচাপাকা’)।

অনেক ক্ষেত্রে অসাধু স্রষ্টারা পরের লেখা নিজের বলে প্রকাশ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে উল্টোভাবে লেখক সেকথা বলেও মূলতঃ নিজেরই লেখা অন্যের বলে চালিয়েছেন। সেখানে তিনি একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কখনো হয়তো সেই কঁচির লেখার মধ্যে নিজেকে নয় বরং নিজের লেখার মধ্যে অন্য কেউ এসে না পড়ে। তাঁর কথায় - ‘‘একণ ভয় শুধু একটাই, আমার লেখার মধ্যে ছোকরা হঠাৎ না উদয় হয়ে বসে।’’ (১ -কাঁচাপাকা)। প্রত্যেক স্রষ্টার মধ্যে উপলব্ধি গুলিতে ভাবের বিগলন ঘটিয়ে প্রমাতৃ সংকীর্ণতা অর্জনের প্রয়াস থাকে। নিজের সৃষ্টির মধ্যে অন্যের ছায়া আসাটাই ভয়ের কারণ। যাতে পাঠক প্রামাতার সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে, এবং সেখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। জীবনের সত্যটাই সাহিত্যের কাহিনী এবং সাহিত্যের শৈল্পিক গুণে সেই কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের একাত্মীকরণের সামর্থ্য অর্জনের মধ্যে স্রষ্টার কৃতিত্ব। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসও ছিল ; তাঁর জীবনের সত্য পাঠকের কাছে যেন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাদের প্রত্যেকের জীবনের গল্পে প্রতিফলিত করে নিতে পারে। তিনি বলেন - ‘‘ যে করেই হোক, আমাকে সত্যি জিনিসটাকে এমনভাবে দেখাতে হবে লোকে যাতে মনে করে গল্প।’’ (১ - কাঁচাপাকা)।

‘কাঁচাপাকা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ‘কচি’। কচির জীবনে কাঁচা থেকে, পাকা হয়ে ওঠার ক্রমবিকাশের কাহিনী হল ‘কাঁচাপাকা’। কচি এই উপন্যাসের কথক। কালীঘাটের পুরুত বংশের ছেলে কচি। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের বাড়িতে এসে ওঠে তার মামা। তার মামা সম্পর্কে সে বলে - ‘‘ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে মামার যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের

বাড়িতে ঘরের অভাব ছিল না। সুতরাং মেস থেকে উঠে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি। মা-র হিতৈষীরা বলেছিলেন এটা ঠিক হচ্ছে না। ঐ একদিন দেখো ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে। ভিটেতে ঘুঘু চরাবে। মামাকে লোকে কেন দেখতে পারত না জানি না। তবে এটা ঠিক, ওর মুখের চামড়ায় কেমন একটা তেলতেলে ভাব ছিল। আয়নায় যে - পুরুষেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেদের মুখ দেখে, তাদের কেমন যেন আমার ভাল লাগে না।'' (২-কাঁচাপাকা)।

কচি তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে অনেকটা সর্দারী ভাবে চলে। কেননা তখন বাড়ীতেও পুরুষ বলতে সে-ই বড়। তার মা-ও ভালো মানুষ। তিনি সারাদিন সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। উঁচু গলায় কাউকে কিছু বলেন না, তাঁর সেলাইয়ের ওপরই নির্ভর করে সংসার চলে। কচির ছেলেবেলা নেহাৎ-ই এলোমেলো ছন্নছাড়া। পিতাহীন কচি বয়সে সে যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে সময় কাটায়। ছেলেবেলা সম্পর্কে সে বলে - ''বাবা মারা যাওয়ার পর আমার হল পোয়াবারো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। যার তার সঙ্গে মিশি। আমাকে বারণ করবার কেউ নেই। সেলাই করতে করতে মা-র মুখটা সেলাই হয়ে থাকে। কালীঘাট যে এমন মজার জায়গা আগে কখনও জানা ছিল না আমার। হাফ-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এলাকাটা চষে বেড়াই। যাত্রী নিবাসে টুঁ মেরে দেখি কারা এল গেল। ছিনে-জোঁকের মত লেগে থেকে পান্ডারা কীভাবে লোক ঠকায়, এও যেমন দেখি-তেমনি মুখ দেখেই ধরতে পারি কে পকেটমার, কে নয়। ফটোর দোকানদারদের সঙ্গেও ভাব হয়ে যায়। মেলার মরশুমে তারা চলে যায় সিনসিনারি নিয়ে গাঁয়েগঞ্জে। ফিরে এসে সেই মেলার গল্প বলে। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আমার ভাব হয়ে গেল। কখনও এর ওর ছাদে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াই।'' (২-কাঁচাপাকা)।

ছোটোবেলা থেকে বাউন্ডুলে জীবন অতিবাহিত করলেও সততার অভাব ছিল না কচির। সে বাড়ির বাজার ঘাট, কেনা বেচা করে ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলায় একদিন ওর একবন্ধু দিনে কত টাকা কামায় কচি জিজ্ঞেস করতেই কচির মনে পড়ে যায় তার মায়ের শুকনো মুখটা। অভাবের সংসারের কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে ওর বোনের কথা। যে জিজ্ঞেস করে - ''দাদা, কতদিন মাছ খাইনি রে।'' এসবের প্রতিক্রিয়ায় সে সেই বন্ধুর গালে চটাস করে এক চড় মেরে বসে। এ থেকে আমরা দেখি অল্প বয়স থেকেই কচি অনুভূতিপ্রবন এক সৎ ছেলে।

পিতৃহীন কচিকে আদর করলে সে সবার আড়ালে গোপনে কাঁদে। ছেলেবেলায় সে ক্রমশঃ বন্ধুদের ত্যাগ করে। কেননা সে দেখে কাঁচা বয়সে ছেলেরা সিগারেট খায় লুকিয়ে লুকিয়ে, মুখ খারাপ

করে কথা বলে। সেগুলি কচির সহ্য হয় না। সে ওদের ত্যাগ করে রাস্তায় একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়।

ছেলেবেলায় প্রকৃতির সঙ্গেও কচির ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। গরম খোলায় চালভাজার মত করে গলির তেতে-ওঠা পিচের ওপর যখন চিরবিড়িয়ে বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পড়ত তখন তাদের আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত। জানলার গরাদ ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কচি ছড়া বলতো -

''আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।''

গলিতে জল জমলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কাগজের নৌকা বানাতে বসে যেতো। ভাই-বোনদের সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠত - ''যা বৃষ্টি ধরে যা
লেবুর পাতায় করঞ্চা।'' সেদিনের সেই কাগজের নৌকাগুলো গাদাগাদি হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে কচির সে কী মন খারাপ হতো তা বলার নয়।

কচির বন্ধু-বান্ধবরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে সেই সময় সে দু-দুবার মাথা ন্যাড়া করে। পৈতে হওয়ার সময়ে এবং বাবা মারা যাওয়ার পর। সেই বয়সে তার নাকের নিচে গোঁফের ফিকে নীল রেখা দেখা দেয়। ক্রমশঃ সাবালক হয়ে ওঠার অনুভূতি জাগে - তার মনে। বন্ধু সুবলের সঙ্গে কালীঘাটের পুরুতদের বর-কনে বিয়ে দেওয়া দেখে সে। বাজারের পাশে রং-মাখা খারাপ মেয়েদের দিকে খারাপ পাড়ায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। এইসব অভিযোগ কচির মামা তার মায়ের কাছে অনুযোগের ভঙ্গিতে জানিয়েছেন। মামা-ভাগ্নের পরস্পরের অভিযোগে কচির মা-র চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ে। সে রাত্রিতেই কচি বাড়ি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা বাড়িতে থাকলে ওর মামা তাকে নষ্ট করে ফেলবে। সে ভেবেছিল - ''আমাকে দাবিয়ে রেখে নিজের মতলব হাসিল করবে। মামা ঠিকই, তবে শুকুনি মামা। এই যা। (৩-'কাচাপাকা')। রাত থাকতে মা-র বালিশের তলায় একটি চিঠি লিখে কচি বাড়ি ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখে।

এই সময়কার কচির মনের অনুভূতিগুলি মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণীতে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। - '' আদি গঙ্গার পাশ দিয়ে হাঁটছি। বাড়ির কথা মনে করে পাছে মন দুর্বল হয়ে যায়, সেইজন্য দু-পাশের দৃশ্যগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, নিজেকে অন্যমনস্ক করে রাখছি।'' (৩-'কাচাপাকা')। পথ চলতে চলতে রাস্তার চারদিকের নানা দৃশ্য দেখে কচি। হোসপাইপে রাস্তা ধোওয়া, খাটালে দুধ দোয়াবার চিড়িক চিড়িক শব্দ, সেপাইদের কুস্তির লড়াই, রেসের মাঠের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি, গলফস্টিক হাতে সাহেব সুবোর পায়রাকে ছানা খাওয়ানো, ঘাটে রোগা লোকগুলি দিয়ে তেল মালিশ

করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি দেখে দেখে রাস্তায় রাস্তায় সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় কচি। এরপর ভুট্টার খই ও কলের জল খেয়ে খিদে চাপা দেয় কচি।

এরপর হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট বিহীন কচি ট্রেনে উঠে পড়ে। কোথায় যাবে কোন ট্রেন সে জানে না। ট্রেনের ভাবনার কথায় সে বলে - " ট্রেন ছাড়তেই আমার কেমন ভয় পেল। কোথায় যাচ্ছি জানি না। মুখে যাই বলি আর মনে মনে যাই ভাবি, বুঝতে পারছি ঘুরে ফিরে সেই মায়ের আঁচল -ধরা হয়েই থেকেছি। মা-র জন্যে খুব মন কেমন করছে। রাত্তিরে না ফিরলে মা কেঁদে ভাসাবে। ছোট বোনটা দাদা-দাদা বলে খুঁজবে। খালি মনে হতে লাগল ফিরে যাই। কিন্দু চলন্ত ট্রেন থেকে এখন আর নামা যাবে না। যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। (৩-'কাচাপাকা')। একসময়ে তার মনে হয়েছিল তার মা যেন তাকে হাঁটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে কু-ঝিকঝিক বলে দোলাচ্ছিল। সেই দুলুনিতেই তার ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই বড় বড় অক্ষরে অক্ষরে লেখা 'জশিডি'।

এরপর ঝাঝায় নেমে পড়ে কচি। সেখানে প্রথমে তার বন্ধু রাম অবতারের কাছে আশ্রয় করে। রামঅবতার লোকোতে কাজ করে এবং রেলকোয়ার্টারে থাকে। ওর বাড়িতেই রান্নার কাজ নেয় কচি। কিন্তু এভাবে রান্না করেই বা ক'দিন চলবে। এরপর কাল্লু বলে একটি ছেলের সাগরেদ হতে হয় তাকে। কাল্লুর নির্দেশ মতো একটি পাহাড়ের ধার ধরে রেললাইন ধরে বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কচি। আগে থেকে বলা রেল ড্রাইভার তার বস্তায় কয়লা ভরে দেয়। একদিন রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সে কাজ ছেড়ে দিয়ে একটি ছেলেকে ধরে। সেই ছেলের নির্দেশ মতো সে দেওঘর থেকে চাল এনে ঝাঝায় বিক্রি করে। সেখানেও সে পুলিশের হাতে পড়ে, সেখান থেকে রেহাই পেয়ে সে পাটনায় চলে যায়। পাটনার এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেও কোনো হিল্লে হয় না তার। সেখানে তার ভিন্ন অনুভূতি হয়। এবারে "পাটনাকে বড় বেশি কাঠখোট্টা লাগল। যে-যার নিজেরটা নিয়ে আছে। বাঙালি নাম দেখে ভেবেছিলাম বাঙালি বললে হয়ত মন ভিজবে। কোথায়? গেটে দাঁড়াতেই কুকুর তেড়ে এল।" (৪-'কাঁচাপাকা')।

পাটনা ছেড়ে কচি এরপর বেনারসে যায়। বেনারসে থাকাকালীন সে তার মাকে একটি চিঠি লেখে। সেখানে সে টোলে ভর্তি হবার কথা তার মাকে জানায় - " কিন্তু বাবর বন্ধু রামসেবক বাবু আমাকে বললেন - তুমি বরং কাশী গিয়ে টোলে ভর্তি হও, জীবনে মানুষ হতে পারবে। ওঁর কথায় আমি বেনারসে চলে এসেছি। বিশ্বনাথের মন্দিরে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল, বাবার এক দুর সম্পর্কের পিসি। তাঁর তিনকুলে কেউ নেই। ওঁর কাছেই এসে আছি। ওঁর বাজার হাট করে দিই। কথা হয়ে গেছে, শিগগিরই টোলে ভর্তি হব। তারপর মা, ফিরে গিয়ে ঠাকুর্দার

নাম দিয়ে একটা টোল খুলে বসব।'' (৪-'কাচাপাকা')। বেনারস সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথায় সে বলে - বেনারস একটা বিশ্রী জায়গা। সেখানকার রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই। সেখানে কেবল রিক্সা, পকেটমার, ফেরিওয়ালা, গুন্ডা মস্তান আর ধর্মের ষাঁড়। সেসব দেখে তার শরীর আনচান করে। কাশীতে যা দেখবার সেটা কেবল ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ডোমবাজার শ্মশান। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই সে বেনারস ত্যাগ করে।

বেনারস ত্যাগ করে কচি এলাহাবাদ গিয়ে, সেখানকার এক মুসলমানের বেকারিতে কাজ নেয়। সেখানে তার ''ভীষণ খাটুনি। কমবয়সী কাজের লোক বলতে আমরা দুজন। আমি আর নিয়াজ। ও আমার চেয়ে মাথায় সামান্য বড়। কিন্তু আমার চেয়েও রোগা। আমাদের উঠে পড়তে হত রাত তিনটেয়। নিয়াজের ওপর ছিল জল ফুটিয়ে চা করার ভার। মালিকটি ছিল কিপ্টের জাশু। তার হাত দিয়ে জল গলত না।'' (৪-'কাচাপাকা')। কাঁচা বয়সের মধ্যবিত্ত ঘরের কচিকে এলাহাবাদে বেকারিতে অধিক পরিশ্রমে কালযাপন করতে হয়েছিল। সেখানে তাল তাল ময়দা মাখা, সেগুলি পাটার ওপর আছড়ানো, তারপর সেগুলি ছাঁচে ফেলে রাবণের চিতার মত তন্দুরে বসানো, রুটির বাক্স মাথায় নিয়ে আড়াই ক্রোশ রাস্তা হেঁটে হেঁটে এ দোকান- সে দোকান, এ হোটেল -সে হোটেল করে রুটি বিক্রি করতে হয়েছিল কচিকে। শরীরের অসম্ভব ধকল সামলাতে পারে না সে। বাধ্য হয়ে জ্বর গায়ে নিয়ে এলাহাবাদ থেকে দিল্লী যায় সে। সেখানে পৌছে তার করুণ অবস্থা সম্পর্কে সে বলে - ''ছবিতে দেখা ছিল, বলে প্রথম দর্শনেও শহরটাকে আমার তেমন অচেনা বলে মনে হল না। খিদে পেয়েছে খুব। পেট ভরে খানিকটা জল খেয়ে নিলাম। সার সার খাবারের দোকান। চোখ সরিয়ে নিচ্ছি। কেননা দেখলেই খিদে পায়। মনে মনে ভাবছি কোথাও একটা লঙ্গরখানা কিংবা কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা দেখলেই পাত পেড়ে বসে যাব। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। রাতটা কাটালাম জামা মসজিদের পৈঠেয় শুয়ে। দেখলাম আমার মত অনেকেই এসে শুয়েছে। তবে দেখে মনে হল, ওরা কেউই আমার মত অভুক্ত নয়।'' (৫-'কাচাপাকা')।

দিল্লীতে কচি এক হোটেলে কাজ নেয়। সেখানে তার কাজ ছিল - ''এঁটো প্লেট ধোয়া আর বাবুর্চিখানা থেকে মাল নিয়ে দোকানে পৌছে দেওয়া।'' হোটেলের মালিক মকবুল খান। দিলদরিয়া ব্যক্তি ছিলেন। পরিস্থিতির চাপে কচি মকবুল হোসেনের কাছাকাছি যেতে মুসলমান বনে যায়। মকবুল তাকে বয়-এর কাজ থেকে রেহাই দিয়ে গদিতে বসিয়ে দেয়। সে সময়কালের কথায় কচি বলে - ''হিঁদুর ছেলে আমি ততদিনে পুরোপুরি মুসলমান বনে গিয়েছি। পরনে শালোয়ার, আচকানের ওপর

হাতকাটা ফতুয়া, মাথায় কিস্তি টুপি, চোখে সুর্মা, কানে গোঁজা আতর। একেবারে পুরোদস্তুর এক আবু হোসেন।'' (৫-'কাচাপাকা')।

মকবুল ছিলেন ফুর্তিবাজ আমুদে মানুষ। তার দুটি ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক নেশা ছিল - মদ ও বাঈজি। প্রয়োজনে ও পরিবেশে মানুষ বদলায়। কচিও প্রয়োজনে নিজেকে বদলে নিয়েছিল। কচি বলে - '' আমি ততদিনে মকবুলের প্রায় ইয়ার দোস্তের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছি। ফটফট করে উর্দু বলি। শায়েরিও অনেক মুখস্থ হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলে মানুষ যে কতভাবে নিজেকে পাল্টাতে পারে।'' (৫-'কাচাপাকা')।

কচির চরিত্রের ক্রমবিকাশ লেখক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পগুণে সমন্বিত করেছেন। কচি বিভিন্ন স্থানে কাজের সন্ধান করে করে দিল্লীতে মকবুল খানের সান্নিধ্যে জীবন সম্পর্কে অনেক পরিণত হয়ে ওঠে। মকবুল খান মদ ও বাঈজীকে নিয়ে জলসার আসরে কচিকে সঙ্গে নিতে চায়। মকবুলের মতলব সম্পর্কে তার সন্দেহ হয়। সে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করে - '' মকবুল কি আমাকে এসব দিয়ে বেঁধে ফেলার মতলব ভাঁজছে।'' হোটেলের দোতলায় কচিদের থাকার ঘরেই মকবুল জলসার আসর বসিয়েছিল। এগুলিকে নিজের জীবন সরিয়ে রাখতে কচি সেদিন সিঁড়ির নিচের ধাপগুলোতেই রাতে থাকে। এরপর কচি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এ সম্পর্কে কচি নিজেই বলে - '' নাচ গানে এমনিতেই আমার প্রচন্ড ঝোঁক। তার ওপর রক্তে যৌবনের প্রথম ঢল। নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না।'' (৫-'কাচাপাকা')। সে ভাবে - 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে,/ এভাবে কচি মকবুলের হাতে নিঃশর্তে সপে দেয় নিজেকে। সেই বাঈজির বয়স কচির থেকেও বেশী। সে সম্পর্কে কচি বলে - '' একটা গেলাসে মদ ভরে আমার মুখের কাছে যখন ও ধরল, ওর গায়ে গা ঠেকে আমার চোখে মুখে যেন রক্ত ছলকে উঠল।'' (৫-'কাচাপাকা')। সেই বাঈজী জোরকরে কচির হাতদুটো টেনে নিয়ে মদ্যপান করিয়েছিল। সেই বাঈজীর ছোঁয়ায় কচি যেন 'স্বর্গের সুখ' উপলব্ধি করে। এই ঘটনা কচির কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইতে পড়া, খসিয়ে খসিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো মনে হয়। সেই সঙ্গে তার সম্বিৎ আসে যে, সে বাড়ি ছেড়েছিল সত্যিকারের মানুষ হবার জন্যে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম। এবারে সেই নারীর ছোঁয়া তার হৃদয়ে ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। সে যমুনার ধারে নির্জনে গিয়ে কেঁদে মন হালকা করে নেয়। সে ভাবে এবারের কান্নাটা তার মায়ের জন্য নয়। সে ভাবে যার জন্য এখন সে কাঁদছে তাকে সে ছুঁতে পেরেছে কিন্তু নিজের করে ধরতে পারছে না। এই ভাবনায় সে সেই বাঈজীকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও এড়াতে পারে না। আনজু নামের সেই বাঈজী কচিকে সন্ধ্যে বেলা তার বাড়িতে খাবার

নেমন্তন্ন করে। কচিও তাকে না বলতে পারে না। নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কচি আনজুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এক সময় দেখে আনজুর চোখে জল। আনজু যেন তাকে বলে - '' ইহাসে তুম চলা যাও, দিল্লি সে ভাগো !'' ভবিষ্যতে মানুষ তৈরী হবার লক্ষে বাইরে আসা কচি ক্রমশঃ নিজেকে হারিয়ে যেতে বসে। সে আত্মবিশ্লেষণ করে বলে - ''আমি এখানে থাকি আনজু চায় না। কিন্তু আমি যে ওর কাছেই থাকতে চাই, সেটা এই প্রথম আমার কাছে ধরা পড়ল। আমার বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না উঠে আসছিল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চন্ডালের মত সামনে এসে দাঁড়ালো প্রচন্ড এক রাগ। জলসুদ্ধু কাঁচের গ্লাস মেঝেয় ঠাস করে পড়ে ভেঙে গেল। রংচঙে কলাই করা প্লেটের খাবারগুলো ছিটিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আনজু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একটু ভেতরে গেল। আমি গুম হয়ে বসে আছি। দেখলাম তার মধ্যে আনজু পোশাক পাল্টে ফেলেছে। চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, সব বদলে গেছে। ওকে দেখাচ্ছে অনেকটা আমার ছেলেবেলার মা-র মত।'' (৫-'কাচাপাকা')। নিজেকে সঁপে দেওয়া আনজুর কাছে, আবার সেই মুহুর্তে নিজের পরিণাম ভাবার মধ্যে কচির চরিত্র ক্রমবিকাশ পুর্বাপর ক্রম বজায় রেখে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের শিল্পধর্ম অক্ষুন্ন রেখেছেন। কচি তার মা-ছাড়া এ পর্যন্ত কোনো নারীর সংস্পর্শে আসেনি। ক্রমশঃ বয়ঃবৃদ্ধি ও নারীর প্রথম ছোঁয়া কচি চরিত্রে যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্দর রূপ নির্মাণে সফল ও সার্থক হয়েছেন লেখক। মকবুলের মতো একটি বদ চরিত্রের কাছাকাছি গিয়েও কচি নিজেকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার মনে হয় - 'খারাপ হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করতে পারে না।' আনজু যে তাঁকে একপ্রকার জোর করেই দিল্লী থেকে চলে যেতে বলে - এর মধ্যে আনজুর ত্যাগ ও ভালোবাসা দেখতে পায় কচি। সেই সঙ্গে সে এও অনুমান করে যে মকবুল হয়তো সর্বদাই আনজুকে কেবল নিজের করে রাখতে চেয়েছিল, এবং আনজুর মধ্যে কচির প্রতি দুর্বলতার চিহ্ন দেখতে পেয়েই মকবুল কৌশলে আনজুকে দিয়ে দিল্লী ছাড়িয়েছে। কচির এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য অর্জনের মধ্যে - পরিপক্ক চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠে - এই অধ্যায়ে।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখি, বাইরের জগৎ প্রত্যক্ষ করে এখন পরিণত কচি তাদের গোটা সংসারের ভার নেবার উপযোগী। সে এখন ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে তোলার কথা ভাবে। তার মা-কেও সংসারের ভার থেকে মুক্তি দেবার কথা ভাবে। এই ভাবনা থেকে সে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে নামে ট্রেনে করে। কিন্তু পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট কচির একটি ঝোলা থেকে ঝোলা সহ হারিয়ে যায়। সেই খেসারতে তাকে পনেরো দিনের জন্য হাজত বাস করতে হয়। সেই হাজত বাসের পনেরো দিনে জেলখানার অভিজ্ঞতা অর্জন করে কচি। জেলখানায়

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে কচি মজার সঙ্গেই। সে বলে - " জেলে ঢুকবার সময় বেশ মজা লাগছিল। জেল সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই খুব কৌতুহ ছিল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সামনে দু-এক সময় দাঁড়িয়ে ভেতরে কয়েদির পোশাক পরা লোকদের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। বাপরে, এরাই তাহলে সেইসব সাংঘাতিক লোক যাদের আমরা বলি নরপিশাচ।" (৬-'কাঁচাপাকা')। 'জেলের রুটিন - বাঁধা জীবন' কচিকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা এনে দেয়। সকাল সাড়ে-পাঁচটায় তাদের মাদুর থেকে তুলে দেয়। তারপর গিনতি করে কোদাল হাতে দিয়ে বাগানে পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক কাজের নির্দিষ্ট সময়ে ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজে। আর সেই জেলখানার খাবার বলতে - "ছটা রুটি আর এক হাতা ডাল। দুপুরে কী, সন্ধেগয় কী।" সেই জেলখানার পনেরো দিনে বিভিন্ন কয়েদীর কাছাকাছি পৌঁছে কচি জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে ওঠে। একটা ভিন্ন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই জেলখানার কথায় সে বলে - " পনেরো দিনের জন্যে মিলেছিল মাদুর বিছোবার একটা জায়গা। খাওয়ার পরই সবাই শোয় না। কোথাও বসে গানের আসর, কোথাও চলে রাজাউজির-মারা আড্ডা। আর যা সব চলে সে আর কহতব্য নয়। তার মধ্যে কোনো রাখঢাকও নেই। এসব ব্যাপারে কয়েদি - সেপাই ভাই-ভাই ; মদ - জুয়োর ঠেক ? কী নেই শ্রী ঘরে।" (৬-'কাচাপাকা')। আবার এই জেলেই আর এক ভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয় - রাজনৈতিক বন্দী গোঁসাইজী। কচি তার জীবনের নানা কথা বলে। সেখানে কচির দেখা হলে গোঁসাইজী তাকে দেশ-বিদেশের নানা কথা শোনায়। সেই গোঁসাইজীর কাছে কচি লেনিন, কার্লমার্ক্স, মে-ডে, রুশদেশ, মাও-সে-তুং -এর নানা কথা শোনে। কচি জানায় - "ওঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর ভাবতাম - ইস্ আমি কী কাঁচা। দিলদুনিয়ার কোনো খবরই রাখি না।" (৬-'কাঁচাপাকা')।

আমরা এই অধ্যায়েই কচির সহজ জীবনের বর্ণনা পাই। লেখকের অসাধারণ দক্ষতায় ক্রমশঃ কচির কাঁচা জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। কচি জেল থেকে ছাড়া পাবর পর কচি বম্বে মেলে উঠে পড়ে। এরপর কাটনি শহরে নেমে নিরুদ্দেশ হয়ে হাঁটতে থাকে। সেখানে সে তার লম্বুদার দেখা পায়। স্টেশনে ভবঘুরে বলে ধরা পড়ার ভয়ে রেল-লাইন বরাবর হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ি ঝোরা দেখতে পায়। সেই ঝোরার নীচে একটা গাছতলায় গিয়ে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলে সেই জনশূণ্য স্থানে জংলি জানোয়ারের ভয় তার মনকে গ্রাস করে। সামনের গাছতলা দিয়ে ছায়ার মতো কী একটা চলে যেতে দেখে তার মনে অশরীরীর ভয় হয়। সেখানে আর থাকার ভরসা হয়না তার। এরপর সে বলে - "কোথায় যাব এবার? পাহাড়ি নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অন্ধের মত চলেছি। হঠাৎ দেখি সামনে যুদ্ধের সময়কার ভাঙা এক পরিত্যক্ত গুমটি। ভেতরে

মাকড়সার জাল আর কিছু আগাছা। ঠিক করলাম একটু সাফসুফ করে এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব। খিদে তখন মাথায় উঠেছে। যতসব উদ্ভট চিন্তা। মাঝে মাঝে মশার কামড়ে সোজা হয়ে বসছি। যতদূর দৃষ্টি যায় লোকালয়ের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক সেই নির্জনতাকে আরও যেন উসকে দিচ্ছে। গুমটির পেছনের দেয়ালে খস্‌খস্‌ করে গা ঘষার একটা আওয়াজ। ভয়ে কান খাড়া করে আছি। একটু বাদেই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেও। বেরিয়ে যে দেখব, সে-সাহস থাকলে তো !'' (৬-'কাঁচাপাকা')। তারওপর নদীতে কিসের যেন জল খাওয়ার আওয়াজ। এমন সময় দুজন লোক যেন কথা বলছে থেমে থেমে হেঁড়ে গলায়। গাছতলা ছেড়ে যেতেই সেই আওয়াজ থেমে গেল। গাছের নিচে যেতেই সেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল/ ফলে তার গা ছমছম করতে থাকল। মনুষ্য জগতের বাইরে নদীর ধারে, একটি পাহড়ি ঝোবার জঙ্গলে থেকে বন্যজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনে কচির চরিত্র বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

সেখান থেকে উঠে এসে কচি স্টেশনে আবার এসে একটি ট্রেনে উঠে বসে। তারপর সে জব্বলপুর স্টেশনে নেমে পড়ে। স্টেশনের বাইরে এসে সে শহরের দিকে হাঁটতে থাকে। সে সেদিনের কথায় বলে - '' সারাদিন শুধু হাঁটাই সার হল। পেটে চনচনে খিদে। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কাজ চাইতে গেলে মুখ ফুটে তো বলতে হবে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। রাত বাড়ছে দেখে অবসন্ন শরীরে একটা বাড়ির রোয়াকে গিয়ে নেতিয়ে পড়লাম। সারাটা মনের মধ্যে চলে তোলপাড়। আর এভাবে থাকা যায় না। যে করেই হোক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হবে।'' (৭-'কাচাপাকা') এসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে কচি। ঘুম থেকে টেনে চুলের মুঠি ধরে তাকে ভ্যান করে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। আবার জেলে ঢোকায় পুলিশ। এবারের জেলে এক পাকা চোরের সঙ্গে ভাব হয় কচির। সে চোরের নাম মেওয়ালাল। সে কী করে চোর হয়, চোরী করার কথায় কী মজা - সব বলেছিল কচিকে। এভাবে এবারের জেলেও অনেক প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কচির। তাদের মধ্যে একজনের গানের গলাও খুব ভালো। সে নিজের সুরে দেশ-দুনিয়ার কথা হিন্দী ভাষা গানে বাঁধে -

''বড়ে বড়ে চোর লোগোঁ কা
বড়ে বড়ে মহল
হাম সব ছোটা হামারা লিয়ে
ডাণ্ডাবেড়ি জেহেল -
বড়ে বড়ে লোক কানুন বানাতা
হামকো মিলতা সাজা

হামারা পেট মে আগ জ্বালা কর্
উনলোগ লুটতে মজা -
দেখো ভাই, তক্‌দির দেখো
দুনিয়াকা মজা দেখো -" (৭-'কাচাপাকা')

এখানেই পরিচয় হয় ফটোগ্রাফার হাসনাৎ-এর সঙ্গে। হাসনাৎ-এর কাছে শোনে কিভাবে সে চক্রান্তের শিকার হয়ে জেলে এসেছে। এখানেই কচি শোনে ইউ-পির নিঃসন্তান জমিদার পরিবারের বাঁজা বড় বউয়ের পাষাণ হৃদয়ের কাহিনী। এবারের জেলে তিনমাস পর জেলের বাইরে এসে পরম আনন্দে কচি 'খোলা আলো-হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস' নেয়।

দ্বিতীয় বারের জেল থেকে বেরিয়ে কচি ধরে আবার রাস্তা, আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ঝোপঝাড় পেরিয়ে কচি একটা গুহাগর্তের আশপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরে বসে বসে রাত কাটিয়ে দেয়। এরপর সে ভাবে - "বড় বেশি এলোমেলো হয়ে গেছে জীবন, এবার গুছিয়ে সব কিছু ঠিক করে নিতে হবে।" - একথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লাল্লু নামের এক ব্যক্তির সাইকেল রিক্সার ধাক্কা খেয়ে ঢালু রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে কচি। সেই লাল্লুই তাকে ডাক্তারখানায় ঔষধ কিনে দিয়ে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। চা খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় কচি না বলতে পারে না। এছাড়াও আরো কিছু খেতে চায় কিনা - একথার উত্তরেও কচি না বলতে পারে নি। কচি বলে - " খিদের জ্বালায় মানুষ কী রকম নির্লজ্জ হয়ে যায় নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পারছিলাম।" কচির সব কথা শুনে লাল্লু তাকে নিজের কাছেই রাখে। লাল্লু কচিকে বলে - " আজ্‌সে হাম তুম এক হ্যায়। সেই লাল্লু বাজারে মাছ বিক্রির ব্যবসা করে। এছাড়া সে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, জুয়ো খেলে আর চুল্লু খায়। সবার বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে বস্তিতে লাল্লুকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু একজন লাল্লুকে সহ্য করতে পারে না, - সুখিয়ার বাবা। সুখিয়ার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল ; স অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই সুখিয়াকে মাউথ অর্গানের সুরের টানে লাল্লু আকর্ষণ করে। কিন্তু স্বজাতের নয় বলেই সুখিয়ার বাবা লাল্লুকে সহ্য করতে পারে না। লাল্লুও সুখিয়ার কথায় কচি বলে - " এদিকে লাল্লু আমাকে বলেছে ও সত্যিই সুখিয়াকে ভালোবাসে। লাল্লুর একটা মাউথ অর্গ্যান ছিল। কী ভাল সে বাজাত বলায় নয়। ঐ মাউথ অর্গ্যানের সুর শুনিয়েই ও নাকি সুখিয়াকে পটায়। মাছ বিক্রির ব্যাপারটা লাল্লু আস্তে আস্তে আমার ঘাড়ে ফেলে দেয়। এরপর ও বোধহয় এমন কোনো লাইন ধরে, সেটাতে পুলিশের ল্যাজে পা পড়ে।" (৮- 'কাঁচাপাকা)

পুলিশকে লাল্লু কচির কথা বলে। তার ভাগ্নের সম্পর্কের কথা বলে। বস্তিতে পুলিশ আসার কথা জানতে পেরে কচি সে স্থান ত্যাগ করে। এরপর ঘুরে ঘুরে ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ইটারসি হয়ে সে নাগপুরে এসে পৌছায়। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বিফল ও বিরক্ত হয়ে চলে আসে ভুসাওয়াল। সেই ভুসাওয়াল থেকে এসে পৌছায় দাদারে। সেখানে মানিকলাল নামের এক ব্যক্তির হাত ধরে আগরওয়ালজী নামে এক ব্যক্তির কাছে পৌছায়। সেই আগরওয়ালজীর নির্দেশ মতো সে প্ল্যাটফর্মে চা-ফেরির কাজ করে। আগরওয়ালজী এরপর চায়ের সেলস্‌ম্যান কাজের বদলে দোকানের ভেতরের কাজ দেয়। তার কাছে কচি বারো ঘন্টা শিফট ডিউটি করে; নাইট ডিউটিতে জল টেনে আনে। একদিন রাতে জল টানতে গিয়ে এক শোরগোল শুনতে পায়। সেখানে একদল পুরুষ একটি মেয়েকে নানাভাবে উত্তক্ত করছিল। তার কথায় কচি বলে - ''শাড়ি-পরার ধরনে আর মুখশ্রী দেখে আমার মনে হল মেয়েটি বাঙালী। বয়স ষোল-সতেরোর বেশি নয়। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে আন্দাজে ঢিল মারলাম। বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম - কী হয়েছে ? আমার মুখে বাংলা শুনে মেয়েটি যেন অকুলে কুল পেল। বলল - '' দেখুন না, এরা আমাকে বড্ড জ্বালাতন করেছে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

অঞ্জলি। সে জানায় মা-বাবাকে হারিয়ে দুই ভাই-বোন টাঙ্গাইল থেকে কলকাতায় কাকার বাড়িতে চলে আসে। সেখানে তাদের কাকিমার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছোটভাই বোম্বাইতে চলে আসে। ছোটভাইকে খুঁজতে অঞ্জলি বোম্বাইতে আসে, এবং তারপর সেই বদ লোকগুলির খপ্পরে পড়ে। তারপর অঞ্জলির একটা সুষ্টু ব্যবস্থা করার জন্য কচি তার পরিচিত টিকিট চেকার বোসদার কাছে নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে এক উকিল ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যায়। এরপর এখানে সেখানে একসঙ্গে ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া করে চলতে চলতে অঞ্জলি আসলে নমিতা। তার কথায় কচি বলে - ''নমিতার তখন গদগদট অবস্থা। গড়গড় করে বলে গেল কী উদ্দেশ্যে ও বোম্বাই এসেছে। ও চায় সিনেমায় নামতে। হেঁদি পেঁচি যে-কোনো রোলে। বোম্বাইতে আমার তো অনেক জানাশোনা। ইচ্ছে করলেই আমি নাকি ওকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে পারি। আর তাহলে আমি যা চাইব ও তাই করবে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

অবস্থা বিবেচনা করে কচি সেই নমিতাকে একপ্রকার জোরকরেই কলকাতার ট্রেনে তুলে দেয়। কিন্তু এরপর সেখানকার সেইসব দুষ্ট মানুষগুলোর রোষের মুখে পড়ে কচি। এই সময় সে কলকাতা ও বোম্বাই-এর সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য উপলব্ধি করে।

এই সংকটময় অবস্থায় মেহের নামের এক ব্যক্তি কচিকে আগলে রাখে। মেহেরের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেহের তাকে নিজের বাড়িতে রাখে। তাকে কোনো কাজও করতে দেয় না। কচির অবস্থার উন্নতি হয়। মেহেরকে তার ভালো মানুষ বলে মনে হয়। জগতের বিভিন্ন মানুষের ভালো-মন্দ উভয় দিকই তার ভাবনাকে আন্দোলিত করে। সে বলে - ''জীবনে আমি মানুষ নিয়ে কম ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। ভালোমানুষ দেখেছি খুব কম। জটাধারী সন্ন্যাসী দেখেছি, দিনে যে - গেরস্থ তার চন্নামেত্তর খায়, রাতে তারই বউয়ের সতীত্ব নাশ করে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

আত্মবিশ্লেষণ করে বলে - ''নিজের ভেতরটাকে কেটে কুটে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমি সে বড়লোক বাপ-মার তবিল ভেঙে পালাইনি, সেটাই ছিল বাঁচোয়া। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে আমাকে শুধু দুটো খাওয়ার যোগাড় করতে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

মেহেরের কাছে থেকে কচির অবস্থার উন্নতি হয়। এখন সে কোট-প্যান্ট -টাই না পড়ে বাড়ির বার হয় না ; পকেটে তাড়া-করা নোট রাখে। তার ভেতরে আসে গাঢ় প্রেম-ভাবনা। একদিন দরজার বাইরে এসে হঠাৎ তার চোখে পড়ে এক তরুণী। 'চোখাচুখি' হতেই কচির শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে যেন সেই তরুণীর কাছ থেকে চোখ দুটোকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। সেই মেয়ে ছিল ইরানি তরুণী মীনা। মীনা ও তার মা পাশের বাড়িতে থাকে। মীনার সঙ্গে কচির আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কচি মীনার বাড়িতে যায়। আবার মীনাও কচির বাড়িতে আসে। ধীরে ধীরে ওরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কচির কথায় - ''আমার ভবঘুরে জীবনে আমি নানা বয়সের ভাল খারাপ কম মেয়ের সংস্পর্শে আসিনি। আমার মধ্যে কোনো প্যাঁচ -পয়জার না থাকায় সকলের ভাল করবার চেষ্টা করে অনেকের আমি আদরও কুড়িয়েছি। কিন্তু কেউই আমাকে শরীর দিয়ে বেধে ফেলতে পারেনি। আমি শেষে মীনার কাছেই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেলাম। যেদিন খোলা দরজার ফ্রেমে প্রথম ওকে দেখেছিলাম, সেই দিনই ঘরে এসে আমি মনে মনে বলেছিলাম - '' কচি, তুমি এবার মরলে, তুঁহু মম শ্যাম সমান !'' (৮-কাঁচাপাকা)

ওরা পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে মীনার শরীর থেকে অদ্ভুত গন্ধ ধীরে ধীরে কচিকে মাতাল করে তোলে। মীনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে কচি। সেকথা সে নিজেই বলে - ''দরজা বন্ধ করে এসে মীনার দিকে হাত বাড়াতেই আমার বুকে এসে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি নাক দিয়ে ওর সারা শরীর শুঁকছি। মৃগনাভির সেই গন্ধ সেই গন্ধ যে গায়ে মাখা কোনো সেন্টের নয়, মীনার ভেতর থেকে আসছে - ওর মুখে মুখ রেখে আমি সেটা আবিস্কার করতে পারলাম।'' (৮-কাঁচাপাকা) এই পর্বে কচি তার বন্ধু মেহের-এর কাছে থাকে। কচির কাজ মেহের-এর ব্যবসায় সাহায্য করা। মেহের সম্পর্কে কচি

বলে সে - সে ফুর্তিবাজ মানুষ। তার কথায় মেহের "বড্ড বেশি মোটা দাগের মানুষ।" তাই মেহেরের ওপর কচির রাগ হয় না বরং দুঃখ হয়। তাদের ব্যবসা সম্পর্কে কচি জানায় - "ঘুরে ঘুরে আমি অর্ডার জোটাতাম, মেহেরের কাজ ছিল এমন লোক পাকড়ানো সে মালের যোগান দেবে। আমি আনতাম অর্ডার, অন্য লোক দিত মালের যোগান। আমরা কেউ কাউকে জানতাম না। এইখানেই ছিল মেহেরের প্যাঁচ। আমি যেন ওকে ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করে দিতে না পারি। ওর কথা হল - বন্ধু বন্ধু, ব্যবসা ব্যবসা।" ব্যবসা আর মীনার প্রেম এই দুই - নিয়েই ক্রমশঃ পাকা হতে থাকে কচি। মীনা ও কচির প্রেমের কথায় কচি বলে - "ভালবাসা কাকে বলে সেই প্রথম জানলাম।" মীনা বুঝেছিল আমি আনাড়ি। মুখে মুখ দিলেও হাত দুটোকে নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কী করতে হয় আমি জানতাম না। মীনা নিজে হাতে খুব সপ্রতিভভাবে আমাকে সব শিখিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমিও পাকা হয়ে উঠলাম। ও তখন আমার হাতেই পুরোপুরিভাবে নিজেকে ছেড়ে দিত। ওর একটা জিনিসই আমাকে অবাক করত। ওকে যখনই আমি আনন্দ দিতাম, মীনা ফুলে ফুলে উঠে কাঁদত।" (৮-কাঁচাপাকা)

এই পক্ষে লেখক অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও শিল্পগুণের সামঞ্জস্য বজায় রেখে কচি ও মীনার প্রেমের বর্ণনায় উপন্যাসে প্রেমভাবনা প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে যৌন বর্ণনাকে ছাপিয়ে কচির জীবনের একঘেয়েমি ভবঘুরে চলাফেরা পাঠকের আকর্ষণ আদায় করে। সমুদ্রের ধারে কিংবা হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে মীনার সঙ্গে কচির ঘোরাফেরা, মীনার গান গাওয়া, কচির ভবঘুরে জীবনের কথা বলা, পরস্পরের শরীর নিয়ে খেলার মধ্যেও সে মেহেরের ভূমিকা থাকে। মেহেরও চায় কচি উৎসাহের সঙ্গে ব্যবসার কাজ করার জন্য মীনার প্রেম একটা আনন্দের অবলম্বন হয়ে থাকুক। কিন্তু ক্রমশঃ কচি মেহেরকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। নিজের জীবনকে নিয়ে কচিভাবতে থাকে। চিরদিন এই প্রেম প্রেম খেলার স্থায়িত্ব নেই সকথ কচি ভাবে। অনেকে তা নিয়ে দুঃখ করে, যদি কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি দিয়ে কেবল একটি বৃত্তে ঘুরত, আমি হলে সেই একঘেয়েমিতে মরে যেতাম। দুঃখের হলেও এটা সুখের যে, আমার বেলায় তা হয়নি। (৮-কাঁচাপাকা)

ভালবাসায় ডুব দিয়েও কচির মনের ভেতর কোথাও একটা সন্দেহ উঁকি দেয় কিন্তু স্পষ্ট হয় না। অন্তর্মনের এই প্রশ্ন ফাঁসে মাছ ধরার মধ্যে ইঙ্গিত পায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে। সে যে মীনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে সে মূলতঃ মেহের-এর রক্ষিতা। কচি একদিন সিনেমায় গেলেও বাজে সিনেমা জন্য এক ঘন্টার মধ্যে ঘরে ফিরে আসে। সে সহসা ঘরে ফিরে মেহের-এর সঙ্গে মীনার দৈহিক মিলন প্রত্যক্ষ করে। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে কচি মেহেরকে ত্যাগ করে। কচি বলে - "মেহেরকে মীনার দেহ দেওয়ার ব্যাপারটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধছিল।" মেহেরকে ত্যাগ করার কারণ হিসেবে

কচি বলে - " কিন্তু তখন তো আমার প্রথম যৌবন। আমার প্রথম প্রেম। অভিমানও ছিল তাই আকাশছোঁয়া।"

পরবর্তী অধ্যায়ে কচি পুরোপুরি পরিণত। নাম কচি হলেও জীবন অভিজ্ঞতায় এখন সে রীতিমতো পাকা। কাঁচাপাকা উপন্যাসের ১০ সংখ্যক অধ্যায়ে তাই কচি নিজের সম্পর্কে বলে - " কচি আর এখন সেই কুয়োর ব্যাঙ নয়। কচি খোকা তো নয়ই। এমনকী শুধু কচিও নয় - একই সঙ্গে সে হিন্দু, সে মুসলমানও। ইরানি মেহেরের কাছে আদরের 'এ বাঙালি।' কচি বুঝেছে নাম আর পদবি, জাতপাতের বালাই - এসব কিচ্ছু নয়। এ সমস্তই ওপরের খোসা। অস্থিমজ্জা আর রক্তমাংসের সে মানুষ - সেখানে কোনো ফারাক নেই। রামঅবতার, লাল্লু, মেওয়ালাল, আনজুরাই, মেহের, মীনা - এরা সবাই হাতে হাত লাগিয়ে কচির মনের জগৎটাকে টেনে বড় করে দিয়েছে।" (১০-কাঁচাপাকা)

মীনার কাছ থেকে আঘাত পাবার পর খুব স্বাভাবিকভাবে বাইরের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কচি বাড়ির দিকে রওনা হয়। মীনাকে না পেয়ে ভালবাসার শীর্ষতম স্থান মা-কে আশ্রয় করে কচি। সে বাড়ীতে এসে বাড়তি বোঝা তার মামা-কে মেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অধিক পরিশ্রম থেকে মা-কে রেহাই দিতে চায়। ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব নেয়। এখন কচি আর কাঁচা নয় - সে রীতিমত পাকা। তথাপি পিছনে ফেলে আসা জীবন কচিকে কখনো কখনো ভাবিয়ে তোলে। এখনো "কেউ যদি শাঁখে ফুঁ দেয়, তার কানে আসবে সমুদ্রের শব্দ।" পরিবারের ভার বহনের জন্য কচি একটা চাকরির খোঁজ করে।

এই সময় সুখচরে থাকার কালে শ্যামনগর -নৈহাটি এলাকায় বেশ কিছু ভালো মানুষের সংস্পর্শে আসে কচি। এঁদের মধ্যে অনেকেই বামসংগঠনের মানুষ ছিলেন। কচি মাঝে মাঝে 'গেট-মিটিঙে তাদের বক্তৃতা শোনে। তাদের যে শ্লোগান কচিকে আলড়িত করে, তা হল - " মালিকের কাছে হাত পেতে কিছু মিলবে না, নিতে হবে হাত মুচড়ে।" এই সময়কালের একটি পরিবারের কথায় কচি বলে - " এই সময়ই বস্তিতে থাকা এক পরিবারের খোঁজ পেয়েছিলাম। এমন লোক যাদের ঠিক বস্তিতে থাকার কথা নয়। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আদর্শবান। কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত। স্ত্রী অসাধারণ গান গাইতেন। স্বামী পার্টি করতেন। ওঁদের তখন কষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। কেউ বলত উনি নাকি একজন উদীয়মান লেখক। বলতে গেলে, আমার ধ্যান ধারনাগুলো ওঁরাই আমূল পাল্টে দেন। ভদ্রলোক ভারি সুন্দর কথা বলতেন। ওঁরই কাছে আমি মানুষের শোষণহীন এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখি।" (১০-কাঁচাপাকা)

এই উপন্যাসটিতে তার ছেলের জন্য নিজের জীবনের কথা লিখে যাবার প্লট-এ লেখক নিরপেক্ষ থেকে নিজের জীবনকে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এখানে যে কমিউনিস্ট পরিবার থেকে কচি সমাজতন্ত্রের কথা জানতে পারে, যে পরিবার এক সময় বস্তির শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে, যে পরিবারের একজন উদীয়মান লেখক সে মূলতঃ ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়। শিল্পের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করা, শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে সমাজকে আলোড়িত করা এবং এই সৃষ্টি যে উত্তরসুরীদের কাজে কালজয়ী গ্রহণযোগ্যতা আদায়ে সমর্থ হবে - সেই প্রত্যয়ে উপন্যাসের কথক কচিকে করেছেন ঔপন্যাসিক। এখানেই কচির নিজের জীবনের কথা ছেলের জন্য লিখে রাখার অভিপ্রায়ের সার্থকতা নিহিত। লেখকের এই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের এখানেই সাফল্য।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের ১০ নং এবং ১১ সংখ্যক অধ্যায়টিতে কচির জীবনের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা, রাজনৈতিক চেতনার ও শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা আমরা পাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের ভবঘুরে আনকোরা জীবনে বিভিন্ন জায়গার মালিক শ্রমিকের বিভিন্ন সম্পর্ক সূত্রে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে কচি। বাইরের জগতের লেনদেনের সম্পর্ক চুকিয়ে কমিউনিস্ট পরিবারের আদর্শে দীক্ষিত হয় সে। এখানে কচি চরিত্রটি অত্যন্ত সরল রৈখিক পথে চলতে চলতে শীর্ষ বিন্দুতে পৌছায় কচি। ভালবাসা-প্রত্যাঘাত-অপরাধ-সংশোধন-জগৎ ও জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করে কচি কমিউনিস্ট মতাদর্শে পৌছোয়। এখানে এসেও কচির জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। কারখানায় কাজ দেবার প্রতিশ্রুতিতে ইউনিয়নের নেতা তাকে প্রতারণা করে। সামান্য মজুরিতে দেশের শিল্প গড়ার ও দেশের বড় কাজ করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করে সে পরিবারের মহৎ উদ্দেশ্যে দিনে ন-সিকে দিনমজুরিতে মজুরি খেটে চলে। সেই কারখানায় একটি শ্রমিকের দুর্ঘটনায় কচির ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা হয়। কচি দেখতে পায় নাইট শিফটে সেই লোকটার অ্যাকসিডেন্ট হলেও বাঁচামরা অবস্থায় ভেতরে পড়ে থাকে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায়। আহত সেই শ্রমিকের ঠাঁই হয়না বাইরে সাহেবদের সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোতে। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও অসুরক্ষিত সেইসব অস্থায়ী শ্রমিকের জীবন। কচি বলে -- সেই কারখানায় ''ঢোকার সময় যারা স্তোক বাক্য দিয়েছিল, এখন তাদের প্রত্যেককেই মনে হয় মূর্তিমান শয়তান। বাইরে ভালোমানুষির শুধু একটা খোলস। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল যার, সেই লোকটা বেঁচে গেছে। কিন্তু টানা ছ-মাস তাকে হাসপাতালে কাটাতে হবে। চিকিৎসার খরচ ছাড়া কোম্পানির কাছ থেকে আর কিছুই সে পাবে না। কেননা সেও অস্থায়ী শ্রমিক। তার অভাবে তার

বাড়ির লোক না খেয়ে মরবে। কিন্তু কোম্পানির নাকি কিছু করার নেই। আইনে আটকায়।'' (১০-কাঁচাপাকা)

এই ঘটনার পর থেকে কচি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্থায়িত্বের দাবিতে সরব হয়ে ওঠে। লেবার অফিসারকে স্থায়িত্বের জবাব তলব করে। কারখানার প্রতারক মালিকগুলোকে শয়তান বলে মনে হয় কচির। সে এমন কিছু করতে চায় যাতে তাদের যথোচিত শিক্ষা হয়। সে উপলব্ধি করে কলকারখানার মালিকরা কুণালের মতো শ্রমিকদের ''রস নিংড়ে ছিবড়ে করে দিচ্ছে।'' সে কারখানার শ্রমিক অফিসার ও মালিকদের প্রকৃতি বিচার করে বুঝতে পারে - ''ক্ষমতার স্বাদ আর রক্তের স্বাদে কোনই তফাৎ নেই।'' কচি দেখে সেই 'গ্যারকানুনি দিন'। সে দেখে বাঁধভাঙা বন্যার মত শ্রমিকের ভিড়ে ময়দান উপ্‌চে পড়ে। কচি শোনে - '' সেি সঙ্গে হাজার হাজার লোকের গলায় ফেটে পড়া স্লোগান -- ইনক্লাব জিন্দাবাদ। দুনিয়াকা মজদুর এক হো।'' সেই শ্রমিক সভায় কারখানাগুলির মালিকদের বঞ্চনাকে চিহ্নিত করা হয়। শ্রমিকদের আসন্ন লড়াইয়ের জন্য তৈরী হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। জাতপাত, ধর্ম ও ঝাণ্ডার সওয়াল করে সেসব বেইমান শ্রমিক ঐক্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের সনাক্ত করা হয়। কুণাল ও কচি শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় সামিল হয়। মিছিলে গলা মিলিয়ে কচিও আওয়াজ তোলে -- ''ইনক্লাব জিন্দাবাদ! দুনিয়াকা মজদুর এক হো।'' কচি দেখতে পায় সব জায়গায় শ্রমিকের হাল একই। লড়াই ছাড়া তাদের আর কোনো বাঁচার পথ নেই। এখন কচির ''নিজেকে অন্য মানুষ বলে মনে হতে লাগল।'' শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কচি কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করে। হোসেন ও ওঝার সঙ্গে ইউনিয়ন গঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় সে। ওদের পরামর্শ দেয় লালজী। কচির কথায় -- ''ভিড়ের রাস্তায় আমার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লালজী আমাকে বলে কীভাবে ধাপে ধাপে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কীভাবে আস্তে আস্তে দালালদের কোণঠাসা করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের রাস্তায় শ্রমিকদের টেনে আনতে হবে।'' (১০-কাঁচাপাকা)

কচিদের কারখানার সমস্ত ওয়াল ওরা শ্রমিকদের দাবি-দাবা বিভিন্ন ভাষায় পোষ্টারে পোষ্টারে ঢেকে দেয়। এভাবে কচি, হোসেন ও ওঝা কারখানার মালিক ও অফিসারদের রোষের মুখে পড়ে। অথচ মালিকরা নিজেদের স্বার্থের কাজে লাগিয়ে কারখানায় একটা ইউনিয়ন জিইয়ে রেখেছিল। কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ভয় দেখিয়ে চার্জশিট হাতে ধরিয়ে, জাতপাত, ধর্মের সুরসুরী দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করে মালিক পক্ষ। শ্রমিকদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করে লালজী। ধীরে ধীরে কচি শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠে। যে শ্রমিকরা সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খেটে কোম্পানির টাকার

পাহাড় গড়ে তোলে সেই শ্রমিকদের অবস্থা সাহেবদের পোষা কুকুরের অধম, কারখানার শ্রমিকরা প্রশ্ন তোলে -- ''মানুষ কি তবে জানোয়ারের চেয়ে, যন্ত্রের চেয়েও অধম ? আমরা চাই চাকরির স্থায়িত্ব। মাথার ওপর সারাক্ষণ ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।'' (১০-কাঁচাপাকা)

বেগতিক দেখে কারখানার মালিক ও অফিসারেরা হোসেন, ওঝা ও কচিকে কারখানা থেকে চার্জশিট দিয়ে বিদায় করে দেয়। লালজী কারখানার ভেতরের নিরীহ আলতাফকে দিয়ে এমন এক ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দেয় যে কোম্পানি সমস্ত চার্জশিট তুলে নিতে বাধ্য হয়।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের সর্বশেষ ১১ নং অধ্যায়ে কচির রাজনৈতিক পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিনয় শিল্প। ইউনিয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় নাটক এবং পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র। ছেলেবেলা থেকেই তার নাটক ও সিনমার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেটাও এই পর্বে সম্পূর্ণ হয় কচির জীবনে। সেই নাটক মঞ্চস্থ করার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কচির রানীদি, সে সেখানকার এক কলেজে চাকরি নিয়ে এসেছিল। তাদের নাটিক ছিল বাংলায় গোর্কির 'মা'। কচির রানীদি যেন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার রানীদির খাতিরে শিক্ষিত সমাজে কচির খাতির বেড়ে যায়। সেই থেকে কচির মনে জনমানস সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন তৈরী হয়। সে বলে -- ''মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে, আমার কারখানার সহকর্মীরা আমাকে এই ভদ্রঘরের লোকদের সঙ্গে গা ঘষতে দেখলে উল্টোপাল্টা কিছু একটা আবার ভেবে না বসে। যে কেউ ভাবতে পারে আমি দু-নৌকোয় পা দিয়ে আছি।'' (১১-কাঁচাপাকা) এই নাটক মঞ্চস্থ করার হাত ধরে কচি পরিকল্পনা নেয় তার বন্ধুসম অতুলদার সঙ্গে ''কালো মেয়ের পায়ের তলায়'' ছবি করার। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে সেই ছবি করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। একে সংসারের বোঝা তার ওপর ''নতুন ঘর বাঁধার মনোমোহিনী হাতছানি'' কচিকে ছবি করার পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। কচির কথায় ''ছবি চুলোয় গেল। অতুলদাকে ছেড়ে তখন আমি সম্পুর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছি ''কালো মেয়ের পায়ের তলায়।''

আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কচি সামান্য থেকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে পাকা হয়ে ওঠার আদ্যোপান্ত কাহিনীকে পুষ্ট করে তোলে। ঔপন্যাসিক এখানে জগৎ ও জীবনকে দেখার মহৎ জীবনদর্শন প্রতিফলিত করেছেন মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ও অসংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাসের প্লট সরল প্লট। উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা নিতান্ত চরিত্রগুলো স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে ঘটনাক্রমে বিকশিত করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কচি নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ কাহিনীবৃত্তে জড়িয়ে পড়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসে। আবার পরিবারের অবস্থান, বিভিন্ন মন-মানসিকতার মানুষের কাছাকাছি এসে কচি কাহিনী

শেষে পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে উপন্যাসের শীর্ষনাম ‘কাঁচাপাকা’ অত্যন্ত শিল্পসম্মত ও ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণ হয়ে উঠেছে অলোচ্য উপন্যাসে। একটি সাধারণ জীবন নিয়ে ঔপন্যাসিকের ‘কাঁচাপাকা’ উপন্যাসটি একটি অসাধারণ শিল্প নিমার্ণ হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ (১৯৯০) উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে অন্যতম স্থান রয়েছে তাঁর মহৎ জীবনদর্শন ও শিল্পীর জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। সেই দৃষ্টিতে তাঁর জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ উপন্যাসটি সমকালে সৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি অনন্য সংযোজন। এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ - ১৯৯০ সালে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। লেখক তাঁর স্নেহধন্য প্রণব বিশ্বাস মহাশয়কে এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসের বিষয় কথা অনুধাবনে সহায়ক হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদলেখ। সেখানে লেখা হয়েছে জ্ঞপ্রথমাবধি তিনি ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। সে কি আজকের কথা? ভয়কাতুরে, মুখচোরা, কোমল প্রাণ কিশোর থেকে ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজের হৃৎকম্প-ঘটানো এক বিপ্লবী। ট্যাঁকে পিস্তল, বুকে আদর্শবাদ। চিরটাকাল কেটে গেল এক ভাবের ঘোরে। জীবনের সিকিভাগ শ্রীঘরে। সময় পালটাল, তিনি থেকে গেলেন একই রকম। দেশ স্বাধীন হল, পার্টি দু-ভাগ হল, তিনি তাঁর জায়গা ছেড়ে এক পাও এগোলেন না। পার্টির স্বার্থে সংসারী হননি, পার্টির গায়ে কাদার দাগ বাঁচাতে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন সখলনের পথ। নেতাদের কথাই তাঁর কাছে বেদবাক্য। নিজের মনের কথা কখনো খুলে বলেননি। অন্যরকম কিছু দেখলেও উড়িয়ে দিয়েছেন নিজেরই চোখের দোষ বলে। তবু পরিণাম?

এক কমরেডের বিচিত্র জীবনকাহিনীর সূত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এই সাহসী, স্পষ্ট, উজাড় করে দিয়েছেন খুব-কাছ-থেকে-দেখা নিজের জীবনেরই কিছু অভিজ্ঞতাকে। আর সেই পরশপাথরের স্পর্শেই এ-উপন্যাস হয়ে উঠেছে নিখাঁদ সোনা।ঞ্চ

জ্ঞকমরেড, কথা কওঞ্চ উপন্যাসেক আমরা দেখি ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ তাঁর কালের গন্ডি অতিক্রম করে চিরস্থায়ী আবেদনের প্রয়াস এই উপন্যাসে আমরা পাই। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বোধ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ করে অহৈতুকী রস সৃজন ও সাহিত্য নিমার্ণের নিরিখে জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ বাংলা সাহিত্যের ধারায় অবিনব সৃষ্টি। এই উপন্যাসের বিষয় অভিজ্ঞতা কাঠামো এবং নিজাল গদ্য ভঙ্গির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা আমরা পাই।

জ্ঞকমরেড, কথা কওঞ্চ উপন্যাসের ছোট ছোট অনুচ্ছেদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। অনুচ্ছেদগুলি ঔপন্যাসিক শীর্ষনাম দ্বারা প্রকাশ করেছেন। অনুচ্ছেদ গুলি ছিল 'শিয়রে চিত্রগুপ্ত', 'বসুবৈধ কুটম্বকম', 'পেছনে কী বলে', 'বাঁয়ে চলো ভাই, বাঁয়ে', 'গিধ্‌ধড়', 'না, কমরেড না', 'পায়ের নিচে শেকড়', 'বেনো জল', 'চোখের ছানি', 'বুকের পাটা', 'কমলি ছাড়ে না', 'জেরার মুখে' 'পিসেমশাইয়ের ডায়েরি', 'ভায়েরির খোল সে', 'তিনের ঘরে দুই শহিদ', 'সেদিন গুরু বার', 'এক দুই তিন', 'আসলনামা', 'নজরদারি', 'শুকনো পোড়া লঙ্কা', 'এমন মানজমিন', 'বাড়ানো হাতে', 'চাওয়া পাওয়া', 'যা নয় তাই আশ্বিনের ঝাড়', 'নটে গাছ', 'পার্টির ঘরবর' 'এক নৌকায়', 'ভাঙার পর','কালা মেঘ', 'অনির্বচনীয় উপোসী মন', 'কালো নামাবলী', 'অগ্নিহোত্রী' 'কথা রইল' সেগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো বিভিন্ন ছবি। উপন্যাসেক একটি অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন ছবির সামগ্রিক শিল্পরূপ নির্মাণ ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব শৈলী।

'কমরেড, কথা কও' (১৯৯০) উপন্যাসের কথক লেখক স্বয়ং। উপন্যাসের ভাই সাহেব, যিনি আজ শুনতে পান না, সাড়া দিতে পাবেন না, একদা সর্বহারার সেবায় তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন। মাথায় লাঠির আঘাতে আহত ও অজ্ঞান এই প্রবীণ কমরেড হাসপাতালের শয্যায় শায়িত। ত্রিভুবনে তার আত্মীয় বা আপনার লোক বলে কেউ নেই। সন্ত্রাসবাদী থেকে তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে থেকে গেছেন পার্টি অফিসে, সেই কমরেড কে অনুনয় করে কথক বলেছেন 'কমরেড, কথা কও '। এই উপন্যাসের পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে আমরা পাই উনিশ শ-আটচল্লিশ - উনপঞ্চাশের কথা, অধীরের শহীদ হওয়ার কথা, একটি নার্স মেয়ের গল্প, রুক্মিনী- গিরিধারীর কথা। সেই ছোট ছোট কাহিনীগুলির মধ্যে উপন্যাসে ঢুকে যায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রসঙ্গ, সাতাত্তর পূর্ববর্তী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট রাজনীতির কমিউনিস্ট পার্টিকে বে আইনী ঘোসণা করার প্রসঙ্গ, নেহেরুর সমাজতন্ত্রবাদ প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে মুক্ত হয় অবলীলায় শৈশবস্মৃতি- সংগঠন সভা ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা বোধ ও প্রেম ভাবনা এবং পরিণতিতে ভাইসাহেবের মৃত্যু। ভাই সাহেবের শেষ যাত্রায় সামিল হলেন সর্বদলের সব শ্রেণীর মানুষ এই উপন্যাসের উল্লেখ্যনীয় দিক হল ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন- সমাজবাস্তবতা-চরিত্র নির্মাণ আঙ্গিক- কাহিনী বিন্যাস সহ শিল্প সার্থকতা কমরেড, কথা কও' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'শিয়রে চিত্রগুপ্ত'। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক বর্ণনাত্মক ঢঙে বলেন 'মাথায় চোট লেগেছে তো কী? সব ভুলে যেতে হবে? এটা কোনো কথা হল? তাছাড়া এই তো সব কিছু মনে করার সময়। তোফা শুয়ে আছ। সংসারের কুটোটা ভেঙে দুখানা করতে হচ্ছে না। গাঁটের

পয়সা খরচ নেই। ফ্রী বেডে দিব্যি ভর্তি হতে পেরেছ। তাই বলে মনে করো না সাত খুন মাপ'। এই উপন্যাসের কাহিনীতে প্রবেশের স্টাইল, বাক্য নির্মাণ, গদ্যের অভিনব আদল এবং সমকাল চেতনা লেখকের নিজস্ব বৃত্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্রের প্রকৃতি স্বল্প কয়েকটি বাক্যের আশ্রয়ে অসাধারণ শৈল্পিক গুণের সঙ্গে উপন্যাসের শুরুতেই বলে দিয়েছেন। সেখানে তিনি লেখেন - 'শ্বশুরবাড়ি কী, তা তুমি কী বুঝবে? জীবনে তো ছাঁদনাতলার রাস্তা মাড়ালে না। এসেছ একলা, যেতেও হবে সেই একলা। দোকলা জীবনের যে কী মজা কোনদিন তা টেরও পেলে না। ও হ্যাঁ, তোমাদের কাছে তো শ্বশুরবাড়ির একটাই মানে। সে হল জেলখানা। শ্রী ঘর। তোমার তো আরও মনে হবে। কেননা তোমার জীবনের সিকিভাগই তো শ্রীঘরে কেটেছে।' সেই সময়কালে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরা একেক করে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরোচ্ছিল। এবং ইংরেজরাও তত দিনে বুঝে গিয়েছিল বোমা পিস্তলের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই সেদিনের এক ছেলে ষোল বছরের এক কয়েদিকে বলেছিল তার জীবনের ষোলটা বছরই বরবাদ। কেননা তার কথায় মন থেকে সন্ত্রাসবাদী ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেললে দুনমুখী দুমানায় চলা যায় না। ষোল বছর জেলে থাকার অর্থ সেই দীর্ঘকাল জনজীবন থেকে সরে থাকা। এবং দিনানুদৈনিক সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা তা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বসুধৈব কুটুম্বকম) শীর্ষক অংশে ফ্ল্যাসব্যাক রীতিতে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রকৃতি ও বাল্যস্মৃতি উল্লেখ করেছেন। আজকের সেই কমিউনিস্ট নেতা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন 'মুখচোর' প্রকৃতির। গ্রামের প্রতিবেশীরা তাঁকে বলতেন 'খুঁজখুঁজে'। সে কাউকে গলা তুলে কোনো কথা বলতে পারতোনা। আবার কোনো অন্যায়ও তেমনভাবে সহ্য করতে পারতো না। খেলাধূলা ও বন্ধুবান্ধব ছোটবেলা থেকে তেমন ছিল না তাঁর। ছোটবেলা একবার খেলতে গিয়ে তাঁর পা মচকে যায়। এবং তারপর আর কোনোদিন সে মাঠমুখো হয়নি। তারপর থেকেই সে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠে। পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচীতে সামিল হয়ে সে শাসক শ্রেণীর রোষানলে পড়ে দীর্ঘ ষোলবছর জেল খাটে। জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ফিরে সে তার চেনা জানা গ্রামকে আর দেখতে পায় না। ততদিনে গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মা-বাবাও লোকান্তরিত হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনেরা সহায় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। ছেলেবেলায় যে মিষ্টি মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিল, সেও জেলে যাওয়ার দু-আড়াই বছরের মধ্যে পেটে ছেলে নিয়ে লজ্জায় কলসি গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরে যায়। তাঁর জীবনের এই সব স্মৃতি লেখক প্রত্যক্ষ উক্তিতে সংলাপের ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন আলোচ্য অংশে। জেলে যাবার পর পরিবর্তিত গ্রামের কথায় ঔপন্যাসিক লেখেন এমনকী বুড়ো বয়সেও মাঝে মধ্যে তোমার স্বপ্নে হানা দিয়েছে ছেলেবেলার গ্রাম। এমনকী এ - হুঁশটুকুও তোমার ছিল না যে, তোমার যে

গ্রাম তুমি স্বপ্নে দেখ আজ তার খোলনলচে সবই বদলে গেছে। সেদিনের সঙ্গে আজকের কোনই মিল নেই। সে সব বদলের কথা কাছে পিঠের গ্রামের লোকদের মুখেই তো তুমি কত শুনেছ। চিনিকল ঢের আগেই হয়েছিল। পরে হয়েছে মদের ভাটিখানা। গাঁয়ের ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে। সাইকেল রিক্সার ছড়াছড়ি। সারা দিক সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ছেয়ে গেছে। জমিদার বাবুদের যেটা ছিল চন্ডীমন্ডপ, সেখানে এখন লাল ঝান্ডার আপিস।'' (বৈসুধৈব কুটুম্বকম কমরেড, কথা কও) এখানে শৈশবস্মৃতি আবেগের সঙ্গে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে চরিত্র বিকাশের পারস্পর্য রক্ষার শৈল্পিক গুণের পরিচয় এখানে পাই । এরপরের 'পেছনে কী বলে' শীর্ষক পরিচ্ছেদে গ্রামের সেই নিতান্ত সাধারণ ছেলেটি মোচড় দিয়ে জাতীয়বোধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। একটি চরিত্রের স্বল্প পরিসরে পরিণত করে তোলার অসাধারণ শিল্প চাতুর্যের পরিচয় এখানে আমরা পাই - ''তোমাকে আগে যারা দেখেছে, পরে তারা তোমাকে দেখলে অবাক হয়ে যেত। ভয়কাতুর সেই মানষটাই কিনা ট্যাঁকে পিস্তল গুঁজে ইংরেজদের প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে থরহরিকম্প'' (পেছনে কী বলে, কমরেড কথা কও) এই পরিবর্তনের শৈল্পিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার সচেতন শিল্পী সত্ত্বায় অনিবার্যতাও নির্দেশ করেছেন লেখক। সেখানে তিনি লেখেন ''এটা হয়। মনের ভাস্তাব হলে মানুষ এমনিভাবে বদলে যায়। আদর্শ যদি মনে ধরে মূকও বাচাল হয়। পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে।'' (পেছনে কী বলে , কমরেড, কথা কও)। সাধারণ জীবন যাপন ও সততার জন্য মানুষ তাকে 'গান্ধীবাবা' করে ডাকত। তার পোষাক বলতে আধময়লা ধুতি আর মোটা কাপড়ের রেডিমেড পাঞ্জাবি। নিজে হাত পুড়িয়ে রেধে খায়। মদগাঁজা - বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি নেশাকে জয় করে নেয় সে। সেই চরিত্রটির প্রকৃতি পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই চরিত্রটির সম্পর্কে তিনি বলেন - ''সারাটা জীবন দেশোদ্ধার করে বেড়ালে। কিন্তু কোন দিন মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে শিখলে না। চিরটা কাল ভাবের ঘোরে কাটিয়ে দিলে। ভাবের ঘরে চুরি করনি তো কী হয়েছে।'' (পেছনে কী বলে কমরেড, কথা কও সে জীবনের একটি বড় সময় নিয়ে কারখানায় শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেয়। মিছিলের আগে আগে পা মেলায় সে। একদিনের রাজনৈতিক সংঘাতে লাঠির আঘাতে তার শরীরের ডানদিক পক্ষাঘাতে অসার হয়ে যায়। হাসপাতালে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রকমারি নল লাগিয়ে দেখতে যায় গিরিধারী। সেই গিরিধারী রুক্মিনীকে বিয়ে করে রুক্মিনীর দুটি বাচ্চা সহ। ডাক্তারী মতে গিরিধারী কোনোদিন সন্তানের পিতা হতে পারবে না। সে এখন সেই রুক্মিনীর বাচ্চা দুটোকে সন্তানস্নেহে ভালোবাসে। লেখক এই ঘটনার প্রসঙ্গে ভাইসাহেব এর মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন। তার সম্পর্কে লেখক বলেন ''কী যেন বল তোমরা নিজেদের? বস্তুবাদী উহু, শুধু বস্তুবাদী নয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। কেউ তোমাকে ভাববাদী বললে রেগে টং হও। তোমাকে অবাস্তববাদী বললে বরং সত্যের কাছাকাছি হয়।'' (বায়ে চলো ভাই, বাঁয়ে / কমরেড, কথা কও)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ গিধধড় এই পরিচ্ছেদে গিরিধারী চরিত্রের পরিচয় পাই আমরা। এই চরিত্রের মধ্যে লেখকের এক সংগ্রামী শ্রেণীর মানুষের পরিচয় আমরা পাই। পরিচ্ছেদের শুরুতেই লেখক লিখেছেন - ''একবার ভেবে দেখো তো গিরিধারীর মত মানুষেরা কী অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে!'' গিরিধারীর পরিচয় দিচ্ছেন লেখক এভাবে- ''ওর ঠাকুর্দা ছিল গাঁয়ের চৌকিদার। নিজেদের হিন্দু বললেও উচ্চবর্ণদের কাছে ওরা ছিল জলঅচল। ছোটলোক ইতর। খাদ্যাখাদ্যের কোনো বাছবিচার ছিলনা। ইল্লত বলতে যা বোঝায়। ওরা মনে করে দানবকুলে ওদের জন্ম। রাহু ওদের পূর্বপুরুষ'' । (গিধ্ধর/কমরেড, কথা কও)। গিরিধারীর বাবা ছিলেন ভারি ডাকাবুকো লোক। কোনো রকম অন্যায় তিনি সহ্য করতেন না। তিনিই গিরিধারীকে গিধ্ধর বলে ডাকতেন। মা-এর মৃত্যুর পর গিরিধারীর বাবা অতিরিক্ত মধ্যপান করে ও নর্দমায় পড়ে মারা যায়। সেই গিরিধারীর পূর্বপুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক অসামান্য শিল্পদক্ষতায় পুরাণ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ (না, কমরেড না)। এই পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক ভাইসাহেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার আঘাতের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেনঃ ভাইসাহেবের উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক তাই বলেন ''তোমাকে মারল, আর তুমি চুপ মেরে গেলে। এটা কোনো কথা হল, ভাই সাহেব? আর কিছু না হোক, যারা মারল, তাদের ধুড়ধুড়ি তো নেড়ে দিতে পারতে। হারামজাদা বেজন্মারা আবার মানুষ নাকি? তোমার সঙ্গের লোকগুলোই বা কী! এমনই ভেড়ের ভেড়েসে, তোমাকে পড়ে যেতে দেখেই চোঁ চোঁ পালিয়ে গেল? ওদেরই না তুমি কমরেড কমরেড বলে এতদিন মাথায় তুলে নেচেছ! আহা, কী দিরির কমরেড!'' (না, কমরেড না / কমরেড, কথা কও) এই কমরেড শব্দটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশেষে কত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আবেদন সৃষ্টি করে আবেগের প্রবাহ বয়ে নিয়ে আসে আলোচ্য পরিচ্ছেদে লেখক তার প্রয়োগিক দিক উল্লেখ করেছেন। এতে এই বিদেশী শব্দটির প্রতি লেখকের ব্যক্তি মানুষের দুর্বলতার প্রকাশ দেখতে পাই আমরা। এখানে 'কমরেড' শব্দটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টির প্রয়োগ দেখিয়ে লেখেন ছাড়া পাওয়ার আনন্দে তুমি ভুলেই গিয়েছিলে যে, দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ নেই। ঠিক সেই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ডাক ভেসে এল 'কমরেড'। --- একটা পরদেশী শব্দ মুখের কথায় উঠে এসে কানে যে এমন মধু ঢেলে দিতে পারে, জেলগেটের বাইরে এসে সেই প্রথম তুমি তা উপলব্ধি করেছিলে।'' (না, কমরেড না/ কমরেড কথা কও) জেলজেটের বাইরের রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয় পরিজনদের ভিড় থেকে বিশ বাইশ বছরের কমরেড

আলম 'কমরেড' শব্দটি দ্বারা ভাইসাহেবকে সম্বোধন করলে সেই শব্দটি তার হৃদয়ে মধুর আবেদন সৃষ্টি করে। লেখকের উপলব্ধিতে সেই মধুর ডাকটি যেন একমাত্র তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। লেখকের কাছে সেই শব্দটি যেমন মধুর, তেমনি বিপ্লবাত্মক। লেখক এই পরিচ্ছেদে নিজেই বলেন ''কমরেড এর মতন এমন একটা বিপ্লবাত্মক শব্দ শেষ পর্যন্ত তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেল।'' (না, কমরেড না/ কমরেড কথা কও)।

ভাইসাহেব কে জেল থেকে বেরোনোর পর যে আলম নিতে এসে ছিল সেও বিয়ে সাদি আর করে না। টেকলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হয়ে ওঠে সে। তার পরিচয় দিয়ে লেখক বলেছেন - ''যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু ছিল না। তাদেরও ভরসাস্থল ছিল আলম। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে আলমের ছিল ওঠা - বসা দিন দুনিয়ার সমস্ত খবরই ছিল তার নখ দর্পণে।'' (পায়ের নিচে শেকড়/কমরেড কথা কও)। লেখক আলমের চরিত্র - প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন - ''তাছাড়া আলমের দলই তো পাড়ার রক্ষেকর্তা। ফি বার মহরমে আলমের দল লাঠিখেলা দেখায়, হায়-হাসান হায়-হোসেন করে। দাঙ্গার সময় রাত জেগে মোড়া পাহারা দেয়। কারো বাড়িতে অসুখ বিসুখ করলে এমনকী রাত বিরেতেও ডাক্তার ধরে আনে''। (পায়ের নিচে শেকড়/কমরেড, কথা কও। ভাইসাহেবই আলমকে শিখিয়ে পড়িয়ে কমিউনিস্ট করেছে। গিরিধারী ও আলম - ভাইসাহেবের হাত ধরেই পার্টিতে এসেছিল। ভাইসাহবকে পার্টির সকলেই অভিভাবকের মতো মান্য করে। অথচ সেই ভাইসাহেবের মাথায় কেউ বাঁশের বাড়ি মারতে পারে একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। পার্টি তখন দ্বিধাবিভক্ত হলেও সেখানকার পার্টিটা ভাই সাহেবের হাতেই গড়া। মূলতঃ ভাইসাহেব পার্টির সবাইকে অন্তঃপ্রাণ করে নিলেও তাঁরা সবাই যে ভালোমানুষ নয়, অন্ধ আবেগে তিনি তা কখনো বিচার করে দেখেননি। পার্টির ভেতরকার মতলববাজ, সুবিধেবাদী স্বার্থপর পার্টি সদস্যদের খারাপ দিক টিকেও ঔপন্যাসিক আলমের দৃষ্টিতে উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন। তাদের কথায় লেখক বলেন ''আলম অবশ্য আগে থেকেই ট্রেড ইউনিয়নে ছিল। তবে যাদের সঙ্গে ও তখন কাজ করত তারা ছিল এক নম্বরের হারামি। মতলববাজ সুবিধেবাদী। মজুরদের নাচিয়ে দিয়ে মালিকদের সঙ্গে দর কষত। তাল করত ইলেকশনে দাঁড়াবার''(বেনো জল/কমরেড, কথা কও)। পার্টিতে নতুন ঢুকে একটা শ্রেণী সামাজিক স্বাভাবিক সম্পর্কে যে বিভাজন এনেছিল তাকে উপন্যাসের অন্তভুর্ক্ত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সামাজিক সম্পর্কগুলো এই নব্য মার্ক্সবাদীদের আচরণে একটু একটু করে বিভাজনের রূপ নিয়েছিল। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে শিল্পে রূপ দিয়ে লেখেন - ''পার্টিতে যারা নতুন এসেছে তারা অনবরত ওকে খোঁটা দেয়। বলে কমরেড, সেদিন দেখলাম ভাইসাহেবের সঙ্গে হেসে হেসে কথা

বলছেন। কেন? কংগ্রেসের পা চাটাদের সঙ্গে কিসের অত ঢলানি? সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে-চাপা লড়াইয়ের ভূত ঝাড়াবার জন্যে ওঝা সেজে ওরা কেবল শান্তি শান্তি করে। ওদের একেবারেই কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, কমরেড। মন থেকে বুর্জোয়া মায়া-দয়া মুছে ফেলুন। নইলে নিজেও ডুববেন, পার্টিটাকেও ডোবাবেন। পার্টির এই সব ছেলেছোকরাদের দেখে আলম কেমন ঘাবড়ে যায়। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। এমন চ্যাটাং করে কথা বলে যে, আলমের ইচ্ছে করে ঝামা দিয়ে ওদের মুখগুলো ঘষে দিতে।'' (বেনো জল / কমরেড, কথা কও)। আলমের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে লেখকের সামাজিক সম্পর্কের বিভাজনের প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পাই আমরা।

উপন্যাসে লেখক সমকালের মার্কসবাদী ও কংগ্রেসী নীতিবাদের দ্বন্দ্বের শিল্পিত রূপদানের প্রয়াস রেখেছিলেন। ভাইসাহেব চরিত্রটির মধ্যে নীতির বিরোধ থাকলেও সামাজিক বোধ ও জাতীয়তাবোধের মমত্ব এতটুকু ঘাটতি ছিল না। ফলে তাঁর ব্যক্তিমানসের এই প্রকৃতির কারণে পার্টিতে তিনি ক্রমশঃ বাতিলের তালিকাভুক্ত হতে বসেছিলেন। অথচ যে সমাজের কাছে ভাইসাহেব আজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছেন, সেই সমাজেই ''একেবারে গোড়ার যুগে ভাইসাহেব এসে মজুরদের ক্লাস নিতেন। আদ্যিকালের সমাজ কেমন ছিল, ধাপে ধাপে কীভাবে তার বদল হল। কেমন করে মানুষে মানুষে ফারাক হল। শ্রেণীভেদ দেখা দিল। শ্রেণী সংগ্রামের ভেতর দিয়েই কীভাবে মানুষ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগোবে। ভাইসাহেব এই সব জলের মত করে বোঝাতেন। সেই ভাইসাহেব আজ কোন মুখে বলেন যে, দেশভক্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে?'' (চোখের ছানি/ কমরেড, কথা কও)। এখানে ভাইসাহেবের সামাজিক বোধ ও সমকালের কংগ্রেস সরকারের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল মাক্সবাদীদের মানসপটকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অসুস্থ ভাইসাহেবকে হাসপাতালে পার্টির অজান্তে দেখতে যাওয়ার আগ্রহ ও আশঙ্কা প্রকাশ পায় আলম চরিত্রে। পার্টির এককালের সংগঠক তার সামাজিক মতপার্থক্যের কারণে ও উচ্চ আদর্শের কারণ ও উদার চিত্ততার প্রকাশে পরিত্যক্ত হয়েছেন। এখানে পার্টির সংকীর্ণতার রূপটিকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিয় কাঠামোতে রাজনীতি সমাজের প্রত্যেক অঙ্ককেই নিয়ন্ত্রণ করে। সেই বিশেষ দিকটিকে ঔপন্যাসিক ভাইসাহেবের অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে শুশ্রষার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। লেখক গিরিধারী ও রুক্মিনীর কথোপকথন প্রসঙ্গে লেখেন 'কী গো! আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেল। না খুলল চোখের পাতা, না বেরোল গলা দিয়ে একটা টু শব্দ। শুধু ঠোঁট দুটোই যা থেকে থেকে নড়ে উঠছে। তুমি তো কিছুই লক্ষ করছ না হে! ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসার পর এলেবেলে একটা

বেড়ে তোমাকে ফেলে রেখেছিল। দু-চারটে টেলিফোন আসতেই ওপর মহলের টনক নড়ে। এখন তুমি কেবিনে। চব্বিশ ঘন্টা পালা করে দু-দুটো নার্স তোমার দেখভাল করছে'' (বুকের পাটা/কমরেড, কথা কও)। যে নার্স মেয়েটি ভাইসাহেবকে দেখভাল করছে তার বাবার সঙ্গে একই জেলে অনেকদিন কাটিয়েছিল ভাইসাহেব। একই জেলায় তাদের বাড়ি। সেই জেলখানাতেই কমিউনিস্ট হয় ভাইসাহেব। সারাদিন জেলে বই মুখে করে বসে থাকে। সে সময়ও তার পুরনো দলের লোকেরা গায়ের জ্বালায় তাকে পিটিয়েছিল। এরপর থেকে ভাইসাহেব সর্বহারার সেবায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন নিয়েছিল। সেই নার্স মেয়েটি আজ রাজনৈতিক নেতাদের ফোনে ও তাগিদে কর্মসূত্রে সর্বদা মুখে হাসি নিয়ে ভাইসাহেবের সেবা করে চলেছে। অথচ তার পারিবারিক অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। সেবার এ এক কঠিন রূপ দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে। সেই মেয়েটির কথায় ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন ''একটু উত্তেজনা হলেই বাবার হাঁপানির টান দেখা দেয়। তখন তাঁকে ওষুধ দাওরে, ঘুম পাড়াওরে। মেয়ে হয়ে জম্মানোর কম ঝকমারি, ছেলেটা কাদা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কোন রকমের দুটো নাকেমুখে গুঁজে দৌড়ে এসে ওকে ট্রেন ধরতে হয়েছে। মা হেঁসেল ঠেলেন, ঘরসংসার সামলান তাই রক্ষে। মা-রও কী খোয়ারের জীবন। ভবকা ছেলেটা ভিড়ে ট্রেন থেকে পড়ে চাকার তলায় চলে গেল। দাদা তখন সবে ফুড কর্পোরেশনের গুদামে একটা চাকরিতে ঢুকেছে। পেটে একটা ছেলে ধরিয়ে দিয়ে স্বামী অন্য একজনের বউ নিয়ে কেটে পড়ায় সেই থেকেই মেয়ে তার বাপের বাড়ির গলগ্রহ। দাদা মারা যাওয়ার পর নার্সের ট্রেনিং নিয়ে নিজের চেষ্টাতেই হাসপাতালের এই বাড়ির সংসার এখন ওর রোজগারেই চলছে। মেয়েই এখন বুড়ো বাপ-মার ভরসা।'' কেমলি ছাড়ে না/ কমরেড কথা কও)। যে নার্স মেয়েটি তার শ্রম দিয়ে ও হাসিমুখে সেবা দিয়ে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলছে ; তার হাসিমুখের আড়ালে যে নিদারুণ বেদনা নিমজ্জিত তা শিল্পে তুলে ধরে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ 'পিসে মশাইয়ের ডায়েরি'। এই পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক ডায়েরী লেখায় পারিবারিক মানুষজনের আচরণের ভালো দিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। লেখকের পরিবারের পিসেমশাই ডায়েরী লিখে রাখার জন্য বাড়ির লোকেরা নিজেদের আচার আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অনেকবার পুলিশ হানা দিয়ে ভাইসাহেবের বাড়িতে ডায়েরী ধরনের কিছু তথ্য আবিষ্কার করতে চেয়ে কেবল ছিটকাপড়ের একটা খোলের মধ্যে জোড়ানো এস্রাজটিই দেখতে পেয়েছিল। লেখক এ সম্পর্কে লেখেন ''বাইরের লোক বলতে, পুলিশ যে কবার খানাতল্লাশিতে

এসেছে, তারাই শুধু ওটা খুলে দেখেছে। বিপ্লবীর ঘরে- বোমা নয়, পিস্তল নয়- চিমসে পড়া একটা এস্রাজ। দেখে ওদের খুব মজা লেগেছে''। (পিসেমশাইয়ের ডায়েরি/কমরেড, কথা কও)।

এরপরের পরিচ্ছেদ 'ডায়েরির খোলসে' এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের একটি ডায়েরীর কথা জানা যায়। সেই ডায়েরীতে ভাই সাহেবের কিশোর কবি সুকান্ত অনুকরণ করে কিছু পদ্য ধরনের লেখার চেষ্টা দেখা যায়। ভাইসাহেব সুকান্ত বলতে অজ্ঞান ছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের চরিত্রের আদলে কবি সুকান্তের প্রতি ঔপন্যাসিকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। রেড এড কিওর হোস - এর যে বেডে সুকান্ত কে রাখা হয়েছিল ঠিক তার পাশের বেডে রেখে উপন্যাসে ভাইসাহেবকে চিকিৎসা করান লেখক। আবার একালের মানুষ হলে সুকান্তকে ক্ষয়রোগে হয়তো ইহলোক ত্যাগ করতে হতো না - এই আক্ষেপও প্রকাশ করেন আলোচ্য অংশে। ভাই সাহেবের প্রতি ঔপন্যাসিকের অধিক গুরুত্ব প্রকাশ করতে দেখি আলোচ্য পরিচ্ছেদে- ''কিছু কিছু ব্যাপারে তুমি যে ভয় পাও, ভাইসাহেব এটা তোমার চরিত্রের একটা ভাল দিক। যারা বীর, তাদের কোনো ভয়ডর থাকে না। একথা ঠিক নয়। তাদেরও ভয় থাকে। মাথা হেঁট হওয়ার ভয় সেই ভয়েই তারা সাহসী হয়।'' (ডায়েরির খোলসে/কমরেড কথা কও) । এই পরিচ্ছেদে মাধবের মা চরিত্রটির কথা পাই আমরা। সেই ভাইসাহেবের করুণ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখের জল ফেলে।

এর পরের পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম তিনির ঘরে দুই শহিদ। এই অধ্যায়ে মাধবের মা যে মৃতপ্রায় ভাইসাহেবের ঘরে এসেছে তার মধ্যে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে মাধব ও কার বাবা অধরের শহীদ হওয়ার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সে জন্য লেখকের জিজ্ঞাসা ''ওর যে অত ফুলে ফুলে কান্না , সে কি শুধু তোমারই জন্যে? মাধবের জন্যে! নাকি মাধবের বাবার জন্যে ?'' মাধব ও অধরের কথায় লেখক জানিয়েছেন ''মাধবের বাবা অধর ছিল বোস্টমের ঘরের ছেলে। গলায় তুলসির মালা নিয়েই অধর কমিউনিস্ট হয়েছিল। এখানকার চটকলে তাঁতঘরে কাজ করত। কোনরকম নেশাভাঙ করত না। কারো সাতে-পাঁচে থাকত না। ওর কাজ ছিল শুধু মিছিল মিটিঙে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ঝান্ডা বওয়া। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল ওর কাল। খাদ্য আন্দোলনের সময়ে পুলিশের গুলিতে অধর মারা গেল। ঝান্ডা নিয়ে ও ছিল মিছিলের ঠিক সামনে। সেটা ছিল কংগ্রেসের আমল।'' (তিনের ঘরে দুই শহিদ কমরেড, কথা কও)। কংগ্রেসের আমলে পার্টির সংঘর্ষে কেবল লাল ঝান্ডা উড্ডীন রাখতে কত শত প্রাণ শহীদ হয়েছে তার শিল্পিত রূপ মাধবের বাবা অধর। তার হাতে ঝান্ডা না থাকলে সে হয়তো ছুটে পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ অধর ঝান্ডা হাতে মিছিলের আগে থাকায় ও হাতের ঝান্ডা উঁচু রাখার চেষ্টায় শহীদ হয়ে যায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে। সেই

অধরের প্রতি আন্তরিক বেদনা গভীর রেখায় প্রকাশ করেন ঔপন্যাসি। তিনি ভাইসাহেবের মর্মবেদনা প্রকাশ করতে লেখেন - ‘‘শহিদ অধরের বডি স্তূপাকার ফুলে ঢেকে লরিতে করে এখানে আনা হয়েছিল। বোধহয় শরীরটা ফুলে যাওয়ার জন্য তার তুলসির মালাটা গলায় এঁটে বসে গিয়েছিল। তাই দেখে ভাইসাহেবের মনে মনে সে কী অশান্তি মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওর যে দম বন্ধ হয়ে যাবে। অধরকে যখন মাটি দেওয়া হয়, পার্টির বড় বড় নেতারা বজ্রমুষ্টি তুলে ‘ভুলো মাৎ’, ‘ভুলো মাৎ’, বলে তাকে অভিবাদন জানালেন। চাচাসাহেব তাদের পেছনে। তাঁর চোখ দিয়ে সমানে টপটপ করে জল পড়ছিল।’’ (তিনের ঘরে দুই শহিদ/কমরেড, কথা কও)। পার্টি কর্মীর মৃত্যুতে কমরেড ভাইসাহেবের মর্মবেদনা অত্যন্ত নিখুঁত তুলির টানে নিজস্ব ভাষা শৈলীতে ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে রাজনৈতিক সত্ত্বা। কমরেড কথা কও’ উপন্যাসের ষোড়শ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম ‘যেদিন গুরুবার’। এই পরিচ্ছেদে অধর এর বাড়ির সঙ্গে ভাইসাহেবের সম্পর্কের একটি সূত্র নির্ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। অধর প্রতি বৃহঃস্পতিবার নিয়মিত লক্ষ্মীর পাঁচালী পাট করত। সেই পাঁচালীতে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে পাঠ শেষে পেট ভর্তি নিনি খেয়ে বাড়িতে ফিরত ভাইসাহেব। অধর মারা যাবার পরও দু’ দিন মাধবের বাড়িতে খায় ভাইসাহেব। কিন্তু মাধবের বাবা না থাকায় কোথায় যেন একটা সুর কেটে যাওয়ার ভাব জেগেছিল ভাইসাহেবের। থান পরে ছোট করে ছাঁটা চুলে কেমন যেন দেখাচ্ছিল মাধবের মাকে। অধর মারা যাবার পর তার বাড়িতে দু’ দিন পুরোহিতের মুখে পাঁচালী শোনে ভাইসাহেব। পুরোহিত লক্ষ্মীর ব্রত পালনের ফলে জনৈক রমণীর সমস্ত দুঃখ ও দীনতা মোচনের পর পুত্রসন্তান লাভ, নীরোগ শরীর অপার ঐশ্বর্য লাভের কথা বলেন।এই সুসমঞ্জস্য প্রসঙ্গে নারীদের পাঁচালী ও ব্রত কথা পালনের বিষয়টি উপন্যাসে অসাধারণ শিল্প দক্ষতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন উপন্যাসিক।

এই উপন্যাসের সপ্তদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল ‘এক দুই তিন। ’ এই পরিচ্ছেদে অধর ও মাধবকে দিয়ে দুই প্রজন্মের জাতীয় রাজনীতির দুটি কালকে নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই দুই সময়কে নির্দেশ করে লেখক বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে লেখেন ‘‘বোষ্টমের ঘরের ছেলে অধর কমিউনিস্ট হয়েছিল ভালবাসার টানে। ‘সবার উপর মানুষ সত্য’ ছিল তার রক্তে। অধর যখন খুন হয়, সরকারে তখন কংগ্রেস। তার ছেলে মাধব হয়ে গেল নকশাল। পাইপগান হাতে নিয়ে সে খুন হয়। তার মধ্যে ছিল শুধু ক্রোধ আর ঘৃণা। রাজ্যে তখন সরকারে কমিউনিস্টরা।’’ (এক দুই তিন কমরেড, কথা কও)। এই শহীদ পরিবারে আরো একটি প্রজন্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক, এখানে তাঁর আশাবাদ ও জীবন সংগ্রামে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহৎ জীবনদর্শন উপলব্ধি করি এখানে। অধর ও পরে মাধব মারা

গেলে, মাধবের এক ছেলের হদিশ পাই আমরা। মাধব মারা যাবার পর তার বউ ছেলে বস্তি ছেড়ে উঠে গিয়েছে রাস্তার ধারের একটি ঝুপড়িতে।

এর পরবর্তী অষ্টাদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম 'আলমনামা'। এই পরিচ্ছেদের একেবারে শুরুতে আলমের ফেস্টুন ও পোস্টার হাতে সদলবলে ইলেকশনের প্রচারে বেরোনোর ছবি দেখি আমরা। কিন্তু লেখকের জিজ্ঞাসা আলমের দায়িত্বে এই এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও আলম এই এলাকায় কেন।? পার্টিকর্মী ভাইসাহেব বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ''আসলে কোনো একটা ছুতো বার করেছে হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়া। যেতে যেতে কেবলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। ওর মুখে একটা ছটফটে ভাব। আগ বাড়িয়ে ছুটে এসে তোমাকে একটু দেখে যাবে কিংবা নিদেনপক্ষে একটা খবর নিয়ে যাবে, তার উপায় নেই। পার্টির বারণ আছে। ভাইসাহেব যে দলছুট। বলিহারি যুক্তি ওদের। যারা ছেড়ে গেল তারা দলছুট নয়, যে থেকে গেল সে দলছুট।'' (আলমনাম/কমরেড, কথা কও) এই পরিচ্ছেদে আমরা আলমের বাবা বদরু মিঞা চরিত্রের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে লেখকের ধর্মসচেতন মানবিক চেতনার পরিচয় আমরা পাই। ধর্মীয় চেতনায় বদরা মিঞা পাপ পুণ্যের বিষয়টি পাড়ার মানুষকে মজলিশ বসিয়ে শোনায়। তিনি কোরান,হাদিস পাঠ করে তার সার কথা শোনান। সেখানে বলা হয় সব মানুষই আদমের সন্তান। তাই ''গোড়ায় ছিল সবাই এক । জাতের বালাই পরে এসেছে। মানুষ মাত্রই হল সোনা রুপোর খনি। যে অত্যাচার করে, পরলোকে তার জন্যে শুধু অন্ধকার। জোর করে কেউ যদি কারো জমি কেড়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সেই জমির নিচের সাত পরত জমি তার গলায় হাঁসুলি করে বেঁধে দেওয়া হবে। অগাধ ধনে সুখ নেই। সুখ মানুষের মনে। পৃথিবীতে অতিথি হয়ে থাকো। কয়েদি হয়ে নয়।'' (আলমনামা/কমরেড, কথা কও)। এখানে মানুষের জীবনের মূল্যবোধ, পাপ বোধ ও পুণ্য চেতনা সম্পর্কে মানুষকে জনআলোড়ন সৃষ্টি করতে জাগরণের প্রয়াস রেখেছেন লেখক, ক্ষমতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, ক্ষমতার লোভে ভাই-ভাইকে আঘাত করে। যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের স্থান বেহেশতে হতে পারে না; তাদের স্থান জাহান্নমে।

'কমরেড, কথা কও' শীর্ষক উপন্যাসে উনিশতম পরিচ্ছেদ 'নজরদারি'। এই পরিচ্ছেদে রাজনীতিতে ক্ষমতাবান মানুষ ও সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার বৈপরীত্য সাহিত্যের অঙ্গ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একজন পার্টি কর্মী সারাজীবন নিজেকে পার্টির সেবায় নিযুক্ত করে গেছেন নিলোভ নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠার সঙ্গে। অথচ অসুস্থ অবস্থায় পার্টি তা অপ্রয়োজনীয় করে রেখেছে তার এই দুঃসময়ে। এমনকি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে সহযোগিতা করে এসেও আজ তেমন কারো টান দেখছেন না লেখক। অথচ সেই পার্টিকর্মী স্বার্থপর হয়ে কোনোভাবে এম এল এ, এম পি হতে পারলে

জীবনে কতটা করত তা নির্দেশ করেছেন লেখক। এখানে রয়েছে সাধারণ মানুষ জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে যতটা ভোগবাদী হয়ে ওঠে তার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক ''তখন পেত রক্তের স্বাদ। দিল্লিতে বারলোবাড়ি, মায় অ্যাটেন্ডান্টেরও ফার্স্ট ক্লাস টিকিট; ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে গিয়ে বসে, তেমনি আজ এখানে পার্টি, কাল সেখানে পার্টি, নানা রঙের নানা রসের দিন; সরকারি লোকেরা স্যার স্যার করবে; আজ এ কমিটিতে কাল সে কমিটিতে; তাছাড়া দুনিয়ার এক ষষ্ঠাংশেরও বেশি জায়গায় ইচ্ছেমত তীর্থদর্শন করে আসতে পারত। দলও তখন পাত্তা না দিয়ে পারত না।'' (নজরদারি/কমরেড, কথা কও)। পার্টি সামাজিক মানুষের জনজীবনে যে সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছিল তা পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে ভাইসাহেবের শ্রমিক সংগঠনের প্রসঙ্গে উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন লেখক, যা উপন্যাস শিল্পের অঙ্গ হয়েও সামাজিক দলিল হয়ে ওঠে এখানে।

উপন্যাসের বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'বাড়ানো হাতে' । এই পরিচ্ছেদে কোনো পরিবারের ছেলে মেয়েরা আবেগে পার্টির কাজে যুক্ত হওয়ার পর তাদের মাতা পিতার প্রতিক্রিয়া এবং সমকালের ছাত্র-যুব সমাজের পার্টিতে যোগদানের পর, তাদের জীবনযাত্রার শৈলীকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সুমনের মায়ের সাধ ছিল ছেলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ফরেন সার্ভিসে উঁচু পদে চাকুরী করবে। খুব কম হলেও সে আই পি হবে। পার্টিতে যোগদান করার সংবাদ শুনে সুমনের মায়ের চোখ কপালে ওঠে যায়। অবশ্য তার বাবা এতে মনে মনে খুশী হয়। তার বাবার কথায় এক শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। সুমনের বাবার কথা ''আড়ালে ওঁর স্ত্রীকে বোঝান। এখন পলিটিক্সের চেয়ে ভাল কেরিয়ার কী আছে? দেখছো না, যাদের কোনো গুণ নেই, শুধু লোক চবিয়ে খায় - তারাই এখন পতিতপাবন মিনিস্টার। মনে মনে শালা বললেও মুখে কিন্তু স্যার স্যার বলছি।'' (বাড়ানো হাতে/কমরেড, কথা কও)। সুমন নাগরিক জীবনের আদব কায়দা থেকে বেরিয়ে আসে । সে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, দেঁতো হাসি দারোয়ান- আর্দালি, মাসি-পিসি, আদব-কায়দা মাপা কথা কপট ভদ্রতার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে ''সুমন কোথায় লীডার হবে, তা না ও হয়ে গেল বস্তির লোকদের ইয়ার দোস্ত। ওদের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের মুখ থেকে এঁটো সিগারেট টেনে নিয়ে খায়। ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি খিস্তি শিখেছে। সেই সঙ্গে ফচকে ছোড়াদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে হিন্দি সিনেমার গান গায়। তারপর শহরে তার সেই নীরক্ত পান্ডুর কৃত্রিমতার জগতে ফিরে গিয়ে সুমন বোমা ফাটায়। (বাড়ানো হাতে/কমরেড কথা কও)। সুমন তার বাবার ইচ্ছেতে অধঃপতনের জীবন থেকে সরে এসে স্টেটস এ চলে যায়। যাওয়ার পর সে পার্টি অফিসে একটি দেওয়াল ঘড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেটা পার্টি অফিসে টাঙানো থাকে। এর ঠিক তিনমাস পর গাড়ি দুর্ঘটনায় সুমনের অকাল

মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর দু-তিন মাসের মধ্যে জয়ন্তীও এক বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে মোটা মাইনের কাজ নিয়ে মুম্বাই চলে যায়। সেখানকার ইন্টারভিউতে সে শ্রমিক ইউনিয়নের জনসংযোগের অভিজ্ঞতার কথা বলে। তবে ''মেয়েদের মুখে যেসব কথা শুনে ওর কান লাল হয়ে যেত, রাস্তায় দু-একদিন মাতালের পাল্লায় পড়ে ওকে যে বেইজ্জত হতে হয়েছিল, মেয়ে মজুরদের ওপর কারখানা কর্তৃপক্ষ আর ঠিকাদাররা যে কী অমানুষিক অত্যাচর চালায় - সে-সব কথা জয়ন্তী একেবারেই বলেনি।'' (বড়ানো হাতে/কমরেড কথা কও) কলকারখানা, মালিক ঠিকাদারদের কাছে নারীর অসহায়তার ও অমানবিক অত্যাচারের করুণ ছবি এঁকে লেখক নারীর প্রতি দায়বদ্ধ সমাজ সচেতন শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন এখানে।

উপন্যাসের তেইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'চাওয়া পাওয়া'। জনসংযোগে মানুষ যে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাতে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার সামর্থ্য তৈরী হয়। এই অভিজ্ঞতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছিলেন লেখক জয়ন্তী চরিত্রে। জয়ন্তী ওর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে জীবনের প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একসময় বাচাঁর ইচ্ছেটাকেই হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথম থেকেই সে ছিল নরম প্রকৃতির মানুষ কেবল স্বপ্ন দিয়েই সে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতো নিজের মধ্যেই। তার সাধারণ জীবনে একটা সংসার নিজের সাধের সন্তান এই স্বপ্নই এতদিন দেখে এসেছিল জয়ন্তী। কিন্তু প্রথম প্রেমে ব্যর্থ এবং দ্বিতীয় বারে মতা সুমনের অকাল মৃতু তার স্বপ্ন কাগজের নৌকার মতো ভেসে যায়। সেই স্বপ্নভঙ্গের জীবনে জয়ন্তী জনসংযোগে বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পায়। সে রাজনীতিতে ডুব দিয়ে জনসংগঠনের সংযোগের কথায় বলে ''নইলে আমি কি ভাইসাহেবের মত মানুষের নাগাল পেতাম? কিংবা বস্তির সেই মানুষগুলোর কাছে যাওয়ার মত সাহস হত? না গেলে মানুষের ওপর হারানো বিশ্বাস আমি ফিরে পেতাম?'' (চাওয়া/পাওয়া /কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের চব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম। যা নয় তাই এই পরিচ্ছেদে নারীর ঈর্ষা রুক্মিনী চরিত্রে দেখিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সমকালের সামাজিক অবস্থান ও মতাদর্শের পার্থক্য তুলে ধরেছেন লেখক। ভাইসাহেব একদিন বাজারের রাস্তা দিয়ে জয়ন্তীর ঘাড়ে একটা হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছিল। রুক্মিনী দূর থেকে দুজনকে এক সঙ্গে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে ''তাতেই রুক্মিনীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে পড়ে নাক দিয়ে একটা হু শব্দ করে হঠাৎ পেছন ফিরে ও যেন গট গট করে হাঁটাদিল যে রাস্তার লোকে অবাক। ঠিক যে রকমটা সিনেমা থিয়েটারে দেখা যায়।'' (যা না তাই/কমরেড, কথা কও)। এখানে লেখক রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে শিল্প নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে চরিত্রের

স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে তাকে রক্ত মাংসের মানুষের জীবন্ত চরিত্রের রূপদান । লেখক এই পরিচ্ছেদে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড ঘোষালের ভাবনায় সমকালীন পার্টির অভিমুখকে শিল্পের অঙ্গ করে তুলেছেন। সেই কথায় লেখক বলেন - " আর তামাদের দিল্লির সেই বড় নেতা গো! কমরেড ঘোষাল। সোভিয়েট পার্টির বিশতম কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে পার্টিরই কাগজে নাকি লিখেছিলেন রেড স্কোয়ারের চত্বর থেকে কাঁচের বাক্সবন্দী স্তালিনকে তুলে নিয়ে গিয়ে যে কবর দেওয়া হয়েছে, সেটা হয়েছে খুবই উচিত কাজ। লেনিনকেও ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। এতো এক রকমের মূর্তিপুজো। কমিউনিস্টরা কেন তার প্রশ্রয় দেবে সেই সঙ্গে একথাও নাকি ঘোষাল লিখেছেন যে, সোভিয়েট অন্য অনেক দিকে এগিয়েছে, কিন্তু একটা দিকে এখনও পিছিয়ে আছে সেটা হল গণতন্ত্র।" (যা নয় তাই/কমরেড, কথা কও)। সেকালে পার্টির একটা নেতৃস্থানীয় কর্মীদল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে আতাত করার প্রয়াস নিয়েছিল। সেই দিকটিকেও লেখক উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই অভিমুখ দেখা গিয়েছিল উনিশ' আটচল্লিশে। এই মতাদর্শের দিক থেকে পার্টি কর্মীরা সেকালে বিভাজিত হয়ে পড়ে " আমাদের একটু সাবধান হতে হবে, কমরেড। সেনাপতি মশাই দল পাকিয়ে পার্টির হাল ধরার চেষ্টা করছে। শুনে এলাম ভাইসাহেব ওর সাগরেদ। । ওরা এক জেলার লোক। একবার যদি ওরা হাল ধরতে পারে, পার্টির নৌকোটাকে ওরা ঠিক কংগ্রেসের ঘাটে ভেড়াবে।" (যা নয় তাই/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের পঁচিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের নাম 'আশ্বিনের ঝড়'। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেকালে বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছিল একটা প্রচন্ড ঝড়ের বেগ সেকালে বাংলার শাসকদল কংগ্রেস কে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা করেছিল। ফলে সেকালে চলছিল একটা রাজনৈতিক সংঘাত। সেই সময়ে জীবন্ত অভিজ্ঞতার ছাপ পাই আমরা আলোচ্য উপন্যাসে। ভাইসাহেবদের মতো কমিউনিস্ট মতাদর্শের মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতেই লেখক লিখেছেন গোড়ার দিকে ধরা পড়েছিলো। তখন কংগ্রেসের আমল। তবে বেশি দিন জেলে থাকতে হয়নি। ছাড়া পাওয়ার পরই চলে গেল আন্ডার গ্রাউন্ডে।" (আশ্বিনের ঝড়/ কমরেড, কথা কও)। ভাইসাহেবদের কাছে দেশের নেতা নেহেরু সর্ম্পকে নেতিবাদী মানসপটের প্রতিক্রিয়া সমকালের কমিউনিস্টদের সামগ্রিক বোধের পরিচয় আমরা পাই। সেকালে পার্টিকর্মীরা গোপনে আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই রাজনৈতিক ও সমাজবাস্তবতাকে সাহিত্যে রূপদান করেছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসের ছাব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম 'নটে গাছ' । কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সেকালে অনেকেই উগ্রয়ামপ্রন্থা ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়া মেতে উঠেছিল। এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদকে ভাইসাহেব এবং স্বয়ং লেখক কেউই সমর্থন করতেন না। সেকালে কলকাতার ময়দানের সভায় নেহেরুকে হত্যার চেস্টা করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল কয়েকটি কিশোর। যৌবনের বাঁধনহারা আবেগে তারা সেই সর্বনাশা পথে পা রেখেছিল। কিন্তু সেই পন্থাকে অহেতুক ও অযৌক্তিক বলে মনে করেছিলেন সাহিত্যিক। এই ঘটনার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ''এ পর্যন্ত ওরা সবাই একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সমাজতন্ত্রের আদর্শ বুকে নিয়ে শাহীদ হতে যাচ্ছে, এই রকমের একটা ভাবনা ওদের নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। রেশনের থলি হাত থেকে পড়ে যেতেই ওদের চট্কা ভেঙে যায়। এতক্ষণ পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই ওরা দেখতে পচ্ছিল না। কানের মধ্যে শুধু রাবণের জ্বলার আওয়াজ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে ময়দান জুড়ে বিশাল জনসমুদ্র লোকে চিৎকার করে থেকে থেকে নেহেরুর জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাত পা হিম হয়ে আছে। ভয়ে বা আতঙ্কে, নয় ছোট ছেলে মেলায় হারিয়ে গেলে তার যে দশা হয়, ওদেরও তখন সেই দশা বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ একা (নটে গাছ/কমরেড, কথা কও)। ছোট ছোট ছেলেদের প্রচন্ড ভাবাবেগ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে লেখক ভয়ঙ্কর স্খলন বলে মনে করে ছিলেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য পরিচ্ছেদে লেখক দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং সমকালকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের সাতাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম পার্টির ঘরবর। এই শীষনাম প্রদানের ও নির্বাচনের কালে লেখকের রাজনৈতিক অভিমুখ ও রাজনৈতিক চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। পার্টিতে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে লেখকের পূর্বাপর বিশ্লেষণ ''পার্টি তখন ছোট্ট গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে কমবয়সীরা দলে দলে আসছে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে। পুরনো আমলের স্বদেশীদের মতন তারা কি সব গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে? আর তা না পেরে শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সংসারের গর্তে ঢুকে যাবে।'' (পার্টির ঘরবর /কমরেড, কথা কও)। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন যে, কমিউনিস্ট হওয়া কোনো সাময়িক বারব্রত নয়। যে বিষয় হল সারা জীবনের বারমেসে সাধনার বিষয়। কমিউনিস্টরা বিয়ে থা করে স্থিতু হবে কিন্তু পুত্র পরিবার নিয়ে তারা গড়ে তুলবে রেড ফ্যামিলি। এমনকি পার্টির গায়ে যাতে কোনো কাদা না লাগে সেজন্য কমিউনিস্টদের জীবনে যে কোনো ত্যাগ করার মতো নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বড় কস্ট হলেও ভাইসাহেবকে যে কোনো স্খলন বাঁচিয়ে পথ চলতে

য়েছিল। এমনকি পার্টির মহিলা সহকর্মীদের প্রতিও ভাইসাহেব কখনো ভিন্ন নজরে দেখতো না। রুক্মিনীর দিকেও ভাইসাহেব তেমনভাবে তাকায়নি। মহিলাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ কখনো তার হৃদয়ে তেমন দাগও কাটতে পারে নি। অথচ সেই রুক্মিনীর ব্যক্তিজীবনে ছিল অভাবের মরুভূমি। লেখকের কথায় - " ও ছিল পাহাড়ি মেয়ে। বাপ মরা অনাথা। চটকলের এক আধ-বুড়ো দারোয়ান কালীঘাটে মালাবদল করে ওকে বিয়ে করে আনে। লোকটা খারাপ ছিল না। তার একমাত্র ইচ্ছে ছিল রুক্মিনী যেন ওকে একটা ছেলে দেয়। জগতে সবার সব ইচ্ছে তো পূরণ হয় না। ওদের বেলাতেও তা হয় নি রুক্মিনী নিজেও কম চেস্টা করেনি। পীরের থানে গিয়ে ঢেলা বেঁধে এসেছে, মা কালীর কাছে মানত করেছে। তাতেও ওর পেটে ছেলে আসেনি। বীজ, না ক্ষেত্র দোষটা যে কার কেউই তা ধরতে পারেনি, তার একটাই ফল হয়। দিন দিন দারোয়ানের খাওয়া মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে, ও যখন লিভার পচে মারা গেল শরীরটাকে পুঁজি করে রুক্মিনীর তখন লাইনে এসে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় রইল না। (পার্টির ঘরবর/কমরেড, কথা কও)। রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে অত্যন্ত স্পর্শদাতর সমাজ সচেতন শিল্পীমনে লেখকের সমাজের হতদরিদ্র অসহায় যৌনকর্মীদের ব্যক্তি জীবনের করুণ কাহিনী এখানে নাড়া দিয়েছিল। সেই দায়বদ্ধ সমাজ সচেতন শিল্পীর অনুভূতি এখানে উপলব্ধি করি আমরা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আটাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল - (এক নৌকোয় কমরেড কথা কও)। এই উপন্যাসে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের কালের সঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর কালের সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখার প্রকৃতি নির্ণয় লেখকের শিল্পীসত্তায় ক্রিয়াশীল ছিল। সেই প্রকৃতি নির্ণয়ে লেখক ভাইসাহেবের কথায় বলেন - "তোমাদের স্বদেশী জমানার সঙ্গে এ-জমানার যে আকাশপাতাল তফাৎ, সেটা তখন আস্তে আস্তে তোমার মালুম হচ্ছে।বাইরে পা দেওয়া ইস্তক আজ খাদ্য কমিটি, কাল বস্ত্র কমিটি, কার আছে কার নেই সব খুঁটিয়ে জেনে, সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে লিস্টি আর লিস্টি।একদিন যে এসব করতে হবে সেকথা তোমাদের স্বদেশী যুগে কি কখনও ভাবতে পেরেছিলে?তখন চাদরের মধ্যে একটা পিস্তল নিলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগত। দু-মাস জেলের ভাত খেয়ে আসতে পারলেই পুরসভার চাকরিতে তখন পদোন্নতি হত, মাইনে বাড়ত। পরতলার ডাকসাইটে নেতা, নিচের তলার অসম্বদ্ধ জনতা। মাঝে মধ্যে স্বাধীনতার জন্যে লম্ফঝম্প।

এ-জমানায় জাতীয় মুক্তি আর জনমুক্তি পিঠোপিঠি সম্পর্কে এল। স্বাধীনতার পর সংগঠনের খোলে জনশক্তিকে পুরে শুরু হল গদিদখলের লড়াই।" (এক নৌকোয়/কমরেড, কথা কও)। গতিময় জীবনে লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বাধীনতার স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় জীবনকে। স্বাধীনতার উত্তর কালেও ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল তুলনা। লেখক তাঁর বাস্তব

অভিজ্ঞতায় জীবনপণ লড়াই করে ভারতীয়ের নিজের হাতের পাসন ক্ষমতা দখলের পর সমষ্টি মানুষের আশাভঙ্গে মর্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত। স্বাধীনতার এই শোচনীয় রূপ তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। মানুষের ভয় ও জীবনকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সেটা ছিল না। এই রাজনৈতিক চেতনায় লেখকের মানসপটে উঠে এসেছিল আন্তর্জাতিক বোধে ভারতের সম্বন্ধের প্রকৃতি। সেকালে সোভিয়েট রাষ্ট্রবিপ্লব থেকে সরে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য দিয়েছিল। আর চীন সেই বুর্জোয়াদের সরিয়ে শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফাঁকি পূরণ করতে বসেছিল। সেই জাতীয়তার সঙ্গে আন্তজার্তিক বোধে পৌছে লেখক বলেন - " আটচল্লিশের সঙ্গে ষাট বাষট্টির অনেক ফারাক। তখন ছিল লড়াইয়ের চেয়ে পাঁয়তারা বেশি। খাজনার চেয়ে বেশি বাজনা। ,ওদিকে দেশে কমিউনিস্ট মেরে হাতের সুখ করে নিয়ে নেহরুর শখ গেল চীনকে এক হাত নেওয়ার। নেহরুর খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিল চীন। অত যে পেয়ারের সোভিয়েট, সে কিন্তু কড়ে আঙুলটিও নাড়াল না। শুধু বলল, - ভারত আমার বন্ধু, চীন আমার ভাই।" (এক নৌকোয়/ কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল 'ভাঙার গান'। আলোচ্য পরিচ্ছেদে যে 'ভাঙনের' কথা বলা হয়েছে তা হল সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের করুণ ছবি। পার্টিকে আপ্রাণ ভালবেসে যে মানুষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন ভাইসাহেব ক্রমশঃ পেটের তাগিদে ও বাঁচার জন্যে তারা পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। গিরিধারী ভাইসাহেবের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। সেই সময়কার ভাইসাহেবের মানসিক টানাপোড়েন ও ভাঙনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন পার্টির তৎপরতার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক এখানে "বেশ কিছুদিন ধরেই কংগ্রেসীরা টোপ ফেলবার জন্যে ওর আশপাশে ছোঁক ছোঁক করছিল। পার্টি ভাঙার পর ওর যে হাড়ির হাল হয়েছে, সেটা ওদের কানে এসেছিল। গোড়ায় গিরিধারী একেবারেই ওদের আমল দেয়নি। কিন্তু মানুষের কাহিল শরীরে যেমন রোগ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়, তেমনি বেশিদিন অভুক্ত থাকলে মনের জোরও কমে যায়। ওরা বলেছে ওদের ট্রেড ইউনিয়নের হয়ে কাজ করলে মাসে তিনশো টাকা করে দেবে। সেই সঙ্গে এখনই কিছু আগাম।

শুনে তুমি পাথরের মত বসে রইলে। কেউ যেন তোমার ডান হাতটা কেটে নিতে চাইছে।" (ভাঙার গান/কমরেড, কথা কও)।

'কমরেড কথা কও" উপন্যাসের ত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম - 'কালা মেঘ'। গিরিধারীকে দেখা যায় এই পরিচ্ছেদে, সে ভাইসাহেবকেও তাদের দলের বিরুদ্ধে সভায় গালমন্দ করার অর্থ উপলব্ধি করে। একসময়ের খুব কাছের জনকেও যে ভিন্ন শিবিরে জায়গা করে নিতে হবে। তাই লেখক বলেন "তুমি বুঝেছিলে ব্যাপারটা তা নয়। ও এটা করছে নতুন পার্টিতে বিশ্বাস অর্জনের

জন্যে। শুধু পার্টির কাছে নয়, নিজের কাছেও ওকে আস্থাভাজন হতে হবে। ওকে চাল ফেরত নিতে হয়েছে স্বেচ্ছায় মাত হবে বলে।'' (কালা মেঘ/কমরেড, কথা কও)। লেখক ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে কথোপকথনের রীতিতে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করলেও অনেকটা বর্ণনার ঢঙে কথাগুলি বিবৃত করেছেন। এই পরিচ্ছেদে ভাই ভাইসাহেবের সঙ্কটপূর্ণ স্থিতিশীল শারীরিক অবস্থার কথা আমরা জানতে পারি ''ভাইসাহেব আজ নিয়ে এই পাঁচ দিন। তোমার আধ বোজা চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখে মাছি বসলেও তোমার কোনো সাড়া নেই।'' (কালা মেঘ/কমরেড, কথা কও)। কারা একজন বৃদ্ধ মানুষের মাথায় বাঁশের বাড়ি মেরেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যক্ষদর্শী নেই। কেবল বিরোধী শিবির বলে আলমের দলের বিরুদ্ধে দোষ চাপানো হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে পুলিশ প্রশাসনের বাস্তবসত্যও এখানে তুলে ধরেছেন লেখক - ''পুলিশ কী করবে? এমনিতেই নকশালদের হামলায় তাদের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। তাছাড়া ওদের হয়েছে এখন উভয়সঙ্কট। কোন দল এসে মাথায় বসবে, তার ঠিক নেই। পারতপক্ষে ওরা এখন কাউকেই খাঁটাবে না।'' (কালা মেঘে/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের একত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'অনির্বচনীয়'। আলোচ্য অধ্যায়ে মৃত্যু ভাবনা এবং আত্মা লেখকের উপলব্ধিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব ই নিয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত। লেখক মনে করেন জীবনরথের মালিক হল জীবের আত্মা এবং রথ তার শরীর। মনের লাগাম হাতে নিয়ে বিবেকবুদ্ধি সেই রথ চালিয়ে যায়। লেখকের এই পরিচ্ছেদে পৌরাণিক ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। জীবনের ভাবনার সঙ্গে পৌরাণিক চেতনার মেলবন্ধন হয়ে লেখকের শিল্পীসত্তাকে এই পরিচ্ছেদে নাড়া দিয়েছিল। এই পরিচ্ছেদে স্বাভাবিকভাবে এসেছে দেবযানী, কচ, নচিকেতা ও যমরাজের বিভিন্ন ছোট ছোট কথা ও কাহিনী। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসে গীতা ও কোরাণ পাঠের উপলব্ধি। এখানে আমরা দেখি ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা যেখানে বিশ্বাস করা হয়দেহ ত্যাগ করেও আত্মা বেঁচে থাকে কিংবা মুক্ত আত্মা দেহান্তরে যায়। সেই ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনায় মিশিয়ে লেখক বলেন এমন এক শ্রেণীর জীবের কথা যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না - তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। যাদের বলা হয় রেখার অ্যানিম্যাল কিউল। এরা জলে থাকে। যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ দিব্যি টগবগে চনমনে হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু জল শুকিয়ে গেলে ধূলিকণার আকার নেয়। মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর সেই কীটানুকে জলে রাখলে দেখা যায় যে এরা আগের মতোই নড়েচড়ে ওঠে। সেখানে লেখকের জিজ্ঞাসা সেটা ''মৃত্যু? না জীবন? নাকি পুনর্জীবন? জন্মান্তর না দেহান্তর?'' (অনীর্বচণীয়/কমরেড, কথা কও)। লেখকের জীবন-মৃত্যু ভাবনা

এসেছিল ভাইসাহেবের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায়। ভাইসাহেবের কথা রাজনৈতিক উপন্যাসে খুবই প্রাসঙ্গিক ও সাযুস্যপূর্ণ ভাবে এসেছে। লেখকের জীবন ভাবনা মৃত্যু চেতনা শরীর ও আত্মার অস্তিত্ব অস্তিত্বের চেতনা।

আলোচ্য উপন্যাসের বত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'উপোসী মন'। পেটের তাগিদে বাঁচার সংগ্রামে গিরিধারী শিবির বদল করেছিল। এই পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ও মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিষ্ট শিল্পীসত্তা। উপন্যাসে এসেছে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম পদক্ষেপ নিরক্ষরদের লিখতে পড়তে শেখানোর কথা। উপন্যাসের সুমনের মতো লেখকের অভীষ্ট ভারতীয়ের জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক লড়াই। সমাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার ও ব্যাধির বৈচিত্র ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে আলোচ্য পরিচ্ছেদে কালিপূজো শীতলাপুজোর ঠেলায় এখন রাস্তা হাঁটা দায়। নতুন উপসর্গ জুটেছে সন্তোষী মা।যে-পুকুরে লোকে স্নান করছে কাপড় কাচছে সেই জলেই রান্না করছে খাচ্ছেও সেই জল। লড়াই করে পাওয়া হকের পয়সা ঠকজুয়াচোর শুঁড়িরাঁড়ী কাবলিওয়ালা আর মোল্লাপুরুতে লুটে নিচ্ছে।

মেয়েগুলোকে বলির পাঁঠার মত তৈরী করা হয় যাতে বালিকাবধূ, বালবিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত মা হয়ে তারা মায়ের ভোগে লাগে।'' (উপোসী মন/কমরেড, কথা কও)। আলোচ্য উপন্যাসের তেত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'কালো নামাবলী'। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভাইসাহেবের মৃত্যু আসন্ন। খুব স্বাভাবিকভাবে এই পরিচ্ছেদে এসেছে মৃত্যু ভাবনা। এসেছে শ্মশানের ছবি। শ্মশানের পোড়া কাঠকয়লার কচিকাঁচাদের হল বানানে লেখা লাইনবন্দী নাম। 'শহীদ অমুক, শহীদ অমুক। শহীদ তোমায় ভুলছি না ভুলব না।' লেখকের মূল্যায়ন যে, দলে দলে মানুষ ভুলছি না ভুলব না বলে চিৎকার করলেও কিন্তু ভুলেই যায়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দলাদলি করে মানুষ মরে, হানাহানি করে কোনো নেতারই জীবনের কোথায় সার্থকতা একই দলের ও সমমনোভাবাপন্ন, একই মতের মানুষের শিবিরে বিভাজনে পার্টির সার্থকতা কোথায়। প্রসঙ্গত এসেছে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনের বিষাদ। যুদ্ধে আপন জনদের হত্যা করে জয়ী হবার কী সুখ। লেখকের কথায় ভাইসাহেবের সেই রথ চালকও নেই, রাথের সারথীও নেই আর অর্জুনের মতো বীরও সে নয়। তাই তার মৃত্যুই শ্রেয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদের চৌত্রিশ সংখ্যক উপন্যাসের শীর্ষনাম 'অগ্নিহোত্রী'। এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের জেল খাটার সময়েপাশের সেলের আলুওয়ালা কিংবা দারুওয়ালা গোছের নামের এক পার্সির প্রসঙ্গ স্মৃতিচারণে এসেছে। সে ছিল খুব নিষ্ঠাবান পার্শি। নরম গলায় কথা বলত। দেশ থেকে নানা রকমের খাবার পার্সেলে এলে সবাইকে খেতে দিত। তার ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্রআবেস্তার সঙ্গে ভাইসাহেবের ধর্মগ্রন্থ গীতার কথা

এসেছে আলোচ্য পরিচ্ছেদে এসেছে বেদের কথা, মহাভারতের কথা। জেন্দআবেস্তা ও ঋগ্বেদের দেবতা ও দানব সৃষ্টির আদিকথা। এই পরিচ্ছেদে এসেছে জীবনের কঠিন তম সত্যের কথা। এই প্রসঙ্গে এসেছে ভক্ত কবি হাফেজের কথা। তিনি বলেছিলেন - ''মনসুরের মতন আমাকে যদি শূলে চড়াও, আমার রক্তধারায় মাটিতে সমানে লেখা হবে - (আঘাতে আছেন সেই সত্য!) (অগ্নিহোত্রী/কমরেড কথা কও)। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখি লেখক ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন - ''অগ্নিহোত্রী/ কমরেড, কথা কও।'' কিন্তু ততক্ষণে ভাইসাহেব ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন।

'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসের সর্বশেষ তথা পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের নাম কথা রইল। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখি গিরিধারী ও রুক্মিনী দুজনেই ভাইসাহেবের মৃত্যুতে নিরুদেশ হয়ে যায়। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ভাইসাহেব চরিত্রের সার্থকতা ঔপন্যাসিকের কথাতেই উঠে এসেছে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখক বলেন '' তোমার জীবন তাই বলে বৃথা যাবে না, ভাইসাহেব। মানুষের ভালর জন্যে নিজেকে যে কাজে তুমি সঁপে দিয়েছিলে, আগাছা, ইঁদুর আর পোকার হাত এড়িয়ে একদিন সেই মাঠের ফসল গোলায় উঠবে।'' (কথা রইল/কমরেড, কথা কও)। মৃত্যুতে ভাইসাহেব চরিত্রটি সর্বজনবিদিত নেতা হয়ে ওঠেন। সেখানে মতাদর্শ নির্বিশেষে ও পার্টির ভেদাভেদ ঘুঁচে সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর শবযাত্রায় হাজির হয়। ভাই সাহেব জগতের ও মানুষের ছোট ছোট ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহান চরিত্র হয়ে ওঠেন। ভাইসাহেবের শবযাত্রার বর্ণনায় তুলনামূলক ভাবে লেখক বলেন - ''শিখণ্ডী খাড়া করে অর্জুন ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে দিলে কুরুক্ষেত্রে অনেকটা এই রকমের একটা সর্বদলীয় সমাবেশ ঘটেছিল।'' (কথা রইল/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চ জীবন দর্শন, চরিত্র সৃজন, সমাজ ভাবনা জীবন চেতনা কাহিনী বিন্যাস, সমকাল চেতনাও রাজনৈতিক চেতনা সবমিলে তাঁর শিল্পভাবনার নিদর্শন আমরা পাই। তাঁর কমরেড, কথা কও' উপন্যাসে ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিজের জীবন অভিজ্ঞতারই নানা কথা বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই ঔপন্যাসিক তাঁর শব্দ চয়ন ও ভাষার প্রয়োগ করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে ভাষায় উপযোগী ও জীবন্ত ও কথ্যরূপ পেয়েছে। তার এই বিশেষ রীতি ও ভাবনা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন - ''তাঁর বক্তৃতা খুবই সোজা। কিন্তু তার লিখিত গদ্যের 'স্টাইল' রীতিমত জটিল। কারণ যে সব জটিল বিষয় নিয়ে তাঁকে ভাবিত হতে হয়েছে তার কোনো সরলীকৃত প্রকাশভঙ্গি হয় না।'' (বাংলা কবিতার কালান্তর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় সংস্করব - ২০০৮-দেজ পবলিশিং, পৃঃ ২২৬-২২৭) ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্য-উপন্যাস-আত্মজীবনী-অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাপ্তি বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্প। তবে শিল্পের গুণগত বিচারে সেই উপন্যাস কয়টি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় কালজয়ী স্থান অধিকারে অবশ্যম্ভাবী সামর্থ অর্জন করেছে। তাঁর মানসলোকের প্রতিফলন ঘটেছে সেই উপন্যাসগুলিতে। তাঁর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসা তারই নিজস্ব নিয়মে সমকালীন পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেছে। স্বদেশ-জিজ্ঞাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের মূলে নিহিত। স্বাভাবিকভাবে তাঁর উপন্যাস শিল্পে চরিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্রষ্টার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে আমরা একেকটি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যময়ী শিল্পপ্রতিমাকে পাই। সেই শিল্পের কাহিনী , চরিত্র , মনস্তাত্ত্বিকদ্বন্দ্ব, বাস্তবতা , স্থনীয় পরিবেশ , সমকাল , শিল্পীর দায়বদ্ধ চেতনা , বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সেগুলিতে আমরা একজন সার্থক শিল্পী এবং সফল স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করি। সেই সঙ্গে আমরা পেয়ে যাই অখ্যাত-উপেক্ষিত-নিতান্ত সাধারণ নিম্নবর্গের মনুষের জীবনকে শিল্পে উন্নীত করার মহান প্রয়াস। তাঁর উপন্যাসগুলিতে আমরা একজন সামাজিক দায়বদ্ধ সচেতন শিল্পের শিল্পসত্তাকে উপলব্ধি করি। তাঁর উপন্যাসে প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে বিশিষ্ট জীবনদর্শন সমকালীন পটভূমি ও সমাজবাস্তবতা। কালধর্মে চলমান সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিতে অসাধারণ শিল্প নির্মাণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। কোথাও কোথাও তিনি উপন্যাসকে গণজীবনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখনীতে উপন্যাসগুলি শিল্পের গুণে উপন্যাস হয়ে উঠেছে আবার জীবনদর্শনে সেগুলি জনজীবনের জাগরণী সুরের বীণা হয়ে বেজে উঠেছে ।

খ) গদ্য সহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় : রিপোর্টাজ ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য গদ্য রচনা

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের উপন্যাস ছাড়াও গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে চাঁর গল্প - রিপোর্টাজ ভ্রমণকাহিনী - প্রবন্ধ - ডায়েরীধর্মী রচনা পত্র-পত্রিকায় লেখা চিঠি ও আত্মজীবনীমূলক রচনা। এগুলি বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিসৃত রস সৃষ্টির প্রয়াস। আবার কোনোটি পছন্দের লেখকের গদ্যানুবাদ। তাঁর এই শ্রেণীর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হল ‘আমার বাংলা’ (প্রথম প্রকাশ

১৩৫৮, বঙ্গাব্দে ঈগল পাবলিশার্স, কলকাতা ২০), 'ভূতের বেগার' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৫৪, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃর্ক), 'যখন সেখানে' (প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭, কলকাতা ২৬), 'ডাকবাংলার ডাইরি' (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯), 'নারদের ডাইরি' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৬, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-৬), 'যেতে যেতে দেখা ' (প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৬, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৭) 'ক্ষমু নেই'(প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮, প্রসূন বসু কর্তৃক কলকাতা ৯ থেকে), 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৪, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৯) 'অবার ডাকবাংলার ডাকে' (প্রথম প্রকাশ জানু ১৯৮১, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, কলকাতা ২৯), 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, সপ্তাহ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২), 'এখন এখানে' (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা ৯), ' খোলা হাতে খোলা মনে (প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৮৭, দরবারী প্রকাশনী, কলকাতা ১২), ''ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন'' (প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৭, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬ থেকে), 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ থেকে) 'কবিতার বোঝাপড়া' (প্রথম প্রকাশ জানুঃ ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা ৯), 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৯) ' ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই' (প্রথম প্রকাশ জানুঃ ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৯) ' ইয়াসিনের কলকাতা'(প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৮, জটায়ু বকস কলকাতা ৯) ' টো টো কোম্পানী' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্যামলী প্রকাশনী, কলকাতা ২৯), 'জানো আর দ্যাখো জানোয়ার' (প্রথম প্রকাশ ১৫ই এপ্রিল ১৯৯১, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা ৭), 'এলাম আমি কোথা থেকে '(প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৯)

তাঁর গদ্যরচনার প্রকৃতি বিশ্লেষণাত্মক উক্তিতে বিগদ্ধ সমালোচক নীহার রঞ্জন রায় (আমার বাংলা) গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখেন '' তারপর সুভাষ পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বেরিয়েছিলেন দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় সেবার জন্য, তাদের দুঃখ সুখ, আনন্দ বেদনা, আশা আকাঙ্খাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণের জন্য, নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্য। সে সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর সুভাষের অজ্ঞাত বাস, নাগর সাহিত্যের মুখর কোলাহল থেকে আত্মনির্বাসন। এ- অজ্ঞাতবাস, এ-নির্বাসন ব্যর্থ

হয়নি; পদাতিক জীবন তাঁকে নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে, দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়েছে। এইতো যথার্থ আত্মপরিচয়।----- দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করা এর চেয়ে গভীরতর জীবন উৎসের কথা আমি জানিনে। সুভাষ সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং তার সন্ধান দিয়েছেন।''

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতার সূত্রে, শ্রমিক সংগঠনের কাজে, বাংলার মাঠ-ঘাট, গ্রামাঞ্চল-শিল্পাঞ্চল, শহর-বন্দর, ঘুরে ঘুরে জীবনের ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জীবনে সঞ্চয় করেছিলেন। সেই পত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট তাঁর বিভিন্ন গদ্য রচনা। গল্প রচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন - ' মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারিনি। আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল। কথিকা ধরনের লেখা। পরিচিত মহলে তা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। --- চাক্ষুষ দেখাশুনো ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প। যা দেখছি তার বেশি লিখিনি।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য সংগ্রহ ২/দেজ পাবলিশিং বৈশাখ ১৪০৩, পৃঃ ৫০৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ - ১ (দেজ পাবলিশিং ডিসেম্বর ১৯৯৪) গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তাঁর গদ্যের শৈলী সম্পর্কে আমিয় দেব লেখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মতোই তাঁর গদ্যেরও মূল লক্ষণ সরলতা। জটিলবাক্য তিনি খুব কম লেখেন যৌগিক বাক্যও তেমন না তাঁর প্রবণতা সরল বাক্যেরই দিকে অথচ সরল বাক্যের পৌন:পুনিকতায় যে একঘেয়েমি আসে অনেক সময়, তার এতটুকুও এখানে নেই। শুধু যে একঘেয়েমিই নেই তা নয়, এমন একটা টান আছে এ গদ্যের যে পড়তে শুরু করলে শেষ করতে হয়। সরলতার এই কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন নানা ভাবে। তাঁর অনুচ্ছেদ বিভাজন খুব সরল, তাঁর শব্দসম্ভার খুব সরল তৎসব শব্দ নিতান্তই অপ্রতুল তাঁর অন্বয়ও খুব সরল। এলাম, দখলাম, জয় করলাম গোছের এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে সব মিলিয়ে যে মনেই হয় না পড়তে বসে কোনো পরিশ্রম করছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গদ্য রচনায় আমরা তাঁর প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। সেগুলি বিভিন্ন দৈনিক, মাসি, সাপ্তাহিক কিংবা ত্রৈমাসিকে ছাপা হয়েছিল। কোনে কোনোটি আবার 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি সংবাদ পত্রের জন্য লেখা। সেগুলির প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র বৈচিত্র পাই আমরা। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে একটি নিগুঢ় ঐক্য। যখন সেখানে ছুটে বেড়িয়েছেন সেখানে যা তাঁর মনে দাগ

কেটেছে তাই তিনি গদ্যে শিল্পিত রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কোনো কোনোটিতে দেখিয়েছেন শ্রম মানুষ কিভাবে বঞ্চিত করছে, কিভাবে কৃষকের ধান মহাজনের আড়তে যাচ্ছে কিংবা কিভাবে গৃদামজাত হচ্ছে কিভাবে কামার কুমোর তাঁতি প্রভৃতি খেটে খাওয়া মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে উঠছে। তিনি কোনো কোনো গদ্যে দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হয় শ্রমিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে, কিভাবে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। কিভাবে বঞ্চিত নিপীড়িত সর্বহারারা সুদখোর জমিদার আড়তদার পাইকার প্রভৃতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিভাবে মহামারী দুর্ভিক্ষে মানুষ জীবনের সংগ্রামে জয়ী হয় এসব কিছুকে তিনি ছোট ছোট কাহিনী ধর্মী গদ্যে বৈচিত্র্য দান করেছিলেন।

তাঁর গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলি হল 'বাঙালীর ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, বুক ওআর্ল্ড লিমিটেড, কলকাতা), 'অক্ষরে অক্ষরে' (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), ' কথার কথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০) 'জগদীশ চন্দ্র বসু' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), 'দেশ বিদেশের রূপকথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২), 'রূপকথার ঝুড়ি'(প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

এছাড়া তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল 'রুশ গল্প সঞ্চয়ন' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬৩, ন্যাশনাল বুক এ জেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩); 'ইভান দেশি সোভিচের জীবনের একদিন' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৫, ডি এম লাইব্রেরী কলকতা ৬) 'তমস' (প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮ সাক্ষরতা প্রকাশনী কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

তাঁর এই গদ্য রচনাগুলির মধ্যে আমরা তাঁর রসবোধের বৈচিত্র্য পাই। এগুলি ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। এই বিপুল সংখ্যক গদ্য রচনার মধ্যে তাঁর সামাজিক চেতনা সংবেদনশীল মননশীলতা উচ্চ জীবন চেতনা শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পবোধের পরিচয় আমরা পাই। এগুলির মধ্যে সাহিত্যেক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিভার নিদর্শন আমরা পাই। ঘুরে ঘুরে দেশ বিদেশের নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এই রচনাগুলি সমাজ বাস্তব সত্যের ছবি আমরা পাই। লেখক 'আমার বাংলা' গদ্যগ্রন্থ সর্ম্পকে লিখেছেন 'দিন বদলেছে। শালগাছের ছায়ায় ছায়ায় আজ আর গোরা পল্টনের তাঁবু নেই। খালের দুপাশে চিক চিক করে না মানুষের হাড়। লরির রাস্তায় এখন পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন গঞ্জ। স্বাধীন দেশে মানুষ এখন নতুন করে দল বাঁধছে, নতুন করে শপথ নিচ্ছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখছে সুখশান্তির।' 'আমার বাংলা পটভূমি' তাঁর সমাজ মানুষকে দেখার নিখুঁত

অন্তদৃষ্টি সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল। তাঁর গদ্য রচনাগুলির একেকটিতে বৈচিত্রময় সমাজ জীবনের ছবি, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, সমাজ মানুষের বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ আমরা সাহিত্যের বিষয় রূপে পাই। সেগুলির রচনা শৈলীতে লেখক যুক্ত করেছেন গল্প বলার ভঙ্গি। এতে পাঠকের রসলিপ্সার চাহিদা পূরণ হয় সার্থক রূপে। তাঁর 'আমার বাংলা' গ্রন্থে এরকম এগারোটি শিরোনামাঙ্কিত গদ্যাংশ পাই আমরা 'গারো পাহাড়ের নীচে' 'ছাতির বদলে হাতি' 'দীপঙ্করের দেশে', 'ধন্যার সঙ্গে যুদ্ধ' 'শাল মহুয়ার ছায়ার' 'পাতালপুরীর রাজ্যে' , 'কলের কলকাতা', 'গদ্দল পাথর''চাঁট গায়ের কবি ওয়ালা' 'মেঘের গায়ে জেল খানা ' এবং 'হাত বাড়াও'। এগুলির মধ্যে 'গারো পাহাড়ের নীচে' শিরোনামের গদ্যটিতে অধুনা বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়ের এক বিচিত্র্য অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। এখনকার মানুষ চৈত্র মাসে পাহাড়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় তখন সেখান কার দুর্ধর্ষ জানোয়ারগুলো প্রাণ ভায়ে ছুটে পালায় । লেখক বলেন - '' আর পাহাড়ী মেয়ে পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধ্যে বেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিয়ে নাচ আর গান।'' 'গারো পাহাড়ের নীচে আমার বাংলা '। লেখক সেই পাহাড়ের বসবাস কারী মানুষের কথায় লেখেন পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মত হালবদল নিয়ে চাষ আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ী ছাপ। হাজং-গারো কোচ বানাই ডালু মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত' কে তারা 'ট' কে 'ত' আবার 'ড' কে তারা 'দ' বলে, 'দ' কে 'ড' প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভারো তো, তোমার কাকার বয়সের এখজন হৃষ্টপুষ্ঠ লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।' (গারো পাহাড়ে নীচে/আমার বাংলা) এখান কার মানুষ মাচা করে ঘর বাঁধে। সেই উচ্চাসনেই হাঁসমুরগী, যেখানে শোওয়া রান্নাবান্না সবই। এখানকার সমকালের জমিদারদের হাতী বেগার আইনের প্রতিবাদী মানুষদের কথায় লেখেন লেখক। জমিদারদের সেখানে হাতি ধরার শখ ছিল। সেই কথায় লেখক বলেন - 'আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চাল চিড়ে বেঁধে। সে জঙ্গলে হাতী আছে সেই জঙ্গল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতী বেড় দিতে যেত তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হত।

মানুষ কতদিন এ সব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরী হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হল।' (গারো পাহাড়ের নীচে/আমার বাংলা)। এখানে বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা চাষবাস পশু শিকার কথা বলার ধরন সেখানকার মানুষের প্রকৃতি জমিদারের অত্যাচার অত্যাচারের প্রতিবাদকে গল্পের ঢঙে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন লেখক।

গারো পাহাড়ের নীচে বসবাস কারী সহজ সরল মানুষগুলিকে মহাজন জমিদার ব্যবসায়ী দোকানদার অমানবিক ভাবে শোষণ করতো। তার কয়েকটি নিদর্শন দিয়েছেন লেখক। যেখান কার এক গারো চেংমান। বিপদের সময় উপযাচকে মহাজন মনমোহন চেংমান কে একটি ছাতা দেওয়ার কয়েকবছর পর সুতসমেত তৎকালীন সময়ে হাজার টাকা আদায় করে নেয়। ডালুদের কুমার গাঁতি গ্রামের নিবেদন সরকারের ছেষট্টি বিঘে জমি দু-দশ বছরের মুদির দোকানের বাকির দেনায় মহাজন কুটিশ্বর সাহা কেড়ে নেয়। এক চাষী আর এক ধুরন্ধর মহাজনের কাছ থেকে ধারে একটি কোদাল নেওয়া তার মাসুল হিসেবে পনেরো বিঘে জমি কেড়ে নেয়। সেকালে চাষীর ধান জমিদারের খামারে তুলতে হতো। চুক্তির ধান কর্জার ধান খাজনা ইত্যাদি সমস্ত মিটিয়ে বুকের রক্ত জল করে ফলানো ফসল সমস্ত জমিদার কে দিয়ে চাষীকে খালি হাতে হতাশ হতে হতো। এছাড়া সেখানে ছিল নান্‌কার প্রথা। লেখকের কথায় 'নানকার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্থ হত। খাজনা দিতে না পারলে তহশীলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমেড়ো করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নীলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত।' 'ছাতির বদলে হাতী/আমার বাংলা) লেখক ঘুরে ঘুরে সাধারণ চাষীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার শোষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অত্যাচারের প্রতিবাদের কথায় লেখেন ''কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুমনাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষীরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আর ধান তুলব না। ধান তারা তোলেনি। পুলিশ - কাছারি কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।'' (ছাতির বদলে হাতী/আমার বাংলা)।

লেখক বলেছেন এখন আগের মতো শহর বন্দরে ভদ্রলোকেরা তাদের আর তুই তুকারি করে না। ওরা এখন আর রূপ ছেলে এক সঙ্গে বসে মদ্যপান করে না। ওরা সকলে একসঙ্গে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ছেলে মেয়ে সকলে মিলে গান করে ---

'শুনো শুনো বন্দু গো ভায়া
রোয়া লাগাইতে চলো গো এলা।

বন্দুর জমিখানি দাহাকোণা

হাল জরিছে মৈষ মেনা

হাল বো আছে

সি উখি মাতি রে -----।' (ছাতির বদলে হাতি/আমরা বাংলা) লোক জীবন লোক কথা লোক সঙ্গীতের প্রতি লেখদের দরদের পরিচয় একদম পাই আমরা।পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ের গ্রাম বাংলায় ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছাকছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এক সময় কীর্তিনাশা নদী পথে রানীনগরের এতিমখানা, ঢাকার বিক্রমপুর পরগনা বা মুন্সী গঞ্জে ঘুরে ঘুরে দেখে ছিলেন গ্রামের মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কালে দেশ ত্যাগী হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে জেলে পাড়া যুগীপাড়া ঋষি পাড়া। তিনি সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন বাড়ীতে বীতে আর সন্ধ্যে জ্বলে না, শাঁখ বাজেনা রাত্রের ঝড়ে ছেলের দল হারিকেন হাতে আম কুড়োতে যায় না পাকা আম মাটিতে পাড়ে পচে যাচ্ছে। লৌহজঙ্গ বন্দরের কথায় লেখক বলেন 'দিঘলীর খাল যেখানটায় পদ্মায় গিয়ে পড়েছে তারই মুখে দোকানপাট, গুদাম আর মহাজনদের গদি। যত লোক না খেয়ে রোগে হাত-পা ফুলে মরেছে, তাদের টেনে টেনে খালের জলে ফেলা হয়েছে। এদিকে স্তুপাকার শবদেহ খালের মুখ পর্যন্ত বুঁজে গিয়েছে। দুগর্ন্ধে বন্দরে টেকা দায়। বন্দরের মহাজনরা মহা ফাঁপরে পড়ল। এ যেন লোকগুলো মরে গিয়ে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।' (দীপঙ্করের দেশে/আমার বাংলা)। বানীনগরের এতিমখানার তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা হয় আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম ও আমিনার সঙ্গে। নেত্রাবতী গ্রামে এক বৃদ্ধের নিষেধ সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান তিনি তাঁর কথায় 'কোন্ দেশে আছি আমরা? কোন শতাব্দী এটা? চিন্তার মধ্যে সবকিছু বান এলোমেলো হয়ে গেল। কাটা একটা আঙুল শুধু চোখের ওপর ভেসে উঠল যে আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ বেনের ছিল। সে আঙুলে বোনা হত একদিন দুনিয়া জয় করা ঢাকাই মসলিন, সেই কাটা আঙুলের রক্ত আজও বন্ধ হয়নি। চোখ বুঁজে সূর্যের দিকে তাকালাম, সেই রক্ত। আজও ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে নম্‌কে আছে ফোঁটা ফোঁটা সেই রক্ত।' (দীপঙ্করের দেশে/আমার বাংলা)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেরিয়েছিলেন অনুসন্ধিৎসা চিত্তে। বন্যাবিধ্বস্ত বর্ধমানে গিয়ে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। বর্ধমানের সাতকাহানিয়া, সাগর পুতুল, সাগিরা, কোটাল ঘোষ, কাঁটাঠি কুরি, আয়না, দর্শিনী, বনবাহিনী গ্রামগুলির বর্ণনায় তিনি লেখেন - ''বোনাবনের ভেতর দিয়ে আলো আলো রাস্তা। সাবধানে যেতে হয় ক্ষুরের মত ধারালো ঘাম পারের পাতা কেটে বসে।

ঘুপচির মধ্যে হল ফুটিয়ে দেয় বিছুটির পাতা। তারপর মাঠ। ধূ ধূ করলে বালি। দুপাশে তাকালে দেখা যায় পোড়োবাড়ীর ভিটে, ভাঙা মন্দির ইঁট ফুঁড়ে বট অশথের গাছ গজিয়েছে। মাঠের মধ্যে বড় বড় খানা খন্দ।'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/ আমার বাংলা)। লেখক সেই বন্যার কথায় লেখেন '' সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায়'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/আমার বাংলা)। লেখক দেখেছেন বন্যা ও মহামারীতে গ্রামগুলো জনশূন্য ধূ ধূ প্রান্তর। আবার ক্রমশঃ দিন গড়িয়ে গেল সেই মানুষগুলো নিজেরাই একসময় বন্যা মোকাবেলার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ বাঁধার কাজ করে সংঘবদ্ধ ভাবে। সেই বাঁধের নির্মানের একদিনের অভিজ্ঞতার কথায় লেখক বলেন - ''পুরুচার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানাগান (বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা-ঙো, গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচন্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র। 'এই কী হচ্ছে? বর্ধমানে ও -গান বেআইনী জানো না?' এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! লোকে শুনলে তো বাঁধের নীচের আমাকে জ্যান্ত মাটি চাপা দিত।'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/আমার বাংলা)

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাংলার মেদিনীপুর, কেপকুর, চন্দ্রকোণা, পাহাড়তলী, মহিষডুবি, মহিষাদল, সুতাহাটা, তরোপাখিয়ার হাট, নন্দীগ্রাম, খড়কড়িহা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি পৌছে তিনি বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার কথা তাঁর গদ্য সাহিত্যের বিষয় করে তুলে ছিলেন। লেখক যেখানকার জীবনের ধ্বংস লীলাকে তাঁর গদ্যের বিষয় করেছেন - ''মহিষাদলে খাবার রাস্তায় শ্মশানের পর শ্মশান। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ, মাঝখানে পড়ে আছে অসংখ্য নতুন মাটির কলসী। লোকে বলল, শ্মশানগুলো সবই নতুন হয়েছে। আগে ধান চাষ হত এইসব জমিতে। দুদিন আগে এলে দেখতেন না - খেয়ে মরা মানুষগুলো বাড়ির উঠোনে পচে ভেপসে উঠেছে, তাদের লাশগুলো শেয়াল আর শকুনিতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঠে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়ানোরও কারো সামর্থ্য ছিল না।'' (শাল মহুয়ার ছায়ায়/অমরা বাংলা)। লেখক লক্ষ করেছিলেন যেসব জঙ্গালের জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি সাঁওতালদের সামাজিক জীবনে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। জঙ্গলের জায়গা দখল করেছিল বিমান ঘাঁটি আর মিলিটারির ছাউনী। লেখকের বর্ণনায় ''শাল মহুয়ার বন উজার করে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে মাইলের পর মাইল। ঝড় ভাঙায় তা দেখেছি, দেখলাম সরডিহায়। যে অঞ্চলে মিলিটারি, সে অঞ্চলে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। কাঁচা রাস্তা

পাকা হয়েছে। গাঁয়ের আকশ ধুলোয় ধুলো হয়ে থাকে লরির চাকার। যেখানে দোখান ছিল না, সেখানে দোকান, যেখানে ঘর ছিল না। সেখানে পাকা দালান উঠেছে।'' শাল মহুয়ার ছায়ায়/আমার বাংলা)

লেখক তাঁর গদ্যে দেখিয়েছেন আসান সোল দুর্গাপুরের খনি শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট পরিশ্রম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কয়লা বনির শ্রমিকদের খনির ভেতরকার কঠিন শ্রমকে তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক। লেখক কয়লা খনির শ্রমিকদের কাছাকাছি পৌছে যান কপিকলের সাহায্যে। খনিতে প্রবেশের ছবি আকতে লেখক বলেন খনির ভেতরের খবর কেউ বাইরের মানুষ জানতে পারে না। মালিকের একেবারে নিজস্ব মানুষ জন ছাড়া কাউকে খনির ভেতরে নামতেও দেওয়া হয় না। খনির ভেতরকার কথা লেখকের ভাষায় ছবি হয়ে ওঠে ''চোখে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। নামতে নামতে মনে হয় যেন কোথায় কোন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর জল বায়ু মাটির জন্যে মন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ পাসের নীচে কপিকলটা সটাং করে আটকায় হাতে আপাদমস্তক ঢাকা সেটি ল্যাম্প আর কাঁধে গাইতি নিয়ে সবাই নেমে দাঁড়ায়।

খাদের গাঁ দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। গোলক ধাঁ ধাঁর মত অসংখ্য সুরঙ্গ চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। মোড়ে মোড়ে হাওয়া চলাচলের খোলা দরোজা। একটু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো।

কয়লা কাটার নানা রকমের ব্যবস্থা। কেউ ড্রিল মেশিনে কয়লা কাটছে, কেউ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিচ্ছে, কয়লার বড় বড় চাংড়া, কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা চটাচ্ছে। যারা বারুদের আওয়াজ করে কয়লা (গিরিয়ে) দেয়, তাদের জল শর্ট ফায়াবার। খাদ মজুর দের বলে, মাল কাটা । এখানে এক রকমের কিম্ভূত ভাষা গড়ে উঠেছে। না বাংলা, না হিন্দী এক রকমের পাঁচ মিশেলী ভাষা। এখানকার বাঙালী কুলিকামিনরাও সেই ভাষাতেই কথা বলে। খাদের নীচে টবে কয়লা ভর্তির পর সেই টব দড়ির কলে ওপরে তোলে হলেজ খালাসীরা। টব টেনে তোলার জন্যে আলাদা আলাদা লাইন পাতা সুরঙ্গ। সেই লাইন ঠিক রাখার জন্যে আছে সাফাই কুলি। ভর্তি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টর মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ টালোয়ানদের । ওপরের কয়লার চাপ ভেঙে পড়ার মত হলে কাঠের ঠেকো দেয় যারা, তাদের বলে কাঠমিত্রি। এ ছাড়া রাজমিস্ত্রিও আছে; তাদের কাজ ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া। খাদের নীচে চোঁয়ানো জল মারার জন্যে আছে পাম্প খালাসী আর বেলিং খালসী।'' (পাতালপুরীর রাজ্যে/আমার বাংলা)। এই খনির ভেতর পদে পদে দুর্ঘটনা এড়িয়ে খাদমজুরদের কাজ করতে হয়। তার ওপর সেখানকার ওভার ম্যান ইনচার্জ ও পিট-সরকারকে ঘুস না দিলে কয়লা খাঁদে কারো বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু লেখকের শিল্পী সত্তায় সেই অত্যাচর স্থায়ী হয় না - '' আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও

আলোর খবর পৌঁছচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনিমজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বীরশা মুন্ডার বংশধরেরা ভগীরথের মত মাটির নীচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্ত গঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা " (পাতাল পুরীর রাজ্যে/আমার বাংলা)।

পদাতিক সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার বাংলা গ্রন্থে কলকাতা হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগনা থেকে শিলিগুড়ি ও পার্বত্য জীবনের সমকালের বিভিন্ন পরিবর্তন সংগ্রামীন ও নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য এঁকেছে। নন্দীগ্রাম থেকে ফরিদপুর আসমুদ্র হিমাচল অঞ্চলের অধিবাসীদের সামগ্রিক সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি লেখক বলেন "বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালী ফসলে, চাষীর গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি। কারখানায় খারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি। যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি।" হাত বাড়াও / আমার বাংলা)। জনজীবনের কথা প্রতিবাদ ও প্রতিবোধের কথা, শান্তি ও সুখের কথা মাটির ভাষা শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িতের কথায় জুতসই শব্দ চয়ন করে গদ্য সাহিত্যের শৈল্পিক রস সৃজনে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে লেখকের লেখার ভাষার সঙ্গে অঙ্কিত তাঁর বিশিষ্ট জীবন দর্শন।

আমার বাংলার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি যখন যেখানে (১৯৬০) ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই গদ্যগ্রন্থটি রচিত। এই সময় কালের মধ্যে ১৯৫২ সালে তিনি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ এবং ১৯৫৭ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শীর্ষক একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও বক্সা জেলে দু বছরের বেশী সময় বন্দী ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বজবজের চটকল শ্রমিক আন্দলনের সক্রিয়কর্মী ছিলেন। তাঁর এই সময় কালে রচিত যখন যেখানে গ্রন্থের গদ্যাংশ গুলিতে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করি আমরা। এই গ্রন্থের রচনা গুলি হল 'এইটুকু, আসমন, জমি, কাঁটাতারের বেড়ায় , বজবজের যে কোন সকাল', বাবর আলির চোখের মত', খবরের খোজে, একুশের সুরে বাঁধা, লিখতে বারন, একটি অমানুষিক কাহিনী, আমাদের গাড়ি, একটি প্রতিবাদ পত্র। আলোচ্য রচনাগুলির শিল্প গুন বিচারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যাংশ গ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লেখিত আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা যথার্থ প্রাসঙ্গিক। যেখানে লেখা হয়েছিল ....ছোটগল্পের রীতিনীতি মেনে না চললেও 'এইটুকু' একটি

অমানুষিক কাহিনী কিংবা একটি প্রতিবাদ পত্র -এ গল্পের বসই পাওয়া যায়- যদিও হয়ত আখ্যাংশ বস্তবজীবন থেকেই সংগ্রহীত, এইটুকু স্মৃতিচারনের মেজাজে শুরু, কিন্তু সমাপ্ত গল্পের সংহত ব্যঞ্জনায়। লিখতে বারন' ঠিক স্মৃতিকথাও নয় রিপোর্টজও নয় -যাকে বলা চলে ঈশপীয় রচনা। বারাবারে ইশারা-ইঙ্গিতেও অনেক কথা বলেছেন লেখক, যা সবসময় সোজাসুজি বলা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির অতি চতুর এবং সর্থক ব্যাবহারের উদাহারন হিসেবে লেখাটি উল্লেখযোগ্য। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখিত কুশল লাহিড়ীর উক্তি যথার্থ- তাঁর সহজ সরল কাব্যময় উপমা কসোনের ভঙ্গি, কথকথার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সহজ সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য শিল্পীর শিক্ষার বিষয়.........। (পরিচয়, জৈষ্ঠ, ১৩৭০পৃ১৪৬১-জ) এই পরিচয় পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক (১৯৫৬-৬৫) বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে যথার্থই লেখেন-''...........না, খবরের মামুলি যোগানদার নয়, প্রথমতো সরকারি বেসরকারি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হওয়া নয়, এ হল একেবারে সরজমিনে সেকালের অখন্ড বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শহরে-হাটে মাঠে ট্রেনে বাসে নৌকোয় চেপে কিংবা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে পরলোভানি ফসলের খেতে, খাবার রুখু ডাঙা আর বানভাসি নাবালে, কয়লাখনির খাদে আর চটকলের কুলি ধাওড়ায় ঘুরে ঘুরে দেশের মাটি আর তার মালিক মানুষের আসল রুপের সন্ধান, তাদের মনের আসল কথাটি জেনে নেয়া। তারপর সবাইকে তা জানানো।.........ফিরে ফিরে খরা, বন্যা, মনন্তর-মহামারীতে নিরন্ন বাস্তুচ্যুত সর্বস্বান্ত রোগে শোকে জজর ধংস বিপর্যস্ত সমাজের নিচুতলার মানুষজনের তত্ব তল্লাস করতে গিয়ে দেশার কাছের দূরের, এমন কি প্রতন্ত অঞ্চলেরও অন্ধি সন্ধিতে সেঁধিয়ে সুভাষ নতুন একটি আবিস্কার করেছিলেন স্বদেশকে আর তুলে আনছিলেন কলমে আঁকা ছবি আমাদের এই বাংলার আর তার বাসিন্দা বাঙালি অবাঙালি নানা জাতের নানান ভাষার মানুষের আসল রুপটির - মরতে মরতেও মরতে জানেনা যে মানুষ ঘর করতে শিখেছে যারা নিরন্তর মরী মতান্তর নিয়ে। এই গদ্য শৈলী ও রিপোটার্জ ধর্মী রচনা সেকালের বাঙালী

লেখকদের কাছে মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাহিত্যিক সুভাষ তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতিতে হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র।

যখন যেখানে গদ্যগ্রন্থের প্রথম গদ্য রচনা এইটুকু। এই-গদ্যাংশে লেখক নিবারণ বাবু ও ফড়িঙের মার ভালোবাসা - দুঃখের কথা বর্ণনাত্মক রীতিতে বলেছেন। একটি কাহিনী বর্ননার মধ্যে লেখকের প্রকৃতি- ও নিত্যনৈমিত্যিক ছোট ছোট বিষয়গুলিকে অসাধরন প্রকাশ ভঙ্গি ও আটপৌড়ে ভাসায় সহজ ভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। চমকপ্রদ উপমা ও চিত্রধর্মী ছবি আমরা পাই তাঁর বর্ণনায়- '' কিন্তু শীতের সকালে কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশে যখন রোদ হেসে ওঠে, গায়ে ছোট্ট মেয়ের নাকের নোলকের মত ফোঁটা জল আর বিন্দু বিন্দু শিশির বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে থাকে। একহাত ঘোমটা টানা থাকলেও ঘড় ঘড়ি তুললে সে দৃশ্য চোখ এড়ায় না।'' (এইটুকু/যখন যেখানে) সেই সঙ্গে এই রচনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ''রাস্তার যে সে জায়গায় খোয়া উঠে গিয়ে খোঁদলের মধ্যে জল জমেছে',পাড়ার বেকিয়া ভাগ বাড়িই পুঁয়ে পাওয়া ক্ষয়াটে।। ময়রার দোকানে গরম জিলিপি ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ চুল পাকা বুড়োদের ভিড়ে গিজ গিজ করত তাঁর সে বৈঠকখানা মিষ্টির দোকানের এদিকে খোলার বস্তাটা ভুঁড়িপেট হালইকর, রোগা রোগা ডকের খলাসী, সেঠ ঘন্টানাড়ানো টিকিওয়ালা পুরুষ পানের দোকানদার বুড় ইত্যাদি বিভিন্ন ছবি। লেখকের বাস্তব মতের স্মার্ট লেখদ্দুআমার বাংলার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি যখন যেখানে (১৯৬০)। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই গদ্যগ্রন্থটি রচিত। এই সময় কালের মধ্যে ১৯৫২ সালে তিনি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ এবং ১৯৫৭ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শীর্ষক একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও বক্স জেলে দু বছদ্দআসমন, জমি, কাঁটাতারের বেড়ায় , বজবজের যে কোন সকাল', বাবর আলির চোখের মত', খবরের খোজে, একুশের সুরে বাঁধা, লিখতে বারন, একটি অমানুষিক কাহিনী, আমাদের গাড়ি, একটি প্রতিবাদ পত্র। আলোচ্য রচনলগুলির শিল্প গুন বিচারে সুভাস মুখোপাধ্যায়ের গদ্যাংশ গ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লেখিত আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা যথার্থ প্রাসঙ্গিক। যেখানে লেখা হয়েছিল ....ছোটগল্পের রীতিনীতি মেনে না চললেও 'এইটুকু' একটি অমানুষিক কাহিনী কিংবা একটি প্রতিবাদ পত্র -এ গল্পের বসই পাওয়া যায়- যদিও

হয়ত আখ্যাংশ বস্তবজীবন থেকেই সংগ্রহীত, এইটুকু স্মৃতিচারনের মেজাজে শুরু, কিন্তু সমাপ্ত গল্পের সংহত ব্যঞ্জনায়। লিখতে 'বারন' ঠিক স্মৃতিকথাও নয় রিপোর্টাজও নয় -যাকে বলা চলে ঈশপীয় রচনা। বারাবারে ইশারা- ইঙ্গিতেও অনেক কথা বলেছেন লেখক, যা সবসময় সোজাসুজি বলা চলে না। অবনীন্দ্র নাথের গদ্যরীতির অতি চতুর এবং সর্থক ব্যাবহারের উদাহারন হিসেবে লেখাটি উল্লেখযোগ্য। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখিত কুশল লাহিড়ীর উক্তি যথার্থ- তাঁর সহজ সরল কাব্যসয় উপসা প্রসোনের ভঙ্গি, কথকথার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য রচনাকে একটি বৈশিষ্ট দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সহজ সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য শিল্পীর শিক্ষার বিষয়.........। (পরিচয়, জৈষ্ঠ, ১৩৭০পৃ১৪৬১-জ) এই পরিচয় পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৫৬-৬৫) বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মঙ্গলাচরন চট্রপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে যথার্থই লেখেন-''. . . . . না, খবরের মামুলি যোগানদার নয়, প্রথমতো সরকারি বেসরকারি সংবাদ সরবরাহ 'যখন যেখানে' গদ্য গ্রন্থের তৃতীয় রচনা 'কাঁটাতারের বেড়ায়'। এই লেখক তার সমকালের সংগ্রামী কমরেডদের কথা বলেছেন। তাঁর এই কমরেডদের মধ্যে আলোচ্য গদ্য উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হলেন - আব্দুল রেজ্জাক খন, সতীশ পাশড়াশী, কমেরেড রামসুরত, লেখকের কালাদা, পরভেজ শহীদী, চারু মজুমদার, চিন্মোহন সেহানবীশ - প্রমুখ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সতীর্থ কমরেড আব্দুল রাজ্জাক খানের কথায় বলেন-খা-সাহেব বক্সার আদিযুগের লোক। প্রায় দু-যুগ আগে ইংরেজ সরকার এই পন্ডববর্জিত দেশে যে প্রথম যে ক-জন বেয়াড়া দেশভক্তকে নির্বাসনের দন্ড দিয়ে পাঠায়,তাদের মধ্যে ছিলেন খা-সাহেব। স্বাধীনতার জন্য দেশে যত আন্দলন হয়েছে, প্রত্যেকটি গণআন্দোলনের সঙ্গেঁ তিনি আশৈশব জড়িত। খিলাফতে তিনি ছিলেন কংগ্রেসে তিনি ছিলেন, শ্রমিক আন্দোলন তার কৃষক আন্দোলনের বীজ বোনা থেকেও তিনি আছেন। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)। ছ-ফুট লম্বা এই মানুষটি কথায়-কথায় বলেন বুশতে পারছেন। তার পুরণ দিনের কথা জেলের সবাই অবাক হয়ে শোনে। বৃদ্ধ বয়েসেও বার বার তিনি টানা অনশন আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। সংসারে তার অসম্ভব অভাব।

বাংলা দেশের অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস যার জীবন সেই সতীশ পাকড়াশীর কথায় সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন — তিনি মুখচোরা মানুষ। তাঁর কথায় লেখক বলেন — সেই কবে প্রথম কৈশরে ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে দেশ স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, প্রতিজ্ঞা পালন না করে তাঁর বিশ্রাম নেই। চির জীবনটাই তাঁর জেলে জেলে কাটল। যারা তাঁরই সঙ্গে এক দিন পথে বেড়িয়েছিল, কেউ আগে কেউ পরে সবাই ঘরে ফিরেছে। অনেকে তাদের অতীতের নির্যাতনের পুঁজি ভাঙিয়ে গাড়ি করেছে বাড়ি করেছে তার যৌবনটা মাটি হল বলে জীবনের অস্তাচলটা নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে।

ভালবাসা কতটা গভীর হলে তবে আজীবন লাঞ্ছিত ষাট বছর বয়সেও দেশের হত ভাগ্য মানুষগুলোর জন্য দুচোখের জ্যোতি আস্তে আস্তে স্মান করে দেওয়া যায়, জ্বড়াগ্রস্থ গায়ের চামড়ায় পরমায় ছোট করে আনা জায় এবং তারপরও নতুন জীবনের আশায় আশান্বিত হওয়া যায়, উদ্দীপ্ত হওয়া যায় যৌবনদিপ্ত উৎসাহে। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)।

সেকালের মজুর কমরেড দের কথা বলেছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য গদ্যে। তাদের অনেকেই সেই বক্সা জেলে দু-বছর , আড়াই বছর ধরে বন্দী আছেন। তারা দু:খে পুড়ে আন্দলনে এসেছিল একদিন। বর্তমান জীবনে তাদের লড়াই করে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার সতীর্থ বন্দীদের প্রতি অফুরন্তকে সম্বল করে তাঁরা বেচে আছে। লেখক বলেন জেলে তারা কষ্ট করে ভাষা শিখেছেন খুটিয়ে খুটিয়ে বই পড়ে নিজেদের বিশ্ববোধে ব্যপ্ত করে তুলেছে। এদের মধ্যে মিসিরজী অল্পকথায় অন্তরস্পর্শী ভাষণ দেন। লেখকের কালীদা শান্ত - স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। জেলে রামদেওকে দেখলে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে। সে চমৎকার বাংলা শিখেছে। এদের মধ্যে রামসুরতের কথায় লেখক বলেন - জীবনের গ্লানির দিকটা দেখে দেখে মনের মধ্যে সে ঘৃনার বারুদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল আগুনের সামান্যতম স্পর্শে তাতে বিস্ফোরণ ঘটল। টাকার নেশা , নীড় - বাঁধার স্বপ্ন সব তুচ্ছ হয়ে গেল। সর্বস্ব ত্যাগ করে আন্দলনে আকণ্ঠ ডুবে গেল সে। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)।

সেই জেল জীবনের কথায় লেখক সেকালের উর্দ সাহিত্যের কবি অধ্যাপক পরভেজ শহিদীর কথা বলেন। সে চমৎকার কবিতা বলতে পারতো। তাদের কবিতা শোনায় মহান হৃদয়ের মানুষ পরভেজ শহিদীকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছিল সেই জেলে।

সেই জেল জীবনে লেখকের সঙ্গে ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের নেতা জলপাইগুড়ির চারু মজুমদার। জেলে বন্দী কয়দীরা চারু মজুমদারের মুখে জলপাইগুরির কাথা ও তেভাগা আন্দোলনের কথা শোনে- প্রয় বাড়িতেই সুপারির বাগান। গায়ে গায়ে লতানো গাছ পান। নদী বহুল দেশ পায়ের পাতা ডোবান সরু অগভীর পাহাড়ী নদী। বর্ষায় জলে ভেসে যায়। চষা ভুঁই। মধ্যে মধ্যে ডাঙা, সেসব ডাঙায় খড় শুকান হয় সেই সব খড় বাড়ি। জমিগুলো আল-বাধা সমতল; উওরে হিমালয় - কালো মেঘের মত।করতোয়া বড় নদী কোমর পর্যন্ত জল। গ্রাম বলে কিছু নেই। কয়েকটা বাড়ি নিয়ে একেকটি টাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ঘর , একটা রান্নাঘর, আর গোয়াল। ঘরের মধ্যে মাচা করে শোয়া। শিকের উপর কয়েকটা হাঁড়ি কোনটাতে বীজ ধান , কোনঠাতে দই কিংবা চিঁড়ে। একটু সবলিন চাষীদের ঘরে কাঠের বাক্স। চটের উপর ছেঁড়া কাপর পেতে বিছানা। প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করে মাটির কুয়ো- এ অঞ্চলে চুয়া। চৈত্র মাসে জল থাকেনা। ঘোলাটে জল। শীতকালে ভাতের সঙেঁ লাফা শাক আর বর্ষায় পাটপাতা। লাফা শাক শলশলা ধরণের - জলে সেদ্ধ করে কিছুটা ক্ষারদেয় তার সঙ্গে লঙ্কা পোড়া আর নুন (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)। সেই মানুষ গুলোর বাঁচার লড়াইয়ের কথা শোনে তারা চারু মজুমদারের মুখে। তার মুখে শোনেন এখানকার মানুষের ব্যবহৃত সতন্ত্র ভাষা।

জেলে সবাইকে নিয়ে হাসিতে ডুবিয়ে রাখতেন চিনুবাবু অর্থাৎ চিন্মোহন সেহানবীশ। তাদের মধ্যে কাজ পাগল লোক ছিলেন হুগলির গিরিজা মুখার্জী। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ- সবই তার নখের ডগায়।এই জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরের প্রসঙেঁ এই জেল জীবনের ও সেখানকার বিভিন্ন ধরনের ছবি সরস ভষায় তুলে ধরেছেন আলোচ্য গদ্যে। বজবজের শ্রমিক সংগঠনের সময় সেখান কার এক বিশেষ জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বর্ণনায় আমরা পাই -‘‘ ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকবে চাড়িয়ালের বাস্তায় হাফ- প্যান্ট পরা কোমরে গামছা বাঁধা মানুষের এক দীর্ঘ মিছিল। কারোহাতে ঝোলান টিফিনের বাক্স, কারো কোমরে

পুটলী বাঁধা শুকন মুড়ি। হাত মোছার জন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ কাটা- ছেড়া পাটের পাকান বান্ডিল। কারো ট্যাকে ঝুলছে ধারাল উলঙ্গঁ ছুরি। চটকলে কাজ করতে করতে লাগে।

মোড়ে মোড়ে শাখা নদীর মতন ভাগ হয়ে জাবে একেকটি দঙ্গল। কেউ জাবে তেল-ডিপোয় , কেউ জাবে ঠিকে কাজে। যাদের এখন ইস্কুলে পড়বার বয়স, গোঁফের রেখা উঠতে ঢের বাকি - তারাও সেই সকালে মিছিলে সার দেবে। আর গাঁ থেকে আসা স্বামী পুত্রহীন কিছু মেয়ে; হয় কয়লা পুরতে নয় মাটি কাটতে।(বজবজের যে- কোন সকাল/ যখন যেখানে)।

বজবজ, ব্যঞ্জনহেড়িয়া, চাড়িয়াল, হপ্তাবাজার প্রভৃতি স্থানের মানুষের সুখ দুঃখ, পরিবার - প্রতিবাদ আন্দোলন মিছিল - সভাসমিতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্যঞ্জন হেড়িয়ার পাগল বাবর আলির ছোট্ট মেয়ে সালেমন-কে নিয়ে আর্থিক ও মানসিক কষ্ট নিজের উপলব্ধিতে একাত্ম করে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন লেখক। আর্থিক অভাবে বাবর আলিকে ত্যাগ করে অর্ধবৃদ্ধ এক রেস্তোলার গলায় ঝুলে পড়ে তার বিবি গোলসন। সেখানে তার নতুন সন্তান আসে- ময়না। বাবর আলির মাথা খারাপের সময় তার এক চাচাতো ভাই গাঁয়ের জায়গাটুকু বেদখল করে নেয়। কেবল বাবর আলির মত মানুষের দুঃখ নয় সেখানকার মানুষের হরতাল প্রতিবাদ সভাসমিতি , মজুরদের সম্মিলিত বাঁধ ভাঙা আবেগে উদ্দীপিত হয়েছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ। তাঁর উপলব্ধির কথায় লেখক লেখেন — বজবজের মাথায় যে আকাশটাকে দেখেছি তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন বাবার আলির চোখের কথাই ফের মনে পড়ল। পাগল বাবার আলি নয়। যে -বাবার আলি ঠক্‌ঠকি তাঁতের সামনে সারা রাত বসে জীবনের সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়া করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার চোখের সঙ্গেঁ এই গনগনে আকাশটার তুলনা করা চলে।'' (বাবর আলির চোখের মত/যখন যেখানে)।

মন্বন্তর ও যুদ্ধের বাজারে সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতার অদূরের কাঁচরাপাড়া বিষ্ণুপুর থেকে ময়মন সিংহের হালুয়াঘাট-ভুমনাকুড়া-ভুবনকুড়া সর্বত্র দেখেছিলেন একই ছবি এক দিকে এক শ্রেণীর মানুষের চরম অমানবিক ভোগসর্বস্বতা আর এক শ্রেণীর অনাহার ক্লিষ্ট লাশের মিছিল। এক শ্রেণীর মানুষ গ্রাম গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে বিদেশী বিমান ঘটি, সেনা ছাউনি ও

সাকিলী নাগরিক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অসংখ্য গ্রাম্য মানুষকে ভিটে ছারা হতে হয়েছিল। এরকম একই প্রত্যক্ষ ছবির কথায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন— ''যাচ্ছিলাম বিষ্ণুপুর গ্রামে। খবরের খোজে। দেখেই রস্তার মধ্যে হেঁকে ধোরল একগাদা লোক। হাতে জরিপের ফিতে নেই, তবু ভেবেছে আমিন। অনাথ বিধবার দল কেঁদে পড়ল, পথের ভিখিরি বানিয়েছে বাবা।''বলতে বলতে আচলের খুঁট থেকে খুলে দেখায় পোকায় খাওয়া ছেঁড়া উলিডুলি দলিল - পাট্টা।

তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকা এক বুড়ি ঠাকুর ঘড়ে ভাঙা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধান সিঁন্দুর লেপা অস্পাস্ট ছবির সামনে মাথা ঠোকেন। সাত পুরুষের অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো এই ভিটে ধুলোয় মিশে যাবে, প্রাণ থাকতে কেমন করে সহ্য হয়? (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)। এভাবে গ্রামগুলো জনশূণ্য হয়ে এবং মহামারী মন্যন্তরের আঘাতে দলে দলে দুমুঠো অন্নের জন্যে রাজপথে ভিড় করে। লেখক মহিষাদলের এক গ্রামের ছবিতে লেখেন— ''পেছনে ফেলে এসেছি কঙ্কালের খাল। তার দুটো পাশ চিক্ চিক্ করছে রোদ্দুরে। লাইনবন্দী হয়ে পড়ে আছে মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। দুভিক্ষে শুরু, মড়ক আর মহামারীতে বয়ে চলেছে মৃত্যুর সেই একটানা স্রোত।'' (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)। লেখক এই খবর সন্ধান এবং সামাজিক মূল্যের সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবন দর্শনের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ''সাধারণ মানুষের তাপদগ্ধ জীবন, সেই জীবন থেকে উৎসারিত তার ভাষার মহাসম্পদ থেকে আমরা যারা বঞ্চিত - তাদের এ নিস্ফলতা অনিবার্য। হয়ত অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে তবেই পৃথিবীতে আগামী দিনের খবর দেওয়া সম্ভব।'' (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)

এই গদ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জাত বিষয় হয়ে উঠেছে ১৯৫২ সালের২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন। সেদিনের বর্ণময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন - ''সারা শহরটা থমথমে। দোকানপাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ। ছাত্ররা জড়ো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। রাস্তায় পুলিশ ট্রাকভর্তি। রোদ তেতে উঠেছে মাথার ওপরে। কপালের দুধারে রগ করছে দপ্দপ্। মুখগুলো সবাইর উত্তেজনায় চকচকে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়র উঠেছে।'' (একুশের সুরে বাঁধা/যখন যেখানে)। লেখক সে দিনের সেই লড়াইএর কথায় ভেবেছিলেন - ''নিজের দেশের প্রতি ভালবাসার আর আত্মবিশ্বাসে সেখানকার সাধারন মানুষ আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। পুরনো শৃঙ্খল তারা ছিঁড়বে নতুন করে আর

শিকল পরতে চায় না। ভাষার প্রতি ভালবাসার ভেতর দিয়ে সাড়ে চার কোটি মানুষ আজ বাঁধামুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।'' (একুশের সুরে বাঁধা/যখন যেখানে)। একুশে ফেব্রুয়ারীতে আবুল বরকত, সালাম রফিক ও জব্বারের আত্মবলিদান লেখকের রাজনৈতিক সত্তায় উত্তাল আলোড়ন তুলেছিল সেদিন। এই সত্তায় তিনি বাংলার মাঠ-ঘাট প্রকৃতি ও পাখির সঙ্গে একাত্ম হয়ে লেখেন ''আমরা আবার হাতে হাত দিয়ে বুকে বুক দিয়ে গলায় গলা মিলিয়ে পাখির ভাষায় বলে উঠলাম, আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।'' (লিখতে বারণ/যখন সেখানে)।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের শৈলীতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে রচনার আলম্বন বিভাগ হিসাবে গ্রহন করেছেন। বাংলার গাছপালা-মানুষজন-সমাজ প্রকৃতি দেশ প্রভৃতি এমন কি বাড়ির পোষা কুকুর বেড়ালকে নিয়েও কাহিনী নির্মাণ করেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি অমানুষিক কাহিনী। গদ্যে তার বাড়ির পোষা কুকুর বিলি ও বেড়াল রুসির সঙ্গে তার পশু প্রমের পরিচয় আমরা পাই। তাঁর বাড়ির বিলির কথায় তিনি লেখেন — '' সেবার চটকলে কী একটা গন্ডগোল হওয়ায় আমাদের দুজনের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরলো। গোটা গ্রাম আমাদের লালকেল্লা। দিনের বেলাটা আমরা বাড়িতেই থাকি। দু-তিন জায়গায় ছেলে মেয়েদের দল আছে পাহারায়। বাড়িরটা শুধু এর বাড়িতে ওর বাড়িতে সরে থাকি। গ্রামের সব বাড়িতেই আমাদের অবারিত দ্বার। সব চেয়ে মুস্কিল করল বিলি। গ্রামে প্রচারে বেরোবার সময় বিলি আমাদের পেছন পেছন ঘুরত, তাড়িয়ে দিলে খানিকক্ষণ পরে ঠিক দেখা যেত ও আমাদের সঙ্গে চলেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা হাল ছেড়ে দিলাম।'' (একটি অমানুষিক কাহিনী/যখন সেখানে)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনা ও তার কাব্য রচনাকে সম্পাদকের প্রকাশকের প্রকাশে অনিচ্ছার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ অসাধারন শিল্পগুনে গদ্যরূপ দিয়েছেন তাঁর একটি প্রতিবাদ পত্র শীর্ষক গদ্যে। সেখানে এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি লেখেন - ''কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, আপনাদের পুজো-সংখ্যায় আমি নাকি গল্প লিখছি। মানতেই হবে, আপনি একজন তুখোড় সম্পাদক, নইলে লেখা এড়াবার এমন একটা কৌশল আপনি খাটালেন কেমন করে ? এই ভেবে আমার মজা লাগছে, আমার কবিতার ভয়ে শেষটায় আমার নামে আপনাকে একটা গল্প খাড়া করতে হল।'' (একটি প্রতিবাদ পত্র/যখন যেখানে)।

দেশের স্বদেশী আন্দোলনের পারিবারিক প্রভাবকে লেখক গদ্যের বিষয় করেছেন। তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের উপলব্ধি সম্পর্কে বলেন — ''আমার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। পুলিশের ভয়ে নয়, পাছে বিজুদির মা ধরে ফেলেন সেই ভয়ে। এ ব্যাপারটাকে পুরোপুরি স্বদেশী বলে আমার কেমন যেন খুব বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে ওপরের কাকিমাদের ছাদের ঘরে বসে দুপুরে বিজুদি আর শঙ্কুদা যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিপ্লবীদের বইপত্র পড়ত, ওদের মুখ থেকেই তা আমি জেনেছিলাম। আমার বাবা সরকারী চাকরি করেন বলেই ওসব বই পড়বার সময় শঙ্কুদা কিছুতেই আমাকে ওদের ধারে কাছে থাকতে দিত না।'' (একটি প্রতিবাদ পত্র/যখন যেখানে)।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর-কলকারখানা-নগর ঘুরে ঘুরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে পূর্ণতার মাত্রা সমৃদ্ধ করেছিলেন; সেইসব ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য তাঁর ডাকবাংলার ডায়েরী। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১লা ভাদ্র ১৩৭২, নবপত্র প্রকাশন, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ থেকে। লেখক 'ডাকবাংলার ডায়েরী' লিখতে শুরু করেছিলেন ১৯৫৮-র শেষ দিকে সুবচনী চন্দ্র নামে আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি হল — 'এপার বাংলা', 'সানালি সুতোর পাকে পাকে', 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর', 'মানচিত্র ও মানহানি', 'তাল দীঘি লাল মাটি', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'হামনাবাদ', 'ফুলের লোক্যালে ফেরা', 'নিম নয়, তিতা নয়', 'ক্যাকটাসের ফুল' এবং 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর'। বংলার ডাকে সাড়া দিয়ে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সোনার বাংলার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে লিখে ছিলেন আমার বাংলা। তারপর এক যুগ কেটে যায়, সেই বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলোক পরিবর্তনের প্রকৃত্তি অন্বেষণের সুতীব্র আগ্রহে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন বাংলার শহর বন্দর গ্রাম ও গঞ্জেও, সেই অভিজ্ঞাতা প্রকাশের মূল্যবান গ্রন্থ ডাক বাংলার ডায়েরী। সেকথা ব্যক্ত করে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ও পটভূমিকা অংশ স্বয়ং লেখক বলেন — ''আমার বংলার পর ডাকবাংলার ডায়েরী।'' এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বিখন্ডিত দেশ। স্বাধীনতার সমবয়সী দুটি দশক।

আস্ত অটুট ষোলআনা বাংলা দেশ নয় আর। এখন পূর্বে পশ্চিমে দশ আনা ছ-আনার দুভাগ হওয়া বাংলার জল-হাওয়া-মাটি। ভাই ভাই এখন দুই ঠাঁই। দুদিকে পৃথক দুই রাজ্যপাট। ভিন্ন নাম নিশান। কিন্তু নাম আলাদা হলেও ডাক এক, ডাক বাংলা। এ তাই সেই এপারের একালের দিগ দেশ

চিহ্নিত ডাকবাংলার ডায়েরী। লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবনের বনগাঁ বর্ডারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত 'এপার বাংলা'। সেই সীমান্ত বা বর্ডার শব্দ তার মানে গভীর রেখাপাত করেছিল ''বর্ডার। তার মানে, সীমান্তে এসেছি। হঠাৎ মনটার মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। এই অবধি তাহলে আমাদের আপন। কিন্তু তারপর ? তারপর কি পর হয়ে গেছে ?

স্টেশনের রাস্তাটা দেখে চেনা যায় না। সামনে ফুটবলের মাঠটা গেল কোথায় ? আর সেই শিমুলগাছ ? কালবোশেখির ঝড় উঠলে পট্ পট্ আওয়াজে তুলোর পাখা মেলে বীজ ছড়ানোর দৃশ্য ? আকাশ থেকে বরফ পড়তে দেখলে আজও সে দৃশ্য মনে পড়ে যায়। রাস্তার দুপাশে রুজু রুজু দোকান। যতদূর দেখা যায় কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। ছেলেবেলার যে ছবিটা মনে মনে এঁকে এনেছিলাম, সেটা মিলিয়ে নেবার কোনো উপায় নেই।'' (এপার বাংলা/ ডাকবাংলার ডায়েরী)। বনগাঁর সেই সীমান্তে ভ্রমণের সুবাদে তাঁর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আজহার, মাদার মন্ডল, ওয়াজেদ আলি প্রমুখ সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে। এখানকার বিভিন্ন জায়গার– হরিদাসপুর, বরাকপুর গ্রাম, বেলেডাঙ্গা গ্রাম, নাতিডাঙ্গা, সন্দরপুর, নিশ্চিন্দিপুর, চাঁদপাড়া প্রভৃতি বিচিত্র জীবনের পরিচয় সমকালের পটভুমিতে আমাদের কাছে সত্যরূপে শিল্পের বিষয় করে তুলেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।সীমান্তে বসবাস কারি মানুষের সঙ্গে তাদের মুখের জীবন্ত ভষায় নানা টুকর টুকর গল্প ও সংলাপে গদ্যটি আমাদের হৃদয়ে রস সঞ্চারে সমর্থ হয়ে ওঠে। বাংলা ভাগের পর সীমান্তে এলাকা বাসীর সুপারী - নরকেল প্রভৃতি দ্রব্যের চোরাকারবার তাদের অর্থ সামাজিক জীবনচিত্র তুলেধরেছেন লেখক। সেখানকার মানুষ গুলোর জীবন সত্যের নানা কথা গল্পের শৈলীতে যুক্ত করে এই জীবন বৃত্তান্তে- পাঠকের নিরবিছিন্ন পাঠের আগ্রহ আদ্যপান্ত বজায় রেখেছেন তিনি। কথা সাহিত্যিক বিভুতিভূষন বন্দোপ্যাধায়ের বাড়ি দেখার অভিজ্ঞতায় তিনি লেখেন– ''চারিদিকে লতাপাতায় এমন ভাবে ঢাকা যে, স্পষ্ট করে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কলা গাছের ডাল আমডাল জড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি। বাঁদিকে বিভূতিভূষণের বাড়ি। আলো জ্বলছে। কারা যেন এখন থাকে।

ডানদিকে আঁশশেওড়ার বন পেরিয়ে ইন্দুভূষণ রায়ের বাড়ি। ভদ্রলোক দুঘন্টা ধরে বিভুতি ভূষনের কত গল্পই যে করলেন। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। মেয়েটি শহরের হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। ভারি সুন্দর গানের গলা। নিশ্চিন্দি পুর আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় অকু আর জন্ম

নেবে না। তা নিয়ে দু:খ করেও খুব লাভ নেই। দেশ-কাল-পাত্রের রূপান্তরে সাহিত্যেও নবযুগ না এসে কারে না।'' (এপার বাংলা / ডাকবাংলার ডাকে)।

অনেক দিনপর আবার তার পুরনো বজবজের মানুষ-সমাজপ্রেক্ষিত-অর্থসামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন-শিল্পে ধরে রেখেছে তাঁর 'সোনালী সুতোর পাকে পাকে' শীর্ষক গদ্যে। কলকাতা থেকে বাস ধরে তিনি একবালপুর-মোমিনপুর-টাকশাল-মহেশতলা-সন্তোষপুর হয়ে তিনি বজবজ পৌছান। বজবজ যাবার পথে রাস্তার দুপাশের প্রকৃতি-জনজীবন নানা ছবি তাঁর এই গদ্যে তুলে ধরেছেন। বজবজের পুরনো চোখেদেখা মানুষ ও জনজীবনের স্মৃতিকথার ঢঙে নতুন জীবনের কথা বদলেছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। সেখানকার ব্যাঞ্জনহেড়িয়ার কথায় তিনি লেখেন আজ ব্যাঞ্জনহোড়িয়া গ্রামের চেহারাই আলাদা। আগে একটা চিঠি লিখতে হলে ছুটতে হত ফকির মহম্মদের ছেলের কাছে। লিখতে না জানার জন্যে লোক ঠকেছেও খুব। এখন চিঠি লেখার লোক বলতে গেলে ঘরে ঘরে আছে। এই ক-বছরে ম্যাট্রিক পাসের সংখাও এ গ্রামে নেহাত কম হল না।'' (সোনালি সুতোর পাকে পাকে/ডাকবাংলার ডায়েরী)। এই বর্ণনায় লেখক বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন জীবনের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। এই গদ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার প্রসঙ্গে ছবিগুলি এঁকেছেন লেখক। স্বাভাবিক ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে- ভূবন, টমাস, জহিরন, আতর, সাজ্জাদ, ময়না আমিনা,গোলবাবু,আহম্মদ প্রভৃতি চরিত্র।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি হল মানুষ ও দেশ। মানুষ বলতে খেটে খাওয়া মানুষ এবং দেশের জন্যে নিবেদিত প্রাণের সংগ্রামী মানুষ। এই সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনে সমিতি গঠনের প্রয়াসকে শিল্পের বিষয় করে লিখেছেন 'ছুরি কাঁচি ট্রাক্টর'। লুপ লাইনে বর্ধমান থেকে বনপাশে ভ্রমণ করে বনবাসের কামারপাড়ার রামগোপাল মাথুর-এর তরোয়াল তৈরী কিংবদন্তি মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সেই বনপাশের কালের নিয়মে পরিবর্তনের রূপটি তাঁর এই গদ্যে পাই আমরা-''গ্রামে বৃত্তি বদলের ইতিহাসটা ভারি মজার। কর্মকারের বাস হলেও এখন বেশির ভাগ ঘরেই হয় সোনা-রুপোর কাজ। ঝরিয়া, ধানবাদ, কাতরাসে যেমন, তেমনি আসানসোল, বর্ধমান আর কলকাতায় গিয়ে এখানকার কারবারীরা সোনা-রুপোর দোকানে কাজ করে। কামারের এক ঘা কী করে সেকরার ঠুকঠাকে দাঁড়িয়ে গেছে তার পুরো ছবি এখন আর পাবার উপায় নেই। এই বদল

হয়েছে ধাপে ধাপে।''(ছুঁরি কাঁচি ট্রাক্টর/ডাকবাংলার ডায়েরি)। ডায়েরির সাধারণ অর্থ-অতিক্রম করে লেখক ব্যক্তি জীবনের দিনলিপির বর্ণনার উর্দ্ধে সামাজিক পরিবর্তনের লিপিকে সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছেন এখানে। তাই ডাক বাংলার ডায়েরী সামাজিক প্রভৃতি ও পরিবর্তনের রূপ বদলের লিপিবদ্ধে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য সৃজনের নিদর্শন হয়ে ওঠে।

সামাজিক পরিবর্তনের ভিন্ন প্রকৃতির সমাজ ডায়েরীতে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন - ''গ্রামের যারা ছোট জাত, তাদের বাড়ি থেকে তাঁত শিখতে কেউ আসে না। একে সারাক্ষণ পেটের ধান্ধা, তার ওপর সমাজে ছোঁয়াছুয়ির বিচার। গোড়ায় গোড়ায় সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়েদেরও সহজে কর্ম কেন্দ্রে আনা যায়নি। যেসব পরিবারে রাজনীতির চর্চা আছে, তাদের বাড়ির মেয়েরাই কর্মকেন্দ্রে যাওয়ার চক্ষুলজ্জাটা প্রথম ঘুচিয়েছে।'' (ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর/ডাকবাংলার ডায়েরী) সমাজ তাত্তিক পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে বাংলার জনজীবনের গতিপ্রকৃতির পালাবদলের ছবি একেঁছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সমকালের বিপর্যস্ত বাংলার কথায় লেখক বলেন - ''তিন ভাগের এক ভাগ চাষী পরিবার লাঙলগরু বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেছে। কেউ গেছে পাকিস্তানে, কেউ গেছে এদিক-ওদিকের আশ্রয়-শিবিরে।'' (নামচিত্র ও মানহানি/ডাকবাংলার ডায়েরি)। মানুষ ক্রমশ বিপর্যয় কাটিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়। কোথাও কোথাও সরকারী সাহায্যে কলোনী গড়ে তোলে। সামাজিক জীবনের গঠনমূখী ছবিও সেই সমাজ ডায়েরীতে স্বাভাবিক ভেবে উঠে আসে। ''সে জায়গায় ধরে এনে বসানো হল উদ্বাস্তুদের যারা এক ফোঁটা জমির জন্যে মরে যাচ্ছিল। সাড়ে চারশো ঘর লোক নিয়ে গড়ে উঠল বিরাট এক কলোনি। বারো আনা পরিবার চাষ করবে আর বাকি সবাই দোকানপসার করে খাবে। যারা চাষী পরিবার তারা চাষের জন্যে ন-বিঘে আর ভিটের জন্যে পেল এক বিঘে জমি। ব্যবসায়ী পরিবারদের দশ কাঠা করে বসতের জায়গা। ঘর তুলবার জন্যে সকলেই পেল পাঁচশো টাকা করে ঋণ। এ ছাড়া চাষবাস আর ব্যবসার পুঁজি পাটার জন্যে আরও কিছু টাকা কর্জ দেরার বাবস্থা হল।'' (মানচিত্র ও মানহানি/ডাকবাংলার ডায়েরী)। নবদ্বীপের বেথুয়াডহরী, চকহাতীশালা, যুগপুর প্রভৃতি মৌজা ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞালব্ধ সে কালের বাংলার সমাজ গঠনের ছবিটি লেখক সামাজিক ডায়েরির

অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট ঘুরে শান্তিপুরের কাপড়ের শিল্পীদের বাজার ও শিল্পের বিরোধের ছবিটিও লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক মানচিত্র ও মানহানি শীর্ষক ডায়েরিতে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এমন ডায়েরিতে সমকালের বাংলার বিপর্যয়ের ও বাংলার দীনতার ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি। তার সাহিত্যে আমরা একজন সহৃদয় লোক সাহিত্যিকের জীবন চেতনার শিল্পরচনার নিদর্শন পাই। তাঁর রচনায় জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে ওঠে গ্রাম্য মেলা-গরুর গাড়ি-মাটির হাঁড়িকুঁড়ি হুঁকোর দোকান-মাছ ধরার জাল ধান মাপার ধামা আমোদ প্রমোদের আড্ডা, বাউল গান, গাঁজার আখড়া ইত্যাদি। বোলপুরের মেলার কথায় লেখক বলেন — " পৌষ-সংক্রান্তির দিন আজ। গেরস্থরা লক্ষ্মীপূজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধনা পরব, পয়লামাঘ, ডোমহাড়িদের এখ্যান-পুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়। দুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন। আগে দু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁদুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে।" (তাল দীঘি লাল মাটি/ডাকবাংলার ডায়েরী)। বাউলের গানে লেখকের সৃজনীমন সিক্ত হয়ে ওঠে —

"হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় কই ?
কোথা কে দিবানিশি
আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।" (তাল দীঘি লাল মাটি/ডাকবাংলার ডায়েরী)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই ভ্রমণধর্মী ও ডায়েরি ধর্মী গদ্য সাহিত্যে বাংলার জনজীবন ও বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির বৈচিত্র্য বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে বাক্‌ময় করে তুলেছে। লেখক সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার, ফ্রেজারগঞ্জ বা নারায়ণতলা মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামারি কুলপি ট্যাংরার চড়াকরঞ্জলি প্রভৃতি স্থানের নানা অভিজ্ঞতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনায় পাই আমরা। সেখানকার নানা লোককথা উপাখ্যান কৃষি বানিজ্য আর্থসামাজিক জীবনের ছবি তাঁর রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সুন্দর বনের নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে একাত্ম করে ছোট ছোট গল্প কথায় লেখকের শৈলী

রচনা পাঠের বিরামহীন ঐক্যসূত্র অটুট রেখেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়– ''ঢেউয়ের ছিটে আর ঝিরঝিরে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিগ্যেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো ? গঙ্গা যেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মন্ডহারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহনাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুড়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহনা। লোকে বলে মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্রে পড়ে।'' (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা/ডাকবাংলার ডায়েরি)। এখানকার মাছের কারবার পানের চাষ বিভিন্ন কাঠ ও পাটের সঙ্গে আর্থ সামাজিক সামগ্রিক ছবিতে লেখকের ডায়েরির প্রকৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য পূর্ণ রচনাশৈলী নির্মাণের সার্থকতা লাভকরি। লেখক সেখানকার রানীচক রত্নার চক ঘুরে ঘুরে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মন্বন্তরের বছরগুলোতে সেকালের হিন্দুরা বাড়িতে মুরগির চাষ করতো কিন্তু এখনকার হিন্দুরা বাড়িতে মুরগি পোষে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষী ভাগচাষী। এই চাষী কৃষকদের দুর্যোগের মোকাবিলার উপায় হিসাবে লেখক বলেন– ''বছর পনেরো ষোল আগে এখানে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্মগোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। ফলে, আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।'' (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

ভ্রমণ কাহিনী ধর্মী ও রিপোর্টাজ মূলক রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন লেখকের স্বীকৃতি – ''আমার চোখ আমার পা দুটোতে বাঁধা। পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমি দেখি। ব্যাসদেবকে নয়, আমি দেখি বাংলা দেশের মুখ।'' (হাসনাবাদ/ডাকবাংলার ডয়েরী)। ইছামতীর ধার হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ প্রকৃতি এলাকায় জনজীবন ব্যবসা বানিজ্য আনন্দ উৎসব সংস্কার কুসংস্কার প্রভৃতি জনজীবনের সামগ্রিক পরিচয় সাহিত্যভুক্ত করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় – ''নদীর ধারে জেলে পাড়া। পুজোর পর মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে জেলেরা যায় সুন্দরবনে মধুর চাক কাটতে, মাছ ধরতে। বনের মধ্যে ওপর

দিকে মৌমাছির দিকে চেয়ে মৌচাকের খোঁজ করতে করতে অনেক সময় তারা সটান গিয়ে পড়ে বাঘের পেটে। যে ক-মাস তারা বাইরে থাকে, বাড়ির মেয়েদের হয় হাঁড়ির হাল। অভাবে স্বভাবও নষ্ট হয়। ওদিকে আবার ঘরের মানুষেরা বাড়ি ফেরে রোগব্যাধি আর মনে কু-সন্দেহ নিয়ে।

জেলে পাড়ায় তাই কখনও সুখ এলে শান্তি আসে না। অন্ধ কুসংস্কারগুলোও যায় না। ছোট ছেলেদের নাকি বনদেবী মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেন; নাকি বলে দেন নদীর ঠিক কোন জায়গায় মাছের ঝাঁক আছে। বছর চারেক আগে বনদেবীর নাকি আদেশ হয়েছিল একটি শিশুকে হত্যা করবার।'' (হাসনাবাদ/ডাকবাংলার ডায়েরি)। সেখানে যাদের জায়গা জমি নেই তারা কষ্টে শাপলার নল সেদ্ধ করে খায়। শাপলার নোনতা নোনতা ঢ্যাপের দানার খৈ, কচু শাক, বীচিকলা সেদ্ধ করে খায়, নদী পাড়ের মানুষের জীবনযাত্রা অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্যের রস সৃজনে অসাধারণ সম্পদ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

লেখকের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনার সূত্রে আমরা বাংলার স্থানের বর্ণময় পরিচয় পাই। সেইসব স্থানের বিভিন্ন কমে নিযুক্ত অসংখ্য চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা। লেখক বাননান-বৈদ্যনাথপুর-দেউল গ্রাম-ফুলবেনিয়ার ফুলচাষী, কামার কুমোর জেলে অঙ্কবার চিরুনিকার চর্মকার প্রভৃতি পেশার মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর লেখায় চিত্ররূপ দান করেছেন। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেই মানুষগুলোর সামগ্রিক রূপান্তর তাঁর গদ্যে বিষয়রূপে স্থান দিয়েছেন লেখক - ''যারা ছিল স্বাধীন শিল্পী, এখন তারা ক্রমেই মহাজনদের কারখানার মজুর হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি বসে কাজ করলেও মজুরি নিচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে।'' (ফুলের লোক্যালে ফেরা/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

ডায়েরিধর্মী রচনার মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করেছে লেখকের ভৌগোলিক চেতনা। এই ভৌগোলিক চেতনায় খাঁটিমানুষ ও মানুষের জীবিকা সিংহভাগ অধিকার করে বসে। ধুলিয়ান স্টেশন হয়ে লেখক ঔরঙ্গাবাদ, নিমতিতা প্রভৃতি জায়গায় জনজীবনকে সাহিত্যের সত্য বিষয় করেছেন লেখক। চাষীর আর্থিক অবস্থানের বর্গীকরণ করে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— ''উনিশশো একচল্লিশের ভাঙনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু-আড়াই হাজার বিঘে জমি গেছে নদীর পেটে। জোত খুঁইয়ে পাঁচ-ছশো চাষী পরিবারকে জাতও খোয়াতে হল। এরা এখন কেউ মোট বয়, কেউ বাগান

নিড়োয়, কেউ ঘরামির কাজ করে, কেউ গাড়ি চালায়, কেউ আনাজপাতি বেচে। তবে এদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই এখন বিড়ি বাঁধে।

চাষীদের মধ্যে এখানে মোটামুটি তিন জাত। মুসলমান, মাহিষ্য আর ধানুক। মুসলমান চাষীরা বেশির ভাগ থাকে বাগড়ী এলাকায়। নদীর ধারে ধারে। মেটাল এলাকায় থাকে মোটামুটি মাহিষ্য আর ধানুক। ধানুকরা এসেছে বিহার থেকে। রাঢ় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই বাস। আরেকটা জাত আছে, তাদের বলে 'চাঁই'। তারা সাধারণত তরিতরকারির আবাদ করে।'' (নিম নয়, তিতা নয়/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

এই বাংলাদেশ ও এখানকার প্রকৃতি লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনী বোধকে অধিক আলোড়িত করেছিল। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠান তার সত্তা। তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ করা বাংলাদেশের কথা ডায়েরি ধর্মী ভ্রমণ কাহিনী মূলক-রিপোর্টাজ ধর্মী রচনার প্রধান বিষয়। সেকথায় তিনি লেখেন — ''আসলে আমাদের প্রত্যেকের মনেই বাংলাদেশের একটা করে ছবি আছে। আমরা যদি প্রত্যেকে এঁকে দেখাই, কারো ছবির সঙ্গে কারো ছবি মিলবে না। যদি কোনো মিল পাওয়াও যায়, তার মূলে যতটা না বাংলাদেশ —তার চেয়ে বেশি রেলের লাইন। ট্রেনে করে আসতে যেতে দেখা বাংলাদেশ। ছোট বড় ডোবা। আম কাঁঠালের বাগান। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। ঘুঁটে-লাগানো দেয়াল। ঋতুভেদে আকাশ আর মাঠের রকমারি রূপ। কোথাও গরু চরাচ্ছে রাখাল। কোথাও পাঠশালায় ছেলেরা পড়ছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি।'' (ক্যাকটাসের ফুল/ডাকবাংলার ডায়েরি)। বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এবং একেবারে সাধারণ ছবি সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য শিল্পিতরূপ দানে অসাধারণ করে তোলার মহতী প্রয়াস এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঁকুড়ায় ঘুরে ঘুরে দেখা সেখানকার বেলেতোড়, বনগ্রাম, বিষ্ণুপুর, ফকিরডাঙ্গা, পাঁচমুড়া, বহড়ামুড়ি, বনকাটা, ইঁদপুর, পাথরডিহি, খাতরা প্রভৃতি স্থান শুশুনিয়া পাহাড়, কংসাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদী তীরবর্তী জনজীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি বর্ণনা ধর্মী আঙ্গিকে সহজ ভাসায় অসাধারণ ছবি এঁকেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র জনজীবন চাষবাস-বনজঙ্গলময় প্রকৃতিকে শিল্পের বিষয় করে তুলেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক জনজীবনের ছোট ছোট কাহিনীর মাধ্যমে জীবন ভাবনা ও সমাজচেতনার মূলে পৌছে যাবার প্রয়াসে তথ্যানুসন্ধান করেছেন। হুগলী জেলার তারকেশ্বরের বাবাজীদের কথায় লেখক বলেছেন — ''বেশ্যাসক্তি, পরদারগমন, ফুসলানো, বলাৎকার, খুন— বাবাজীদের গুণের ঘাট ছিল না। কারো ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ফাঁসিকাঠে, কেউ বা জেলে ঘানি টেনে এসে গদিতে আবার গ্যাঁট হয়ে বসেছে। আজ আর সে বাবাজী মোহান্তরা নেই, কিন্তু বাবা তারকনাথের দবদবা যেমন তেমনিই আছে। শুধু হাওড়া স্টেশনে কেন, শহরের সর্বত্রই দেখবেন বাসন্তী রঙে ছোপানো কাপড়ে টুং টাং টুং টুং করতে করতে কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে দলে দলে লোক। যাবে তারকেশ্বরে। বাবার থানে।'' (নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর/ডাকবাংলার ডায়েরি)। তারকেশ্বরের সাধারণ বর্ণনায় আমরা দেখি বাবাজীদের জীবনের ধর্মীয় চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে মূলের তথ্যানুসন্ধান করা লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসা।

ভ্রমণ কাহিনীধর্মী ও রিপোর্টাজমূলক রচনা লেখকের রচনার গুণে পাঠকের মনে অহৈতুকী রসের সঞ্চার ঘটে। লেখক বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে কোন স্থানের পরিচয়ের সঙ্গে সেখানকার মানুষের জীবনের টুকরো কাহিনী যুক্ত করে বিস্তৃত একটি ফ্রেম নির্মিত করে চলেন অবলীলায় — ''আমাদের ঐ যে অমুকের ভাই গো, সে মুখপোড়াও এখন মাস্টার হয়েছে। কোন্নগরের কাছে কোথায় পড়ায়। ওর দাদা দিন মজুরি করে কত কষ্টে ওকে পড়াল। এম.এসসি পাশ করাল। বুড়ো মা, ভাই, দাদা — কারো দিকে সে আজ একবার চেয়েও দেখে না। কলকাতার ভদ্দরলোকদের তো জানেন . . . আজকাল এক কায়দা হয়েছে। মেয়ের জন্যে মাস্টার রাখে, তারপর সেই বড়শিতেই মাস্টারকে জামাই হিসেবে গেঁথে তোলে। ওর তাই হল। এক উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে। তাও দেখতে ভাল হলে কথা ছিল। বাপটা বিনি পয়সায় মেয়ে পার করে দিয়েছে। বোকা আর কাকে বলে। কেন ? বাগ্দী সমাজে কি মেয়ে জুটত না! দু-পাঁচ হাজার টাকা দেবার মত লোকও পাওয়া যেত। কী হবে ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে? লেখাপড়া শিখে তো এই হাল . . . . ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল — সমস্যাটা জাতের নয়, লেখাপড়া শেখা না শেখারও নয়। সমস্যাটা শ্রেণীর। কাছের লোক দূরে চলে যাবার। যাকে ধরে বাকি সবাই উঠে দাঁড়াবে ভাবছিল, হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে তার ওপরে উঠে আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া। সত্যিই তো। একে বাঁচা বলে না। পালানো বলে।'' (নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

এই দৃষ্টান্তে আমরা দেখি লেখক তার ভ্রমণের বর্ণনাগুলিতে কাহিনী যুক্ত করে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে সেগুলিতে তাঁর নিজের সত্তায় সমাজ ভাবনা, প্রকৃতি চেতনা, মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সমাজ মানস ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ ভ্রমণ কাহিনীধর্মী রচনার প্রকরণের অভিনব বৈশিষ্ট্য রূপে তাঁর হাত ধরে নির্মিতরূপ লাভ করেছে।

ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দরবন থেকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত তাঁর নারদের ডায়েরি গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, ৪২ বিধান সরনী, কোলকাতা ৬, ডি. এম লাইব্রেরী থেকে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত দশটি গদ্য হল — 'না রদবদল', 'সমুদ্র সাধ', পারগঙ্গা', 'কুকুরের নাম মিঠু', 'বিপদ গ্রস্ত হলে', 'বকুল গাছের তলায়', 'যে দিকে দুচোখ যায়', 'সভারোহী', 'মরশুমের দিনে' এবং 'যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' শীর্ষক গদ্য। জীবনকে দেখা ও সত্যকে বিশেষ রূপে জানার আগ্রহ নিয়ে লেখক রাস্তাকেই একমাত্র রাস্তা করে নিয়েছিলেন। সেই জীবনকে জানার ও সত্যকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করার সুতীব্র আগ্রহ নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'না-রদবদল' গদ্যাংশে লেখক পৌরাণিক নারদ ও সনৎকুমার কল্পিত চরিত্রের কথোপকথনে বলেন মানুষ নিজের নামের জন্যই সব কিছু করে। কিন্তু কথা তার থেকাও বড়। আবার কথার চেয়ে বড় সংকল্প। কিন্তু সংকল্পের চেয়ে বড় চিত্ত। চিত্তের চেয়ে বড় ধ্যান। আর ধ্যানের চেয়ে বড় বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞানের চেয়েও বড় বল। বলের চেয়ে বড় অন্ন। যদিও অন্নের চেয়ে বড় জল। জলের থেকে বড় তেজ। তেজের চেয়ে বড় আকাশ। আকাশেরর চেয়ে বড় স্মৃতি এবং স্মৃতির চেয়ে বড় আশা। কিন্তু জীবন আসার চেয়েও বড়। সেই জীবন সম্পর্কে লেখক লিখেছেন — "জীবন আশার চেয়েও বড়। জীবনই সবকিছুর গোড়ায়। রথচক্রের নাভিতে যেমন শলাকার পর শলাকা গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত কিছুই জীবনের সঙ্গে লেগে থাকে।" (না রদবদল/নারদের ডায়েরি)। গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ভাবনা ও জগৎসত্যের বৃহৎ তত্ত্ব এই গদ্যাংশে আচার্য সনৎ কুমার ও ব্রহ্মাপুত্র নারদের কথোপকথনে সহজ ভাব ও সরল ভাষার অসাধারণ শিল্পরূপ পেয়েছে।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরীধর্মী রচনাগুলির দিন তারিখ দিয়ে গতানুগতিক ডায়েরী রচনা নয়। তাঁর গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবিগুলিকে তুলে ধরেছেন

এই সব রচনায়। সমুদ্র সাধ শীর্ষক গদ্যাঅশে তিনি হুগলী হলদিয়া কাকদ্বীপ মাডপয়েন্ট, ফেরিনটোপ, ট্রাওয়ার ল্যান্ড, শিকারপুর, ধোবলাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখার প্রত্যক্ষ জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তার সেই ডায়েরি ধর্মী রচনাগুলিতে আমরা দেখি স্থানভেদে তাঁর মানস পটের বর্ণময় প্রকাশ— ''পরে মাডপয়েন্টে দুবার গিয়েছি। একমাত্র গ্রীষ্মের শুরুতে একবার শীতের গোড়ায়। শেষের বারে লণ্ডা ছিল ফ্রেজারগঞ্জ যাবার পথে একটা রাত থেকে। মার্চ মাসে যা দেখে গিয়েছিলাম, ডিসেম্বরে দেখে কান্না পেল।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি) সেই সব রচনায় লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষনী সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানের জীবন পটের অবস্থানের শিল্পরূপদান করেছেন — ''এত বড় মৌজায় সাপে কাটুক, ওলা উঠা হোক — চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা নেই। কাজেই মা-মনসা, মা-শীতলার ভরসাতেই এই নির্বাসিত জনপদের বেঁচে থাকতে হয়। সাপ আছে সব রকমেরই। শিয়রচাঁদা, কালকেউটে, গোখরো, তেঁতুলে, কেউটে। চন্দ্রবোড়া, বিষধর, প্রায় সব সাপই।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)। ডায়েরী ধর্মী এইসব রচনায় আমরা দেখি লেখক জীবনকে দেখার মৌলিক সত্ত্বা। সেই সব স্থানের বিপদসঙ্কুল জীবনকে বেছে নেবার হেতু অন্বেষণে তিনি প্রামাণ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন— ''বন কেটে বসত একানে। কাজেই এসব করে গোড়ায় গোড়ায় লোকে শখ করে আসেনি। এসেছিলেন দায়ে পড়ে — নিরুপায় হয়ে।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)। আর তুলনা মূলক অনুন্নত সেই সব স্থানের অনগ্রসর জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি তাঁর নর এড়ায়নি— ''এতদিন এমনিভাবেই চলে এসেছে। এখন গোল বাধাতে শুরু করেছে ছোকরার দল। তারা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখছে। পুরনো রাস্তায় আয় তারা চলতে রাজি নয়। গ্রামের মাতব্বরদের কারসাজি তারা ধরে ফেলছে। তাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধগুলো ছোট-বড় ধনী-গরীবের বাছবিচার করে না। আজকাল অন্যায় দেখলেই তারা জোট বেঁধে রুখে দাঁড়াচ্ছে।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)।

তাঁর ডায়েরীধর্মী রচনায় বিভিন্ন স্থানের চোখে দেখা জীবন' গ্রাম বাংলা-মাঠ- ঘাট-ঐতিহাসিক বোধ-জাতীয়তা বোধ এমনকি বাড়ির লোকজন পোষা কুকুর, বেড়ালের কথাও ঠাঁই পেয়েছে। এর পোষা কুকুর মিঠুর কথায় তাঁর ডায়রী ধর্মী রচনায় লিখেছেন — '' ইলেকসনের সময় মিঠুয় আমাদের সঙ্গে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। কোথাও তাতে ফলও যে ভালো হয় নি তা বলা যায় না- কোন কোন ভোট দাতাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সহমতে আনতে পেরেছিলাম। পাড়ার কোন কোন লোক

আবার আড়ালে ঠাট্টা করে চলেছে, বাপ রে এ-যে দেখছি খুব স্বদেশী কুকুর।''(কুকুরের নাম মিঠু/নারদের ডায়েরী)।

জীবনেই ইতি-নেতি সব ঘটনা-দুর্ঘটনা জাত সত্যই ডায়েরীধর্মী রচনার অঙ্গ। জীবনের দুর্ঘটনার সত্য তাঁর গদ্য রচনার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে —''আর আমার চোখও জলে ভরে আসছে। তার ছেলেকে আমিই কোলে নিয়ে বসে আছি। . . . কখনও মনে হচ্ছে — না, সব শেষ। ওর মাকে কি বলে আমি সান্তনা দেব? ছেলেটা চাপা পড়ারার সময় যে গাড়ি চালাচ্ছিল, সে ভাল গাড়ি চালায় বটে— কিন্তু সদ্য দেশে ফিরেছে বলে লাইসেন্সটা আর করে ওঠা হয়নি। কাজেই চলতে চলতেই ঠিক করে ফেলা হল, দোষটা অন্য একজন নিজের ঘাড়ে নেবে। সারা গড়িটাতে এখন একটা থমথমে অস্বস্তিকর ভাব। প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে এখন অনেক কিছু ভাঙা-গড়া চলছে। মাঝে মাঝে উপছে পড়ছে দয়ামায়া। ছেলেটার মাকে কীভাবে সাহায্য করা হবে, তার সহৃদয় জল্পনা।'' (বিপদস্থ হলে/নারদের ডায়েরী)।

তাঁর ডায়েরীধর্মী রচনা নিজের জীবনের সঙ্গে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে আছে সাধারণের জীবন। সেই সাহিত্য ধর্মের কথায় কবিসাহিত্যিক বিষ্ণু দে লিখেছেন — ''বলা যেতে পারে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা বিষয় ও কলা কৌশল, ভব ও রূপের ভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলা কৌশল বা টেক্‌নিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মানের সামাজিক সৃষ্টির আবেগ থাকবে কী করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়, সাধারণের জীবনেইত এ — মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত।'' (বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খন্ড, ১ম প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, পৃ: ১৩) সাধারণের কথার সঙ্গে তার শিল্পসত্ত্বা সুনিবিড় রূপে একাত্ম। তার কাব্য-উপন্যাস-গল্প-ডায়েরিধর্মী-ভ্রমণ কাহিনীধর্মী বা রিপোর্টাজধর্মী রচনার কেন্দ্রীয় উপাদান সমাজ মানুষের জীবন। সেই সমাজে একেবারে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত ফুটপাতের জীবন তাঁর সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে মূল্য স্বীকৃত। সেই কথায় তাঁর ডায়েরিধর্মী রচনায় আমরা দেখি — ''কোলে দুধের বাচ্চা নিয়ে ফুটপাথ সম্বল করেছিল স্বামিপরিত্যক্ত একটি মেয়ে। মাকে বাড়ি বাড়ি কাজ করতে পাঠিয়ে সেই বাচ্চা ফুটপাথে হামা দিতে শিখল। তারপর দাঁড়াতেও শিখল। তারপর আবার একদিন দেখলাম ফুটপাথে মেয়েটি শুয়ে। তার কোলে আবার একটি টুকটুকে বাচ্চা।'' (বকুল গাছের

তলায়/নারদের ডায়েরি) বৃত্তাকার এই ফুটপাত জীবন শিল্পীর চেতনায় নাড়া দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরিধর্মী রচনায় সুন্দর্যময় চিত্রশিল্প রূপ। সেই বিশিষ্ট চিত্রকল্পই হয়ে ওঠে তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পচিত্রকলাময়তা সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন —''আসলে কথাশিল্পের যে চিত্র ধর্ম, চিত্রাত্মকতা, গভীরতলাশ্রিত ব্যঞ্জনা—সে সমস্ত কথাকারের ব্যক্তিত্ব, বিষয়ের গুরত্বে, রচনার স্বভাব স্বতন্ত্রো ও গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতায় রূপ পায়।......... কল্পনাময়তাই আসল, প্রয়োগ তুলির রঙে বৈচিত্র্য আনে। ছবির তুলি রঙ চিত্রীর ব্যক্তিত্বের ও আপন মনের মাধুরী আনে, কবির হাতে ছবির তুলি — রঙ কবিকে আত্মমগ্ন করে, কথাকারের হাতের রঙ-তুলি অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটায়, স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টিকে করে ভিন্ন স্বাদ ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।'' (বীরেন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ১ম প্রকাশ, ২০০৪, পুস্তক বিপনি, পৃ:৪৪)

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভ্রমণ কাহিনি শীর্ষক কোন গ্রন্থ না লিখলেও ভ্রমণ কাহিনীর আস্বাদ তাঁর গ্রন্থ সার্থকরূপে পাঠকের রসতৃপ্তি পূরণ করে। তার একাধিক গদ্যে আমরা বাংলাদেশের-বর্ধমান-হাওড়া-হুগলী-বাঁকুরা-পুরুলিয়া-সুন্দরবন-কলকাতা-নবদ্বীপ সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের ভ্রমনের অনুপম কাহিনীধর্মী বর্ণনা পাই। সেই রচনা বাংলা ভ্রমণকাহিনীগুলির অনন্য সাধারণ সম্পদ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ বাস ভ্রমণের অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথায় আমরা দেখি—''...... তাহলেও বলে কয়ে সাতসকালে রায়গঞ্জের বাসে রোওনা হলাম। শিলিগুড়ি হয়ে বাসে বসেই জলপাইগুড়ি যাব। বালুর ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি বাসরাস্তায় পাকা দু-শো মাইল।

তেত্রিশ মাইল পেরিয়ে এসে আবার সেই বুনিয়াদপুর। নেমে একটু হাত-পা টান করে গরম গরম চা খেয়ে নেওয়া গেল। বাস এবার ডানদিকে মোড় ঘুরে টানা জাতীয় সরক বরাবর ছুটল। খানিকটা যেতেই ট্রাক-লরির একটা লম্বা কনভয়। মানিক চকে গঙ্গা পার হবে। ত্রিপলে ঢাকা থাকায় কী জিনিস বোঝা গেল না। শব্দ শুনে মনেহল চায়ের পেটি।আসাম থেকে আসছে। অমনি একটা কনভয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার আমার অনেক দিনের শখ। সুযোগ পেলেই একবার ভিড়ে পড়তে হবে।

বাস চলছে কালিয়ামোড়, বুড়িপুকুর, লক্ষীপুর হয়ে কুশমুন্ডি। ছোটবন্দর মত জায়গাটা। তার পর আবার দু-পাশে এক টানা ধান জমি। সর্ষে খেতে বাসন্তি রঙের ফুল। কোনকোন মাঠে খড় এখন সব কাটা হয়নি। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও আছে রবিবারের হাট। গরুর গাড়িতে করে

সওদা চলছে।''(যেদিক দুচোখ যায়/নারদের ডায়েরী)। এই ভ্রমণ কাহিনী ধর্মী রচনায় আমরা তাঁর বর্ণনায় পাই বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক, কৃষিজ-অর্থনৈতিক-সংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ঠ, যোগাযোগ ব্যাবস্থা-শিক্ষা- সাস্থ্য ও জীবন জীবিকার বিস্ময় কর পরিচয়। লেখকের ভ্রমন কাহিনীধর্মী রচনার অঙ্গ হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গের শীমান্ত বিহার রাজ্য উত্তরবঙ্গের সঙ্গে একই রুপে জুড়ে রয়েছে। এর বর্ণনা তিনি লেখেন — ''দেওগাঁর পর কানকি বড়সড় গ্রাম। হাটোয়ার পেরিয়ে কিষানগঞ্জ। সবকিছুতেই বিহারী ছাপ। বিহার যে কোথায় কখন ছাড়িয়ে আবার বাংলাদেশে পা দিলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

কিষানগঞ্জ থেকেই রেললাইন গেছে বাস রাস্তার পাশ বরাবর। হাসমুন্ডনালা , ইকরছানা পেরিয়ে মনে হল প্রকৃতির দেহারা বদলে গেছে। চারদিকে অফুরন্তু গাছ। বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। আমবাগান, শালবন, আদিগন্ত চাষের মাঠ। কয়েক মাইল যাবার পর মাঠ শেষ হয়ে ঘন জঙ্গল। উঁচু উঁচু শাল - সেগুন। (যেদিকে দুচোখ যায়/নারদের ডায়েরি)। উত্তরবঙ্গের ভ্রমণে আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মালবাজার, লাটাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি স্থানের ভৌগলিক প্রকৃতি - প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষজন, ঘরবাড়ি, নদনদী, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় আমরা পাই। ১৯৪৮ এর আগের ও পরের কথায় মালবাজার ভ্রমণ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — ''মালবাজার বদলাতে লাগল উনপঞ্চাশ থেকে। দলে দলে রিফিউজিরা এসে পড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে খুলতে লাগল মুদিখানা, কাপড়ের দোকান, মনোহরি দোকান। আরও কত কী ? স্টেশনের পাশে জমি পড়ে ছিল, সেখানে বসে গেল রিফিউজি কলোনি। চা বাগানের অনেক বাবুও সেই সুযোগেকলোনিতে বাড়ি তুলে মাথা গুজবার একটু ঠাঁই করে নিলেন।

আটচল্লিশের আগে রেলস্টাফ, আধিকারী ইত্যাদি নিয়ে মালবাজারে লোক ছিল শ দুই আড়াই। জ্বরজ্বারিত ছিল খুব। ম্যালেরিয়া, পিলে, লিভারের রোগ এ তো ছিলই। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ছিল কালাজ্বরের দাপট। প্রকান্ড একটা গাছ ছিল— লোকে তার ছাল জ্বাল দিয়ে নিজেরাই রস বানিয়ে খেত। কালাজ্বরের সেই ছিল একমাত্র ওষুধ। ডাক্তারখানা বলে কিছু ছিল না। জেলা বোর্ডের ছিল একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। (যেদিকে দুচোখ জায়/নারদের ডায়েরি)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমন কাহিনীধর্মী রচনা সৃষ্টির মূলে নিহিত আশৈশব সত্ত্বায় অন্বিষ্ট ভ্রমণপিপাসা। বড় হয়ে লেখক সভাসমিতি সূত্রে খবরের কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে সেই ভ্রমণ পিপাসা আসক্তির পরিতৃপ্তি সম্পন্ন করেছিলেন। তার আশৈশব ভ্রমণের চাহিদার কথা তার ভ্রমণ কাহিনীধর্মী রচনায় সেই প্রকাশ আমরা পাই – ''ছেলে বেলায় ছুটি ছাটায় দেশের বাড়িতে যেতে যা দু-চারবার ট্রেনে উঠেছি। নইলে বড় একটা ঠাঁইনাড়া হইনি। হাওয়া বদলাতে কিংবা শখ করে কোথাও বেড়াতে যাওয়া রেস্তর অভাবেই আমাদের কখনও হয়ে ওঠেনি। কখনও হবে কিনা জানি না।'' (সভারোহী / নাটদের ডায়েরি)। গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনীর তুলনা তাঁর জীবনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং লেখক লিখেছিলেন – ''সত্যি বলতে কী, ভ্রমণকারীদের মত ঘুরতে আমার আদৌ ভাল লাগে না। অর্থসামর্থের কথা ছেড়েই দিলাম। কবে যাবেন কোথায় যাবেন – সব তাদের আগে থেকে ঠিক। কোনো অনিশ্চয়তা, কোনো সংশয় নেই।

উঠবেন কোথায় ? হয় কোনো জানা বাড়িতে, নয় হোটেলে। যার যেমন প্রয়োজন, যার যেমন রুচি। আমার সেসব কোনো বালাই নেই। কোথায় উঠব ? যেখানে ওঠাবে। বাড়ি না হলে হোটেল, হোটেল না হলে বাড়ি। থাকার জায়গা অসম্ভব ভাল হতে পারে, আবার অবিশ্বাস্য রকমের খারাপও হতে পারে।'' (সভারোহী/নারদের ডায়েরি)।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাস, কয়েকটি ছোটগল্প ও কবিতা ব্যতীত অন্যান্য গদ্য রচনাগুলির অধিকাংশ সাংবাদিকতার সূত্রে ঘুরে ঘুরে লেখা। খুব স্বাভাবিক ভাবে সেগুলির মধ্যে আমরা পাই তাঁর দায়বদ্ধ সাংবাদিকের সচেতন শিল্পীমানস। সেগুলির অনেক রচনাই হয়ে উঠেছে রিপোর্টাজ ধর্মী গদ্য রচনা। এই শ্রেণীর রচনায় আমরা দেখি তাঁর সাবলীল ভাষাও ভাবের গভীরতা – ''বর্ষার শেষাশেষি মেয়েরা করে ভাদুলি ব্রত। মাটিতে আঁকে আল্পনা, সাত সমুদ্র, তেরো নদী, নদীর চড়া, কাঁটার পর্বত, বন, ভেলা, বাঘ, মোষ, কাক, বক, তালগাছে বাবুইয়ের বাসা। – এ ব্রত সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সাতডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বানিজ্যে যেত। ব্রত ও ছড়ায় আজও সে ছবি ধরা আছে। 'বাপ গেছেন বানিজ্যে', 'ভাই গেছেন বানিজ্যে', 'সোয়ামি গেছেন বানিজ্যে' – তারা মেন নিরাপদে ফিরে আসে। ভাদ্রের ভরা নদীকে ডেকে দুরুদুরু বক্ষে তারা ব্যগ্রতা জানায় – নদী! নদী! কোথায় যাও

বাপ ভাইয়ের বার্ত দাও

নদী! নদী! কোথায় যাও

স্বামী শ্বশুরের বার্তা দাও।

আজ সেই সওদাগরও নেই, সেই বানিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভেতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে।'' (মরশুমের দিনে/নারদের ডায়েরি)। এই রচনাগুলির মধ্যে সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে লেখকের প্রকৃতি চেতনা সমাজভাবনা - বাংলার প্রকৃতি প্রভৃতি একাত্ম হয়ে উঠেছিল। কখন তাঁর ব্যক্তি জীবনের টুকরো স্মৃতিকথা সেই সাংবাদিকতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর জেলে বন্দীজীবনের কথায় তিনি লিখেছিলেন ''সব দলের, সব মতের লোক নিয়ে তৈরী হয়ে গেল জেলে আমাদের যুক্তফ্রন্ট কমিটি। খাদ্য, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলার জন্যে আলাদা আলাদা দপ্তর। জেলের মধ্যে টাকা পয়সার যেহেতু চল নেই, সেইজন্যে অর্থদপ্তর বলে কিছু থাকল না। মন্ত্রী, এম.এল.এ , কাউন্সিলার জেলে কিছুরই আমাদের অভাব ছিল না। তার ওপর ছিল লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, মিস্ত্রি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, স্কুল কলেজের ছাত্র, ছাঁটাই মজুর, ওষুধের ক্যানভাসার, বীমার দালাল, চাকুরি প্রার্থী যুবক এমনি রকমারি পেশার এবং বাংলা হিন্দি উদু মৈথিলী নেপালী রাজস্থানী এমনি রকমারী ভাষার লোক। কেউ ঘোর নাস্তিক, কারো বা দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি।

লোকও সব মজার মজার। একজন স্নান করেননি চল্লিশ বছর, বলতেন ওটা তার একটা এক্সপেরিমেন্ট। বৈঠক খানার বাজারে একজনের ফুলের দোকান, আজকালকার বোমায় কেন এত ধোয়া হয় সে দিত তার ফিরিস্তি। ঘোরতর সংসারী একজন লোক, তিনি জেলে এসেছেন বাড়ির কাউকে না বলে। আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে, সটান সে কয়েদগাড়ীতে উঠে চলে এসেছে ভাবী স্ত্রীর ফটো পকেটে নিয়ে।'' (যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা/নারদের ডায়েরি)।

এই রিপোর্টাজধর্মী লেখাগুলি সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহের প্রথম খন্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন — ''গ্রামাঞ্চল আর শিল্পাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পার্টির কাগজে সেই সময় কয়েকটা রিপোর্টাজ লিখেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে বন্ধু দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তাড়নায় ছোটদের কথা মনে রেখে কিছু কিছু সেই রিপোর্টাজের অন্তর্বস্তু নিয়ে 'রংমশালের জন্যে', 'আমার বাংলা' লিখি।'' সেই

সাংবাদিকতা ও ডায়েরিধর্মীতার নিদর্শন পাই তাঁর 'ক্ষমা নেই' শীর্ষক গ্রন্থটিতে। তাঁর গদ্য সংগ্রহের ভূমিকা অংশে তিনি 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন — ''বাংলাদেশের যশোর-খুলনায় মুক্তিযুদ্ধের শেষপদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'ক্ষমা নেই'। তখনকার তাৎক্ষণিক ক্রোধ এতদিনের ব্যবধানে কারো কারো কর্কষ লাগতে পারে। লেখক এক্ষনে নিরুপায়। আজকের মন দিয়ে সেদিনের মনের অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'' কবি বন্ধু হিমাচলবাসী শের জঙ্গকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে, প্রকাশক প্রসুন বসু, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯ থেকে। প্রকাশকালে এই গ্রন্থে গদ্য ছিল আটটি। সেগুলি হল — 'সকালের অপেক্ষায়', 'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই', 'এক নির্দয় দয়েল পাখি', 'ভয় নেই', 'এইবার হাসি ফুটুক', 'ভাই জাহির রায়হান', ' দুই ঢিল, এক পাখি' এবং 'অপুতপু কে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খন্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে — ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর পাঁচজন সচেতন বুদ্ধিজীবীর মতই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণে মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান)-এর বেশ কিছু লেখক, শিল্পী, কবি কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ও হয়েছিল সে সময়ে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে গিয়ে যা দেখেছিলেন তারই লেখচিত্র তুলে ধরেন 'আনন্দ বাজারে'র পাতায়, ধারাবাহিক কয়েকটি রচনায়। তখন একদিকে মুক্তিকামী গরিষ্ঠ মানুষ আর অন্যদিকে মিলিটারি ও তার অনুগৃহীতদের জান্তব দাপট, এটাই ছিল মুক্তিপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস। এই সংগ্রাম ও তাকে দাবিয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি নির্বিচারে গণহত্যাও চলে। যুদ্ধ, হিংসা আর লোভ মানুষকে পশুত্বের কোন নিম্নতম স্তরে যে পৌছে দেয় তা দেখলেন সুভাষ। তাঁর মানবতাবাদী মন— ক্রোধ আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল।''

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাধর্ম প্রায়ই তাঁকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন — ''কোনো কাগজের লোক হলে একটা হোল্লে হয়ত হয়র যেত। কিন্তু কাগজের রাজ্যে আমি নাম কাটা সেপাই। কাজেই আমার সামনে কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। ক্রমে তার চাক্ষুস দেখা মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি নানা কথা নিজের ভ্রমণ কথা ও ডায়েরিতে জায়গা পেয়েছে। তার রিপোর্টাজধর্মী রচনায় আমরা দেখি মুক্তি যোদ্ধার

বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের নরনারীর ওপর পাকসেনার অমানবিক অত্যাচারের চিত্ররূপ। লেখক লিখেছিলেন - গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে পুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাক ফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপেছিলেন এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। পরে পাক ফৌজের হাতে পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শারিরীক নিগরহ ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল সেদিন। সেই অত্যাচারের বর্ণনা লেখকের দরদী হৃদয়ে ব্যাথিত করেছিল - ''একজন তার শার্টের বোতাম খুলে ডান কাঁধের দিকে কন্টার হাড়ের কাছটা দেখান। ডুমো ডুমো হওয়া ক্ষতবিক্ষত দাগ। ঘা এখনও পুরো শুকোয়নি। তার পাকিয়ে যাওয়া দুর্বল শরীরটার দিকে তাকিয়ে বর মায়া লাগছিল।'' (এক নির্দয় দয়েল পাখী/ক্ষমা নেই)।

একজন শিল্পীর লেখায় ক্ষমার অযোগ্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা বিষয়কে অনেকেই অন্যায় বলে শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভৎসনা করেছিলেন। ২২-১২-১৯৭১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অমানবিক পৈশাচিক ধর্ষনকারী, লুন্ঠনকারী ও হত্যাকারীদের সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঙমা না ক্ষমা নেই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতা ১৯ - ১৯৭১ সালের ২৮শৈ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন শিল্পীর ক্ষমা না করার অসহিষ্ণুতা শিক্ষার অভাব সংস্কৃতির অভাব বলে সমালোচিত করেছিলেন। সেইসব সমালোচকদের উদ্দশ্যে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ - ''মশাইরা, যান। তাড়াতাড়ি গিয়ে গ্রাম শহর মাঠ ঘাট পুকুর খাল নর্দমা কুয়ো থেকে পচাগলা লাশ আর মাথার খুলি মড়ার হাড় চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে রাতারাতি বাড়ি তুলে ফেলুন। গাছে চড়ার লোক না পেয়ে ডাব খাওয়ার জন্যে পাক-ফৌজ যে গাছগুলো গোড়া কেটে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো চটপট মাটিতে খাড়া করে দিন।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)।

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসহিষ্ণুতার মূলে নিহিত তাঁর দায়বদ্ধ সামাজিক বোধ। সেই বোধে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছিল সাংবাদিকতাপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন - ''এ পর্যন্ত আমি আমার একটা লেখাতেও বাংলাদেশে হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সত্যের কথা বলিনি। তার কারন, লিখতে গিয়ে

লজ্জায় আমার কলম থেমে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো সৈন্যবাহিনী, এমনকি নাৎসীরাও এমন ব্যাপক হাতে বাড়ি ঢুকে নারীধর্ষণ করেনি। শুধু ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পর হত্যা। ধর্ষণের পর সবাইকে মেরেছে তা নয়। বড় একটা দলকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে তারা নিজেদের বেশ্যালয় খুলেছিল। বেশ্যাদেরও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, এরা ছিল খাঁচায় বন্দী। .... পাক ফৌজ ধর্ষণ করে মৃত মনে করে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে। আজও বেঁচে আছে এমন ধর্ষিতা মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। ....। ত মেয়ে মরেনি, কিন্তু বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)। এই পাশবিক অত্যাচারীদের প্রতি সহিষ্ণু ও নমনীয় না হবার মধ্যে লেখকের সত্যবোধ সচেতন শিল্পী সত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই পরিচয় হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি। তাঁর লেখায় সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে আমরা শৈলীতে ডায়েরি ধর্মিতার নিদর্শন পাই ক্ষমা নেই গ্রন্থে - ''মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউটাউনের পাশদিয়ে আসছিলাম। দু-পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি।'' (ভয় নেই/ক্ষমা নেই)। ব্যক্য বিন্যাস শব্দচয়ন ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় আমরা তাঁর ডায়েরিধর্মি রচনার শিল্পরুপের আভাষ পাই। সেই সঙ্গে এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তার ভ্রমণ পিপাসা। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কছায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন - ''বাসে আসতে আসতে দেখলাম হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সারবাঁধা নৌকোয় রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)।

গ) অন্যান্য গদ্য গ্রন্থ ও অগন্থিত রচনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের বেগার , আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন , অক্ষরে অক্ষরে , কথার কথায় , দেশ বিদেশের রূপকথায় এবং বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থছ এবং কিছু অগ্রন্থিত কবিতা , আখ্যান , গল্প ও নিবন্ধ সাহিত্য তাঁর গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে বৈচিত্র ও প্রাচুর্যে পূর্ণ করে তুলেছে । তাঁর গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলি হল 'বাঙালীর ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, বুক ওআর্ল্ড লিমিটেড, কলকাতা), 'অক্ষরে অক্ষরে' (প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), ' কথার কথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০) 'জগদীশ চন্দ্র বসু' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), 'দেশ বিদেশের রূপকথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২), 'রূপকথার ঝুড়ি'(প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা ৯) ইত্যাদি।এছাড়া তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল 'রুশ গল্প সঞ্চয়ন' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬৩, ন্যাশনাল বুক এ জেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩); 'ইভান দেশি সোভিচের জীবনের একদিন' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৫, ডি এম লাইব্রেরী কলকতা ৬) 'তমস' (প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮ সাক্ষরতা প্রকাশনী কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর আগে 'জনযুদ্ধ' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে গদ্যরচনায় সমাজ সত্যের ছবি নিয়ে গদ্যশিল্পে ক্রমশ: পরিণত হয়ে উঠেছিলেন । এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে 'গণনাট্য সংঘ'-এ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাট্যসাহিত্যেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁর লেখনীতে । ১৯৪২ সালের ১৫ই জুলাই তিনি 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম গদ্যরচনা --''জাপানকে রোখা চাই । চীন ভারত ভাই - ভাই'' । এই পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই বাংলার মানুষকে জ্ঞাত করেছিলেন — ''বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন '' শীর্ষক গদ্য রচনায় । এর পরের বছর 'জনযুদ্ধে' লিখেছিলেন তাঁর গদ্যরচনা —''বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া , জমি ও জাত ব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নি:স্ব '' (১৯৪৪ সালের ১৪ই জুন) । এই পত্রিকায় এই বছরের ৮ই নভেম্বর তিনি প্রকাশ করেছিলেন — '' বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা'' এবং ''কলের কলকাতা'' শীর্ষক গদ্য রচনা । এই গদ্যরচনাগুলির শীর্ষনামেই আমরা তাঁর গদ্যরচনার উদ্দেশ্যমুলকতা উপলব্ধি করতে পারি । সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন — ''আমি বলেছিলাম কাগজ কীভাবে আমাকে গ্রামশহরের সাধারণ মানুষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । সেখানে শুধু যে নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম তাই নয় — বাংলা ভাষার প্রাণপুরুষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম ।

পার্টির কাগজে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে । সবচেয়ে বড় সুবিধে , সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে বাইরের মানুষ বলে মনে হয় না । তারাও বিশ্বাস করে নিজেদের মনের কথা খুলে বলে ।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ , প্রথম খণ্ড , দে'জ পাবলিশিং , কল -৭৩ , প্রথম

প্রকাশ , পৃষ্ঠা ৫৪৪) । সংবাদ পত্রে কাজ করার সুবাদে তিনি অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন । আবার কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাংলার মানুষের বন্যা - খরা - মহামারি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন — ‘‘সেই প্রথম বন্যা দেখলাম । আমি আর সুনীল জানা । আমি গিয়েছি খবর আনতে , সুনীল জানা ফটো তুলতে । সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি । সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায় । যেতে হবে আরও মাইল চার - পাঁচ দূরে । একেবারে হানার মুখে । মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে ~~অনেক । তিনগুণ চারগুণ~~ ভাড়া । পকেটে আমাদের যা রেস্ত — তাতে শুধু যাওয়াই যায় , ফেরা যায় না ।’’ (দীপঙ্করের দেশে , আমার বাংলা , ঈগল পাবলিশার্স , প্রথম প্রকাশ , পৃষ্ঠা ২৩) । আবার তিনি লিখেছেন — ‘‘..........পুরু চার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান ‘বাঁধ ভেঙে দাও , বাঁধ ভেঙে দাও , ভা—ঙো’ গাইছি , এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল । ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।’’ (দীপঙ্করের দেশে , আমার বাংলা , ঈগল পাবলিশার্স , প্রথম প্রকাশ , পৃষ্ঠা ২৫) ।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ পিপাসু মন নিয়ে গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ফিরে রচিত রিপোর্টাজধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’ । তাঁর এই ধরণের গদ্য নির্মাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে গদ্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ‘গ্রন্থপরিচয়’ শীর্ষক অংশে লেখা হয়েছে --‘‘একালের বাঙালি লেখক কবিদের মধ্যে গোটা বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়ই সব চেয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বললে হয়তো আত্যুক্তি হবে না । চল্লিশের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে বার বার সাড়া দিতে হয়েছে ডাকবাংলার ডাকে । এবং যা তিনি দেখেছেন , শুনেছেন , অনুভব করেছেন তারই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় । ‘আমার বাংলা’ থেকে ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’-এ পর্যন্ত প্রকাশিত এই ছ’টি গ্রন্থে গ্রন্থিত এই নিবন্ধমালা সংখ্যায় ৭০ । এছাড়া অগ্রন্থিত রয়েছে এরকম আরো অসংখ্য রচনা । এইসব রচনা সাধারণভাবে ‘রিপোর্টাস’ নামেই পরিচিতি পেয়েছে । .... সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একান্তভাবে নিজস্ব , সহজ , সবলীল ও চিত্ররূপময় গদ্যরীতির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে তাঁর অনুভবী মন , গভীর জীবনানুরাগ আর দৃঢ়প্রত্যয় পদযাত্রার অন্তরঙ্গ পরিচয় । তাই গত চল্লিশ বেশি সময় ধরে তিনি যে অসংখ্য ‘রিপোর্টাজ’ লিখলেন তা শুধুমাত্র ‘রিপোর্টাজ’ না থেকে হয়ে উঠল এক গভীর মানবিক উচ্চারণ যা বাংলা গদ্যসাহিত্যেরও অনন্য সম্পদ ।’’

এই গদ্য গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে । প্রকাশক এ. চক্রবর্তী চলতি দুনিয়া প্রকাশনী থেকে এই গ্রন্থটির প্রকাশ করেছিলেন । প্রকাশকালে নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন । আলোচ্য গ্রন্থের নিবন্ধের সংখ্যা কুড়িটি -- 'যাচ্ছি বনগাঁয়' , 'এবার বনগাঁয় গিয়ে', 'হালছাড়া শহর', 'অপুদুর্গার জগৎ' , 'দেখার মত বর্ডার' , 'কাছেই বজবজ' , 'বজবজের অসুখ' , 'আগে ছিল বাহান্ন বাজার' , 'আগে ছিল জঙ্গল মহল' 'উপরে কাঁটা নিচে কাটা ,' 'মাটির কাজ মাটি না হয় ' , ' নদেয় এল বান ' , 'সুতোর জট জঙ্গলে ' , অথ বাঘ - ছাগল কথা ' , ' মরা ডালে ফুল ' , ' নাম রেখেছি নবজীবনপুর ' , 'পৌষ পেরিয়ে ' , 'এক যাত্রায় ' , 'ভূবননগর এড়িয়ে ' এবং 'তামাম শোধ', আলোচ্য নিবন্ধগুলির বিষয় সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব উক্তি -- ''তারপর দেশ ভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেখা জায়গাগুলো অনেকদিন পরে নতুন করে দেখব মনে মনে ইচ্ছে ছিল । কিন্তু দেশ আর কালের পাঁচিল পেরোতে পারিনি।

'আনন্দবাজারে' যখন 'ডাকবাংলার ডায়েরি' শুরু করি , তখন আমার ইচ্ছে ছিল একটাই। প্রত্যেকটা জেলারি একটা-দুটো অঞ্চলে যাব। দেখার চেষ্টা করব স্বাধীনতার পর কোথায় কতটা কী বদলেছে। পুরোপুরি না হলেও , সে ইচ্ছে খনিকটা পূরণ করেছিলাম।'' (যাচ্ছি বনগাঁয় / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। অনেকদিন পর আবার বনগাঁয় গিয়ে সেখানকার জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন প্রাবন্ধিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় । তাঁর দৃষ্টিতে বনগাঁর রেললাইনের দুপাশে আগে ছিল জঙ্গল। সেখানে লোকালয় ছিল খুব কম। সেসময় প্রত্যেক স্টেশনে অপেক্ষারত যান বলতে ছিল গরুর গাড়ি। সেখানকার বদলে যাওয়া জীবনের কথায় তিনি লিখেছেন -- ''এখন দুপাশে একটানা লোকালয়। জঙ্গলের বদলে ফসলের মাঠ। এর প্রায় সবটা জুড়েই এখন পূর্ববাংলা থেকে আসা মানুষের বাস। আজ আর তাদের ছিন্নমূল বলা যায় না। নিজেদের তারা রোপণ করেছে নতুন জমিতে । গোটা এলাকা জুড়ে শুধু তাদের ঘরবন্ধন নয় , রক্তেরও সম্বন্ধ।'' (যাচ্ছি বনগাঁয় / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। তিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে বনগাঁর জনজীবনের উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানকার উন্নয়নের কথায় তিনি বলেছেন --''দেখলাম বাড়িতে গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট বসছে। ফেরার সময় রাস্তায় ফটো তোলা হল। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে তার ছবি। ভূমিহীনেরা বাস্তু পেয়েছে ,জমি পাচ্ছে সেচের জল , গ্রামে তৈরী হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র।'' (এবার বনগাঁয় গিয়ে / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' নিবন্ধ গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়ে সাংবাদিকতার প্রখর দৃষ্টি সক্রিয় ছিল। সেই দৃষ্টিতে সকালের বৃহৎ সামাজিক ছবি তাঁর লেখায় বাঁধা পড়েছে --'' পাকিস্তান হওয়ার পর শুধু হিন্দু নয় , নিরাপত্তার অভাবে খ্রিষ্টানরাও দল বেঁধে চলে এসেছিল। বনগাঁ শহরে তো খ্রিষ্টানদের দুটো

আলাদা পাড়া গড়ে উঠেছে ।এক পাড়ায় ক্যাথলিক , অন্য পাড়ায় প্রোটেস্টান্ট। জাত ঠেলাঠেলির ব্যাপার এদের ভেতরেও আছে । একটু টোকা দিলেই ধরা পড়ে। যারা শুয়োর পালে , কাছিমের মাংস বেচে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয় ওরা এসেছে নিচু জাত থেকে তাদের আলাদা গির্জা । নইলে এখানকার দেশী খ্রিষ্টানেরা সবাই গরীব । হয় রিক্‌শা চালায় , নয় জন খাটে ।'' (দেখার মত বর্ডার / আবার ডাকবাংলার ডাকে) । এই গদ্যের শৈলিতে ডায়িরিধর্মিতা অসাধারণ শিল্পদক্ষতায় তিনি রচনার অঙ্গ করে তুলেছেন । এই রচনাধর্মীর ভঙিমার কথায় বর্ণনাত্মক রীতিতে তিনি লিখেছেন --'' বসে বসে ওদের তীর ধনুকে আমরা হাতের টিপ পরীক্ষা করলাম । বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলা দেখালেন সরোজ বাবু । দেখলাম লক্ষ্যভেদে একেবারে অব্যর্থ ।

রাত্তিরে যখন গড়বেতায় ফিরলাম মাঠঘাট ঘরদুয়োর ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার জোয়ারে । অনেক রাত অবধি ঠান্ডার ভয়ে ঘর বন্ধ করে ছোট সরোজের কাছে শুনলাম একানকার জেলখানার গল্প ।'' (আগে ছিল জঙ্গলমহাল / আবার ডাকবাংলার ডাকে) । এই নিবন্ধগ্রন্থে লেখক পারিপার্শ্বিক অবস্থান , সামাজিক রীতিনীতি , নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডল সমাজমানুষের জীবনযাত্রার ক্রমপরিবর্তনের প্রকৃতি সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন । যা বাংলা নিবন্ধসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠেছে । এছাড়াও এই গ্রন্থটিতে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার মানুষের কথাকে বিষয় নির্বাচন করেছেন । সেই বিষয় বর্ণনায় বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত করেছেন বনগাঁ , জঙ্গমহল , গরবেতা , বেলেডাঙা , বজবজ , চন্দ্রকোণা , শান্তিপুর , গৌরীপুর , খেজুরডাঙা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণের বিভিন্ন কাহিনী ।

'আবার ডাকবাংলার ডাকে ' গ্রন্থের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হল ' নাম রেখেছি নবজীবনপুর ' শিরোনামাঙ্কিত নিবন্ধটি । এই নিবন্ধে আমরা তাঁর আন্যতম 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ 'উপন্যাস সৃষ্টির সূত্রটি পাই । এই নবজীবনপুরের কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্যনিকেতন যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল , সেই মহৎপ্রাণ সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকেই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন ঔপন্যাসিক। আলোচ্য নিবন্ধটিতে আমরা দেখি বাঁকুড়ার গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপতাল এবং খেজুরডাঙার আরোগ্যনিকেতন তিনি ঘুরেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় লেখক সেখানকার অর্ধেকমানুষের জীবনকে উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। ''জনযুদ্ধ' পত্রিকায় সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেসব রিপোর্টাজধর্মী নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর মহৎকর্মপরয়াস, জীবনদর্শন, সমাজভাবনা, দেশকাল সচেতন,জাতীয়তাবাদী ও ভ্রমণপিপাসু শিল্পীমানসের নিদর্শন পাই। আবার বিভিন্ন সময়ে 'জনযুদ্ধ'পত্রিকায় প্রকাশিত আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ পাই । সেগুলি হল -' জাপানকে রোখা চাই

!চীন ভারত ভাই ভাই '(১৫ই জুলাই ১৯৪২) , ' বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন ' (২৮শে জুলাই ১৯৪২) , 'অপরাজিত ' (৬ই অক্টো: ১৯৪৩) , বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া / জমি ও জাত- ব্যাবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নিঃস্ব '(১৪ই জুন ১৯৪৪) , কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি কেন ? / আসানসোলে কয়লা মজুরের হালচাল ' (১৪ই জুন ১৯৪৪) , 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা' (২২শে সেপ্টে: ১৯৪৪) , 'বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা ' (৮ই নভে: ১৯৪৪) , 'লাইন / চটকল মজুরের জীবন চিত্র '(৮ই নভে : ১৯৪৪) , ' চালের দর পড়তে আমার ক্ষতি কিন্তু সমাজের মঙ্গল হবে '/ -ঘাটতি জেলা ২৪ পরগণার স্বচ্ছল চাষীর উক্তি ' (১৯শে নভে : ১৯৪৪) ।এই নিবন্ধগুলিতে লেখকের হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি দিয়ে অঙ্কিত সামাজিক ছবি সমকালের সাহিত্যের দলিল হয়ে রয়েছে । বাংলার সমাজ ইতিহাসে এগুলির গুরুত্ব অনন্য সাধারণ । এই নিবন্ধগুলির বিষয়-আঙ্গিক ও ভাবপ্রকাশের ভঙিমায় আমরা ছোট গল্পের বিভিন্ন শর্তের আভাষ পাই । প্রচলিত ছোটগল্প না লিখলেও , সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় পাঠকের ছোটগল্প পাঠের রস তৃপ্তির চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন টুকরো কাহিনী যুক্তকরে ।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃজনীধারায় দেশ-কাল-জাতপাত-স্থান-বয়স প্রভৃতি গন্ডী উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাঁর বিভিন্ন গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ বাংলার সর্বস্তরের পাঠকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা আদায়ে সমর্থ হয়েছে । শিশু -কিশোরদের কচিমনে সৃষ্টিস্বাদ ঢেলে দেবার জন্যে তিনি 'অক্ষরে অক্ষরে ' গদ্য-নিবন্ধ গ্রন্থটি লিখেছিলেন । প্রকাশক সুধংশুশেখর দে কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে১৯৫৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন । এর উৎসর্গ অংশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - " যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে / যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে / নতুন ভবিষ্যৎ মুঠোয় আনবে / আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো / ছেলে মেয়েদের / উদ্দেশে " । এর বিষয় সূচিতে আমরা পাই -- 'ভাষা' , 'সবকিছুর গোড়ায় ', 'ছিরি -ছাঁদ' 'নকল থেকে নাচ', 'গান বাজনা', 'পালা বদলের পালা' ,'যম - নিয়তি যক্ষ' এবং 'পালট পুরাণ' । ছোট কিশোর-কিশোরীর বৌদ্ধিক বিকাশে এই গ্রন্থের মুল্য অসাধারণ । এই গ্রন্থ সৃষ্টির লক্ষ্য ছোটোরা হলেও এর শিল্পগুণ অনেক উঁচুদরের । এতে ছোটোদের মানসিক চাহিদা পূরণ , গ্রন্থ পাঠের সময় তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ বজায় রাখা , বাক্য বিন্যাস , ভাষা প্রয়োগ ও নানা মজাদার কাহিনী যুক্তকরার ক্ষেত্রে লেখক অত্যন্ত সচেতন শিল্পীসত্ত্বার পরিচয় দিয়েছেন । ভাষা , ভাব , কথা , কাজ , শব্দ , অর্থ , চিহ্ন , ছবি , লেখা , লিপি , হরফ , সৌন্দর্য , ছন্দ, নৃত্য , সঙ্গীত , সুর , জগৎ , জীবন , মৃত্যু প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়কে লেখকন অত্যন্ত দক্ষতার

অক্ষরে অক্ষরে গ্রন্থটিতে তাঁর রচনাভঙ্গির সারল্যে ছোটদের উপযোগী ও আর্কষণীয় করে তুলেছিলেন। এই গ্রন্থে লেখক 'ভাষা'র মতো একটি বিজ্ঞাননির্ভর বিষয় সম্পর্কে লেখক লিখেছেন --" ফুস্‌ফুসের হাওয়াটাকে গলা , জিভ , টাক্‌রা , দাঁত , ঠোঁট-মুখের ভেতর নানা জায়গায় খেলিয়ে মানুষ যতো রকমের খুশি আওয়াজ করতে পারে । হাত জোড়া থাকলেও মুখে আওয়াজ করতে কোনোই বাধা নেই ।

তাহলে দেখে যাচ্ছে , ইশারা করার চেয়ে আওয়াজ করলে সব দিক থেকেই জানাবার সুবিধে। আওয়াজ করে জানাবার নামই হলো ভাষা ।" (হাতে নয় , মুখে / ভাষা / অক্ষরে অক্ষরে)।

এই গ্রন্থটিতে লেখক বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা ছড়া যুক্ত করে বিষয়কে আকর্ষণীয় করেছেন। তাঁর রচনার নিপুণ দক্ষতায় গভীর তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে উঠেছে গ্রহণযোগ্য ও সরল -- " তুঁষ , গোবর আর খড়কুটো একসঙ্গে মেখে আগুনে পুড়িয়ে তারপর জলে ভাসাতে হবে । আর সেই সঙ্গে আছে ছড়া : কুলকুলনি এয়োরানী , মাঘমাসে শীতল পানি ।

শীতল শীতল ধাই লো , বড়গঙ্গা নাই লো
শীতল শীতল জাগে , রাই বিয়ে মাগে ।
আমাদের রায়ের বিয়ে ঝাম-কুর-কুর দিয়ে ।।

তোষলার সরায় করে মৃত্যুর যে কুশপুত্তলিকা জলে ভাসানো হচ্ছে , সেটা আসলে সারমাটি -- যা নতুন ফসল ফলাবে । মৃত্যুর মধ্যেই আছে জীবন । সূর্যের নাম করে সবটাই আসলে ফসলের ক্রিয়াকর্ম । সে যুগে মানুষ মনে করতো বীজ রোয়া মানেই হলো বীজটার মৃত্যু হওয়া -- বীজটাকে মাটির নিচে কবর দেওয়া । সেই বীজ থেকে উঠবে অঙ্কুর । মৃত্যু থেকে জীবন । শীত হলো মৃত্যু , বসন্ত জীবন ।" (মৃত্যু থেকে জীবন / পালাবদলের পালা / অক্ষরে অক্ষরে । এই গ্রন্থটি বাংলা শিশু-সাহিত্যের ধারায় একটি মূল্যবান সম্পদ ।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ হল জীবনী সাহিত্য । জীবনী সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনী নিয়ে রচিত 'ভারত স্বাধীন হল' , নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী নিয়ে রচিত 'ব্যাঘ্রকেতন' , বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'জগদীশচন্দ্র বসু' , তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ , 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন' এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' প্রভৃতি । এই জীবনীমূলক ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলিতে আমরা

তাঁর সত্যনিষ্ঠা , জাতীয়তা বোধ । ইতিহাস চেতনা , বিজ্ঞানচেতনা , স্বদেশপ্রেম , সমকাল ভাবনা ও সমাজভাবনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই ।

উল্লেখিত গদ্যসাহিত্য নিবন্ধগুলিতে তাঁর বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ চেতনা ও মননশীল বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় আমরা পাই । এগুলির মধ্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৫৫-স্বাক্ষর-কলকাতা ২০ থেকে প্রকাশ , 'ব্যাঘ্রকেতন'-এর প্রকাশ কাল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ -- এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড -- কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত , 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন' -- জুলাই ১৯৮৭ -- অরুণা প্রকাশনী -- কলকাতা ৬ থেকে প্রকাশিত , 'ভারত স্বাধীন হল' -- পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ -- ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড -- কলকাতা ৭২ থেকে প্রকাশিত , এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' -- জানু : ১৯৯৪ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত ।

এগুলির মধ্যে তাঁর 'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে 'বন্ধু ও কমরেড' সম্বোধনে উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় বিষয় স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলনা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) । আজাদ উর্দু সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' (১৯১২) এবং 'আল-বালখ' (১৯১৫) পত্রিকা প্রকাশ করেন । ১৯১৬তে তাঁকে কলকাতা , বোম্বাই , পাঞ্জাব , দিল্লী , উত্তরপ্রদেশ প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাঁচীতে অন্তরীন থাকেন । ১৯২১ সালে ভারত খিলাফত কমিটির সভাপতি , ১৯২৮ সালে জাতীয় মুসলিম অধিবেশনের সভাপতি , ১৯২৩ ও ১৯৪০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । আবার ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই ভূমিকা পালন করেন ।

তাঁর মহৎ জীবনী নিয়ে ইংরেজিতে তার জীবনালেখ্য রচনা করেন কবি-সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর । সেই জীবনীর সরল ও সুপাঠ্য বাংলা অনুবাদ করেন শিল্পী-সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় । এই গ্রন্থে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য রহস্য এই গ্রন্থে উন্মোচিত করেছেন । গ্রন্থের পূর্বাভাষ , উত্তরভাগ , পরিশিষ্ঠ ও নির্ঘন্ট ছাড়া মোট ষোলটি অধ্যায়ের আবুল কালাম আজাদের জীবনালেখ্য অনুবাদ করেছিলেন । সেগুলির শীর্ষনাম হল (১) সরকারে কংগ্রেস (২) ইউরোপে যুদ্ধ (৩) আমি কংগ্রেস সভাপতি হলাম (৪) একটি চীনা গর্ভনাটিকা (৫) ক্রিপস মিশন (৬)অস্বস্তিকর বিরতি (৭) ভারত ছাড় (৮) আমেদনগর কোর্ট জেল (৯) সিমলা সম্মেলন (১০) সাধারণ নির্বাচন (১১) ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন

(১২) পাকিস্তানের প্রস্তাবন (১৩) অন্তর্বর্তী সরকার (১৪) মাউন্টব্যাটেন মিশন (১৫) একটি স্বপ্নের সমাধি এবং (১৬) বিভক্ত ভারত ।

এই গ্রন্থে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা এবং ব্যক্তি মৌলানা আবুল কালামের জীবনের ঐতিহাসিক নানা তথ্য আমরা পাই। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থে পাই আমরা। এই গ্রন্থের কথক স্বয়ং আবুল কালাম আজাদ। তাঁর মুখে আমরা ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির গোপন অলিন্দের নানা সত্যতা। ১৯৩৫ সালের 'ভারত সরকার আইন' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য -- ''কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে যে কংগ্রেস, সে এই বিধিব্যবস্থা মেনে নিতে চাইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের ধাঁচটিকে কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জানিয়েছিল। প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ছক সম্পর্কেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বহুদিন ধরে বিরুদ্ধতা করেছে। কমিটির একটি শক্তিশালী অংশ এমন কি নির্বাচনে যোগ দেওয়ারও ঘোর বিরোধী ছিল। আমি একেবারেই ভিন্ন মত পোষণ করতাম। আমি বলেছিলাম নির্বাচন বয়কট করাটা ভুল কাজ হবে।'' (সরকারে কংগ্রেস / ভারত স্বাধীন হল) ।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় নেতাদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র মতভেদ এই গ্রন্থে উঠে এসেছে । উঠে এসেছে আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের নানা উত্থান পতন । উঠে এসেছে অত্যাচার ও অত্যাচারীর দমন এবং এমনকি জাতির জনকেরও মর্মান্তিক হত্যালীলার সত্য স্বীকার -- '' ১৯৪৮ -এর ৩০শে জানুয়ারি দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে আমি গান্ধীজীর কাছে যাই । .... গেটের কাছে গাড়ি থেকে নেমে আমি তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম । বাড়ির সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল । বাড়ির একজন জানালার শার্সি দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল । ঢোকার মুখে একজন কাঁদতে কাঁদতে বলল , 'গান্ধীজীকে গুলি করেছে , এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।' খবরটা এমনই শোচনীয় আর আচমকা যে , কথাগুলোর অর্থ আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না । আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় গান্ধীজীর ঘরের দিকে হেঁটে চললাম । দেখলাম মেঝের ওপর তিনি সটান পড়ে আছেন । তাঁর মুখ ফ্যাকাশে আর চোখদুটো বন্ধ । তাঁর দুই নাতি তাঁর পা দুটো ধরে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে । স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমি শুনলাম কেউ বলল , 'গান্ধীজী মারা গেছেন ।'

'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনীসাহিত্যের ধারায় একটি অনন্য সাধারণ সম্পদ । এই গ্রন্থের অনন্যতার মধ্যে নিহিত রয়েছে মৌলানা আবুল কালামের মহৎ জীবন ,

সেই জীবনকে উপস্থাপনের ভাষা , বাক্য গঠন , সমকালের সামগ্রিক জাতীয় জীবনের বাস্তব সত্য নির্ভর মূল্যবান তথ্য প্রভৃতি ।

সাংবাদিকতার নিদর্শন পাই তাঁর 'ক্ষমা নেই' শীর্ষক গ্রন্থটিতে। তাঁর গদ্য সংগ্রহের ভূমিকা অংশে তিনি 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন – ''বাংলাদেশের যশোর-খুলনায় মুক্তিযুদ্ধের শেষপদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'ক্ষমা নেই'। তখনকার তাৎক্ষণিক ক্রোধ এতদিনের ব্যবধানে কারো কারো কর্কষ লাগতে পারে। লেখক এক্ষনে নিরুপায়। আজকের মন দিয়ে সেদিনের মনের অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'' কবি বন্ধু হিমাচলবাসী শের জঙ্গকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে, প্রকাশক প্রসুন বসু, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯ থেকে। প্রকাশকালে এই গ্রন্থে গদ্য ছিল আটটি। সেগুলি হল – 'সকালের অপেক্ষায়', 'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই', 'এক নির্দয় দয়েল পাখি', 'ভয় নেই', 'এইবার হাসি ফুটুক', 'ভাই জাহির রায়হান', ' দুই টিল, এক পাখি' এবং 'অপুতপু কে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খন্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে – ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর পাঁচজন সচেতন বুদ্ধিজীবীর মতই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণে মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান)-এর বেশ কিছু লেখক, শিল্পী, কবি কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ও হয়েছিল সে সময়ে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে গিয়ে যা দেখেছিলেন তারই লেখচিত্র তুলে ধরেন 'আনন্দ বাজারে'র পাতায়, ধারাবাহিক কয়েকটি রচনায়। তখন একদিকে মুক্তিকামী গরিষ্ঠ মানুষ আর অন্যদিকে মিলিটারি ও তার অনুগৃহীতদের জান্তব দাপট, এটাই ছিল মুক্তিপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস। এই সংগ্রাম ও তাকে দাবিয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি নির্বিচারে গণহত্যাও চলে। যুদ্ধ, হিংসা আর লোভ মানুষকে পশুত্বের কোন নিম্নতম স্তরে যে পৌছে দেয় তা দেখলেন সুভাষ। তাঁর মানবতাবাদী মন– ক্রোধ আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল।''

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাধর্ম প্রায়ই তাঁকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন – ''কোনো কাগজের লোক হলে একটা হোল্লে হয়ত হয়র যেত। কিন্তু কাগজের রাজ্যে আমি নাম কাটা সেপাই। কাজেই আমার সামনে কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না।''

(সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। ক্রমে তার চাক্ষুস দেখা মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি নানা কথা নিজের ভ্রমণ কথা ও ডায়েরিতে জায়গা পেয়েছে। তার রিপোর্টাজধর্মী রচনায় আমরা দেখি মুক্তি যোদ্ধার বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের নরনারীর ওপর পাকসেনার অমানবিক অত্যাচারের চিত্ররূপ। লেখক লিখেছিলেন - গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে পুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাক ফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপেছিলেন এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। পরে পাক ফৌজের হাতে পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শারিরীক নিগরহ ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল সেদিন। সেই অত্যাচারের বর্ণনা লেখকের দরদী হৃদয়ে ব্যাথিত করেছিল - ''একজন তার শার্টের বোতাম খুলে ডান কাঁধের দিকে কন্টার হাড়ের কাছটা দেখান। ডুমো ডুমো হওয়া ক্ষতবিক্ষত দাগ। ঘা এখনও পুরো শুকোয়নি। তার পাকিয়ে যাওয়া দুর্বল শরীরটার দিকে তাকিয়ে বর মায়া লাগছিল।'' (এক নির্দয় দয়েল পাখী/ক্ষমা নেই)।

একজন শিল্পীর লেখায় ক্ষমার অযোগ্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা বিষয়কে অনেকেই অন্যায় বলে শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভৎসনা করেছিলেন। ২২-১২-১৯৭১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অমানবিক পৈশাচিক ধর্ষনকারী, লুন্ঠনকারী ও হত্যাকারীদের সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঙমা না ক্ষমা নেই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতা ১৯ - ১৯৭১ সালের ২৮শৈ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন শিল্পীর ক্ষমা না করার অসহিষ্ণুতা শিক্ষার অভাব সংস্কৃতির অভাব বলে সমালোচিত করেছিলেন। সেইসব সমালোচকদের উদ্দশ্যে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ - ''মশাইরা, যান। তাড়াতাড়ি গিয়ে গ্রাম শহর মাঠ ঘাট পুকুর খাল নর্দমা কুয়ো থেকে পচাগলা লাশ আর মাথার খুলি মড়ার হাড় চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে রাতারাতি বাড়ি তুলে ফেলুন। গাছে চড়ার লোক না পেয়ে ডাব খাওয়ার জন্যে পাক-ফৌজ যে গাছগুলো গোড়া কেটে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো চটপট মাটিতে খাড়া করে দিন।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)।

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসহিষ্ণুতার মূলে নিহিত তাঁর দায়বদ্ধ সামাজিক বোধ। সেই বোধে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছিল সাংবাদিকতাপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন - ''এ পর্যন্ত আমি আমার একটা লেখাতেও বাংলাদেশে হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সত্যের কথা বলিনি। তার কারন, লিখতে গিয়ে লজ্জায় আমার কলম থেমে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো সৈন্যবাহিনী, এমনকি নাৎসীরাও এমন ব্যাপক হাতে বাড়ি ঢুকে নারীধর্ষণ করেনি। শুধু ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পর হত্যা। ধর্ষণের পর সবাইকে মেরেছে তা নয়। বড় একটা দলকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে তারা নিজেদের বেশ্যালয় খুলেছিল। বেশ্যাদেরও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, এরা ছিল খাঁচায় বন্দী। .... পাক ফৌজ ধর্ষণ করে মৃত মনে করে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে। আজও বেঁচে আছে এমন ধর্ষিতা মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। ....। ত মেয়ে মরেনি, কিন্তু বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)। এই পাশবিক অত্যাচারীদের প্রতি সহিষ্ণু ও নমনীয় না হবার মধ্যে লেখকের সত্যবোধ সচেতন শিল্পী সত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই পরিচয় হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি। তাঁর লেখায় সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে আমরা শৈলীতে ডায়েরি ধর্মিতার নিদর্শন পাই ক্ষমা নেই গ্রন্থে - ''মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউটাউনের পাশদিয়ে আসছিলাম। দু-পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি।'' (ভয় নেই/ক্ষমা নেই)। ব্যক্য বিন্যাস শব্দচয়ন ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় আমরা তাঁর ডায়েরিধর্মি রচনার শিল্পরূপের আভাষ পাই। সেই সঙ্গে এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তার ভ্রমণ পিপাসা। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কছায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন - ''বাসে আসতে আসতে দেখলাম হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সারবাঁধা নৌকোয় রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)।

ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস শিল্পের আরেকটি ভিন্ন প্রয়াস 'কতক্ষুধা'। এই উপন্যাসটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিক ভনানী ভট্টাচার্যের (১৯০৬-১৯৮৮) প্রথম ইংরেজি উপন্যাস 'So many Hungers' (১৯৪৭- বোম্বাই এ প্রকাশিত) এর অনুবাদ উপন্যাস 'কত ক্ষুধা' ভবানী ভট্টাচার্যের 'So many Hungers' এর অনুবাদ করে কত ক্ষুধা শীর্ষক উপন্যাস সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত করেন।

চল্লিশের দশকের প্রথম পর্বে ভারতীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজিতে উপন্যাস রচনার প্রবণতা জেগেছিল রাজনৈতিক উদ্দীপনা থেকে। সেকালে ইংরেজি উপন্যাস সৃস্টিতে অগ্রগণ্য ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ আর কে নারায়ণ রাজরাও ভবানী ভট্টাচার্য তাঁর Shadow from Ladakh (১৯৬৬) উপন্যাসটির জন্য ১৯৬৮ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। বাংলা ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে তাঁর অন্যতম রচনা হল 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ (কল্লোল শ্রাবণ ১৩৩৪), 'সাহিত্যিক সংহতি' শীর্ষক গল্প (কল্লোল মাঘ- ১৩৩৪) 'ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এক কণা ' 'এত ঘণা করি তবু' 'কালো চোখে এত আলো ' শীর্ষক কবিতাগুলি। তিনি ১৯৪১ সালে 'Music for Mohini' শীর্ষক উপন্যাসটি লিখতে শুরু করে ও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ১৯০৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি হন। 'দি হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ Some Memorable yesterday গ্রন্থ। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের ভারতীয় দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে তিনি ওফশিংটন ভি সি তে যান। সাহিত্য সম্মেলন ও বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে জিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় সহ জাপান, টোকিও, নিউমিল্যান্ড দেশে বিভিন্ন সময়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ভবানী ভট্টাচার্য প্রফেসর নিযুক্ত হন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিয়াটল-এ। তিনি জীবনদর্শনে গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতির জনক মহাত্মাগান্ধীকে।

ভাবনী ভট্টাচার্য ১৯৭২ সালে নিউ ইয়র্কের St. Martins Press Contemporary Novelists in the English language শীর্ষক আলোচনায় বলেন - '' তারপর মহামন্বন্তর বিনাশের ঝাঁটা নিয়ে এসে পড়ল বাংলার ওপর। অনুভবগত উত্তেজনা যা পেয়েছিলাম (দুই মিলিয়নের অধিক পুরুষ, নারী, শিশু মানবসৃষ্ট অভাবে ধীরগতি অনাহারে মরে গেল'' তার চাপ এসে গেল সৃজনের ওপর। তার ফলশ্রুতি হল So Many Hungers কত ক্ষুধা প্রথম দেজ সংস্করণ আগস্ট ২০১০ পৃঃ ৭-৮) এই উপন্যাসটি দেশী বিদেশী বহু পত্র পত্রিকায় সমাদৃত হয়েছিল। এই উপন্যাস সম্পদে The times Literary supplement পত্রিকা লিখেছিল "Stneere, bitter.... a factual and vivid account of one of the most shocking disasters in history" (কত ক্ষুধা পথম দেজ সংস্ক রণ ২০১০, পৃঃ ১০)

এই উপন্যাসটিতে লেখকের দায়বদ্ধ সৃজনী প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মনুষ্য সৃষ্ট মর্মান্তিক মন্বন্তর, জীবন সংকট, দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি - কালোবাজাবিদের নির্মমতা, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পোড়ামাটি নীতি, যুদ্ধের দেশীয় ও অন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, ভারতছাড়ো

আন্দোলন ইংরেজ সৈন্যের পাশবিক লালসা - মন্বন্তরের তথ্যানুসন্ধান অসংখ্য নিরন্ন মানুষের হাহাকার প্রভৃতি। এই উপন্যাসে লেখক ব্যক্তিক পারিবারিক দেশীয় ভাবনার সঙ্গে জাগতিক চেতনার সমন্বয় খাটিয়েছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হবে প্রচন্ড আশাবাদিতায় আদর্শ বাদী দেশপ্রেম স্বার্থমুক্ত উদার মানবতার মহান জীবনদর্শন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কত ক্ষুধা উপন্যাসের অনুবাদ সম্পর্কে উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে রবিন পাল লেখেন ''তাঁর অনুবাদ কবিতায় যেমন উপন্যাসটি অনুবাদেও আমরা দেখব একান্ত ঘরোয়া বাংলা লোক শ্রুতি প্রবচন ব্যবহৃত যা অনুবাদকে প্রায় উদ্দিস্ট ভাষার মৌলিক রচনার কাছাকাছি নিয়ে চলে। খুব কম বাঙালি অনুবাদকই সুভাষের মতো এই ঈর্ষানীয় দক্ষতার অধিকারী। এই বইটিতে ঘরচলতি বাংলা ব্যবহারের কিছু নমুনা - চিমড়ে পরা কৌটো, ট্যাখ ভারী করো, যা হয়ে গেলাম, কুঁচকি কণ্ঠা ভর্তি করে যাক, জবর, আঙুল ফুলিয়ে কলা গাছ, বেখাপ্পা, দাবার বড়ে, গাধা পিটিয়ে মানুষ, টিউশনির যাঁতায় পেশা, কিংখাবের ব্লাউজ, ফোঁৎ ফোঁৎ কয়সা হল ডানা গজানো পাখি, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, সাঁক সাঁক করে উঠল ইত্যাদি। এগুলি ইংরেজির কাছাকাছি, অথচ এই ব্যহারে অনুবাদ টিকে আর অনুবাদ বলে মনে হয় না। যেখানে ইংরেজি না রাখলেই নয় সেখানে তা রাখা হয়েছে।'' কত ক্ষুধা - প্রথম সংস্ক্রণ ২০১০ পৃঃ ১২।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা' উপন্যাসটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত আঠারেটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই উপন্যাসটিতে আমরা 'ক্ষুধা' শব্দটির ব্যাপ্তি অনেকভাবে হয়ে উঠেছে - মানুষের শরীরী ক্ষুধা, ঘর বাঁধার ক্ষুধা - ছোট ছোট আশা পুরনের ক্ষুধা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির ক্ষুধা যুদ্ধে জয়ের ক্ষুধা স্ত্রী পুরুষ পিতা সন্তানের ক্ষুধা শান্তি স্থাপনের ক্ষুধা আত্মপূর্ণতার ক্ষুধা সৃষ্টি ক্ষুধা প্রভৃতি।

আলোচ্য কত 'ক্ষুধা ' উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখি রাহুলের পরিবারে তার স্ত্রী মঞ্জু একটা সন্তান প্রসব করছে। সেই পরিবারে এই সন্তান প্রথমের আনন্দের সঙ্গী হয়েছে তার ভাই কুনাল, সচেতন পিতা সমরেন্দ্র বাবু ও তার মা। গত প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই জন্ম নিয়েছিল রাহুল। তার সন্তানের জন্ম হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কানে। মহাযুদ্ধে আয় একটি পরিবারের মানুষগুলোর বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রকাক হয়ে যায়। পরিবারের মানুষ জনের মধ্যে মহাযুদ্ধ প্রভাব ফেলে। জনজীবনে এই মহাযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনাগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছিল। রাহুল জীসেন্ বেতার কেন্দ্রে এক ফ্যাসিস্টের বক্তৃতার শুনছিল। লেখকের ভাষায় সেই ফ্যাসিস্ট ''দুনিয়াসুদ্ধ লোককে শাসাচ্ছে। এক দল গুন্ডা এক মহান জাতিকে কান ধরে ওউ বস করাচ্ছে, তাকে দিয়ে দুনিয়াটাকে তছনছ করে দিতে চাইছে। ফলে, তার মাথায় ঢুকেছে যুদ্ধ ছাড়া সে বাঁচবে না। কারণ, পরাজয়ের গ্লানি তার বুকে জগদ্দল পাথরের

মতো চেপে আছে, দম বন্ধ হয়ে সে ভাবছে ইউরোপের কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। মানুষের এমন ভুলও হয়। জার্মান জাতি নিশ্চয়ই বাঁচবে - যুদ্ধে যদি সে হারে। ইংলন্ডের প্রতিক্রিয়ার বাহিনী তার নাৎসী জাত ভাইদের খতম করুক। তবেই যদি জার্মেনি বাঁচে।

ইংলন্ডও তাতে বাঁচবে। ঝানু রাজনীতিক দের পাল্লায় পড়ে মানুষের ভালমন্দ বোধের বাইরে চলে গেছে সে। সেখান থেকে তাকে টেনে এনে গায়ের ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সুশিক্ষিত এক দল নেতা -'' এক -কতক্ষুধা পারিবারিক চরিত্রগুলোর সাধারণ কথাবার্তায় আসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। রাহুলের মা ফিরে দালানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলেন --'' আমাদের জীবনকালে এইবার নিয়ে দুবার গ্রেট ব্রিটেনকে জার্মানির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে''। রাহুল মনে মনে উপহাস করে তার মাকে বলে - '' যাও না, আরও ভাল করে শয়তানের ট্যাঁক ভারি করো - প্রতিক্রিয়ার এমন বিষদাঁত আর পাবো না। দুর দেশি মানুষগুলোর স্বানীনতা লুটে পুটে নিয়ে - যাও, খুব করে শয়তানের ঝুলি ভরো। এতদিন পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে নিয়ে ইতিহাসের একি বিষয় ঠাট্টা! '' (এক - কত ক্ষুধা)। রাহুল জ্যোতিবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানের একজন জাঁদরেল অধ্যাপক - কেম্ব্রিজের ডি এস সি। তার ভাই কুণালের মাটিতে পা দিয়ে চলা স্বভাব। সে সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু দেরি করেনা। সে ন্যায় অন্যায় বিচার করে না - যুদ্ধ তার কাছে একটা মস্ত অ্যাড্ভেঞ্চার। রাহুল ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মনে প্রাণে সংকল্পিত। রাহুলের বাবার পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বলিষ্ঠ চেহারা, তার সাহেবি পোশাক । রাহুলের মা কিনছেন চাল আর সর্ষের তেল। বাবা সমরেন্দ্র বাবু কিনছেন শেয়ার । আর ভাবছেন যুদ্ধের বাজারে হয় সোনা নয়তো লোহা কিনতে হবে। সে যুদ্ধের সুযোগে আর্থিক দুনিয়ার নেপোলিয়ন হবার স্বপ্ন দেখে। এই পরিচ্ছেদের শেষে লেখক মঞ্জুর গর্ভের সন্তান প্রসবের নতুন এক অর্থ বহনের কথা ভাবে। লেখকের কথা - ''যখন এক রাস্ট্রনায়ক ভেঙে পড়া পচাঁগলা সমাজ ব্যবস্থার তল্পিদার হয়েও অনিচ্ছুক কণ্ঠে সেই সমাজ ব্যবস্থাকে স্বখাত সলিলে ডুবে মরার নির্দেশ দিচ্ছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে তার সন্তানের জন্মগ্রহণ তার কাছে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হয়।

হ্যাঁ হবে। যুদ্ধের রক্তগঙ্গায় স্বস্তিকা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর সমাধি হবে। লক্ষ লক্ষ তরুণের আত্ম বলিদান বৃথা যাবে না।'' (এক-কত ক্ষুধা)

'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি রাহুলের পরিবারে মানুষ জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সমকালের আন্তজার্তিক পেক্ষিত। মঞ্জুর সদ্য প্রসব হয়েছে। তার শরীরের বর্ণনায় আমরা রাহুল ও মঞ্জুর শরীরী ক্ষুধার পরিচয় পাই। ঔপন্যাসি লিখেছেন - ''মঞ্জুর ফিতে খোলা শাদা

জামার ভেতর দিয়ে তার উদ্ধত বুক আসুল অনাবৃত। স্তনাগ্রে চুঁইয়ে পড়া এক ফোঁটা দুধ। পাকা ফলের মতো বক্ষদেশে তার নতুন সরসতা। রাহুলের দৃষ্টি অনুসরণ করে মুখ লিচু করে তাকাতেই বুকের দিকে চোখ পড়ল মঞ্জু। লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি সে দুটো হাত দিয়ে নিজেকে ঢাকল। কিন্তু রাহুলের মানসপটে অনেকক্ষণ ভেসে থাকল চুঁইয়ে পড়া এক ফোঁটা দুধ।'' (দুই - কত ক্ষুধা)

আরেক ক্ষুধার তাড়নায় কুণাল লড়াইতে যোগ দিতে চাইছে। মঞ্জুর যেমন সন্তানকে ভালোবাসে তেমনি এক অব্যক্ত ভালেবাসার ক্ষুধিত মা কুণালকে যুদ্ধে যেতে বারণ করে। কিন্তু কুণাল তার মা কে আস্বস্ত করে বলে ''ভাববে কেন মা? দুনিয়ার দেশে দেশে আজ লক্ষ লক্ষ মা যে তাদের লড়তে পাঠাচ্ছে।'' (দুই-কত ক্ষুধা)

রাহুলের দাদুকে জীবনের ভিন্ন ক্ষুধা পেয়ে বসেছে। তিনি ''শহরে ইস্কুল মাস্টারি থেকে অবসর নিয়েই সোজা চলে গেছেন সমুদ্রের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে। সেখানে চাষিদের মধ্যে মিশে গিয়ে একা হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাচ্ছেন। বছর কয়েক আগে হার কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে বুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে চাষি আর জেলেদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাদের নিয়ে আইন অমান্য করে সমুদ্রের ধারে গেলেন নুন তৈরী করতে জেল হল। মেয়েরাও বাদ গেল না। রাহুলের তখন ছাত্রজীবন। রাহুল মাথা গরম করে কিছু একটা করে বসত, আস্তে আস্তে সেই দিকেই পা বাড়াচ্ছিল।'' (দুই-কত ক্ষুধা) রাহুল ও এখন মনে একটা খচ্ খচ্ উপলব্ধি করে। পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামে সে যোগ দেবার কথা ভাবে। এই পরিচ্ছেদে বিশ্বের যুদ্ধের বাজার কে সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। বাজারে ছুটোছুটি করে দালান তস্য দালাল দালালস্য দালাল। সমগ্র দুনিয়ায় একটা বৃহৎ ক্ষুধা - ''খরিদ করো যুদ্ধের অস্ত্র। কামান বন্দুক, গোলাগুলির মালমশলা। কোনো যুদ্ধ জাহাজের সাজ সরঞ্জাম। লোহা কেনো। লড়াই বেঁচে থাকে লোহা খেয়ে। টাটা স্টিল্স্, বেঙ্গল করপোরেশন স্টিল্স্ - কোবার কেনো, শেয়ার। এক লাখ টন লোহায় বড় একটা শহর গুঁড়িয়ে যায়। পৃথিবী টাকে গুঁড়িয়ে দিতে লাগবে দশ কোটি টন লোহা। কয়লা কেনো, কয়লা। যুদ্ধের হাত পা গরম রাখবে কয়লা। জন্তুর চেয়ে ঢের বেশি নীচে মাটি খুঁড়তে পারে মানুষে। ইস্পাতের নখ দিয়ে পৃথিবীর পেট চিড়ে দিতে পারে। .... একশোতে একশো লভ্যাংশ লাভের টাকায় মৃত্যুর কল তৈরী হবে। গোলা ফাটলে তা থেকে টুকরো টুকরো লোহা মিলবে মাসে দশ লাখ টন। লোক মরবে লাখ দশেক। লোক মরবে আর মনাফা হবে''। মাথা পিছু মুনাফা। পুঁজিবাদী মানুষ ধনের ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যু কামনা করেছিল সেদিন। মানুষ সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় দীর্ঘমেয়াদী সেই মহাযুদ্ধের বিশ্বের সবকিছু কিনে নিতে চেয়েছিল।

(কতক্ষুধা) উপন্যাসের তৃতীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে রাহুলের পিতা তাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্ঠা করে। কিন্তু এই সময় তার দাদুর সন্ধান করে। সেই খোঁজে পথে দুজন চাষীকে জিজ্ঞেস করায় তারা তার দাদুকে ভগবান হিসেবে মেনে নেবার। কারণ হিসেবে তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা জানায়। তাদের হাত ধরে রাহুল দাদুর গ্রাম বারুনীতে পৌছায়। সেখানে তার দাদু সেখান কার চাষা ভুষো মানুষ গুলোকে নাইট স্কুলে পড়াশুনা করায়, চরকার সতী কাটায়, চাষে উৎসাহ দেয় ও কংগ্রেসের ডাকে দেশের মুক্তি ডাকে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের কথায় রাহুলের দাদু তাকে বলে - ''বারুনীতে আমার ছেলেমেয়ের ছড়াছড়ি। এখানকার গ্রামবাসীরা আমার গর্বের বিষয়। তোরা শহরের মানুষ হয়েছিস, তোদের মতো বুদ্ধির চাকচিক্য এদের নেই - সভ্য নয়। জানেশোনেও কম। কিন্তু লোক খুব ভাল এরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধএর জানোয়ারের মতো খাটতে হয়েছে তাদের, হাড় - ভাঙা খাটুনি; তবু মনুষ্যত্বের ওপর বিশ্বাস পষ্ট হয়নি তাদের! '' (তিন-কত ক্ষুধা)।

ভারতের কৃষিভিত্তিক জনজীবনের কথায় রাহুলকে তার দাদু জানায় ''আর কিষাণদের খাওয়া জোটে বছরে দুতিন মাস, যখন মাঠের কাজে মজুরি পায়। বছরের বাকি কমাস তারা শুকিয়ে থাকে। ভারতেরদশ কোটি কিষাণের কপালে নিত্য উপবাস। কালে ভদ্রে তারা ভরপেট খেতে পায়। .... পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই দশ কোটি মানুষ কী দিয়ে মাটিতে কোঁচা লোটানো ধুতি কিনবে? এ থেকেই তুই চরকার মর্ম বুঝতে পারবি, রাহুল - যে চরকা হল আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক। দুখানা রোজ হফ না যাদের, ভারতের সেই কোটি কোটি মানুষ চরকা কেটে শরীরের লজ্জা ঢাকতে পারে।'' (তিন - কত ক্ষুধা) এই প্রসঙ্গে চাষীদের ওপর খাজনার জুলুম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ এখানে যুক্ত করেছেন ঔপন্যাসি। সেই সঙ্গে এই পরিচ্ছেদে দাদু জাতীয় আন্দোলনের মর্মকথায় বলেন - '' জাতীয় আন্দোলন সব চেয়ে আগে যে কাজটা হাতে পিতে চায়, সেটা হল গ্রামোন্নয়নের কাজ। যে জীবন ভবিষ্যতে আমরা গড়ে তুলব, এটা হবে তার বনিয়াদ।'' (তিন/কত ক্ষুধা)। এখানে জাতীয় উন্নয়ন কৃষিভিত্তিক দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ঔপন্যাসিকের মহৎ জীবনদর্শনের নিদর্শন আমরা পাই। উপন্যাসের এই তৃতীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে কানু, কাজলী ও মঙ্গলী চরিত্রের পরিচয় পাই। তার দাদুর কাছে রাহুলের পরিচয় পেয়ে কাজলী হাঁটু গেড়ে বসে রাহুলকে প্রণাম করে। রাহুলের পা থেকে জুতো খুলে কলসির ঠান্ডা জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেয় কাজলী। সে কাজে রাহুল আপত্তি জানালে দাদু তাকে জানায় - '' চাষির ঘরের আদব কায়দা জানা মেয়ে ও। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আচার ব্যবহার গুলো জন্মে থেকে দেখে আসছে। তোমাদের হাল - আমলের শহুরে ভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ও-ই ওর দেশাচার কেমন করে

ছাড়ে? এ বাড়িতে তুমি এসেছ একজন মান্যগণ্য অতিথি -''। (তিনি - কত ক্ষুধা)। এখানে হ্াল আসলের শহরে অভি সভয জনজীবনের সঙ্গে লেখক গাম্য মূল্যবোধের ইবসাদৃশ্য কে শিল্পিত রূপ দান করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের চতুর্থ সংখ্যক পরিচ্ছেদে সমরেন্দ্র বাবু গ্রেট ব্রিটেনের মহাযুদ্ধে জয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য কে জুড়ে দেবার কথা বলেন। বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষ জয়ী হলে শেয়ার বাজার চড় চড় করে উঠে যাবে। তাঁর মনে হয় তিনি হবেন রায় বাহাদুর - রায়বাহাদুর সমরেন্দ্র বসু। তিনি জানেন ''ফটকা বাজারের তজি মন্দার লড়াই। ব্রিটিশের বেগত্তিক হলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সঙ্কটে পড়লে অমনি শেয়ারের দাম হু হু করে পড়তে থাকে। তারপর সেই নার্ভিকে ব্রিটিশ ফৌজ নামে, সুমেরু বৃত্তে রাজকীয় বিমান বহরের পাখা গুড়ে অমনি চড় চড় করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। শত্রুপক্ষ ঘা খাবার জন্যেই গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ফাট্কা বাজারে তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। (চার-কত ক্ষুধা) ফাটকা শেয়ার বাজারের ওঠানামা দেখেই সমরেন্দ্র বাবুরা বিশ্বের যুদ্ধের পরিস্থিতি টের পেয়ে যান। তারপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি চাল ব্যবসার কথা বিবেচনা করেন।''

আলোচ্য উপন্যাসের পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদে উচ্চবিত্ত স্ট্যাটাচের মানুষের পচন ধরা সভ্যতা শিল্পে তুলে ধরার প্রয়াসী দেখি আমরা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী নোবেল পুরস্কার পায় পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজে সেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাহুল স্ত্রীর সঙ্গে উচ্চবিত্তের আমোদ প্রমোদের ছবিতে আমরা দেখি মদ্যপান ও অশালীন মৃত্য। সেই নাচের মেয়েটির তালে তালে গুরু নিতম্ব হাঁসফাঁস করে, তার পৃষ্ঠ দেশ নগ্ন - ''শাড়িটা এসম করে পরেছে যাতে বাহুমূলি পর্যন্ত দুটো হাত আর ঘাড় দেখা যায়। ব্লাউজের লম্বা (কাট) গলায় সন্তনরেখা থেকে অন্তঃপাড়ী গ্ভীর প্রদেশটুকু পর্যন্ত অনাবৃত।'' (পাঁচ - কত ক্ষুধা) এখানে আমরা মঞ্জু ও রাহুলের ঘনিষ্ঠ হবার ছবি পাই। দাম্পত্ত জীবনের শরীরী ক্ষুধার স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ার পরিচয় এখানে পাই আমরা। তাদের ভোগবাসিনা চরিতার্থ করার ও শরীরে আনন্দের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হবার - পরিচয় এখানে পাই আমরা।

'কতক্ষুধা ' উপন্যাসের ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখি যুদ্ধের বাজারে ছোটো ছোটো নৌকোর অস্বাভাবিক মূল্য ও অধিক চাহিদার কথা-- ''জেলেদের এই নৌকো না হলে ঘরে আলো জ্বলে না, পেটে খাবার যায় না। চাষীরা এই নৌকো করেই চর জমিতে করে ফসল নিয়ে হাট যায়। যুদ্ধের বাজারে জেলেদের কাছ থেকে সেই নৌকো কেড়ে নেওয়া হয়। বারুনী গ্রামের বুড়ো বটের নীচে গ্রামসুদ্ধ লোক জুড়ো হয়। সেখানে তারা প্রতিরোধে সংখব্ধ হয়। কেননা শত্রুরা দিন দিন তাদের ঘরে হানা দিচ্ছে বর্বরের দল মানুষের রক্ত চায়। তারা মানুষের চোখের দিকে গুলি ছুঁড়ে হাতের টিপ পরীক্ষা করে। তারা

বাপমাদের হাত পা বেঁধে চোখের সামনে তাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে সঙ্গীনের ফলা ঢুকিয়ে দেয়। মা বউ আর কচি মেয়েদের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়ে সমস্ত জীবনটাই তাদের বরবাদ করে দেয়। কী ভয়ঙ্কর! '' (ছয়-কত ক্ষুধা)। ভারতের সঙ্গে যেন নাৎসী বাহিনীর যুদ্ধ লেগেছে। পরাধীন ভারতের আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। গ্রেট ব্রিটেন পরাজিত হলে ভারত নাৎসী বাহিনীর অধীন আরো পরাধীনতার হস্তান্তর হবে। ব্রিটিশ সেনারা গ্রামগুলো তছনছ করে দিয়েছে। গ্রামগুলোতে মিলিটারির ছাউনি ও উড়োজাহাজের খাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বড় লোকদের পাশ দালান, সাধারণ মানুষের মাটির ঘর সেনারা দখল করে নিয়েছে। মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হবে। পড়েছে। দেশের নৌকোগুলো পুড়িয়েছে খাবার ফসলেও আগুন লাগিয়েছে। দেশের অস্থি মজ্জার মানুষগুলোকে যুদ্ধের বাজারে যেন পুড়িয়ে যাক বাক করে দেবে।

আলোচ্য উপন্যাসের সাত সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা শহরে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেখানে শোনা যায় উদাও ঘোষণা -- ''স্বাধীন ভারত তার বিরাট ভান্ডার উজার করে ফ্যাশিজম-এর বিরুদ্ধে লড়বে। স্বাধীন ভারত হবে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের মিত্র; যত ঝড় ঝাপ্টাই আসুক, স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... স্বাধীন ভারত হবে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের মিত্র; যত ঝড় ঝাপ্টাই আসুক, স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... ভারতবর্ষ স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে যে কোনো আক্রমণ অব্যর্থভাবে রুখে দাঁড়াতে পারবে - তার পেছনে কাঁধে কাঁধ দেবে সংকল্পে অটল, শক্তিতে দুর্জয় জনসাধারণ।'' (সাত - কতক্ষুধা)। বিদেশী সেনারা দেবতা দাদুকে গ্রেপ্তার করে। তিনি বারুনী গ্রামের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন - ''আজ আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। শক্ত হও। সত্য নিষ্ঠ হত। মৃত্যুঞ্জয়ী হও। বন্দেমাতরম্'' (সাত - কত ক্ষুধা) দেবতা দাদু কাজলীদের উদ্দেশ্য করে বলেন - ''ভাই বন্ধুরা, পতাকার সম্মান রেখো। নিজেদের বঞ্চনা করো না। আমরা হারি কিম্বা জিতি, অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রাখব; অহিংসা আমাদের মূলমন্ত্র।'' (সাত - কত ক্ষুধা)। কাজলী বুড়ো বটের নীচে পতাকা উত্তোলনের উৎসবে ও জাতীয় আন্দোলনের সংকল্প উচ্চারণ করে। সেখানে কাজলী সবুজ পাড়ের খদ্দরের সাদা শারির নীচে বাসন্তী রঙের ব্লাউজ পড়ে যেন তিন রঙা নিশান। তারা সেখানে পতাকার তলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হয়।

কত ক্ষুধা উপন্যাসের আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি -- ''বুক টান করে দাঁড়াল চাষিরা। পরপর বার কয়েক প্রচন্ড সংঘর্ষ হল। গুলি চলল বেপরোয়া জখমী মানুষগুলোকে বাড়ি বয়ে নিয়ে গেল

তাদের ভাইরেরাদায়রা। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বন্দিদের হাতে হাত কড়া বেঁধে চালান করা হল দলকে দল। মুখ বুজে যারা এতদিন অত্যাচার সয়ে এসেছিল দমন রাজের চোখ রাঙানিতে ভয় তো তারা পেলই না, সাহস বেড়ে গেল। রক্তচক্ষুর অগ্নিবর্ষণে তাদের মনে আগুন জ্বলে উঠল।'' (আট - কত ক্ষুধা)।

এদিকে মাঠের মাঠে সোনার ধান কাটার সময় হয়ে আসে। মাঠের কাঠফাটা রোদ্দুর কাস্তের গায়ে ঠিকরে পড়ে। গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ধান কাটে। গোলায় ধান তোলে। কাজলী চাষিদের জোটদ্ধ করে। কাজলীর সঙ্গে ধানকাটার কাজে কাস্তে হাতে তুলে নয়ে কিশোর। কাজলী চাষীদের বলেন-- '' জাগো, জাগো সর্বহারা ''। সে স্লোগান তোলে (তামাম মজুর, এক হও।) সে বলে ওঠো জাগো চাষির দল। কাজলী চাষিদের বলে -- ''উঠে দাঁড়াও চাষির দল। ঘুমোবার চমৎকার সময়টুকু ছাড়া আর কীই বা আছে তোমাদের যে হারাবে? কিছু নেই, কিছুই নেই আর।'' (আট - কত ক্ষুধা)। কাজলীর মা কাজলী বড় হয়েছে ভেবে কিশোরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবে। কিশোর কাজলীর সঙ্গে চাষিদের জাগিয়ে তোলার কথা বলে। এদিকে চাষির ধান সামান্য দামে কিনে দেবার অভিসন্ধিতে গিরিশ মুদি যুদ্ধের কথা বলে তাদের ধান বেঁচে দেবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। চাষিদের উদ্দেশ্যে কে বলে-- '' ভাইরে এমন সুযোগ হারালে আর পাবিনে। গোলা খালি করে বেচে দে। আট টাকা করে চালের মন। এমন দর কখনও পেয়েছিস? না একশো বছরের মধ্যে বাপ চোদ্দ পুরুষে কেউ এমন দরের কথা শুনেছে? জোদের ধানগুলো যেন সোনার জলে ছাপানো। রং ধুয়ে যাবে ভাই, রং ধুয়ে যাবে - এ রং পাকা নয়। জাপানি শুত্তুররা আজ আমাদের দরোজায়। আমাদের পল্টনদের ভাল মতন খাওয়ার দরকার। আমাদের কলকারখানার মজুররা যারা খেটে চলেছে, তাদের ভরপেট খাওয়া দরকার। বেশিদিন এভাবে যাবে না, ভাইরে; ব্রিটিশরা আছেন, মার্কিনরা আছেন। তাঁদের পায়ের নীচে জাপানি শত্তুররা ছাতু হয়ে যাবে। তখন? ধানচাল কিনবে কে? '' (আট - কত ক্ষুধা)। সরল মনের চাষীদের ভাবে ফন্দি এঁটে গিরিশ মুদিরা কৌশল নিঃস করার ফন্দি এঁটেছিল যুদ্ধের বাজারে। এক শ্রেণীর কালো বাজীরেতে সাধারণ মানুষ নিরন্ন হাহাকারে ভুগেছিল এদেশে। এই শ্রেণীর মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসি আলোচ্য উপন্যাসে।

আলোচ্য 'কত ক্ষুধা ' শীর্ষক উপন্যাসের নয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে কাজলীর প্রাণে আনন্দের বান ডাকে। সরল খুহিতে হাসতে হাসতে তার চোখে জল গড়িয়ে আসে। ''কাজলীকে হাসতে দেখে কিশোরে বুকের মধ্যে রক্তের স্রোত তোলপাড় করে উঠল; মনে তুল তার মাতাল হৃদয় যেন কাগজের নৌকোর মতো ঘুর্ণীর মধ্যে টলছে।'' (নয় - কত ক্ষুধা)। দুমাস হল কিশোর ও কাজলীর বিয়ে হায়েছে। কাজলী

এখন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত কিশোর চরকায় নিজহাতে শাড়ি বুনে কাজলীকে পাড়ায়। কাজলী ক্রমে মন্তান সম্ভবা হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে এসে অনেক দিন পর কাজলীকে দেখে রাহুল অবাক হয়ে যায়। সংসারের প্রয়োজনে কিশোর শহরে চাকরির খোঁজে রওনা হয়। ট্রেনের জন্য রাস্তা সংক্ষেপ করতে কিশোর বাঁধের ওপর উঠে রেল লাইনে পা দেয়। একজন পাহারাদার সেপাই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কিশোর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কাজলীর দুগাল বেয়ে অবিরল ধারায় আশ্রম গাড়িয়ে পড়ে।

আলোচ্য উপন্যাসের দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শুরুতে কুণাল তার দাদাকে চিঠিতে জানায় লিবিয়ার কোনো মরা প্রান্তর থেকে। সে চিঠিতে ভারতীয় সেনাদের জন্য গর্ববোধ করে। তার গর্ব যে, ''দারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়েও ভারতীয় সোপাইরা সামনা সামনি যুদ্ধ করে গোরা সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে।'' (দশ কত ক্ষুধা)। রাহুল লক্ষ্য করছিল সেকালে মানুষ মরছে অনাহারে। মানুষ তৈরী করেছে কৃত্তি কৃত্রিমভাবে দেশে আকাল। এদেশে ''দুস্থ, নিঃস্ব যে হাজার হাজার গ্রামবসী এই আমিরি শহরে এসে আছড়ে পড়েছে, যন্ত্রণায় কাৎয়াছে তারা।'' (দশ -কত ক্ষুধা) খাদ্যের অভাবে মানুষ শহরে ভিড় করতে থাকে। আর এক শ্রেণীর মানুষকে টাকার নেশা পেয়ে বসেছে। হৃদয়হীন , অমানুষগুলি দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক ডাকাতি করছে। গ্রামের মানুষ পিতৃ পুরুষেরা ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে একমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। তাদের সম্বন্ধে কালো বাজারী মজুতদারেরা মহা অমনোযাগী ও উদাসীন। এসব ভেবে রাহুল চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ভাবে নিতান্ত নিজের পেটের জন্য মানুষ বিদ্রোহী হতে পারবে না কেননা সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ। কিন্তু এই নিরন্ন মানুষগুলিই যখন নীতির প্রশ্নে তারা লড়াই করবে তখন তাড়া প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। কিন্তু বাদুল আশাবাদী ''কিন্তু দিন আসবে - কোটি কোটি মানুষ চোখে মেলে সত্যকে দেখবে, বাঁচবার অধিকার তারা বুঝে নেবে। সেদিন তাদের জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে অত্যাচারীর দল প্রাণ ভয়ে কাঁপবে।'' (দশ - কত ক্ষুধা)

ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের এগারো সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি একদিকে বাংলার নিরন্ন হাহাকার বুভুক্ষের মিছিল অন্যদিকে পাঁচ মাসের গর্ভবতী কাজলীর প্রকৃতির বুক চিড়ে ফসল ফলানোর অদম্য চেষ্টা। সে মাটি কুপিয়ে ঢেলা ভেঙে, আগাছা নিড়িয়ে বা বাগান লাগানোর চেষ্টা করে কাজলী। সে ''বেড়ার ধারে ধারে কাজলী সিমের বীজ লাগিয়েছে। বরবটি গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এরই মধ্যে বেশ তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে। বেগুন আর সিমের মাঝখানে এক সার ট্যাড়স্ গাছ। ঘরের চালের ওপর লতানো কৃমড়োর ডাঁটা। বছরের শেষে শুকিয়ে এসেছে। উঠোনের এতটুকু মাটিও পড়ে থাকতে দেয়নি কাজলী।'' (এগারো - কত ক্ষুধা) ''দিনে হাজারবার কাজলী হেঁট

হয়ে গাছগুলোকে দেখে। আস্তে আস্তে সেগুলি থেকে মুকুল বের হয় ধীরে ধীরে শাদা ফল বড়। তার গাছ প্রতিদিন কেমন করে বেড়ে ওঠে সে ধৈর্য ধরে তা দেখে। ধৈর্য ধরে তাদের বেড়ে ওঠা প্রতীক্ষা করে সে। কাজলীর গাছের সঙ্গে অসাধারণ শৈল্পিক গুণে লেখক বাংলার দেশ লড়ছে জীবন মরণ লড়াই। মানুষের সত্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত শিশুরা কেঁদে কেঁদে মরে যায়। দলে দলে মানুষ মরিয়া হয়ে বাপদাদার ভিটে মাটি ছেড়ে অন্নের সন্ধানে পথে বার হয়। ট্রেনের পাদানীতে ঝুলতে ঝুলতে, চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে রোদ্দুরে ঝল্‌সায়। পুলিশ এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। মাঠ খাটের ওপর দিয়ে দলবদ্ধ মানুষ তখন পায়ে হাঁটে। দশ হাজার গ্রাম স্রোতের মতো শহরে ধাওয়া করে।'' (এগারো কত ক্ষুধা)। গ্রামের ছোট ছোট কচিকাঁচা অনুর পরিবার, বিষ্টুর বছর চারেকের বোনটা গলা গলা করে সেদ্ধ ডুমুর খায়। অসুর মা দিদি অনভ্যাসে খেতে না খারলেও বুনো কচু খেতে বাধয হয়। আতঙ্কে হতাশায় অসুর কান্না পায়। সে চোখের পাতা দিয়ে আশ্রয় ঠেকিয়ে রাখে। এসময় বাংলায় প্রচর গরুর চাহিদা বাড়ে। কেনানা পল্টনরা গরুর মাংস খায়। সমাজিক দায়বদ্ধ শিল্পীর চেতনা নিয়ে সমকালের মন্বন্তরের বাংলার ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসি হৃদয়ের তুলিতে। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (কত ক্ষুধা) উপন্যাসের সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই মঙ্গলার খেয়ে বাঁচার মতো ঘাসের জমির অভাব। কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন-- ''ফসল বাড়ানোর জন্যে গাঁয়ের পুরনো গোচর ভূমিতে এখন আবাদ হচ্ছে - গোরমেন্টের নাকি হুকুম। একটু দূরে আর যেসব মাঠ ছিল, সেখানেও গাঁয়ের লোকের গোরু চরানো বন্ধ ।কেন বন্ধ তা কেউ জানে না। তবে মনে হয়, যেসব পাইকাররা গোরু কেনাবেচা করছে, এ হল তাদেরই ফন্দি। যেসব গোঁয়ার লোকেরা কিছুতেই গোরু বেচতে চাইছে না, হৈ ভাবে তাদের প্যাঁচে ফেলা হচ্ছে।'' (বারো - কত ক্ষুধা)। এই পারিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই পঞ্চাশের মন্বন্তর মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। আর এই সংকটের আগুনের আঁচ কেবল মানুষই নয় - মনুষ্যেতর প্রাণীগুলিকেও সেদিন পুড়িয়ে দিয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষের আগুন। অস্থিচর্মসার সেদিনের সেই গরুগুলোর দুধেণ আশা ছিল না। কেননা গাইগুলোর বাঁট শুকিয়ে সিঁটকে গিয়েছিল। মঙ্গলাকে নিজের প্রাণ থাকতে বেচে দেবার কথা ভাবতে পারেনা চাষি মা। শেষ পর্যন্ত নিজের পেটের ক্ষিদেয় মঙ্গলার গলার ঘন্টা টি বিক্রি করে সে। দুর্ভিক্ষে সেদিন মা সন্তানের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একটি জেলের বউ তার গর্ভের ছোট শিশুটিকে গর্তে মাটি চাঁপা দেয়। লেখক বলেন ''ছেলেটা চিঁ চিঁ করে ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদে। মেয়েটি আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে ঃ সোনা আমার, আর খিদেয় কষ্ট পাবে না। মালিক আমার ঘমোও। গর্তের মধেয ছেলেটাকে শুইয়ে দেয়, হাড়

বার করা বুকের ওপর দুটো কাঠি কাঠি হাত জোড়া করে চোখের পাতা টেনে বুজিয়ে দেয়। ছেলেটাকে সেযন ঘুম পাড়াচ্ছে। তার পর তাড়াতাড়ি গর্তটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে থাকে।

মা যেন পাথর হয়ে গেছেন। নড়তে পাড়ছেন না, কথা বলতে পারছেন না। ছেলেটার চিবুক পর্যন্ত যখন মাটি ভরাট হয়ে এসেছে, তখন মা মরিয়া হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন।'' (বারো - কত ক্ষুধা)

সেই দুভির্ক্ষের সুযোগ নিয়ে শহরের একশ্রেণীর উচ্চবিত্ত গ্রামের সুন্দরী মেয়ে ও নারী ভোগের লিপ্সার মেতে উঠেছিল। এই শারীরিক ক্ষুধায় ও পাশাবিক চাহিদায় সেই শ্রেণীর মানুষগুলো মহিলাদেরই ব্যবহার করেছিল সেদিন। এই প্রয়োজনে শহরের সেই মানুষগুলো একটি মেয়ে মানুষকে শাড়ী, মিস্টি ও চাল দিয়ে পাঠায় কাজলীর বাড়িতে। সেই মহিলা কাজলীর মাকে ফিস্ ফিস্ করে বলে -- ''রাণির মতো থাকবে তোমার মেয়ে। যেমন গড়ন তেমনি রূপ। শহরের লোক ওকে দেখে পাগল হয়ে যাবে, ওর পায়ের ধূলো চাটবে। যত ইচ্ছে কুঁচকি - কণ্ঠায় খাবে। দেদার শাড়ি পাবে, গয়না পাবে গা-ভর্তি। সোনার চুড়ি, সোনার রুলি। মণিমুক্তোর হার, কানপাশা। দেখ তোমার জন্যে এই শাড়ি এনেছি''। (বারো- কত ক্ষুধা) দুর্ভিক্ষের দিনে উচ্চবিত্ত মানুষগুলির যৌন চাহিদা ও ভোগবাসনার বাদ পড়েনি অন্তঃস্বত্তা নারীরাও। এরই প্রকাশে লেখক লিখেছেন-- ''কতদিন আর মিথ্যে ইজ্জত ধুয়ে যাবে? তারপর মেরে দিকে তাকিয়ে ভাল করে বোঝবার চেস্টা করে। অনাহারে যেন তার রূপ আরও খুলে গেছে। শুকনো খরু মুখে বড় বড় টানা চোখ। পেটে ছেলে থাকায় স্তনযুগল সুপরিণত। কিন্তু অনাহারের দরুণ ক্ষুদ্রকায়। '' (বারো - কত ক্ষুধা)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের (তের) সংখ্যক পরিচ্ছেদে শ্রেণী বৈষম্য ও লেখকের পুঁজিবাদী জনমানষের প্রতি শ্লেষাত্মক সৃষ্টি মানুষ পাই আমরা । সেই সঙ্গে অনাহার ক্লিস্ট দুস্থ মানুষের প্রতি লেখকের দরদ ভরা জীবন প্রত্যয় দেখি। তাদের কথায় লেখক বলেন ''এই বড় রাস্তা ধরে ছিন্নমূল মানুষ ঘা-দগ্ দগে পায়ে দলে দলে গেছে অদৃস্টের সন্ধানে। এমনি আরও শত শত রাস্তা ধরে। যত গেছে, ততই কুয়াশার মধ্যে অনিদির্স্ট দূরে সরে যায়। পেছনে অতীত নেই। সামনে ভবিষ্যৎ নেই। শুধু মুহূর্তের মধ্যে, শুধু শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচা। ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, চোখ মেলে জীবন, আবার মৃত্যু। রাস্তা তোমার ঘরবাড়ি পথের শুরু কোথায়, শেষ কোথায় দেখা যায় না। রাস্তার ধুলো তুমি, রাস্তা থেকে তোমাকে আলাদা করা যায় না। তোমার নাম দিয়েছে ওরা দুস্থ।'' (তের -কত ক্ষুধা)

গ্রামের হাজার হাজার মানুষ একমুঠো ভাত ও ফ্যানের প্রয়োজনে শহর অভিমুখে ছুটে চলেছে। খাদ্যের সন্ধানে অন্তঃসত্ত্বা নারী কাজলী, নাবালক অনু সকলেই শহরের দিকে ধাবিত হয়। পুলিশের গুলিতে যারা বিকলাঙ্গ তারাই কেবল সেদিন গ্রামে ছিল বাধ্য হয়েই। তথাপি ''মহাজন গাঁ থেকে নড়ছে

না! সে একধার থেকে জমি কিনবে, সম্পত্তি কিনবে। সাধারণ মানুষের সে কেউ নয়। শকুসিরা মানুষের দুঃখ দুদর্শার ওপর বেঁচে থাকে।'' (তের - কত ক্ষুধা) এখানে লেখকের উচ্চবিত্তের শোষণ বঞ্চনা লোভের প্রতি প্রতিবাদ ও ক্ষোভের প্রকাশ আমরা পাই। মন্বন্তরের গ্রামীণ দুর্দশা গ্রস্থ অসহায় মানুষের প্রতি একাত্ম হয়ে ঔপন্যাসি বলেন '' রাস্তার পাশে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মানুষের শব। হাড় থেকে ঘসিয়ে নিয়েছে মাংস, খাবলানো চোখ - নাক, চিবুক আর পাঁজরের কাছটাতে সামান্য একটু চামড়া আর মাংস লেগে আছে। মাথার খুলি ঠুকরে ঠুকরে ভেঙেছে, চুলগুলো শুধু অক্ষত। বাচ্চাদের পাতলা চুল, পুরুষদের চুল, মেয়েদের কটি তট বিস্তৃত কেশপাশ। একটি গোটা পরিবার চির নিষ্প্রায় শায়িত, নিদ্রার পরপারে শকুনির দল।'' (তের-কতক্ষুধা) এখানে অসহায় মানুষের দুভির্ক্ষের কবলে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিল। অন্যদিকে সম্পত্তি ও ধন লোভের ক্ষুধায় পুঁজিবাদি মানুষ অমানবিক ভাবে কতটা ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছেন তার জীবন্ত দলিল উপন্যাসে শিল্পিতরূপ দিয়েছেন লেখক। মৃত্যুর পাহাড় ডিঙিয়ে লেখকের ইতিবাচক প্রচন্ড শাবাদিতা তথাপি। জিইয়ে থাকে আগামী প্রচন্ডকে নিয়ে। সেই আশাবাদের কথায় পেটের সন্তান গর্ভে নড়েচড়ে উঠলে কাজলী বলে ''জেগে আছিস? কাজলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাভিদেশে হাত বোলায় তার অনাগাত সন্তানকে সে আদর করছে। জীবনের সমস্ত রঙিন স্বপ্ন টুকে গিয়ে একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। আজও কাজলী স্বপ্ন দেখে তার আগত শিশুকে নিয়ে। '' (তের - কত ক্ষুধা)। সৃষ্টির ধারা সময়ের নিয়মে সংকটকে ডিঙিয়েও অটুট থাকে । সেকালে অর্ধমৃত অস্থিচর্মসার মানুষগুলো শেয়াল কোথাও কোথাও জ্যান্ত ছিঁড়ে খেয়েছিল। একসময় কাজলীর শরীর থেকে যখন রক্ত স্রোত বয়ে তার শরীরে যখন সেপ্‌সিস্ দেখা দিয়েছিল তখন তাকে শেয়াল ছিঁড়ে খাবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল। তাকে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের চোদ্দ সংখ্যক পরিচ্ছেদে লেখক বাংলার মন্বন্তরের কৃত্রিম উপায়কে অন্বেষনী সন্ধানে লিখেছেন -- ''ধান বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে! এক কোটি চাষি যখন খিদেয় আর্তনাদ করছে, তখন তাদের ঘর্মাক্ত হাতে বোনা ধান বাংলাদেশ থেকে প্ল্যান-মাফিক বেরিয়ে যাচ্ছে।'' (চোদ্দ - কত ক্ষুধা) লেখক দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন-মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান করে বলেছেন-- ''গ্রাম থেকে স্রোতের মতো আসছে বুভুক্ষু জনতা। তাদের এক বিরাট অংশের শক্ত খাদ্য হজম করার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তারা মরে গেল। তাদের ভাত খেতে দেওয়া মানে মেরে ফেলা। বিশেষ পক্ষের দরকার ছিল তাদের। '' (চোদ্দ - কত ক্ষুধা)।

বিবেকহীন মানুষ সেদিন সমাজ সচেতন শিল্পীদের বাস্তবতার ছবি আঁকাকে আঘাত করে স্তব্দ করে দিতে চেয়েছিল তাদের সৃজনী ধারাকে। এক শিল্পী যখন দুর্ভিক্ষের বাস্তব ছবিতে শিল্পে আকতে বসেছিলেন - মা মরে গেছে আর জ্যান্ত অবস্থায় তার ছেলে বুকের দুধ খাচ্ছে। শিল্পীকে শক্তিমানেরা সেদিন কিল-চড়-ঘুষি দিয়ে তার ছবি আঁকার প্যাড ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। ‘‘শিল্পী ভদ্রলোক দেহ দিয়ে তাঁর ছবিটা আড়াল করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। প্রচন্ড চড় লাথি বর্ষণ হতে লানাল তাঁর ওপর। ’’ (চোদ্দ - কত ক্ষুধা)।

আলোচ্য উপন্যাসের (পনেরো) সংখ্যক পরিচ্ছেদে মঞ্জুওকে তার স্বামী রাহুলের সঙ্গে থাকতে দেখা যায় শহরে। রাহুলের মনে সব সময় অস্থির সুখ নেই। গবেষণায় তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে প্রথম প্রথম মঞ্জু রাতে ঘুমোতে পারি না। তার কানে আসে বুভুক্ষু মানুষের মর্মন্তুদ আর্তনাদ - ঘা খাওয়া পশুর মতো। একটানা গোঙানি আর শূন্যগর্ভ বিলাপ - মা! মা - গো-মা! ফ্যান দাও, মা পায়ে পড়ি, মা। ’’ ক্ষুধার্ত মানুষের আর্ত চিৎকার ক্রমশঃ কেমনভাবে মানষের অনুভূতিতে সহনশীল হয়ে ওঠে তার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক মঞ্জুর কথায়। লেখক বলেন -- ‘‘দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা, মিনিটের পর মিনিট নিজের বাড়ির দরোজায়, পাড়াপড়শির দরোজায় সেই ক্ষুধার্ত চিৎকার শুনতে শুনতে একদিন তার ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে যায়; প্রথম প্রথম যে বেদনা, যে করুণা জাগত, তা আর জাগে না। শেষ পর্যন্ত আর কোনই অনুভূতি জাগে না আহত পশু মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করলে যেমন আমরা দেখেও দেখি না তেমনি। ’’ (পনেরো - কত ক্ষুধা)। মঞ্জু জীবনের রুঢ় দিক টিকে বরাবর এড়িয়ে চলেছিল। সেই মেয়ে মঞ্জুর একটি অন্তঃসত্ত্বা পীড়িত মেয়েকে সুশ্রুষা করে ভালবাসার নতুন অর্থ উপলব্ধি করে। ‘‘পীড়িত মেয়েটিকে প্রথমে সে দৈহিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছে। সেবা করে এক অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে। নিজেকে আর কখনও এতটা উন্নীত বলে মনে হয়নি। ’’ মঞ্জু চরিত্রের মধ্যে এখানে লেখক সেবার মহৎ আনন্দের প্রকৃতি শিল্প রূপদান করেছেন। মঞ্জুর চেতনায় মানুষের প্রতি দরদবোধের জাগরণ ঘটে। রাহুলের অসুখী মনের আত্মক্ষয়ী অস্থিরতার সন্ধান পায় মঞ্জু। মঞ্জু বিশ্বনিয়মের রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার স্বামীর অন্তরের সন্ধান পায়। দাম্পত্ত জীবনের দুটি মনকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানোর এক অভিনব শৈল্পিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষও বাঁচার লড়াইয়ে শহরের ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে স্তুপাকার জঞ্জালে সেদিন খাদ্যের কণা দখল করে নিয়েছিল।

আলোচ্য উপন্যাসের (ষোল) সংখ্যক পরিচ্ছেদে মঞ্জু আর্তমানুষের রিলিফের কাজে মেতে ওঠে। লঙ্গর খানা চালু রাখার কাজে রাহুলকে সাহায্য করে। শিশুদের মরা শিশুদের অনাথ আশ্রম খোলে। তাদের মজুত কাল শেষ হয়। সমরেন্দ্র বাবু মঞ্জুকে চেক লিখে দেয় টাকার জন্য। সমরেন্দ্র বাবু বেঙ্গল লিমিটিডের মালিক লক্ষ্মীনাথকে মনে মনে ঘৃণা করে। কেননা সেই লক্ষ্মীনাথ চোরা বাজারের রাজা। সে দুর্ভিক্ষ্য অঞ্চলের বুকের ওপর চালের গোপন আড়ত তৈরী করেছিল। সমরেন্দ্র বাবু যে কেবল পয়সা আর খেতাব কেই জীবনের লক্ষ্য বলে জেনে এসেছে সে খেন লক্ষ্মীনাথ কে ঘৃণা করে। এই শ্রেণীর মানুষেরা চরিত্রহীন ও লজ্জাহীন। তারা মানুষের যৌন অভিজ্ঞতার কথার অদ্ভুত আনন্দ পায়। সমরেন্দ্র বাবুর কাছে তাদের চাহিদাগুলো তাদের নিজেদেরই বিকৃত ও অসুস্থ মনের পরিচায়ক। সমরেন্দ্র বাবুর মনে হয় - লক্ষ্মীনাথাদের নিজেদের নোংরা জিনিসগুলো দশজনের চোখের সামনে তুলে আনন্দ পায়। এই পরিচ্ছেদে লেখক দুর্ভিক্ষের জন্য স্বার্থপর মানুষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে আর্তের সেবায় যুক্ত করে স্বর্গীয় আনন্দ লাভের পথ দেখিয়ে একটি পরিবারকেও উৎকর্ষতা দান করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের (সতেরো) সংখ্যক পরিচ্ছেদে বাংলার দুভির্ক্ষের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বোধের পরিচয় আমরা পাই। আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতেই আমরা দেখি সোলে মেদিনীপুরের এক সংবাদ দাতার কথায় তিনটি সন্তানের দুস্থ জননী গঙ্গায় ডুবে মরার চেষ্টা করেছেন। সেই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া থেকে রয়টারের তার বার্তা ''মাখনের বরাদ্দ কম করার প্রতিবাদে খনিমজুররা ধর্মঘট করেছে।'' রাহুলের মনে হয় সারা পৃথিবী এক, একই অবস্থা কমনওয়েলথ এর। সোলে একটি খবরের কাগজের কার্টুনে দেখানো হয়েছিল-- ''ওপরওয়ালা প্রধানমন্ত্রী জাগ থেকে জল ঢালছেন আর বড়লাট সাহেব হোয়াইট হলে দাঁড়িয়ে সেই জলে হাত ধুয়ে দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দায়িত্ব স্খালন করছেন।'' (সতেরো - কত ক্ষুধা)

বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষগুলো সেদিন তাদের সমস্ত অনুভূতি নৈতিক বোধ ও মূল্যবোধগুলো হাড়িয়ে ফেলেছিল। লেখকের কথায় ''এরপর হল নৈতিক অধঃপতন। গোড়ায় গোড়ায় ক্ষুধার্ত বাপমায়েরা যেটুকু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত ছেলেমেয়েদের দিত। সকলের তাতে ফুলত না। কিন্তু খিদে যতই মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, ততই মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিলো অসাড় হয়ে ঘরে যেতে লাগল। মনের দিক থেকে ময়ে পুরুষেরা পশুর স্তরে নেমে গেল।'' (সতেরো কত ক্ষুধা) সোলে রাস্তার দুপাশে নোংরা দেহের স্তূপ পচাগলা দেহের স্তূপ ময়লা জঞ্জালের দুগন্ধে পথ চলা কঠিন হয়েছিল। আকাশে জাপানী যুদ্ধ বিমনের বিরামহীন আওয়াজ সহ কঠিন পরিস্থিতি ও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ।

'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের আঠারো সংখ্যক সর্বশেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে আমরা দেখি দুভিক্ষের কবলে পড়ে এক পান ওয়ালীর কাছে নিজের দেহ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। লেখকের কথায়-- '' কাজলী শেষ পর্যন্ত নিষ্করুণ সংকল্পে মন বেঁধে ফেলেছে। সে তার শেষ সম্বলটাও বিকিয়ে দেবে নিজেকে। মার মরণদশা। অসুখে ভুগছেন। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ভিক্ষে করে জঞ্জাল খেঁটে যে খাবার টুকু আনে মা তা খেতে পারেন না ---- সত্তরটা টাকা। তার এই দেহটার দাম অত টাকা? কাজী বিরস মখে অবাক হয়ে ভাবে। মাঠের রাস্তায় এ দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। আবারও না হয় সে দেহ অপবিত্র হবে, তবু সেই পয়সায় মাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে।--- মার দিকে চাইলে তার চোখ জ্বালা করে, বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে। হ্যাঁ, সে শেয়ালের হাতেই নিজেকে তুলে দেবে, যে শেয়াল তার বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। তার আর বেঁচে থেকে কী লাভ? শেয়ালটা তাকেও খেয়ে ফেলুক'' আঠারো কত ক্ষুধা। সে ভাবে একদিন সুদিন আসবে। গ্রামে জমি জায়গা আছে। সেখানে তার বাবাও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরবে। আর অনু ও একদিন তার মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। হয়তো তার স্বামী কিশোর আর ভাই অনুর ফাঁসী হয়েগেছে জেলে। জন্মজন্মান্তরে সেই স্বামী কিশোরের সঙ্গে একদিন সে মিলিত হবে। এই মাটিতেই জন্ম নিয়ে কাজলী কিশোরকে আবার স্বামী রূপে পাবার প্রার্থনা করে। তখন জেলে জেলে চলছিল ভুক হরতালি কংগ্রেস নেতারা আমৃত্যু অনশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন। দেবেশ বসু দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলে-- ''ভাই বন্ধুরা পতাকার সম্মান রেখো, নিজেদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করে না। চরম পরীক্ষার দিন এসে গেছে। শক্ত হও। সত্য নিষ্ঠ হও। মৃত্যুঞ্জয়ী হও। বন্দেমাতরম্'' (আঠারো - কত ক্ষুধা)। দেশবাসীর বুকে তখন স্বাধীনতার চরম ক্ষুধা। কাজলী সেই পানওয়ালীর সঙ্গে তার কথায় দেহ বিক্রিতে চলেছে। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে তার দাদুর কথায়। কাজলী পতাকাকে প্রণাম করেছে। সে নিজেকে দেশের সৈনিক ভাবছে। ক্রমশ তার মনে হয় শত অত্যাচারেও অনশন সংগ্রামের যন্ত্রণায় যত ব্যথা পেয়েছিলেন দাদু তার নিজের জন্য দেহ বিক্রির কথা শুনলে সে দাদু কতটা ব্যথা পেতেন। ক্রমশ তার অসার অনুভুতিগুলি আচ্ছন্নতা কাটিয়ে প্রাণশক্তি ফিরে পায়, তার বাবা - তার কানু ভাই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছে স্বামী কিশোর মজুরদের জন্য লড়েছে তারা কেউ হার মানেনি। কখনো নিজের জন্য মন ভাঙেনি। আর কাজলী সেখানে নিজের দেহ বিকিয়ে দেবে। দেশের কাগজগুলো জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা সবর্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের চেতনায় আঘাত করে সর্বত্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই দেশীয় সর্বত্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই দেশীয় কাগজগুলি সঙ্কটে পড়েছিল সেদিন। কাজলী তার দেহ বিক্রির জন্য আগাম নেওয়া টাকাগুলো কাগজের জন্য দান করতে প্রস্তুত হয়। আর সেই পানওয়ালার কাছে মনে হয়

কাজলী পাগল হয়ে গেছে। অপরদিকে সমরেন্দ্র বাবু মঞ্জু ও অন্য ছেলেদের দেশের লড়াইয়ের মানস্তি। তার উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে। সম্বিত ফিরে পেয়ে তার জীবনের চাওয়া-পাওয়ার জীবন সম্পর্কে আপসোস করতে থাকেন। আর রাহুল পরাধীনতা থেকে মুক্তিই কেবলমাত্র উপায় নয় বলে ভাবে। সে নতুনন জীবন গড়ার কথা ভাবে। সেখানে অনাহার আর দুভাবনা ভয় তার শোষনের হাত থেকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরাধীনতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত কের নতুন জীবনের বাঞ্ছিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে। সেখানে মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। রাহুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাহুলের মানসপটে ভেসে ওঠে এক বিরাট যন্ত্রণার ছবি '' তার সামনে ভেসে উঠছে দুঃখ যন্ত্রণা অন্তহীন ছবি। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা দুমুঠো ভাতের জন্যে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা রোগের হাতে মরতে বসেছে, আরও লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল ছিন্নমূল মানুষ রুজিরোজগার হারিয়ে যাদের ভাঙা দেহে ভাঙা মনে বেঁচে থাকতে হবে - মানুষ বলে চেনা যাবে না। যারা সকলের জন্যে মহত্তর জীবন চেয়েছিল, সেই মেয়ে পুরুষ বন্দির ভিড়ে জেল খানা ভারাক্রান্ত'' কিন্তু জেল খানায় নিজেকে একা ভাবে না। সে লক্ষ লক্ষ মানুষের তরঙ্গে নিজেকে একটি বদ্বদমাত্র মনে করে। জেল খানায় সামগ্রিক কারো মধ্যে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বন্দীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাহুল বিশ্বকবির জয়ধ্বনি সূচক সঙ্গীতে গলা মিলিয়ে গায় -- ''ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে

মোদের আঁখি ফুটবে;

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

মোদের বাঁধন টুটবে।''

আলোচ্য উপন্যাসের জাতীয়তাবোধ স্বদেশমুক্তির চেতনা - মন্বন্তরের মর্মন্তদ বেদনা কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানানসই শব্দ যোজনায়, প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে অনুবাদ সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নিশ্চিত রূপে। চরিত্র - বিষয় ও মহৎ জীবন দর্শন - জীবন চেতনা - জনজাগরণের লক্ষ্য জাতীয়তাবোধ আলোচ্য উপন্যাসটিকে কত ক্ষুধা উপন্যাসে রূপদানে উদ্দীপক হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল নিশ্চিত রূপে। কত ক্ষুধা সুভাষমুখোপাধ্যায়ের মহৎ শিল্পকর্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি মৌলিক সৃষ্টি না হয়েও রচনার গুণ, ভাষা প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায় একাধিক গল্প-উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভাণ্ডারে বৈচিত্র্য দান করেছিলেন । এগুলির মধ্যে তাঁর অন্যতম অনুবাদ সাহিত্য হল রুশ গল্প সঞ্চয়ন , সলঝেনেৎ সিন এর One day in the life of Ivan Denisovich এর বাংলা অনুবাদ

'ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন' , ভীষ্ম সাহানী-র বাংলা অনুবাদ উপন্যাস 'তমস' , হিউটয় এর The Springing Tiger এর বাংলা আনুবাদ ব্যাঘ্রকেতন , 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ , চে গেভারার ডায়েরী , ডোরাকাটার অভিসারে , সেদিন বনে জঙ্গলে , আনাফ্রাঙ্কের ডায়েরী ' ইত্যাদি অন্যতম অনুবাদ গদ্য ।

তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টির মধ্যে ছোট কিশোরদের জন্য সৃষ্ট বাঙালীর ইতিহাস , কথার কথা , জগদীশচন্দ্র বসু , দেশবিদেশের রূপকথা , ইয়াসিনের কলকাতা , টো টো কোম্পানী , রূপকথার ঝুড়ি , জানো আর দ্যাখো জানোয়ার , এলাম আমি কোথা থেকে ইত্যাদি গদ্য নিবন্ধে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর বিশিষ্টবোধ ও চেতনার পরিচয় আমরা পাই । তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ দুটি - 'আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' বাংলা জীবনী সাহিত্যের অনন্য সম্পদ । গদ্য সাহিত্যের ধারায় তাঁর 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' , 'কবিতার বোঝাপড়া' , 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' , 'খোলা হাতে খোলা মনে' , 'ভূতের বেগার' 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' , 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' প্রভৃতি রচনা উজ্জ্বল সৃষ্টি ।

উপসংহার
(সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিমূলে নিহিত তাঁর আদর্শিক চেতনা, ব্যক্তিজীবনের স্মৃতি, বাংলার মাঠ-ঘাট,শহর-নগর, কলকারখানার শ্রমজীবন মন্বন্তর, বৈসম্যহীন-শোষণহীন-পীড়নহীন নতুন জগতের স্বপ্ন প্রত্যয়। কেবল শিল্পের জন্য তাঁর শিল্প নয়— তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল সমকালীনতার বৃহত্তর সত্য, প্রতীয়মান বাস্তবতার জীবনানুভূতি, সমকালের রূপ ও স্বরূপের সঙ্গে আত্মস্থ হয়েই। দেশ ও জাতির কালপ্রবাহজাত সমাজজীবনের সঙ্গে তাঁর চেতনাভূমি অঙ্গীভূত হয়ে গদ্যসাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সমাজ-মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধের অনুভূতি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির আদিকথা। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্য - সাহিত্যে ভাববহুল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুর চড়িয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদের পূজা করেছিলেন। তদুপরি তিনি স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্য ইতিহাসে একমাত্র তিনি প্রথম কবি যিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে সেই দলের মতাদর্শ পুরোপুরি মেনে নিয়ে সৃষ্টির জগতে আসন পাকা করে নিতে পেরেছিলেন।

তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বিশেষ মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। তথাপি তাঁর সাহিত্য নির্বিরোধ গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শ কালের পরিবর্তনে, ক্ষমতার পরিবর্তনে ও যুগের বদলে জনমানসে পরিত্যক্ত হয়। এছাড়া ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি সাধারণ পাঠককে দলগত বৈষম্য ও বিরোধ সৃষ্টি করে। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ দলের হয়ে সেই দলের মার্কসীয় দর্শন কাব্যে প্রতিফলিত করেও বিরোধী পাঠক ও দর্শকের মনে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নেন। রীতিমতো রাজনৈতিক কবিতা ধারার সৃষ্টি করে তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠেন।

তাঁর চৈতন্যের এক প্রবল তাড়না থেকে তিনি সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন। কল্পনানির্ভর নিছক কাহিনী বর্ণনার জন্য গল্প-উপন্যাস তাঁর লেখনী সৃষ্টিশীল ছিল না। পরাধীন ভারতে কৈশোরের নওগাঁর স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা যার সূত্রপাত, পরবর্তী জীবনে সাংবাদিকতা জীবনে, দেশের শ্রমিক সংগঠনের কাজে খেটে খাওয়া মানুষের নিত্যজীবনের সঙ্গে ও জেলজীবনের একাত্ম অনুভূতি জাত অভিজ্ঞতা তাঁর গদ্যসাহিত্যের মুখে ভাষা জুগিয়েছে। শিল্পের সঙ্গে বিশিষ্ট জীবন অভিজ্ঞতার কথা

সাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন — ''আসলে কথাশিল্পের যে চিত্রধর্ম, চিত্রাত্মকতা, গভীর তলাশ্রিত ব্যঞ্জনা — সে সমস্তই কথাকারের ব্যক্তিত্ব, বিষয়ের গুরুত্বে, রচনার স্বভাব স্বাতন্ত্র্যে ও গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতায় রূপ পায়। . . . . সেখানে বাস্তব পৃথিবী, মানুষজন, প্রকৃতি সভ্যতা-সংস্কৃতি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে শিল্পের সুষমা আনার জন্যই চিত্রস্বভাব তৈরী হয়ে যায়।'' (বীরেন্দ্র দত্তের 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৪৪)

তাঁর গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি ও তাঁর শিল্পরূপ বিচারে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য স্মরণীয় — ''গল্পের উপাদান উপকরণ যাই হোক, যেমনই হোক লেখকের অভিমত, অভিপ্রায় বা দৃষ্টিকোণ শেষপর্যন্ত শিল্পীর মানবিকতাবোধের শক্তিতেই উপকরণগুলির বিন্যাস থেকে শিল্পজেগে ওঠে। ভাষার নির্মাণ থেকে সৃষ্ট হয় সাহিত্য।'' (ছোটগল্পের বিষয় আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা ৩৫৪)তাঁর উপন্যাস, নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রিপোর্টাজধর্মী রচনা, ডায়েরীধর্মী রচনা ও জীবনীসাহিত্য রসোত্তীর্ণ সজীব শিল্প হয়ে উঠেছিল। এই গদ্যসাহিত্যের কলাকৌশল ও রূপনির্মিতিতে ছিল প্রগতি নির্ভর। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শিল্পী মানসসরোবরের কেন্দ্রমূলে নিহিত সাধারণ জনজীবন । শিল্পের সঙ্গে শিল্পীমানসের কথায় কবি বিষ্ণু দে যথার্থই লিখেছেন —''.............. সজীব রচনাতে তাই শিলপী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেক্‌নিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হ'ল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান। ....নেতিতে আরম্ভ হ'তে পারে এই মানসের প্রগতি। তারপরে মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ । মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ-চৈতন্য, ঐ-বোধ। ঐ-বোধের পেশীবহুল ছাপ আসে স্বভাবজড় পাথরে, রং-রেখায়, শব্দে, ভাষার বনেদী রীতিতে বাক্যের গোঁড়ামিতে। জীবনের প্রত্যক্ষ আর সর্ব সংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে-থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড পালোয়ানিতে।'' (বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ , প্রথম খণ্ড , দে'জপাবলিশিং ,প্রথমপ্রকাশ, পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যের ভাষা ও ভাব প্রকাশের আঙ্গিকের মধ্যে ছিল বিশিষ্টতা। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল শিল্পীমানসের ও সত্য প্রকাশের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর শিল্প নির্মানে, ভাষা প্রয়োগ ও ভাব প্রকাশে ছিল বিস্ময়কর সাবলীল দক্ষতা। এই গুণেই তাঁর সাহিত্য সজীব হয়ে উঠেছিল। সজীব সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বিদগ্ধ ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন — ''বাঙ্গালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে , বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা — এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ফুটাইয়া তোলার

সার্থকতা থাকিবে — ইহার অন্তর্নিহিত সত্য-দর্শনের মধ্যে এবং শক্তিময় প্রকাশের মধ্যে।'' (সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রা. লি, তৃতীয় প্রকাশ পৃষ্ঠা ৬৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে নিরন্তর স্বপ্নের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিক সমস্যা ও সামাজিক চলমান সমস্যাগুলিকে শিল্পের সমস্যার সঙ্গে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য সাধনা সময়ের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর সময়চেতনা ও সাহিত্য সাধনার সঙ্গে বিদগ্ধ সমলোচক সরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য —''পৃথিবীজোড়া একোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করার কারণ আমরাই। আবার দূষিত পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধতার সাধনাও তো আমাদেরই। . . . . এখানে প্রত্যেক লেখকই যেন সময়ের হাতে লাঞ্ছিত অস্তিত্বের বেদনায় অস্তির। সময় তো অস্থির হবেই। যে-কোনো ইতিহাস জিজ্ঞাসুই জানেন প্রতিটি কালখণ্ড কালান্তরের আবেগে স্পন্দমান। কিন্তু আজকের সচেতন মানুষের অস্থিরতার অর্থটা আরো একটু গভীর। আমাদের লেখকরা একবিংশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বোধহয় অনুভব করছেন ব্যক্তিক নিরুপায়ত্ব, গত্যন্তরহীনতা। সুনীল যাকে বলেছেন 'ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা' আর সমরেশ যাকে বলেছেন আত্মানুসন্ধানের 'নৈতিক ও মানসিক আর্তি' এ দুইয়েরই মূলে আছে বাইরের দিক থেকে প্রযুক্তিপারঙ্গম অথচ অন্তরের দিকে নিষ্প্রদীপ ব্যক্তির নিজেকে খুঁজে ফেরা। এই অভিজ্ঞান সন্ধানের যন্ত্রণা নানা লেখকের কাছে নানা মাত্রায় মূর্তি ধরেছে।'' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৩৯ -৩৪০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুব-জনচিত্তের হতাশা, অনন্বয়, অনিকেত অসহায়তা,নিস্ফলত্ব,বিষাদগ্রস্ত ও ভঙ্গুর মনকে স্বপ্নময় জগৎ নির্মাণে উৎসাহিত করে, সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে, আলোর দিশা দিয়ে তাদের হৃদয়ের কাছের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের কান্না ,অধ:পতন, মানবতার লঞ্ছনা, বঞ্চনা, শোষণ, পীড়ন ও বেদনার ভেতর দিয়ে শান্তি, সাম্য ও জাগরনী সুরের ছন্দে ও বলিষ্ঠ জীবনবোধে মানুসের প্রত্যয় ও স্বপ্নময় জগতের ঠিকানা দিয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মানবচেতনা, সমাজসচেতনতা ও দায়বদ্ধ শিল্পীসত্ত্বার জন্য তিনি কালজয়ী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বার দৃঢ় প্রত্যয়, গভীর জীবনসক্তি, তীক্ষ্ম বাস্তব সচেতনতা, আদর্শিক জীবনবোধ, অর্থনৈতিক চেতনা, আপাত সাফল্যকে অগ্রাহ্য করে নতুন পথে হাটবার দু:সাহসিকতা, সমালোচনার মুকুটের কন্টকাকীর্ণতাকে বহন করে সত্যনিষ্ঠায় আপনসীমাকে উত্তীর্ণ হবার আন্তরিকতা বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এই কর্মযোগীর সৃষ্টিকর্ম জনজাগরণের ও জনপ্রিয়তার অন্ত:মূলে পদচারণায় সফল।

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কথায় কবি-সহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য স্মর্তব্য — ''পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে; ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা; আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা . . . . কিন্তু প্রেরণা যেখানে সত্য, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত , সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি ,স্বীকার ক'রে খুশি হই।'' (কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৮) জগৎ, জীবন, মানবিকচেতনা ও ভালোবাসায় তাঁর শিল্পীসত্তা অমর।

কিশোর কবির 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস' প্রভৃতি কাব্যে শিল্প-সার্থকতা উৎককৃষ্ট কবির সৃজনশীল শক্তির উৎস সমাজ মানুষের প্রতি কবির দায়বদ্ধতা। এই চেতনা থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কাব্য সাহিত্যে অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫) প্রভৃতি কাব্যদ্বারা সৃজনশীলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রেখেছেন। সমাজ দায়বদ্ধতা থেকে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়পত্র কাব্যের ছাড়পত্র কবিতায় লিখেছেন —

" চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল;
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" (ছাড়পত্র/ছাড়পত্র)

কবি সমর সেন সমাজ সচেতন জীবন দর্শন থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'নানা কথা', 'খোলা চিঠি', 'তিন পুরুষ', 'গ্রহণ' প্রভৃতি কাব্যে শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন পাই। আবার তাঁর কাব্য গুলিতে আমরা কবির সমাজ - দায়বদ্ধতা ও কবির জীবন প্রত্যয়ের উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি করতে দেখি —

"তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চুর্ণ হবে ভষ্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামাবে।" (ঘরে বাইরে / গ্রহণ)

এই সাহিত্য প্রেরণাই কবির বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের বাহন হয়ে উঠেছে। সমাজ-বাস্তবতা, প্রত্যয়-প্রত্যাশা, জীবন-দর্শন, সমকালের সমাজপ্রেক্ষিত, রাষ্ট্রনৈতিক উত্তাপে-আলোড়িত কবিমানসে সৃষ্ট

সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সাহিত্যে শিল্পগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্দেশ্যমূলকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়েই। এতে মূলতঃ উদ্দীপক হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়েছে মার্কসীয় জীবন দর্শন। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন " শিল্প হল, মার্কস-এঙ্গেলস্ -এর মতে, সমাজ - চৈতন্যের অন্যতম রূপ। সমাজচৈতন্যের অন্যান্য প্রকাশ অর্থাৎ ধর্ম, দর্শননীতি, অর্থনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্র আবদ্ধ। (সাহিত্য- বিচারঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১)

এই ধরণের উদ্দেশ্যমূখী সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্য স্রষ্টার দায়বদ্ধতা সর্ম্পকে তিনি আবারও লেখেন " যে সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী বিশ্বচেতনায়।' বিকাশ ঘটাতে চায়নি নিঃসন্দেহে সেই সাহিত্য—উদ্দেশ্যমুখী এবং সেই সাহিত্যের রচয়িতাও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা দায়বদ্ধ।" (সাহিত্য- বিবেক ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং ,পৃঃ ১৭০) ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় মাক্সিম গোর্কির কথায় বলেছেন— *"Its main tasks, however, is to promote a socialist and rovolutionary world under standing and world sensation".*(সেই,পৃঃ ১৭০)

এই উদ্দেশ্যমূলকতা কবি সুভাষের পদাতিক চিরকুট-অগ্নিকোণ কাব্য তিনটির নান্দনিক মাধুর্য ক্ষুন্ন করেনি। উপরন্তু সমকালের সাধারণের সামগ্রিক প্রত্যাশা, প্রত্যয় ও জীবনদৃষ্টি আলোচ্য কাব্য তিনটির শিল্প সার্থকতা উৎকর্ষতার শিখরে পৌছে দিয়েছে। কালক্রমে নদীর বাঁকের মতো লেখকের জীবন দৃষ্টি নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। এই নতুন বাঁকে আলোচ্য তিনটি কাব্যের মিচিলের শ্লোগান নয়, মুষ্টিবদ্ধ উদ্ধত হাতের আহ্বান নয়, রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট উপকণ্ঠে কবির প্রত্যাশা ঘোষণা নয়, পরবর্তীকালের কাব্য নতুন রূপে সজ্জিত। নতুন ফসল হয়ে ওঠে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে। এটা কবির কাব্য সৃষ্টির ভান্ডারে বৈচিত্র্য দান করেছে।

তাঁর কাব্যের কবিতাগুলিতে কবি সুভাষের রচনার বৈশিষ্ট্য বিচিত্র পথগামী হয়ে উঠেছে। কবির জীবন দর্শনে ইতিবাচক পট পরিবর্তনের ফলে এর ভাব-ভাষা, আঙ্গিক স্বতন্ত্র হয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। কবি সুভাষের কাব্যে নানা রঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মানবতাবাদী চেতনা রয়েছে কবির জীবন দর্শনে। কবি ফুলকে প্রতীক দ্যোতনায় শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেছেন। ফুল কবি সুভাষের কাব্যের ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর কাব্যে ফুল ফোটার মতো তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলি বিকশিত হয়েছে।

তাঁর সাহিত্যে কবির জীবনদর্শন ব্যাপ্ত হয়ে সর্বমুখী হয়েছে। এ সাহিত্যে তিনি নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘরোয়া সংসারে। ফলে তাঁর কবিতাগুলিতে বিষয় বৈচিত্র এসেছে। নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় সাদামাটা বাংলার প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক ঘরোয়া গল্প ভাষার অত্যাশ্চর্য সংহত রূপে ও শাণিত বাক্ ভঙ্গিমা কবিতার শরীরে অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে।

কবি নেমে এসেছিলেন সাধারণ মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘরোয়া সংসারে। ফলে তাঁর কবিতাগুলিতে বিষয় বৈচিত্র এসেছে। নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় সাদামাটা বাংলার প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক ঘরোয়া গল্প ভাষার অত্যাশ্চর্য সংহত রূপে ও শাণিত বাক্ ভঙ্গিমা কবিতার শরীরে অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে। বিষয়ের অভিনবত্বে, স্বতন্ত্র চিত্ররূপ নির্মাণে, কাব্যিক শৈলী ও নির্মোহ মননশীলতায় তিনি অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনেছিলেন। তাঁর কাছে কাব্য-শিল্প দামি কিন্তু, তার থেকে বেশী মূল্যবান মনে হয়েছিল জীবনের দাবি। তাঁর কবিতায় তিনি নিছক ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিতায় বাড়তি বাগ্‌বহুলতাকে ঝরিয়ে ফেলে তাকে করতে চেয়েছিলেন মেদহীন, লঘু, নগ্ন, এবং সুঠাম। যথাসম্ভব যতিচিহ্ন বর্জন করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তির্যক ব্যঙ্গ, প্রবাদ ও ইডিয়মের ব্যবহার। গদ্যধর্মী আটপৌরে মুখের ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ হসন্ত, চরণের শেষে অন্ত্যমিল, অল্পকথায় গল্পের ভঙ্গি ও জীবনমুখী চিত্রকল্প, বিষয়, আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কাব্যের ধারায় ছিলেন যথার্থ আধুনিক। অসাধারণ কবির আত্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় রাখেন যে এ পৃথিবীতে কালোত্তীর্ণ হবেন। মহাকালের স্বর্ণরথে তাঁর যে লড়াই 'মানুষের কাজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তার একটা ভালো ব্যবস্থা' এর দ্বারাই তিনি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন। এর জন্য তিনি লেখনীকে হাতিয়ার করেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস, স্বপ্ন ও প্রত্যয় যে তিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন।

মরণকে জয় করে মানুষের জন্য লড়াই করার এই জীবন-প্রত্যয় নিদর্শনমূলক এবং এই শুভকর্মের জন্য পৃথিবী তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে হয়তো, এই আত্মবিশ্বাস তাঁর বুকে প্রবল শক্তি সঞ্চার করেছিল। কবির আত্মপ্রত্যয় ও সুদৃঢ় মানসিক শক্তি এই কবিতার মর্মবস্তু হিসেবে একক বৈশিষ্ট্যের মর্যাদার যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করে। শিল্প ধর্মের সঙ্গে কবিতার উদ্দেশ্য সুষম অনুপাতে প্রয়োগ তাঁর অনন্যসাধারণ ও উৎকৃষ্ট শিল্প প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। কবির জীবনে ভোগ বিলাসের কোন জায়গা ছিল না। গাড়ি-বাড়ি নিজের করে ভোগবিলাসী জীবন নিয়ে নির্বিকার চিত্তে তাঁর অনেক বন্ধুই সে সময় উচ্চবিত্তের জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু কবি সুভাষ তাঁর সেই সব বন্ধুর মতো, উচ্চবিত্তের জীবন ভোগ করেন নি। তাঁর জীবন কেটেছিল অন্যের বাড়ি ভাড়া নিয়েই। তাই একদা একই সঙ্গে যে সব বন্ধু পৃথিবীকে বদলে নিয়ে নিজের মনের মতো সবকিছু সাজিয়ে নিতে চেয়েছিলনে,

তাঁরা আজ নিজেরাই বদলে গেছেন। অথচ কবি দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে পৃথিবীকে বদলাবার লক্ষ্যে গিয়েছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত।

কবির অন্তর্লোকে জাগরণের প্রত্যয় সর্বদা জাগরুক ছিল। মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, সার্বিক সংকীর্ণতা দূর করে মানুষ মুখ ফুটে হাতে রাখি পরিয়ে ভ্রাতৃত্ব বোধের কথা মানুষ বলুক। তিনি আমাদের সেই সব মানুষকেই রাজার আসনে বসাতে চেয়েছিলেন; যারা সারা দিনরাত মাঠ ঘাট সমুদ্র বন্দর কলকারখানায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে বাঁচার মহামন্ত্র ধ্বনি মুখরিত করে তুলেছে। তিনি মানুষকে জাগিয়ে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন গুনীকে সমাদর করে, গলায় মালা পরিয়ে তার যোগ্যতাকে মর্যাদা দিতে এবং যারা খুণী তাদের সাজা দেবার জন্য মানুষকে সজাগ করতে বলেছিলেন তিনি। এই পৃথিবীরে সন্ত্রাস-দাঙ্গা-খুনোখুনি-মার জখম থেকে সরে এসে তিনি পৃথিবীতে আমাদের শান্তির রথকে ময়ূরপঙ্খে সাজাতে বলেছেন। বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে কবির উচ্চকিত ঘোষণা —

''কে কোন্‌খানে ঘুমোন সেটা
একেবারেই গৌণ
দেখব তিনি কোথায় জেগে
কোথায় নন মৌন।'' (জাগ্রত / একটু পা চালিয়ে ভাই)

সুভাষ মুখোপাধ্যয় পৃথিবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সমস্ত ভেদাভেদ ঘুচিয়ে গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে পৌছে গেছেন। এই কবিতায় একজন কবির পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও রচনা প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। জগৎ প্রকৃতি ব্যক্তি জীবন, সামাজিক, ও রাজনৈতিক জীবন পারিবারিক জীবন, উৎসব, ধর্ম, সুখ-দুঃখ সবকিছু জীবনের অঙ্গ হয়েছে কবির রচনার গুনে। এখানে কবি অসাধারণ ইতিবাচক গ্রহণ যোগ্যতায় সম্পূর্ণতার প্রতি নিজেকে অর্পন করেছেন। জগৎ ও জীবনের সবকিছুকে নিজের করে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর এই আহ্বান মানুষের চিত্তকে উদার ও ধারণশীল করে তোলে।

সমালোচক অশোক মিত্র মহাশয় বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন —''অবলম্বনহীনতা থেকে কবিতা হয় না, বাংলা কবিতাকে বাঁচতে হ'লে কোনো আস্তিকতার জন্ম মৃত্তিকায় করতেই হবে। আস্তিকতার জন্ম মৃত্তিকার মূল থেকে, পরিপার্শ্বের নিঃশ্বাস থেকে। বাংলাদেশের সমাজ বিবর্তনের ধারাগুলি এড়িয়ে, সন্দেহ সংশয় অবরুদ্ধ বিপ্লবআরক্ত সমাজ ব্যবস্থা ডিঙিয়ে, কবিতা অসম্ভব। কাব্যে অকৈবল্য যদি এখনো অন্বিষ্ট হয়, আমাদের ব্যাহত পাঠ ফের শুরু ক'রে অতএব ফিরতে হবে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

উপলব্ধির উৎসে, জীবন এবং লোকপ্রেমের প্রত্যয়ে।''(অশোক মিত্র, 'ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা',১৯৬৫,'কবিতা থেকে মিছিলে', প্যাপিরাস,১৯৮৯, পৃ: ৩৯) ক্রমশঃ কবি সুভাষ, সমর সেন প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা হয়ে ওঠেন তরুণতর অতি আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের আশ্রয় স্থল।

তাঁর সাহিত্যে আমরা একজন সামাজিক দায়বদ্ধ সচেতন শিল্পের শিল্পসত্তাকে উপলব্ধি করি। তাঁর সাহিত্যে প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে বিশিষ্ট জীবনদর্শন সমকালীন পটভূমি ও সমাজবাস্তবতা। কালধর্মে চলমান সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিতে অসাধারণ শিল্প নির্মাণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। কোথাও কোথাও তিনি সাহিত্যকে গণজীবনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখনীতে সাহিত্য শিল্পগুণে সাহিত্য হয়ে উঠেছে আবার জীবনদর্শনে সেগুলি জনজীবনের জাগরণী সুরের বীণা হয়ে বেজে উঠেছে ।

সাহিত্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র। সেটা তাঁর নিজস্ব বৃত্তি। যার সাহায্যে তিনি তাঁর শিল্পকর্মে স্বধীন ও স্বচ্ছন্দ গতি হতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই স্বধীন স্বাচ্ছন্দ্য সাহিত্যের কাঠামো নির্মাণ, চরিত্র সৃজন, ভাষাবয়ন ও জীবনব্যাখ্যা — সর্বত্র উপলব্ধি করি আমরা। জীবন সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক ধ্যানধারণা ও মনোভঙ্গি সাহিত্যের রস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যে নিছক কাহিনী চয়নের লক্ষে চরিত্র নির্মাণ করতে দেখি না তাঁকে আমরা। সেই চরিত্রগুলি বেশিরভাগই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্টিলাভ করেছে। অভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্রগুলি তাঁর সাহিত্যে বিশেষ দর্শনে ও অভিনব আঙ্গিক নির্মিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনকে সেভাবে দেখেছেন এবং জীবন থেকে যা গ্রহণ করেছেন সেই বক্তব্য বিশেষ এক নৈতিক বোধে তার শিল্পরূপদান করেছেন।

সাহিত্যের শিলপধর্মকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সচেতন শিল্পসত্তায় বজায় রেখেছেন। সাহিত্যের কোথাও কোথাও তিনি মার্ক্স-কে অবলম্বন করেছিলেন। এজন্য বাংলা সমালোচনার ধারায় কোথাও কোথাও তিনি নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে দেখার বিষয় — জীবনকে তাঁর দেখার ভঙ্গী, জীবন থেকে যা গ্রহণ করেছেন এবং জীবন সর্ম্পকে যে বক্তব্যে তিনি পৌছাতে চেয়েছেন। কেননা সাহিত্য মানুষের জীবন ও ক্রিয়ার অণুকরণ । যেখানে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে মার্ক্সীয় গণআন্দোলন অভিন্ন, সেখানে শিল্পধর্ম সৃজনে মার্ক্স বা কোনো মতবাদকে গ্রহণে ত্রুটি থাকে না। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সমকালের ভারতীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের মরণপণ বিপ্লবের কাল। আর জাতির সংকটে যেকোনো সচেতন নাগরিকের রাজনৈতিক নিস্পৃহতা অস্বাভাবিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তাই কোথাও কোথাও রাজনৈতিক প্রত্যয়দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠের ধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে নিন্দিত করা যুক্তি সংগত নয়। বাংলা সাহিত্যের ধারায় রাজনৈতিক শিল্পীমানস কেবল তাঁর

ক্ষেত্রেই প্রযজ্য — এমনটা নয়। এর আগেও কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুরী, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা রাজনৈতিক সত্তাকে প্রত্যক্ষ করি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কেবল রাজনীতি অথবা সাহিত্য যেকোনো একটিকে বেছে নেবার সিদ্ধান্তে আমরা তাঁকে সংকীর্ণ পথে চলার ও বঞ্চনা করতে পারি না। সেই দুটোই তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর নির্ভর করে। আমরা দেখি রাজনীতির সংকীর্ণ গন্ডীজাল তাঁকে চিরদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। বরং তিনি রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আধার ও বাহন করে তাকেই সাহিত্য ও শিল্পরূপ দান করেছেন । তদুপরি বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশক ছিল বাংলা সাহিত্যে প্রগতিচেতনা ও প্রগতি আন্দোলন বিকাশের উদ্দীপনাময় কাল। সেই কালধর্মকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। বরং বিশিষ্ট কালধর্মে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও মহৎ জীবনদর্শন নিয়ে সাহিত্য সৃজনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছেন।

....

গ্রন্থতালিকা

আকর গ্রন্থ :

১) কবিতা সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

২) কবিতা সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৩) কবিতা সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৪) কবিতা সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৫) কবিতা সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (৫ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৬) গদ্য সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৭) গদ্য সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২য় খণ্ড), দেশ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৮) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, একাদশ পরিবর্ধিত সংস্করণ: ২০০৪ জানুয়ারী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩

৯) পাবলো নেরুদার কবিতা গুচ্ছ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৩৮৪, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯

১০) পদাতিক - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৪০, কবিতাভবন, কলকাতা

১১) অগ্নিকোণ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৪৮, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ২০

১২) চিরকুট - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৫০, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬

১৩) যতদূরেই যাই - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৬২, ত্রিবেনী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,

কলকাতা ১২
১৪) কাল মধুমাস - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৬৬, ভারবি, কলকাতা ১২
১৫) এই ভাই - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টম্বর, ১৯৭১, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯
১৬) ছেলে গেছে বনে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯
১৭) একটু পা চালিয়ে ভাই - সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৭৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯
১৮) জল সইতে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯
১৯) চইচই চইচই - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৮৩, নাভানা, কলকাতা
২০) বাঘ ডেকেছিল - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টম্বর, ১৯৮৫, স্বরলিপি, কলকাতা
২১) যারে কাগজের নৌকা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯
২২) ধর্মের কল - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়রী, ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেৎ লিমিটেড, কলকাতা ৯
২৩) ফুল ফুটুক - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: রথযাত্রা ১৩৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩
২৪) একবার বিদায় দে মা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯
২৫) নাজিম হিকমতের কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৫২, ঈগল পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা ২০
২৬) নাজিম হিকমতের আরো কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৮৬, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯
২৭) দিন আসবে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৬১, নির্মল বোস এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ১
২৮) রোগা ঈগল - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৌষ ১৩৮১, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯
২৯) পাবলো নেরুদার আরো কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮০, বৈশাখ ১৩৮৭, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯

৩০)	হাফিজের কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৩১) চর্যাপদ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮৬, স্বরলিপি, কলকাতা ৯

৩২)	অমরু শতক - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৮৮, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩

৩৩)	গাথা সপ্তসতী - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৯, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা ১২

৩৪)	হাংরাস - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৮০, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৯

৩৫)	কে কোথায় যায় - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯

৩৬)	অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ, ১৩৯০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৩৭)	কাঁচাপাকা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৩৮)	কমরেড, কথা কও - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

৩৯)	কত ক্ষুধা ! (So Many hungers) - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনুবাদ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩ ।

৪০)	রুশ গল্প সঞ্চয়ণ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩ ।

৪১)	ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা৬ ।

৪২)	তমস - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮৮, সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলকাতা ২০

৪৩)	আমার বাংলা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, ঈগল পাবলিশার্স, কলকাতা ২০

৪৪)	ভূতের বেগার - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৫৪, প্রকাশক - কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৫)	যখন যেখানে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭, বর্তিক, কলকাতা ২৬

৪৬)	ডাকবাংলার ডাইরি - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৭২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯

৪৭) নারদের ডাইরি - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭৬, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ৬

৪৮) যেতে যেতে দেখা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: কার্তিক, ১৩৭৬, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৭

৪৯) ক্ষমা নেই - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৭৮, প্রসূন বসু, কলকাতা ৯

৫০) ভিয়েতনামে কিছুদিন - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৭৪, রামায়নী প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৯

৫১) আবার ডাকবাংলার ডাকে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৮১, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, কলকাতা ২৯

৫২) অগ্নিকোণ থেকে ফিরে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, সপ্তাহ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২

৫৩) এখন এখানে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টম্বর, ১৯৮৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৫৪) খোলা হাতে খোলা মনে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৮৭, দরবারী প্রকাশনী, কলকাতা ১৪

৫৫) আমাদের সবার আপন ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮৭, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬

৫৬) কুড়িয়ে ছিটিয়ে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯০, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯

৫৭) কবিতার বোঝাপড়া - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৫৮) টানাপোড়েনের মাঝখানে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৫৯) ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

৬০) রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৫৪, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, কলকাতা

৬১) ব্যাঘ্রকেতন (The Springing Tiger) - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৭, এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩

৬২) চে গুয়েভারার ডায়েরী - অসীম চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৯, নাথ পাবলিশিং, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

৬৩) ডোরাকাটার অভিসারে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৬৯, রূপরেখা, কলকাতা ৯
৬৪) সেদিন বনে জঙ্গলে (ভাষান্তর সহযোগী - আশিস মুখোপাধ্যায়) - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা ২৯
৬৫) আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৮২, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা২৯
৬৬) ভারত স্বধীন হল (India Wins freedom) - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম পূর্নাঙ্গ বাংলা সংস্করণ ১৯৮৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা ৭২
৬৭) বাঙালীর ইতিহাস - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৯, বুক ওয়ার্লড লিমিটেড, কলকাতা
৬৮) অক্ষরে অক্ষরে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ , ১৯৫৪, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা১২।
৬৯) কথার কথা - সুভাষ মুখোপাধ্যায় , প্রথম প্রকাশ , ১৯৫৫ স্বাক্ষর , কলকাতা ২০ ।
৭০) জগদীশচন্দ্র বসু - সুভাষ মুখোপাধ্যায় ,প্রথম প্রকাশ , ১৯৫৫, স্বাক্ষর , কলকাতা ২০ ।
৭১) দেশ বিদেশের কথা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , প্রকাশভবন , কলকাতা ১২ ।
৭২) ইয়াসিনের কলকাতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায় ,প্রথম প্রকাশ ,১৯৭৮, জটায়ু বুকস্ , কলকাতা ৯ ।
৭৩) মিউ এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৯৮০,৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ।
৭৪) টো টো কোম্পানী - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ,১৯৮৪, শ্যামলী প্রকাশনী , কলকাতা ২৯ ।
৭৫) রুপকথার ঝুড়ি - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , ১৯৮৮,ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড , কলকাতা৭২।
৭৬) জানো আর দ্যাখো জানোয়ার - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , ১৯৯১,নির্মল বুক এজেন্সি , কলকাতা ৭ ।
৭৭) এলাম আমি কোথা থেকে - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ,১৩৯৮ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ।
৭৮) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, নিউ এজ পাবলিশার্স , কলকাতা ১ ।
৭৯) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ ,১৯৭২, বিশ্ববানী প্রকাশনী , কলকাতা ৯।
৮০) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড), প্রথম প্রকাশ ,১৯৭৪, বিশ্ববানী প্রকাশনী ,কলকাতা ৯।
৮১) কেন লিখি - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ ,২০০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা ৭৩ ।

৮২) পাতাবাহার - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ,১৩৬২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা ১৩ ।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) আধুনিক কবিতার দিগবলয় - অশ্রুকুমার সিকদার, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ , অরুণা প্রকাশনী ,১৪০৬ ৭ যুগলকিশোর দাস লেন ,কলকাতা ৬ ।

২) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় - দীপ্তি ত্রিপাঠী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ,১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা১২ ।

৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ ,১৯৯৫ দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য - সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত), দ্বিতীয় প্রকাশ ,২০০২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন , ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

৫) আধুনিক বাংলা কবিতার রুপরেখা - ডঃ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংস্করণ , ২০০৭,প্রকাশ ভবন , ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৬) তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য -মাহবুবুল হক, প্রথম প্রকাশ ,২০০৫, নয়া উদ্যোগ , ২০৬ বিধান সরণি , কলকাতা ৬ ।

৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা - সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ সৌরীন ভট্টাচার্য অমিয় দেব মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণব বিশ্বাস ; প্রথম প্রকাশ ,১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

৮) কালের পুতুল - বুদ্ধদেব বসু, তৃতীয় সংস্করণ ,১৯৯৭, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১২ বি ও সি বঙ্কিম চ্যাটার্জী , স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৯) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য -গোপীকানাথ রায় চৌধুরী , প্রথম দে'জ সংস্করণ ,১৯৮৬

দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

১০) বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় সংযোজন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ,১৯৯৫,পুস্তক বিপণি , ২৭বেনিয়াটোলা লেন,কলকাতা ৯ ।

১১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খন্ড) - সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ,১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা ৯ ।

১২) কালের প্রতিমা -অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ ,২০০৫, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

১৩) পঞ্চাশের দশকের কথাকার -উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত) ,প্রথম প্রকাশ , ১৯৯৮,পুস্তক বিপণি , ২৭বেনিয়াটোলা লেন,কলকাতা ৯ ।

১৪) বাংলা সাহিত্যের একদিক - শশিভূষণ দাসগুপ্ত , ষষ্ঠ বইমেলা সংস্করণ , ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি , কলকাতা ৭৩ ।

১৫) বাংলা সংবাদ পত্র ও বাঙালির নবজাগরণ - ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায় , প্রথম প্রকাশ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

১৬) কালের পুত্তলিকা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা১২।

১৭) কাব্যতত্ত্ব (আরিস্টটল) - শিশিরকুমার দাস (অনুবাদ), তৃতীয় মুদ্রণ ,১৯৯৪, প্যাপিরাস , ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন , কলকাতা ৪ ।

১৮) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , পুণর্মূদ্রণ ,১৯৯৬, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ , ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

১৯) সাহিত্য -বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ - বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় , দ্বিতীয় সংস্করণ ,২০০৬, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

২০) বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ -শশিভূষণ দাসগুপ্ত, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬৩, এ , মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২ কলেজ স্কোয়ার , কলকাতা ১২ ।

২১) বাংলার ব্রত - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুণর্মুদ্রণ ১৪০৭, বিশ্বভারতী , ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড , কলকাতা ১৭ ।

২২) কাব্যজিজ্ঞাসা -অতুল চন্দ্র গুপ্ত, পুণর্মুদ্রণ১৩৯৮ বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭ ।

২৩) জীবনানন্দ ; স্বাতন্ত্র্য সন্ধান - পঞ্চানন মালাকার, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৩,এডুকেশন ফোরাম ,স্টল ৪১ ভবানীদত্ত লেন ,কলেজ স্ট্রীট ,কলকাতা ৭৩ ।

২৪) সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য -অলোক রায় (সম্পাদিত), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩, সাহিত্যলোক , ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট , কলকাতা ৬ ।

২৫) মানুষের ধর্ম - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুণর্মূদ্রণ ১৪০১, বিশ্বভারতী , ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড , কলকাতা ১৭ ।

২৬) জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি - অমর্ত্য সেন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ,১৪০১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ৯ ।

২৭) আধুনিক বাংলা কবিতা ; বিচার ও বিশ্লেষণ - জীবেন্দ্র সিংহ রায় (সম্পাদিত) , দ্বিতীয় সংস্করণ ,১৯৮৯, প্রকাশক- রথীন্দ্রকুমার পালিত , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় , বর্ধমান ।

২৮) ছন্দ-অলঙ্কার দীপিকা - অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ, পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ ,১৯৯৩, প্রকাশক - শ্রী সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , ৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

২৯) রোম্যান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন - ড: ভানুভূষণ জানা , প্রথম প্রকাশ ,১৯৮৭ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় , কলকাতা ৫০ ।

৩০) সাহিত্যে ছোটগল্প - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ ,১৪০৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা ৭৩ ।

৩১) আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - অশ্রুকুমার সিকদার, প্রথম প্রকাশ ,১৯৮৮, অরুণা প্রকাশনী , ৭ যুগলকিশোর দাস লেন ,কলকাতা ৬ ।

৩২) সাহিত্যের পরিভাষা - ড: কৃষ্ণগোপাল রায়, সোমা প্রকাশন ,১৯৯৪, ৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

৩৩) মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব - ড: বিমলকুমার মজুমদার, প্রথম দে’জ সংস্করণ , ২০০৬, দে’জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২ ।

৩৪) প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা - প্রেমেন্দ্র মিত্র, তৃতীয় মুদ্রণ , ১৯৯১, দে’জ পাবলিশিং , কলকাতা ১২।

৩৫) মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা - মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৯৯৯,পুনর্মূদ্রণ , ভারবি , ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৩৬) তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেরও - সম্পাদনা ড; হীরেন চট্টোপাধ্যায় , প্রথম প্রকাশ ,১৪০৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , বামা পুস্তকালয় , ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ ।

৩৭) উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ - ড: নির্মল দাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০১, পুনর্মূদ্রণ , সাহিত্য বিহার , ১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

৩৮) ভাষা-বিজ্ঞান পরিদয় - সুকুমার বিশ্বাস ,প্রকাশ ,১৯৬৮, জিজ্ঞাসা , ১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ , কলকাতা ৯ ।

৩৯) বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ - ড: সৌগত চট্টোপাধ্যায় , প্রথম প্রকাশ , রথযাত্রা , ১৪১১ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৪০) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন - সম্পাদনা ড: সত্যবতী গিরি ড: সমরেশ মজুমদার, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০২, ১১এ ব্রজনাথ মিত্র লেন , কলকাতা ৭৩ ।

৪১) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বই -প্রথম প্রকাশ , ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ,দে'জ পাবলিশিং কলকাতা৭৩

৪২) সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি -উজ্জ্বলকুমার মজুমদার , তৃতীয় সংস্করণ , সেপ্টেম্বর ২০০৯ , দে'জ পাবলিশিং ,কলকাতা ৭৩ ।

৪৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির - ড: জয়গোপাল মন্ডল , প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৭ , পুস্তক বিপণি , ২৭বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

৪৪) ছড়া সংগ্রহ - সুভাষ মুখোপাধ্যায় , সম্পাদক প্রণব বিশ্বাস , প্রথম প্রকাশ , ফেব্রুয়ারী২০০৮ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৪৫) সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস - শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , তৃতীয় প্রকাশ , এপ্রিল ১৯৯৪ জিজ্ঞাসা , কলকাতা ২৯ ।

৪৬) সাহিত্য-বীক্ষণ - হীরেন চট্টোপাধ্যায় , দ্বিতীয় প্রকাশ , মহালয়া ১৪০৮ , এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, ৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

৪৭) ছাড়পত্র - সুকান্ত ভট্টাচার্য , চতুর্থ সংস্করণ , পুণর্মূদ্রণ আশ্বিন ১৪০৯ , সারস্বত লাইব্রেরী ,২০৬বিধান সরণী , কলকাতা ৬ ।

৪৮) বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ট কবিতা - সম্পাদক নরেশ গুহ , দশম সংস্করণ , এপ্রিল ১৯৯৮ , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩ ।

৪৯) আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় -সুমিতা চক্রবর্তী , দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ ,মে ২০০৫ , প্রজ্ঞাবিকাশ , ১২রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ,কলকাতা ৭৩ ।

৫০) দোঁহাবলী - উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত , বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির (বসুমতী করপোরেশন লিমিটেড),১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট , কলকাতা ১২ ।

৫১) সাহিত্যের পথে -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ সংস্করণ, পুণর্মুদ্রণ মাঘ ১৪০০, বিশ্বভারতী ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড , কলকাতা ১৭ ।

৫২) আত্মচরিত - শিবনাথ শাস্ত্রী ,প্রথম (বিশ্ববানী) সংস্করণ , মার্চ ১৯৮৩ , বিশ্ববানী প্রকাশনী, ৭৯/১বি মহাত্মাগান্ধী রোড , কলকাতা ৯ ।

৫৩) দিনেশ দাসের শ্রেষ্ট কবিতা -পঞ্চম সংস্করণ , জানুয়ারী ২০০২ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৫৪) সাধারন ভাষাবিঞ্জান ও বাংলা ভাষা - ড: রামেশ্বর শ' , তৃতীয় সংস্করণ ,অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

৫৫) চর্যাগীতি -তারাপদ মুখোপাধ্যায় ,পুনর্মুদ্রণ , শ্রাবণ ১৩৮৫ , বিশ্বভারতী , ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড , কলকাতা ১৭ ।

৫৬) বাংলা সমালোচনার ইতিহাস - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় , প্রথম দে'জ সংস্করণ , এপ্রিল ২০০২ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৫৭) বাংলার লোকসাহিত্য -ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য্য , প্রথম খন্ড , পরিবর্ধিত তৃতীয় সথস্করণ ,১৯৬২ , ক্যালকাটা বুক হাউস , ১/১ কলেজ স্কোয়ার , কলকাতা ১২ ।

৫৮) নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা - ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় , দ্বিতীয় সংস্করণ , ডিসেম্বর ১৯৯৩ ,রত্নাবলী , ৫৯/এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

৫৯) সাহিত্য-বিবেক ড; বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় , চতুর্থ সংস্করণ , জানুয়ারী ২০০৬ , দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩ ।

৬০) বাংলা কবিতার কালান্তর - সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , দ্বিতীয় সংস্করণ , নভেম্বর ২০০৮, দে'জ পাবলিশং , কলকাতা ৭৩ ।

৬১) আধুনিক কবিতার ইতিহাস -সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ,দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রথম দে'জ সংস্করণ , জানুয়ারী ২০১১ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৬২) আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা (প্রথম খন্ড) - ড: অধীর দে , দ্বিতীয় সংস্করণ ,অক্টোবর ১৯৯৬ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির , কলকাতা ৭ ।

৬৩) সুকান্ত বিচিত্রা -বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত , পুণর্মুদ্রণ জানুয়ারী , ১৯৯৫ , সাহিত্যম্ , ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৬৪) সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম , পঞ্চপঞ্চাশৎ সংস্করণ , জুন ২০০১ , ডি.এম. লাইব্রেরী , ৪২বিধান সরণী , কলকাতা ৬ ।

৬৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ট গল্প , দ্বাদশ মুদ্রণ , বৈশাখ ১৪০৬ , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১০শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৬৬) রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প - প্রমথনাথ বিশী , নবম মুদ্রণ , আশ্বিন ১৪০০ , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১০শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

৬৭) বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ - শুদ্ধ সত্ত্ব বসু , তৃতীয় মুদ্রণ , আষাঢ় ১৩৯৯ , বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮মহাত্মা গান্ধী রোড , কলকাতা ৯ ।

৬৮) একালের কবিতা : প্রকৃতি ও প্রবণতা -অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ড: আদিত্য মুখোপাধ্যায় , দ্বিতীয় সংস্করণ , আগস্ট ২০০৯ , পান্ডুলিপি , ১এ , কলেজ রো , কলকাতা ৯ ।

৬৯) আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা - (২য় খন্ড) , -ড: অধীর দে , দ্বিতীয় সংস্করণ ,১৪০৬ , উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির , সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট , কলকাতা ৭ (দ্বিতল) ।

৭০) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা -প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ ১৯৯৩ , রহমান বুকস্ , ৩৮/৪বাংলাবাজার

৭১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা -সম্পাদক জগন্নাথ চক্রবর্তী , তৃতীয় সংস্করণ , আগস্ট ২০০১ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৭২) জীবনস্মৃতি -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১ , বিশ্বভারতী , ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড , কলকাতা ১৭ ।

৭৩) গবেষণা : প্রকরণ ও প্রকৃতি - ড: সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় , তৃতীয় সংস্করণ , জুলাই ২০০৫,দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

৭৪) মোহিতলালের কাব্য ও কবিতা - ড: দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯ ।

৭৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন (চতুর্থ খন্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ,১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯ ।

৭৬) সন্তোষ কুমার ঘোষ এক ব্যতিক্রমী কথাকার- বীরেন্দ্র দত্ত, প্রথম প্রকাশ,২০০১, শঙ্খপুস্তক প্রকাশন, ঋষি বঙ্কিম নগর, বারুইপুর দ: চব্বিশ পরগনা ।

৭৭) তিনকুড়ি দশ (দ্বিতীয় খন্ড) স্বাধীনতার পথে ১৯৪০-৪৭- অশোক মিত্র, তৃতীয় সংস্করণ,১৪০৭, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩ ।

৭৮) সত্তর দশক , দ্বিতীয় খন্ড (সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক মূল্যায়ণ)- অনীল আচার্য সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ,১৯৮২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ নবীনকুন্ডু লেন, কলকাতা- ৯ ।

৭৯) বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য- প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ,২০০২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্র: লিমিটেড, ১২- বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩।

৮০) সাহিত্য বিবেচনা - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়,
প্রথম প্রকাশ,২০০৬, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩ ।

৮১) সাহিত্য- বীক্ষা-নীরেন্দ্র নাথ রায়, প্রথম প্রকাশ,১৯৮৩, প্রকাশক-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

৮২) নির্বাচিত প্রবন্ধ স্ংকলন- সম্পাদনা অনিল ভট্টাচার্য্য ও সব্যসাচী দেব, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৮, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ নবীনকুন্ডু লেন, কলকাতা- ৯ ।

৮৩) অস্তিত্বের সংকট ও বিবিধ প্রবন্ধ-শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়,
প্রথম প্রকাশ , ২০০৫, নচিকেতা প্রকাশন , এ.সি.-৫৪, বি-৪, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কলকাতা ৬৪ ।

৮৪) কবীর চৌধুরী- প্রবন্ধ সমগ্র-১ - কবীর চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার , ঢাকা বাংলাদেশ ।

৮৫) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য- সম্পাদনা বাসুদেব মোসেল, প্রথম প্রকাশ , বুকস্ ওয়ে , ৮৬ এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ ।

৮৬) বীরেন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ- বীরেন্দ্র দত্ত, প্রথম প্রকাশ,২০০৪, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ।

৮৭) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , প্রথম প্রকাশ ,১৩৯০, পুণর্মূদ্রণ , দে'জ পাবলিশিং প্র: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩ ।

৮৮) বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা - সংগ্রহ ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ , ২০১০, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা- ৭৩ ।

৮৯) প্রবন্ধগুচ্ছ-অজিত দত্ত, প্রথম প্রকাশ ,২০০৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯

৯০) অশোক মিত্রের প্রবন্ধ সংকলন- অশোক মিত্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং প্রা: লিমিটেড ,কলকাতা- ৭৩ ।

৯১) ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য - অশ্রুকুমার সিকদার , প্রথম প্রকাশ ,২০০৫, দে'জ পাবলিশিং প্রা: লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩ ।

৯২) সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী- সম্পাদনা নিতাই বসু, প্রথম সংস্করণ,২০০০, সাহিত্যলোক , ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট , কলকাতা-৬ ।

৯৩) বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং কলাকাতা- ৭৩ ।

৯৪) বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ সংগ্রহ- বিনয় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৯ ।

৯৫) বিষ্ণু দে: প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রথম খন্ড- বিষ্ণু দে, প্রথম প্রকাশ ,১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং প্রা: লিমিটেড, কলকাতা ৭৩ ।

৯৬) বাঙালির সাংস্কৃতিক দিগন্ত- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ ,২০০১, সোনার তরী, ৪ এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা- ৫৭ ।

৯৭) উপন্যাসের ঘরবাড়ি-জহর সেন মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ,২০০১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

৯৮) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ,২০১১, প্রজ্ঞাবিকাশ , ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা-৯

৯৯) আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ - ড: রামেশ্বর শ', প্রথম প্রকাশ ,২০০৬, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা-৯ ।

১০০) বাংলা কথাসাহিত্য- জিজ্ঞাসা- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , ২০০৪দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩ ।

১০১) আধুনিক কবিতার ইতিহাস - সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় , প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩ ।

১০২) আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর - তপোধীর ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ,২০০৪, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ।

১০৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিকথা-চতুর্থ পর্যায় (রবীন্দ্র যুগ:দ্বিতীয় পর্ব)-শ্রী ভূদেব চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ , ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩ ।

১০৪) বিষয় : প্রবন্ধ - প্রধান সম্পাদক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ,দ্বিতীয় প্রকাশ , ১৯৯৬, ক্যালকাটা পাবলিশার্স , ১৫ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

১০৫) স্বাধীনতা - উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭৭) - রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ,২০০৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ দপ্তর প্রথম প্রকাশ , ভারতী বুক এজেন্সী , ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড , কলকাতা ৯ ।

১০৬) বাংলা কবিতার সহজ পাঠ - সুজিত সরকার , প্রথম প্রকাশ ,২০০৪, প্যাপিরাস , ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৪ ।

১০৭) বাংলা কবিতা : সৃষ্টি ও স্রষ্টা , ২য় খণ্ড - সম্পাদনা সুবল সামন্ত, প্রথম প্রকাশ ,২০০২, এবং মুশায়েরা , ৩৮/এ/১ , নবীনচন্দ্র দাস রোড , কলকাতা ৯০ ।

১০৮) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস , চতুর্থ খণ্ড - ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ , ২০০২, গ্রন্থনিলয় , ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

১০৯) কবির অভিপ্রায় - শঙ্খ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ,১৯৯৪, প্যাপিরাস , ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন , কলকাতা ৪ ।

১১০) বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয় - অশীন দাশগুপ্ত, প্রথম সংস্করণ ,১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি . কলকাতা ৯ ।

১১১) সৃজনশীল ও রসবাত্তাদলের স্মৃতিসান্নিধ্য - অজিতকুমার দত্ত, প্রথম প্রকাশ ,২০০৭, প্যাপিরাস , ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন , কলকাতা ৪ ।

১১২) দুই বাংলার উপন্যাস প্রেক্ষিত দুর্ভিক্ষ - ড: শফিউল আজম ডালিম, প্রথম প্রকাশ ,২০০১, একবিংশ জয়দুর্গা লাইব্রেরী , ৮এ কলেজ রো , কলকাতা ৯ ।

১১৩) প্রবন্ধ সংকলন - অশোক মিত্র, প্রথম প্রকাশ ,১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

১১৪) সাহিত্য - প্রবন্ধ প্রবন্ধ - সাহিত্য - সম্পাদনা হীরেন চট্টোপাধ্যায় , কৃষ্ণগোপাল রায়, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ , ২০০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ,কলকাতা ৯ ।

১১৫) সুকান্তের জীবন ও কাব্য - ড: সরোজমোহন মিত্র, প্রথম দে'জ সংস্করণ ,১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

১১৬) নকশলবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য - বামাচরণ মুখোপাধ্যায় , প্রথম প্রকাশ , দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী , ১৮ এ টেমার লেন , কলকাতা ৯ ।

১১৭) বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অণ্বীক্ষা - সম্পাদনা সুবল সামন্ত , প্রথম প্রকাশ , ১৯৯৮, এবং মুশায়েরা , ৩৮/এ/১ , নবীনচন্দ্র দাস রোড , কলকাতা ৯০ ।

১১৮) বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ (১৯৬১-১৯৮৫) - উর্মি রায়চৌধুরী , প্রথম প্রকাশ ,২০০১, পুস্তক বিপনি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

১১৯) শিল্পিত বাঙলা উপন্যাস - গুণময় মান্না , প্রথম প্রকাশ ,২০০২, বামা পুস্তকালয় , ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

১২০) উপন্যাসের সময় - তপোধীর ভট্টাচার্য , দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ , ২০০৯, এবং মুশায়েরা , ৩৮/এ/১ নবীনচন্দ্র দাস রোড , কলকাতা ৯০ ।

১২১) বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক - গুণময় মান্না , প্রথম প্রকাশ ,১৯৯৫, ভাষা ও সাহিত্য , ১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

১২২) বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা - ড: প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ , ২০০২, এডুকেশন ফোরাম , স্টল ৪১ , ভবানীদত্ত লেন , কলেজ স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

১২৩) বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস - কার্তিক লাহিড়ী , প্রথম অরুণা পরিবর্ধিত সংস্করণ , ১৪০৫অরুণা প্রকাশনী , ৭ যুগলকিশোর দাস লেন , কলকাতা ৬ ।

১২৪) বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিম পর্ব (১৯৪২-১৯৪৭) - ড: শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী , প্রথম প্রকাশ ,২০০৬, করুণা প্রকাশনী , ১৮এ টেমার লেন , কলকাতা ৯ ।

১২৫) সমাজ দ্বন্দ্ব ও বাংলা কথাসাহিত্য - ড: অরূপকুমার দাস , প্রথম প্রকাশ ,২০০৫, করুণা প্রকাশনী , ১৮এ টেমার লেন , কলকাতা ৯ ।

১২৬) আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী - জগদীশ ভট্টাচার্য ,
দ্বিতীয় প্রকাশ , ২০০৭ভারবি , ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট , কলকাতা ৭৩ ।

১২৭) সমকালের গল্প-উপন্যাস : প্রত্যাখ্যানের ভাষা - রুশতী সেন , প্রথম প্রকাশ ,২০০৭, পুস্তক বিপনি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

১২৮) মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস - চিত্তরঞ্জন লাহা , প্রথম প্রকাশ ,২০০৪, পুস্তক বিপনি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

১২৯) উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব , সম্পাদনা অঞ্জন সেন উদয়নারায়ণ সিংহ , প্রথম প্রকাশ ,২০০৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

১৩০) অতিপ্রাকৃতের উদ্‌ভাস : বাংলা কথাসাহিত্য - অপর্ণা দাশ ,প্রথম প্রকাশ , ২০০৪, পুস্তক বিপনি , ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা ৯ ।

১৩১) বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ - ড: কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী , প্রথম পুষ্প সংস্করণ ,১৯৯৯, পুষ্প , ১৩ বাঙ্গুর অ্যাভিন্যু , কলকাতা ৫৫ ।

১৩২) সাহিত্য সন্ধান - ড: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ,পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ,১৯৮৮ সাহিত্য বিহার , ১বি কাহেন্দ্রশীমানী স্ট্রীট , কলকাতা ৯ ।

১৩৩) উপন্যাসের কথা - দেবীপদ ভট্টাচার্য , দ্বিতীয় জি . এ . ই . সংস্করণ , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা ৭৩ ।

১৩৪) বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, ড: শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২ ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলি ১২

১৩৫) বাংলার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, গ্রন্থবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি ৯

১৩৬) বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খন্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪

১৩৭) ঐ দ্বিতীয় খন্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪

<u>পত্র-পত্রিকা</u>

১) দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম - দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন ২০০৪

২) পরিচয়, ৭-১২ সংখ্যা, ৭৩ বর্ষ, ফেব্রুয়ারী-জুলাই ২০০৪

৩) প্রবাসী, ষোড়শ ভাগ, প্রথম খন্ড, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩-২৩

৪) 'কবিতা-পরিচয়' বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭

৫) 'দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা', ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

৬) 'দেশ', ১৬ই আগষ্ট, ১৯৮৬

৭) 'দেশ', ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

৮) 'অনুষ্টুব: কলকাতা', ১৯৯৪

৯) 'পত্রপুট'/৩৩ সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

১০) 'সাপ্তাহিক বর্তমান', ৪ই অক্টোবর, ১৯৯৭

১১) 'সপ্তাহ' পত্রিকা/ ৮ই আগষ্ট, ২০০৩

১২) 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ই জুন, ২০০৩

১৩) 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৯ই জুলাই, ২০০৩

....

LIBRARY N.B.U. DARJEELING